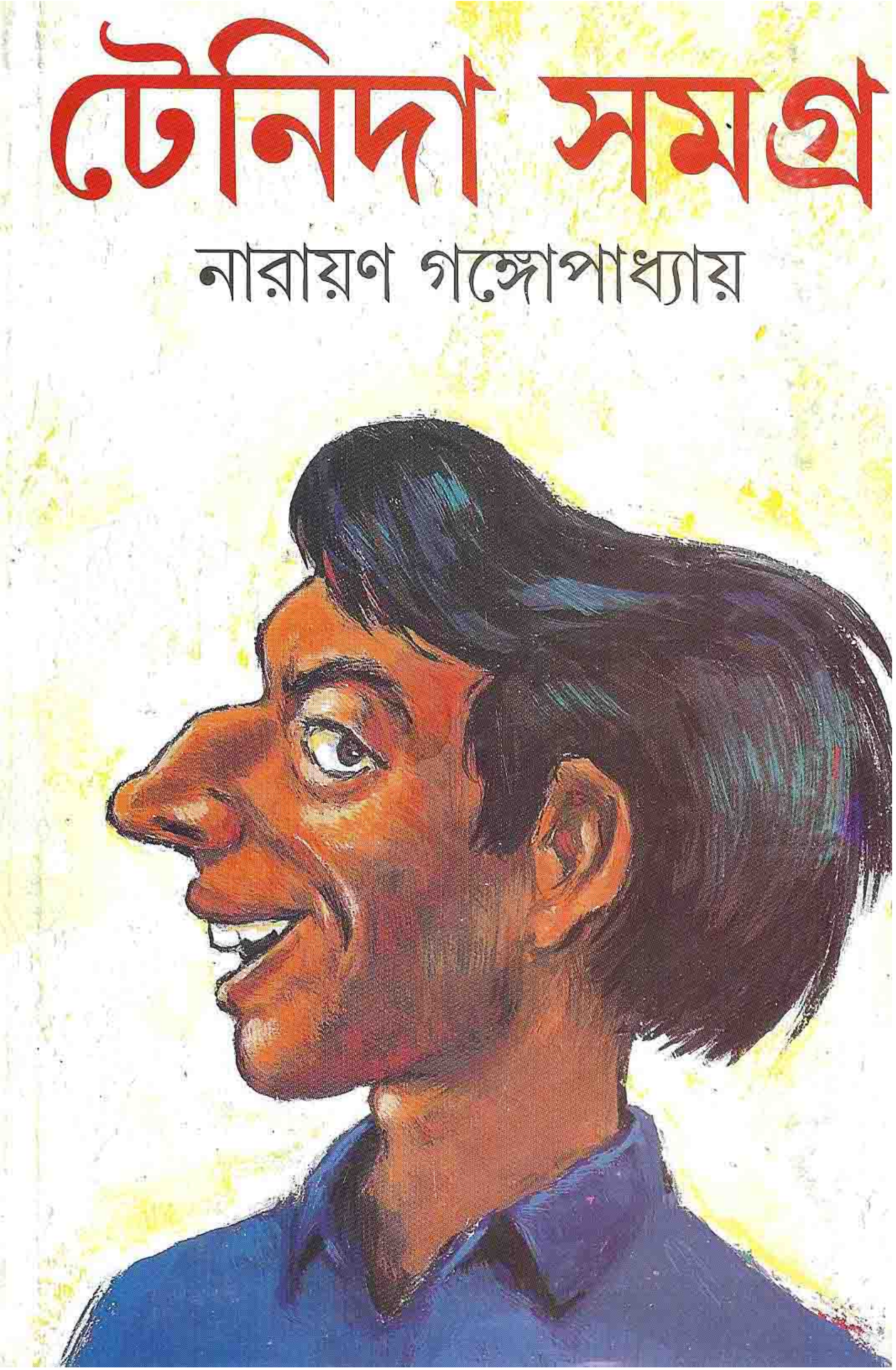

টেনিদা সমগ্র

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

সংকলন ও সম্পাদনা

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৬ থেকে দ্বাদশ মুদ্রণ জুলাই ২০০৫ পর্যন্ত
মুদ্রণ সংখ্যা ৭২০০০
ত্রয়োদশ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ২০০৬ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০০

প্রচ্ছদ দেবাশীষ দেব
এখনকার টেনিদার ছবি তুলেছেন শ্যামল চক্রবর্তী

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনও রূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-502-6

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড
৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা ৭০০০০৯
থেকে মুদ্রিত।

১২৫.০০

সংকলকের নিবেদন

'টেনিদা-সমগ্র' প্রকাশিত হল।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের যাবতীয় ছোটদের লেখা এখন 'সমগ্র কিশোরসাহিত্য' নামের সংকলনে পাওয়া যায়। চার খণ্ডের সেই আনন্দ-প্রকাশনাটি অত্যন্ত জনপ্রিয়ও বটে। তবু কেন আলাদা করে এই 'টেনিদাসমগ্র', এমন প্রশ্ন—কেউ তুলবেন বলে মনে হয় না, তাও—যদি কেউ তোলেন, জবাবদিহির দায় একটা থেকেই যায়। এর উত্তরে বলি, চার খণ্ডের 'সমগ্র কিশোরসাহিত্য'-এর ভিত্তিতেই 'টেনিদাসমগ্র' সংকলিত, তবু এই সংগ্রহে এমন-কিছু রয়েছে যা কিনা 'সমগ্র কিশোরসাহিত্য'-এ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আর তা হল, শুধুই টেনিদার গল্প-উপন্যাসের কাহিনী পরপর পড়ে যাবার, পড়তে-পড়তে অবিমিশ্র আনন্দ উপভোগ করে যাবার এক দুর্লভ সুযোগ।

এ-কথা অবিসংবাদিত রূপে সত্যি যে, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটদের লেখা মাত্রেই দারুণ উপভোগ্য। কিন্তু টেনিদার ক্ষেত্রে তার মাত্রাটা যেন কূল-ছাপানো। প্রেমেন্দ্র মিত্রের যেমন ঘনাদা, পরবর্তীকালে সত্যজিৎ রায়ের যেমন ফেলুদা, তেমনই এক পরম পাঠকপ্রিয় চরিত্র টেনিদা। বয়স-ভোলানো, প্রজন্ম-পেরুনো, অবাক-করা এই পাঠকপ্রিয়তা। টেনিদার সঙ্গে ঘনাদার মিল নেই, ফেলুদা তো গোয়েন্দাচরিত্র, টেনিদা একেবারে টেনিদারই মতন। এক এবং অদ্বিতীয়। টেনিদার মুখের কথা আজ প্রবচন, পটলডাঙার চারমূর্তির কীর্তিকাহিনী আজ কিংবদন্তী। এই অবিস্মরণীয় প্রবচন আর কিংবদন্তীকেই দু' মলাটের মধ্যে পুরোপুরি ধরে রাখার চেষ্টা এই বইতে।

এই সংগ্রহে রইল টেনিদাকে নিয়ে লেখা পাঁচটি উপন্যাস, বত্রিশটি গল্প আর একটি নাটিকা। এর বাইরেও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা টেনিদার কোনও গল্প-উপন্যাস-নাটকের যদি খোঁজ পান কোনও সহৃদয় পাঠক, তাঁর উদ্দেশে অনুরোধ রইল, তিনি যেন অনুগ্রহ করে প্রকাশকের ঠিকানায় সংবাদটি জানিয়ে এই সংগ্রহকে সম্পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সহযোগিতা করেন। এই সূত্রেই বলি, এই সংকলন করতে গিয়ে টেনিদার নামে এমন গল্প-উপন্যাসও দু'-একটি বাজারচালু গ্রন্থে চোখে পড়েছে যা কিনা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর প্রকাশিত এবং তাঁর লেখা নয়। সে-লেখা এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত করা সঙ্গত মনে হয়নি।

প্রয়োজনীয় তথ্য জোগাড় করতে না পারায় এই সংগ্রহের গল্প-উপন্যাস রচনাকাল-অনুসারে বিন্যস্ত করা গেল না। এ-ত্রুটির দায় সর্বাংশে সংকলকের। তবে, নিতান্ত এলোমেলোভাবে রচনাগুলি সাজিয়ে দিতেও মনের সায় মেলেনি। তাই, মধুর অভাবে গুড়ের ব্যবস্থার মতন, বিকল্প বিন্যাসের কথা ভাবতে হয়েছে।

পাঠকের চোখে খুঁজে বার করতে চেয়েছি টেনিদা-কাহিনী-সমূহের অন্তর্লীন ধারাবাহিকতা। যেভাবে তা ধরা পড়েছে, সেই পারম্পর্যেই সাজিয়ে দেওয়া হল উপন্যাস-গল্পের নতুন ক্রম। এ-বিষয়েও টেনিদা-অনুরাগীদের যাবতীয় অভিমত ও পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে। এভাবে সাজাতে গিয়ে টেনিদা-কাহিনীর কতকগুলি অচেনা দিক চোখের সামনে ফুটে উঠেছে, চোখে পড়েছে কিছু কিছু অসঙ্গতিও। এ-নিয়ে পরিশিষ্টে যোগ করা হল সংক্ষিপ্ত একটি আলোচনা। সেই সঙ্গে সংযোজিত হল আনন্দবাজার পত্রিকায় সম্প্রতি-প্রকাশিত সাক্ষাৎকারভিত্তিক একটি দারুণ কৌতূহলকর প্রতিবেদন। যে-চরিত্রের আদলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় গল্পের টেনিদাকে নিজের মতো করে সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন, ক'দিন আগে বাস্তবের সেই টেনিদার সঙ্গে পটলডাঙায় গিয়ে মুখোমুখি কথা বলে এসেছেন সাংবাদিক দীপংকর চক্রবর্তী। টেনিদার সাক্ষাৎকার-সংকলিত তাঁর সেই লেখাটিকে তিনি এ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করতে দিয়েছেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি এ-গ্রন্থের প্রকাশক বন্ধুবর বাদল বসুর কাছেও, আলস্যপরায়ণ, অছিলা-অনুরাগী ও খুঁতখুঁতে স্বভাবের লেখকের কাছ থেকেও ঠিক সময়ে পাণ্ডুলিপি আদায় করে নেবার সমূহ কৌশল যাঁর করায়ত্ত।

পরিশেষে একটি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ। এই সংকলন করার পিছনে নিরন্তর প্রেরণা, তাগিদ ও প্ররোচনা জুগিয়েছিল অতি কাছের এক গ্রন্থভুক্ পাঠিকা। আজ যখন সত্যি-সত্যি বেরুতে চলেছে 'টেনিদা-সমগ্র', সে তখন নয়নসমুখ থেকে নয়নের মাঝখানে। বেদনার্ত চিত্তে এই সম্পাদনার ফসল তার উদ্দেশেই উৎসর্গ করলাম।

১ মাঘ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ
রূপসাগর অ্যাপার্টমেন্ট
কলকাতা ৭০০ ০৫৫

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

সূচিপত্র

উপন্যাস

১১ চারমূর্তি
৮১ চার মূর্তির অভিযান
কম্বল নিরুদ্দেশ ১৪৩
টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক ১৯১
ঝাউ-বাংলোর রহস্য ২২২

গল্প

২৮১ একটি ফুটবল ম্যাচ
২৮৭ দধীচি, পোকা ও বিশ্বকর্মা
২৯৩ খট্টাঙ্গ ও পলান্ন
২৯৯ মৎস্য-পুরাণ
৩০৫ পেশোয়ার কী আমীর
৩১১ কাক-কাহিনী
৩১৭ ক্রিকেট মানে ঝিঁঝি
৩২৩ পরের উপকার করিও না
৩২৯ চেঙ্গিস আর হ্যামলিনের বাঁশিওলা
৩৩৫ ঢাউস
৩৪২ নিদারুণ প্রতিশোধ
৩৪৬ তত্ত্বাবধান মানে—জীবে প্রেম
৩৫২ দশাননচরিত
৩৫৮ দি গ্রেট ছাঁটাই
৩৬৫ ক্যামোফ্লেজ
৩৭০ কুট্টিমামার হাতের কাজ
সাংঘাতিক ৩৭৭
বন-ভোজনের ব্যাপার ৩৮৩
কুট্টিমামার দন্ত-কাহিনী ৩৯০
প্রভাতসঙ্গীত ৩৯৭
ভজহরি ফিল্ম কর্পোরেশন ৪০৫
চামচিকে আর টিকিট চেকার ৪১১
ব্রহ্মবিকাশের দন্তবিকাশ ৪১৬
টিকটিকির ল্যাজ ৪২৩
বেয়ারিং ছাঁট ৪২৯
কাঁকড়াবিছে ৪৩৬
হনোলুলুর মাকুদা ৪৪৪
হালখাতার খাওয়াদাওয়া ৪৪৮
ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ ৪৫৩
টেনিদা আর ইয়েতি ৪৫৯
একাদশীর রাঁচি যাত্রা ৪৬৬
ন্যাংচাদার হাহাকার ৪৭১
ভজগৌরাঙ্গ কথা ৪৭৮

নাটিকা

পরের উপকার করিও না ৪৮৭

সংযোজন

কিছু কথা : বই নিয়ে, টেনিদাকে নিয়ে ৪৯৭
পটলডাঙার সেই টেনিদার বয়স এখন ৭৫ ৫০১

উ প ন্যা স

চার মূর্তি

১। মেসোমশায়ের অট্টহাসি

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

চাটুজ্যেদের রোয়াকে আমাদের আড্ডা জমেছে। আমরা তিনজন আছি। সভাপতি টেনিদা, হাবুল সেন, আর আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে—পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই। আমাদের চতুর্থ সদস্য ক্যাবলা এখনও এসে পৌঁছয়নি।

চারজনে পরীক্ষা দিয়েছি। লেখাপড়ায় ক্যাবলা সবচেয়ে ভালো—হেডমাস্টার বলেছেন ও নাকি স্কলারশিপ পাবে। ঢাকাই বাঙাল হাবুল সেনটাও পেরিয়ে যাবে ফার্স্ট ডিভিশনে। আমি দু'-বার অঙ্কের জন্যে ডিগবাজি খেয়েছি—এবার থার্ড ডিভিশনে পাশ করলেও করতে পারি। আর টেনিদা—

তার কথা না বলাই ভালো। সে ম্যাট্রিক দিয়েছে—কে জানে এনট্রান্সও দিয়েছে কি না। এখন স্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছে—এর পরে হয়তো হায়ার সেকেন্ডারিও দেবে। স্কুলের ক্লাস টেন-এ সে একেবারে মনুমেন্ট হয়ে বসে আছে—তাকে সেখান থেকে টেনে এক ইঞ্চি নড়ায় সাধ্য কার!

টেনিদা বলে, হেঁ—হেঁ—বুঝলিনে? ক্লাসে দু'-একজন পুরনো লোক থাকা ভালো—মানে, সব জানে-টানে আর কি! নতুন ছোকরাদের একটু ম্যানেজ করা চাই তো!

তা নতুন ছেলেরা ম্যানেজ হচ্ছে বইকি। এমনকি টেনিদার দুঁদে বড়দা—যাঁর হাঁক শুনলে আমরা পালাতে পথ পাই না, তিনি সুদ্ধু ম্যানেজড় হয়ে এসেছেন বলতে গেলে। তিন-চার বছর আগেও টেনিদার ফেলের খবর এলে চেঁচিয়ে হাট বাধাতেন, আর টেনিদার মগজে ক-আউন্স, গোবর আছে তাই নিয়ে গবেষণা করতেন। এখন তিনিও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। টেনিদার ফেল করাটা তাঁর এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, হঠাৎ যদি পাশ করে ফেলে তা হলে সেইসঙ্গে তিনি

একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে পড়বেন।

অতএব নিশ্চিন্তে আড্ডা চলছে।

ওরই মধ্যে হতভাগ্য হাবুলটা একবার পরীক্ষার কথা তুলেছিল, টেনিদা নাক কুঁচকে বলেছিল, নেঃ—নেঃ—রেখে দে! পরীক্ষা-ফরীক্ষা সব জোচ্চুরি! কতকগুলো গাধা ছেলে গাদা-গাদা বই মুখস্থ করে আর টকাটক পাশ করে যায়। পাশ না করতে পারাই সবচেয়ে শক্ত। দ্যাখ না—বছরের পর বছর হলে গিয়ে বসছি, সব পেপারের অ্যানসার লিখছি—তবু দ্যাখ কেউ আমাকে পাশ করাতে পারছে না। সব এগজামিনারকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছি। বুঝলি, আসল বাহাদুরি এখানেই।

আমি বললাম, যা বলেছ। এইজন্যেই তো দু'-বছর তোমার শাগরেদি করছি। ছোটকাকা কান দুটো টেনে-টেনে প্রায় আধ-হাত লম্বা করে দিয়েছে—তবু ইস্কুল কামড়ে ঠিক বসে আছি।

টেনিদা বললে, চুপ কর, মেলা বকিসনি! তোর ওপরে আমার আশা-ভরসা ছিল—ভেবেছিলুম, আমার মনের মতো শিষ্য হতে পারবি তুই। কিন্তু দেখছি তুই এক-নম্বর বিশ্বাসঘাতক! কোন্ আক্কেলে অঙ্কের খাতায় ছত্রিশ নম্বর শুদ্ধ করে ফেললি? আর ফেললিই যদি, ঢ্যারা দিয়ে কেটে এলিনে কেন?

আমি ঘাড়-টাড় চুলকে বললাম, ভারি ভুল হয়ে গেছে!

টেনিদা বললে, দুনিয়াটাই নেমকহারাম। মরুক গে। কিন্তু এখন কী করা যায় বল দিকি? পরীক্ষার পর স্রেফ কলকাতায় বসে ভ্যারেন্ডা ভাজব? একটু বেড়াতে-টেড়াতে না গেলে কি ভালো লাগে?

আমি খুশি হয়ে বললাম, বেশ তো চলো না। লিলুয়ায় আমার রাঙা-পিসিমার বাড়ি আছে—দু'দিন সেখানে বেশ হই-হল্লা করে—

—থাম বলছি প্যালা—থামলি?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, যেমন তোর ছাগলের মতো লম্বা লম্বা কান, তেমনি ছাগলের মতো বুদ্ধি। লিলুয়া! আহা ভেবে-চিন্তে কী একখানা জায়গাই বের করলেন! তার চেয়ে হাতিবাগান বাজারে গেলে ক্ষতি কী? ছাতের ওপরে উঠে হাওয়া খেলেই বা ঠ্যাকাচ্ছে কে? যতসব পিলে রুগি নিয়ে পড়া গেছে, রামোঃ।

হাবুল সেন চিন্তা করে বললে, আর অ্যাকটা জায়গায় যাওন যায়। বর্ধমানে যাইবা? সেইখানে আমার বড়মামা হইল গিয়া পুলিশের ডি. এস. পি—

দুদ্দুর। সেই ধ্যাড়ধেড়ে বর্ধমান?—টেনিদা নাক কোঁচকাল: ট্রেনে চেপেছিস কি রক্ষে নেই—বর্ধমানে যেতেই হবে। মানে, যে-গাড়িতেই চড়বি—ঠিক বর্ধমানে নিয়ে যাবে। সেই রেলের ঝক-ঝক আর পিঁ পিঁ—প্ল্যাটফর্মে যেন রথের মেলা! তবে—চাঁদির ওপরটা একবার চুলকে নিয়ে টেনিদা বললে—তবে হ্যাঁ—সীতাভোগ মিহিদানা পাওয়া যায় বটে। সেদিক থেকে বর্ধমানের প্রস্তাবটা বিবেচনা করা যেতে পারে বইকি। অন্তত লিলুয়ার চাইতে ঢের ভালো।

রাঙা-পিসিমার বাড়িকে অপমান! আমার ভারি রাগ হল।

বললাম, সে তো ভালোই হয়। তবে, বর্ধমানের মশার সাইজ প্রায় চড়ুই পাখির মতো, তাদের গোটাকয়েক মশারিতে ঢুকলে সীতাভোগ মিহিদানার মতো তোমাকেই ফলার করে ফেলবে। তা ছাড়া—আমি বলে চললাম—আরও আছে। শুনলে তো, হাবুলের মামা ডি. এস. পি.। ওখানে যদি কারও সঙ্গে মারামারি বাধিয়েছ তা হলে আর কথা নেই—সঙ্গে-সঙ্গে হাজতে পুরে দেবে।

টেনিদা দমে গিয়ে বললে, যাঃ—যাঃ—মেলা বকিসনি! কী রে হাবুল—তোর মামা কেমন লোক?

হাবুল ভেবে-টেবে বললে, তা, প্যালা নিতান্ত মিথ্যা কথা কয় নাই! আমার মামায় আবার মিলিটারিতে আছিল—মিলিটারি মেজাজ—

—এই সেরেছে! নাঃ—এ ঢাকার বাঙালটাকে নিয়ে পারবার জো নেই! ও-সব বিপজ্জনক মামার কাছে খামকা মরতে যাওয়া কেন? দিব্যি আছি—মিথ্যে ফ্যাচাঙের ভেতরে কে পড়তে চায় বাপু!

আলোচনাটা এ-পর্যন্ত এসেছে—হঠাৎ বেগে ক্যাবলার প্রবেশ। হাতে একঠোঙা আলু-কাবলি।

—এই যে—ক্যাবলা এসে পড়েছে। বলেই টেনিদা লাফিয়ে উঠল, তারপরেই চিলের মতো ছোঁ মেরে ক্যাবলার হাত থেকে কেড়ে নিলে আলু-কাবলির ঠোঙাটা। প্রায় আদ্ধেকটা একেবারে মুখে পুরে দিয়ে বললে, কোত্থেকে কিনলি রে? তোফা বানিয়েছে তো!

আলু-কাবলির শোকে ক্যাবলাকে বিমর্ষ হতে দেখা গেল না। বরং ভারি খুশি হয়ে বললে, মোড়ের মাথায় একটা লোক বিক্রি করছিল।

—এখনও আছে লোকটা? আরও আনা-চারেক নিয়ে আয় না!

ক্যাবলা বললে, ধ্যাৎ, আলু-কাবলি কেন? পোলাও—মুরগি—চিংড়ির কাটলেট—আনারসের চাটনি—দই—রসগোল্লা—

টেনিদা বললে, ইস, ইস,—আর বলিসনি! এমনিতেই পেট চুঁই-চুঁই করছে, তার ওপরে ওসব বললে একদম হার্টফেল করব।

ক্যাবলা হেসে বললে, হার্টফেল করলে তুমিই পস্তাবে! আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে এ-সবই রান্না হচ্ছে কিনা! আর মা তোমাদের তিনজনকে নেমন্তন্ন করতে বলে দিয়েছেন।

শুনে আমরা তিনজনেই একেবারে থ! পুরো তিন মিনিট মুখ দিয়ে একটা রা বেরুলো না।

তারপর তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে টেনিদা বললে, সত্যি বলছিস ক্যাবলা—সত্যি বলছিস? রসিকতা করছিস না তো?

ক্যাবলা বললে, রসিকতা করব কেন? রাঁচি থেকে মেসোমশাই এসেছেন যে। তিনিই তো বাজার করে আনলেন।

—আর মুরগি? মুরগি আছে তো? দেখিস ক্যাবলা—বামুনকে আশা দিয়ে নিরাশ করিসনি! পরজন্মে তাহলে তোকে কিন্তু মুরগি হয়ে জন্মাতে হবে—খেয়াল

থাকে যেন !

—সে-ভাবনা নেই। আধ-ডজন দড়ি-বাঁধা মুরগি উঠনে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছে দেখে এলাম।

স্ট্রিম—ট্রিম—ট্রা—লা—লা—লা—লা—

টেনিদা আনন্দে নেচে উঠল। সেইসঙ্গে আমরা তিনজন কোরাস ধরলাম। গলি দিয়ে একটি নেড়ি-কুকুর আসছিল—সেটা ঘ্যাঁক করে একটা ডাক দিয়েই ল্যাজ গুটিয়ে উল্টোদিকে ছুটে পালাল।

রাত্তিরে খাওয়ার তা ব্যবস্থা হল—সে আর কী বলব ! টেনিদার খাওয়ার বহর দেখে মনে হচ্ছিল, এর পরে ও আর এমনি উঠতে পারবে না—ক্রেনে করে তুলতে হবে। সের-দুই মাংসের সঙ্গে ডজন খানেক কাটলেট তো খেলই—এর পরে প্লেট-ফ্লেটসুদ্ধু খেতে আরম্ভ করবে এমনি আমার মনে হল।

খাওয়ার টেবিলে আর-একজন মজার মানুষকে পাওয়া গেল। তিনি ক্যাবলার মেসোমশাই। ভদ্রলোক কত গল্পই না জানেন ! একবার শিকার করতে গিয়ে বুনো মোষের ল্যাজ ধরে কেমন বন-বন করে ঘুরিয়েছিলেন, সে-গল্প শুনে হাসতে-হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরবার জো হল। আর-একবার নাকি গাছের ডাল ভেঙে সোজা বাঘের পিঠের উপর পড়ে গিয়েছিলেন—বাঘ তাঁকে টপাৎ করে খেয়ে ফেলা দূরের কথা—সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান ! বোধহয় ভেবেছিল তাকে ভূতে ধরেছে। এমনকি সবাই মিলে জলজ্যান্ত বাঘকে যখন খাঁচায় পুরে ফেলল—তখনও তার জ্ঞান হয়নি। শেষকালে নাকি স্মেলিং সল্ট শুঁকিয়ে আর মাথায় জলের ছিটে দিয়ে তবে বাঘের মূর্ছা ভাঙাতে হয়।

খাওয়ার পর ক্যাবলাদের ছাতে বসে এইসব গল্প হচ্ছিল। ইজি-চেয়ারে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে গল্প বলছিলেন ক্যাবলার মেসোমশাই—আর আমরা মাদুরে বসে শুনছিলাম। মেসোমশাইয়ের টাকের ওপর চাঁদের আলো চিকচিক করছিল—থেকে-থেকে লালচে আগুনে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল তাঁর মুখখানা।

মেসোমশাই বললেন, ছুটিতে বেড়াতে যেতে চাও ? আমি এক-জায়গায় যাওয়ার কথা বলতে পারি। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গা আশেপাশে বেশি নেই।

ক্যাবলা বললে, রাঁচি ?

মেসোমশাই বললেন, না—না, এখন বেজায় গরম পড়ে গেছে ওখানে ? তা ছাড়া বড্ড ভিড়—ও সুবিধে হবে না।

টেনিদা বললে, দার্জিলিং, না শিলং ?

মেসোমশাই বললেন, বেজায় শীত ? গরমে পুড়তে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু শীতে জমে যেতেই বা কী সুখ, সে আমি ভেবে পাইনে। ও-সব নয়।

আমার একটা কিছু বলার দরকার এখন। কিন্তু কিছুই মনে এল না। ফস করে বলে বসলাম, তা হলে গোবরডাঙা ?

—চুপ কর বলছি প্যালা—চুপ কর !—টেনিদা দাঁত খিঁচোল—নিজে এক-নম্বর গোবর-গণেশ—গোবরডাঙা আর লিলুয়া ছাড়া আর কী বা খুঁজে পাবি ?

মেসোমশাই বললেন, থামো—থামো। ও-সব নয়। আমি যে-জায়গার কথা বলছি, কলকাতার লোকে তার এখনও খবর রাখে না। জায়গাটা রাঁচির কাছাকাছি বটে—হাজারিবাগ আর রামগড় থেকে সেখানে যাওয়া যায়। বাস থেকে নেমে গোরুর গাড়ি চড়ে মাইল-তিনেক পথ। ভারি সুন্দর জায়গা—শাল আর মহুয়ার বন, একটা লেক রয়েছে—তাতে টলচলে নীল জল। দিনের বেলাতেই হরিণ দেখা যায়—খরগোশ আর বন-মুরগি ঘুরে বেড়ায়। কাছেই সাঁওতালদের বস্তি, দুধ আর মাংস খুব শস্তায় পাওয়া যায়—লেকেও কিছু মাছ আছে—দু'-পয়সা চার পয়সা সের। আর সেইখানে পাহাড়ের একটা টিলার ওপর একটা খাসা বাংলো আমি কিনেছি। বাংলোটা এক সাহেব তৈরি করিয়েছিল—বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে বেচে দিয়ে গেছে। চমৎকার বাংলো ! তার বারান্দায় বসে কতদূর পর্যন্ত যে দেখতে পাওয়া যায় ঠিক নেই। পাশেই ঝরনা—বারো মাস তির-তির করে জল বইছে। ওখানে গিয়ে যদি একমাস থাকো—এই রোগা প্যাঁকাটির দল সব একেবারে ভীম-ভবানী হয়ে ফিরে আসবে।

টেনিদা পাহাড়-প্রমাণ আহার করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়েছিল, তড়াক করে উঠে বসল।

—আমরা যাব ! আমরা চারজনেই !

মেসোমশাই আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সে তো ভালো কথাই। কিন্তু একটা মুস্কিল আছে যে।

—কী মুস্কিল ?

—কথাটা হল—ইয়ে—মানে বাড়িটার কিছু গোলমাল আছে।

—গোলমাল কিসের ?

—ওখানকার সাঁওতালেরা বলে, বাড়িটা নাকি দানো-পাওয়া। ওখানে নাকি অপদেবতার উপদ্রব হয় মধ্যে-মধ্যে। কে যেন দুম-দাম করে হেঁটে বেড়ায়—অদ্ভুতভাবে চেঁচিয়ে ওঠে—অথচ কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। আমি অবশ্য বাড়িটা কেনবার পরে মাত্র বার-তিনেক গেছি—তাও সকালে পৌঁছেছি, আর সন্ধেবেলায় চলে এসেছি। কাজেই রাত্তিরে ওখানে কী হয় না হয় কিছুই টের পাইনি। তাই ভাবছি—ওখানে যেতে তোমাদের সাহসে কুলোবে কি না।

টেনিদা বললে, ছোঃ ! ওসব বাজে কথা। ভূত-টুত বলে কিছু নেই মেসোমশাই। আমরা চারজনেই যাব। ভূত যদি থাকেই, তাহলে তাকে একেবারে রাঁচির পাগলাগারদে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ফিরে আসব কলকাতায়। আর—

কিন্তু তারপরেই আর কিছু বলতে পারল না টেনিদা—হঠাৎ থমকে গিয়ে দু'হাতে হাবুল সেনকে প্রাণপণে জাপটে ধরল।

হাবুল ঘাবড়ে গিয়ে বললে, আহা-হা—কর কী, ছাইড়্যা দাও, ছাইড়্যা দাও ! গলা পর্যন্ত খাইছি, প্যাটটা ফ্যাইট্যা যাইব যে !—

টেনিদা তবু ছাড়ে না। আরও শক্ত করে হাবুলকে জাপটে ধরে বললে, ও কী—ও কী—বাড়ির ছাতে ও কী !

আকাশে চাঁদটা ঢাকা পড়েছে একফালি কালো মেঘের আড়ালে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে পাশের বাড়িতে ছাতে কার যেন দুটো অমানুষিক চোখ দপদপ করে জ্বলছে।

আর সেই মুহূর্তে ক্যাবলার মেসোমশাই আকাশ ফাটিয়ে প্রচণ্ড অট্টহাসি করে উঠলেন। সে-হাসিতে আমার কান বোঁ-বোঁ করে উঠল, পেটের মধ্যে খটখটিয়ে নড়ে উঠল পালাজ্বরের পিলে—মনে হল মুরগি-টুরগিগুলো বুঝি পেট-ফেট চিরে কঁক্-ক্ করতে করতে বেরিয়ে আসবে।

এমন বিরাট কিম্ভুত অট্টহাসি জীবনে আর কখনও শুনিনি।

২। যোগ-সর্পের হাঁড়ি

একে তো ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের ওই উৎকট অট্টহাসি—তারপর আবার পাশের বাড়ির ছাতে দুটো আগুন-মাখা চোখ। 'জয় মা কালী' বলে সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাব ভাবছি, এমন সময়—মিয়্যাঁও—মিয়্যাঁও—মিয়্যাঁও—

সেই জ্বলন্ত চোখের মালিক এক লাফে ছাতের পাঁচিলে উঠে পড়ল, তারপর আর-এক লাফে আর-এক বাড়ির কার্নিশে।

পৈশাচিক অট্টহাসিটা থামিয়ে মেসোমশাই বললেন, একটা হুলো-বেড়াল দেখেই চোখ কপালে উঠল, তোমরা যাবে সেই ডাক-বাংলোয় !—ভেংচি কাটার মতো করে আবার খানিকটা খ্যাঁকখেঁকে হাসি হাসলেন ভদ্রলোক : বীর কী আর গাছে ফলে।

আমাদের ভেতর ক্যাবলাটা বোধহয় ভয়-টয় বিশেষ পায়নি—এক নম্বরের বিচ্ছু ছেলে। তাই সঙ্গে সঙ্গেই বললে, না—পটোলের মতো পটলডাঙায় ফলে।

টেনিদার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হাবুল হাঁসফাঁস করে বললে, কিংবা ঢ্যাঁড়সের মতন গাছের ওপর ফলে।

এবার আমাকেও কিছু বলতে হল : কিংবা চালের ওপর চাল-কুমড়োর মতো ফলে।

টেনিদা দম নিচ্ছিল এতক্ষণ, এবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠল,—থাম থাম সব—বাজে বকিসনি ! সত্যি বলছি মেসোমশাই—ইয়ে—আমরা একদম ভয় পাইনি। এই প্যালাটা বেজায় ভিতু কিনা, তাই ওকে একটু ঠাট্টা করছিলাম।

বা রে, মজা মন্দ নয় তো ! শেষকালে আমার ঘাড়েই চালাবার চেষ্টা। আমার ভীষণ রাগ হল। আমি ছাগলের মতো মুখ করে বললাম, না মেসোমশাই, আমি মোটে ভয় পাইনি। টেনিদার দাঁত-কপাটি লেগে যাচ্ছিল কিনা, তাই চেঁচিয়ে ওকে সাহস দিচ্ছিলাম।

—ইঃ, সাহস দিচ্ছিল। ওরে আমার পাকা পালোয়ান রে !—টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে মুখটাকে আমের মোরব্বার মতো করে বললে, দ্যাখ প্যালা, বেশি জ্যাঠামি করবি তো এক চড়ে তোর কান দুটোকে কানপুরে পাঠিয়ে দেব !

মেসোমশাই বললেন, আচ্ছা থাক, থাক। তোমরা যে বীরপুরুষ এখন তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু আসল কথা হোক। তোমরা কি সত্যিই ঝন্টিপাহাড়ে যেতে চাও ?

ঝন্টিপাহাড় ! সে আবার কোথায় ? যা-বাব্বা, সেখানে মরতে যাব কেন ?—টেনিদা চটাং করে বলে ফেলল।

মেসোমশাই বললেন, কী আশ্চর্য—এক্ষুনি তো সেখানে যাওয়ার কথা হচ্ছিল।

—তাই নাকি ?—টেনিদা মাথা চুলকে বললে, বুঝতে পারিনি। তবে কিনা—ঝন্টিপাহাড় নামটা, কী বলে—ইয়ে—তেমন ভালো নয়।

হাবুল বললে,হ, বড়ই বদখত।

আমি বললাম, শুনলেই মনে হয় ব্রহ্মদৈত্য আছে।

মেসোমশাই আবার খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে বললেন, তার মানে তোমরা যাবে না ? ভয় ধরছে বুঝি ?

টেনিদা এবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর সাঁ করে একটা বুক-ডন দিয়ে বললে, ভয় ? দুনিয়ায় আছে বলে আমি জানিনে !—নিজের বুকে একটা থাপ্পড় মেরে বললে, কেউ না যায়—হাম জায়েঙ্গা ! একাই জায়েঙ্গা !

ক্যাবলা বললে, আর যখন ভূতে ধরেঙ্গা ?

—তখন ভূতকে চাটনি বানিয়ে খায়েঙ্গা !—টেনিদা বীররসে চাগিয়ে উঠল :সত্যি, কেউ না যায় আমি একাই যাব।

হঠাৎ আমার ভারি উৎসাহ হল।

—আমিও যাব !

ক্যাবলা বললে, আমিও।

হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বললে, হ, আমিও জামু !

মেসোমশাই বললেন, তোমরা ভয় পাবে না ?

টেনিদা বুক চিতিয়ে বললেন, একদম না।

আমিও ওই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হতভাগা ক্যাবলা একটা ফোড়ন কেটে দিলে—তবে, রাত্তিরবেলা হুলোবেড়াল দেখলে কী হবে কিছুই বলা যায় না।

মেসোমশাই আবার ছাত-ফাটানো অট্টহাসি হেসে উঠলেন। টেনিদা গর্জন করে বললে, দ্যাখ ক্যাবলা, বেশি বকবক করবি তো এক ঘুষিতে তোর নাক—

আমি জুড়ে দিলাম : ন্যাসিকে পাঠিয়ে দেব !

—যা বলেছিস ! একখানা কথার মতো কথা !—এই বলে টেনিদা এমনভাবে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে যে, আমি উহু-উহু শব্দে চেঁচিয়ে উঠলাম।

তার পরের খানিকটা ঘটনা সংক্ষেপে বলে যাব। কেমন করে আমরা চার মূর্তি বাড়ি থেকে পারমিশন আদায় করলাম সে-সব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। সে-সব এলাহি কাণ্ড এখন থাক। মোট কথা, এর তিনদিন পরে, কাঁধে চারটে সুটকেশ আর বগলে চারটে সতরঞ্চি জড়ানো বিছানা নিয়ে আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছুলাম।

ট্রেন প্রায় ফাঁকাই ছিল। এই গরমে নেহাত মাথা খারাপ না হলে আর কে রাঁচি যায় ? ফাঁকা একটা ইন্টার ক্লাস দেখে আমরা উঠে পড়লাম, তারপর চারটে বিছানা পেতে নিলাম।

ভাবলাম, বেশ আরামে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি, হঠাৎ টেনিদা ডাকল—এই প্যালা।

—আবার কী হল।

—ভারি খিদে পেয়েছে মাইরি। পেটের ভেতর যেন একপাল ছুঁচো বক্সিং করছে।

বললাম, সে কী এই তো বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে প্রায় তিরিশখানা লুচি আর সের-টাক মাংস সাবাড় করে এলে। গেল কোথায় সেগুলো ?

হাবুল বললে, তোমার প্যাটে ভস্মকীট ঢুইক্যা বসছে।

টেনিদা বললে, যা বলেছিস ! ভস্মকীটই বটে ! যা ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে স্রেফ ভস্ম হয়ে যায় ! বলেই দরাজভাবে হাসল : বামুনের ছেলে, বুঝলি—সাক্ষাৎ অগস্ত্য মুনির বংশধর ! বাতাপি ও ইল্বল-ফিল্বল যা ঢুকবে দেন-অ্যান্ড-দেয়ার হজম হয়ে যাবে। হুঁ-হুঁ !—এরই নাম ব্রহ্মতেজ !

ক্যাবলা বলে বসল : ঘোড়ার ডিমের বামুন তুমি। পৈতে আছে তোমার ?

—পৈতে ? টেনিদা একটা ঢোক গিলল : ইয়ে, ব্যাপারটা কী জানিস ? গরমের সময় পিঠ চুলকোতে গিয়ে কেমন পটাং করে ছিঁড়ে যায়। তা আদত বামুনের আর পৈতের দরকার কী, ব্রহ্মতেজ থাকলেই হল। কিন্তু সত্যি, কী করা যায় বল তো ? পেটের ভেতর ছুঁচোগুলো যে রেগুলার হাডু-ডু খেলছে !

ক্যাবলা বললে, তা আর কী করবে ! তুমি রেফারিগিরি করো।

—কী বললি ক্যাবলা ?

—কী আর বলব—কিছুই বলিনি—বলেই ক্যাবলা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল।

হাবুল সেন এর মধ্যে বলে বসল, প্যাটে কিল মাইরা বইস্যা থাকো।

—কার পেটে কিল মারব ? তোর ?—বলে ঘুষি বাগিয়ে টেনিদা উঠে পড়ে আর কি !

হাবুল চটপট বলে বসল, আমার না—আমার না—প্যালার।

বা-রে, এ তো বেশ মজা দেখছি ! মিছিমিছি আমি কেন পেটে কিল খেতে

যাই ? তড়াক করে একটা বাঙ্কের ওপর উঠে বসে আমি বললাম, আমি কেন কিল খাব ? কী দরকার আমার ?

টেনিদা বললে, খেতেই হবে তোকে ! হয় আমায় যা-হোক কিছু খাওয়া, নইলে শুধু কিল কেন—রাম-কিল আছে তোর বরাতে। ওই তো কত ফিরিওলা যাচ্ছে—ডাক না একটাকে। পুরি-কচৌরি, কমলালেবু চকোলেট—ডালমুট—

—আমি তো দেখছি একটা জুতো-ব্রাশ যাচ্ছে। ওকেই ডাকব ?—আমি নিরীহ গলায় জানতে চাইলাম।

—তবে রে—বলে টেনিদা প্রায় তেড়ে আসছিল আর আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব কি না ভাবছিলুম, এমন সময় ঢনাঢন করে ঘণ্টা বাজল। ইঞ্জিনে ভোঁ করে আওয়াজ হল—আর গাড়ি নড়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে আর-একজন ঢুকে পড়ল কামরায়, তার হাতে এক প্রকাণ্ড সন্দেহজনক চেহারার হাঁড়ি। আর তক্ষুনি পেছন থেকে কে যেন কী-একটা ছুঁড়ে দিলে গাড়ির ভেতর। সেটা পড়বি তো পড়, একেবারে টেনিদার ঘাড়ের ওপর। টেনিদা হাঁই-মাই করে উঠল।

তারপরে চোখ প্যাকিয়ে 'এটা কী হল মশাই'—বলতে গিয়েই স্পিকটি নট ! সঙ্গে সঙ্গে আমরাও।

গাড়িতে যিনি ঢুকেছেন তাঁর চেহারাখানা দেখবার মতো। একটি দশাসই চেহারার সাধু। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দাড়িগোঁফে মুখ একেবারে ছয়লাপ। গলায় অ্যাই মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের তিলক আঁকা, পায়ে শুঁড়-তোলা নাগরা।

হাতের সন্দেহজনক হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে সাধুবাবা বললেন, ঘাবড়ে যেও না বৎস—ওটা আমার বিছানা। তাড়াহুড়োতে আমার শিষ্য জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। তোমার বিশেষ লাগেনি তো ?

—না, তেমন আর কী লেগেছে বাবা ! তবে সাতদিনে ঘাড়ের ব্যথা ছাড়লে হয় !—টেনিদা ঘাড় ডলতে লাগল। আমি কিন্তু ভারি খুশি হয়ে গেলাম সাধুবাবার ওপরে। যেমন আমার পেটে কিল মারতে এসেছিল—বোঝো এবার !

সাধুবাবা হেসে বললেন, একটা বিছানার ঘায়েই কাবু হয়ে পড়লে বৎস, আর আমার কাঁধে একবার একটা আস্ত কাবুলিওয়ালা এক মন হিংয়ের বস্তা নিয়ে বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়েছিল। তবু আমি অক্কা পাইনি—সাতদিন হাসপাতালে থেকেই সামলে নিয়েছিলুম। বুঝেছ বৎস—এরই নাম যোগবল !

—তবে তো আপনি মহাপুরুষ স্যার—দিন দিন পায়ের ধুলো দিন !—বলেই টেনিদা ঝাঁ করে সাধুবাবাকে একটা প্রণাম ঠুকে বসল।

সাধু বললেন, ভারি খুশি হলুম—তোমার সুমতি হোক। তা তোমরা কারা ? এমন দল বেঁধে চলেছই বা কোথায় ?

—প্রভু, আমরা রামগড়ে যাচ্ছি। বেড়াতে। আমার নাম টেনি—থুড়ি, ভজহরি মুখুজ্যে। এ হচ্ছে প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে—খালি জ্বরে ভোগে আর পেটে মস্ত

একটা পিলে আছে। এ হল হাবুল সেন—যদিও ঢাকাই বাঙাল, কিন্তু আমাদের পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবে অনেক টাকা চাঁদা দেয়। আর ও হল ক্যাবলা মিত্তির, ক্লাসে টকাটক ফার্স্ট হয় আর ওদের বাড়িতে আমাদের বিস্তর পোলাও-মাংস খাওয়ায়।

—পোলাও-মাংস! আহা—তা বেশ—দাড়ির ভেতরে সাধুবাবা যেন নোলার জল সামলালেন মনে হল : তা বেশ—তা বেশ!

—বাবা, আপনি কোন্ মহাপুরুষ—হাবুল সেন হাত জোড় করে জানতে চাইল।

—আমার নাম? স্বামী ঘুটঘুটানন্দ।

—ঘুটাঘুটানন্দ! ওরে বাবা!—ক্যাবলার স্বগতোক্তি শোনা গেল।

—এতেই ঘাবড়ালে বৎস ক্যাবল? আমার গুরুর নাম কী ছিল জানো? ডমরু-ঢক্কা-পট্টনানন্দ ; তাঁর গুরুর নাম ছিল উচ্চণ্ড-মার্তণ্ড-কুক্কুটডিম্বভর্জনন্দ ; তাঁর গুরুর নাম ছিল—

—আর বলবেন না প্রভু ঘুটঘুটানন্দ—এতেই দম আটকে আসছে। এরপর হার্টফেল করব।—বাঙ্কের ওপর থেকে এবার কথাটা বলতেই হল আমাকে।

শুনে ঘুটঘুটানন্দ করুণার হাসি হাসলেন : আহা—নাবালক! তা, তোমাদের আর দোষ কী—আমার গুরুদেবের উর্ধ্বতন চতুর্থ গুরুর নাম শুনে আমারই দু'-দিন ধরে সমানে হিক্কা উঠেছিল। সে যাক—তোমরা চারজন আছ দেখছি, যাবেও রামগড়ে। আমি নামব মুরিতে—সেখান থেকে রাঁচি। তা বৎসগণ, আমার যোগনিদ্রা একটু প্রবল—চট করে ভাঙতে চায় না। মুরিতে গাড়ি ভোরবেলায় পৌঁছয়—যদি উঠিয়ে দাও বড় ভাল হয়।

—সেজন্যে ভাববেন না প্রভু, ঘাটশিলাতেই উঠিয়ে দেব আপনাকে।—ক্যাবলা আশ্বাস দিলে।

—না—না বৎস, অত তাড়াতাড়ি জাগাবার দরকার নেই। ঘাটশিলায় মাঝরাত।

—তা হলে টাটানগরে?

—সেটা শেষরাত, বৎস—অত ব্যস্ত হয়ো না। মুরিতে উঠিয়ে দিলেই চলবে।

টেনিদা বললে, আচ্ছা তাই দেব। এবার আপনি যোগনিদ্রায় শুয়ে পড়তে পারেন।

—তা পারি।—ঘুটঘুটানন্দ এবার চারিদিকে তাকালেন : কিন্তু শোব কোথায়? চারজনে তো চারটে নীচের বেঞ্চি দখল করে বসেছ। আমি সন্ন্যাসী মানুষ—বাঙ্কে উঠলে যোগনিদ্রার ব্যাঘাত হবে।

টেনিদা বললে, আপনি উঠবেন কেন প্রভু—প্যালা বাঙ্কে শোবে। ও ব্যাঙ্কে শুতে ভীষণ ভালবাসে।

দ্যাখো তো—কী অন্যায়! বাঙ্কে ওঠা আমি একদম পছন্দ করি না, খালি মনে হয় কখন ছিটকে পড়ে যাব—আর টেনিদা কিনা আমাকেই—

আমি বললাম, কক্ষনো না—বাঙ্কে শুতে আমি মোটেই ভালোবাসি না।

টেনিদা চোখ পাকাল।

—দ্যাখ্ প্যালা—সাধু-সন্নিসি নিয়ে ফাজলামো করিসনি—নরকে যাবি! প্রভু, আপনি প্যালার বিছানা ফেলে দিয়ে ওইখানেই লম্বা হোন—প্যালা যেখানে হোক শোবে।

—আহা, বেঁচে থাকো বৎস—বলে ঘুটঘুটানন্দ আমার বিছানা ওপরে তুলে দিয়ে নিজের বিছানাটা পাতলেন। আমি জুলজুল করে চেয়ে রইলাম।

তারপর শোয়ার আগে সেই সন্দেহজনক হাঁড়িটি নিজের বেঞ্চির তলায় টেনে নিলেন। টেনিদা অনেকক্ষণ লক্ষ করছিল, জিজ্ঞেস করল, হাঁড়িতে কী আছে প্রভু?

শুনেই ঘুটঘুটানন্দ চমকে উঠলেন ; হাঁড়িতে? হাঁড়িতে বড় ভয়ঙ্কর জিনিস আছে বৎস! যোগসর্প!

—যোগসর্প?—হাবুল বললে, সেইটা আবার কী প্রভু?

ঘুটঘুটানন্দ চোখ কপালে তুলে বললেন, সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার! ভীষণ সমস্ত বিষধর সাপ—তপস্যাবলে আমি তাদের বন্দি করে রেখেছি। তারা দুধকলা খায় আর হরিনাম করে।

—সাপে হরিনাম করে!—আমি জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলুম না।

—তপস্যায় সব হয় বৎস! ঘুটঘটানন্দ হাসলেন : তা বলে তোমরা ওর ধারেকাছে যেও না! যোগবল না থাকলে বোঁ করে ছোবল মেরে দেবে! সাবধান!

—আজ্ঞে আমরা খুব সাবধানে থাকব—টেনিদা গোবেচারির মতো বললে।

ঘুটাঘুটানন্দ আর-একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন, হ্যাঁ, খুব সাবধান। ওই হাঁড়ির দিকে ভুলেও তাকিও না।—তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ি?

—পড়ুন।

তারপর পাঁচ মিনিট কাটল না। ঘর্-ঘর্-ঘরাৎ করে ঘুটঘুটানন্দের নাক ডাকতে লাগল।

—বাঙ্কের উপরে দুলুনি খেতে খেতে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নেই। হঠাৎ কার যেন খোঁচা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, টেনিদা, আমার পাঁজরায় সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

—নেমে আয় না গাধাটা! সাধুবাবা জেগে উঠলে তখন লবডঙ্কা পাবি।

চেয়ে দেখি, টেনিদার বিছানার ওপর যোগসর্পের হাঁড়ি। আর তার ঢাকনা খুলে ক্যাবলা আর হাবুল সেন পটাপট রসগোল্লা আর লেডিকেনি সাবড়ে দিচ্ছে।

টেনিদা আবার ফিসফিসিয়ে বললে, হাঁ করে দেখছিস কী? নেমে আয় শিগগির! যোগসর্পের হাঁড়ি শেষ করে আবার তো মুখ বেঁধে রাখতে হবে!

আর বলবার দরকার ছিল না। একলাফে নেমে পড়লুম এবং এক থাবায় দুটো লেডিকেনি তুলে ফেললুম।

টেনিদা এগিয়ে এসে বললে, দাঁড়া দাঁড়া—সবগুলো মেরে দিসনি। দুটো-একটা আমার জন্যেও রাখিস!

ট্রেন টাটানগর ছেড়ে আবার অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। স্বামী ঘুটঘুটানন্দের নাক সমানে ডেকে চলল : ঘরাৎ—ফোঁ—ফব্‌র্‌ ফোঁ—ফুরুৎ—ফুর্‌র্‌—

চারজনে মিলে যেভাবে আমরা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের হাঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, তাতে সেটা চিচিং ফাঁক হতে পাঁচ মিনিট সময় লাগল না। অর্ধেকের ওপর টেনিদা সাবড়ে দিলে—বাকিটা আমি আর হাবুল সেন ম্যানেজ করে নিলুম। বয়েসে ছোট ক্যাবলাই বিশেষ জুত করতে পারল না। গোটা-দুই লেডিকেনি খেয়ে শেষে হাত চাটতে লাগল।

টেনিদা তবু হাঁড়িটাকে ছাড়ে না। শেষকালে মুখের ওপর তুলে চোঁ করে রসটা পর্যন্ত নিকেশ করে দিলে। তারপর নাক-টাক কুঁচকে বললে, দুত্তোর, গোটাকয়েক ডেয়ো পিঁপড়েও খেয়ে ফেললুম রে! জ্যান্তও ছিল দু'-তিনটে। পেটের ভেতরে গিয়ে কামড়াবে না তো?

হাবুল বললে, কামড়াইতেও পারে।

—কামড়াক গে, বয়ে গেল! একবার ভীমরুল-সুদ্ধ একটা জামরুল খেয়ে ফেলেছিলুম, তা সে-ই যখন কিছু করতে পারলে না, তখন ক'টা পিঁপড়েতে আর কী করবে!

—ইচ্ছে করলে গোটাকয়েক বাঘ-সুদ্ধ সুন্দরবন পর্যন্ত তুমি খেয়ে ফেলতে পারো—তোমাকে ঠেকাচ্ছে কে!—হাত চাটা শেষ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ক্যাবলা।

এর মধ্যে স্বামী ঘুটঘটানন্দের নাক সমানেই ডেকে চলছিল। যোগসিদ্ধ নাক কিনা—সে-নাকের ডাকবার কায়দাই আলাদা! ঘর্‌-র্‌-ঘোঁ-ঘুরৎ!

টেনিদা বললে, যতই ঘুরুৎ-ঘুরুৎ করো না কেন—তোমার হাঁড়ি ফুড়ুৎ! চালাকি পেয়েছে! কাঁধের ওপর দেড়মনি বিছানা ফেলে দেওয়া! ঘাড়টা টনটন করছে এখনও! প্রতিশোধ ভালোই নেওয়া হয়েছে—কী বলিস প্যালা?

আমি বললুম, প্রতিশোধ বলে প্রতিশোধ! একেবারে নির্মম প্রতিশোধ।

যোগসর্পের শূন্য হাঁড়িটার মুখ টেনিদা বেশ করে বাঁধল। তারপর বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে বললে, এবার একটু ঘুমোনো যাক। পেটের জ্বলুনিটা এতক্ষণে একটু কমেছে।

আমার আর হাবুলেরও তাতে সন্দেহ ছিল না। কেবল ক্যাবলাই গজগজ করতে লাগল : তোমরাই সব খেয়ে নিলে, আমি কিছু পেলুম না।

টেনিদা বললে, যা যা, মেলা বকিসনি! ছেলেমানুষ, বেশি খেয়ে শেষে কি অসুখে পড়বি? নে, চুপচাপ ঘুমো—

ক্যাবলা ঘুমোলো কি না কে জানে, কিন্তু টেনিদার ঘুমোতে দু'-মিনিটও লাগল না। স্বামীজীর নাক বললে, ঘুরুৎ—টেনিদার নাক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, ফুড়ুৎ।

এই উত্তর-প্রত্যুত্তর কতক্ষণ চলল জানি না—মুখের ওপর থেকে দেওয়ালি পোকা তাড়াতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম।

৩। কলার খোসা

মুরি। মুরি জংশন।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠতেই দেখি, বাইরে আবছা সকাল। ক্যাবলা কখন উঠে বসে এক ভাঁড় চায়ে মন দিয়েছে। হাবুল সেন দুটো হাই তুলে শোয়া অবস্থাতেই স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দিকে জুলজুল করে তাকালে। কিন্তু স্বামীজীর নাক তখন বাজছে—গোঁ-গোঁ—আর টেনিদার নাক জবাব দিচ্ছে—ভোঁ-ভোঁ—অর্থাৎ হাঁড়িতে আর কিছুই নেই।

হঠাৎ ক্যাবলা টেনিদার পাঁজরায় একটা খোঁচা দিলে।

—অ্যাই—অ্যাই! কে সুড়িসুড়ি দিচ্ছে র‍্যা?—বলে টেনিদা উঠে বসল।

ক্যাবলা বললে, গাড়ি যে মুরিতে প্রায় দশ মিনিট থেমে আছে! স্বামীজীকে জাগাবে না?

টেনিদা একবার হাঁড়ি, আর একবার স্বামীজীর দিকে তাকাল। তারপর বললে, গাড়িটা ছাড়তে আর কত দেরি রে?

—এখুনি ছাড়বে মনে হচ্ছে।

—তা ছাড়ুক। গাড়ি নড়লে তারপর স্বামীজীকে নড়াব। বুঝছিস না, এখন ওঠালে হাঁড়ির অবস্থা দেখে কি আর রক্ষা রাখবে? যা ষণ্ডামার্কা চেহারা—রসগোল্লার বদলে আমাদেরই জলযোগ করে ফেলবে! তার চেয়ে—

টেনিদা আরও কী বলতে যাচ্ছিল—ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে বাজখাঁই গলায় বিটকেল হাঁক শোনা গেল : প্রভুজী,—কোন্ গাড়িতে আপনি যোগনিদ্রা দিচ্ছেন দেবতা?

সে তো হাঁক নয়—যেন মেঘনাদ! সারা ইস্টিশন কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী ঘুটঘুটানন্দ তড়াক করে উঠে বসলেন।

—প্রভুজী, জাগুন! গাড়ি যে ছাড়ল—

অ্যাঁ! এ যে আমারই শিষ্য গজেশ্বর!—জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্বামীজী ডাকলেন : গজ—বৎস গজেশ্বর! এই যে আমি এখানে!

গাড়ির দরজা খটাৎ করে খুলে গেল। আর ভেতরে যে ঢুকল, তার চেহারা দেখেই আমি এক লাফে বাঙ্কে চেপে বসলুম। হাবুল আর টেনিদা সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়ল—আর ক্যাবলা কিছু করতে পারল না—তার হাত থেকে চায়ের ভাঁড়টা টপাং করে পড়ে গেল মেঝেতে।

—উঁহু হুঁ গেছি—পা পুড়ে গেল রে—স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠলেন।

উঃ—ছোঁড়াগুলো কী ত্যাঁদোড় ? বলেছিলুম মুরিতে তুলে দিতে—তা দ্যাখো কাণ্ড ? একটু হলেই তো ক্যারেড-ওভার হয়ে যেতুম !

গজেশ্বর একবার আমাদের দিকে তাকাল—সেই চাউনিতেই রক্ত জল হয়ে গেল আমাদের। গজেশ্বরের বিরাট চেহারার কাছে অমন দশাসই স্বামীজীও যেন মূর্তিমান প্যাঁকাটি। গায়ের রঙ যেন হাঁড়ির তলার মতো কালো—হাতির মতোই প্রকাণ্ড শরীর—মাথাটা ন্যাড়া, তার ওপর হাতখানেক একটা টিকি। গজেশ্বর কুতকুতে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, আজকাল ছোঁড়াগুলো এমনি হয়েছে প্রভু—যেন কিষ্কিন্ধ্যা থেকে আমদানি হয়েছে সব। প্রভু যদি অনুমতি করেন, তা হলে এদের কানগুলো একবার পেঁচিয়ে দিই।

গজেশ্বর কান প্যাঁচাতে এলে আর দেখতে হবে না—কান উপড়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা চারজন ভয়ে তখন পান্তুয়া হয়ে আছি। কিন্তু বরাত ভালো—সঙ্গে-সঙ্গে টিন-টিন করে ঘণ্টা বেজে উঠল।

গজেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বললে, নামুন—নামুন প্রভু ! গাড়ি যে ছাড়ল ! এদের কানের ব্যবস্থা এখন মুলতুবি রইল—সময় পেলে পরে দেখা যাবে এখন ! নামুন—আর সময় নেই—

বাক্স-বিছানা, মায় স্বামীজীকে প্রায় ঘাড়ে তুলে গজেশ্বর নেমে গেল গাড়ি থেকে। সেই সঙ্গেই বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করে দিল।

আমরা তখনও ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছি—গজেশ্বরের হাতির শুঁড়ের মতো প্রকাণ্ড হাতটা তখনও আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। মস্ত ফাঁড়া কাটল একটা।

কিন্তু ট্রেন হাতকয়েক এগোতেই স্বামীজী হঠাৎ হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন : হাঁড়ি—আমার রসগোল্লার হাঁড়ি—

সঙ্গে সঙ্গেই টেনিদা হাঁড়িটা তুলে ধরল, বললে, ভুল বলছেন প্রভু, রসগোল্লা নয়, যোগসর্প। এই নিন—

বলেই হাঁড়িটা ছুঁড়ে দিলে প্ল্যাটফর্মের ওপর।

—আহা-আহা—করে দু'-পা ছুটে এসেই স্বামীজী থমকে দাঁড়ালেন। হাঁড়ি ভেঙে চুরমার। কিন্তু আধখানা রসগোল্লাও তাতে নেই—সিকিখানা লেডিকেনি পর্যন্ত না।

—প্রভু, আপনার যোগসর্প সব পালিয়েছে—আমি চিৎকার করে বললুম। এখন আর ভয় কিসের।

কিন্তু এ কী—এ কী ! হাতির মতো পা ফেলে গজেশ্বর যে দৌড়ে আসছে। তার কুতকুতে চোখ দিয়ে যেন আগুন-বৃষ্টি হচ্ছে ! এ যেন ট্রেনের চাইতেও জোরে ছুটছে—কামরাটা প্রায় ধরে ফেললে।

আমি আবার বাঙ্কে উঠতে যাচ্ছি—টেনিদা ছুটেছে বাথরুমের দিকে—সেই মুহূর্তে—ভগবানের দান ! একটা কলার খোসা।

হড়াৎ করে পা পিছলে সোজা প্ল্যাটফর্মে চিত হল গজেশ্বর। সে তো পড়া নয়—মহাপতন যেন ! মনখানেক খোয়া বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে পড়ল আশেপাশে।

—গেল—গেল—চিৎকার উঠল চারপাশে। কিন্তু গজেশ্বর কোথাও গেল না—প্ল্যাটফর্মের ওপর সেকেণ্ড পাঁচেক পড়ে থেকেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়াল—

—খুব বেঁচে গেলি !—দূর থেকে গজেশ্বরের হতাশ হুঙ্কার শোনা গেল।

গাড়ি তখন পুরো দমে ছুটতে শুরু করেছে। টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হরি হে, তুমিই সত্য !

৪। ঝন্টিপাহাড়ির ঝণ্টুরা

পথে আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। গজেশ্বরের সেই আছাড়-খাওয়া নিয়ে খুব হাসাহাসি করলুম আমরা। অত বড় হাতির মতো লোকটা পড়ে গেল একেবারে ঘটোৎকচের মতো ! তবে আমাদের ওপর চেপে পড়লে কী যে হত, সেইটেই ভাববার কথা।

হাবুল বললে, আর একটু হইলেই প্রায় উইঠ্যা পড়ছিল গাড়িতে ! মাইর্যা আমাগো ছাতু কইর্যা দিত !

টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে হাবলাকে ভেংচে বললে, হঃ—হঃ—ছাতু কইর্যা দিত ! বললেই হল আর-কি ! আমিও পটলডাঙার টেনি মুখুজ্যে—অ্যায়স্যা একখানা জুজুৎসু হাঁকড়ে দিতুম যে মুরি তো মুরি—বাছাধন একেবারে মুড়ি হয়ে যেত ! চ্যাপটাও হতে পারত চিঁড়ের মতো !

শুনে ক্যাবলা খিক-খিক করে হাসল।

—অ্যাই ক্যাবলা, হাসছিস যে ? টেনিদার সিংহনাদ শোনা গেল।

ক্যাবলা কী ঘুঘু ! সঙ্গে সঙ্গেই বললে, আমি হাসিনি তো—প্যালা হাসছে !

—প্যালা— !

বা—আমি হাসতে যাব কেন ? যোগসর্পের হাঁড়ির লেডিকেনি খেয়ে সেই তখন থেকে আমার পেট কামড়াচ্ছে। আমার পেটেও গোটাকয়েক ডেয়ো পিঁপড়ে ঢুকেছে কিনা কে জানে ! মুখ ব্যাজার করে বললাম, আমি হাসব কেন—কী দায় পড়েছে আমার হাসতে !

টেনিদা বললে, খবরদার—মনে থাকে যেন ! খামকা যদি হাসবি তাহলে তোর ওই মূলোর মতো দাঁতগুলো পটাপট উপড়ে দেব !—ইস-স্, ব্যাটা গজেশ্বর বড্ড বেঁচে গেল ! একবার ট্রেনে উঠে এলেই বুঝতে পারত পটলডাঙার প্যাঁচ কাকে বলে। আবার যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়—

কিন্তু সত্যিই যে দেখা হবে সে-কথা কে জানত ! আর আমি, পটলডাঙার প্যালারাম, অন্তত সে-দেখা না হলেই খুশি হতুম ।

ট্রেন একটু পরেই রামগড়ে পৌঁছল ।

ক্যাবলার মেসোমশাই বলে দিয়েছিলেন গোরুর গাড়ি চাপতে, কিন্তু কলকাতার ছেলে হয়ে আমরা গোরুর গাড়িতে চাপব ! ছোঃ—ছোঃ !

টেনিদা বললে, ছ'-মাইল তো রাস্তা ! চল—হেঁটেই মেরে দিই—

আমি বললুম, সে তো বটেই—সে তো বটেই । দিব্যি পাখির গান আর বনের ছায়া—

ক্যাবলা বললে, ফুলের গন্ধ আর দক্ষিণের বাতাস—

টেনিদা বললে, আর পথের ধারে পাকা পাকা আম আর কাঁঠাল ঝুলছে—

হাবুল সেন বললে, আর গাছের মালিক ঠ্যাঙা নিয়া তাইড়া আসছে—

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, ইস, দিলে সব মাটি করে ! হচ্ছিল আম-কাঁঠালের কথা, মেজাজটা বেশ জমে এসেছিল—কোত্থেকে আবার ঠ্যাঙা-ফ্যাঙা এসে হাজির করলে ! এইজন্যেই তোদের মতো বেরসিকের সঙ্গে আসতে ইচ্ছে করে না ! নে, এখন পা চালা—

সুটকেস কাঁধে, বিছানা ঘাড়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলুম ।

কিন্তু বিকেলে গড়ের মাঠে বেড়ানো আর সুটকেস বিছানা নিয়ে ছ'-মাইল রাস্তা পাড়ি দেওয়া যে এক কথা নয় সেটা বুঝতে বেশি দেরি হল না । আধ মাইল হাঁটতে না-হাঁটতে আমার পালাজ্বরের পিলে—টন-টন করে উঠল ।

—টেনিদা, একটু জিরিয়ে নিলে হয় না ?

টেনিদা তৎক্ষণাৎ রাজি ।

—তা মন্দ বলিসনি । খিদেটাও বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে । একটু জল-টল খেয়ে নিলে হয়—কী বলিস ক্যাবলা ?—বলে টেনিদা ক্যাবলার সুটকেসের দিকে তাকাল । এর আগেই দেখে নিয়েছে, ক্যাবলার সুটকেসে নতুন বিস্কুটের টিন রয়েছে একটা ।

ক্যাবলা সঙ্গে সঙ্গেই সুটকেসটাকে বগলে চেপে ধরল ।

—জল-টল খাবে মানে ? এক্ষুনি তো রামগড় স্টেশনে গোটা-আষ্টেক সিঙ্গাড়া খেয়ে এলে ।

—তা খেয়েছি তো কী হয়েছে !—একটানে ক্যাবলার বগল থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিয়ে টেনিদা : ওই খেয়েই ছ'-মাইল রাস্তা চলবে নাকি ! আমার বাবা খিদেটা একটু বেশি—সে তোমরা যাই বলো ।

বলেই ধপ করে একটা গাছতলায় বসে পড়ল । আর সঙ্গে সঙ্গেই খুলে ফেলল সুটকেস । চাবি ছিল না—পত্রপাঠ বেরিয়ে এল টিনটা ।

একরাশ খাস্তা ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট । কী করি, আমরাও বসে পড়লুম । টেনিদা একাই প্রায় সব-ক'টা সাবাড় করলে—আমরা ছিটে-ফোঁটার বেশি পেলুম না । শুধু ক্যাবলাই কিছু খেল না, হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে রইল ।

ছ'-মাইল রাস্তা—সোজা কথা নয় । হাবুল সেন দু'খানা পাউরুটি রেখেছিল, এর পরে সেগুলোও গেল । কিন্তু টেনিদার খিদে আর মেটে না । রাস্তায় চিঁড়ে—মুড়ির দোকান দেখলেই বসে পড়ে আর হাঁক ছাড়ে : দু'আনা পয়সা বের কর, প্যালা—খিদেয় পেটটা ঝিম-ঝিম করছে !

মাইল-চারেক পেরুতেই পাহাড়ি পথ আরম্ভ হল । দু'-ধারে শালের জঙ্গল, আর তার ভেতর দিয়ে রাঙামাটির পথ ঘুরপাক খেয়ে চলেছে । খানিকটা হাঁটতেই গা ছম-ছম করতে লাগল ।

ক্যাবলা বলে বসল : টেনিদা—এ-সব জঙ্গলে বাঘ থাকে ।

টেনিদার মুখ শুকিয়ে গেল, বললে, যাঃ—যাঃ—

হাবুল বললে, শুনছি ভালুকও থাকে ।

টেনিদা বললে, হুম্ !

বাঘ ভালুকের পরে আর কী আছে আমার মনে পড়ল না । আমি বললাম, বোধহয় হিপোপোটেমাসও থাকে ।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল : থাম থাম প্যালা, বেশি পাকামো করিসনি ! আমাকে ছাগল পেয়েছিস, না ? হিপোপোটেমাস তো জলহস্তী । জঙ্গলে থাকে কী করে ?

আমি বললুম, আচ্ছা যদি ভূত থাকে ?

টেনিদা রেগে বললে, তুই একটা গো-ভূত ! ভূত এখানে কেন থাকবে শুনি ? মানুষই নেই, চাপবে কার ঘাড়ে ?

ক্যাবলা ফস করে বলে বসল : যদি আমাদের ঘাড়েই চাপতে আসে ? আর তুমি তো আমাদের লিডার—যদি তোমার ঘাড়টাই ভূতের বেশ পছন্দ হয়ে যায় ?

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গেই ধাঁ করে ডান হাতটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিলে ক্যাবলার কান পাকড়ে ধরার জন্যে । তৎক্ষণাৎ পট করে সরে গেল ক্যাবলা, আর টেনিদা খানিকটা গোবরে পা দিয়ে একেবারে গজেশ্বরের মতো—

ধপাস—ধাঁই !

আনন্দে আমার হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ঠিক তৎক্ষণাৎ—

জঙ্গলের মধ্য থেকে হঠাৎ প্রায় ছ'-হাত লম্বা একটা মূর্তি বেরিয়ে এল । প্যাঁকাটির মতো রোগা—মাথায় ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল—কটকটে কালো গায়ের রঙ । বিকট মুখে তার উৎকট হাসি । ভূতের নাম করতে করতেই জঙ্গল থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে ।

—বাবা গো—বলে আমিই প্রথম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগালুম । ক্যাবলা এক লাফে পাশের একটা গাছে উঠে পড়ল, টেনিদা উঠতে গিয়ে আবার গোবরের মধ্যে আছাড় খেল, আর হাবুল সেন দু'-হাতে চোখ চেপে ধরে চ্যাঁচাতে লাগল : ভূত—ভূত—রাম—রাম—

সেই মূর্তিটা বাজখাঁই গলায় হা-হা করে হেসে উঠল ।

—খোঁকাবাবু আপনারা মিছাই ভয় পাচ্ছেন ! হামি হচ্ছি ঝণ্টিপাহাড়ির

ঝণ্টুরাম—বাবুর চিঠি পেয়ে আপনাদের আগ বাড়িয়ে নিতে এলাম। ভয় পাবেন না—ভয় পাবেন না—

আমি তখন আধ মাইল রাস্তা পার হয়ে গেছি—ক্যাবলা গাছের মগডালে। হাবুল সমানে বলে চলেছে : ভূত আমার পুত, শাকচুন্নি আমার ঝি! টেনিদা তখনও গোবরের মধ্যেই ঠায় বসে আছে। ভিরমিই গেছে কি না কে জানে।

মূর্তিটা আবার বললে, কুছ ডর নেই খোঁকাবাবু, কুছ ডর নেই। আমি হচ্ছি ঝণ্টিপাহাড়ির ঝণ্টুরাম—আপনাদের নোকর—

৫। চলমান জুতো

কী যে বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলা! ভূত নয়—তবু কেমন ভূতের ভয় ধরিয়ে দিলে হতচ্ছাড়া ঝণ্টুরাম! আধ ঘণ্টা ধরে বুকের কাঁপুনি আর থামতেই চায় না, গোবর-টোবর মেখে টেনিদা উঠে দাঁড়াল। গোটাকয়েক অ্যায়সা অ্যায়সা কাঠ-পিঁপড়ের কামড় খেয়ে প্রাণপণে পা চুলকোতে চুলকোতে নামল ক্যাবলা। হাবুলের হাঁটু দুটো থেকে-থেকে ধাক্কা খেতে লাগল। আর মাইলখানেক বাঁই-বাঁই করে দৌড়োনোর ফলে আমার পালা-জ্বরের পিলেটা পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল।

টেনিদাই সামলে নিলে সক্কলের আগে।

—ঝণ্টুরাম? দাঁত খিঁচিয়ে টেনিদা বললে, তা অমন ভূতের মতো চেহারা কেন?

—কী করব খোঁকাবাবু, ভগবান বানিয়েছেন।

—ভগবান বানিয়েছেন—ছোঃ!—টেনিদা ভেংচি কাটাল : ভগবানের আর খেয়েদেয়ে কাজ ছিল না! ভগবানের হাতের কাজ এত বাজে নয়—তোকে ভূতে বানিয়েছে, বুঝলি?

—হাঁঃ!—ঝণ্টুরাম আপত্তিও করলে না

এবার ক্যাবলা এগিয়ে এল : তা, এই ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসেছিলি কেন?

ঝণ্টুরাম কতকগুলো এলোমেলো দাঁত বের করে বললে, কী করব দাদাবাবু—ইস্টিশনে তো যাচ্ছিলাম। তা, পথের মধ্যে ভারি নিদ এসে গেল, ভাবলম একটু ঘুমিয়ে নিই। তা ঘুমাচ্ছি তো ঘুমাচ্ছি, শেষে নাকের ভেতরে দু'-তিনটে মচ্ছর (মশা) ঘুসে গেল। উঠে দেখি, আপনারা আসছেন। আমি আপনাদের কাছে এলম তো আপনারা ডর খেয়ে অ্যায়সা কারবার করলেন—

বলেই, খ্যাঁক-খ্যাঁক খিঁক-খিঁক করে লোকটা ভুতুড়ে হাসি হাসতে আরম্ভ করে দিলে।

ক্যাবলা বললে, খুব হয়েছে, আর হাসতে হবে না! দাঁত তো নয়—যেন মুলোর দোকান খুলে বসেছে মুখের ভেতর! চল—চল এখন শিগগির, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল ঝণ্টিপাহাড়িতে—

সত্যি, চমৎকার জায়গা এই ঝণ্টিপাহাড়ি!

নামটা যতই বিচ্ছিরি হোক—এখানে পা দিলেই গা যেন জুড়িয়ে যায়। তিনদিকে পাহাড়ের গায়ে শাল-পলাশের বন—পলাশ ফুল ফুটে তাতে যেন লাল আগুন জ্বলছে। নানারকমের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে—কত যে রঙের বাহার তাদের গায়ে! সামনে একটা ঝিল—তার নীল জল টলমল করছে দুটো-চারটে কলমি-লতা কাঁপছে, তার ওপর আবার থেকে-থেকে কেউটে সাপের ফণার মতো গলা-তোলা পানকৌড়ি টপাটপ করে ডুব দিচ্ছে তার ভেতরে।

ঝিলের কাছেই একটা টিলার ওপর তিনদিকে বনের মাঝখানে মেসেপশায়ের বাংলো। লাল ইটের গাঁথুনি—সবুজ দরজা জানালা—লাল টালির চাল। হঠাৎ মনে হয় এখানেও যেন একরাশ পলাশ ফুল জড়ো হয়ে রয়েছে আর দুটো-চারটে সবুজ পাতা উঁকি দিচ্ছে তাদের ভেতরে।

এমন সুন্দর জায়গা—এমন মিষ্টি হাওয়া—এমন ছবির মতো বাড়ি—এখানে ভূতের ভয়! রাম রাম! হতেই পারে না!

বাংলোর ঘরগুলোও চমৎকার সাজানো। টেবিল, চেয়ার, ডেক-চেয়ার, আয়না, আলনা—কত কী? খাটো মোটা জাজিম। আমরা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ঝণ্টুরাম দু'খানা ঘরের চারখানা খাটে চমৎকার করে বিছানা পেতে দিলে। বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে আমরা আরাম করে বসলুম। ঝণ্টুরাম ডিমের ওমলেট আর চা এনে দিলে। তারপর জানতে চাইল : খোকাবাবুরা কী খাবেন দুপুরে? মাছ, না মুরগি?

—মুরগি—মুরগি!—আমরা কোরাসে চিৎকার করে উঠলুম।

টেনিদা একবার উস্ করে জিভের জল টানল : আর হ্যাঁ—চটপট পাকিয়ে ফেলো—বুঝলে? এখন বেলা বারোটা বাজে—পেটে ব্রহ্মা খাই-খাই করছেন। আর বেশি দেরি হলে চেয়ার-টেবিলই খেতে আরম্ভ করব বলে দিচ্ছি!

—হঃ, তুমি তা পারবা। হাবুল সেন ঠুকে দিলে।

—কী—কী বললি হাবুল?

—না না—আমি কিছু কই নাই।—হাবুল সামলে দিলে, কইতেছিলাম ঝণ্টু খুব তাড়াতাড়ি রাঁধতে পারবে।

ঝণ্টুরাম চলে গেল। টেনিদা বললে, চেহারাটা যাচ্ছেতাই হলে কী হয়—ঝণ্টুরাম লোকটা খুব ভালো—না রে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, যত্ন-আত্তি আছে। রোজ যদি মুরগি-টুরগি খাওয়ায়—সাতদিনে আমরা লাল হয়ে উঠব।

টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, আর লাল হয়ে কাজ নেই তোর। পালা-জ্বরে

ভুগিস, বাসক পাতার রস দিয়ে কবরেজি বড়ি খাস, তোর এ-সব বেশি সইবে না। কাল থেকে তোর জন্যে কাঁচকলা আর গাঁদালের ঝোল বরাদ্দ করে দেব। বিদেশে-বিভুঁয়ে এসে যদি পটাৎ করে পটল তুলিস, তাহলে সে ম্যাও সামলাবে কে—শুনি ?

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না ! গাঁদালের ঝোল খেতে বয়ে গেছে আমার। মরি তো মুরগি খেয়েই মরব !

—আর পরজন্মে মুরগি হয়ে জন্মাবি। ডাকবি, কঁর্—কঁর্—কোঁকোর—কোঁ—ইস্টুপিড ক্যাবলাটা বদ-রসিকতা করলে। আমি বেদম চটে বসে বসে নাক চুলকোতে লাগলাম।

খেতে খেতে দুটো বাজল। আহা, ঝণ্টুর রান্না তো নয়—যেন অমৃত ! পেটে পড়তে পড়তেই যেন ঘুম জড়িয়ে এল চোখে। রাত্রে ট্রেনের ধকলও লেগেছিল কম নয়—নরম বিছানায় এসে গা ঢালতেই আমাদের মাঝ-রাত্তির।

বিকেলের চা নিয়ে এসে ঝণ্টুরাম যখন আমাদের ডেকে তুলল, পাহাড়ের ওপারে তখন সূর্য ডুবে গেছে। শাল-পলাশের বন কালো হয়ে এসেছে, শিসের মতো রঙ ধরেছে ঝিলের জলে। দুপুরবেলা চারিদিকের যে মন-মাতানো রূপ চোখ ভুলিয়েছিল, এখন তা কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে। ঝাঁ-ঝাঁ করে ঝিঁঝির ডাক উঠেছে ঝোপঝাড় আর বাংলোর পেছনের বন থেকে।

প্ল্যান ছিল ঝিলের ধারে বিকেলে মন খুলে বেড়ানো যাবে, কিন্তু এখন যেন কেমন ছম-ছম করে উঠল শরীর। মনে পড়ে গেল, কলকাতার পথে পথে—বাড়িতে বাড়িতে এখন ঝলমলে আলো জ্বলে উঠেছে, ভিড় জমেছে সিনেমার সামনে। আর এখানে জমেছে কালো রাত—ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ঝিঁঝির চিৎকার, একটা চাপা আতঙ্কের মতো কী যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে আশেপাশে।

বারান্দায় বসে আমরা গল্প করার চেষ্টা করতে লাগলুম—কিন্তু ঠিক জমতে চাইল না। ঝণ্টুরাম একটা লণ্ঠন জ্বেলে দিয়ে গেল সামনে, তাইতে চারিদিকের অন্ধকারটা কালো মনে হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত টেনিদা বললে, আয়, আমরা গান গাই।

ক্যাবলা বললে, সেটা মন্দ নয়। এসো—কোরাস ধরি। —বলেই চিৎকার করে আরম্ভ করলে—

আমরা ঘুচাব মা তোর কলিমা,
মানুষ আমরা নহি তো মেষ—

আর বলতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তিনজনে গলা জুড়ে দিলুম। সে কী গান !

আমাদের চারজনের গলাই সমান চাঁছাছোলা—টেনিদার তো কথাই নেই। একবার টেনিদা নাকি অ্যায়সা কীর্তন ধরেছিল যে তার প্রথম কলি শুনেই চাটুজ্যেদের পোষা কোকিলটা হার্টফেল করে। আমরা এমনই গান আরম্ভ করে দিলুম যে ঝণ্টুরাম পর্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে ছুটে এল।

আমরা সবাই বোধ হয় একটা কথাই ভাবছিলুম। ঝন্টিপাহাড়ের বাংলোতে যদি ভূত থাকে, তবুও এ-গান তাকে বেশিক্ষণ সইতে হবে না—আপনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে এখান থেকে।

কিন্তু সেই রাত্রে—

আমি আর ক্যাবলা এক ঘরে শুয়েছি—পাশের ঘরে হাবুল সেন আর টেনিদা। একটা লণ্ঠন আমাদের ঘরে মিটিমিটি করছে ঘরের চেয়ার টেবিল আয়নাগুলো কেমন অদ্ভুত মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। ভয়টা আমার বুকের ভেতরে চেপে বসল। অনেকক্ষণ বিছানায় আমি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলুম—কান পেতে শুনলুম, টেনিদার নাকে—সা রে গা মা-র সাতটা সুর বাজছে। কাচের জানালা দিয়ে দেখলুম বাইরে কালো পাহাড়ের মাথায় একরাশ জ্বলজ্বলে তারা। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে গেছি।

হঠাৎ খুট—খুট—খটাৎ—খটাৎ—

চমকে জেগে উঠলাম। কে যেন হাঁটছে।

কোথায় ?

এই ঘরের মধ্যেই। যেন পায়ে বুট পরে কে চলে বেড়াচ্ছে ঘরের ভেতর।

হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দিলুম। না—ঘরে তো কিছু নেই ! তবু সেই জুতোর আওয়াজ। কেউ হাঁটছে—নির্ঘাত হাঁটছে ! খুট-খুট—খটাত-খটাত—

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : ক্যাবলা !

ক্যাবলা লাফিয়ে উঠল : কী—কী হয়েছে ?

—কে যেন হাঁটছে ঘরের ভেতর ?

কী গোঁয়ার-গোবিন্দ এই পুঁচকে ক্যাবলা। তক্ষুনি তড়াক করে নেমে পড়ল মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ইঁদুর দুড়দুড় করে দরজার চৌকাটের গর্ত দিয়ে বাইরে দৌড়ে পালাল।

ক্যাবলা হেসে উঠল।

—তুই কী ভিতু রে প্যালা ! একটা পুরোনো ছেঁড়া জুতোর মধ্যে ঢুকে ইঁদুরটা নড়ছিল—তাই এই আওয়াজ। এতেই এত ভয় পেলি !

শুনেই আমি বীরদর্পে বললুম—যাঃ—যাঃ—আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি নাকি !—বেশ ডাঁটের মাথায় বললুম, ইঁদুর তো ছার—সাক্ষাৎ ব্রহ্মদত্যি যদি আসে—

কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে গেল আমার। সেই মুহূর্তেই কোথা থেকে জেগে উঠল এক প্রচণ্ড অমানুষিক আর্তনাদ। সে-গলা মানুষের নয়। তারপরেই আর-একটা বিকট অট্টহাসি। সে-হাসির কোনও তুলনা হয় না। মনে হল, পাতালের অন্ধকার থেকে তা উঠে আসছে, আর তার শব্দে ঝণ্টিপাহাড়ির বাংলোটা থর-থর করে কেঁপে উঠছে !

৬। রো মা ঞ্চ ক র রা ত

সে-ভয়ঙ্কর হাসির শব্দটা যখন থামল, তখনও মনে হতে লাগল ঝন্টিপাহাড়ির ডাকবাংলোটা ভয়ে একটানা কেঁপে চলেছে। আমি বিদ্যুৎবেগে আবার চাদরের তলায় ঢুকে পড়েছি, সাহসী ক্যাবলাও এক লাফে উঠে গেছে তার বিছানায়। আমার হাত-পা হিম হয়ে এসেছে—দাঁতে-দাঁতে ঠকঠকানি শুরু হয়েছে। যতদূর বুঝতে পারছি, ক্যাবলার অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়।

প্রায় দশ মিনিট।

তারপর ক্যাবলাই সাহস ফিরে পেল। শুকনো গলায় বললে, ব্যাপার কী রে প্যালা ?

চাদরের তলা থেকেই আমি বললাম, ভূ—ভূ—ভূত।

ক্যাবলা উঠে বসেছে। আমি চাদরের তলা থেকে মিটমিট করে ওকে দেখতে লাগলাম।

ক্যাবলা বললে, কিন্তু কথা হল, ভূত এখানে খামকা হাসতে যাবে কেন ?

ভুতুড়ে বাড়িতে ভূত হাসবে না তো হাসবে কোথায় ? তারও তো হাসবার একটা জায়গা চাই।—আমি বলতে চেষ্টা করলুম।

ক্যাবলা মাথা চুলকে বললে, তাই বলে মাঝরাতে অমন করে হাসতে যাবে কেন ? লোকের ঘুম নষ্ট করে অমন বিটকেল আওয়াজ ঝাড়বার মানে কী ?

আমি বললুম, ভূত তো মাঝরাতেই হাসে। নইলে কি দুপুরবেলা কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বসে হাসবে নাকি ?

ক্যাবলা বললে, তাই তো উচিত। তাহলে অন্তত ভূতের সঙ্গে একটা মোকাবিলা হয়ে যায়। তা নয়, সময় নেই অসময় নেই, যেন 'হাহা' শব্দরূপ আউড়ে গেল—হাহা-হাহৌ-হাহাঃ! আচ্ছা প্যালা, ভূতদের যখন-তখন এ-রকম যাচ্ছেতাই হাসি পায় কেন বল দিকি ?

আমি চটে গিয়ে বললুম, তার আমি কী জানি! তোর ইচ্ছে হয় ভূতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় না।

ক্যাবলা আবার চুপ করে নেমে পড়ল খাট থেকে। বললে, তাই চল না প্যালা—ভূতের চেহারাটা একবার দেখেই আসিগে। সেইসঙ্গে এ-কথাও বলে আসি যে আপাতত এ-বাড়িতে চারটি ভদ্রলোকের ছেলে এসে আস্তানা নিয়েছে। এখন রাত দুপুরে ও-রকম বিটকেল হাসি হেসে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত করা নিতান্ত অন্যায়।

বলে কী ক্যাবলা! আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

—খেপেছিস নাকি তুই ?

—খেপব কেন ? বুকের পাটা আছে বটে ক্যাবলার। একটুখানি হেসে বললে, আমার কী মনে হয় জানিস ? ভূতও মানুষকে ভয় পায়।

—কী বকছিস যা-তা ?

—ভয় পায় না তো কী! নইলে কলকাতায় ভূত আসে না কেন ? দিনের বেলায় তাদের ভুতুড়ে টিকির একটা চুলও দেখা যায় না কেন ? বাইরে বসে বসে হাসে কেন ? ঘরে ঢুকতে ভূতের সাহস নেই কেন ?

আমি আঁতকে উঠে বললুম, রাম—রাম! ও-সব কথা মুখেও আনিসনি ক্যাবলা! হাসির নমুনাটা একবার শুনলি তো ? এখুনি হয়তো দুটো কাটা মুণ্ডু ঘরে ঢুকে নাচতে শুরু করে দেবে।

ক্যাবলাটা কী ডেঞ্জারাস ছেলে। পটাং করে বলে ফেলল—তা নাচুক না। কাটা মুণ্ডুর নাচ আমি কখনও দেখিনি, বেশ মজা লাগবে। আচ্ছা—আমি ওয়ান-টু-থ্রি বলছি। ভূতের যদি সাহস থাকে, তাহলে থ্রি বলবার মধ্যেই এই ঘরে ঢুকে নাচতে আরম্ভ করবে। আই চ্যালেঞ্জ ভূত। ওয়ান—টু—

কী সর্বনাশ ? করছে কী ক্যাবলা। ভূতের সঙ্গে চালাকি। ওরা যে পেটের কথা শুনতে পায়! ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে আমি চাদরের তলায় মুখ লুকোলুম। এবার এল—নির্ঘাত—এল—

ক্যাবলা বললে, থ্রি!

চাদরের তলায় আমি পাথর হয়ে পড়ে আছি। একেবারে নট-নড়ন-চড়ন ঠকাস মার্বেল। এক্ষুনি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে! এল—এল—ওই এসে পড়ল—

কিন্তু কিছুই হল না। ভূতেরা ক্যাবলার মতো নাবালককে গ্রাহ্যই করল না বোধহয়।

ক্যাবলা বললে, দেখলি তো। চ্যালেঞ্জ করলুম—তবু আসতে সাহস পেল না। চল—এক কাজ করি। টেনিদা আর হাবুল সেনও নিশ্চয়ই জেগেছে এতক্ষণে। আমরা চারজনে মিলে ভূতেদের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ভয়ে আমার দম আটকে গেল।

—ক্যাবলা, তুই নির্ঘাত মারা যাবি।

ক্যাবলা কর্ণপাত করল না। সোজা এসে আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারলে।

—ওঠ—

আমি প্রাণপণে চাদর টেনে বিছানা আঁকড়ে রইলুম।

—কী পাগলামি হচ্ছে ক্যাবলা। যা, শুয়ে পড়—

ক্যাবলা নাছোড়বান্দা। ওর ঘাড়ে ভূতই চেপে বসেছে না কি কে জানে! আমাকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে বললে, ওঠ বলছি। ভূতে মাঝরাতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে আর আমরা চুপটি করে সয়ে যাব। সে হতেই পারে না। ওঠ—ওঠ—শিগগির—

এমন করে টানতে লাগল যে চাদর-বিছানাসুদ্ধু আমাকে ধপাস্ করে মেঝেতে

ফেলে দিলে।

—এই ক্যাবলা, কী হচ্ছে ?

ক্যাবলা কোনও কথা শোনবার পাত্রই নয়। টেনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। বললে, চল দেখি. পাশের ঘরে টেনিদা আর হাবুল কী করছে।

বলে লণ্ঠনটা তুলে নিলে।

অগত্যা রাম-রাম দুর্গা-দুর্গা বলে আমি ক্যাবলার সঙ্গেই চললুম। ও যদি লণ্ঠন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—তাহলে এক সেকেন্ডও আর আমি ঘরে থাকতে পারব না ! দাঁতে দাঁতে লেগে যাবে, অজ্ঞান হয়ে যাব—হয়তো মরেও যেতে পারি। এমনিতেও তো আমার পালাজ্বরের পিলেটা থেকে-থেকে কেমন গুরগুরিয়ে উঠছে।

পাশের দরজাটা খোলাই ছিল। ওদের ঘরে ঢুকেই ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল : এ কী, ওরা গেল কোথায় ?

তাই তো—কেউ নেই। দুটো বিছানাই খালি ! না টেনিদা—না হাবুল। অথচ দুটো ঘরের মাঝের দরজা ছাড়া আর সমস্ত জানালা-দরজাই বন্ধ। আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে ছাড়া ওদের তো আর বেরুবার পথ নেই।

ক্যাবলা বললে, গেল কোথায় বল দিকি।

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, নির্ঘাত ভূতে ভ্যানিশ করে দিয়েছে ! এতক্ষণে ঘাড় মটকে রক্ত খেয়ে ফেলেছে ওদের !

এতক্ষণে বোধহয় ক্যাবলার খটকা লেগে গিয়েছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, তাই তো রে, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব। দু'-দুটো জলজ্যান্ত মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি !

আর ঠিক তক্ষুনি—

ক্যাঁক-ক্যাঁক করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ। যেন ঘরের মধ্যে সাপে ব্যাঙ ধরেছে কোথাও। ক্যাবলা চমকে একটা লাফ মারল, একটুর জন্যে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল হাতের লণ্ঠনটা। আর আমিও তিড়িং করে একেবারে টেনিদার বিছানায় চড়ে বসলুম।

আবার সেই ক্যাঁক-ক্যাঁক-কোঁক।

নির্ঘাত ভূতের আওয়াজ ! আমার পালাজ্বরের পিলেতে প্রায় ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। চোখ বুজে ভাবছি এবার একটা যাচ্ছেতাই ভুতুড়ে কাণ্ড হয়ে যাবে, ঠিক সেই সময় হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে ক্যাবলা হা-হা করে হেসে উঠল।

চমকে তাকিয়ে দেখি, লণ্ঠনটা নিয়ে হাবুলের খাটের তলায় ঝুঁকে রয়েছে ক্যাবলা। তেমনি বেয়াড়াভাবে হাসতে হাসতে বললে, দ্যাখ প্যালা অমাদের লিডার টেনিদা আর হাবুলের কাণ্ড ! ভূতের ভয়ে এ-ওকে জাপটে ধরে খাটের তলায় বসে আছে।

বলেই ক্যাবলা দস্তুরমতো অট্টহাসি করতে শুরু করলে।

খাটের তলা থেকে টেনিদা আর হাবুল গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল। দু'জনেরই নাকে-মুখে ধুলো আর মাকড়সার ঝুল। টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে, আর হাবুল সেনের চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে প্রায় আকাশে চড়ে বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, এই বীরত্ব তোমার ! তুমি আমাদের দলপতি—আমাদের পটলডাঙার হিরো—গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ন—

টেনিদা তখন সামলে নিয়েছে। নাক থেকে ঝুল ঝাড়তে-ঝাড়তে বললে, থাম থাম, মেলা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি। আমরা খাটের তলায় ঢুকেছিলুম একটা মতলব নিয়ে।

হাবুলের কাঁধের ওপর একটা আরশোলা হাঁটছিল। হাবুল টোকা মেরে সেটাকে দূরে ছিটকে দিয়ে বলল, হ—হ, আমাগো একটা মতলব আছিল !

ক্যাবলা বললে, শুনি না—কেয়া মতলব সেটা ! বাতলাও।—ক্যাবলা অনেকদিন পশ্চিমে ছিল, কথায় কথায় ওর রাষ্ট্রভাষা বেরিয়ে পড়ে দু'একটা।

টেনিদা তখন সাহস পেয়ে জুত করে বিছানার ওপর উঠে বসেছে। বেশ ডাঁটের মাথায় বললে, বুঝলি না ? আমরা খাটের তলায় বসে ওয়াচ করছিলুম। যদি একটা ভূত-টুত ঘরের মধ্যে ঢোকে—

হাবুল টেনিদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, তখন দুইজনে মিল্যা ভূতের পা ধইর‍্যা একটা হ্যাঁচকা টান মারুম—আর ভূতে—

টেনিদা বললে, একদম ফ্ল্যাট !

ক্যাবলা খিক-খিক করে হাসতে লাগল।

টেনিদা চটে গিয়ে বললে, অমন করে হাসছিস যে ক্যাবলা ? জানিস ওতে আমার ইনসাল্ট হচ্ছে ? টেক কেয়ার ! গুরুজনকে যদি অমন করে তুরুশ্চু করবি, তা হলে চটে গিয়ে এমন একখানা মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেব—

টেনিদা বোধহয় ক্যাবলার নাকে একটা মুগ্ধবোধ বসাবার কথাই ভাবছিল, সেই সময় আবার একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটল।

পাশের জানালাটার কাচে ঝনঝন করে শব্দ হল একটা। কতকগুলো ভাঙা কাচ ছিটকে পড়ল চারিদিকে আর সঙ্গে সঙ্গে মধ্যে শাদা বলের মতো কী একটা ঠিকরে পড়ল এসে—একেবারে ক্যাবলার পায়ের কাছে গড়িয়ে এল।

আর লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট দেখলুম—ওটা আর কিছু নয়, স্রেফ মড়ার মাথার খুলি।

—ওরে দাদা !

আমি মেঝেতে ফ্ল্যাট হলুম সঙ্গে সঙ্গেই। হাবুল আর টেনিদা বিদ্যুৎবেগে আবার খাটের তলায় অদৃশ্য হল। শুধু লণ্ঠন হাতে করে ক্যাবলা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—শুয়ে পড়ল না, বসেও পড়ল না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পৈশাচিক অট্টহাসি উঠল। সেই হাসির সঙ্গে থরথর করে কাঁপতে লাগল ঝন্টিপাহাড়ির ডাক-বাংলো।

৭। কে তুমি হাস্যময়?

বাকি রাতটা যে আমাদের কী ভাবে কাটল, সে আর খুলে না বললেও চলে।

টেনিদা আর হাবুল সেনের কী হল জানি না—আমি তো প্রায় অজ্ঞান। তার মধ্যেই মনে হচ্ছিল, দুটো তালগাছের মতো পেল্লায় ভূত আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। একজন যেন বলছে: এটাকে কালিয়া রান্না করে খাব, আর-একজন বলছে: দূর—দূর! এটা একেবারে শুঁটকো চামচিকের মতো—গায়ে একরত্তি মাংস নেই। বরং এটাকে তেজপাতার মতো ডাল সম্বরা দেওয়া যেতে পারে।

আমি বোধহয় ভেউ-ভেউ করে কাঁদছিলুম, হঠাৎ তিড়িক করে লাফিয়ে উঠতে হল। মুখের ওপর কে যেন আঁজলা-আঁজলা করে জল দিচ্ছে। আর, কী ঠাণ্ডা সে জল! বাঘের নাকে সে জল ছিটিয়ে দিলে বাঘ-সুদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়বে।

বাঘ অজ্ঞান হোক—কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরে এল, মানে, আসতেই হল তাকে।

আর কে? ক্যাবলা। করেছে কী—বাগানে জল দেবার একটা ঝাঁঝরি নিয়ে এসেছে, তাই দিয়ে আমাকে স্রেফ চান করিয়ে দিচ্ছে।

—ওরে থাম থাম—

ক্যাবলা কি থামে! আমার মুখের ওপর আবার একরাশ জল ছিটিয়ে দিয়ে বললে, কী রে, মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তো?

—ঠাণ্ডা মানে? সারা গা ঠাণ্ডা হবার জো হল—আমি তড়াক করে ঝাঁঝরির আক্রমণ থেকে পাশ কাটালুম।

কাচের জানালা দিয়ে বাইরের ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। ঝন্টিপাহাড়ির ডাক-বাংলোয় একটা দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়ে গেছে। সামনে লেকের নীল জলটার ওপর ভোরের লালচে রং। পাখির মিষ্টি ডাক শুরু হয়েছে চারদিকে—শিশিরে ভেজা শাল-পলাশের বন যেন ছবির মতো দেখাচ্ছে।

কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছতে মুছতে আমার মনে হল, এমন সুন্দর জায়গায় এমন বিচ্ছিরি ভূতের ব্যাপার না থাকলে দুনিয়ায় কার কী ক্ষতি হত।

আমি তো এ-সব ভাবছি, ওদিকে ক্যাবলার ঝাঁঝরি সমানে কাজ করে চলেছে। খানিক পরে হাঁই-মাঁই কাঁই-কাঁই আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি, ঝাঁঝরির আক্রমণে জর্জরিত হয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে টেনিদা আর হাবুল।

ক্যাবলা হেসে বললে, তোমাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে কেমন দাওয়াইটি বের করেছি! দেখলে তো!

টেনিদা গাঁক-গাঁক করে বললে, থাক, বকিসনি! আমরা অজ্ঞান হয়েছিলাম কে বললে তোকে? দু'জনে চুপি-চুপি প্ল্যান আঁটছিলুম, আর তুই রাস্কেল ঠাণ্ডা জল দিয়ে—

বলেই টেনিদা ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেললে। বললে, ইঃ গেছি—গেছি! এই শীতের সকালে যেভাবে নাইয়ে দিয়েছিস, তাতে এখন ডবল-নিউমোনিয়া না হলে

বাঁচি!

ঝন্টুরামকে জিজ্ঞেস করে কোনও হদিশ পাওয়া গেল না।

সে ডাক-বাংলোয় থাকে না। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে তার বাড়ি। আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। সকালবেলায় এসেছে।

টেনিদা বললে, ওটা কোনও কম্মের নয়—একেবারে গাড়ল! হাবুল সেন মাথা চুলকে বললে, ও নিজেই ভূত কি না সেই কথাটাই বা কেডা কইব? চেহারাখানা দেখতে আছ না? য্যান তালগাছের থন নাইম্যা আসছে।

আমি আঁতকে উঠলাম: সত্যিই কি ভূত নাকি?

টেনিদা বললে, তোরা দুটোই হচ্ছিস্ গোভূত! জানিস্‌নে, ভূত আগুন দেখলেই পালায়? ও ব্যাটা নিজে উনুন ধরিয়ে চা করে দিলে, রাত্তিরে ওর রান্না মুরগির ঝোল আর ভাত দু'-হাতে সাঁটলি, সে-কথা মনে নেই বুঝি?

আমরা আর সাঁটতে পেরেছি কই—মুরগির দু-এক টুকরো হাড় কেবল চুষতে পেরেছি, বাকি সবটাই টেনিদার পেটে গেছে। কিন্তু এখন আর সে-কথা বলে কী হবে!

আমি বললুম, ঝন্টুরাম ভূত হোক আর না-ই হোক, তাতে কিছু আসে যায় না। সোজা কথা হচ্ছে, পটল যদি তুলতেই হয়, তাহলে পটলডাঙাতে গিয়েই তুলব। এখানে ভূতের হাতে মরতে আমি রাজি নই। আমি আজকেই কলকাতায় ফিরে যাব।

হাবুল উৎসাহিত হয়ে বললে, হ—হ, আমিও সেই কথাই কইতে আছিলাম।

টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটা চুলকোতে লাগল।

আমি বললুম, তোমাদের ইচ্ছে হয় থাক। ভূতেরা ধরে ধরে তোমাদের হাঁড়ি-কাবাব করে খাক—কাটলেট বানাক, রোস্ট করে ফেলুক—আমার কিছুই আপত্তি নেই।

আজই আমি পালাব।

টেনিদা বললে, তাই তো! কিন্তু জায়গাটা খাসা—বেশ প্রেমসে খাওয়া-দাওয়াও করা যাচ্ছিল, কিন্তু ভূতগুলোই সব মাটি করে দিলে!

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ, সইত্য কথা। এখানে জঙ্গলের মধ্যে থাইক্যা ভূতগুলানে কী যে সুখ হয়—তাও তো বুঝি না। আমাগো কইলকাতায় গিয়া বাসা করত, থাকতও ভালো, আমরাও ছুটি পাইতাম। আর যদি বাইছ্যা বাইছ্যা হেড পণ্ডিতের ঘাড়ে উইঠ্যা বসত, তাহলে আমাগো আর শব্দরূপ মুখস্থ করতে হইত না!

—সে তো বেশ ভালো কথা, কিন্তু ভূতগুলোকে সে-কথা বোঝায় কে।

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: যেতে চাস তো চল্। কিন্তু সত্যি, ভারি মায়া লাগছে রে। এমন আরাম, এমন খাওয়া-দাওয়া, ঝণ্টেটা আবার রুটির সঙ্গে কতটা করে মাখন দিয়েছিল—দেখেছিস তো? এখানে দিনকয়েক থাকলে আমরা লাল হয়ে যেতুম।

আমি বললাম, তার আগে ভূতেরাই লাল হয়ে যাবে।

টেনিদা সামনে থেকে একটা প্লেট তুলে নিয়ে তার তলায় লেগে-থাকা একটুখানি মাখন চট করে চেটে নিলে। তারপরের আর একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—তাহলে আজই ?

আমি আর হাবুল সমস্বরে বললাম, হ্যাঁ—হ্যাঁ, আজই।

ক্যাবলার কথা এতক্ষণ আমাদের মনেই ছিল না। সেই যে ভোরবেলা ঝাঁঝরি-দাওয়াই দিয়ে আমাদের জ্ঞান ফিরিয়েছে, তারপর আর তার পাত্তা নেই। কোথায় গেল ক্যাবলা ?

আমি বললাম, ক্যাবলা গেল কোথায় ?

টেনিদা চমকে বললে, তাই তো। সকাল থেকে তো ক্যাবলাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না !

হাবুল সেন জানতে চাইল ; ভূতের সঙ্গে মস্করা করতে আছিল, ভূতে তারে লইয়া যায় নাই তো ?

টেনিদা মুখ-টুক কুঁচকে বললে, বয়ে গেছে ভূতের ! ওটা যা অখাদ্যি—ওকে ভূতেও হজম করতে পারবে না। কিন্তু গেল কোথায় ? আমাদের ফেলেই চম্পট দিলে না তো ?

ঠিক এই সময় হঠাৎ বাজখাঁই গলায় গান উঠল :

ছপ্পর পর কৌয়া নাচে, নাচে বগুলা—
আরে রামা হো—হো রামা—

গানটা এমন বেখাপ্পা যে আমি চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়তে পড়তে সামলে গেলুম। এ আবার কী রে বাবা ! দিন-দুপুরে এসে হানা দিলে নাকি। কিন্তু ভূতে রাম নাম করতে যাবে কোন্ দুঃখে ?

ভূত নয়—ক্যাবলা। কোত্থেকে একগাল হাসি নিয়ে বারান্দায় উঠে পড়ল।

—গিয়েছিলি কোথায় ? অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিসই বা কেন ?—টেনিদা জানতে চাইলে।

—বলছি—ক্যাবলা করুণ চোখে সামনের পেয়ালা-পিরিচগুলোর দিকে তাকাল : এর মধ্যেই ব্রেকফাস্ট শেষ ? আমার জন্যেই কিছু নেই বুঝি ?

—সে আমরা জানিনে, ঝন্টুরাম বলতে পারে।—টেনিদা বললে, ব্রেকফাস্ট পরে করবি, কোথায় গিয়েছিলি তাই বল।

ক্যাবলা মিটমিট করে হেসে বলল, ভূতের খোঁজে গিয়েছিলুম। ভূত পাওয়া গেল না—পাওয়া গেল একঠোঙা চীনেবাদাম।

—চীনেবাদাম।

ক্যাবলা বললে, তাতে অর্ধেক খোসা, অর্ধেক বাদাম। মানে অর্ধেকটা খাওয়ার পরে আর সময় পায়নি।

—কে সময় পায়নি ? —আমি বেকুবের মতো জিজ্ঞেস করলুম।

—জানালার ও ধারে ঝোপের ভেতরে বসে যারা মড়ার মাথা ছুঁড়েছিল, তারাই। যদি ভূতও হয়—তাহলে কিন্তু বেশ মডার্ন ভূত, টেনিদা ! মানে—বাদাম খায়, মুড়ি খায়, তেলেভাজাও খায়। তেলেভাজার শালপাতা আর মুড়িও পাওয়া গেল কিনা !

টেনিদা বললে, তার মানে—

ক্যাবলা বললে, তার মানে হল, এ সব কোনও বদমাস আদমি কা কারসাজি ! তারাই রাত্তিরে অমনি করে যাচ্ছেতাই রকম হেসেছে, ঘরের ভেতরে মড়ার মাথা ফেলেছে—অর্থাৎ আমাদের তাড়ানোর মতলব। তুমি পটলডাঙার টেনিদা—গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ন—তুমি এ-সব বদমায়েসদের ভয়ে পালাবে এখান থেকে !

—ঠিক জানিস ? ভূত নয় ?

—ঠিক জানি।—ক্যাবলা বললে, ভূতে তেলেভাজা আর চীনেবাদাম খায়, এ-কথা কে কবে শুনেছে ? তার ওপর তারা বিড়িও খেয়েছে। দু'-চারটে পোড়া বিড়ির টুকরোও ছিল।

—তাহলে বদমাস লোক !—পটলডাঙার টেনিদা হঠাৎ বুক ঠুকে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল ; মানুষ যদি হয়, তবে বাবাজীদের এবার ঘুঘু আর ফাঁদ দুই-ই দেখিয়ে ছাড়ব ! চলে আয় সব—কুইক মার্চ—

বলে এমনিভাবে আমাকে একটা হ্যাঁচকা টান মারল যে আমি ছিটকে সামনের মেঝেয় গিয়ে পড়লুম।

হাবুল সেন প্যাঁচার মতো ব্যাজার মুখে বললে, কোথায় যেতে হবে ?

—লোকগুলোর সঙ্গে একবার মোলাকাত করতে। আমরা কলকাতার ছেলে—আমাদের বক দেখিয়ে কেটে পড়বে—ইয়ার্কি নাকি ! চল-চল, ভালো করে একবার চারদিকটা ঘুরে দেখি !

ক্যাবলা বললে, কিন্তু আমার ব্রেকফাস্ট—

—সেটা একেবারে লাঞ্চের সময়েই হবে। নে—চল—

হাবুল আর ক্যাবলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল স্পষ্ট দিনের আলোয়—সেই বেলা আটটার সময়—ঠিক আমাদের মাথার ওপর কে যেন কর্কশ গলায় বলে উঠল : বাঃ—বেশ, বেশ !

তারপরেই হা-হা করে ঠাট্টার অট্টহাসি।

কে বললে, কে হাসল ? কেউ না। মাথার ওপরে টালির চাল আর লাল ইটের ফাঁকা দেওয়া—জন-মানুষের চিহ্নও নেই কোথাও। যেন হাওয়ার মধ্যে থেকে ভেসে এসেছে আশ্চর্য শব্দগুলো।

৮। "ছপ্পর পর কৌয়া নাচে"

রাত নয়—অন্ধকার নয়—একেবারে ফুটফুটে দিনের আলো। দেওয়ালের ওপরে টালির চাল—একটা চড়ুই পাখি পর্যন্ত বসে নেই সেখানে। অথচ ঠিক মনে হল ওই টালির চাল ফুঁড়েই হাসির আওয়াজটা বেরিয়ে এল।

কী করে হয় ? কী করে এমন সম্ভব ?

আমরা কি পাগল হয়ে গেছি ? না কি ঝণ্টুরাম চায়ের সঙ্গে সিদ্ধি-ফিদ্ধি কিছু খাইয়ে দিলে ? তাই বা হবে কেমন করে ? ক্যাবলা তো চা খায়নি আমাদের সঙ্গে ! তবু সেও ওই অশরীরী হাসির আওয়াজটা ঠিক শুনতে পেয়েছে।

প্রায় চার মিনিট ধরে আমরা চারমূর্তি চারটে লাট্টুর মতো বসে রইলুম। আমরা অবশ্য লাট্টুর মতো ঘুরছিলুম না—কিন্তু মগজের সব ঘিলুগুলো ঝনর-ঝনর করে পাক খাচ্ছিল। খাসা ছিলুম পটলডাঙায়, পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেয়ে দিব্যি দিন কাটছিল। কিন্তু টেনিদার প্যাঁচে পড়ে এই ঝন্টিপাহাড়ে এসে দেখছি ভূতের কিল খেয়েই প্রাণটা যাবে !

আরও তিন মিনিট পরে যখন আমার পিলের কাঁপুনি খানিক বন্ধ হল, আমি ক্যাবলাকে বললুম, এবার ?

হাবুল সেন গোঁড়ালেবুর মতো চোখ দুটোকে একবার চালের দিকে বুলিয়ে এনে বললে, হ, অখন কও।

টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকটা টিয়ার ঠোঁটের মতো সামনের দিকে ঝুলে পড়েছিল। জিভ দিয়ে একবার মুখ-টুক চেটে টেনিদা বললে, মানে—ইয়ে হল, মানুষটানুষ সামনে পেলে চাঁটির চোটে তার নাক-টাক উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু ইয়ে—মানে, ভূতের সঙ্গে তো ঠিক পারা যাবে না—

আমি বললুম, তা ছাড়া ভূতেরা ঠিক বক্সিংয়ের নিয়ম-টিয়মও মানে না—

টেনিদা ধমক দিয়ে বললে, তুই থাম না পুঁটিমাছ !

পুঁটিমাছ বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। যদি ভূতের ভয় আমাকে বেজায় কাবু করে না ফেলত আর পালাজ্বরের পিলেটা টনটনিয়ে না উঠত, আমি ঠিক টেনিদাকে পোনামাছ নাম দিয়ে দিতুম।

ক্যাবলা কিন্তু ভাঙে তবু মচকায় না।

চট করে সে একেবারে সামনের লনে গিয়ে নামল। তারপর মাথা উঁচু করে সে দেখতে লাগল। তারও পরে বেজায় খুশি হয়ে বললে, ঠিক ধরেছি। ওই যে বলছিলুম না ?

'ছপ্পর পর কৌয়া নাচে
নাচে বগুলা—'

টেনিদা বলল—মানে ?

ক্যাবলা বললে, মানে ? মানে হল, চালের ওপর কাক নাচে—আর নাচে বক।

—রাখ তোর বক নিয়ে বকবকানি। কী হয়েছে বল দিকি ?

—হবে আর কী। একেবারে ওয়াটারের মতো—মানে পানিকা মাফিক সোজা ব্যাপার। ওই চালের ওপরে লোক বসেছিল কেউ। সে-ই ওরকম বিটকেল হাসি হেসে আমাদের ভয় দেখিয়েছে।

—সে-লোক গেল কোথায় ?

—আঃ, নেমে এসো না—দেখাচ্ছি সব। আরে ভয় কী—না হয় রাম-রাম জপ করতে করতেই চলে এসো এখানে।

—ভয় ! ভয় আবার কে পেয়েছে ? —টেনিদা শুকনো মুখে বললে, পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরেছে কিনা—

ক্যাবলা খিক-খিক করে হাসতে লাগল।

—ভূতের ভয়ে বহুত আদমির অমন করে ঝিঁ-ঝিঁ ধরে। ও আমি অনেক দেখেছি।

এর পরে বসে থাকলে আর দলপতির মান থাকে না। টেনিদা ডিম-ভাজার মতো মুখ করে আস্তে-আস্তে লনে নেমে গেল। অগত্যা আমি আর হাবুলও গুটি-গুটি গেলাম টেনিদার পেছনে পেছনে।

ক্যাবলা বললে, পেছনে ওই ঝাঁকড়া পিপুল গাছটা দেখছ ? আর দেখছ—ওর একটা মোটা ডাল কেমনভাবে বাংলোর চালের ওপর নেমে এসেছে ? ওই ডাল ধরে একটা লোক চালের ওপর নেমে এসেছিল। টালিতে কান পেতে আমাদের কথাগুলো শুনেছে, আর হা-হা করে হেসে ভয় দেখিয়ে ডাল বেয়ে সটকে পড়েছে।

হাবুল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল ; হ, এইটা নেহাত মন্দ কথা কয় নাই। দ্যাখতে আছ না, চালের উপর কতকগুলি কাঁচা পাতা পইড়্যা রইছে ? কেউ ওই ডাল বাইয়া আসছিল ঠিকোই।

—আসছিল তো ঠিকোই—হাবুলের গলা নকল করে টেনিদা বললে, কিন্তু এর মধ্যেই সে গেল কোথায় ?

ক্যাবলা বললে, কোথাও কাছাকাছি ওদের একটা আড্ডা আছে নিশ্চয়। মুড়ি আর চীনেবাদাম দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। সেই আড্ডাটাই খুঁজে বের করতে হবে। রাজি আছ ?

টেনিদা নাক চুলকে বললে, মানে কথা হল—

ক্যাবলা আবার খিক-খিক করে হেসে উঠল : মানে কথা হল, তোমার সাহস নেই—এই তো ? বেশ, তোমরা না যাও আমি একাই যাচ্ছি।

দলপতির মান রাখতে প্রায় প্রাণ নিয়ে টান পড়বার জো ! টেনিদা শুকনো হাসি হেসে বললে, যাঃ—যাঃ—বাজে ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি ! মানে, সঙ্গে দু'-একটা বন্দুক-পিস্তল যদি থাকত—

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, বন্দুক-পিস্তল থাকলেই বা কী হত। কখনও ছুঁড়েছি নাকি ওসব ! আর টেনিদার হাতে বন্দুক থাকা মানেই আমরা স্রেফ খরচের

খাতায়। ভূত-টুত মারবার আগে টেনিদা আমাদেরই শিকার করে বসত।

ক্যাবলা বলল, বন্দুক দিয়ে কী হবে? তুমি তো এক-এক চড়ে গড়ের মাঠের এক-একটা গোরাকে শুইয়ে দিয়েছে শুনতে পাই। বন্দুক তোমার মতো বীরপুরুষের কী দরকার?

অন্য সময় হলে টেনিদা খুশি হত, কিন্তু এখন ওর ডিম-ভাজার মতো মুখটা প্রায় আলু-কাবলির মতো হয়ে গেল। টেনিদা হতাশ হয়ে বললে, আচ্ছা—চল দেখি একবার।

ক্যাবলা ভরসা দিয়ে বললে, তুমি কিছু ভেবো না টেনিদা। এ সব নিশ্চয় দুষ্টু লোকের কারসাজি। আমরা পটলডাঙার ছেলে হয়ে এত ঘেবড়ে যাব? ওদের জারি-জুরি ভেঙে দিয়ে তবে কলকাতায় ফিরব, এই বলে দিলাম।

হাবুল ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : হ। কার জারিজুরি যে কেডা ভাঙব, সেইটাই ভালো বোঝা যাইতে আছে না।

কিন্তু ক্যাবলা এর মধ্যেই বীরদর্পে পা বাড়িয়েছে। টেনিদা মানের দায়ে চলেছে পেছনে পেছনে। হাবুলও শেষ পর্যন্ত এগোল সুড়সুড় করে। আমি পালাজ্বরের রুগী প্যালারাম, আমার ওসব ধাষ্টামোর মধ্যে এগোনোর মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তবু একা-একা এই বাংলোয় বসে থাকব—ওরেঃ বাবা। আবার যদি সেই ঘর-ফাটানো হাসি শুনতে পাই—তাহলে আমাকে আর দেখতে হবে না। বাংলোতে হতভাগা ঝন্টুরামটা থাকলেও কথা ছিল, কিন্তু আমাদের খাওয়ার বহর দেখে চা খাইয়ে সামনের গাঁয়ে মুরগি কিনতে ছুটেছে। একা-একা এখানে ভূতের খপ্পরে বসে থাকব, এমন বান্দাই আমি নই।

কোথায় আর খুঁজব—কীই বা পাওয়া যাবে।

তবু চারজনে চলেছি। বাংলোর পেছনেই একটা জঙ্গল অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। জঙ্গলটা যে খুব উঁচু তা নয়—কোথাও মাথা-সমান, কোথাও আর একটু বেশি। বেঁটে বেঁটে শাল-পলাশের গাছ—কখনও কখনও ঘেঁটু আর আকন্দের ঝোপ। মাঝখান দিয়ে বেশ একটা পায়ে-চলা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। এ-পথ দিয়ে কারা যে হাঁটে কে জানে। তাদের পায়ের পাতা সামনে না পেছন দিকে, তাই বা কে বলবে।

প্রথম-প্রথম বুক দুর-দুর করছিল। খালি মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি ঝোপের ভেতর থেকে হয় একটা স্কন্ধকাটা, নইলে শাঁকচুন্নি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুই হল না। দুটো-চারটে বুনো ফল—পাখির ডাক আর সূর্যের মিষ্টি নরম আলোয় খানিক পরেই ভয়-ভয় ভাবটা মন থেকে কোথায় মুছে গেল।

গোড়ার দিকে বেশ হুঁশিয়ার হয়েই হাঁটছিলুম—যাচ্ছিলুম ক্যাবলার পাশাপাশি। তারপর দেখি একটা বৈঁচি গাছ—ইয়া-ইয়া বৈঁচি পেকে কালো হয়ে রয়েছে। একটা ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দেখি—অমৃত! তারপরে আরও একটা—তারপরে আরও একটা—

গোটা-পঞ্চাশের খেয়ে খেয়াল হল, ওরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি

ওদের সঙ্গ ধরতে হবে—হঠাৎ দেখি আমার পাশেই ঝোপের মধ্যে—

লম্বা শাদা মতো কী ওটা? নির্ঘাত ল্যাজ! কাঠবেড়ালির ল্যাজ!

কাঠবেড়ালি বড় ভালো জিনিস। ভন্টার মামা কোত্থেকে একবার একটা এনেছিল, সেটা তার কাঁধের ওপর চড়ে বেড়াত, জামার পকেটে শুয়ে থাকত। ভারি পোষ মানে। সেই থেকে আমারও কাঠবেড়ালি ধরবার বড় শখ। ধরি না খপ করে ওর ল্যাজটা চেপে!

যেন ওদিকে তাকাচ্ছিই না—এমনিভাবে গুটি-গুটি এগিয়ে টক করে কাঠবেড়ালির ল্যাজটা আমি ধরে ফেললুম। তারপরেই হেঁইয়ো টান!

কিন্তু কোথায় কাঠবেড়ালি! যেই টান দিয়েছি, অমনি হাঁই-মাই করে একটা বিকট দানবীয় চিৎকার। সে চিৎকারে আমার কানে তালা গেলে গেল। তারপরেই কোথা থেকে আমার গালে এক বিরাশি সিক্কার চড়। ভৌতিক চড়।

সেই চড় খেয়ে আমি শুধু সর্ষের ফুলই দেখলুম না। সর্ষে, কলাই, মটর, মুগ, পাট, আম, কাঁঠাল—সব-কিছুর ফুলই এক সঙ্গে দেখতে পেলুম। তারপরই—

সেই ঝোপের ভেতরে সোজা চিত। একেবারে পতন ও মূর্ছা। মরেই গেলুম কি না কে জানে!

৯। 'কাঠবেড়ালির ল্যাজ নয় রে ওটা কাহার দাড়ি!'

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি, আমি ডাক-বাংলোর খাটে লম্বা হয়ে আছি। ঝন্টু মাথার সামনে দাঁড়িয়ে আমায় হাওয়া করছে, ক্যাবলা পায়ের কাছে বসে মিটমিটে চোখে তাকিয়ে আছে আর পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে টেনিদা ঘুঘুর মতো বসে রয়েছে।

ঝন্টুর হাতের পাখাটা খটাস করে আমার নাকে এসে লাগতেই আমি বললুম, উফ্!

চেয়ার ছেড়ে টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : যাক, তা হলে এখনও তুই মারা যাসনি!

ক্যাবলা বললে, মারা যাবে কেন? থোড়াসে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। আমি তো বলেইছিলুম টেনিদা, ওর নাকে একটুখানি লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া দাও—এক্ষুনি চাঙা হয়ে উঠবে।

টেনিদা বললে, আর লঙ্কা-পোড়া! যেমনভাবে দাঁত ছরকুটে পড়েছিল, দেখে তো মনে হচ্ছিল, পটলডাঙা থেকে এখানে এসেই বুঝি শেষ পর্যন্ত পটল তুলল।

মাঝখান থেকে ঝন্টু বিচ্ছিরি রকমের আওয়াজ করে হেসে বললে, দাদাবাবু ডর

খিয়েছিলেন !

ক্যাবলা বললে, যাঃ-যাঃ, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না । এখন শিগগির এক পেয়ালা গরম দুধ নিয়ে আয় দেখি !

ঝাঁটু পাখা রেখে বেরিয়ে গেল ।

আমি তখনও চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখছি । ডান চোয়ালে অসম্ভব ব্যথা । এমন চড় হাঁকড়েছে যে, গোটাদুয়েক দাঁত বোধহয় নড়িয়েই দিয়েছে একেবারে । চড়ের মতো চড় একখানা ! অঙ্কের মাস্টারের বিরাশি সিক্কার চাঁটি পর্যন্ত এর কাছে একেবারে সুগন্ধি তিন-নং পরিমল নস্যি । আমি পটলডাঙার রোগা ডিগডিগে প্যালারাম, পালাজ্বরে ভুগি, আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই, এমন একখানা ভৌতিক চপেটাঘাতের পরেও আমার আত্মারাম কেন যে খাঁচাছাড়া হয়নি, সেইটেই আমি বুঝতে পারছিলুম না ।

টেনিদা বললে, আচ্ছা পুঁটিমাছ, তুই হঠাৎ ডাক ছেড়ে অমন করে অজ্ঞান হয়ে গেলি কেন ?

এ অবস্থাতেও পুঁটিমাছ শুনে আমার ভয়ানক রাগ হল, চোয়ালের ব্যথা-ট্যথা সব ভুলে গেলুম । ব্যাজার হয়ে বললুম, আমি পুঁটিমাছ আছি বেশ আছি, কিন্তু ও-রকম একখানা বোম্বাই চড় খেলে তুমি ভেটকিমাছ হয়ে যেতে ! কিংবা ট্যাপামাছ !

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, চাঁটি আবার তোকে কে মারলে ?

—ভূত !

টেনিদা বললে, ভূত ! ভূতের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই । খামকা তোকে চাঁটি মারতে গেল ? তাও সকালবেলায় ? পাগল না পেট-খারাপ ?

ক্যাবলা বললে, পেট-খারাপ । এদিকে ওই তো রোগা ডিগডিগে চেহারা, ওদিকে পৌঁছে অবধি সমানে মুরগি আর আণ্ডা চালাচ্ছে । অত সইবে কেন ? পেট-গরম হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে । ভূত-টুত সব বোগাস ।

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলে, ঠিক । আমিও ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম ।

ডান চোয়ালটা চেপে ধরে আমি এবার বিছানার ওপরে উঠে বসলুম ।

—তোমরা বিশ্বাস করছ না ?

টেনিদা বললে, একদম না । ভূতে আর চাঁটি মারবার লোক পেলে না !

ক্যাবলা মাথা নাড়ল ; বটেই তো । আমাদের লিডার টেনিদার অ্যায়সা একখানা জুতসই গাল থাকতে তোর গালেই কিনা চাঁটি হাঁকড়াবে ? ওতে লিডারের অপমান হয়—তা জানিস ?

শুনে টেনিদা কটমট করে ক্যাবলার দিকে তাকাল ।

—ঠাট্টা করছিস ?

ক্যাবলা তিড়িং করে হাত-পাঁচেক দূরে সরে গেল । জিভ কেটে বললে, কী সর্বনাশ ! তোমাকে ঠাট্টা ! শেষে যে গাঁট্টা খেয়ে আমার গালপাট্টা উড়ে যাবে ! আমি বলছিলুম কি, ভূত এসে হ্যান্ডশেকই করুক আর বক্সিংই জুড়ে দিক, লেকিন ওটা দলপতির সঙ্গে হওয়াটাই দস্তুর ।

টেনিদার কথাটা ভালো লাগল না । মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, যা-যাঃ, বেশি ক্যাঁচোর-ম্যাচোর করিসনি । কিন্তু তোকেও বলে দিচ্ছি প্যালা, এ বেলা থেকে তোর ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ । স্রেফ কাঁচকলা দিয়ে গাঁদালের ঝোল, আর রাত্তিরে সাবু-বার্লি । আজকে মুচ্ছো গিয়েছিলি, দু'-চারদিন পরে একেবারেই যে মারা যাবি !

আমি রেগে বললুম, ধ্যাত্তোর তোমার সাবু-বার্লির নিকুচি করেছে । বলছি সত্যিই ভূতে চাঁটি মেরেছে, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না !

ক্যাবলা বললে, বটে ?

টেনিদা বললে, থাম, আর চালিয়াতি করতে হবে না ।

আমি আরও রেগে বললুম, চালিয়াতি করছি নাকি ? তাহলে এখনও আমার ডান গালটা টনটন করবে কেন ?

টেনিদা বললে, অমন করে । খামকাই তো লোকের দাঁত কনকন করে, মাথা বনবন করে, কান ভোঁ-ভোঁ করতে থাকে—তাই বলে তাদের সকলকে ধরেই কি ভূতে ঠ্যাঙায় নাকি ?

আমি এবারে মনে ভীষণ ব্যথা পেলুম । এত কষ্টে-সৃষ্টে যদিই বা গালে একটা ভুতুড়ে চড় খেয়েছি, কিন্তু এই হতভাগারা কিছুতেই বিশ্বাস করছে না । ওরা নিজেরা খেতে পায়নি কিনা, তাই বোধহয় ওদের মনে হিংসে হয়েছে ।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, কেন বিশ্বাস করছ না বলো তো ? তোমরা তো গুটি-গুটি সামনে এগিয়ে গেলে । এর মধ্যে গোটাকয়েক বৈঁচি-টৈঁচি খেয়ে আমি দেখলুম, ঝোপের মধ্যে একটা কাঠবেড়ালির ল্যাজ নড়ছে । যেই সেটাকে খপ করে চেপে ধরেছি, অমনি—

—অমনি কাঠবেড়ালি তোকে চড় মেরেছে ?—বলেই টেনিদা হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল । আবার ক্যাবলার নাক-মুখ দিয়ে শেয়ালের ঝগড়ার মতো খিক-খিক করে কেমন একটা আওয়াজ বেরোতে শুরু করল ।

এই দারুণ অপমানে আমার পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলেটা নাচতে লাগল । আর সেই সঙ্গেই হঠাৎ নিজের ডানহাতের দিকে আমার চোখ পড়ল । আমার মুঠোর মধ্যে—

একরাশ শাদা শাদা রোঁয়া । সেই ল্যাজটারই খানিক ছিঁড়ে এসেছে নিশ্চয় ।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললাম, এই দ্যাখো, এখনও কী লেগে রয়েছে আমার হাতে ।

ক্যাবলা এক লাফে এগিয়ে এল সামনে । টেনিদা থাবা দিয়ে রোঁয়াগুলো তুলে নিলে আমার হাত থেকে ।

তারপর টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : এ যে—এ যে—

ক্যাবলা আরও জোরে চেঁচিয়ে বললে, দাড়ি ।

টেনিদা বললে, পাকা দাড়ি ।

ক্যাবলা বললে, তাতে আবার পাটকিলে রঙ । তামাক-খাওয়া দাড়ি !

টেনিদা বললে, ভূতের দাড়ি !

ক্যাবলা বললে, তামাকখেকো ভূতের দাড়ি ।

ভূতের দাড়ি ! শুনে আর একবার আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার জো হল । কী সর্বনাশ—করেছি কী ! শেষে কি কাঠবেড়ালির ল্যাজ টানতে গিয়ে ভূতের দাড়ি ছিঁড়ে এনেছি ? তাই অমন একখানা মোক্ষম চড় বসিয়েছে আমার গালে ! কিন্তু একখানা চড়ের ওপর দিয়েই কি আমি পার পাব ? হয়তো কত যত্নের দাড়ি, কত রাত-বিরেতে শ্যাওড়া গাছে বসে ওই দাড়ি চুমরে-চুমরে ভূতটা খাম্বাজ-রাগিণী গাইত ! অবশ্য খাম্বাজ রাগিণী কাকে বলে আমার জানা নেই, তবে নাম শুনলেই মনে হয়, ও-সব রাগ-রাগিণী ভূতের গলাতেই খোলতাই হয় ভালো ।—আমি সেই সাধের দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েছি, এখন মাঝরাতে এসে আমার মাথার চুলগুলো উপড়ে নিয়ে না যায় ! ক্যাবলা আর টেনিদা দাড়ি নিয়ে গবেষণা করুক—আমি হাত-পা ছেড়ে আবার বিছানার ওপর ধপাস করে শুয়ে পড়লুম ।

ক্যাবলা দাড়িগুলো বেশ মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে বললে, কিন্তু টেনিদা—ভূতে কি তামাক খায় ?

—কেন, খেতে দোষ কী ?

—মানে ইয়ে কথা হল—ক্যাবলা মাথা চুলকে বললে, লেকিন বাত এহি হ্যায়, ভূতে তো শুনেছি আগুন-টাগুন ছুঁতে পারে না—তাহলে তামাক খায় কী করে ? তা ছাড়া আমার মনে হচ্ছে—এমনি পাকা, এমনি পাটকিলে-রঙ-মাখানো দাড়ি যেন আমার চেনা, যেন এ-দাড়িটা কোথায় আমি দেখেছি—

ক্যাবলা আরও কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দু'-পাটি জুতো হাতে করে ঘরের মধ্যে ঝাঁটু এসে ঢুকল । টেনিদার মুখের সামনে জুতোজোড়া তুলে ধরে বললে, এই দেখুন দাদাবাবু—

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠে বললে, ব্যাটা কোথাকার গাড়ল রে ! বলা হল প্যালার খাওয়ার জন্য দুধ আনতে, তুই আমার মুখের কাছে জুতোজোড়া এনে হাজির করলি ? আমি কি ও-দুটো চিবোব নাকি বসে বসে ?

ঝাঁটু বললে, রাম-রাম ! জুতো তো কুত্তা চিবোবে, আপনি কেন ? আমি বলছিলাম, হাবুলবাবু কুথা গেল ! জুতোটা বাহিরে পড়েছিল, হাবুলবাবুকে তো কোথাও দেখলম না । ফির জুতোর মধ্যে একটা চিঠি দেখলম, তাই নিয়ে এলম ।

জুতোর মধ্যে চিঠি ? আরে, তাই তো বটে । আমি জ্ঞান হওয়ার পরে তো সত্যিই এ-ঘরে হাবুল সেনকে দেখতে পাইনি !

ক্যাবলা বললে,তাই তো ! জুতোর ভেতরে চিঠির মতো একটা কী রয়েছে যে ! ব্যাপার কী, টেনিদা ? হাবুলটাই বা গেল কোথায় ?

টেনিদা ভাঁজ-করা কাগজটা টেনে বের করে বললে, দাঁড়া না কাঁচকলা, আগে দেখি চিঠিটা ।

কিন্তু চিঠির ওপর চোখ বুলোতেই—সে দুটো তড়াক করে একেবারে টেনিদার

কপালে চড়ে গেল । বার-তিনেক খাবি খেয়ে টেনিদা বললে, ক্যাবলা রে, আমাদের বারোটা বেজে গেল !

—বারোটা বেজে গেল ! মানে ?

—মানে—হাবুল 'গন' ।

—কোথায় 'গন' ?—আমি আর ক্যাবলা একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠলাম : চিঠিতে কী আছে টেনিদা ? কী লেখা ওতে ?

ভাঙা গলায় টেনিদা বললে, তবে শোন, পড়ি ।

চিঠিতে লেখা ছিল :

'হাবুল সেনকে আমরা ভ্যানিশ করিলাম । যদি পত্রপাঠ চাঁটি-বাঁটি তুলিয়া আজই কলিকাতায় রওনা হও, তবে যাওয়ার আগে অক্ষত শরীরে হাবুলকে ফেরত পাইবে । নতুবা পরে তোমাদের চার মূর্তিকেই আমরা ভ্যানিশ করিব—এবং চিরতরেই তাহা করিব । আগে হইতেই সাবধান করিয়া দিলাম, পরে দোষ দিতে পারিবে না ।

ইতি—ঘচাং ফুঃ । দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু ।'

১০। 'নস্যু কচাং কুঃ'

টেনিদা ধপাস্ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল । ওর নাকের সামনে অনেকক্ষণ ধরে একটা পাহাড়ি মৌমাছি উড়ছিল, অত বড় নাকটা দেখে বোধহয় ভেবেছিল, ওখানে একটা জুতসই চাক বাঁধা যায় । হঠাৎ টেনিদার নাক থেকে ঘড়াৎ-ঘড় করে এমনি একটা আওয়াজ বেরুল যে—সেটা ঘাবড়ে গিয়ে হাত তিনেক দূরে ঠিকরে পড়ল ।

লিডারের অবস্থা তখন সঙ্গিন । করুণ গলায় বললে, ওরে বাবা—গেলুম । শেষকালে কিনা চীনে দস্যুর পাল্লায় ! এর চেয়ে যে ভূতও অনেক ভালো ছিল ।

আমাক হাত-পাগুলো তখন আমার পিলের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে । বললুম, তার নাম আবার ঘচাং ফুঃ ! অর্থাৎ ঘচাং করে গলা কেটে দেয়... তারপর ফুঃ করে উড়িয়ে দেয় !

ঝাঁটু মিটমিট করে তাকাচ্ছিল । আমাদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে, বেপার কী বটেক দাদাবাবু ?

ক্যাবলা বললে, বেপার ? বেপার সাঙ্ঘাতিক । হ্যাঁ রে ঝাঁটু, এখানে ডাকাত-ফাকাত আছে নাকি ?

—ডাকাত ?—ঝাঁটু বললে, ডাকাত ফির ইখানে কেনে মরতে আসবেক ? ই তল্লাটে উসব নাই ।

—নাঃ, নেই !—মুখখানাকে কচু-ঘণ্টর মতো করে টেনিদা খেঁকিয়ে উঠল ; তবে ঘচাং ফুঃ কোত্থেকে এল ? তাও আবার যে-সে নয়—একেবারে দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু !

ক্যাবলা কী পাখোয়াজ ছেলে ! কিছুতেই ঘাবড়ায় না। বললে, আরে দুত্তোর—রেখে দাও ওসব ? দেখলে তো, তা হলে কিছু নয়, সব ধাপ্পা ! ঘচাং ফুঃর তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—এই হাজারিবাগের পাহাড়ি বাংলোয় এসে ভ্যারেণ্ডা ভাজবে ! আসলে ব্যাপার কী জানো ? শ্রেফ বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস।

—বাংলা ডিটেকটিভ উপন্যাস !—টেনিদা চোয়াল চুলকোতে চুলকোতে বললে : মানে ?

—মানে ? মানে আবার কী ? ওই এনতার সব গোয়েন্দা গল্প—যে-সব গল্পের পুকুরে সাবমেরিন ভাসায়, আর যাতে করে বাঙালী গোয়েন্দা দুনিয়ার সব অসাধ্য সাধন করে—সেই সমস্ত বই পড়ে এদের মাথায় এগুলো ঢুকেছে। আমার বড়মামা লালবাজারে চাকরি করে, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—এই গোয়েন্দারা কোথায় থাকে। বড়মামা রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই করে বললে, কী একটা কল্‌কেতে থাকে।

—চুলোয় যাক গোয়েন্দা। টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, তার সঙ্গে ঘচাং ফুঃর সম্পর্ক কী ?

—আছে—আছে ! ক্যাবলা সবজান্তার মতো বললে, যারা এই চিঠি লিখেছে, তারা গোয়েন্দা-গল্প পড়ে। পড়ে-পড়ে আমাদের ওপরে একখানা চালিয়াতি খেলেছে।

—কিন্তু এ-রকম চালিয়াতি করার মানে কী ? আমাদের এখান থেকে তাড়াতেই বা চায় কেন ? আর হাবুল সেনকেই বা কোথায় নিয়ে গেল ?

ক্যাবলা বললে, সেইটেই তো রহস্য ! সেটা ভেদ করতে হবে। কতকগুলো পাজি লোক নিশ্চয়ই আছে—আর কাছাকাছিই কোথাও আছে। কিন্তু এই চিঠিটা দিয়ে এরা মস্ত উপকার করেছে টেনিদা !

—উপকার ?—টেনিদা বললে, কিসের উপকার ?

—একটা জিনিস তো পরিষ্কার বোঝা গেল, জিন-টিন এখানে কিচ্ছু নেই—ও-সব একদম ভোঁ-কাট্টা ! কতকগুলো ছ্যাঁচড়া লোক কোথাও লুকিয়ে রয়েছে—এ-বাড়িটায় তাদের দরকার। আমরা এসে পড়ায় তাদের অসুবিধে হয়েছে—তাই আমাদের তাড়াতে চায়।—ক্যাবলা বুক টান করে বললে, কিন্তু আমরা পটলডাঙার ছেলে হয়ে একদল ছিঁচকে লোকের ভয়ে পালাব টেনিদা ? ওদের টাকের ওপরে টেক্কা মেরে জানিয়ে দিয়ে যাব, ওরা যদি ঘচাং ফুঃ হয়—তাহলে আমরা হচ্ছি কচাং কুঃ !

—কচাং কুঃ !—আমি বললুম, সে আবার কী ?

ক্যাবলা বললে, বাঘা চৈনিক দস্যু ! দুর্ধর্ষের ওপর আর-এক কাঠি !

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, আমরা আবার চীনে হলুম কবে ? দস্যুই বা হতে যাব কোন দুঃখে ?

ক্যাবলা বললে, ওরা যদি চৈনিক হয়—আমাদেরই বা হতে দোষ কী ? আমরাও ঘোরতর চৈনিক। ওরা যদি দস্যু হয়—আমরা নস্যু !

—নস্যু !—টেনিদার নাক-বরাবর আবার সেই মৌমাছিটা ফিরে আসছিল, সেটাকে তাড়াতে তাড়াতে টেনিদা বললে, নস্যু কাকে বলে ?

—মানে, দস্যুদের যারা নস্যির মতো নাক দিয়ে টেনে ফেলে, তারাই হল নস্যু।

টেনিদা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দ্যাখ ক্যাবলা, সব জিনিস নিয়ে ইয়ার্কি নয়। যদি সত্যিই ওরা ডাকাত-টাকাত হয়—

ডাকাত হলে অনেক আগেই ওদের মুরোদ বোঝা যেত। বসে-বসে ঝোপের মধ্যে চীনেবাদাম খেত না, কিংবা কাগজে জড়িয়ে মড়ার মাথা ছুঁড়ত না। ওরাও এক নম্বর কাওয়ার্ড !

—তাহলে হাবুল সেনকে নিয়ে গেল কী করে ?

—নিশ্চয়ই কোনও কায়দা করেছে। কিন্তু সে-কায়দাটা সমঝে ফেলতে বহুত সময় লাগবে না। টেনিদা—

—কী ?

—আর দেরি নয়। রেডি ?

টেনিদা বললে, কিসের রেডি ?

—ঘচাং ফুঃ-দের কচাং কুঃ করতে হবে ! আজই, এক্ষুনি।

টেনিদা তখনও সাহস পাচ্ছিল না। কুঁকড়ে গিয়ে বললে, সে কী করে হবে ?

—হয়ে যাবে একরকম। এই বাংলোর কাছাকাছিই ওদের কোনও গোপন আস্তানা আছে। হানা দিতে হবে সেখানে গিয়ে।

—ওরা যদি পিস্তল-টিস্তল ছোড়ে ?

—আমরা ইট ছুড়ব !—ক্যাবলা ভেংচি কেটে বললে, রেখে দাও পিস্তল ! গোয়েন্দা-গল্পে ওসব কথায়-কথায় বেরিয়ে আসে, আসলে পিস্তল অত সস্তা নয়। হ্যাঁ—গোটাকয়েক লাঠি দরকার। এই ঝাণ্টু—লাঠি আছে রে ?

ঝাণ্টু চুপচাপ সব শুনছিল। কী বুঝছিল কে জানে, মাথা নেড়ে বললে, দুটো আছে। একটো বল্লমও আছে।

—তবে নিয়ে আয় চটপট।

—লাঠি-বল্লমে কী হবেক দাদাবাবু ?—ঝাণ্টুর বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

—শেয়াল মারা হবেক।

—শেয়াল মারা ? কেনে ? মাংস খাবেন ?

—অত খবরে তোর দরকার কী ? —ক্যাবলা রেগে বললে, যা বলছি তোকে তাই কর। শিগগির নিয়ে আয় ওগুলো। চটপট।

ঝাণ্টু লাঠি বল্লম আনতে গেল। টেনিদা শুকনো গলায় বললে, কিন্তু ক্যাবলা, এ বোধহয় ভালো হচ্ছে না। যদি সত্যিই বিপদ-আপদ হয়—

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, অঃ—তুম্‌হারা ডর লাগ গিয়া ? বেশ, তুমি তাহলে

বাংলোয় বসে থাকো। আমি তো যাবই—এমনকি পালাজ্বরে-ভোগা এই প্যালাটাও আমার সঙ্গে যাবে। দেখবে, তোমার চাইতে ওরও বেশি সাহস আছে।

শুনে আমার বুক ফুলে উঠল বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পালাজ্বরের পিলেটাও নড়-নড় করে উঠল—আমাকেও যেতে হবে! বেশ, তাই যাব! একবার ছাড়া তো দু'বার মরব না।

আর আমি মারা গেলে—হ্যাঁ, মা কাঁদবে, পিসিমা কাঁদবে, বোধহয় সেকেন্ডারি বোর্ডও কাঁদবে—কারণ, বছর-বছর স্কুল-ফাইন্যালের ফি দেবে কে? আর বৈঠকখানা বাজারে দৈনিক আধপো পটোল আর চারটে শিঙিমাছ কম বিক্রি হবে—এক ছটাক বাসকপাতা বেঁচে যাবে রোজ। তা যাক! এমন বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের জন্যে সংসারের একটু-আধটু ক্ষতি নয় হলই বা।

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল,—তবে যাই! কিন্তু প্যালার সেই দাড়িটা—

বললুম, তামাকখেকো দাড়ি।

ক্যাবলা বললে, ঠিক। মনেই ছিল না। ওই দাড়ি থেকেই আরও প্রমাণ হয়—ওরা চৈনিক নয়। কলকাতায় তো এত চীনা মানুষ আছে—কারও দাড়ি দেখেছ কখনও?

তাই তো! দাড়িওলা চীনা মানুষ! না, আমরা কেউ তো দেখিনি। কখনও না।

এর মধ্যে ঝাঁটু লাঠি আর বল্লম এনে ফেলেছে। বল্লমটা ঝাঁটুই নিলে, একটা লাঠি নিলে ক্যাবলা—আর-একটা টেনিদা। আমি আর কী নিই? হাতের কাছে একটা চ্যালাকাঠ পড়েছিল, সেইটেই কুড়িয়ে নিলুম। যদি মরতেই হয়, তবু তো এক ঘা বসাতে পারব।

অতঃপর ঘচাং ফুঃ দস্যুর দলকে একহাত নেবার জন্যে দস্যু কচাং কুঃর দল আবার রওনা হল বীরদর্পে। আবার সেই বুনো রাস্তা। আমরা ঝোপ-ঝাপ ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে দেখছিলুম, কোথাও সেই তামাকখেকো লুকিয়ে আছে কি না।

কিন্তু আবার আমি বিপদে পড়ে গেলুম। এবার বৈঁচি নয়—কামরাঙা।

বাংলোর ঠিক পেছন দিয়ে আমরা চলেছি। আমি যথানিয়মে পেছিয়ে পড়েছি—আর ঠিক আমারই চোখে পড়েছে কামরাঙার গাছটা। আঃ, ফলে-ফলে একেবারে আলো হয়ে রয়েছে!

নোলায় প্রায় সেরটাক জল এসে গেল। জ্বরে ভুগে-ভুগে টক খাবার জন্যে প্রাণ ছটফট করে। ঘচাং ফুঃ-টুঃ সব ভুলে গিয়ে গুটি-গুটি গেলুম কামরাঙা গাছের দিকে। কলকাতায় এ সব কিছুই খেতে পাই না—চোখের সামনে অমন খোলতাই কামরাঙার বাহার দেখলে কার আর মাথা ঠিক থাকে!

যেই গাছতলায় পা দিয়েছি—

সঙ্গে-সঙ্গেই—ইঃ! একতাল গোবরে পা পড়ল—আর তক্ষুনি এক আছাড়। কিন্তু এ কী! আছাড় খেয়ে আমি তো মাটিতে পড়লুম না! আমি যে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে পাতালে চলেছি! কিন্তু পাতালেও নয়। আমি একেবারে সোজা কার মস্ত একটা ঘাড়ের ওপর অবতীর্ণ হলুম। 'আঁই দাদা রে—' বলে সে আমাকে নিয়ে একেবারে পপাত।

আমি আর-একবার অজ্ঞান।

১১। গজেশ্বরের পাল্লায়

অজ্ঞান হয়ে থাকাটা মন্দ নয়—যতক্ষণ কাঠপিঁপড়েতে না কামড়ায়। আর যদি একসঙ্গে একঝাঁক পিঁপড়ে কামড়াতে শুরু করে—তখন? অজ্ঞান তো দূরের কথা, মরা মানুষ পর্যন্ত তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে!

আমিও লাফ মেরে উঠে বসলুম।

কেমন আবছা-আবছা অন্ধকার—গোড়াতে কিছু ভালো বোঝা গেল না! চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকছিল। খামকা বাঁ-কানের ওপর কটাৎ করে আর-একটা কাঠপিঁপড়ের কামড়।

—বাপ রে—বলে আমি কান থেকে পিঁপড়েটা টেনে নামালুম!

আর ঠিক তক্ষণাৎ কটকটে ব্যাঙের মতো আওয়াজ করে কে যেন হেসে উঠল। তারপর, ঘোড়ার নাকের ভেতর থেকে যেমন শব্দ হয় তেমনি করে কে যেন বললে, কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে বাপ রে-বাপ রে বলছ, এর পরে যখন ভীমরুলে কামড়াবে, তখন যে মেসোমশাই-মেসোমশাই বলে ডাক ছাড়তে হবে!

তাকিয়ে দেখি—

ঠিক হাত দুয়েক দূরে একটা মুশকো জোয়ান ভাম-বেড়ালের মতো থাবা পেতে বসে আছে। কথাটা বলে সে আবার কটকটে ব্যাঙের মতো শব্দ করে হাসল।

আমার তখন সব কি-রকম গোলমাল ঠেকছিল। বললুম, আমি কোথায়?

—আমি কোথায়!—লোকটা একরাশ বিচ্ছিরি বড়-বড় দাঁত বের করে আমায় ভেংচে দিলে। তারপর ঝগড়াটে প্যাঁচার মতো খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, আহা-হা, ন্যাকা আর কি! যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না! হঠাৎ ওপর থেকে দুড়ুম করে পাকা তালের মতো আমার পিঠের ওপর এসে নামলে, আর এখন সোনামুখ করে বলছ—আমি কোথায়? ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি?

আমার সব মনে পড়ে গেল। সেই পাকা কামরাঙা—গুটি গুটি পায়ে সেদিকে এগোনো, গোবরে পা পিছলে পড়া—তারপরে—

আমি হাঁউ-মাউ করে বললুম, তবে কি আমি দস্যু ঘচাং ফুঃ-র আড্ডায় এসে পড়েছি?

—ঘচাং ফুঃ? সে আবার কী?—বলেই লোকটা সামলে নিল: হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক বটে। বাবাজী অমনি একটা কী লিখেছিল বটে চিঠিতে।

—বাবাজী ? কে বাবাজী ?

একটু পরেই টের পাবে। —লোকটা দাঁত খেঁচিয়ে বললে, চালাকি পেয়েছ ? এত করে চলে যেতে বললুম—ভূতের ভয় দেখানো হল—সারা রাত মশার কামড় খেয়ে ঝোপের মধ্যে বসে মড়ার মাথা-ফাতা ছুঁড়লুম—অট্টহাসি হেসে-হেসে গলা ব্যথা হয়ে গেল—তবু তোমাদের গেরাহ্যি হয় না ? দাঁড়াও এবার ! একটাকে ভোগা দিয়ে এনেছি—তুমিও এসে ফাঁদে পড়েছ ; এবার তোমায় শিককাবাব বানিয়ে খাব !

—অ্যাঁ—শিককাবাব !

—ইচ্ছে হলে আলু-কাবলিও বানাতে পারি। কিংবা ফাউল-কাটলেট। চপও করা যায় বোধহয়। কিন্তু লোকটা চিন্তিতভাবে একবার মাথা চুলকাল, কিন্তু তোমাদের কি খাওয়া যাবে ? এ-পর্যন্ত অনেক ছোকরা আমি দেখেছি, কিন্তু তোমাদের মতো অখাদ্য জীব কখনও দেখিনি।

শুনে আমার কেমন ভরসা হল। মরতেই তো বসেছি—তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

বললুম, সে-কথা ভালো ! আমাদের খেয়ো না—অন্তত আমাকে তো নয়ই ! খেলেও হজম করতে পারবে না। কলেরা হতে পারে, গায়ে চুলকুনি হতে পারে, ডিপথিরিয়া হতে পারে—এমনকি সর্দি-গর্মি হওয়াও আশ্চর্য নয় !

লোকটা বললে, থামো ছোকরা—বেশি বকবক কোরো না। আপাতত তোমায় নিয়ে যাব ঠাণ্ডী গারদে—তোমার দোস্ত হাবুল সেনের কাছে। সেইখানেই থাকো এখন। ইতিমধ্যে বাবাজি ফিরে আসুন, তোমার বাকি দুটো দোস্তকেও পাকড়াও করি—তারপর ঠিক করা যাবে তোমাদের দিয়ে মোগলাই পরোটা বানানো হবে—না ডিমের হালুয়া।

আমি বললুম, দোহাই বাবা, আমাকে খেয়ো না ! খেয়ে কিছু সুখ পাবে না—তা বলে দিচ্ছি। আমি পালাজ্বরে ভুগি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই—কিচ্ছু রস-কস নেই। আমাদের অঙ্কের মাস্টার গোপীবাবু বলেন, আমি যমের অরুচি। আমাকে খেয়ে বেঘোরে মারা যাবে বাবা ঘচাং ফুঃ—

লোকটা রেগে বললে, আরে দেখে দাও তোমার ঘচাং ফুঃ—ঘচাং ফুঃ-র নিকুচি করেছে। কেন বাপু, রাঁচির গাড়িতে বসে গুরুদেবের রসগোল্লা আর মিহিদানা খাওয়ার সময় মনে ছিল না ? তাঁর যোগসর্পের হাঁড়ি সাবাড় করার সময় বুঝি এ-কথা খেয়াল ছিল না যে আমাদেরও দিন আসতে পারে ? নেহাত মুরি স্টেশনে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম—নইলে—

আমি ততক্ষণে হাঁ হয়ে গেছি। আমার চোখ দুটো ছানাবড়া নয়—একেবারে ছানার ডালনা।

—অ্যাঁ, তাহলে তুমি—

—চিনেছ এতক্ষণে ? আমি গুরুদেবের অধম শিষ্য গজেশ্বর গাড়ুই।

—অ্যাঁ !

গজেশ্বর মিটমিট করে হেসে বললে, ভেবেছিলে মুরি স্টেশন পার হয়ে গাড়ি

চলে গেল, আর তোমরাও পার পেলে। আমরা যে তার পরের গাড়িতেই চলে এসেছি, সেটা তো আর টের পাওনি। এবারে বুঝবে কত ধানে কত চাল হয়।

ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম, পটলডাঙার প্যালারামের এবার বারোটা বেজে গেছে—ওই গজেশ্বর ব্যাটা এবার আমায় নির্ঘাত 'সামী কাবাব' বানিয়ে খাবে। নেহাত যখন মরবই, তখন ভয় করে কী হবে ? বরং গজেশ্বরের সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করি।

—কিন্তু তোমরা এখানে কেন ? ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের বাংলোতে তোমাদের কী দরকার ? এমন করে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছই বা কী জন্যে ? আর যদি বসেই থাকো—গর্তের মধ্যে একতাল অত্যন্ত বাজে গোবর রেখে দিয়েছ কেন ?

গজেশ্বর বিরক্ত হয়ে বললে, গোবর কি আমরা রেখেছি নাকি ? রেখেছে গোরুতে। তোমাদের মত গোবর-গণেশ তাতে পা দিয়ে সুড়ুৎ করে পিছলে পড়বে—সেইজন্যেই বোধহয়।

—সে তো হল—কিন্তু আমাদের তাড়াতে চাও কেন ? এ-বাড়িতে তোমাদের কী দরকার ?

—অত কথা দিয়ে তোমার কাজ কী হে চিংড়িমাছ ? এখনও নাক টিপলে দুধ বেরোয়—ও-সব খবরে তোমার কী হবে ?—ব্যাজার মুখে গজেশ্বর একটা হাই তুলল।

আমাকে চিংড়িমাছ বলায় আমার ভীষণ রাগ হল। ডান কানের ওপর আর একটা কাঠপিঁপড়ে পুটুস করে ইনজেকশন দিচ্ছিল, 'উঃ' করে সেটাকে টেনে ফেলে দিয়ে বললুম, আমাকে চপ-কাপলেট করে খেতে চাও খাও, কিন্তু খবরদার বলছি, চিংড়িমাছ বোলো না !

—কেন বলব না ? চিংড়ির কাটলেট বলব ! গজেশ্বর মিটিমিটি হাসল।

—না, কক্ষনো বলবে না !—আমি আরও রেগে গিয়ে বললুম, তা ছাড়া এখন আমার নাক টিপলে দুধ বেরোয় না। আমি দু'-দুবার স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছি।

—ইঃ—স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছে !—গজেশ্বর ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল : আচ্ছা বলো তো—'ক্যাটাক্লিজম' মানে কী ?

—ক্যাটাক্লিজম ? ক্যাটাক্লিজম ? আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, বেড়ালের বাচ্চা হবে বোধহয় ?

বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে গজেশ্বর বললে, তোমার মুণ্ডু। আচ্ছা বলো তো—'সেনিগেম্বিয়া'র রাজধানী কী ?

বললুম, নিশ্চয় হনোলুলু ? নাকি, ম্যাডাগাস্কার ?

—ভূগোলকে একেবারে গোলগপ্পার মতো খেয়ে নিয়েছ দেখছি !—গজেশ্বর নাক বেঁকিয়ে বললে, আচ্ছা বলো দেখি, 'জাড্যাপহ' মানে কী ? 'অনিকেত' কাকে বলে ?

—কী বললে—অনিমেষ ? অনিমেষ আমার মামাতো ভাই।

—হয়েছে, আর বিদ্যে ফলিয়ে কাজ নেই !—গজেশ্বর আবার ঝগড়াটে প্যাঁচার মতো খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, স্কুল-ফাইন্যাল কেন—তুমি ছাত্রবৃত্তিও ফেল করবে ! নাঃ—সত্যিই দেখছি তুমি একদম অখাদ্য ! বোধহয় শুক্তো করে এক-আধটু খাওয়া যেতে পারে। এখন উঠে পড়ো।

—কোথায় যেতে হবে ?

—বললুম তো, ঠাণ্ডী গারদে। সেখানে তোমার ফ্রেন্ড হাবলু সেন রয়েছে—তার সঙ্গেও মোলাকাত হবে। ওদিকে আবার গুরুদেব গেছেন দলবল নিয়ে একটুখানি বিষয়-কর্মে, তিনিও ফিরে আসুন—তারপর দেখা যাক—

ইতিমধ্যে আমি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলুম। বিপদে পড়ে পটলডাঙার প্যালারামের মগজও এক-আধটু সাফ হয়ে এসেছে। কোথায় এসে পড়েছি সেটাও একটু ভালো করে জানা দরকার।

যতটা বোঝা গেল, হাত সাত-আষ্টেক নীচে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে পড়েছি। যদি গজেশ্বরের পিঠের ওপর সোজা ধপাস করে না পড়ুম, তাহলে হাত-পা নির্ঘাত ভেঙে থেঁতলে যেত। যেখানে বসে আছি, সেটা একটা সুড়ঙ্গের মতো সামনের দিকে চলে গেছে। কোথায় গেছে—কতটা গেছে বোঝা গেল না। তবে ওরই কোথাও ঠাণ্ডী গারদ আছে—সেইখানেই আপাতত বন্দি রয়েছে হাবুল সেন।

হাবুলের ব্যবস্থা পরে হবে—কিন্তু আমি কি এখান থেকে পালাতে পারি না ? কোনওমতেই না ?

মাথার ওপর গোল কুয়ার মতো গর্তটা দেখা যাচ্ছে—যেখান দিয়ে আমি ভেতরে পড়েছি। লক্ষ করে আরও দেখলুম, গর্তের পাশ দিয়ে পাথরে পাথরে বেশ খাঁজকাটা মতো আছে। একটু চেষ্টা করলেই ঠকাৎ করে ওপরে—

এ-সব ভাবতে বোধহয় মিনিট দুই সময় লেগেছিল। এর মধ্যে বিড়িটা শেষ করেছে গজেশ্বর—মিটমিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

—বলি, মতলবটা কী হে ? পালাবে ? সে-গুড়ে বালি চাঁদ—স্রেফ বালি ! বাঘের হাত থেকে ছাড়ান পেতে পারো, কিন্তু এই গজেশ্বর গাড়ুইয়ের হাত থেকে তোমার আর নিস্তার নেই ! তার ওপর তুমি আবার আমার গুরুদেবের দাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছ—তোমার কপালে কী যে আছে—একটা যাচ্ছেতাই মুখ করে গজেশ্বর উঠে দাঁড়াল।

অ্যাঁ। তাহলে সেই তামাকখেকো ভূতুড়ে দাড়িটা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের ! স্বামীজীই তবে ঝোপের মধ্যে বসি আড়ি পাতছিলেন, আর আমি কাঠবেড়ালির ল্যাজ মনে করে সেই স্বর্গীয় দাড়ি—

আমি কাতর হয়ে বললুম, আমি কিচ্ছু ইচ্ছে করে দাড়ি ছিঁড়িনি ! আমি ভেবেছিলুম—

—থাক—থাক। তুমি কী ভেবেছ তা আমার জেনে আর দরকার নেই। গালের ব্যথায় গুরুদেব দু'ঘণ্টা ছটফট করেছেন। তিনি ফিরে এলে—যাক সে-কথা, ওঠো এখন—

গজেশ্বর হাতির শুঁড়ের মতো প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়িয়ে আমায় পাকড়াও করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : বাপ রে গেলুম—আরে বাপ রে গেছি—

ততক্ষণে আমিও দেখেছি, কালো কটকটে একটা কাঁকড়া-বিছে, গজেশ্বরের পায়ে কাছে তখনও দাঁড়া উঁচু করে যমদূতের মতো খাড়া হয়ে আছে।

—গেলুম—গেলুম—ওরে বাবা—জ্বলে গেলুম—

বলতে বলতে সেই ষাঁড়ের মতো জোয়ানটা মেঝের ওপর কুমড়োর মতো গড়াতে লাগল : গেছি—গেছি—একদম মেরে ফেলেছে—

আর আমি ? এমন সুযোগ আর কি পাব ? তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের খাঁজে পা লাগালুম—এইবার এসপার কি ওসপার।

১২। শেঠ ঢুণ্ডুরাম

ওঠ জোয়ান হেঁইয়ো !

পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে যখন গর্তের মুখে উঠে পড়লুম, তখন আমার পালাজ্বরের পিলেটা পেটের মধ্যে কচ্ছপের মতো লাফাচ্ছে। অবশ্য কচ্ছপকে আমি কখনও লাফাতে দেখিনি—সুড়সুড় করে শুঁড় বের করতে দেখেছি কেবল। কিন্তু কচ্ছপ যদি কখনও লাফায়—আনন্দে হাত-পা তুলে নাচতে থাকে—তাহলে যেমন হয়, আমার পিলেটা তেমন করেই নাচতে লাগল। একেবারে পুরো পাঁচ মিনিট। পিলের নাচ-টাচ থামলে কামরাঙা গাছটার ডাল ধরে আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। কোথাও কেউ নেই—ক্যাবলা আর টেনিদা কোথায় গেছে কে জানে ! ও-ধারে একটা আমড়া গাছে বসে একটা বানর আমাকে ভেংচি কাটছিল—আমিও দাঁত-টাত বের করে সেটাকে খুব খারাপ করে ভেংচে দিলুম। বানরটা রেগে গিয়ে বললে, কিঁচ—কিঁচ—কিচ্ছু—বোধহয় বললে, তুমি একটা বিচ্ছু !—তারপর টুক করে পাতার আড়ালে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

পায়ের তলায় গর্তটার ভেতর থেকে গজেশ্বর গাড়ুইয়ের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। আমার বেশ লাগছিল। আমাকে বলে কিনা কাটলেট করে খাবে ! যাচ্ছেতাই সব ইংরিজি শব্দের মানে করতে বলে আর জানতে চায় হনোলুলুর রাজধানীর নাম কী ! বেশ হয়েছে। পাহাড়ি কাঁকড়া-বিছের কামড়—পুরো তিনটি দিন সমানে গান গাইতে হবে গজেশ্বরকে !

এইবার আমার চোখ পড়ল সেই কালান্তক গোবরটার দিকে। এখনও তার ভিতর দিয়ে পেছলানোর দাগ—ওই পাষণ্ড গোবরটাই তো আমায় পাতালে নিয়ে গিয়েছিল ! ভারি রাগ হল, গোবরকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যে ওটাকে আমি সজোরে পদাঘাত করলুম।

এহে-হে—এ কী হল। ভারি ছ্যাঁচড়া গোবর তো। একেবারে নাকে-মুখে ছিটকে এল যে! দুত্তোর!

কিন্তু এখানে আর থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গজেশ্বরকে বিশ্বাস নেই—হঠাৎ যদি উঠে পড়ে গর্তের ভেতর থেকে! সরে পড়া যাক এখান থেকে। পত্রপাঠ!

যাই কোন্ দিকে। ঝণ্টিপাহাড়ি বাংলোর ঠিক পেছন দিকে এসে পড়েছি সেটা বুঝতে পারছি—কিন্তু যাই কোন্ ধার দিয়ে। কীভাবে যে এসেছিলুম, ওই মোক্ষম আছাড়টা খাওয়ার পর মাথার ভেতর সে-সমস্ত হালুয়ার মতো তালগোল পাকিয়ে গেছে। ডাইনে যাব, না বাঁয়ে? আমার আবার একটা বদ দোষ আছে। পটলডাঙার বাইরে এলেই আমি পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কিছুই আর চিনতে পারিনে। একবার দেওঘরে গিয়ে আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদাকে বলেছিলুম; দেখো ফুচুদা, কী আশ্চর্য ব্যাপার। উত্তরদিক থেকে কী চমৎকার সূর্য উঠছে!—শুনে ফুচুদা কটাং করে আমার লম্বা কানে একটা মোচড় দিয়ে বলেছিল, স্ট্রেট এখান থেকে রাঁচি চলে যা প্যালা—মানে, রাঁচির পাগলা গারদে।

কোন্ দিকে যাব ভাবতে ভাবতেই—আমার চোখ একেবারে ছানাবড়া! কিংবা একেবারে চমচম! ওদিকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গুটিসুটি মেরে ও কারা আসছে? কাঠবেড়ালির ল্যাজের মতো ও কার দাড়ি উড়ছে হাওয়াতে?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ—নির্ঘাত। তাঁর পেছনে পেছনে আরও দুটো ষণ্ডা জোয়ান—তাদের হাতে দুটো মুখ-বাঁধা সন্দেহজনক হাঁড়ি! নির্ঘাত যোগসর্পের হাঁড়ি—মানে, দই আর রসগোল্লা-ফোল্লা থাকা সম্ভব। একা একা নিশ্চয় খাবে না, খুব সম্ভব হাবুল সেনও ভাগ পাবে!

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—রসগোল্লার ব্যাপারে একটুখানি দুর্বলতা আমার আছে। কিন্তু সেই লোভে আবার আমি গজেশ্বর গাড়ুইয়ের পাল্লায় পড়তে চাই না—উহুঁ—কিছুতেই না! বেঁচে কেটে পড়ি এখান থেকে।

সুট করে আমি বাঁ পাশের ঝোপে ঢুকে গেলুম। দৌড়নো যাবে না—পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবে ওরা। ঝোপের মধ্যে আমি সুড়সুড়িয়ে চললুম।

চলেছি তো চলেইছি। কোন্ দিকে চলেছি জানি না। ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে, নালা-ফালা টপকে, একটা শেয়ালের ঘাড়ের ওপর উলটে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে, চলেছি আর চলেইছি। আবার যদি দস্যু ঘচাং ফুঃর পাল্লায় পড়ি—তাহলেই গেছি। গজেশ্বর যে-রকম চটে রয়েছে—আমাকে আবার পেলে আর দেখতে হবে না! সোজা শুক্তোই বানিয়ে ফেলবে!

প্রায় ঘণ্টাখানেক এলোপাথাড়ি হাঁটবার পর দেখি, সামনে একটা ছোট্ট নদী। ঝুরঝুরে মিহি বালির ভেতর দিয়ে তিরতির করে তার নীলচে জল বয়ে চলেছে। চারদিকে ছোট-বড় পাথর। আমার পা প্রায় ভেঙে আসবার জো—তেষ্টায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

পাথরের ওপর বসে একটুখানি জিরিয়ে নিলুম। আকাশটা মেঘলা—বেশ ছায়াছায়া জায়গাটা। শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। চারদিকে পলাশের বন—নদীর ওপারে আবার দুটো নীলকণ্ঠ পাখি।

একটুখানি জলও খেলুম নদী থেকে। যেমন ঠাণ্ডা—তেমনি মিষ্টি জল। খেয়ে একেবারে মেজাজ শরিফ হয়ে গেল। দস্যু ঘচাং ফুঃ, গজেশ্বর, টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল—সব ভুলে গেলুম। মনে এত ফুর্তি হল যে আমার চা-রা-রা-রা-রা—রামা হো—রামা হো—বলে গান গাইতে ইচ্ছে করল।

কেবল চা-রা-রা-রা-রা—বলে তান ধরেছি—হঠাৎ পেছনে ভোঁপ-ভোঁপ-ভোঁপ!

দুত্তোর—একেবারে রসভঙ্গ! তার চাইতেও বড় কথা এখানে মোটর এল কোত্থেকে? এই ঝণ্টিপাহাড়ির জঙ্গলে?

তাকিয়ে দেখলুম, নদীর ধার দিয়ে একটা রাস্তা আছে বটে। আর-একটু দূরেই সেই রাস্তার ওপর পলাশ-বনের ছায়ায় একখানা নীল রঙের মোটর দাঁড়িয়ে।

কী সর্বনাশ—এরাও ঘচাং ফুঃ-র দল নয় তো? ডিটেকটিভ গল্পে এইরকমই তো পড়া যায়! নিবিড় জঙ্গল—একখানা রহস্যজনক মোটর—তিনটে কালো-মুখোশ পরা লোক, তাদের হাতে পিস্তল—আর ডিটেকটিভ হিমাদ্রি রায়ের চোখ একেবারে মনুমেন্টের চূড়ায়। ভাবতেই আমার পালাজ্বরের পিলেটা ধপাস করে লাফিয়ে উঠল। ফিরে কচ্ছপ-নৃত্য শুরু করে আর-কি!

উঠে একটা রাম-দৌড় লাগাব ভাবছি—এমন সময় আবার ভোঁপ, ভোঁপ! মোটরটার হর্ন বাজল। তারপরেই গাড়ি থেকে যে নেমে এল, তাকে দেখে আমি থমকে গেলুম। না—কোনও দস্যুর দলে এমন লোক থাকতেই পারে না! কোনও গোয়েন্দা-কাহিনীতে তা লেখেনি।

প্রকাণ্ড থলথলে ভুঁড়ি—দেখলে মনে হয়, ক্রেনে করে তুলতে গেলে ক্রেন ছিঁড়ে পড়বে। গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবিটা তৈরি করতে বোধহয় একথান কাপড় খরচ হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা বেলুনের মতো মুখ—নাক-টাকগুলো প্রায় ভেতরে ঢুকে বসে আছে। মাথায় একটা বিরাট হলদে রঙের পাগড়ি। গলা-টলার বালাই নেউ—পেটের ভেতর থেকে মাথাটা প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে মনে হয়। ঠিক থুতনির তলাতেই একছড়া সোনার হার চিকচিক করছে। দু'হাতের দশ আঙুলে দশটা আংটি।

একখানা মোক্ষম শেঠজী!

নাঃ—এ কখনও দস্যু ঘচাং ফুঃ-র লোক নয়। বরং ঘচাং ফুঃদের নজর সচরাচর যাদের ওপর পড়ে—এ সেই দলের। কিন্তু এ রকম একটি নিটোল শেঠজী খামকা এই জঙ্গলে এসে ঢুকেছে কেন?

শেঠজী ডাকলেন: খোঁকা—এ খোঁকা—

আমাকেই ডাকছেন মনে হল। কারণ, আমি ছাড়া কাছাকাছি আর কোনও খোঁকাকে আমি দেখতে পেলুম না। সাত-পাঁচ ভেবে আমি গুটি-গুটি এগোলুম তাঁর দিকে।

—নমস্তে শেঠজী।

—নমস্তে খোঁকা। —শেঠজী হাসলেন বলে মনে হল। বেলুনের ভেতর থেকে গোটাকতক দাঁত আর দুটো মিটমিটে চোখের ঝলক দেখতে পেলুম এবার। শেঠজী বললেন, তুমি কার লেড়কা আছেন ? এখানে কী করতেছেন ?

একবার ভাবলুম, সত্যি কথাটাই বলি। তারপরেই মনে হল কার পেটে যে কী মতলব আছে কিছুই বলা যায় না। এই ঝন্টিপাহাড়ি জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়। শেঠজীর অত বড় ভুঁড়ির আড়ালেও রহস্যের কোনও খাসমহল লুকিয়ে আছে কি না কে বলবে।

তাই বোঁ করে বলে দিলুম, আমি হাজারিবাগের ইস্কুলে পড়তেছেন। এখানে পিকনিক করতে এসেছেন।

—হাঁ ! পিকনিক করতে এসেছেন ?—শেঠজীর চোখ দুটো বেলুনের ভেতর থেকে আবার মিটমিট করে উঠল : এতো দূরে ? তা, দলের আউর সব লেড়কা কোথা আছেন ?

—আছেন ওদিকে কোথাও।—আঙুল দিয়ে আন্দাজি যে-কোনও একটা দিক দেখিয়ে দিলুম। তারপর পাল্টা জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কে আছেন, এই জঙ্গলে আপনিই বা কী করতে এসেছেন ?

—হামি ? শেঠজী বললেন, হামি শেঠ ঢুণ্ডুরাম আছি। কলকাতায় হামার দোকান আছেন—রাঁচিমে ভি আছেন। এখানে হামি এসেছেন জঙ্গল ইজারা লিবার জন্যে।

—ও—জঙ্গল—ইজারা লিবার জন্যে ? আমার হঠাৎ কেমন রসিকতা করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু জঙ্গলে বেশি ঘোরাফেরা করবেন না শেঠজী—এখানে আবার ভালুকের উৎপাত আছে।

—অ্যাঁ—ভালুক ! শেঠ ঢুণ্ডুরামের বিরাট ভুঁড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল : ভালুক মানুষকে কামড়াচ্ছেন ?

—খুব কামড়াচ্ছেন। পেলেই কামড়াচ্ছেন।

—অ্যাঁ।

আমি শেঠজীকে ভরসা দিয়ে বললুম : ভুঁড়ি দেখলে আরও জোর কামড়াচ্ছেন। মানে ভালুকেরা ভুঁড়ি কামড়াতে ভালোবাসেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—অ্যাঁ ! রাম-রাম !

শেঠজী হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন। অত বড় শরীর নিয়ে কেউ যে অমন জোরে লাফাতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না।

তারপর মন-চারেক ওজনের সিল্কের সেই প্রকাণ্ড বস্তাটা এক দৌড়ে গিয়ে মোটরে উঠল। উঠেই চেঁচিয়ে উঠল : এ ছগনলাল—আরে মোটরিয়া তো হাঁকাও। জলদি।

ভোঁপ—ভোঁপ ! চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই ঢুণ্ডুরামের নীল মোটর জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল ! আর পুরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি

পরমানন্দে হাসতে লাগলুম। বেড়ে রসিকতা হয়েছে একটা।

কিন্তু বেশিক্ষণ আমার মুখে হাসি রইল না। হঠাৎ ঠিক আমার পেছনে জঙ্গলের মধ্যে থেকে—

—হাল্লুম।

ভালুক নয়—ভালুকের বড়দা ! অর্থাৎ বাঘ ! রসিকতার ফল এমন যে হাতে-হাতে ফলে আগে কে জানত !

—বাপরে, গেছি !—বলে আমিও এক পেল্লায় লাফ ! শেঠজীর চাইতেও জোরে !

আর লাফ দিয়ে ঝপাং করে একেবারে নদীর কনকনে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে। পেছন থেকে সঙ্গে-সঙ্গে আবার জোর আওয়াজ : হাল্লুম !

১৩। বা ঘা কা ণ্ড

বাপ্‌স্—কী ঠাণ্ডা জল ! হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি লেগে গেল। আর স্রোতও তেমনি। পড়েছি হাঁটু জলে—কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় তিরিশ হাত দূরে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু জলসই না হলে যে বাঘসই—মানে, বাঘের জলযোগ হতে হবে এক্ষুনি ! আঁকুপাঁকু করে নদী পার হতে গিয়ে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম—খানিকটা জল ঢুকল নাক-মুখের মধ্যে। আর তক্ষুনি মনে হল, বাঘটা বুঝি এক্ষুনি পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে।

আর সেই মুহূর্তেই—

পেছন থেকে বাঘের গর্জন নয়—অট্টহাসি শোনা গেল।

বাঘ হাসছে। বাঘ কি কখনও হাসতে পারে ? চিড়িয়াখানায় আমি অনেক বাঘ দেখেছি। তারা হাম-হাম করে খায়, হুম-হুম করে ডাকে—নয় তো, ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। আমি অনেকদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছি বাঘের কখনও নাক ডাকে কি না। আর যদি ডাকেই, সেটা কেমন শোনায়। একদিন বাঘের হাঁচি শোনবার জন্যে এক ডিবে নস্যি বাঘের নাকে ছুঁড়ে দেব ভেবেছিলুম—কিন্তু আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা ডিবেটা কেড়ে নিয়ে আমার চাঁদির ওপর কটাৎ করে একটা গাঁট্টা মারল। কিন্তু বাঘের হাসি যে কোনও-দিন শুনতে পাওয়া যাবে—সে-কথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখব ভাবছি, সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা নুড়িতে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লুম। আবার সেই অট্টহাসি—আর কে যেন বললে —উঠে আয় প্যালা, খুব হয়েছে। এর পরে নির্ঘাত ডবল-নিউমোনিয়া হয়ে

মারা যাবি।

এ তো বাঘের গলা নয়!

আর কে? নির্ঘাত ক্যাবলা। পাশে টেনিদাও দাঁড়িয়ে। দু'জনে মিলে দন্তবিকাশ করে পরমানন্দে হাসছে—যেন পাশাপাশি একজোড়া শাঁকালুর দোকান খুলে বসেছে।

টেনিদা তার লম্বা নাকটাকে কুঁচকে বললে, পেছন থেকে একটা বাঘের ডাক ডাকলুম আর তাতেই অমন লাফিয়ে জলে পড়ে গেলি! ছোঃ-ছোঃ—তুই একটা কাপুরুষ!

অ! দুজনে মিলে বাঘের আওয়াজ করে আমার সঙ্গে বিটকেল রসিকতা হচ্ছিল! কী ছোটলোক দেখছ! মিছিমিছি ভিজিয়ে আমার ভূত করে দিলে—কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে সারা গায়ে!

রেগে আগুন হয়ে আমি নদী থেকে উঠে এলুম। বললুম, খামকা এরকম ইয়ার্কির মানে কী?

ক্যাবলা বললে, তোরই বা এসব ইয়ার্কির মানে কী? দিব্যি আমাদের পেছনে শামুকের মতো গুঁড়ি মেরে আসছিলি—তারপরই একেবারে নো-পাত্তা! যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলি। ওদিকে আমরা সারাদিন খুঁজে-খুঁজে হয়রান। শেষে দেখি—এখানে বসে মনের আনন্দে পাগলের মতো হাসা হচ্ছে। তাই তোর খরচায় আমরাও একটু হেসে নিলুম।

আমি বললুম, ইচ্ছে করে আমি হাওয়ায় মিলিয়েছিলুম নাকি? আমি তো পড়ে গিয়েছিলুম দস্যু ঘচাং ফুঃর গর্তে।

—দস্যু ঘচাং ফুঃ-র গর্তে। সে আবার কী?—ওরা দুজনেই হাঁ করে চেয়ে রইল।

—কিংবা ঘুটঘুটানন্দের গর্তেও বলতে পার।

—স্বামী ঘুটঘুটানন্দ। ক্যাবলা বারতিনেক খাবি খেল। টেনিদা তেমনি হাঁ করেই রইল—ঠিক একটা দাঁড়কাকের মতো।

—সেই সঙ্গে আছে গজেশ্বর গাড়ুই। সেই হাতির মতো লোকটা।

—অ্যাঁ!

—আর আছে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরগাড়ি।

—অ্যাঁ!

ওরা একদম বোকা হয়ে গেছে দেখে আমার ভারি মজা লাগছিল! ভাবলুম চ্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা করে গানটা আবার আরম্ভ করে দিই—কিন্তু পেটের মধ্যে থেকে গুরগুরিয়ে ঠাণ্ডা উঠছে—এখন গাইতে গেলে গলা দিয়ে কেবল গিটকিরি বেরুবে। বললুম, বাংলোয় আগে ফিরে চল—তারপরে সব বলছি।

সব শুনে ওরা তো বিশ্বাসই করতে চায় না। স্বামী ঘুটঘুটানন্দই হচ্ছে ঘচাং ফুঃ! সঙ্গে সেই গজেশ্বর গাড়ুই! তারা আবার পাহাড়ের গর্তের মধ্যে থাকে! যা-যাঃ! বাজে গল্প করবার আর জায়গা পাসনি।

টেনিদা বললে, নিশ্চয় জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে প্যালার পালাজ্বর এসেছিল। আর জ্বরের ঘোরে ওই সমস্ত উষ্টুম-ধুষ্টুম খেয়াল দেখেছিল।

আমি বললুম, বেশ, খেয়ালই সই! কাঁকড়াবিছের কামড়ের জেরটা মিটে যাক না আগে, তারপরে আসবে ওই গজেশ্বর গাড়ুই। তুমি আমাদের লিডার—তোমাকে ধরে ফাউল কাটলেট বানাবে।

ক্যাবলা বললে, ফাউল মানে হল মুরগি। টেনিদা মুরগি নয়—কারণ টেনিদার পাখা নেই; তবে পাঁঠা বলা যায় কি না জানিনে। মুশকিল হল, পাঁঠার আবার চারটে পা। আচ্ছা টেনিদা, তোমার হাত দুটোকে কি পা বলা যেতে পারে?

টেনিদা ক্যাবলাকে চাঁটি মারতে গেল। চাঁটিটা ক্যাবলার মাথায় লাগল না—লাগল চেয়ারের পিঠে। 'বাপ রে গেছি'—বলে টেনিদা নাচতে লাগল খানিকক্ষণ।

নাচ-টাচ থামলে বললে, তোদের মতো গোটাকয়েক গাড়লকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে! ওদিকে হতচ্ছাড়া হাবলাটা যে কোথায় বসে আছে তার পাত্তা নেই। আমি একা কতদূর আর সামলাব!

—আহা-হা—কত সামলাচ্ছ! ক্যাবলা বললে, তুম কেইসা লিডার—উ মালুম হো গিয়া! তোমাকে যে কে সামলায় তার ঠিক নেই।

টেনিদা আবার চাঁটি তুলছিল—চেয়ার থেকে চট করে সটকে গেল ক্যাবলা।

আমি রেগে বললুম, তোমরা এই করো বসে-বসে! ওদিকে গজেশ্বর ততক্ষণে হাবলাকে চপ করে ফেলুক!

ক্যাবলা বললে, মাটন চপ। হাবলাটা এক-নম্বরের ভেড়া! কিন্তু আপাতত ওঠা যাক টেনিদা। প্যালা সত্যি বলছে কি না একবার যাচাই করে দেখা যাক। চল প্যালা—কোথায় তোর ঘুটঘুটানন্দের গর্ত একবার দেখি। ওঠো টেনিদা—কুইক!

টেনিদা নাক চুলকে বললে, দাঁড়া, একবার ভেবে দেখ।

ক্যাবলা বললে, ভাববার আর কী আছে? রেডি—কুইক মার্চ। ওয়ান—টু—থ্রি—

টেনিদা কুইনিন-চিবানোর মতো মুখ করে বললে, মানে, আমি ভাবছিলুম—ঠিক এভাবে পাহাড়ের গুহায় ঢোকাটা কি ঠিক হবে? আমাদের তো দু'-এক গাছা লাঠি ছাড়া আর কিছু নেই—ওদের সঙ্গে হয়তো পিস্তল-বন্দুক আছে। তা ছাড়া ওদের দলে হয়তো অনেকগুলো গুণ্ডা—আমরা মোটে তিনজন—ঝাঁটুটাও বাজার করতে গেছে—

ক্যাবলা বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

—কী আর হবে টেনিদা? বড়জোর মেরে ফেলবে—এই তো? কিন্তু কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো মরে যাওয়া অনেক ভালো: নিজের বন্ধুকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে কতকগুলো গুণ্ডার ভয়ে আমরা পালিয়ে যাব টেনিদা? পটলডাঙার ছেলে হয়ে?

বললে বিশ্বাস করবে না—ক্যাবলার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে আমারও

যেন কেমন তেজ এসে গেল ! ঠিক কথা—করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা ! পালাজ্বরে ভুগে-ভুগে এমনভাবে নেংটি ইঁদুরের মতো বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না ! ছ্যা-ছ্যা ! আরে—একবার বই তো দু'বার মরব না !

তাকিয়ে দেখি, আমাদের সর্দার টেনিদাও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ভিতু মানুষটা নয়—গড়ের মাঠের গোরা পিটিয়ে যে চ্যাম্পিয়ন—এ সেই লোক। বাঘের মতো গলায় বললে, ঠিক বলেছিস ক্যাবলা—তুই আজকে আমার আক্কেল-দাঁত গজিয়ে দিয়েছিস ! একটা নয়—একজোড়া ! হয় হাবুল সেনকে উদ্ধার করে কলকাতায় ফিরে যাব, নইলে এ পোড়া প্রাণ রাখব না !

—হ্যাঁ, একে- বলে লিডার ! এই তো চাই !

তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম তিনজনে। ওদের দুটো লাঠি তো ছিলই। আমার সেই ভাঙা ডালটা কোথায় পড়ে গিয়েছিল, অগত্যা একটা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে চললুম।

এবার আর জায়গাটা চিনতে ভুল হল না। এই তো সেই কামরাঙা গাছ। এই তো সেই পাষণ্ড গোবরটা, যেটা আমাকে পিছলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু গর্তটা ? গর্তটা গেল কোথায় ?

গর্তের কোনও চিহ্নই নেই। খালি একরাশ ঝোপঝাড়।

ক্যাবলা বললে, কই রে—তোর সে গহ্বর গেল কোথায় ?

—তাই তো !—

টেনিদা বললে, আমি তক্ষুনি বলেছিলুম—প্যালা, জ্বরের ঘোরে তুই খোয়াব দেখেছিস। স্বামী ঘুটঘুটানন্দ হল কিনা দস্যু ঘচাং ফুঃ ! পাগল না প্যাঁজফুলুরি !

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। সত্যিই কি জ্বরের ঘোরে আমি খোয়াব দেখেছি ! তাহলে এখনও গায়ে টনটনে ব্যথা কেন ? ওই তো গোবরে আমার পা পেছলানোর দাগ। তাহলে ?

ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি ? পাখি ওড়ে,—রসগোল্লা উড়ে যায়, চপ-কাটলেট হাওয়া হয়—মানে পেটের মধ্যে ; কিন্তু অত বড় গর্তটা যে কখনও উড়ে যেতে পারে—সে তো কখনও শুনিনি !

টেনিদা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, তোর গর্ত আমাদের দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে—বুঝলি ? এই বলেই বীরদর্পে ঝোপের ওপর এক পদাঘাত।

আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপটায় যেন ভূমিকম্প জাগল। তার চাইতেও বেশি ভূমিকম্প জাগল টেনিদার গায়ে।—আরে আরে বলে চেঁচিয়ে উঠেই ঝোপঝাড়-সুদ্ধ টেনিদা মাটির তলায় অদৃশ্য হল। একেবারে সীতার পাতাল প্রবেশের মতো। তলা থেকে শব্দ উঠল—খচ্ খচ্, ধপাস !

ওগুলো তবে ঝোপ নয় ? গাছের ডাল কেটে গর্তের মুখটা ঢেকে রেখেছিল ?

আমি আর ক্যাবলা কিছুক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কী বলব—কী যে করব—কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

সেই মুহূর্তেই গর্তের ভেতর থেকে টেনিদার চিৎকার শোনা

গেল—ক্যাবলা—প্যালা—

আমরা চেঁচিয়ে জবাব দিলুম, খবর কী টেনিদা ?

—একটু লেগেছে, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তোরা শিগ্‌গির গর্তের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে ভেতরে নেমে আয়। ভীষণ ব্যাপার এখানে—লোমহর্ষণ কাণ্ড !

শুনে আমাদের লোম খাড়া হয়ে গেল। আমার মনে পড়ল করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা ! আমি তক্ষণাৎ গর্তের মুখে পা দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম—ক্যাবলাও আমার পেছনে।

১৪। হাবলু সেনের মৃতদেহ

আমি আর ক্যাবলা টপাটপ নীচে নেমে পড়লুম। নেমেই দেখি, কোথাও কিছু নেই। টেনিদা নয়—গজেশ্বর নয়—স্বামী ঘুটঘুটানন্দর ছেঁড়া দাড়ির টুকরোটুকুও নয়।

ব্যাপার কী ! ঘচাং ফুঃর দল টেনিদাকেও ভ্যানিশ করে দিয়েছে নাকি ?

ক্যাবলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, টেনিদা তো এখানেই এক্ষুনি পড়ল রে। গেল কোথায় ?

আমি এতক্ষণে কিন্তু আবছা আবছা আলোয় সাবধানে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কাঁকড়াবিছেটাকে খুঁজছিলুম। সেটা আশেপাশে কোথাও ল্যাজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি না কে জানে ! তার মোক্ষম ছোবল খেয়ে ওই গুণ্ডা গজেশ্বর কোনওমতে সামলেছে—কিন্তু আমাকে কামড়ালে আর দেখতে হচ্ছে না—পটলডাঙার পালাজ্বর-মার্কা প্যালারামের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

ক্যাবলা আমার মাথায় একটা থাবড়া মেরে বললে, এই টেনিদা গেল কোথায় ?

—আমি কেমন করে জানব !

ক্যাবলা নাক চুলকে বললে, বড়ী তাজ্জব কী বাত ! হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি ?

কিন্তু পটলডাঙার টেনিদা—আমাদের জাঁদরেল লিডার—এত সহজেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার পাত্র ? তৎক্ষণাৎ কোত্থেকে আবার টেনিদার অশরীরী চিৎকার : ক্যাবলা—প্যালা—চলে আয় শিগ্‌গির ! ভীষণ ব্যাপার !

যাব কোথায় ! কোন্‌খান থেকে ডাকছ ? এ যে সত্যিই ভুতুড়ে ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। আমার মাথার চুলগুলো সঙ্গে সঙ্গে কড়াং করে দাঁড়িয়ে উঠল।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে বললে, টেনিদা, তুমি কোথায় ? তোমার টিকির ডগাও যে দেখা যাচ্ছে না !

আবার কোথা থেকে টেনিদার অশরীরী স্বর : আমি একতলায়।

—একতলায় মানে ?

টেনিদা এবার দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কানা নাকি ? সামনের দেওয়ালে গর্ত দেখতে পাচ্ছিসনে ?

আরে—তাই তো ! এদিকের পাথরের দেওয়ালে একটা গর্তই তো বটে। কাছে এগিয়ে দেখি, তার সঙ্গে একটা মই লাগানো ভেতর থেকে। যাকে বলে, রহস্যের খাসমহল !

টেনিদা বললে, বেয়ে নেমে আয়। এখানে ভয়াবহ কাণ্ড—লোমহর্ষণ ব্যাপার !

অ্যাঁ !

ক্যাবলাই আগে মই বেয়ে নেমে গেল—পেছনে আমি। সত্যিই তো—একতলাই বটে। যেখানে নামলুম, সেটা একটা লম্বা হলঘরের মতো—কোত্থেকে আলো আসছে জানি না—কিন্তু বেশ পরিষ্কার। তার একদিকে একটা ইটের উনুন—গোটা-দু'তিন ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি—এক কোনায় একটা ছাইগাদা আর তার মাঝখানে—

টেনিদা হাঁ করে দাঁড়িয়ে। ওধারে হাবুল সেন পড়ে আছে—একেবারে ফ্ল্যাট।

টেনিদা হাবুলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই দ্যাখ !

ক্যাবলা বললে, হাবুল !

আমি বললাম, অমন করে আছে কেন ?

টেনিদার গলা কাঁপতে লাগল : নিশ্চয় ওকে খুন করে রেখে গেছে।

আমার যে কী হল জানি না। খালি মনে হতে লাগল, ভয়ে একটা কচ্ছপ হয়ে যাচ্ছি ! আমার হাত-পা একটু-একটু করে পেটের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে। আমার পিঠের ওপরে যেন শক্ত খোলা তৈরি হচ্ছে একটা। আর একটু পরে গুড়গুড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একেবারে জলের মধ্যে গিয়ে নামব।

আমি কোনওমতে বলতে পারলাম : ওটা হাবুল সেনের মৃতদেহ !

কথা নেই—বার্তা নেই—টেনিদা হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেললে : ওরে হাবলা রে। এ কী হল রে ! তুই হঠাৎ খামকা এমন করে বেঘোরে মারা গেলি কেন রে ! ওরে কলকাতায় গিয়ে তোর দিদিমাকে আমি কী বলে বোঝাব রে ! ওরে—কে আর আমাদের এমন করে আলুকাবলি আর ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়াবে রে !

ক্যাবলা বললে, আরে জী, রোও মৎ। আগে দ্যাখো—জিন্দা আছে কি মুর্দা হয়ে গেছে।

আমারও খুব কান্না পাচ্ছিল। হাবুল প্রায়ই ওর দিদিমার ভাঁড়ার লুঠ করে আমের আচার আর কুলচুর এনে আমায় খাওয়াত। সেই আমের আচারের কৃতজ্ঞতায় আমার বুকের ভেতরটা হায়-হায় করতে লাগল। আমি কোঁচা দিয়ে নাক-টাক মুছে ফেললুম। আমার আবার কী যে বিচ্ছিরি স্বভাব—কান্না পেলেই কেমন যেন সর্দি-উর্দি হয়ে যায়।

বারতিনেক নাক টেনে আমি বললুম, আলবত মরে গেছে ! নইলে অমন করে পড়ে থাকবে কেন ?

ক্যাবলাটার সাহস আছে—সে গুটি-গুটি এগিয়ে গিয়ে হাবুলের মৃতদেহের পেটে একটা খোঁচা মারল। আর, কী আশ্চর্য ব্যাপার—অমনি মৃতদেহ উঠে বসল ধড়মড়িয়ে।

—বাপ রে—ভূত হয়েছে ! বলেই আমি একটা লাফ মারলুম। আর লাফিয়ে উঠতেই টেনিদার খাঁড়ার মতো খাড়া নাকটার একটা ধাক্কা আমার মাথায়। কী শক্ত নাক—মনে হল যেন চাঁদিটা স্রেফ ফুটো হয়ে গেছে।—নাক গেল—নাক গেল—বলে টেনিদা একটা পেল্লায় হাঁক ছাড়ল, আর ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়লুম আমি।

আর তক্ষুনি দিব্বি ভালো মানুষের মতো গলায় হাবুল বললে, একহাঁড়ি রসগোল্লা খাইয়া খাসা ঘুমাইতে আছিলাম, দিলি ঘুমটার দফা সাইর‍্যা।

তখন আমার খটকা লাগল। ভূতেরা তো চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা বলে—এ তো বেশ ঝরঝরে বাংলা বলে যাচ্ছে। আর, পরিষ্কার ঢাকাই বাংলা !

টেনিদা খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে উঠল :

—আহা-হা—কী আমার রাজশয্যে পেয়েছেন রে—যে নবাবি চালে ঘুমোচ্ছেন ! ইদিকে তখন থেকে আমরা খুঁজে মরছি—হতচ্ছাড়ার আক্কেলটা দ্যাখো একবার।

হাবুল আয়েশ করে একটা হাই তুলে বললে, একহাঁড়ি রসগোল্লা সাঁইট্যা জব্বর ঘুমখানা আসছিল ! তা, গজাদা কই ? স্বামীজী কই গেলেন ?

টেনিদা বললে, ইস, বেজায় যে খাতির দেখছি। স্বামীজী—গজাদা !

হাবুল বললে, খাতির হইব না ক্যান ? কাইল বিকালে আইছি—সেই থিক্যা সমানে খাইত্যাছি। কী আদর-যত্ন করছে—মনে হইল য্যান ঠিক মামাবাড়ি আইছি। তা, তারা গেল কই ?

ক্যাবলা বললে, তারা গেল কই—সে আমরা কী করে জানব ? তা, তুই কী করে ওদের পাল্লায় পড়লি ? এখানে এলিই বা কী করে ?

—ক্যান আসুম না ? একটা লোক আইস্যা আমারে কইল, খোকা—এইখানে পাহাড়ের তলায় গুপ্তধন আছে। নিবা তো আইস। বড়লোক হওনের অ্যামন সুযোগটা ছাড়ুম ক্যান ? এইখানে চইল্যা আইছি। স্বামীজী—গজাদা—আমারে যে যত্ন করছে—কী কমু !

টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, হ, কী আর কবা ! এখানে বসে উনি রাজভোগ খাচ্ছেন, আর আমরা চোখে অন্ধকার দেখছি !

ক্যাবলা বললে, এ-সব কথা এখন থাক। এই গর্তের মধ্যে ওরা ক'জন থাকত রে ?

—জনচারেক হইব।

—কী করত ?

—কেমনে জানুম ? একটা কলের মতো আছিল—সেইটা দিয়া খুটুর-খুটুর কইরা কী য্যান ছাপাইত। সেই কলডাও তো দ্যাখতে আছি না। চইল্যা গেল নাকি ? আহা হা, বড় ভালো খাইতে আছিলাম রে !—হাবুলের বুক ভেঙে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরুল একটা।

—থাক তোর খাওয়া !—টেনিদা বললে, চল এবার বেরুনো যাক এখান থেকে। আমরা সময়মতো এসে পড়েছিলুম—নইলে খাইয়ে খাইয়েই তোকে মেরে ফেলত !

আমি বললুম, উঁহু, মোটা করে শেষে কাটলেট ভেজে খেত !

ক্যাবলা বললে, বাজে কথা বন্ধ কর। হ্যাঁ রে হাবুল—ওরা কী ছাপত রে ?

—ক্যামন কইরা কই ? ছবির মতো কী সব ছাপাইত।

—ছবির মতো কী সব ! ক্যাবলা নাক চুলকোতে লাগল : পাহাড়ের গর্তের মধ্যে চুপি চুপি। বাংলোতে লোক এলেই তাড়াতে চাইত। জঙ্গলের মধ্যে একটা নীল মোটর ! শেঠ ঢুণ্ডুরাম !

টেনিদা বললে, চুলোয় যাক শেঠ ঢুণ্ডুরাম ! হাবুলকে পাওয়া গেছে—আপদ মিটে গেছে। ওটা নয় হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা সাবড়েছে—কিন্তু আমাদের পেটে যে ছুঁচোর দল সংকীর্তন গাইছে রে ! চল বেরোই এখান থেকে—

আমি বললুম, আবার ওই মই বেয়ে ?

হাবুল বললে, মই ক্যান্ ? এইখান দিয়েই তো যাওনের রাস্তা আছে।

—কোন্ দিকে রাস্তা ?

—ওই তো সামনেই।

হাবুলই দেখিয়ে দিলে। হলঘরের মতো সুড়ঙ্গটা পেরুতেই দেখি, বাঃ ! একেবারে যে সামনেই পাহাড়ের একটা খোলা মুখ। আর কাছেই সেই নদীটা—সেই শালবন।

ক্যাবলা বললে, কী আশ্চর্য, তুই তো ইচ্ছে করলেই পালাতে পারতিস হাবলা।

হাবুল বললে, পালাইতে যামু ক্যান ? অমন আরামের খাওন-দাওন ! ভাবছিলাম—দুই-চাইরটা দিন থ্যাইকা স্বাস্থ্যটারে এইট্টু ভালো কইর‍্যা লই।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, ভালো কইরা ! হতচ্ছাড়া—পেটুকদাস। তোকে যদি গজেশ্বর কাটলেট বানিয়ে খেত, তাহলেই উচিত শিক্ষা হত তোর !

কিন্তু বলতে বলতেই—

হঠাৎ মোটরের গর্জন।

মোটর ! মোটর আবার কোত্থেকে ? আবার কি শেঠ ঢুণ্ডুরাম ?

হ্যাঁ—ঢুণ্ডুরামই বটে। সেই নীল মোটরটা। কিন্তু এদিকে আসছে না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমশ—তারপর পাতার আড়ালে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। যেন আমাদের ভয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাল ওটা।

আর আমি স্পষ্ট দেখলুম—সেই মোটরে কার যেন একমুঠো দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়। তামাক-খাওয়া লালচে পাকা দাড়ি।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি ?

১৫। ‘চিড়িয়া ভাগল বা’

দূরে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরটাকে চলে যেতে দেখেই ক্যাবলা বললে, চুকচুক-চ্চু !

টেনিদা জিজ্ঞেস করলে, কী হল রে ক্যাবলা ?

—কী আর হবে ? চিড়িয়া ভাগল বা।

—চিড়িয়া ভাগল বা মানে ?

আমি বললুম, বোধহয় চিঁড়ে-টিঁড়ের ভাগ হবে। চিঁড়ে কোথায় পেলি রে ক্যাবলা ? দে না চাট্টি খাই ! বড্ড খিদে পেয়েছে।

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, বহুৎ হুয়া, আর ওস্তাদি করতে হবে না। চিঁড়ে নয় রে বেকুব—চিঁড়ে নয়—চিড়িয়া ভাগল বা মানে হল, পাখি পালিয়েছে।

আমি বললুম, পাখি ? নাঃ—পালায়নি তো ! ওই তো দুটো কাক ওই গাছের ডালে বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, দুত্তোর ! এই প্যালাটার মগজে খালি বাসক পাতার রস আর শিঙিমাছ ছাড়া আর কিছু নেই। শেঠ ঢুণ্ডুরামের মোটরে করে সব পালাল দেখছিস না ? স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি দেখতে পাসনি ?

—পালিয়েছে তো হয়েছে কী ? টেনিদা বলল, আপদ গেছে।

হাবুল তখন দাঁড়িয়ে ঝিমুচ্ছিল। একহাঁড়ি রসগোল্লার নেশা ওর কাটেনি। হঠাৎ আলোর-খোঁচা-খাওয়া প্যাঁচার মতো চোখ মেলে বললে, আহা-হা, গজাদা চইল্যা গেল ? বড় ভালো লোক আছিল গজাদা।

ক্যাবলা বললে, তুই থাম হাবুল, বেশি বকিসনি ! গজাদা ভালো লোক ? ভালো লোকই তো বটে ! তাই তো বাংলো থেকে আমাদের তাড়াতে চায়—তাই পাহাড়ের গর্তের মধ্যে বসে কুটুর-কুটুর করে কী সব ছাপে ! আর শেঠ ঢুণ্ডুরাম কী মনে করে একটা নীল মোটর নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঘুরে বেড়ায় ?—ক্যাবলা পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়তে লাগল, হুঁ-হুঁ-হুঁ ! আমি বুঝতে পেরেছি।

টেনিদা বললে, খুব যে ডাঁটের মাথায় হুঁ-হুঁ করছিস। কী বুঝেছিস বল তো ?

ক্যাবলা সে কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ চোখ পাকিয়ে আমাদের সকলের দিকে তাকাল। তারপর গলাটা ভীষণ গম্ভীর করে বললে, আমাদের দলে কাপুরুষ কে কে ?

এমন করে বললে যে, আমার পালাজ্বরের পিলেটা একেবারে গুরগুর করে উঠল। একবার অঙ্কের পরীক্ষার দিনে পেট-ব্যথা হয়েছে বলে মটকা মেরে

পড়েছিলুম। মেজদা তখন ডাক্তারি পড়ে—আমার পেট-ব্যথা শুনে সে একটা আট হাত লম্বা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার পেটে ইনজেকশন দিতে এসেছিল, আর তক্ষুনি পেটের ব্যথা উর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পথ পায়নি। ক্যাবলার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল সেও যেন এইরকম একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমায় তাড়া করছে।

আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলুম—একমাত্র আমিই কাপুরুষ, কিন্তু সামলে গেলুম।

টেনিদা বললে, কাপুরুষ কে ? আমরা সবাই বীরপুরুষ।

—তাহলে চলো—যাওয়া যাক।

—কোথায় ?

—ওই নীল মোটরটাকে পাকড়াও করতে হবে।

বলে কী, পাগল না পাঁপড়-ভাজা। মাথা-খারাপ না পেট-খারাপ। মোটরটা কি ঘুটঘুটানন্দের লম্বা দাড়ি যে হাত বাড়িয়ে পাকড়াও করলেই হল।

হাবুল সেন বললে, পাকড়াও করবা কেমন কইর‍্যা ? উইর‍্যা যাবা নাকি ?

ক্যাবলা বললে, চল—বড় রাস্তায় যাই। ওখান দিয়ে অনেক লরি যাওয়া-আসা করে, তাদের কিছু পয়সা দিলেই আমাদের তুলে নেবে।

—আর ততক্ষণ নীল মোটরটা বুঝি দাঁড়িয়ে থাকবে ?

—নীল মোটর আর যাবে কোথায় বড়-জোর রামগড়। আমরা রামগড়ে গেলেই ওদের ধরতে পারব।

—যদি না পাই ? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—আবার ফিরে আসব।

—কিন্তু মিথ্যে এ-সব দৌড়ঝাঁপের মানে কী ? টেনিদা বললে, খামকা ওদের পিছু-পিছু ধাওয়া করেই বা লাভ কী হবে ? পালিয়েছে, আপদ গেছে। এবার বাংলোয় ফিরে প্রেমসে মুরগির ঠ্যাং চর্বণ করা যাবে। ও-সব বিচ্ছিরি হাসিটাসিও আর শুনতে হবে না রাত্তিরে।

ক্যাবলা বুক থাবড়ে বললে, কভি নেহি। আমাদের বোকা বানিয়ে ওর চলে যাবে—সারা পটলডাঙার যে বদনাম হবে তাতে। তারপর আর পটলডাঙায় থাকা যাবে না—সোজা গিয়ে আলু-পোস্তায় আস্তানা নিতে হবে। ও-সব চলবে না, দোস্ত। তোমরা সঙ্গে যেতে না চাও, না গেলে। কিন্তু আমি যাবই।

টেনিদা বললে, একা ?

—একা।

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল—আমরাও তা হলে বেরিয়ে পড়ি।

আমি শেষবারের মতো চাঁদির ওপরটা চুলকে নিলুম।

—কিন্তু ওদের সঙ্গে যে গজেশ্বর আছে। কাঁকড়াবিছের কামড়ে সেবার একটু জব্দ হয়েছিল বটে, কিন্তু আবার যদি হাতের মুঠোয় পায় তাহলে সকলকে কাটলেট বানিয়ে খাবে। পেঁয়াজ-চচ্চড়িও করতে পারে। কিংবা পোস্তর বড়া।

—কিংবা পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল।—ক্যাবলা তিনটে দাঁত বের করে

দিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই রকম ভেংচে দিলে : তাহলে তুই একাই থাক এখানে—আমরা চললুম।

পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলকে অপমান করলে আমার ভীষণ রাগ হয়। পটোল নিয়ে ইয়ার্কি নয়, হুঁ-হুঁ। আমাদের পাড়া হচ্ছে কলকাতার সেরা পাড়া—তার নাম পটলডাঙা। মানুষ মরে গেলে তাকে পটল তোলা বলে। আমার এক মাসতুতো ভাই আছে—তার নাম পটল ; সে একসঙ্গে দেড়শো আলুর চপ আর দুশো বেগুনি খেতে পারে ! ছোড়দির একটা পাঁঠা ছিল—সেটার নাম পটল—সে মেজদার একটা শখের শাদা নাগরাকে সাত মিনিট তেরো সেকেন্ডের মধ্যে খেয়ে ফেলেছিল—ঘড়ি ধরে মিলিয়ে দেখেছিলুম আমি। আর, শিঙিমাছের কথা কে না জানে। আর কোন্ মাছের শিং আছে ? মতান্তরে ওকে সিংহমাছও বলা যায়—মাছেদের রাজ্যে ও হল সিংহ। আর তোরা কী খাস বল। আলু, পোনামাছ। আলু শুনলেই মনে পড়ে আলু প্রত্যয়। সেইসঙ্গে পণ্ডিতমশায়ের বিচ্ছিরি গাঁট্টা। আর পোনা ! ছোঃ ! লোকে কথায় বলে—ছানাপোনা—পুঁচকে এত্তোটুকু। কোথায় সিংহ, আর কোথায় পোনা ! কোনও তুলনা হয়। রামচন্দ্র !

আমি যখন এইসব তত্ত্বকথা ভাবছি, আর ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় আমার কান কটকট করছে, তখন হঠাৎ দেখি ওরা দল বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে আমাকে ফেলেই।

অগত্যা পটোল আর শিঙিমাছের ভাবনা থামিয়ে আমাকে ওদেরই পিছু-পিছু ছুটতে হল।

বড় রাস্তাটা আমাদের বাংলো থেকে মাইল-দেড়েক দূরে। যেতে-যেতে কাঁচা রাস্তায় আমরা মোটরের চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছিলুম। এক জায়গায় দেখলুম একটা শালপাতার ঠোঙা পড়ে রয়েছে। নতুন—টাটকা শালপাতার ঠোঙা। কেমন কৌতূহল হল—ওরা দেখতে না পায় এমনিভাবে চট করে তুলে নিয়ে শুঁকে ফেললুম। ইঃ—নির্ঘাত সিঙাড়া ! এখনও তার খোশবু বেরুচ্ছে !

কী ছোটলোক ! সবগুলো খেয়ে গেছে। এক-আধটা রেখে গেলে কী এমন ক্ষেতিটা ছিল।

—এই প্যালা—মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লি ক্যান র‍্যা ?—টেনিদার হাঁক শোনা গেল।

এমনিতেই খিদে পেয়েছে—ঘ্রাণে অর্ধভোজন হচ্ছিল, সেটা ওদের সইল না। চটপট ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে আবার আমি ওদের পিছু-পিছু হাঁটতে লাগলুম। ভারি মন খারাপ হয়ে গেল। ঠোঙাটা আরও একটু শোঁকবার একটা গভীর বাসনা আমার ছিল।

বড় রাস্তায় যখন এসে পড়েছি—তখন, ভোঁক-ভোঁক। একটা লরি।

আমি হাত তুলে বলতে যাচ্ছিলুম—রোখ্‌কে—রোখ্‌কে—কিন্তু ক্যাবলা আমার হাত চেপে ধরলে। বললে, কী যে করিস গাড়লের মতো তার ঠিক নেই ! ওটা তো রামগড় থেকে আসছে !

—ওরা তো উল্টোদিকেও যেতে পারে !

—তুই একটা ছাগল ! দেখছিস না কাঁচা রাস্তার ওপর ওদের মোটরের চাকা কীভাবে বাঁক নিয়েছে ! অর্থাৎ ওরা নির্ঘাত রামগড়ের দিকেই গেছে। উল্টোদিকে হাজারিবাগ—সেদিকে যায়নি।

ইস—ক্যাবলার কী বুদ্ধি ! এই বুদ্ধির জন্যেই ও ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়—আর আমার কপালে জোটে লাড্ডু ! তাও অঙ্কের খাতায়। আমার মনে হল, লাড্ডু কিংবা গোল্লা দেবার ব্যবস্থাটা আরও নগদ করা ভালো। খাতায় পেনসিল দিয়ে গোল্লা বসিয়ে কী লাভ হয় ? যে গোল্লা খায় তাকে একভাঁড় রসগোল্লা দিলেই হয় ! কিংবা গোটা-আষ্টেক বড়বাজারের লাড্ডু ! কিন্তু তিলের নাড়ু নয়—একবার একটা খেয়ে সাতদিন আমার দাঁত ব্যথা করেছিল।

—ঘর্‌র্‌—ঘ্যাঁস !

পাশে একটা লরি এসে থামল। কাঠ-বোঝাই। ক্যাবলা হাত তুলে সেটাকে থামিয়েছে। লরি-ড্রাইভার গলা বের করে বললে, কী হয়েছে খোকাবাবু ! তুমরা ইখানে কী করছেন ?

—আমাদের একটু রামগড়ে পৌঁছে দিতে হবে ড্রাইভার সাহেব।

—পয়সা দিতে হবে যে ! চার আনা।

—তাই দেব।

—তবে উঠে পড়ো। লেকিন কাঠকে উপর বসতে হোবে।

—ঠিক আছে। কাঠে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না।

ক্যাবলা আমাদের তাড়া দিয়ে বললে, টেনিদা—ওঠো ! হাবলা—আর দেরি করিসনি। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন প্যালা ? উঠে পড় শিগগির—

ওরা তো উঠল। কিন্তু আমার ওঠা কি অত সহজ ? টেনে-হিঁচড়ে কোনমতে যখন লরির ওপরে উঠে কাঠের আসনে গদিয়ান হলুম—তখন আমার পেটের খানিক নুন-ছাল উঠে গেছে। সারা গা চিড়-চিড় করে জ্বলছে।

আর তক্ষুনি—

ভোঁক-ভোঁক করে আরও গোটা-দুই হাঁক ছেড়ে গাড়ি ছুটল রামগড়ের রাস্তায়। এঃ—কী যাচ্ছেতাই ভাবে নড়ছে যে কাঠগুলো। কখন ধপাস করে উলটে পড়ে যাই—তার ঠিক নেই ! আমি সোজা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দু'হাতে মোটা কাঠের গুঁড়িটা জাপটে ধরলুম।

লরিটা পাঁই-পাঁই করে ছুটতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, পেল্লায় ঝাঁকুনির চোটে আমার পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো সব একসঙ্গে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছে।

১৬। 'মো ক্ষ ম লা ড্ডু'

কাঠের লরির সে কী দৌড় ! একে তো হইহই করে ছুটছে, তায় ভেতরের কাঠগুলো যেন হাত-পা তুলে নাচতে শুরু করেছে। যদিও মোটা দড়ি দিয়ে কাঠগুলো বেশ শক্ত করে বাঁধা, তবু মনে হচ্ছিল কখন যেন আমাদের নিয়ে ওরা চারদিকে ছিটকে পড়ে যাবে।

জাম-ঝাঁকানো দেখেছ কখনও ? সেই যে দুটো বাটির মধ্যে পুরে ঝকর-ঝকর করে ঝাঁকায়—আর জামের আঁটি-টাটিগুলো সব আলাদা হয়ে যায় ? ঠিক তেমনি করে আমার জ্বরের পিলে-টিলে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল। আমার সন্দেহ হতে লাগল, আর কিছুক্ষণ পরে আমি আর পটলডাঙার প্যালারাম থাকব না—একেবারে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকচ্ছপ হয়ে যাব। মানে, সব মিলিয়ে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাব।

এর মধ্যে—ঝড়াৎ—ঝড়াৎ ! নাকের ওপর দিয়ে কে যেন চাবুক হাঁকড়ে দিলে ! একটা গাছের ডাল।

টেনিদা বললে, ইঃ—হতভাগা ক্যাবলার্ বুদ্ধিতে পড়েই আজ মাঠে মারা যাব !

ক্যাবলা ইস্টুপিডটা এর মধ্যেও রসিকতার চেষ্টা করলে : মাঠে নয়—রাস্তায়। রামগড়ের রাস্তায়।

—রাস্তায় ! টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, দাঁড়া না একবার, রামগড় পৌঁছে যাই। তারপর—

তারপর বললে—কোঁৎ।

মানে, ক্যাবলাকে কোঁৎ করে গিলে খাবে তা বললে না। একটা মোক্ষম ঝাঁকুনি খেয়ে ওটা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

হাবুল সেন ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল : ইস, কর্ম তো সারছে। প্যাটের মধ্যে গজাদার রসগোল্লা যে ছানা হইয়া গেল !

আমি বললুম, শুধু ছানা ? এর পরে দুধ হয়ে যাবে।

টেনিদা শুরু করলে : দুধ ? দুধেও কুলোবে না। একটু পরে পেট ফুঁড়ে শিং-টিং সুদ্ধু একটা গোরুও বেরিয়ে আসছে—দেখে নিস।

হাবুল আবার ঘ্যানঘ্যান করে বললে, হঃ—সত্য কইছ। প্যাট ফুইড়্যা গোরুই বাহির হইব অখনে।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে গান ধরলে, প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ !

টেনিদা রেগেমেগে কী একটা বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার সেই পেল্লায় ঝাঁকুনি। টেনিদা সংক্ষেপে বললে, ঘোঁ-ঘোঁ ঘোৎ।

কিন্তু সব দুঃখেরই শেষ আছে। শেষ পর্যন্ত লরি রামগড়ের বাজারে এসে পৌঁছুল।

গাড়িটা এখন একটু আস্তে আস্তে যাচ্ছে—আমরা চারজন কোনওমতে কাঠের ওপর উঠে বসেছি। হঠাৎ—

—আরে ভগলু, দেখ্ ভাইয়া! লরিকা উপর চার লেড়কা বান্দরকা মাফিক বৈঠল বা!

তিনটে কালো-কালো ছোকরা। আমাদের দেখে দাঁত বের করে হাসছে।

আমি ভীষণ রেগে বললুম, তুম্‌লোগ্ বান্দর হো! তুম্‌লোগ্ বুদ্ধু হো!

শুনে একজন অমনি বোঁ করে একটা ঢিল চালিয়ে দিলে—একটুর জন্যে আমার কানে লাগল না। আমাদের লরির ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল, মারকে টিক্কি উখাড় দেব—হঁ!

ছোকরাগুলোর অবশ্য টিকি ছিল না, তবু দাঁত বের করে ভেংচি কাটতে কাটতে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল।

লরিটা আর-একটু এগোতেই ক্যাবলা বললে,—টেনিদা কুইক। ওই যে নীল মোটর!

তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো! আমাদের থেকে বেশ খানিকটা আগে একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল রঙের মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমার বুকের ভেতর ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। আবার সেই গজেশ্বর! সেই ষণ্ডা জোয়ান ভয়ঙ্কর লোকটা! এর চাইতে লরির ওপরে কচ্ছপরাম হয়ে থাকলেই ভালো হত—অনেক বেশি আরাম পাওয়া যেত।

কিন্তু ক্যাবলা ছাড়বার পাত্র নয়। টেনে নামাল শেষ পর্যন্ত।

—শোন্ প্যালা! তুই আর হাবলা এই পিপুল গাছটার তলায় বসে থাক। বসে-বসে ওই নীল মোটরটাকে ওয়াচ কর। আমরা ততক্ষণে একটা কাজ সেরে আসি।

লরিটা ভাড়া বুঝে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কাছে থাকলে আমি আবার তড়াক করে ওটার ওপরে উঠে বসতুম—তারপর যেদিকে হোক সরে পড়তুম। কিন্তু এ কী গেরো রে বাপু! এই পিপুল গাছতলায় বসে ওয়াচ করতে থাকি, আর এর মধ্যে গজেশ্বর এসে ক্যাঁক করে আমার ঘাড় চেপে ধরুক।

আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাই না! হাবুল এখানে একাই সব ম্যানেজ করতে পারবে।

ক্যাবলা বললে, বেশি ওস্তাদি করিসনি। যা বললুম তাই কর—বসে থাক ওখানে। গাড়িটার ওপরে বেশ করে লক্ষ রাখিস। আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরব। এসো টেনিদা—

এই বলে, পাশের একটা রাস্তা দিয়ে ওরা টুক করে যেন কোন্ দিকে চলে গেল।

আমি বললুম, হাবলা।

—উঁ?

—দেখলি কাণ্ডটা?

হাবলা তখন পিপুল গাছের গোড়ায় বসে পড়েছে। মস্ত একটা হাই তুলে বললে: হঃ সইত্য কইছ।

—এভাবে বোকার মতো এখানে বসে থাকবার কোনও মানে হয়?

হাবুল আর-একটা হাই তুলে বললে, নাঃ। তার চাইতে ঘুমানো ভালো। আমার কাঁচা ঘুমটা তোরা মাটি কইর‍্যা দিছস—তার উপর লরির ঝাঁকানি।—ইস—শরীরটা ম্যাজম্যাজ করতে আছে।

এই বলেই হাবুল পিপুল গাছটায় ঠেসান দিলে। আর তখুনি চোখ বুজল। বললে বিশ্বাস করবে না—আরও একটু পরে ফরর্ ফোঁ-ফোঁ করে হাবুলের নাক ডাকতে লাগল।

কাণ্ডটা দ্যাখো একবার।

আমি ডাকলুম, হাবলা—হাবলা—

নাকের ডাক নামিয়ে হাবুল বললে, উঁ?

—এই দিন-দুপুরে গাছতলায় বসে ঘুমুচ্ছিস কী বলে?

হাবুল ব্যাজার হয়ে বললে, বেশি চিল্লাচিল্লি করবি না প্যালা—কইয়া দিলাম। শান্তিতে একটু ঘুমাইতে দে। সঙ্গে-সঙ্গেই পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর নাকের ভেতর থেকে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে শব্দ হতে লাগল—যেন ঝাঁক বেঁধে চড়ুই উড়ে যাচ্ছে।

কী ছোটলোক—কী ভীষণ ছোটলোক! এখন আমি একা বসে ঠায় পাহারা দিই। কী যে রাগ হল বলবার নয়। ইচ্ছে করতে লাগল ওর কানে কটাং করে একটা চিমটি দিই। কিন্তু তক্ষুনি দেখলুম, তার চাইতেও ভালো জিনিস আছে। বেশ মোটা-মোটা একদল লাল পিঁপড়ে যাচ্ছে মার্চ করে। ওদের গোটাকয়েক ধরে ক্যাবলার নাকের ওপর ছেড়ে দিলে কেমন হয়?

একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে লাল পিঁপড়ে ধরতে যাচ্ছি, হঠাৎ—

—আরে খোঁকা—তুমি এহিখানে?

তাকিয়ে দেখি, শেঠ ঢুণ্ডুরাম!

ভয়ে আমার পেটের মধ্যে এক ডজন পটোল আর দু'ডজন শিঙিমাছ একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল। আমি একটা মস্ত হাঁ করলুম, শুধু বললুম—আ—আ—আ—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম হাসলেন: রামগড়ে বেড়াইতে এসেছ? তা বেশ, বেশ। কিন্তু এহিখানে গাছের তলায় বসিয়ে কেনো? লেকিন মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার বহুৎ খিদে পেয়েছে।

খিদে? বলে কী? সেই শালপাতার ঠোঙাটা শোঁকার পর থেকে আমার সমস্ত মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে—আকাশ খাই, পাতাল খাই। এমন অবস্থা হয়েছে যে শেঠ ঢুণ্ডুরামের ভুঁড়িটাতেই হয়তো কড়াৎ করে কামড় বসিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সে কথা কি আর বলা যায়?

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে খিদে পেয়েছে—তাতে লজ্জা কী? আইসো হামার সঙ্গে। ওই দোকানে বহুৎ আচ্ছা লাড্ডু মিলে—গরমাগরম সিঙাড়া ভি আছে।

খাবে ? হামি খিলাবো—তোমাকে পয়সা দিতে হোবে ন্য।

এই পটলডাঙার প্যালারামকে বাঘ-বালুক কায়দা করতে পারে না—টেনিদার গাঁট্টা দেখেও সে বুক টান করে দাঁড়িয়ে থাকে, অঙ্কে গোল্লা খেলেও তার মন-মেজাজ বিগড়ে যায় না। কিন্তু খাবারের নাম করেছ কি, এমন দুর্ধর্ষ প্যালারাম একেবারে বিধ্বস্ত।

আমি আমতা আমতা করে বললুম—লেকিন শেঠজী, গজেশ্বর—

ঢুণ্ডুরাম চোখ কপালে তুলে বললেন, গজেশ্বর ? কোন্ গজেশ্বর ?

আমি বললুম, সেই যে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান—হাতির মতো চেহারা—আপনার গাড়িতে এসেছে—

ঢুণ্ডুরাম বললেন, রাম—রাম—সীতারাম। আমি কোনও গজেশ্বরকে জানে না। হামার গাড়িতে হামি ছাড়া আর কেউ আসেনি।

—তবে যে স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি—

ঘুটঘুটানন্দ ? ঢুণ্ডুরাম ভেবে-চিন্তে বললেন, হাঁ—হাঁ একঠো বুড়্ঢা রাস্তায় হামার গাড়িতে উঠেছিল বটে। হামাকে বললে, শেঠজী, রামগড় বাজারে আমি নামবে। হামি তাকে নামাইয়ে দিলম। সে ইস্টেশনের দিকে চলিয়ে গেল।

এর পরে আর অবিশ্বাসের কী থাকতে পারে ?

ঢুণ্ডুরাম বললে, আইসো খোকা—আইসো। ভালো লাড্ডু আছে—গরম সিঙাড়া ভি আছে—

আর থাকা গেল না। পটলডাঙার প্যালারাম কাত হয়ে গেল। হাবলা তখনও নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে আর ওর নাকের ভেতর থেকে সমানে চড়ুই পাখি উড়ছে। একবার মনে হল ওকে জাগাই—তারপরেই ভাবলুম : না—থাক পড়ে। আমি একাই গুটি-গুটি ঢুণ্ডুরামের সঙ্গে গেলাম।

মস্ত খাবারের দোকান। থরে-থরে লাড্ডু আর মোতিচুর সাজানো। প্রকাণ্ড কড়াইয়ে গরম সিঙাড়া ভাজা হচ্ছে। গন্ধেই প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়!

শেঠজী বললেন, আইসো খোকা—ভিতরে আইসো।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, গজেশ্বর কিংবা ঘুটঘুটানন্দের টিকির ডগাটিও কোথাও নেই।

ঢুকে তো পড়ি।

দোকানের ভেতরে একটা ছোট্ট খাবারের ঘর। বসেই শেঠজী ফরমাস করলেন, স্পেশাল এক ডজন লাড্ডু আর ছ-ঠো সিঙাড়া—

আমি বিনয় করে বললুম, আবার অত কেন শেঠজী ?

ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে বাচ্চা খাও না! বহুৎ বড়িয়া চিজ আছে।

শালপাতায় করে বড়িয়া চিজ এল। একটা লাড্ডু খেয়ে দেখি—যেন অমৃত! সিঙাড়া তো নয়—যেন কচি পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল। আর বলতে হল না, আমি কাজে লেগে গেলুম।

গোটা চারেক লাড্ডু আর গোটা দুই সিঙাড়া খেয়েছি—এমন সময় হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠল। তারপর চোখে অন্ধকার দেখলুম। তারপর—

স্পষ্ট শুনলুম—গজেশ্বরের অট্টহাসি!

—পেয়েছি এটাকে। এক নম্বরের বিচ্ছু। আজই এটাকে আমি আলু-কাবলি বানিয়ে খাব।

ব্যস—দুনিয়া একেবারে অথই অন্ধকার। আমি চেয়ার-টেয়ারসুদ্ধু হুড়মুড় করে মাটিতে উলটে পড়ে গেলুম।

১৭। 'খেল খতম।'

চটকা ভাঙতেই মনে হল, এ কোথায় এলুম ?

কোথায় ঝণ্টিপাহাড়ের বাংলো—কোথায় রামগড়—কোথায় কী ? চারিদিকে তাকিয়ে নিজের চোখকেই ভালো করে বিশ্বাস হল না।

দেখলুম মস্ত একটা পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছি। ঠিক চূড়ায় নয়, তা থেকে একটু নীচে। আর চূড়ার মুখে একটা উনুনের মতো—তা থেকে লক-লক করে আগুন বেরুচ্ছে।

ভূগোলের বইয়ে পড়েছি...সিনেমার ছবিতেও দেখেছি। ঠিক চিনতে পারলুম আমি। বলে ফেললুম, এটা নিশ্চয় আগ্নেয়গিরি!

যেই বলা, সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন হা-হা করে হেসে উঠল। সে কী হাসি! তার শব্দে পাহাড়টা থর-থর করে কেঁপে উঠল—আর আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে একটা প্রকাণ্ড আগুনের শিখা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে।

চেয়ে দেখি—একটু দূরে বসে তিনটে লোক হেসে লুটোপুটি। একজন শেঠ ঢুণ্ডুরাম—হাসির তালে-তালে শেঠজীর ভুঁড়িটা ঢেউয়ের মতো দুলে-দুলে উঠছে। তাঁর পাশেই বসে আছেন স্বামী ঘুটঘুটানন্দ—হাসতে হাসতে নিজের দাড়ি ধরেই টানাটানি করছেন। আর পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মতো গজেশ্বর আকাশ-জোড়া হাঁ মেলে অট্টহাসি হাসছে।

ওদের তিনজনকে দেখেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। পেটের পিলেতে একেবারে ভূমিকম্প জেগে উঠল।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, এত হাসছ কেন তোমরা ? হাসির কী হয়েছে ?

শুনে আবার একপ্রস্থ হাসি। আর গজেশ্বর পেটে হাত দিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ল।

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হোঃ—হোঃ! আগ্নেয়গিরিই হচ্ছেন বটে। এইটা কোন্ আগ্নেয়গিরি জানো খোঁকা ?

—কী করে জানব ? এর আগে তো কখনও দেখিনি।

—এইটা হচ্ছেন ভিসুভিয়াস।

—ভিসুভিয়াস? —শুনে আমার চোখ কপালে উঠল। ছিলুম রামগড়ে, সেখান থেকে ভিসুভিয়াস যে এত কাছে এ খবর তো আমার জানা ছিল না!

আমি বললুম, ভিসুভিয়াস তো জার্মানিতে! না কি, আফ্রিকায়?

শুনে গজেশ্বর চোখ পাকিয়ে এক বিকট ভেংচি কাটল।

—ফুঃ, বিদ্যের নমুনাটা দ্যাখো একবার। এই বুদ্ধি নিয়েই উনি স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করবেন। ভিসুভিয়াস জার্মানিতে—ভিসুভিয়াস আফ্রিকায়। ছোঃ ছোঃ!

আমি নাক চুলকে বললুম তাহলে বোধহয় আমেরিকায়?

শুনে গজেশ্বর বললে, এঃ, এর মগজে গোবরও নেই—একদম খটখটে ঘুঁটে! সাধে কি পরীক্ষায় গোল্লা খায়। ভিসুভিয়াস তো ইটালিতে।

ওহো—তাও হতে পারে। তা, ইটালি আর আমেরিকা একই কথা।

—একই কথা? গজেশ্বর বললে, তোমার মুখ আর ঠ্যাং একই কথা? পাঁঠার কালিয়া আর পলতার বড়া একই কথা?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ বললেন, ওর কথা ছেড়ে দাও। ওর পা-ও যা মুণ্ডুও তাই। সে মুণ্ডুতে কিছু নেই—স্রেফ কচি পটোল আর শিঙিমাছের ঝোল।

শিঙিমাছ আর পটোলের বদনাম করলে আমার ভীষণ রাগ হয়। আমি চটে বললুম, থাকুক যে, তাতে তোমাদের কী? কিন্তু কথা হচ্ছে—রামগড় থেকে আমি ইটালিতে চলে এলুম কী করে? কখনই বা এলুম? টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা এরাই বা সব গেল কোথায়? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।

—পাবেও না—গজেশ্বর মিটিমিটি হাসল : তারা সব হজম।

—হজম। তার মানে?

—মানে? পেটের মধ্যে, খেয়ে ফেলেছি।

—খেয়ে ফেলেছ। আমার পেটের পিলেটা একেবারে গলা-বরাবর হাইজাম্প মারল : সে কী কথা।

আবার তিনজনে মিলে বিকট অট্টহাসি। সে-হাসির শব্দে ভিসুভিয়াসের চূড়ার ওপর লকলকে আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। আমি দু'হাতে কান চেপে ধরলুম।

হাসি থামলে স্বামী ঘুটঘুটানন্দ বললেন, বাপু হে, আমাদের সঙ্গে চালাকি! পুঁটিমাছ হয়ে লড়াই করতে এসেছ হুলো বেড়ালের সঙ্গে! পাঁঠা হয়ে ল্যাং মারতে গেছ রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে! যোগবলে চারটেকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে এসেছি! আর তারপরে—

শেঠজী বললেন, হাবুলকে রোস্ট পাকিয়েছি—

গজেশ্বর বললে, তোমাদের লিডার টেনিকে কাটলেট বানিয়েছি—

স্বামীজী বললেন, ওই ফরফরে ছোকরা ক্যাবলাকে ফ্রাই করেছি—

শেঠজী বললেন, তারপর খেয়ে লিয়েছি।

আমার ঝাঁটার মতো চুল ব্রহ্মতালুর ওপরে কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল।

বারকয়েক খাবি খেয়ে বললুম, অ্যাঁ!

স্বামীজী বললেন, এবার তোমার পালা।

—অ্যাঁ!

—আর অ্যাঁ অ্যাঁ করতে হবে না, টের পাবে এখুনি।—স্বামীজী ডাকলেন, গজেশ্বর!

গজেশ্বর হাতজোড় করে বললে, জী মহারাজ!

—কড়াই চাপাও।

বলতে বলতে দেখি কোত্থেকে একটা কড়াই তুলে ধরেছে গজেশ্বর। সে কী কড়াই! একটা নৌকোর মতো দেখতে। তার ভেতরে শুধু আমি কেন, আমাদের চার মূর্তিকেই একসঙ্গে ঘণ্ট বানিয়ে ফেলা যায়।

—উনুনে কড়াই বসাও, ঘুটঘুটানন্দ আবার হুকুম করলেন। গজেশ্বর তক্ষুনি সোজা গিয়ে উঠল ভিসুভিয়াসের চূড়ায়। তারপর ঠিক উনুনে যেমনি করে বসায়, তেমনি করে কড়াইটা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর চাপিয়ে দিলে।

স্বামীজী বললেন, তেল আছে তো?

গজেশ্বর বললে, জী মহারাজ।

—খাঁটি তেল?

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হামার নিজের ঘানির তেল আছে মহারাজ। একদম খাঁটি। থোরাসে ভি ভেজাল নেহি।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ দাড়ি চুমরে বললেন, তবে ঠিক আছে। ভেজাল তেল খেয়ে ঠিক জুত হয় না—কেমন যেন অম্বল হয়ে যায়।

আমি আর থাকতে পারলুম না। হাউমাউ করে বললুম, খাঁটি তেল দিয়ে কী হবে?

—তোমাকে ভাজব। গজেশ্বর গাড়ুইয়ের জবাব এল।

স্বামীজী বললেন, তারপর গরম গরম মুড়ি দিয়ে—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, কুড়মুড় করে খাইয়ে লিব।

পটলডাঙার প্যালারাম তাহলে গেল! চিরকালের মতোই বারোটা বেজে গেল তার। শেয়ালদার বাজারে আর কেউ তার জন্যে কচি পটোল কিনবে না—শিঙিমাছও না। এই তিন-তিনটে রাক্ষসের পেটে গিয়ে সে বিলকুল বেমালুম হজম হয়ে যাবে!

তখন হঠাৎ আমার মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। কেমন স্বর্গীয় স্বর্গীয় মনের ভাব এসে দেখা দিলে। ব্যাপারটা কী রকম জানো? মনে করো, তুমি অঙ্কের পরীক্ষা দিতে বসেছ। দেখলে, একটা অঙ্কও তোমার দ্বারা হবে না—মানে তোমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না। তখন প্রথমটায় খানিক দরদরিয়ে ঘাম বেরুল, মাথাটা গরম হয়ে গেল, কানের ভেতর ঝিঁঝি পোকা ডাকতে লাগল আর নাকের ওপরে যেন ফড়িং এসে ফড়াং ফড়াং করে উড়তে লাগল! তারপর আস্তে আস্তে প্রাণে একটা গভীর শান্তির ভাব এসে গেল। বেশ মন দিয়ে তুমি খাতায় একটা

নারকোল গাছ আঁকতে শুরু করে দিলে। তার পেছনে পাহাড়—তার ওপর চাঁদ—অনেকগুলো পাখি উড়ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে সব আশা ছেড়ে দিয়ে তুমি তখন আর্টিস্ট হয়ে উঠলে।

এখানেও যখন দেখছি প্রাণের আশা আর নেই—তখন আমার ভারি গান পেলে। মনে হল, আশ মিটিয়ে একবার গান গেয়ে নিই। বাড়িতে কখনও গাইতে পাইনে—মেজদা তার মোটা-মোটা ডাক্তারি বই নিয়ে তাড়া করে আসে। চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে দু'চারদিন গাইতে চেয়েছি—টেনিদা আমার চাঁদিতে চাঁটি বসিয়ে তক্ষুনি থামিয়ে দিয়েছে। এখানে একবার শেষ গান গেয়ে নেব। এর আগে কখনও গাইতে পাইনি—এর পরেও তো আর কখনও সুযোগ পাব না।

বললুম, প্রভু, স্বামীজী!

স্বামীজী বললেন, কী চাই বলো? কী হলে তুমি খুশি হও: তোমায় বেসম দিয়ে ভাজব—না এমনি নুন-হলুদ মাখিয়ে?

আমি বললুম, যেভাবে খুশি ভাজুন—আমার কোনও আপত্তি নেই। কেবল একটা নিবেদন আছে। একটুখানি গান গাইতে চাই। মরবার আগে শেষ গান।

গজেশ্বর গাঁ-গাঁ করে বললে, সেটা মন্দ হবে না প্রভু। খাওয়া-দাওয়ার আগে এক-আধটু গান-বাজনা হলে মন্দ হয় না। আফ্রিকার লোকেও মানুষ পুড়িয়ে খাওয়ার আগে বেশ নেচে নেয়। লাগাও হে ছোকরা—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হাঁ হাঁ—প্রেমসে একঠো আচ্ছা গানা লগা দেও—

আমি চোখ বুজে গান ধরে দিলুম:

'একদা এক নেকড়ে বাঘের গলায়
মস্ত একটি হাড় ফুটিল—
বাঘ বিস্তর চেষ্টা করিল—
হাড়টি বাহির না হইল।'

শেঠজী বিরক্ত হয়ে বললেন, ই কী হচ্ছেন? ই তো কথামালার গল্প আছেন। স্বামীজী বললেন, না হে—এতেও বেশ ভাব আছে। আহা-হা—কী সুর, কী প্যাঁচামার্কা গলার আওয়াজ। গেয়ে যাও ছোকরা, গেয়ে যাও!

আমি তেমনি চোখ বজেই গেয়ে চললুম:

'তখন গলার ব্যথায় নেকড়ে বাঘের
চোখ ফাটিয়ে জল আসিল,
ভ্যাঁও-ভ্যাঁও রবে কাঁদিতে-কাঁদিতে
সে এক সারসের কাছে গেল—'

এই পর্যন্ত গেয়েছি—হঠাৎ ঝুমুর-ঝুমুর করে ঘুঙুরের শব্দ কানে এল। মনে হল কেউ যেন নাচছে। চোখ মেলে যেই তাকিয়েছি—দেখি—

গজেশ্বর নাচছে।

হ্যাঁ—গজেশ্বর ছাড়া আর কে? এর মধ্যে কখন একটা ঘাগরা পরেছে—নাকে একটা নথ লাগিয়েছে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধেছে আর ঘুরে-ঘুরে ময়ূরের মতো নাচছে।

সে কী নাচ! রামায়ণের তাড়কা রাক্ষসী কখনও ঘাগরা পরে নেচেছিল কি না জানি না, কিন্তু যদি নাচত তাহলেও যে সে গজেশ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি! আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে গজেশ্বর মিটমিট করে হাসল।

—বলি, কী দেখছ? অ্যাঁ—অমন করে দেখছ কী? এ-সব নাচ নাচতে পারে তোমাদের উদয়শঙ্কর? ছোঃ-ছোঃ! এই যে নাচছি—এর নাম হচ্ছে আদত কথাকলি।

স্বামীজী বললেন, মণিপুরীও বলা যায়।

শেঠজী বললেন, হাঁ—হাঁ কত্থক ভি বলা যেতে পারে।

আমি বললুম, তাড়কা-নৃত্যও বলা যায়।

গজেশ্বর বললেন, কী বললে?

আমি তক্ষুনি সামলে নিয়ে বললুম, না না, বিশেষ কিছু বলিনি।

—তোমাকে বলতেও হবে না।—ঘাগরা ঘুরিয়ে আর-এক পাক নেচে গজেশ্বর বললে, কই, গান বন্ধ হল যে? ধরো—গান ধরো। প্রাণ খুলে একবার নেচে নিই।

কিন্তু গান গাইব কী! গজেশ্বরের নাচ দেখে আমার গান-টান তখন গলার ভেতরে হালুয়ার মতো তাল পাকিয়ে গেছে।

গজেশ্বর বললে, ছোঃ-ছোঃ—এই তোমার মুরোদ। তুমি ঘোড়ার ডিমের গান জানো। শোনো—আমি নেচে নেচে একখানা ক্ল্যাসিক্যাল গান শোনাচ্ছি তোমায়।

এই বলে গজেশ্বর গান জুড়ে দিলে:

'এবার কালী তোমায় খাব—
হুঁ—হুঁ—তোমায় খাব তোমায় খাব—
তোমার মুণ্ডুমালা কেড়ে নিয়ে—হুঁ—হুঁ—
মুড়িঘণ্ট রেঁধে খাব—'

আর সেই সঙ্গে আবার সেই নাচ। সে কী নাচ! মনে হল, গোটা ভিসুভিয়াস পাহাড়টাই গজেশ্বরের সঙ্গে ধেই-ধেই করে নাচছে। স্বামীজী তালে-তালে চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলেন, শেঠজী বললেন, উ-হু-হু! কেইসা বঢ়িয়া নাচ! দিল্ একেবারে তর্ হোয়ে গেলো!

ওদের তো দিল্ তর্ হচ্ছে—নাচে গানে একেবারে মশগুল। ঠিক সেই সময় আমার পালাজ্বরের পিলের ভেতর থেকে কে যেন বললে, পটলডাঙার প্যালারাম, এই তোমার সুযোগ! লাস্ট চান্স! যদি পালাতে চাও, তা হলে—

ঠিক।

এসপার কি ওসপার। শেষ চেষ্টাই করি একবার।

আমি উঠে পড়লুম। তারপরেই ছুট লাগালুম প্রাণপণে।

কিন্তু ভিসুভিয়াস পাহাড়ের ওপর থেকে দৌড়ে পালানো কি এতই সোজা

কাজ। তিন পা এগিয়ে যেতে-না-যেতেই পাথরের নুড়িতে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়লুম ধপাস্ করে।

আর তক্ষুনি—

তক্ষুনি নাচ থেমে গেল গজেশ্বরের। আর পাহাড়ের মাথা থেকে হাত-কুড়ির মতো লম্বা হয়ে এগিয়ে এল গজেশ্বরের হাতটা। বললে, চালাকি! আমি নাচছি আর সেই ফাঁকে সরে পড়বার বুদ্ধি। বোঝ এইবার—বলেই, মস্ত একটা হাতির শুঁড়ের মতো হাত আমার গলাটাকে পাকড়ে ধরল, আর শূন্যে ঝুলোতে ঝুলোতে—

জয় গুরু ঘুটঘুটানন্দ। বলে আকাশ-ফাটানো একটা হুঙ্কার ছাড়ল। তারপরেই ছ্যাঁক—ঝপাস্!—সেই প্রকাণ্ড কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলের মধ্যে—

ফুটন্ত তেলের মধ্যে নয়—একরাশ ঠাণ্ডা জলের ভেতর। আমি আঁকুপাঁকু করে উঠে বসলাম। তখনও ভালো করে কিছু বুঝতে পারছি না। চোখের সামনে ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে ভাসছে ভিসুভিয়াস, গজেশ্বরের ঘাগরা পরে সেই উদ্দাম নৃত্য, সেই বিরাট কড়াই—সেই ফুটন্ত তেলের রাশ।

—সিদ্ধি-ফিদ্ধি কিছু খাইয়েছিল—ভরাট গম্ভীর গলায় কে বলল।

তাকিয়ে দেখি, একজন পুলিশের দারোগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে। সঙ্গে পাঁচ-সাতজন পুলিশ, আর কোমরে দড়ি বাঁধা—স্বামী ঘুটঘুটানন্দ, শেঠ ঢুণ্ডুরাম আর মহাপ্রভু গজেশ্বর।

টেনিদা আমার মাথায় জল ঢালছে, হাবুল হাওয়া করছে। আর ক্যাবলা বলছে, উঠে পড় প্যালা, উঠে পড়। থানায় গিয়ে খবর দিয়েছিলুম, পুলিশ এসে ওদের দলবলসুদ্ধু পাকড়াও করেছে। ঝন্টিপাহাড়ির বাংলোর নীচে বসে এরা নোট জাল করত। স্বামীজী এদের লিডার। শেঠজী নোটগুলো পাচার করত। সব ধরা পড়েছে এদের। জাল নোট ছাপার কল সব। এদের মোটরের মধ্যেই সমস্ত কিছু পাওয়া গেছে। বুঝলি রে বোকারাম, ঝন্টিপাহাড়ির বাংলোয় আর ভূতের ভয় রইল না এর পর থেকে।

দারোগা হেসে বললেন, শাবাশ ছোকরার দল, তোমরা বাহাদুর বটে। খুব ভালো কাজ করেছ। এই দলটাকে আমরা অনেকদিন ধরেই পাকড়াবার চেষ্টা করছিলুম, কিছুতেই হদিস মিলছিল না। তোমাদের জন্যেই আজ এরা ধরা পড়ল। সরকার থেকে এ-জন্যে মোটা টাকা পুরস্কার পাবে তোমরা।

এর পরে আর কি বসে থাকা চলে? বসে থাকা চলে এক মুহূর্তও? আমি পটলডাঙার প্যালারাম তক্ষুনি লাফিয়ে উঠলুম। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললুম: পটলডাঙা—

টেনিদা, হাবুল সেন আর ক্যাবলা সমস্বরে সাড়া দিলে: জিন্দাবাদ।

চার মূর্তির অভিযান

১। বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘটনা

বললে বিশ্বাস করবে?

আমরা চার মূর্তি— পটলডাঙার সেই চারজন— টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা আর আমি— স্বয়ং শ্রীপ্যালারাম, চারজনেই এবার স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে ফেলেছি। টেনিদা আর আমি থার্ড ডিভিশন, হাবুল সেকেণ্ড ডিভিশন— আর হতচ্ছাড়া ক্যাবলাটা শুধু যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে তা-ই নয়, আবার একটা স্টার পেয়ে বসে আছে। শুনছি ক্যাবলা নাকি স্কলারশিপও পাবে। ওর কথা বাদ দাও—ওটা চিরকাল বিশ্বাস-ঘাতক।

কলেজে ভর্তি হয়ে খুব ডাঁটের মাথায় চলাফেরা করছি আজকাল। কথায় কথায় বলি, আমরা কলেজ স্টুডেন্ট! আমাদের সঙ্গে চালাকি চলবে না— হুঁ হুঁ!

সেদিন কেবল ছোট বোন আধুলিকে কায়দা করে বলেছি, কী যে ক্লাস নাইনে পড়িস— ছ্যা-ছ্যা! জানিস লজিক কাকে বলে?

অমনি আধুলি ফ্যাঁচ করে বললে, যাও যাও ছোড়দা— বেশি ওস্তাদি কোরো না। ভারি তো তিনবারের বার থার্ড ডিভিশনে পাশ করে—

আস্পর্ধা দ্যাখো একবার। যেই আধুলির বিনুনি ধরে একটা টান দিয়েছি, অমনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ বলে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একাকার। ঘরে বড়দা দাড়ি কামাচ্ছিল, ক্ষুর হাতে বেরিয়ে এসে বললে, ইস্টুপিড— গাধা। যেমন ছাগলের মতো লম্বা লম্বা কান, তেমনি বুদ্ধি! ফের যদি বাঁদরামো করবি— দেব এই ক্ষুর দিয়ে কান দুটো কেটে!

দেখলে? ইস্টুপিড তো বললেই— সেই সঙ্গে গাধা-ছাগল-বাঁদর তিনটে জন্তুর নাম একসঙ্গে করে দিলে। আমি যে কলেজে পড়ছি— এখন আমার রীতিমতো একটা প্রেসটিজ হয়েছে— সেটা গ্রাহ্যিই করলে না। আমার ভীষণ রাগ হল। মা বারান্দায় আমসত্ত্ব রোদে দিয়েছিল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে তা থেকে খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে মনের দুঃখ বাইরে চলে এলুম।

আমাদের বাড়ির সামনে একটুখানি পাঁচিল-ঘেরা জায়গা। সেখানে বড়দার সিল্কের পাঞ্জাবি শুকুচ্ছে— নিজের হাতে কেচেছে বড়দা। আর একপাশে বাঁধা রয়েছে ছোড়দির আদরের ছাগল গঙ্গারাম। বেশ দাড়ি হয়েছে গঙ্গারামের। একমনে আমসত্ত্ব খেতে খেতে ভাবছি, এবার সরস্বতী পুজোয় থিয়েটারের সময় গঙ্গারামের দাড়িটা কেটে নিয়ে মোগল সেনাপতি সাজব— এমন সময় দেখি গঙ্গারাম গলার দড়ি খুলে ফেলেছে।

ছাগলের খালি দাড়ি হয় অথচ কান পর্যন্ত গোঁফ হয় না কেন, এই কথাটা খুব দরদ দিয়ে ভাবছিলুম। ঠিক তক্ষুনি চোখে পড়ল— গঙ্গারাম এগিয়ে এসে বড়দার সিল্কের পাঞ্জাবিতে মুখ দিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলুম। একটু আগেই বড়দা আমাকে গাধা-ছাগল এইসব বলেছে। খেয়ে নিক সিল্কের পাঞ্জাবি— বেশ জব্দ হয়ে যাবে।

দেখলুম, কুর্-কুর্ করে দিব্যি খিয়ে নিচ্ছে গঙ্গারাম। দাড়িটা অল্প অল্প নড়ছে— চোখ বুজে এসেছে আরামে, কান দুটো লটর-পটর করছে। সিল্কের পাঞ্জাবি খেতে ওর বেশ ভালোই লাগে দেখা যাচ্ছে। আমসত্ত্ব চিবোনো ভুলে গিয়ে আমি নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ করতে লাগলুম।

ইঞ্চি-দুয়েক খেয়েছে— এমন সময় গেটটা খুলে গেল। গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে হাসপাতালে নাইট ডিউটি সেরে ফিরছে মেজদা। সবে ডাক্তারি পাশ করেছে মেজদা— আর কী মেজাজ! আমাকে দেখলেই ইনজেকশন দিতে চায়।

ঢুকেই মেজদা চেঁচিয়ে উঠল : কী সর্বনাশ! ছাগল যে বড়দার জামাটা খেয়ে ফেললে! এই প্যালা— ইডিয়ট— হতভাগা— বসে বসে মজা দেখছিস নাকি?

বুঝলুম, গতিক সুবিধের নয়! এবার বড়দা এসে সত্যিই আমার কান কেটে নেবে। কান বাঁচাতে হলে আমারই কেটে পড়া দরকার। ঘাড়-টাড় চুলকে বললুম, লজিক পড়ছিলুম— মানে দেখতে পাইনি— মানে আমি ভেবেছিলুম— বলতে বলতে মেজদার পাশ কাটিয়ে এক লাফে সোজা সদর রাস্তায়।

আমাদের সিটি কলেজ খুব ভাল— খালি ছুটি দেয়। আজও চড়কষষ্ঠী না কোদালে অমাবস্যা— কিসের একটা বন্ধ ছিল। আমি সোজা চলে এলুম চাটুজ্যেদের রোয়াকে। দেখি, টেনিদা হাত-পা নেড়ে কী যেন সব বোঝাচ্ছে ক্যাবলা আর হাবুল সেনকে।

—সামনেই ক্রিসমাস! ব্যস— বাঁই বাঁই করে প্লেনে চেপে চলে যাব! কুট্টিমামা তোদেরও নিয়ে যেতে বলেছে। যাবি তো চল— দিনকতক বেশ খেয়ে-দেয়ে ফিরে আসা যাবে।

ক্যাবলা বললেন, কিন্তু প্লেনের ভাড়া দেবে কে?

—আরে মোটে কুড়ি টাকা। ড্যাম চিপ।

আমি বললুম, কোথায় যাবে প্লেনে চেপে? গোবরডাঙা?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, খেলে কচুপোড়া। এটার মাথাভর্তি কেবল গোবর— তাই জানে গোবরডাঙা আর ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুর! ডুয়ার্সে যাচ্ছি— ডুয়ার্সে। এন্তার হরিণ, দেদার বন-মুরগি, ঘুঘু, হরিয়াল— বলতে বলতেই আমার হাতের দিকে চোখ পড়ল : কী খাচ্ছিস র‍্যা?

লুকোতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই খপ করে আমসত্ত্বটা কেড়ে নিলে। একেবারে সবটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, বেড়ে মিষ্টি তো! আর আছে?

ব্যাজার হয়ে বললুম, না— আর নেই। কিন্তু ডুয়ার্সের জঙ্গলে যে যেতে চাইছ, শেষে বাঘের খপ্পরে নিয়ে ফেলবে না তো?

—বাঘ মারতেই তো যাচ্ছি! —আমসত্ত্ব চিবুতে চিবুতে টেনিদা একটু উঁচুদরের হাসি হাসল— যাকে বাংলায় বলে 'হাইক্লাস'।

—অ্যাঁ! —আমি ধপাৎ করে রোয়াকের ওপর বসে পড়লুম : বাঘ না—না—বাঘটাগের মধ্যে আমি নেই!

হাবুল বললে, হ, সত্য কইছস! এদিকে দন্তশূলে মরতে আছি— বাঘের হাতে পইড়্যা পরানডা যাইব গিয়া।

ক্যাবলা বললে, ভালোই তো! দাঁতের ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছিস— যদি মারা যাস দেখবি একটুও আর দাঁতের ব্যথা নেই।

টেনিদা আমসত্ত্ব শেষ করে বললে, থাম— ইয়ার্কি করিসনি। আরে ডুয়ার্সের বাঘ-ভালুক সবাই আমার কুট্টিমামাকে খাতির করে চলে। কুট্টিমামা ভাল্লুকের নাক পুড়িয়ে দিয়েছে— বাঘের বত্রিশটা দাঁত কালীসিঙ্গির মহাভারতের এক ঘায়ে উড়িয়ে দিয়েছে। শেষে সেই বাঘ কুট্টিমামার বাঁধানো দাঁত নিয়ে খেয়ে বাঁচে। সে বাঘটা আজকাল আর মাংস-টাংস খায় না— স্রেফ নিরিমিষি। লোকের বাগান থেকে লাউ-কুমড়ো চুরি করে খায়— সেদিন আবার টুক করে কুট্টিমামার একডিশ আলুর দম খেয়ে গেছে।

ক্যাবলা বললে, গুল।

টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, কী বললি?

ক্যাবলা বললে, না—মানে, বলছিলুম— গুল বাঘ আর ডোরাদার বাঘ— দু'রকমের বাঘ হয়।

হাবুল বললে, আর-এক রকমের বাঘও হয়। বিছানায় থাকে আর কুটুস কইর‍্যা কামড়ে দেয়। তারে বাগ কয়।

আমিও ভেবে-চিন্তে বললুম, আর তাকে কিছুতেই বাগানো যায় না। কামড়েই সে হাওয়া হয়ে যায়।

টেনিদা রেগে-মেগে বললে, দুত্তোর— খালি বাজে কথা। এদের কাছে কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি! এই তিনটের নাকে তিনখানা মুগ্ধবোধ বসিয়ে নাকভাঙা বুদ্ধদেব বানিয়ে দিলে তবে ঠিক হয়। ফাজলামি নয়— সোজা জবাব দে— যাবি কি যাবি না? না যাস একাই যাচ্ছি প্লেনে চেপে— তোরা এখানে ভ্যারেণ্ডা ভাজ বসে বসে।

আমি বললুম, বাঘে কামড়াবে না?

—বললুম তো সে আজকাল ভেজিটেবিল খায়। আলুর দম আর মুলো ছেঁচকি

খেতে দারুণ ভালবাসে।

ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে, তার আত্মীয়স্বজন ?

—তারা কুট্টিমামাকে দেখলেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তখন আর শিকার করবারও দরকার নেই— স্রেফ গলায় দড়ি বেঁধে বাড়িতে নিয়ে এলেই হল।

আমি ভারি খুশি হয়ে বললুম, তা হলে তো যেতেই হয়। আমরা সবাই একটা করে বাঘ সঙ্গে করে বেঁধে আনব।

হাবুল বললে, সেই বাঘে দুধ দিব।

ক্যাবলা বললে, আর সেই বাঘের দুধ বিক্রি করে আমরা বড়লোক হব।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠে বললে— ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমরা সবাই আরও জোরে চিৎকার করে বললুম—ইয়াক—ইয়াক।

বাবা অফিস যাওয়ার সময় বলে গেলেন, সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসবি— একদিনও যেন কলেজ কামাই না হয়।

কোর্টে বেরুতে বেরুতে বড়দা মনে করিয়ে দিলে, দু'-একখানা পড়ার বইও সঙ্গে নিয়ে যাস— খালি ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াসনি।

ছুটির ভিতরে পড়ার বই নিয়ে বসতে বয়ে গেছে আমার। আমি সুটকেসের ভেতর হেমেন রায় আর শিবরামের নতুন বই ভরে নিয়েছি খানকয়েক।

মা এসে বললে, যা-তা খাসনি। তুই যে-রকম পেটরোগা— বুঝে-সুঝে খাবি।

কোত্থেকে আধুলি এসে জুড়ে দিলে, দুটো কাঁচকলা নিয়ে যা ছোড়দা— আর হাঁড়ির ভেতরে গোটাকয়েক শিঙিমাছ।

আমি আধুলির বিনুনিটা চেপে ধরতে যাচ্ছি— সেই সময় মেজদা এসে হাজির। এসেই বলতে লাগল : প্লেনে চেপে যদি কানে ধাপা লাগে তাহলে হাই তুলতে থাকবি। যদি বমি আসে তাহলে অ্যাভোমিন ট্যাবলেট দিচ্ছি— গোটা-কয়েক খাবি। যদি—

উঃ, উপদেশের চোটে প্রাণ বেরিয়ে গেল! এর মধ্যে আবার ছোড়দি এসে বলতে আরম্ভ করল ; দার্জিলিঙের কাছাকাছি তো যাচ্ছিস। যদি সস্তায় পাস— কয়েক ছড়া পাথরের মালা কিনে আনিস তো!

—দুত্তোর— বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই বাইরে মোটরের হর্ন বেজে উঠল। আর টেনিদার হাঁক শোনা গেল ; কি রে প্যালা— রেডি ?

—রেডি। আসছি—

তক্ষুনি সুটকেস নিয়ে লাফিয়ে উঠলুম। হাবুলদের মোটরে চেপে ওরা সবাই এসে পড়েছে। মোটরে করে সোজা দমদমে গিয়ে আমরা প্লেনে উঠব। তারপর দু'ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব ডুয়ার্সের জঙ্গলে। তখন আর পায় কে। কুট্টিমামার ওখানে মজাসে খাওয়া-দাওয়া— চা বাগান আর বনের মধ্যে বেড়ানো— দু'-একদিন শিকারে বেরিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে বাঘ-টাঘ নিয়ে আসা। ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস!

সকলকে চটপট প্রণাম-ট্রনাম সেরে নিয়ে গেট খুলে বেরুতে যাচ্ছি, হঠাৎ—

পেছনে বিটকেল 'ব-ব-ব' আওয়াজ আর শার্টের কোনা ধরে এক হ্যাঁচকা টান। চমকে লাফিয়ে উঠলুম। তাকিয়ে দেখি, হতচ্ছাড়া গঙ্গারাম। দাড়ি নেড়ে নেড়ে আমার জামাটা খাওয়ার চেষ্টা করছে।

—তবে রে অযাত্রা! পেছু টান!

ধাঁই করে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলুম গঙ্গারামের গালে। গঙ্গারাম ম্যা-আ-আ করে উঠল। আর আমার হাতে যা লাগল সে আর কী বলব। গঙ্গারামটার গাল যে এমন ভয়ানক শক্ত, সে-কথা সে জানত!

মোটর থেকে টেনিদা আবার হাঁক ছাড়ল ; কী রে প্যালা, দেরি করছিস কেন ?

—আসছি— বলে এক ছুটে বেরিয়ে আমি গাড়িতে উঠে পড়লুম। তখনও গঙ্গারাম সমানে ডাকছে ; ম্যা-অ্যা-অ্যা—ভ্যা-অ্যা-অ্যা! ভাবটা এই : খামকা আমায় একটা রামচাঁটি লাগালে ? আচ্ছা— যাও ডুয়ার্সের জঙ্গলে! এর ফল যদি হাতে-হাতে না পাও— তাহলে আমি ছাগলই নই।

হায় রে, তখন কি আর জানতুম— গঙ্গারামের ভাগনে যা দশগণ্ডা করে মারে, তারই পাল্লায় পড়ে আমার অদৃষ্টে অশেষ দুঃখ আছে এরপর।

গাড়ি দমদম এয়ারপোর্টের দিকে ছুটল।

২। বিমানে চৈনিক রহস্য

ভজহরি মুখার্জি— স্বর্ণেন্দু সেন— কুশল মিত্র— কমলেশ ব্যানার্জি—

নামগুলো শুনে চমকে চমকে উঠছ তো ? ভাবছ— এ আবার কারা ? হুঁ-হুঁ— ভাববার কথাই বটে। এ হল আমাদের চারমূর্তির ভালো নাম— আগে স্কুলের খাতায় ছিল। এখন কলেজের খাতায়। ভজহরি হচ্ছে আমাদের দুর্দান্ত টেনিদা, স্বর্ণেন্দু হল ঢাকাই হাবুল, কুশল হচ্ছে হতচ্ছাড়া ক্যাবলা আর কমলেশ ? আন্দাজ করে নাও।

এ-সব নাম কি ছাই আমাদের মনে থাকে ? প্লেনে উঠতে যেতেই একটা লোক কাগজ নিয়ে এইসব নাম ডাকতে লাগল। আমরাও— এই যে— এই যে বলে টকাটক উঠে পড়লুম। হাবলা তো অভ্যাসে বলেই ফেলল, প্রেজেন্ট স্যার।'

আরে রামো— এ কী প্লেন!

এর আগে আমি কখনও প্লেনে চাপিনি— কিন্তু বড়দা ও মেজদার কাছে কত গল্পই যে শুনেছি! চমৎকার সব সোফার মতো চেয়ার— থেকে-থেকে চা-কফি-লজেন্স-স্যাণ্ড-উইচ-সন্দেশ খেতে দিচ্ছে, উঠে বসলেই সে কী খাতির! কিন্তু এ কী! প্লেনের বারো আনা বোঝাই কেবল বস্তা আর কাপড়ের গাঁট, কাঠের বাক্স, আবার এক জায়গায় দড়ি দিয়ে বাঁধা কয়েকটা হুঁকোও রয়েছে।

শুধু দু'দিকে চারটে সিট কোনওমতে রাখা আছে আমাদের জন্যে। তাতে গদিটদি কিছু ছিল, কিন্তু এখন সব ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার।

হাবুল সেন বললে, অ টেনিদা! মালগাড়িতে চাপাইলা নাকি?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, যা—যা—মেলা বকিসনি! কুড়ি টাকা দিয়ে প্লেন চাপবি— কত আরাম পেতে চাস— শুনি? তবু তো ভাগ্যি যে প্লেনের চাকার সঙ্গে তোদের বেঁধে দেয়নি!

বলতে বলতে জন-তিনেক কোট-প্যান্ট-পরা লোক তড়াক করে প্লেনে উঠে পড়ল। তারপর সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো অদ্ভুত কায়দায় টকাটক করে সেই বাক্স-বস্তার স্তূপ পেরিয়ে—একজন আবার হুঁকোগুলোতে একটা হোঁচট খেয়ে ওপাশের 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা একটা কাচের দরজার ওপারে চলে গেল।

টেনিদা বললে, ওরা পাইলট। এখুনি ছাড়বে।

ক্যাবলা বললে, ইস, পাইলট হওয়া কী কষ্ট! বাক্স আর বস্তার উপর দিয়ে লাফাতে হয় কেবল।

যাত্রী আমরা মাত্র চারজন। দু'দিকের সিটগুলোতে চেপে বসতে-না-বসতে হঠাৎ ঘুরুর ঘুরুর করে আওয়াজ আরম্ভ হল। তারপরেই গুড়গুড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল প্লেনটা।

আমরা তাহলে সত্যিই এবার আকাশে উড়ছি!—কী মজা! এবার মেঘের উপর দিয়ে—নদী গিরি কান্তার— মানে আরও কী সব যেন বলে—অটবী-টটবী পার হয়ে দূর-দূরান্তে চলে যাব। আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা এখন থাকলে নিশ্চয় কবিতা লখত:

পাখি হয়ে যাই গগনে উড়িয়া,
ফড়িং টড়িং খাই ধরিয়া—

কিন্তু ফড়িং খাওয়ার কথা কি লিখত? আমার একটু খটকা লাগল। কবিরা কি ফড়িং খায়? বলা যায় না— যারা কবি হয় তাদের অসাধ্য আর অখাদ্য কিছুই নেই!

এইসব দারুণ চিন্তা করছি, আর প্লেনটা সমানে গুড়-গুড় করে চলেছে। আমি ভাবছিলুম এতক্ষণে বুঝি মেঘের উপর দিয়ে কান্তার মরু দুস্তর পারাবার এইসব পাড়ি দিচ্ছি! দ্যুৎ—কোথায় কী! খালি ডাঙা দিয়ে চলছে তো চলছেই।

টেনিদার পাশ থেকে হাবুল বললে, কই টেনিদা— উড়তে আছে না তো?

ক্যাবলা একটা এলাচ বের করে চিবুচ্ছিল। আমি খপ করে নিতে গেলুম—পেলুম খোসাটা। রাগ করে বললুম, উড়বে না ছাই! মালগাড়ি কোনওদিন ওড়ে নাকি?

ক্যাবলা বললে যাচ্ছে তো গড়গড়িয়ে। কাল হোক, পরশু হোক,—ঠিক পৌঁছে যাবে।

হাবুল করুণ গলায় বললে, কয় কী— অ টেনিদা! এইটা উড়ব না? সঙ্গে সঙ্গে প্লেন দাঁড়িয়ে পড়ল। আর বেজায় জোরে ঘরর্ ঘরর্ করে আওয়াজ হতে লাগল।

আমি বললুম, যাঃ, থেমে গেল!

ক্যাবলা মাথা নেড়ে বললে, হুঁ—স্টেশনে থামল বোধহয়। ইঞ্জিনে জল-টল নেবে।

টেনিদা ভীষণ রেগে গেল এবার।

—টেক কেয়ার ক্যাবলা— আমার কুট্টিমামার দেশের প্লেন! খবরদার—অপমান করবিনি বলে দিচ্ছি!

—তবে ওড়ে না কেন! খালি আওয়াজ করে— মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে!

বলতে বলতেই আবার ঘর্ ঘর্ করে ছুটতে আরম্ভ করল প্লেন। তারপরেই—ব্যাস, টুক্ করে যেন ছোট্ট একটু লাফ দিলে, আর সব আমাদের পায়ের তলায় নেমে যাচ্ছে।

আমরা উড়েছি! সত্যিই উড়েছি!

টেনিদা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে, তবে যে বলছিলি উড়বে না? কেমন—দেখলি তো এখন? ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমরা সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করে বললুম, ইয়াক—ইয়াক।

প্লেন উড়েছে। দেখতে দেখতে বাড়িঘরগুলো খেলনার মতো ছোট্ট-ছোট্ট হয়ে গেল, গাছগুলোকে দেখাতে লাগল ঝোপের মতো, রাস্তাগুলো চুলের সিঁথির মতো সরু হয়ে গেল আর রুপোর সাপের মতো আঁকাবাঁকা নদীগুলো আমাদের অনেক নিচে লুকিয়ে রইল।

মেজদার কাছে আগেই শুনেছিলুম, প্লেনে চেপে সিনারি দেখতে হলে জানলার পাশে যেতে হয়। আমিও কায়দা করে আগেই বসে পড়েছি। ক্যাবলা মিনতি করে বললে, তুই আমার জায়গায় আয় না প্যালা— আমিও ভাল করে একটুখানি দেখে নিই!

আমি বললুম, এখন কেন? এলাচের খোসা দেবার সময় মনে ছিল না?

—তোকে চকলেট দেব।

—দে!

ঘাড় চুলকে ক্যাবলা বললে, এখন তো সঙ্গে নেই, কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেব।

—তবে কলকাতায় ফিরেই সিনারি দেখিস।—আমি তক্ষুনি জবাব দিলুম।

ক্যাবলা ব্যাজার হয়ে বললে, না দিলি দেখতে—বয়ে গেল। কীই বা আছে দেখবার। ভারি তো বাঁশবন আর পচা ডোবা—ও তো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে তালগাছের উপরে চাপলেই দেখা যায়।

—দ্রাক্ষাফল অতিশয় টক— শেয়াল বলেছিল।— আমি ক্যাবলাকে উপদেশ দিলুম; তবে যা— তালগাছের মাথাতেই চাপ গে।

ওদিকে টেনিদা আর হাবুলের মধ্যে দারুণ তর্ক চলছে।

হাবুল বললে, আমার মনে হয়, আমরা বিশ হাজার ফুট উপর দিয়া যাইত্যাছি।

টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে বললে, ফুঃ ! আমার কুট্টিমামার দেশের প্লেন অত তলা দিয়ে যায় না। আমরা কম-সে-কম পঞ্চাশ হাজার ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছি।

ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল। তারপর বললে, কেইসা বাত বোল্‌তা তুমলোক ! এ-সব ডাকোটা প্লেন, যেগুলো মাল টানে, কখনও ছ-সাত হাজার ফুটের উপর দিয়ে যায় না।

—এই ক্যাবলাটার সব সময় পণ্ডিতি করা চাই। টেনিদা মুখখানা হালুয়ার মতো করে বললে, থাম, ওস্তাদি করিসনি ! এ-সব কুট্টিমামার দেশের প্লেন— পঞ্চাশ-ষাট হাজারের নীচে কথাই কয় না।

ক্যাবলা বললে, আমি জানি।

টেনিদার হালুয়ার মতো মুখটা এবার আলু-চচ্চড়ির মতো হয়ে গেল : তুই জানিস ? তবে আমিও জানি। এক্ষুনি তোর নাকে এমন একটা মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেব যে—

ক্যাবলা তাড়াতাড়ি বললে, না-না, আমারই ভুল হয়ে গিয়েছিল। এই প্লেনটা বোধহয় এখন একলাখ ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছে।

—এক লাখ ফুট !—আমি হাঁ করে রইলুম। সেই ফাঁকে ক্যাবলা আমার মুখের ভেতরে আবার একটা এলাচের খোসা ফেলে দিলে।

হাবুল বললে, খাইছে ! এক লাখ ফুট ! অ টেনিদা— !

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, কী বলবি বল না। একেবারে শিবনেত্তর হয়ে বসে রইলি কেন ?

—আমরা তো অনেক উপরে উইঠ্যা পড়ছি।

টেনিদা ভেংচে বললে, তা পড়ছি। তাতে হয়েছে কী ?

—চাঁদের কাছাকাছি আসি নাই ?

টেনিদা উঁচুদরের হাসি হাসল।

—হ্যাঁ, তা আর-একটু উঠলেই চাঁদে যাওয়া যেতে পারে।

—তা হইলে একটু কও না পাইলটেরে। চাঁদের থিক্যা একটু ঘুইর‍্যাই যাই। বেশ ব্যাড়ানোও হইব, রাশিয়ান স্পুটনিক আইস্যা পড়ছে কি না সেই খবরটাও নিতে পারুম।

ক্যাবলা বললে, হুঁ, চাঁদে সুধাও আছে শুনেছি। এক-এক ভাঁড় করে খেয়ে যাওয়া যাবে।

আমার শুনে কেমন খটকা লাগল। এত সহজেই কি চাঁদে যাওয়া যায় ? কাগজে কী সব যেন পড়েছিলুম। চাঁদ, কী বলে— সেই যেন কত লক্ষ মাইল দূরে— মানে, যেতে-টেতে অনেক দেরি হয় বলেই শুনেছিলুম। এমন চট করে কি সেখানে যাওয়া যাবে ? আরও বিশেষ করে এই মালগাড়িতে চেপে ?

কিন্তু টেনিদাকে সে-কথা বলতে আমার ভরসা হল না। কুট্টিমামার দেশের প্লেন। সে-প্লেন সব পারে। আর পারুক বা না-ই পারুক, মিথ্যে টেনিদাকে চটিয়ে আমার লাভ কী ? এসে হয়ত টকাটক চাঁদির উপরে গোটা-কয়েক গাঁট্টাই মেরে

দেবে। আমি দুনিয়ার সব খেতে ভালবাসি— কলা, মুলো, পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল, চপ-কাটলেট-কালিয়া— কিচ্ছুতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ওই চাঁটি-গাঁট্টাগুলো খেতে আমার ভালো লাগে না—একদম না।

হাবুল আবার মিনতি করে বললে, অ টেনিদা, একবার পাইলটেরে রিকোয়েস্ট কইর‍্যা— চল না চাঁদের থিক্যা একটুখানি ব্যাড়াইয়া আসি।

হাবুল সেন ইয়ার্কি করছে— নির্ঘাত ! আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ পিট-পিট করলে। কিন্তু টেনিদা কিছু বুঝতে পারল না। বুঝলে হাবলার কপালে দুঃখ ছিল।

টেনিদা আবার উঁচুদরের হাসি হাসল— যাকে বাংলায় বলে, 'হাইক্লাস'। তারপর বললে, আচ্ছা, নেকস্‌ট্‌ টাইম। এখন একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে কিনা— মানে কুট্টিমামা আমাদের জন্যে এতক্ষণ হরিণের মাংসের ঝোল রেডি করে ফেলেছে। তা ছাড়া রাশিয়ান আর আমেরিকানরা যাওয়ার এত চেষ্টা করছে, ওদের মনে ব্যথা দিয়ে আগে চাঁদে যাওয়াটা উচিত হবে না। ভারি কষ্ট পাবে। আমার মনটা বড় কোমল রে— কাউকে দুঃখ দিতে ইচ্ছে করে না।

আমরা সবাই বললুম, সে তো বটেই।

টেনিদা বললে, যাক— চাঁদে পরে গেলেই হবে এখন। ও আর কী— গেলেই হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, কুট্টিমামার হরিণের ঝোল মনে পড়তে ভারি খিদে পেয়ে গেল রে। কী খাওয়া যায় বল দিকি ?

—এই তো খেয়ে এলে— আমি বললুম, এক্ষুনি খিদে পেল ?

টেনিদা বললে, পেল। যাই বল বাপু, আমার খিদে একটু বেশি। বামুনের পেট তো— প্রত্যেক দশ মিনিটেই একেবারে ব্রহ্মতেজে দাউ-দাউ করে ওঠে। কিন্তু কী খাই বল তো ?

হাবুল বললে, ওই তো একটা বস্তা ফুটা হইয়া কী জ্যান পড়তে আছে। লবণ মনে হইত্যাছে। খাইবা ?

আমরা একসঙ্গে তাকিয়ে দেখলুম। তাই বটে। একটা ছোট বস্তায় ছোট একটা ফুটো হয়েছে। সেখান থেকে সাদা গুঁড়ো-গুঁড়ো কী সব পড়ছে। লবণ ? কিন্তু— কিন্তু কেমন সন্দেহজনক !

একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ল টেনিদা। বললে, দেখি কী রকম লবণ।

বলেই বস্তা থেকে খানিকটা আঙুলের ডগায় তুলে নিলে। তারপর চেঁচিয়ে বললে, ডি-ল্যা-গ্র্যাণ্ডি ! ইউরেকা !

আমরা বললুম, মানে ?

—বস্তার রহস্যভেদ। মানে বস্তার চৈনিক রহস্য।

—চৈনিক রহস্য ! সে আবার কী ?— আমি জানতে চাইলুম।

টেনিদা বললে, চিনি—চিনি—পিয়োর চিনি ! যে-চিনি দিয়ে সন্দেশ তৈরি হয়, যে-চিনির রহস্যভরা রসের ভিতরে রসগোল্লা সাঁতার কাটে। যে-চিনি—

আর বলতে হল না। চিনিকে আমরা সবাই চিনি— কে না চেনে ?

পড়ে রইল চাঁদ, নদী-গিরি-কান্তারের শোভা। আমরা সবাই চিনির বস্তার ফুটোটাকে বাড়িয়ে ফেললুম।

তারপর—

তারপর বলাই বাহুল্য।

৩। অতঃপর কুট্টিমামা

প্লেন এসে মাটিতে নামল।

ভালোই হল। চৈনিক রহস্য ভেদ করে এখন গলা একেবারে আঠা-আঠা হয়ে আছে—জিভটা যেন কাঁচাগোল্লা হয়ে আছে। জিভে কাঁচাগোল্লা চেপে বসলে ভালোই লাগে— কিন্তু জিভটাই কাঁচাগোল্লা হয়ে গেলে কেমন বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি মনে হতে থাকে। এর মধ্যে আবার থেকে-থেকে কেমন গা গুলিয়ে উঠছিল। শেষকালে ক্যাবলার গায়েই খানিকটা বমি করে ফেলব কি না ভাবতে ভাবতেই দেখি, প্লেনটা সোজা থেমে গেল, আর বাইরে থেকে কারা টেনে দরজাটা খুলে দিলে।

দেখি, দুজন কুলি একটা ছোট লোহার সিঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। নীচে পাঁচ-সাত জন লোক দাঁড়িয়ে।

চিনির বস্তার রাহাজানি ধরা পড়বার আগেই সরে পড়া দরকার। টুপ-টুপ করে নেমে পড়লুম আমরা।

বা—রে—কোথায় এলুম ? সামনে একটা টিনের ঘর, একটুখানি মাঠ— তার ভেতরে প্লেনখানা এসে নেমেছে। মাঠের তিন দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গল— আর একদিকে মেঘের মতো মাথা তুলে আছে নীল পাহাড়। হাওয়ায় বড়-বড় ঘাস দুলছে আশেপাশে।

হাবুল বললে, তাইলে আইস্যা পড়লাম !

কিন্তু কুট্টিমামা ? কোথায় কুট্টিমামা ! যে-ক'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে— তার মধ্যে তো কুট্টিমামা নেই ? সেই লম্বা তালগাছের মতো চেহারা, মিশমিশে কালো রং—মাথায় খেজুরপাতার মতো ঝাঁকড়া চুল— মানে টেনিদা আমাদের কাছে যে-রকম বর্ণনা দিয়েছে আগে— সে-রকম কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না ?

বললুম, ও টেনিদা, কুট্টিমামা কোথায় ?

টেনিদা বললে, ঘাবড়াসনি— ওই তো আসছে মামা।

চালাঘরটার পাশে একখানা জিপ গাড়ি এসে থেমেছে এক্ষুনি। তা থেকে নেমেছে বেঁটে-খাটো গোলগাল একটি ভালোমানুষ লোক। গায়ে নীল শার্ট, পরনে পেন্টুলুন। টেনিদা দেখিয়ে বললে, ওই তো কুট্টিমামা।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলুম, ওই কুট্টিমামা ! হতেই পারে না। ঝাঁকড়া চুল— তালগাছের মতো লম্বা— কালিগোলা রং— সে কী করে অমন ছোটখাটো টাক-মাথা গোলগাল মানুষ হয়ে যাবে ! আর গায়ের রংও তো বেশ ফর্সা।

ক্যাবলা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই টেনিদা এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে একটা প্রণাম ঠুকে দিলে।

—মামা, আমরা সবাই এসে গেছি।

কী আর করা ! কুট্টিমামার রহস্য পরে ভেদ করে যাবে— আপাতত আমরাও একটা করে প্রণাম করলুম।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে হেসে বললেন, বেশ— বেশ, ভারি আনন্দ হল তোমাদের দেখে। তা পথে কোনও কষ্ট হয়নি তো ?

ফস করে বলে ফেললুম, না মামা— বেশি কষ্ট হয়নি। মানে, চিনির বস্তাটা ছিল—

টেনিদার চোখের দিকে তাকিয়েই সামলে গেছি সঙ্গে সঙ্গে। মামা বললেন, চিনির বস্তা ! সে আবার কী ?

টেনিদা বললে, না মামা, ওসব কিছু না। চিনির বস্তা-টস্তা আমরা চিনি না। মানে, প্যালা খুব চিনি খেতে ভালোবাসে কিনা— তাই সারা রাস্তা স্বপ্ন দেখছিল।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, তাই নাকি ?

—হ্যাঁ মামা।—টেনিদা উৎসাহ পেয়ে বলতে আরম্ভ করলে, আমারও ওরকম হয়। তবে আমি আবার চপ-কাটলেটের স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি। এই হাবুল সেন খালি রাবড়ি আর চমচমের স্বপ্ন দেখে। আর এই ক্যাবলা— মানে এই বাচ্চা ছেলেটা পরীক্ষায় স্কলারশিপ পায় আর চুয়িং গামের স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে।

ক্যাবলা ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে উঠল, কক্ষনো না ! চুয়িং গামের স্বপ্ন দেখতে আমি মোটেই ভালোবাসি না। আমিও চপ-কাটলেট রাবড়ি চমচম— এইসবের স্বপ্ন দেখি।

কুট্টিমামা আবার অল্প একটু হেসে বললেন, দেখা যাক, স্বপ্নকে সফল করা যায় কি না। এখন চলো। মালপত্র প্লেনে কিছু নেই তো ? সব হাতে ? ঠিক আছে।

—তোমাদের বাগান কতদূরে মামা ?

—এই মাইল-ছয়েক। দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই চলে যাব। এসো—

একটু পরেই আমরা জিপে উঠে পড়লুম। ড্রাইভারের পাশে বসে মামা বললেন, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে দেওয়ান বাহাদুর। অনেক দূরে থেকে আসছে এরা— এদের খিদে পেয়েছে।

টেনিদা বললে, তা যা বলেছ মামা ! সকালে বলতে গেলে কিছুই খাইনি— পেট চুঁই-চুঁই করছে।

টেনিদা কিছু খায়নি ! বাড়ি থেকে গলা পর্যন্ত ঠেসে বেরিয়েছে— প্লেনে এসে কমসে কম একসের চিনি মেরে দিয়েছে। টেনিদা যদি কিছু না খেয়ে থাকে, আমি

তো তিনদিন উপোস করে আছি !

জিপ ছুটল।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কালো পিচের পথ পড়ে আছে মস্ত একটা ফিতের মতো। আমাদের জিপ চলেছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ছায়া ছড়িয়ে আছে পথের উপর— কেমন মিষ্টি গলায় নানারকমের পাখি ডাকছে।

টেনিদা বসেছে আমাদের পাশেই। ফাঁক পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি যে-রকম বলেছিলে, তোমার কুট্টিমামার চেহারা তো একদম সে-রকম নয় ! গুল দিয়েছিলে বুঝি ?

টেনিদা বললে, চুপ-চুপ ! কুট্টিমামা শুনলে এখুনি একটা ভীষণ কাণ্ড হয়ে যাবে !

—ভীষণ কাণ্ড ! কেন ?

টেনিদা আমার কানে-কানে বললে, সে এক লোমহর্ষক ব্যাপার— বুঝলি। বললে পেত্যয় যাবি না— নেপালী বাবার একটা ছু-মন্তরেই কুট্টিমামার চেহারা বিলকুল পালটে গেছে।

—ছু-মন্তর। সে আবার কী ?

—পরে বলব, এখন ক্যাঁচম্যাচ করিসনি। কুট্টিমামা শুনলে দারুণ রাগ করবে। বলতে বারণ আছে কিনা।

আমি চুপ করে গেলুম। একটা যা-তা গল্প বানিয়ে দেবে এর পরে। কিন্তু টেনিদার কথায় আর বিশ্বাস করি আমি ? আমি কি পাগল না পেণ্টুলুন ?

এর মধ্যে হাবুল সেন কুট্টিমামার পাশে বসে বকবকানি জুড়ে দিয়েছে : আইচ্ছা মামা, এই জঙ্গলটার নাম কী ?

মামা বললেন, এর নাম দইপুর ফরেস্ট।

—এই জঙ্গলে বুঝি খুব দই পাওয়া যায় ?

মামা বললে, দই তো জানি না—তবে বাঘ পাওয়া যায় বিস্তর।

এতক্ষণ পরে ক্যাবলা বললে, সেই বাঘের দুধেই দই হয়।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, তা হতে পারে। কখনও খেয়ে দেখিনি।

শুনে দু'চোখ কপালে তুলল হাবুল সেন : আরে মশয়, কন কী ? আপনে বাঘের দই খান নাই ? আপনার অসাধ্য কর্ম আছে নাকি ? কালীসিঙ্গির মহাভারতের একখানা ঘাও দিয়া— বলেই হঠাৎ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল ; গেছি— গেছি— খাইছে !

কুট্টিমামা অবাক হয়ে বললেন, কী হল তোমার ? কিসে খেলে তোমাকে ?

কিসে খেয়েছে সে আমি দেখেছি। টেনিদা কটাং করে একটা রাম-চিমটি বসিয়েছে হাবুলের পিঠে।

—আমারে একখানা জব্বর চিমটি দিল !

কুট্টিমামা পেছন ফিরে তাকালেন ; কে চিমটি দিয়েছে ?

টেনিদা চটপট বললে, না মামা, কেউ চিমটি দেয়নি। এই হাবুলটার— মানে

পিঠে বাত আছে কিনা, তাই যখন-তখন কড়াং করে চাগিয়ে ওঠে, আর অমনি ওর মনে হয় কেউ ওকে চিমটি কেটেছে।

হাবুল প্রতিবাদ করে বললে, কখনও না— কখনও না ! আমার কোনও বাত নাই !

টেনিদা রেগে গিয়ে বললে, চুপ কর্ হাবলা, মুখে মুখে তক্কো করিসনি ! বাত আছে মামা— ও জানে না। ওর পিঠে বাত আছে— কানে বাত আছে, নাকে বাত আছে—

কুট্টিমামা বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক ! এইটুকু বয়সেই এ-সব ব্যারাম !

—তাই তো বলছি মামা— টেনিদার মুখখানা করুণ হয়ে এল : এইজন্যেই তো ওকে নিয়ে আমাদের এত ভাবনা ! কতবার ওকে বলেছি— হাবলা, অত বাতাবিনেবু খাসনি— খাসনি। বাতাবি খেলেই বাত হয়। এ তো জানা কথা। কিন্তু ভালো কথা কি ওর কানে যায় ? তার ওপর বাতাসা দেখলে তো কথাই নেই— তক্ষুনি খেতে শুরু করে দেবে। এতেও যদি বাত না হয়—

হাবুল আবার হাউমাউ করে কী সব বলতে যাচ্ছিল, কুট্টিমামা তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, বাতাবিলেবু আর বাতাসা খেলে বাত হয় ? তা তো কখনও শুনিনি !

—হচ্ছে মামা, আজকাল আকছার হচ্ছে ! কলকাতায় আজকাল কী যে সব বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানা ঘটছে সে আর তোমায় কী বলব ! এমনকি একটু বেশি করে জল খেয়েছ তো সঙ্গে-সঙ্গেই জলাতঙ্ক।

শুনে কুট্টিমামা চোখ কপালে তুলে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। বললেন, কী সর্বনাশ !

কথা বলে কিছু লাভ হবে না বুঝে হাবুল একদম চুপ। আমি গ্যাঁট হয়ে বসে টেনিদার চালিয়াতি শুনছি। কিন্তু ক্যাবলাটা আর থাকতে পারল না, ফস করে বলে ফেলল, গুল !

টেনিদা চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী বললি ?

ক্যাবলা দারুণ হুঁশিয়ার—সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়েছে। নইলে জিপ থেকে নেমেই নির্ঘাত টেনিদা ওকে পটাপট কয়েকটা চাঁটি বসিয়ে দিত চাঁদির ওপর। বললে, না-না, চারদিকে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে !

আমি অবশ্যি কোথাও কোনও ফুল-টুল দেখতে পেলুম না। কিন্তু ক্যাবলা বেশ ম্যানেজ করে নিয়েছে।

কুট্টিমামা খুশি হয়ে বললেন, হুঁ, ফুল এদিকে খুব ফোটে। কাল জঙ্গলে যখন বেড়াতে নিয়ে যাব, তখন দেখবে ফুলের বাহার।

হাবুলটা এক নম্বরের বোকা, এর মধ্যেই আবার বলে ফেলেছে, মামা আপনার পোষা বাঘটা—

মামা ভীষণ চমকে গেলেন।

—কী বললে ! পোষা বাঘ ! সে আবার কী ?

কিন্তু টেনিদা তক্ষুনি উল্টে দিয়েছে কথাটা। হাঁ-হাঁ করে বললে, না-না মামা, বাঘ-টাঘ নয়। হাবুলের নাকেও বাত হয়েছে কিনা, তাই কথাগুলো ওইরকম শোনায়। ও বলছিল তোমার ধোসা রাগ্‌টা— মানে সেই ধুসো কম্বলটা— যেটা তুমি দার্জিলিঙে কিনেছিলে সেটা আছে তো ?

হাবুল একবার হাঁ করেই মুখ বন্ধ করে ফেললে। কুট্টিমামা আবার দারুণ অবাক হয়ে বললেন, তা সে কম্বলটার কথা এরা জানলে কী করে ?

—হেঁ—হেঁ—টেনিদা খুব কায়দা করে বললে, তোমার সব গপ্পই আমি এদের কাছে করি কিনা ! এরা যে তোমাকে কী ভক্তি করে মামা, সে আর তোমায়—

কথাটা শেষ হল না। ঠিক তখুনি—

জিপের বাঁ দিকের জঙ্গলটা নড়ে উঠল। আর জিপের সামনে দিয়ে এক লাফে যে রাস্তার ওপারে গিয়ে পড়ল, তাকে দেখামাত্র চিনতে ভুল হয় না। তার হলদে রঙের মস্ত শরীরটার উপর কালো কালো ডোরা— ঠিক যেন রোদের আলোয় একটা সোনালি তীর ছুটে গেল সামনে দিয়ে।

আমি বললুম, বা—বা—বা—

'ঘ'-টা বেরুবার আগেই টেনিদা ঝাঁপটে ধরেছে ক্যাবলাকে— আবার ক্যাবলা পড়েছে আমার ঘাড়ের ওপর। আর হাবুল আর্তনাদ করে উঠেছে : খাইছে—খাইছে !

৪। বনের বিভীষিকা

বনের বাঘ অবিশ্যি বনেই গেল, 'হালুম' করে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল না। আর কুট্টিমামা হা হা করে হেসে উঠলেন।

—ওই একটুখানি বাঘ দেখেই ভিরমি খেলে, তোমরা যাবে জঙ্গলে শিকার করতে !

ততক্ষণে গাড়ি এক মাইল রাস্তা পার হয়ে এসেছে। জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে দু'ধারে। আমরাও নড়েচড়ে বসেছি ঠিক হয়ে।

টেনিদা বললে, না মামা, আমরা ভয় পাইনি। বাঘ দেখে ভারি ফুর্তি হয়েছিল কিনা, তাই বাঃ-বাঃ বাঘ বলে আনন্দে চেঁচামেচি করছিলুম। শুধু প্যালাই যা ভয় পেয়েছিল। ও একটু ভিতু কিনা !

বাঃ—ভারি মজা তো ! সবাই মিলে ভয় পেয়ে শেষে আমার ঘাড়ে চাপানো ! আমি তাড়াতাড়ি বললুম, না-না, আমিও ভয় পাইনি। এই ক্যাবলাটাই একটুতে নার্ভাস হয়ে যায়, তাই ওকে ভরসা দিচ্ছিলুম।

ক্যাবলা নাক-মুখ কুঁচকে বললে, ব্যাস্—খামোশ।

শুনে আমার ভারি রাগ হয়ে গেল।

—খা মোষ ! কেন—আমি মোষ খেতে যাব কী জন্যে ? তোর ইচ্ছে হয় তুই মোষ খা—গণ্ডার খা—হাতি খা ! পারিস তো হিপোপটেমাস ধরে ধরে খা !

কুট্টিমামা মিটমিট করে হাসলেন।

—ও তোমাকে মোষ খেতে বলেনি—বলেছে 'খামোশ'—মানে,'থামো'। ওটা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা।

বললুম, না ওসব আমার ভালো লাগে না। চারদিকে বাঘ-টাঘ রয়েছে—এখন খামকা রাষ্ট্রভাষা বলবার দরকার কী ?

হাবুল সেন বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল।

—বুঝছস নি প্যালা—বাঘেও রাষ্ট্রভাষা কয় : হাম—হাম। মানেডা কী ? আমি—আমি—যে-সে পাত্তর না—সাইক্ষাৎ বাঘ। বিড়ালে ইন্দুররে ডাইক্যা কয় : মিঞা আও—আইসো ইন্দুর মিঞা, তোমারে ধইর্যা চাবাইয়া খামু। আর কুত্তায় কয় : ভাগ—ভাগ—ভাগ হো—পলা—পলা, নইলে ঘ্যাঁক্কৎ কইর্যা তর ঠ্যাঙে একখানা জব্বর কামড় দিমু—হঃ।

টেনিদা বললে, বাপ্‌রে, কী ভাষা ! যেন বন্দুক ছুড়ছে !

হাবুল বুক চিতিয়ে বললে, বীর হইলেই বীরের মতো ভাষা কয়। বোঝলা!

জবাব দিলে কুট্টিমামা। বললেন, বোঝলাম। কে কেমন বীর, দু'-একদিনের মধ্যেই পরীক্ষা হবে এখন। এ-সব আলোচনা এখন থাক। এই যে—এসে পড়েছি আমরা।

সত্যি, কী গ্র্যান্ড জায়গা !

তিনদিকে জঙ্গল—আর একদিকে চায়ের বাগান ঢেউ খেলে পাহাড়ের কোলে উঠে গেছে। তার উপরে কমলালেবুর বাগান—অসংখ্য নেবু ধরেছে, এখনও পাকেনি, হলদে-হলদে রঙের ছোপ লেগেছে কেবল। চা-বাগানের পাশে ফ্যাক্টরি, তার পাশে সায়েবদের বাংলো। আর একদিকে বাঙালী কর্মচারীদের সব কোয়ার্টার—কুট্টিমামার ছোট্ট সুন্দর বাড়িটি। অনেকটা দূরে কুলি লাইন। ভেঁপু বাজলেই দলে দলে কুলি মেয়ে ঝুড়ি নিয়ে চায়ের পাতা তুলতে আসে, কেউ-কেউ পিঠে আবার ছোট্ট বাচ্চাদেরও বেঁধে আনে—বেশ মজা লাগে দেখতে।

সায়েবরা কলকাতায় বেড়াতে গেছে—কুট্টিমামাই বাগানের ছোট ম্যানেজার। আমরা গিয়ে পৌঁছুবার পর কুট্টিমামাই বললেন, খেয়ে-দেয়ে একটু জিরিয়ে নাও, তারপর বাগান-টাগান দেখব'খন।

টেনিদা বললে, সেই কথাই ভালো মামা। খাওয়া-দাওয়াটা আগে দরকার। সে-চিনি যে কখন—বলতে বলতেই সামলে নিলে : মানে সেই যে কখন থেকে পেট চিন-চিন করছে !

মামা হেসে বললেন, চান করে নাও—সব রেডি।

চান করবার তর আর সয় না—আমরা সব হুটোপুটি করে টেবিলে গিয়ে বসলুম।

একটা চাকর নিয়ে কুট্টিমামা এ-বাড়িতে থাকেন, কিন্তু বেশ পরিপাটি ব্যবস্থা চারদিকে। সব সাজানো গোছানো ফিটফাট। চাকরটার নাম ছোট্টুলাল। আমরা বসতে-না-বসতে গরম ভাতের থালা নিয়ে এল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, টেনিদা, তুমি যে রামভরসার কথা বলছিলে, সে কোথায় ?

টেনিদা আমার কানে-কানে বললে, চুপ—চুপ ! রামভরসার নাম করিসনি। সে ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে !

—কী ভীষণ কাণ্ড ?

—ভাত দিয়েছে—খা না বাপু! টেনিদা দাঁত খিঁচুনি দিলে : অত কথা বলিস কেন ? বকবক করতে করতে একদিন তুই ঠিক বক হয়ে উড়ে যাবি, দেখে নিস !

—বকবক করলে বুঝি বক হয় ?

—হয় বইকি ! যারা হাঁস-ফাঁস করে তারা হাঁস হয়, যারা ফিস-ফিস করে তারা 'ফিশ' —মানে মাছ হয়—

আরও কী সব বাজে কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল। ফিশকে থামিয়ে দিয়ে 'ডিশ' এসে পড়েছে। মানে, মাংসের ডিশ!

—ইউরেকা !—বলেই টেনিদা মাংসের ডিশে হাত ডোবাল। একটা হাড় তুলে নিয়ে তক্ষুনি এক রাম-কামড়। ছোট্টুলাল ওর গ্লাসে জল দিতে যাচ্ছিল, একটু হলে তার হাতটাই কামড়ে দিত।

ক্যাবলা বললে, মামা—হরিণের মাংস বুঝি ? মামা বললেন, শিকারে না গেলে কি হরিণ পাওয়া যায় ? আজকে পাঁঠাই খাও, দেখি কাল যদি একটা মারতে-টারতে পারি।

—আমরা সঙ্গে যাব তো ?

—আমার আপত্তি নেই।—কুট্টিমামা হাসলেন : কিন্তু বাঘের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়—

ক্যাবলা বললে, না মামা, আমরা ভয় পাব না। পটলডাঙার ছেলেরা কখনও ভয় পায় না। আমাদের লিডার টেনিদাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না।...আচ্ছা টেনিদা, আমরা কি বাঘকে ভয় করি ?

টেনিদা চোখ বুজে, গলা বাঁকিয়ে একমনে একটা হাড় চিবুচ্ছিল। হঠাৎ কেমন ভেবড়ে গেল।

বিচ্ছিরি রেগে, নাকটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে, দেখছিস মন দিয়ে একটা কাজ করছি, খামকা কেন ডিসটার্ব করছিস র‍্যা ? হাড়টাকে বেশ ম্যানেজ করে এনেছিলুম, দিলি মাটি করে!

হাবুল ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে উঠল : তার মানে ভয় পাইতাছে !

—হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছে ! তোকে বলেছে !

—কওনের কাম কী, মুখ দেইখ্যাই তো বোঝন যায়। অখনে পাঠার হাড় খাইতাছ, ভাবতাছ বাঘে তোমারে পাইলেও ছাইড়্যা কথা কইব না—তখন তোমারে নি ধইর‍্যা—

বাঁ হাত দিয়ে দুম করে একটা কিল টেনিদা বসিয়ে দিলে হাবুলের পিঠে।

হাবুল হাউমাউ করে বললে, মামা দ্যাখেন—আমারে মারল।

মামা বললেন, ছিঃ ছিঃ মারামারি কেন ! ওর যদি ভয় হয়, তবে ও বাড়িতে থাকবে। যাদের সাহস আছে, তাদেরই সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

টেনিদার মেজাজ গরম হয়ে গেল।

—কী, আমি ভিতু !

ক্যাবলা বললে, না—না, কে বলেছে সে-কথা ! তবে কিনা তোমার সাহস নেই—এই আর কি !

—সাহস নেই !—এক কামড়ে পাঁঠার হাড় গুঁড়িয়ে ফেলল টেনিদা : আছে কি না দেখবি কাল। বাঘ-ভালুক-হাতি-গণ্ডার যে সামনে আসবে, এক ঘুষিতে তাকে ফ্ল্যাট করে দেব।

ক্যাবলা বললে, এই তো বাহাদুরকা বাত—আমাদের লিডারের মতো কথা।

মামা বললেন, শুনে খুশি হলাম। তবে যা ভাবছ তা নয়, বাঘ অমন ঝট করে গায়ের উপর এসে পড়ে না। তাকেই খোঁজবার জন্যে বরং অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তা ছাড়া সঙ্গে দুটো বন্দুকও থাকবে—ঘাবড়াবার কিছু নেই।

হাবুল সেন খুশি হয়ে বললে, হ, সেই কথাই ভালো। বাঘেরে ঘুষিঘাষি মাইর‍্যা লাভ নাই—বাঘে তো আর বক্সিং-এর নিয়ম জানে না ! দিব ঘচাং কইর‍্যা একখানা কামড় ! বন্দুক লইয়া যাওনই ভালো।

টেনিদা বললে, আঃ, তোদের জ্বালায় ভালো করে একটু খাওয়া-দাওয়া করবারও জো নেই, খালি বাজে কথা ! কই হে ছোট্টুলাল, আর-এক প্লেট মাংস আনো। বেড়ে রেঁধেছে বাপু, একটু বেশি করেই আনো।

বিকেলে আমরা চায়ের বাগানে বেশ মজা করেই বেড়ালুম, কারখানাও দেখা হল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলুম দূরের কমলানেবুর বন পর্যন্ত। জায়গাটা ভালো—সামনে একটা ছোট্ট নদী রয়েছে। আমাদের সঙ্গে ছোট্টুলাল গিয়েছিল, সে বললে, নদীটার নাম জংলি।

সবাই বেশ খুশি, কেবল আমার মেজাজটাই বিগড়ে ছিল একটু। মানে, ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। চা জিনিসটা খেতে ভালো, আমি ভেবেছিলুম চায়ের পাতা খেতেও বেশ খাসা লাগবে। বাগান থেকে একমুঠো কাঁচা পাতা ছিঁড়ে চুপি-চুপি মুখেও দিয়েছিলুম। মাগো—কী যাচ্ছেতাই খেতে ! আর সেই থেকে মুখে এমন একটা বদখত স্বাদ লেগে ছিল যে নিজেকে কেমন ছাগল-ছাগল মনে হচ্ছিল—যেন একটু আগেই কতগুলো কচি ঘাস চিবিয়ে এসেছি।

তার মধ্যে আবার নদীর ধারে দাঁড়িয়ে টেনিদা বাজখাঁই গলায় গান ধরলে :

এমনি চাঁদিনি রাতে সাধ হয় উড়ে যাই,—
কিন্তু ভাই বড় দুঃখ আমার যে পাখা নাই—

বলতে যাচ্ছি—এই বিকেলে চাঁদের আলো এল কোত্থেকে, এমন সময় ফস করে ক্যাবলা সুর ধরে দিলে :

তোমার যে ল্যাজ আছে,
তাই দিয়ে ওড়ো ভাই—

টেনিদা ঘুষি পাকিয়ে বললে, তবে রে—

ক্যাবলা টেনে দৌড় লাগাল। টেনিদা তাড়া করল তাকে। আর পরমুহূর্তেই এক গগনভেদী আর্তনাদ।

হাবুল, ছোট্টুলাল আর আমি দেখতে পেলুম। স্বচক্ষেই দেখলুম।

ঘন ঝোপের মধ্য একখানা কদাকার লোমশ হাত বেড়িয়ে এসে খপ করে টেনিদার কাঁধ চেপে ধরল। আর তারপর বেরিয়ে এল আরও কদাকার, আরও ভয়ঙ্কর একখানা মুখ। সে-মুখ মানুষের নয়। ঘন লোমে সে-মুখও ঢাকা—দুটো হিংস্র হলদে চোখ তার জ্বলজ্বল করছে—আর কী নিষ্ঠুর নির্মম হাসি ঝকঝক করছে তার দু'-সারি ধারালো দাঁতে।

হাবুল বললে, অরণ্যের বি—বি—বি—

আর বলতে পারল না। আমি বললুম—ভীষিকা, তারপরেই ধপাস করে মাটিতে চোখ বুজে বসে পড়লুম। আর টেনিদার করুণ মর্মান্তিক আর্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠল।

৫। শাখামৃগ কথা

অরণ্যের সেই করাল বিভীষিকার সামনে যখন হাবুল স্তম্ভিত, আমি প্রায় মূর্ছিত, ক্যাবলা খানিক দূরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আর টেনিদার গগনভেদী আর্তনাদ—তখন—

তখন আশ্চর্য সাহস ছোট্টুলালের। মাটি থেকে একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুটল সেই ভীষণ জন্তুটার দিকে : ভাগ্—ভাগ্ জলদি !

টেনিদা তো গেছেই—বোধহয় ছোট্টুলালও গেল ! আমি দু'-চোখের পাতা আরও জোরে চেপে ধরেছি, এমনি সময় কিচ-কিচ কিচিং-কাচুং বলেই একটা অদ্ভুত আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবলার অট্টহাসি !

চমকে তাকিয়ে দেখি, বনের সেই বিভীষিকা টেনিদার ঘাড় ছেড়ে দিয়ে লাফে লাফে সামনের একটা উঁচু শিমুল ডালে উঠে যাচ্ছে। আর ছোট্টুলাল শুকনো ডালটা উঁচিয়ে তাকে ডেকে বলছে : আও—আও—ভাগ্‌তা কেঁও ! মার্‌কে মার্‌কে তেরি হাড্ডি হাম পটক দেব—হুঁঃ !

কিন্তু হাড্ডি পটকাবার জন্যে সে আর গাছ থেকে নামবে বলে মনে হল না। বরং গাছের উপর থেকে তার দলের আরও পাঁচ-সাতজন দাঁত খিঁচিয়ে বললে,

কিঁচ-কিঁচ-কাঁচালঙ্কা—কিচ্চিৎ—

এখনও কি ব্যাপারটা বলে দিতে হবে ? ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আর কিছু নয়, একটা গোদা বানর।

ক্যাবলা তখনও হাসছে। বললে, টেনিদা—ছ্যা-ছ্যা। পটলডাঙার ছেলে হয়ে একটা বানরের ভয়ে তুমি ভিরমি গেলে !

টেনিদা মুখ ভেংচে বললে, থাম—থাম—বেশি চালিয়াতি করতে হবে না। কী করে বুঝব যে ওটা বানর ? খামকা জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে বিচ্ছিরি মুখ করে অমন করে ঘাড়টা খিমচে দিলে কার ভালো লাগে বল দিকি ?

আমি বেশ কায়দা করে বললুম, আমি আর হাবলা তো দেখেই বুঝতে পেরেছিলুম যে ওটা বানর। তাই আমরা হাসছিলুম।

হাবুল বললে, হ-হ। আমরা খুবই হাসতে আছিলাম।

ছোট্টুলালই গোলমাল করে দিলে। বললে, কাঁহা হাঁসতে ছিলেন ? আপলোগ তো ডর খাকে একদম ভুঁইপর বৈঠে গেলেন !

টেনিদা বললে, মুরুক-গে, আর ভালো লাগছে না। মেজাজ-টেজাজ সব খিঁচড়ে গেছে। দিব্যি বিকেল বেলায় গান-টান গাইছিলুম, কোত্থেকে বিটকেল একটা গোদা বানর এসে দিলে মাটি করে।

ছোট্টুলাল বললে, আপ অত চিল্লালেন কেন ? বান্দরকে কষিয়ে এক থাপ্পড় লাগিয়ে দিতেন—উসকো বদন বিগড়াইয়ে যেত—হুঁঃ !

—তার আগে ও আমারই বদন বিগড়ে দিত ! বাপরে কী দাঁত ! নে বাপু, এখন বাড়ি চল। বাঁদরের পাল্লায় পড়ে পেটের খিদে বড্ড চাগিয়ে উঠেছে—কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক।

শিমুল গাছের উপর বানরগুলো তখনও কিচির-মিচির করছিল। ছোট্টুলাল শুকনো ডালটা তাদের দেখিয়ে বললে, আও—একদফা উতার আও। এইসা মারেগা কি—

উত্তরে পটাপট করে কয়েকটা শুকনো শিমুলের ফল ছুটে এল। আমি আঁই আঁই আঁই করে মাথাটা সরিয়ে না নিলে একটা ঠিক আমার নাকে এসে লাগত।

হাবুল সেন বললে, শূন্য থিক্যা গোলাবর্ষণ করত্যাছে—পাইর্যা উঠবা না। অখনি ধরাশায়ী কইর্যা দিব সক্কলরে।

বলতে বলতে—ঠকাস ! ঠিক তাক-মাফিক একটা শিমুলের ফল এসে লেগেছে ছোট্টুলালের মাথায় ! এ দাঃদ্দা—বলেসে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল—আর তক্ষুনি ফলটা ফেটে চৌচির হয়ে শিমুল তুলো উড়তে লাগল চারিদিকে।

ছোট্টুলালের সব বীরত্ব উবে গেছে তখন। —বহুৎ বদমাস বান্দর—বলেই সে প্রাণপণে ছুট লাগাল। বলা বাহুল্য, আমরাও কি আর দাঁড়াই ? পাঁচজনে মিলে অ্যায়সা স্পিডে ছুটলাম যে অলিম্পিক রেকর্ড কোথায় লাগে তার কাছে। গাছের উপর থেকে বানরদের জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল—পলাতক শত্রুদের ওরা যেন বলছে—দুয়ো, দুয়ো।

কুট্টিমামার কোয়ার্টারে ফিরে মন-মেজাজ যাচ্ছেতাই হয়ে গেল।

পটলডাঙার চারমূর্তি আমরা—কোনও কিছু আমাদের দমাতে পারে না—শেষকালে কিনা একদল বানর আমাদের বিধ্বস্ত করে দিলে। ছ্যা-ছ্যা!

প্লেট-ভর্তি হালুয়ায় একটা খাবলা বসিয়ে টেনিদা বললে, কী রকম খামকা বাঁদরগুলো আমাদের ইনসাল্ট করলে বল দিকি!

ক্যাবলা বললে, অসহ্য অপমান।

আমি বললুম, এর প্রতিকার করতে হবে।

হাবুল বললে, হ, অবশ্যই প্রতিশোধ লইতে হইব।

টেনিদা বললে, যা বলেছিস—নির্মম প্রতিশোধ নেওয়া দরকার।—বলেই আমার হালুয়ার প্লেট ধরে এক টান।

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলুম, তা আমার প্লেট ধরে টানাটানি কেন? আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও নাকি?

—মেলা বকিসনি। টেনিদা থাবা দিয়ে আমার প্লেটের অর্ধেক হালুয়া তুলে নিলে: তোর ভালোর জন্যেই নিচ্ছি। অত খেয়ে তুই হজম করতে পারবি না—যা পেটরোগা!

—আর তুমি পেটমোটা হয়েই বা কী কীর্তিটা করলে শুনি?—আমার রাগ হয়ে গেল—একটা বানরের ভয়ে একদম মূর্ছা যাচ্ছিলে।

—কী বললি?—বলে টেনিদা আমাকে একটা চাঁটি মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাবলা হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে এমন চেঁচিয়ে উঠল যে থমকে গেল টেনিদা।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, সর্বনাশ হয়ে গেল।

—কিসের সর্বনাশ রে?

—বানরটা তোমার ঘাড়ে আঁচড়ে দেয়নি তো?

—দিয়েছে বোধহয় একটু।—টেনিদা ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে বললে, সে কিছু না—সামান্য একটুখানি নখের আঁচড়। তা কী হয়েছে?

ক্যাবলা মুখটাকে প্যাঁচার মতন করে বললে, দিয়েছে তো একটু আঁচড়! বাস—আর দেখতে হবে না।

টেনিদার গলায় হালুয়ার তাল আটকে গেল।

—কী দেখতে হবে না? অমন করছিস কেন?

ক্যাবলা মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলে, কুকুরে কামড়ালে কী হয়?

হাবুল দারুণ উৎসাহে বললে, কী আবার হইব? জলাতঙ্ক।

টেনিদা মুখখানা কুঁকড়ে-টুকড়ে কি রকম যেন হয়ে গেল। ঠিক একতাল হালুয়ার মতো হয়ে গেল বলা চলে।

—কিন্তু আমাকে তো কুকুরে কামড়ায়নি। আর, মাত্র একটু আঁচড়ে দিয়েছে—তাতে—

এইবার আমি কায়দা পেয়ে বললুম, যা হবার ওতেই হবে—দেখে নিয়ো।

—কী হবে? টেনিদার হালুয়ার মতো মুখটা এবার ডিমের ডালনার মতো হয়ে

গেল।

ক্যাবলা খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে, কেন, প্রেমেন মিত্তিরের গল্প পড়োনি? হবে স্থলাতঙ্ক।

—অ্যাঁ!

—তারপর তুমি আর মাটিতে থাকতে পারবে না। বানরের মতো কিচমিচ আওয়াজ করবে—

আমি বললুম, এক লাফে গাছে উঠে পড়বে—

হাবুল সেন বললে, আর গাছের ডালে বইস্যা বইস্যা কচি-কচি পাতা ছিড়্যা ছিড়্যা খাইবা।

টেনিদা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল: আর বলিসনি—সত্যি আর বলিসনি। আমি বেজায় নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি। ঠিক কেঁদে ফেলব বলে দিলুম।

বোধহয় কেঁদেও ফেলত—হঠাৎ কুট্টিমামা এসে গেলেন।

—কী হয়েছে রে? এত গণ্ডগোল কেন?

—মামা, আমার স্থলাতঙ্ক হবে—টেনিদা আর্তনাদ করে উঠল।

—স্থলাতঙ্ক! তার মানে?—কুট্টিমামার চোখ কপালে চড়ে গেল।

আমরা সমস্বরে ব্যাপারটা যে কী তা বোঝাতে আরম্ভ করলুম। শুনে কুট্টিমামা হেসেই অস্থির। বললেন, ভয় নেই, কিছু হবে না। একটু আইডিন লাগিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শুনে টেনিদার সে কী হাসি! বত্রিশটা দাঁতই বেরিয়ে গেল যেন।

—তা কি আর আমি জানি না মামা। এই প্যালারামকেই একটু ঘাবড়ে দিচ্ছিলুম কেবল।

চালিয়াতিটা দেখলে একবার?

৬। বড় বেড়ালের আবির্ভাব

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমরা বারান্দায় এসে বসলুম। আকাশ আলো করে চাঁদ উঠেছে। চায়ের বাগান, দূরের শালবন, আরও দূরের পাহাড় যেন দুধে স্নান করছে। ঝিরঝিরে মিষ্টি হওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। খাওয়াটাও হয়েছে দারুণ। আমার ইচ্ছে করছিল গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ি। কিন্তু কুট্টিমামা গল্পের থলি খুলে বসেছেন—সে-লোভও সামলানো শক্ত।

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসেছি। একখানা ছোট তক্তোপোশে আধশোয়া হয়ে আছেন কুট্টিমামা। সামনে গড়গড়া রয়েছে, গুড়গুড় করে টানছেন আর গল্প বলছেন।

সেই অনেক কাল আগের কথা। জঙ্গল, কেটে সবে চায়ের বাগান হয়েছে। বড় বড় পাইথন, বাঘ আর ভালুকের রাজত্ব। কালাজ্বর, আমাশা, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া এ-সব লেগেই আছে। বাগানে কুলি রাখা শক্ত—দু'দিন পরে কে কোথায় পালিয়ে যায় তার আর ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কুলিদের আর কী দোষ—প্রাণের মায়া তো সকলেরই আছে।

তখন কুট্টিমামার বাবা এই বাগানে কাজ করতেন। পাকা রাস্তা ছিল না—যোলো মাইল দূরের রেল স্টেশন থেকে গোরুর গাড়ি করে আসতে হত। বাঘ-ভালুকের সঙ্গে দেখা হত হামেশা। কুট্টিমামা তখন খুব ছোট্ট—কত জন্তু-জানোয়ার দেখেছেন কতবার।

তারই একদিনের গল্প।

সেবার কুট্টিমামা আর ওঁর বাবা নেমেছেন রেল থেকে—বিকেলের গাড়িতে। সময়টা শীতকাল। একটু পরেই অন্ধকার নেমে এল। কাঁচা রাস্তা দিয়ে গোরুর গাড়ি দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে ঘন অন্ধকার শাল-শিমুলের বন। কুট্টিমামা চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, জঙ্গলের মধ্যে থোকা থোকা জোনাক জ্বলছে। অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে হাতির ডাক—হরিণ ডেকে উঠছে মধ্যে মধ্যে—গাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে খরগোশ। ঝিঁঝির আওয়াজ উঠছে একটানা—ঘুমের ভেতর গাছের ডালে কুঁক-কুঁক করছে বনমুরগি।

দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন কুট্টিমামা। টুকুটক করে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

গাড়ি থেমে দাঁড়িয়েছে। শালবনের ভেতর দিয়ে সেদিনও অনেকখানি চাঁদের আলো পড়েছে বনের রাস্তায়। সেই চাঁদের আলোয় আর বনের ছায়ায়—

কুট্টিমামা যা দেখলেন তাতে তাঁর দাঁত-কপাটি লেগে গেল।

গোরুর গাড়ি থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে এক বিকট মূর্তি। কুচকুচে কালো লোমে তার শরীর ভরা—বুকে কলারের মতো একটা শাদা দাগ। হিংসায় তার চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে। মুখটা খোলা—দু'সারি দাঁত যেন সারি সারি ছুরির ফলার মতো সাজানো। আলিঙ্গন করবার ভঙ্গিতে হাত দু'খানা দু'পাশে বাড়িয়ে অল্প টলতে টলতে এগিয়ে আসছে সে।

ভালুক।

ভালুক বলে কথা নয়। এদিকের জঙ্গলে ছোটখাটো ভালুক কিছু আছেই। কিন্তু মানুষ দেখলে তারা প্রায়ই বিশেষ কিছু বলে না—মানে মানে নিজেরাই সরে যায়। কিন্তু এ তো তা নয়! অদ্ভুত বড়—অস্বাভাবিক রকমের বিরাট! আর কী তার চোখ—কী দৃষ্টি সেই চোখে! সাক্ষাৎ নরখাদক দানবের চেহারা।

গোরু দুটোর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। ছটফট করছে—একটা বিচিত্র আওয়াজ বেরুচ্ছে তাদের গলা দিয়ে।

কুট্টিমামার বাবাও দারুণ ভয় পেয়েছেন। সঙ্গে বন্দুক নেই। ফিসফিস করে বললেন, এখন কী হবে?

নেপালি গাড়োয়ান বীর বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বললে, কিছু ভাববেন না বাবু, আমি ব্যবস্থা করছি।

ফস করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল বীর বাহাদুর। ভালুক তখন পাঁচ-সাত হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। কুট্টিমামা ভাবলেন, এইবার গেছে বীর বাহাদুর! ভালুক এখুনি দু'হাতে ওকে বুকে জাপটে ধরবে। আর যা চেহারা ভালুকের! একটি চাপে সমস্ত হাড়-পাঁজরা একেবারে গুঁড়ো করে দেবে। ভালুকরা অমনি করেই মানুষ মারে কিনা!

কিন্তু নেপালীর বাচ্চা বীর বাহাদুর—এ-সব জিনিসের অন্ধিসন্ধি সে জানে। চট করে গাড়ির তলা থেকে একরাশ খড় বের করে আনল, তারপর দেশলাই ধরিয়ে দিতেই খড়গুলো মশালের মতো দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল।

আর সেই জ্বলন্ত খড়ের আঁটি নিয়ে সে এগিয়ে গেল ভালুকের দিকে।

আগুন দেখে ভালুক থমকে গেল। তারপর বীর বাহাদুর আর-এক পা সামনে বাড়াতেই সব বীরত্ব কোথায় উবে গেল তার। অতবড় পেল্লায় জানোয়ার চার পায়ে একেবারে চোঁ-চোঁ দৌড়—বোধহয় সোজা পাহাড়ে পৌঁছে তবে থামল।

কুট্টিমামার গল্প শুনে আমরা ভীষণ খুশি।

টেনিদা বললে, মামা, আমাদের কিন্তু শিকারে নিয়ে যেতে হবে।

কুট্টিমামা বললেন, যে-সব বীরপুরুষ, বাঘের ডাক শুনলেই—

হাবুল সেন বললে, না মামা, ভয় পামু না। আমরাও বাঘেরে ডাকতে থাকুম। ডাইক্যা কমু—আইসো বাঘচন্দর, তোমার লগে দুইটা গল্পসল্প করি।

ক্যাবলা বললে, আর বাঘও অমনি হাবুলের পাশে বসে গলা জড়িয়ে ধরে গল্প আরম্ভ করে দেবে।

তখন আমি বললুম, আর মধ্যে-মধ্যে হাবলাকে আলুকাবলি আর কাজুবাদাম খেতে দেবে।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কী যে বাজে বকবক করিস তোরা—একদম ভালো লাগে না। হচ্ছে একটা দরকারি কথা—খামকা ফাজলামি জুড়ে দিয়েছে!

কুট্টিমামা হাই তুলে বললেন, আচ্ছা, সে হবে-এখন। এখন যাও—শুয়ে পড় গে সবাই। কালকে ভাবা যাবে এ-সব।

টেনিদা, হাবুল আর কুট্টিমামা শুয়েছেন বড় ঘরে। এ-পাশের ছোট ঘরটায় আমি আর ক্যাবলা।

বিছানায় শুয়েই কুর-কুর্ করে ক্যাবলার নাক ডাকছে। কিন্তু অচেনা জায়গায় এত সহজেই আমার ঘুম আসে না। মাথার কাছে টিপয়ের উপর একটা ছোট্ট নীল টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। আমি ল্যাম্পটাকে একেবারে বালিশের পাশে টেনে আনলুম। তারপর সুটকেস খুলে শিবরামের নতুন হাসির বই 'জুতো নিয়ে জুতোজুতি' আরাম করে পড়তে লেগে গেলুম।

পড়ছি আর নিজের মনে হাসছি। পাশেই খোলা জানালা দিয়ে মিঠে হাওয়া

আসছে। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় স্নান করছে চায়ের বাগান আর পাহাড়ের বন। কতক্ষণ সময় কেটেছে জানি না। হাসতে হাসতে এক সময় মনে হল, জানালার গায়ে যেন খড়খড় করে আওয়াজ হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি, একটা বেশ বড়সড় বেড়াল। জানালার ওপর উঠে বসেছে—আর জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

বললুম, যাঃ—যাঃ—পালা—

পালাল না। বললে, গর্—র্—র্—

তখন আমার ভালো করে চোখে পড়ল।

শুধু একটা নয়—তার পাশে আর একটা বেড়াল। সেটার হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা—ভাঁটার মতো চোখ আর গায়ে ঘন হলদের ওপর কালো ফোঁটা।

এত বড় বেড়াল! আর, এ কেমন বেড়াল!

সেই প্রকাণ্ড বেড়ালটাও বললে, গর্—র্—র্—ঘুঁ।

আর ঘুঁ! আমি তৎক্ষণাৎ আকাশ-ফাটানো চিৎকার করলুম একটা। তারপর ক্যাবলাকে জড়িয়ে ধরে সোজা আছড়ে পড়লুম বিছানা থেকে। টেবিল-ল্যাম্পটাও সেইসঙ্গে ভেঙে চুরমার।

আর সেই অথই অন্ধকারের ভেতর—

৭

অন্ধকারে দু'জনে কুমড়োর মতো গড়াগড়ি খেলুম কিছুক্ষণ। ক্যাবলা যতই বলে, ছাড়—ছাড়—আমি ততই গোঁ-গোঁ করতে থাকি : বা—বা—বা—

এর ভেতরে লণ্ঠন হাতে টেনিদা, হাবলা আর কুট্টিমামা এসে হাজির। ছোট্টুলালও সেইসঙ্গে।

—কী হল ? কী হল ?

—আরে ই ক্যা ভৈল বা ?

ক্যাবলা তড়াক করে উঠে পড়ে বললে, দেখুন না কুট্টিমামা, ঘুমের ঘোরে প্যালাটা আমাকে জাপটে ধরে খাট থেকে নীচে ফেলে দিলে। কিছুতেই ছাড়ে না। খালি বলছে : বা—বা—বা—

বা—বা—বা ?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তার মানে, বাঃ—বেশ মজার খেলা হচ্ছে! এই প্যালাটাকে নিয়ে সব সময় একা কেলেঙ্কারি হবে। ওর গাধার মতো লম্বা কান দুটোকে ইস্ক্রুপের মতো পেঁচিয়ে দিলে তবে ঠিক হয়। এই প্যালা, এই গাড়লরাম—উঠে পড় বলছি—

আমি কি উঠি নাকি অত সহজে ? ক্যাবলার পাশেই তো সেই একজোড়া বড় বেড়াল বসে আছে!

চোখ বুজেই বলি, ওই জা—জা—জা—

হাবুল বললে, কারে যাইতে কস ? কেডা যাইব ?

বললুম, জা—নালায়!

হাবুল বিচ্ছিরি চটে গেল। বললে, কী, আমি নালায় যামু ? ক্যান, আমি নালায় যামু ক্যান ? তর ইচ্ছা হইলে তুই যা—নালায় যা, নর্দমায় যা—গোবরের গাদায় যা—

আমি তেমনি চোখ বুজে বললুম, দুত্তোর! জানালায় তা—তাকিয়ে দ্যাখো না একবার! বা—বাঘ বসে আছে ওখানে!

—অ্যাঁ, জানালায় বাঘ!—বলেই টেনিদা লাফ দিয়ে প্রায় হাবুলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

হাবুল বললে, ইঃ—খাইছে, খাইছে।

কুট্টিমামা হেসে উঠলেন।

—জানালায় বাঘ ? এই বাগানের ভেতর ? ঘুমের ঘোরে তুমি স্বপ্ন দেখেছ প্যালারাম!

ক্যাবলা খিক-খিক করে হাসতে লাগল, হাবুল খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগল, টেনিদা খ্যাঁচর-খ্যাঁচর করে হেসে চলল। আর পেট চেপে ধরে খৌ-খৌ করে সবচেয়ে বেশি করে হাসতে লাগল ছোট্টুলাল।

—খৌ —খৌ—খৌ! আরে খৌ—খৌ—বাঘ কাঁহাসে আসবে। বাঘের মাসি এসেছিল হোবে—খৌ—খৌ—খৌ—! কী খুশি সবাই, আর কী হাসির ধুম! যেন আমাকে পাগল পেয়েছে ওরা!

রাগে গা জ্বলে গেল, আমি উঠে বসলুম।

—চলে গেছে কিনা, তাই সবাই হাসছে। যদি দেখতে—

টেনিদা বললে, আমিও তো দেখেছিলুম। এই একটু আগেই। দুটো গণ্ডার আর তিনটে জলহস্তী আমার দিকে তেড়ে আসছিল। আমি এক ঘুষিতে একটা গণ্ডারকে মেরে ফেললুম—দুই চড়ে দুটো জলহস্তী কাত হয়ে গেল। বাকি দুটো ল্যাজ তুলে পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে পালাল। অবিশ্যি স্বপ্নে।

আবার হাসি। ছোট্টুলাল তো প্রায় নাচতে লাগল। আমার এত রাগ হল যে ইচ্ছে করতে লাগল ছোট্টুলালের ঠ্যাঙে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দিই কিংবা ওর কানের ভেতরে কতগুলো লাল পিঁপড়ে ঢেলে দিই।

কুট্টিমামা বললেন, থামো—থামো। সবটা ওকে বলতে দাও। আচ্ছা প্যালারাম, তুমি তো ঘুমুচ্ছিলে ?

—মোটেই না। আমি শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিলুম।

—তারপরে ?

—জানালায় একটা গর্র্ আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি—

বলতে বলতে আমি থেমে গেলুম। বুকের ভেতর দুরুদুরু করে উঠল।

—কী দেখলে ?

—প্রথমে একটা বাচ্চা—বড়সড় বেড়ালের মতো দেখতে। তারপরে আর একটা। জালার মতো মাথা—ভাঁটার মতো চোখ, কাঁটার মতো গোঁফ—

ক্যাবলা বললে, ধামার মতো পিলে—

টেনিদা বললে, শিঙিমাছের মতো শিং—

হাবুল জুড়ে দিলে, আর পটোলের মতন দাঁত—

বুঝতে পারছ তো ? আমার সেই পালা-জ্বরের পিলে আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলকে ঠাট্টা করা হচ্ছে।

শুনে কুট্টিমামা পর্যন্ত মুচকে মুচকে হাসলেন, আর খৌয়া—খৌ-খৌ বলে আবার নাচতে শুরু করে দিলে ছোট্টুলাল।

ভাবছি ছোট্টুলালকে এবার সত্যিই ঘ্যাঁচ করে একখানা ল্যাং মেরে দেব যা থাকে কপালে, এমন সময় টেনিদা বললে, না কুট্টিমামা, প্যালাকে আর এখানে রাখতে ভরসা হচ্ছে না।

ক্যাবলা বললে, ঠিক। বাঘের কথা শুনেই যেমন করছে, তাতে তো—

হাবুল বললে, বাঘ একখান চক্ষের সামনে দেখলে ভয়েই মইর‍্যা যাইব নে।

টেনিদা বললে, কালই ওকে প্লেনে তুলে দেওয়া যাক।

ক্যাবলা বললে, বেয়ারিং পোস্টে।

হাবুল বললে একটা বস্তার মইধ্যে কইর‍্যা তুইল্যা দিলেই হইব—পয়সা লাগব না।

অপমানে আমার কান কটকট করতে লাগল, খালি মনে হতে লাগল নাকের ডগায় কতগুলো উচ্চিংড়ে লাফাচ্ছে। কিন্তু এদের কোনও কথা বলে লাভ নেই—এরা বিশ্বাস করবে না। আমি রেগে গোঁজ হয়ে বসে রইলুম।

কুট্টিমামা বললেন, যাও—যাও, সব শুয়ে পড় এখন। আর রাত জেগে শরীর খারাপ করে লাভ নেই।

আমি শেষবার বলতে চেষ্টা করলুম : আপনারা বিশ্বাস করছেন না—

টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, ঝা—যা খুব হয়েছে ! আর ওস্তাদি করতে হবে না তোকে। রাক্ষসের মতো খাবি আর শেষে পেট-গরম হয়ে উট্টুম-ধুট্টুম স্বপ্ন দেখবি ! দরজা-জানালা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে পড়। কাল ভোরের প্লেনে যদি তোকে কলকাতায় চালান না করি তো—

দাঁত বের করে আরও কী সব বলতে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময় একটা বিকট হৈচই চিৎকার। সেটা এল কুলি লাইনের দিক থেকে। তারপরেই জোর টিন-পেটানোর আওয়াজ।

আমরা সবাই ভীষণভাবে চমকে উঠলুম। সবচাইতে বেশি করে চমকালেন কুট্টিমামা।

—ও কী ! ও আওয়াজ কেন ?

চিৎকারটা আরও জোরালো হয়ে উঠল। আকাশ ফেটে যেতে লাগল টিন-পেটানোর শব্দে। তারপরেই কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বাইরে থেকে হাঁক পাড়ল : বাবু—ছোট ম্যানেজারবাবু—

ছোট্টুলাল দরজা খুলে দিলে। দেখা গেল, লণ্ঠন হাতে কুলিদের একজন সর্দার।

কুট্টিমামা বললেন, কী হয়েছে রে ? অমন চেঁচামেচি করছিস কেন ?

—কুলি-লাইনে বাঘ এসেছিল বাবু !

বাঘ !

ঘরে যেন বাজ পড়ল। আর দেখি—সবাই যেন হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আর ছোট্টুলালের চোখ দুটো একেবারে গোল গোল হয়ে গেছে—টিকিটা খাড়া হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে !

এইবারে জুত পেয়ে আমি বললুম, কেমন বাপু ছোট্টুলাল—আভি খৌয়া-খৌয়া করকে হাসছ না কেন ?

কুলি-সর্দার বললে, একটা চিতা, সঙ্গে বাচ্চাও ছিল। একটা গোরুকে জখম করেছে আর একটা ছাগল মেরে নিয়ে পালিয়েছে।

কারও মুখে আর কথাটি নেই।

আর—তক্ষুনি আমি ঘর কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলুম। সেই হাসির আওয়াজে টেনিদা লাফিয়ে হাবুলের ঘাড়ের উপর পড়ল—হাবুল গিয়ে পড়ল ছোট্টুলালের গায়ে, আর—আঁই দাদা বলে চিৎকার ছেড়ে একেবারে চিৎপাত হল ছোট্টুলাল।

৮

কুট্টিমামা বললেন, তাই তো ! আবার চিতাবাঘের উৎপাত শুরু হল।

সর্দার বললে, ওদিকের জঙ্গলে বাঘ বড় বেড়ে গেছে বাবু। মাসখানেক ধরেই আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। এখন একেবারে বাগানে ঢুকে পড়েছে। আর আসতে যখন শুরু করেছে তখন সহজে ছাড়বে না।

কুট্টিমামা মাথা নেড়ে বললেন, দু'-একটা না মারলে চলছে না। আচ্ছা, এখন যাও। দেখি কাল সকালে কী করা যায়।

সর্দার চলে গেল। কুট্টিমামা বললেন, তোমরাও সব শুয়ে পড় গে। আর প্যালারাম—এবার ভালো করে জানালা বন্ধ করে দিয়ো।

আমরা সব চুপচাপ চলে এলুম। হাবুলের বকবকানি, টেনিদার চালিয়াতি আর ফুট-কাটা একদম বন্ধ। সব একেবারে স্পিক্‌টি নট। আর ছোট্টুলাল ? সে তো তক্ষুনি—আঁই দাদা হো—বলে একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

খড়খড়ি আর কাচের জানালা দুটোই বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি, ক্যাবলা বললে,

খড়খড়িটা খুলে রাখ না প্যালা। বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ দেখা যাবে। কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে রে।

আমি দাঁত-মুখ খুব বিচ্ছিরি করে বললুম, থাক—আর পারৃকিতিক দিরিশ্যি দেখে দরকার নেই। চাঁদের আলোয় খুশি হয়ে বাঘ এসে যদি জানালার বাইরে দাঁত খিঁচোয়?

—আমরাও বাঘকে ভেংচে দেব।

—আর যদি জানালা ভেঙে ঢোকে?

—আমরা দরজা ভেঙে পালিয়ে যাব।

দেখেছ ইয়ার্কিটা একবার! বাঘ যেন আমাদের পটলডাঙার একাদশী কুণ্ডু—পেছন থেকে 'হাঁড়ি ফাটল' 'হাঁড়ি ফাটল' বলে চেঁচিয়ে চটিয়ে দিলেই হল!

বললুম, বেশি ফেরেব্বাজি করিসনে ক্যাবলা, ঘুমো।—বলে আমি দুটো জানালাই শক্ত করে এঁটে দিলুম। ঘুমোতে চেষ্টা করছি—কিন্তু ঘুম কি ছাই আসে? খালি বন্ধ জানালায় চোখ পড়ছে। এই মনে হচ্ছে বাইরের খড়খড়ি কেউ কড়কড় করে আঁচড়াচ্ছে, আবার যেন শুনছি ঘাসের উপর দিয়ে কী সব হাঁটছে—হুমহাম করে কী একটা ডেকেও উঠল। এদিকে আবার নকের ডগায় দু'-তিনটে মশা বিন-বিন করছে। ক্যাবলাটা তো দেখতে-না-দেখতেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কী করি? মশারি একটা আছে—ফেলে দেব? কিন্তু মশারির ভেতরে আমি একদম শুতে পারি না—কেমন দম আটকে আসে।

তা হলে মশাই মারি—কী আর করা? কিন্তু চেষ্টা করে দেখলুম, কিছুতেই মারা যায় না। নাকের ওপর চাঁটি হাঁকড়েছি তো কানের কাছে গিয়ে পোঁ করে উঠল। আবার কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ করেছি তো শত্রুবাহিনী নাসিকে এসে উপস্থিত। কাঁহাতক পেরে ওঠা যায়? আধঘণ্টা ধরে নিজেকে সমানে চাঁটিয়ে এবং ঘুষিয়ে—শেষতক হাল ছেড়ে দিলুম। বললুম, যাও না বাপু—জঙ্গলে যাও না। বাঘ আছে—হাতি আছে, অনেক রক্ত আছে তাদের গায়ে। যত খুশি খাও গে! আমি পটলডাঙার প্যালারাম—সবে পালা-জ্বরের পিলেটা সেরেছে—আমার রক্তে আর কী পাবে? খানিক পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল বই তো নয়।

যেই বলেছি—অমনি কী কাণ্ড।

হুড়মুড়িয়ে জানালাটা ভেঙে পড়ল। আর কী সর্বনাশ! বাইরে—বাইরে যে একটা হাতি! পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড—জমাট অন্ধকার দিয়ে তৈরি তার শরীর! দুটো কুতকুতে চোখে আমার দিকে খানিক তাকিয়েই কেমন যেন মিটমিট করে হাসল। তারপরেই করেছে কী—হাত-দশেক লম্বা একটা শুঁড় বাড়িয়ে কপাৎ করে আমার একটা লম্বা কান টেনে ধরেছে।

এতক্ষণ তো আমি পান্তুয়ার মতো পড়ে আছি—কিন্তু এবার আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া! 'বাপ-রে—মা-রে—মেজদা রে—পটলডাঙা রে'—বলে রাম-চিৎকার ছেড়েছি!

আর তক্ষুনি কানের কাছে ক্যাবলা বললে, কী আরম্ভ করেছিস প্যালা? ভিতুর ডিম কোথাকার!

বললুম, হা—হা—হাতি!

ক্যাবলা বললে, গোদা পায়ের লাথি!

চমকে চোখ মেলে চাইলুম। কোথায় হাতি—কোথায় কী! ঘরভর্তি ঝকঝকে সকালের আলো। আর ক্যাবলা কোত্থেকে একটা পাখির পালক কুড়িয়ে এনে আমার কানের ভেতর দিতে চেষ্টা করছে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। আর পালকটা আমার কানে ঢোকাতে না পেরে ভারি ব্যাজার হল ক্যাবলা। বললে, কোথায় রে তোর হা—হা—হাতি? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি?

—বকিসনি! আমার কানে পালক দিচ্ছিলি কেন?

—তোকে জাগাবার জন্যে। কিন্তু পারলুম কই? তার আগেই তো জেগে গেলি—ইস্টুপিড কোথাকার!

—মারব এক থাপ্পড়—বলে আমি রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

সকালের চা এবং সেইসঙ্গে লুচি-আলুভাজা-রসগোল্লার 'টা' বেশ ভালোই হল তারপর কুট্টিমামা চলে গেলেন ফ্যাক্টরিতে। আমাদের বলে গেলেন, তোমরা বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াও—ভয়ের কিছু নেই। তবে জঙ্গলের দিকে যেয়ো না। চিতাবাঘের উৎপাত যখন শুরু হয়েছে, তখন সাবধান থাকাই ভাল।

টেনিদা বললে, হেঃ—বাঘ! জানো কুট্টিমামা—রাত্তিরেই কেমন একটু বেকায়দা হয়ে যায়। কিন্তু দিনের বেলায় বাঘ একবার আসুক না সামনে। এমন একখানা আন্ডারকাট্ বসিয়ে দেব—

হাবুল বললে, আপনার কালীসিঙ্গির মহাভারতের থিক্যাও জব্বর!

কুট্টিমামা অবাক হয়ে বললেন, আমার কালীসিঙ্গির মহাভারত! তার মানে?

হাবুল সবে বলতে যাচ্ছে; সেই যে মহাভারতের একখানা পেল্লায় ঘাও নি মাইর‍্যা—

আর বলতে পারল না। তার আগেই টেনিদা ওর পিঠে কটাং করে একটা জবরদস্ত চিমটি কেটে দিয়েছে।

হাবুল হাউ-মাউ করে উঠল: খাইসে, খাইসে!

কুট্টিমামা আরও অবাক হয়ে বললেন, খাইছে! কীসে খেল তোমাকে?

—টেনিদা!

টেনিদা তাড়াতাড়ি বললে, না মামা, আমি ওকে খাচ্ছি না। ওটা এত অখাদ্য যে বাঘে খেলেও বমি করে দেবে। ওর পিঠে একটা ডেয়ো পিঁপড়ে কামড়াচ্ছিল, সেটাকে ফেলে দিলুম কেবল। তুমি যাও—নিজের কাজে যাও।

খানিকক্ষণ কেবল বোকা-বোকা হয়ে তাকিয়ে দেখে কুট্টিমামা চলে গেলেন।

টেনিদা এবার হাবুলের মাথায় কুট্টুস্ করে একটা ছোট্ট গাঁট্টা দিলে। বললে, তোকে ও-সব বলতে আমি বারণ করিনি? জানিসনে—নিজের বীরত্বের কথা বললে কুট্টিমামা লজ্জা পায়?

—আর তোমার সব চালিয়াতি ফাঁস হয়ে যায়। টুক করে কথাটা বলেই ক্যাবলা তিন হাত লাফিয়ে সরে গেল। টেনিদা একটা চাঁটি হাঁকিয়েছিল, সেটা হাওয়ায় ঘুরে এল।

যাই হোক, আমরা চার মূর্তি তো বাগানে বেরিয়ে পড়লুম। চমৎকার সকাল, মিঠে রোদ্দুর, প্রাণ-জুড়োনো হাওয়া। দোয়েল শিস দিচ্ছে, বুলবুলি নেচে বেড়াচ্ছে। মাথার ওপর শিরিষ পাতার ঝিরিঝিরি। ঝুড়ি কাঁধে কুলি মেয়েরা টুকটুক করে পাতি তুলছে—বেশ লাগছে দেখতে।

পাতি তোলা দেখতে দেখতে কখন আমি দলছাড়া হয়ে অন্য দিকে চলে গেছি টেরই পাইনি। যখন খেয়াল হল, দেখি বাগানের বাইরে চলে এসেছি। সামনে মাঠ—তাতে কতগুলো এলোমেলো ঝোপ আর পাঁচ-সাতটা গাছ একসঙ্গে ঝাঁকড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। আরও তাকিয়ে দেখি—কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই।

কী সর্বনাশ—বাঘের মুখে পড়ব নাকি?

কিন্তু এখানে বাঘ! এমন সুন্দর রোদ্দুরে! এমনি চমৎকার সকালে! ধেৎ! আর গাছগুলো যে আমলকীর! কত বড়—কী সুন্দর দেখতে! গোছায় গোছায় যেন মণিমুক্তোর মতো ঝুলছে!

নোলায় জল এসে গেল। নিশ্চয় গাছতলায় আমলকী পড়েছে। যাই—গোটা-কয়েক কুড়িয়ে আনি। আমলকী দেখে বাঘের ভয়-টয় বেমালুম মুছে গেল মন থেকে।

গেলুম গাছতলায়? ধরেছি ঠিক। বড় বড় পাকা আমলকীতে ছেয়ে আছে মাটি।

বেছে বেছে কয়েকটা কুড়িয়ে নিলুম। তারপর পাশেই একটা সরু মতন লম্বা ডাল পড়ে আছে দেখে—বসলুম তার উপর।

কিন্তু একী! ডালটা যে কেমন রবারের মতো নরম!

আর তৎক্ষণাৎ ফোঁস করে একটা আওয়াজ। ডালটা নড়ে উঠল, বাঁকা হয়ে চলতে শুরু করে দিলে।

অ্যাঁ!

সাপ—অজগর!

বাপ—রে গেছি! তড়াক করে এক লাফে আমি গিয়ে একটা কাঁটা-ঝোপের উপর পড়লুম। আর তক্ষুনি দেখলুম বরফির মতো একটা অদ্ভুত মাথা—লকলক করে উঠেছে লম্বা জিভ—আর নতুন নয়া পয়সার মতো দুটো জ্বলজ্বলে চোখ ঠায় তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকেই।

৯। এ কার কণ্ঠস্বর?

সেই নয়া পয়সার মতো চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েই তো আমার হয়ে এসেছে! গল্পে শুনেছি, অজগর সাপ অমনিভাবে চোখের দৃষ্টি দিয়ে নাকি হিপ্‌নটাইজ করে ফেলে, তারপর ধীরে-সুস্থে এগিয়ে এসে পাকে পাকে জড়িয়ে একেবারে কপাৎ! অতএব হিপ্‌নটাইজ করার আগেই ধড়মড়িয়ে উঠে আমি তো টেনে দৌড়। দৌড়ই আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তাড়া করে আসছে কি না পেছন-পেছন।

না—এল না। এঁকেবেঁকে, সুড়সুড়িয়ে, আস্তে আস্তে নেমে গেল পাশের একটা শুকনো নালার ভেতর।

আধ মাইল দৌড়ে বাগানের মধ্যে এসে যখন থামলুম, তখন আমি আর আমি নেই! এ কোথায় এলুম রে বাবা! কথা নেই বার্তা নেই—কোত্থেকে গোদা বাঁদর এসে খপ করে কাঁধ চেপে ধরে—রাত্তিরে জানালার কাছে এসে চিতাবাঘ দাঁত খিঁচিয়ে যায়, আমলকী গাছের তলায় ঘাপটি মেরে ময়াল সাপ বসে থাকে! আফ্রিকার মতো বিপজ্জনক জায়গায় বেড়াতে এলে এমনি দশাই হয়!

থুড়ি—আফ্রিকা নয়। এ নিতান্তই বাংলাদেশ। কিন্তু এমনভাবে রাতদিন প্যাঁচে পড়ে গেলে কারও কি আর কিছু খেয়াল থাকে—তোমরাই বলো। তখন মনে হয় আমার নাম প্যালারাম হতে পারে—গদাইচরণ হতে পারে, কেষ্টদাস হওয়াও অসম্ভব নয়। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা গোবরডাঙা হতে পারে, জিব্রাল্টার হতে পারে—জাঞ্জিবার হলেই বা ঠেকাচ্ছে কে?

দুত্তোর, কিচ্ছুটি ভালো লাগছে না। কেমন উদাস-উদাস হয়ে যাচ্ছি। আর বাঁচব না বলে মনে হচ্ছে। এই আফ্রিকার জঙ্গলে—না-না, আফ্রিকা নয়, এই ম্যাডাগাস্কারের মরুভূমি—দুত্তোর, ম্যাডাগাস্কারও নয়—মানে, এই খুব বিচ্ছিরি জায়গায় আমি নির্ঘাত মারা যাবে। বাঘেই খাক—কি সাপেই ফলার করুক।

মারা যাব—এ-কথা মনে হলেই আমার খুব করুণ সুরে গান গাইতে ইচ্ছে করে। বাগেশ্রী-টাগেশ্রী ওই রকম কোনও একটা সুরে। আচ্ছা, বাগেশ্রী না বাঘেশ্রী? বেমক্কা বনের মধ্যে বাঘের ছিরি দেখলে গলা দিয়ে কুঁই-কুঁই করে যে-গান বেরোয়—তাকেই বাঘেশ্রী বলে নাকি? খুব সম্ভব। আর বাঘ যখন গম্ভীর সুরে বলে—হালুম, খাম্—খাম্—তখন সেই সুরটার নাম বোধহয় খাম্বাজ। তাহলে মল্লার গান কি মল্লরা—মানে পালোয়ানরা কুস্তি করবার সময় গেয়ে থাকে?

কিন্তু মল্লার-ফল্লার চুলোয় যাক। সাপ-বাঘের ফলার হওয়ার আগে বরং মনের দুঃখে ঘরে যাওয়াই ভালো। টেনে দৌড় দেওয়ার ধুকপুকুনি একটু থামলে, আমি খুব মিহি গলায় গাইতে লাগলুম:

'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান—'

বেশ আবেগ দিয়ে গাইছি, চোখে জল আসব-আসব করছে, এমন সময় কানের কাছে কে যেন খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠল :

—আরে খেলে যা ! এই ভরা রোদ্দুরে চাঁদের আলো পেলি কোথায় ?

আর কে ? বেয়াক্কেলে ক্যাবলাটা। খুব ভাল এসেছিল, একদম গুলিয়ে দিলে। সাধে কি টেনিদা যখন-তখন চাঁদিতে চাঁটি হাঁকড়ে দেয় !

—গোলমাল করছিস কেন ? আমি মারা যাব।

—যা না। কে বারণ করেছে তোকে ? বেশ কায়দা করে—'যা-ই—বি-দায় বি-দায়' বলে মরে যা, আমরা তোর শোকসভা করব। কিন্তু খবরদার, ও-রকম যাচ্ছেতাই সুরে গান গাইবি না।

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, দ্যাখ ক্যাবলা, বেশি ঠাট্টা করিসনি। জানিস—এক্ষুনি একটা অজগর সাপ আমাকে প্রায় ধরে খাচ্ছিল ?

ক্যাবলা বললে, খাচ্ছিল নাকি ? তা খেলে না কেন ? তোকে খেয়ে পাছে পালাজ্বর হয় এই ভয়েই ছেড়ে দিলে বুঝি ?

—সত্যি বলছি, ইয়া পেল্লায় এক অজগর সাপ—

ক্যাবলা বাধা দিয়ে বললে, বটেই তো। ত্রিশ হাত লম্বা আর সাড়ে চার হাত চওড়া'। জানিস আমাকেও এক্ষুনি একটা তিমি মাছ—তা প্রায় পঞ্চাশ হাত হবে—একটা ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে কপাৎ করে চেপে ধরে আর-কি ! কোনও মতে পালিয়ে বেঁচেছি।

বলে মুখ-ভর্তি শাঁকালুর দোকান দেখিয়ে ক্যাবলার কী হাসি !

—বিশ্বাস হল না—না ?

—কেন এলোমেলো বকছিস প্যালা ? চালিয়াতি একটু বন্ধ কর এখন। কপালজোরে একটা বাঘ না-হয় দেখেই ফেলেছিস, তাই বলে অজগর-গণ্ডার-হিপোপটেমাস-উড়ুক্কু মাছ সব তুই একাই দেখবি ? আমরা দুটো-একটাও দেখতে পাব না ? গপ্প মারতে হয় পটলডাঙায় চাটুজ্যেদের রোয়াকে গিয়ে যা-খুশি মারিস, এখানে ওসব ইয়ার্কি চলবে না। এখন চল—ওরা সবাই তোকে গোরু-খোঁজা করছে।

বেশ, বলব না। কাউকেই কোনও কথা বলব না আমি। এমনকি কুট্টিমামাকেও না। তারপর কালকে একটা মতলব করে সবাইকে ওই আমলকী গাছের দিকে পাঠিয়ে দেব। তখন বোঝা যাবে নালা থেকে অজগর বেরোয়, না ইঁদুরের গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাত তিমি মাছই বেরিয়ে আসে।

সন্ধেবেলায় কুট্টিমামা বললেন, এক-আধটা চিতাবাঘ না মারলে নয়। ভারি উৎপাত শুরু করেছে। আজও বিকেল নাগাদ একটা এসেছিল কুলি লাইনের দিকে। অবিশ্যি কিছু করতে পারেনি—কিন্তু এখন রোজ হাঙ্গামা বাধাবে মনে হচ্ছে।

টেনিদা খুব উৎসাহ করে বললে, তাই করো মামা। গোটা-কয়েক ধাঁ করে মেরে

ফেলে দাও, আপদ চুকে যায়।

ক্যাবলা বললে, তারপর আমরা সবাই মিলে একটা করে বাঘের চামড়া নেব।

হাবুল বললে, আর সেই চামড়া দিয়া জুতা বানাইয়া মচমচাইয়া হ্যাঁইট্যা যামু।

আমি চটেই ছিলুম। সেই অজগরকে নিয়ে ক্যাবলাটা ঠাট্টা করবার পর থেকে আমার মন-মেজাজ এমন খিঁচড়ে রয়েছে যে কী বলব ! আমি বললুম, আর কলার খোসায় পা পড়ে ধপ্‌পাস্ করে আছাড় খামু।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, আচ্ছা—আচ্ছা, আগে বাঘ তো মারা যাক, পরের কথা পরে হবে। আজ কয়েকটা টোটা আনতে পাঠিয়েছি শহরে—নিয়ে আসুক, তারপর কাল বিকেলে বেরুব।

—আমরাও যাব তো সঙ্গে ?—ফস করে জিজ্ঞেস করল ক্যাবলা।

শুনেই তো আমার পেটের মধ্যে গুরুগুরিয়ে উঠেছে। আগে যেটুকু-বা সাহস ছিল, জানালার পাশে বাঘ এসে দাঁড়াবার পর থেকে সমানে ধুকপুক করছে বুকের ভেতরটা। তারপর ওই বিচ্ছিরি সাপটা। নাঃ, শিকারে গেলে আমাকে অরা দেখতে হবে না ! পটলডাঙার প্যালারামের কেবল বারোটা নয়—সাড়ে দেড়টা বেজে যাবে। বাঁচালেন কুট্টিমামাই।

—সে হরিণ শিকার হলে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু চিতাবাঘ বড্ড শয়তান। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই ওদের।

টেনিদাও বোধহয় মওকা খুঁজছিল। বললেন, আমরা তো শিকার করবার জন্যেই এসেছিলুম। কিন্তু কুট্টিমামার অসুবিধে হলে কী আর করা যায়—মনে ব্যথা পেলেও বাংলোতেই বসে থাকব।

ক্যাবলা বললে, সমঝ গিয়া। তোমার ভয় ধরেছে, তাই না যেতে পারলে বাঁচো। ওরা থাকুক মামা—আমি সঙ্গে যাব।

হাবলা সঙ্গে সঙ্গেই পোঁ ধরলে : হঃ—ক্যাবলা সাহস কইর্‍যা যাইতে পারব—আর আমি পারুম না! আমারেও লইতে হইব।

আমার যে কী বিচ্ছিরি স্বভাব—ওদের উৎসাহ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমারও দারুণ তেজ এসে যায়। তখন মনে হয় পালাজ্বর-ফালাজ্বর পিলে-টিলে কিচ্ছু না—আমি সাক্ষাৎ ভীম-ভবানী, এক্ষুনি গরিলার সঙ্গে দমাদম বক্‌সিং লড়তে পারি। মনে হয়, মনের দুঃখে মরে যাওয়ার কোনও মানে হয় না—মরি তো একটা কিছু করেই মরব।

একটু আগেই ভয় ধরে গিয়েছিল, হঠাৎ বুক চিতিয়ে বলে ফেললুম, আমিও যাব—নিশ্চয় যাব !

টেনিদা কেমন করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকাল। তারপর ঘাড়-টাড় চুলকে নিয়ে বললে, সবাই যদি যায়—তবে আমিই আর বাদ থাকি কেন ?

ক্যাবলা বললে, কিন্তু তুমহারা ডর লাগ গিয়া।

—ডর ? হেঁঃ ! আমি পটলডাঙার টেনি শর্মা—আমি ভয় করি দুনিয়ায় এমন কোন—

কথাটা শেষ হতেও পেল না। হঠাৎ বাইরে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে এক বিটকেল আওয়াজ। টেনিদা তড়াং করে লাফিয়ে উঠল : ও কী—ও কী মামা ?

কুট্টিমামা কী যেন বলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে গেলেন। আমরা দেখলুম তাঁর মুখের চেহারা কেমন পাল্টে গেছে—দু'চোখে অমানুষিক ভয়ের ছাপ।

কুট্টিমামা কেবল ফিসফিস করে বললেন, সর্বনাশ—কী সর্বনাশ ! তারপর এক হাতে গলাটা চেপে ধরলেন।

বাইরে আবার চ্যাঁ-চ্যাঁ করে সেই বীভৎস ধ্বনি। আর কুট্টিমামার আতঙ্কে স্তব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে আমরাও একটা রহস্যময় ভয়ের অতলে ডুবে যেতে লাগলুম।

বাইরে ও কী ডাকল ? কোন্ অদ্ভুত আতঙ্ক—কোন্ ভয়াল ভয়ঙ্কর ?

১০। টেনিদার বিদায়

খানিক পরে হাবুল সেনই সামলে নিলে। মামার কপালে-তোলা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হইল মামা ? অমন কইর‍্যা চক্ষু আকাশে তুইল্যা বইস্যা আছেন ক্যান ? কী ডাকল বাইরে ? ভূত না রাইক্ষস ?

কুট্টিমামার মুখখানা এবার ভীষণ ব্যাজার হয়ে গেল।

—দূর কী আর ডাকবে ? ও তো প্যাঁচা।

—প্যাঁচা।—ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, তাতে আপনি ভয় পেলেন কেন ?

—ভয় পেলুম কখন ?

আমি বললুম, বা-রে, এই তো আপনি বললেন, কী সর্বনাশ—কী সর্বনাশ ! তারপরেই ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন।

—আরে, ঘাবড়ে গেছি সাধে ?—কুট্টিমামার ব্যাজার মুখটা আরও ব্যাজার হয়ে গেল : একটা বাঁধানো দাঁত ছিল, সেটা গেল খুলে আর মনের ভুলে ক্লিপ-টিপসুদ্ধ সেটাকে টক করে গিলে ফেললুম। যাই—এক্ষুনি একটা জোলাপ খেয়ে ফেলি-গে।

কুট্টিমামা উঠে চলে গেলেন।

হাবুল বললে, দাঁতটা প্যাটে থাকলেই বা ক্ষতি কী ! মামার তো সুবিধাই হইল। যা খাইব তারে ডবল চাবান দিতে পারব : একবার চাবাইব মুখে, আর একবার কইস্যা প্যাটের মধ্যে চাবান দিতে পারব।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, চুপ কর, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না ! কাল আমি তোকে একটা দেশলাই, খানিক সর্ষের তেল আর আধসের বেগুন গিলিয়ে দেব। পেটের মধ্যে বেগুন ভাজা করে খাস।

ছোট্টুলাল এসে বললে, খানা তৈয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়লুম আমরা। টেনিদা বললে, কেয়া বানায়া আজ ?

ছোট্টুলাল বললে, ডিমের কারি, মাছের ফ্রাই—

টেনিদা বললে, ট্রা-লা-লা-লা-লা ! কাল তো শিকারে যাচ্ছি। আমরা বাঘের পেটে যাব, না হিপোপটেমাসেই গিলে খাবে কে জানে ! চল—আজ প্রাণ ভরে ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিই !

ক্যাবলা বলতে যাচ্ছিল, ডুয়ার্সের জঙ্গলে কি হিপো—

কিন্তু বলবার সুযোগ পেলে না। তার আগে টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : ডি-লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমরা কোরাস তুলে বললুম, ইয়াক-ইয়াক।

আর ছোট্টুলাল চোখ দুটোকে আলুর দমের মতো করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সকালে উঠেই সাজ-সাজ রব।

দেখি, বেশ বড় একটা মোটর ভ্যান এসে গেছে। ওদিকে কুট্টিমামা বুট আর হাফপ্যান্ট পরে একেবারে তৈরি। গলায় টোটার মালা—হাতে বন্দুক। কুলিদের সর্দারও এসে হাজির—তারও হাতে একটা বন্দুক। সর্দারের নাম রোশনলাল।

মামা বললেন, রোশনলাল খুব পাকা শিকারি। ওর হাতের তাক ফস্কায় না।

আমরাও চটপট কাপড়-জামা পরে নিলুম। কিন্তু টেনিদার আর দেখা নেই।

কুট্টিমামা বললেন, টেনি কোথায় ?

টেনিদা—ভদ্রভাষায় যাকে বলে বাথরুম—তার মধ্যে ঢুকে বসে আছে। আর বেরুতেই চায় না। শেষে দরজায় দমাদম ঘুষি চালাতে লাগল ক্যাবলা।

—শিকারে যাওয়ার আগেই কি অজ্ঞান হয়ে গেলে নাকি টেনিদা ? যদি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে থাকো, দরজা খুলে দাও। আমরা তোমার নাকে স্মেলিং সল্ট্ লাগিয়ে দিচ্ছি।

এর পরে কোনও ভদ্রলোকই অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে না। রেগে-মেগে দরজা খুলে বেরিয়ে এল টেনিদা।

—টেক কেয়ার ক্যাবলা—কে বলে আমি অজ্ঞান হয়েছি ? কেবল পেটটা একটু চিন-চিন করছিল—

কুট্টিমামার হাঁক শোনা গেল : কী হল টেনি—রেডি ?

হাবুল বললে, টেনিদার প্যাট চিন-চিন করে।

আমি বললুম, মাথা ঝিন-ঝিন করে—

ক্যাবলা বললে, বাঘ দেখার আগেই প্রাণ টিন-টিন করে।

টেনিদা ঘুষি বাগিয়ে ক্যাবলাকে তাড়া করলে—ক্যাবলা পালিয়ে বাঁচল।

হাঁড়ির মতো মুখ করে টেনিদা বললে, ভাবছিস আমি ভিতু ? আচ্ছা—চল শিকারে। পটলডাঙার এই টেনি শর্মা কাউকে কেয়ার করে না। বাঘ-ফাগ যা

সামনে আসবে—স্রেফ হাঁড়িকাবাব করে খেয়ে নেব দেখে নিস !

টেনিদার মজাই এই। ঠিক হাওড়া স্টেশনের গাড়িগুলোর মতো। লিলুয়া পর্যন্ত যেন চলতেই চায় না—খালি ক্যাঁচ—খালি কোঁচ। তারপর একবার দৌড় মারল তো পাঁই-পাঁই শব্দে সোজা বর্ধমান—তখন আর কে তার পাত্তা পায় ! এই গুণের জন্যেই তো টেনিদা আমাদের লিডার।

যাই হোক, আমরা বেরিয়ে পড়লুম। কুট্টিমামা আর রোশনলাল বসলেন ড্রাইভারের পাশে, আমরা বসলুম ভ্যানের ভিতর। একটু পরেই গাড়ি এসে জঙ্গলে ঢুকল।

দু'দিকে বড় বড় শাল গাছ—তাদের তলায় নানা আগাছার জঙ্গল। এখানে-ওখানে নানা রকমের ফুল ফুটেছে, মাথা তুলে আছে ডোরাকাটা বুনো ওলের ডগা। ছোট ছোট কাকের মতো কালো কালো একরকম পাখি রাস্তার উপর দিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে—ছোট-ছোট নালা দিয়ে তিরতির করে বইছে পরিষ্কার নীলচে জল।

সামনে দিয়ে কয়েকবার কান খাড়া করে দৌড়ে পালাল খরগোশ। মাথা নিচু করে তীরের গতিতে ছুটে গেল একটা হরিণ, সোনালি লোমের ওপর কী সুন্দর কালো কালো ছিট !

কুট্টিমামা বললেন, ইস-ইস ! আর একটু হলেই মারতে পারা যেত হরিণটাকে।

কথাটা আমার ভালো লাগল না। এমন সুন্দর হরিণগুলোকে মানুষ কেন মারে ! দুনিয়ায় তো খাবার জিনিসের অভাব নেই। দুমদাম করে হরিণ না মারলে কী এমন ক্ষতিটা হয় লোকের ?

পাশের শিমুল গাছের ডালে বড় একটা পাখি ডেকে উঠল।

ক্যাবলা হাততালি দিয়ে বললে, ময়ূর—ময়ূর !

ময়ূরই বটে। ঠিক চিনেছি আমরা। অনেক ময়ূর দেখেছি চিড়িয়াখানায়।

বাঘের কথা ভুলে গিয়ে আমার ভারি ভালো লাগছিল জঙ্গলটাকে। কী সুন্দর—কী ঠাণ্ডা ছায়ায় ভরা ! কত ফুল—কত পাখির মিষ্টি ডাক—কত খরগোশ—কত হরিণ ! ইচ্ছে করছিল পাহাড়ি নালার ওই নীলচে ঝর্নার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নান করি।

হঠাৎ চমক ভাঙল রোশনলালের গলার আওয়াজ।

—বাবু—বাবু !

কুট্টিমামা বললেন, হুঁ—দেখেছি।...বাহাদুর, গাড়ি রোখো !

গাড়িটা আস্তে আস্তে থেমে গেল। মামা আর রোশনলাল নামলেন গাড়ি থেকে।

মামা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চুপচাপ বসে থাকো গাড়িতে। কাচ তুলে দাও। নেহাত দরকার না পড়লে নামবে না। আমরা আসছি একটু পরে।...বাহাদুর—তুম ভি আও—

মাটির দিকে তাকিয়ে কী যেন দেখতে দেখতে তিনজনে টুপ করে মিলিয়ে গেল বনের ভিতর।

আমরা চারমূর্তি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম ভ্যানের ভিতর। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে বোকার মতো বসে থাকতে ভালো লাগে ? কাচ তুলে দেওয়াতে কেমন গরমও বোধ হচ্ছিল। অথচ বাইরে ঠাণ্ডা ছায়া—হাওয়া বইছে ঝিরঝিরিয়ে, টুপটুপিয়ে পড়ছে শালের পাতা। আমরা যেন জেলখানার মধ্যে আটকে আছি—এমনি মনে হচ্ছিল।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, একটু নেমে পায়চারি করলে কেমন হয় ?

টেনিদা বললে, কুট্টিমামা বারণ করে গেল যে। কাছাকাছি যদি বাঘ-টাঘ থাকে—

হাবুল বললে, হঃ। এমন দিনের ব্যালা—চাইরদিক এমন মনোরম—এইখানে বাঘ থাকব ক্যান ? আর বাঘ যদি এইখানেই থাকব—তাইলে অরা বাঘের খোঁজে দূরে যাইব ক্যান ?

পাকা যুক্তি। শুনে টেনিদা একবার কান, আর একবার নাকটা চুলকে নিলে। বললে, তা বটে—তা বটে ! তবে, মামা বারণ করে গেল কিনা—

ক্যাবলা বললে, মামারা বারণ করেই। সংস্কৃতে পড়োনি টেনিদা ? 'মা'—'মা'—অর্থাৎ কিনা, না—না। ওটা মামা নামের গুণ—সবটাইতে 'মা—মা' বলবে।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, ধ্যাত্তোর সংস্কৃত ! ইস্কুলে পণ্ডিতের চাঁটিতে চোখে অন্ধকার দেখতুম—কলেজে এসে সংস্কৃতের হাত থেকে বেঁচেছি ! তুই আর পণ্ডিতি ফলাসনি ক্যাবলা—গা জ্বালা করে !

ক্যাবলা বললে, তা জ্বালা করুক। তো ম্যায় উতার যাঁউ ?

—সে আবার কী ? হাউ-মাউ করছিস কেন ?

—হাউ-মাউ নয়—রাষ্ট্রভাষা। মানে, নামব ?

—সোজা বাংলায় বললেই হয় !—টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, অমন ভুতুড়ে আওয়াজ করছিস কেন ? আয়—নামা যাক। কিন্তু বেশি দূর যাওয়া চলবে না—কাছাকাছিই থাকতে হবে।

আমরা নেমে পড়লুম ভ্যান থেকে।

বেশি দূর আর যাব না ভেবেও হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা এগিয়েছি। চারদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য-টিশ্য দেখে আমি বেশ কায়দা করে বলতে যাচ্ছি ; 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—' ঠিক এমন সময়—

জঙ্গলের মধ্যে কেমন মড়-মড় শব্দ ! পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—

হাতি ! গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই !

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা—বুনো হাতি !

বাপরে—মা-রে ! কিন্তু ভ্যানের দিকে যাবার উপায় নেই—হাতি পথ জুড়ে এগিয়ে আসছে !

—ক্যাবলা, হাবুল, প্যালা—গাছে, গাছে—উঠে পড়—কুইক্—টেনিদার আদেশ

শোনা গেল।

কিন্তু তার আগেই আমরা সামনের একটা মোটা গাছে তর-তর করে উঠতে আরম্ভ করেছি। যেভাবে তিন লাফে আমরা গাছে চড়ে গেলুম, তা দেখে কে বলবে আমাদের পেছনে একটা করে লম্বা ল্যাজ নেই।

হাতিটা তখন ঠিক গাছটার তলায় এসে পড়েছে। আর সেই মুহূর্তেই অঘটন ঘটল একটা। মড়মড় করে ডাল ভাঙবার আওয়াজ এল, একটা চিৎকার শোনা গেল টেনিদার, তারপর—

তারপর রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা দেখলুম, টেনিদা পড়েছে হাতির পিঠের ওপর। উপুড় হয়ে দু'হাতে চেপে ধরেছে হাতির গলার চামড়া। আর পিঠের উপর খামকা এই উৎপাতটা ভাদ্রমাসের পাকা তালের মতো নেমে আসাতে হাতিটা ছুট লাগিয়েছে প্রাণপণে।

আমরা আকুল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা—টেনিদা—

হাতি জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগে আমরা শুনলুম টেনিদা ডেকে বলছে : তোদের পটলডাঙার টেনিদাকে তোরা এবার জন্মের মতো হারালি। বিদায়—বিদায়—

১১। অভিযানের আরম্ভ

গাছের উপর বসে আমরা তিন মূর্তি একসঙ্গে কেঁদে ফেললুম।

টেনিদা—আমাদের লিডার—পটলডাঙার চার মূর্তির সেরা মূর্তি—এমনি করে বুনো হাতির পিঠে চেপে বিদায় নিলে! এ আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না—কেউ না।

টেনিদা আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক মিষ্টি আর বিস্তর ডালমুট খেয়েছে। চাঁটি গাঁট্টা লাগিয়েছে যখন-তখন। কিন্তু টেনিদাকে নইলে আমাদের যে একটি দিনও চলে না। যেমন চওড়া বুক—তেমনি চওড়া মন। হাবুল সেবার যখন টাইফয়েড হয়ে মরো-মরো তখন সারারাত জেগে, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে টেনিদাই তাকে নার্স করেছে—বাঁচিয়ে তুলেছে বলা চলে। পাড়ার কারও বিপদ-আপদ হলে টেনিদাই গিয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের আগে। লোকের উপকারে এক মুহূর্তের জন্য তার ক্লান্তি নেই—মুখে হাসি তার লেগেই আছে। ফুটবলের মাঠে সেরা খেলোয়াড়, ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন। আর গল্পের রাজা। এমন করে গল্প বলতে কেউ জানে না।

সেই টেনিদা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? এ হতেই পারে না! এ অসম্ভব।

ক্যাবলাই চোখের জল মুছে ফেলল সকলের আগে। ডাকলে, হাবুল!

—কী কও?—ধরা গলায় হাবুল জবাব দিলে।

—কেঁদে লাভ নেই। টেনিদাকে খুঁজে বের করতে হবে।

—কোথায় পাবে?—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—যেখানেই হোক।

ফোঁস-ফোঁস করতে করতে হাবুল বললে, বুনো হাতি—কোথায় যে লইয়া গেছে—

ক্যাবলা ততক্ষণে নেমে পড়েছে গাছ থেকে। বললে, পৃথিবীর বাইরে তো কোথাও নিয়ে যায়নি! দরকার হলে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। নেমে আয় তোরা।

আমরা নামলুম।

ক্যাবলা বললে, শোনো বন্ধুগণ। আমরা পটলডাঙার ছেলে, ভয় কাকে বলে কোনও দিন জানিনি। তোমরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভুলে যাওনি সেই ঝণ্টিপাহাড়ির অভিযানকাহিনী—নিশ্চয় ভুলে যাওনি, স্বামী ঘুটঘুটানন্দের চক্রান্ত আমরা কেমন করে ফাঁস করে দিয়েছিলুম! মানুষের শয়তানিকে ঠাণ্ডা করতে পেরেছি, আর বুনো জানোয়ারকে ভয়? জানোয়ার মানুষের চাইতে নিচুদরের জীব—তাকে হারিয়ে, হটিয়েই মানুষ এগিয়ে চলেছে। আমরাও টেনিদাকে ফিরিয়ে আনবই।

—যদি হাতি তাকে মেরে ফেলে থাকে?

—আমি তা বিশ্বাস করি না। সে আমাদের লিডার—বিপদে পড়লে যেমন বেপরোয়া তেমনি সাহসী হয়ে ওঠে—সে তো তোমরা জানোই। সে ঠিকই বেঁচে আছে। তবু আমাদের কর্তব্য আমরা করব। আর—আর যদি দেখি সত্যিই হাতি তাকে মেরে ফেলেছে, তাহলে আমরাও মরব। টেনিদাকে ফেলে আমরা কিছুতেই কলকাতায় ফিরে যাব না। কী বল তোমরা?

আমরা দু'জনে বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়ালুম।

—ঠিক। আমিও তাই কই।—হাবুল বললে।

—চারজন এসেছিলুম—তিনজন কিছুতেই ফিরে যাব না। মরলে চারজনেই মরব।—আমি বললুম।

ক্যাবলা বললে, তাহলে এখনি আমরা বেরিয়ে পড়ি।

—কিন্তু কুট্টিমামা আর রোশনলালকে খবর দিতে পারলে—

—কোথায় খবর দিবি, আর পাবিই বা কোথায়? তা ছাড়া এক সেকেন্ডও আমরা সময় নষ্ট করতে পারব না। চল, এগোনো যাক—

—কোন্‌দিকে যাবি?—হাবুল জানতে চাইল।

—হাতির পায়ের দাগ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তাই ধরেই এগোব।

আমি বললুম, একটা বন্দুক-টন্দুক যদি থাকত—

ক্যাবলা রাগ করে বললে, তুই আর এখন জ্বালাসনি প্যালা। বন্দুক থাকলেই বা কী হত শুনি—কোনও জন্মে আমরা কেউ ছুঁড়েছি নাকি ও-সব? বন্দুক আমাদের দরকার নেই, মনের জোরই হল সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আয়—

—চল—

আমরা এগিয়ে চললুম। বুক এক-আধটু দুর-দুর না করছিল তা নয়, মনে হচ্ছিল পটলডাঙায় ফিরে গিয়ে বাবা-মা ভাইবোনদের মুখও হয়ত কোনওদিন আর দেখতে পাব না। হয়ত এ-জঙ্গলেই বাঘ ভালুক হাতির পাল্লায় আমার প্রাণ যাবে। যদি যায়—যাক। দুনিয়ায় ভীরু আর স্বার্থপরদের কোনও জায়গা নেই! ও-ভাবে বাপ-মা'র কোলে আহ্লাদে পুতুল হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো মরা ভালো। আর, একবার ছাড়া তো দু'বার মরব না।

ক্যাবলা ঠিকই বুঝেছিল। ডালপালা ভেঙে, গাছপালা মাড়িয়ে হাতিটা যেভাবে এগিয়ে গেছে আমরা তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলুম। কোথাও কোথাও নরম মাটিতে তার পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমরা বনের পথ বেয়ে চলতে লাগলুম। কিন্তু তখনও হাতির দেখা নেই, টেনিদারও চিহ্নমাত্রও না।

শেষে এক জায়গায় এসে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হল।

চারধারে জঙ্গল কেমন তচনচ। চার পাশেই হাতির পায়ের দাগ। মনে হয়, পাঁচ-সাতটা হাতি জড়ো হয়েছিল এখানে তারপর নানা দিকে যেন তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। এর মধ্যে কোন্ হাতিটার পিঠে টেনিদা গদিয়ান হয়ে বসে আছে—সে কথা কে বলবে!

ক্যাবলা বললে, তাই তো! কোন্ দিকে যাই?

হাবুল ভেবেচিন্তে বলল, এইভাবে ঘুর্যা খুব সুবিধা হইব না। চল ক্যাবলা, আবার ভ্যানের কাছে ফির্যা যাই। মামারে সঙ্গে কইর্যা—

ক্যাবলা বললে, না।

—কী করবি তাহলে?—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—তিনজনে তিনদিকে যাব।

—একা-একা?

—হ্যাঁ—একলা চল রে।

আমার পালাজ্বরের পিলেটা অবশ্য এতদিনে অনেক ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু যেটুকু আছে তা-ও চড়াৎ করে লাফিয়ে উঠল।

—একা যাব?

ক্যাবলা দুটো জ্বলজ্বলে চোখ মেলে আমার দিকে চাইল।

—তুই ভ্যানে ফিরে যা প্যালা। আমি আর হাবুল চললুম খুঁজতে।

আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল। আমি ভীরু! একা আমারই প্রাণের ভয়! কখনও না।

বললুম, তোর ইচ্ছে হয় তুই ফিরে যা। আমি টেনিদাকে খুঁজব।

ক্যাবলা আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। খুশি হয়ে বললে, ব্যস, ঠিক হ্যায়। ই হ্যায় মরদকা বাত! এবার তিনজন তিনমুখে। বন্ধুগণ, হয়তো আমাদের এই শেষ দেখা। হয়তো আমরা আর কেউ বেঁচে ফিরব না। তাই যাওয়ার আগে একবার বল—

—পটলডাঙা—

—জিন্দাবাদ।

—চার মূর্তি—

—জিন্দাবাদ!

তারপরেই দেখি, ওরা দু'জনে দু'দিকে বনের মধ্যে সুট করে কোথায় চলে গেল। আমি এখন একা। এই বাঘ-সাপ-হাতির জঙ্গলে একেবারে একা। নিজেকে বললুম, বুকে সাহস আনো পটলডাঙার প্যালারাম! তুমি যে কেবল শিঙিমাছ দিয়েই পটোলের ঝোল খেতে এক্সপার্ট তা নও, তার চাইতে আরও অনেক বেশি। আজ তোমার চরম পরীক্ষা। তৈরি হও সেজন্যে।

একটা শুকনো ডাল পড়ে ছিল সামনে। সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে আমিও চলতে শুরু করলুম। মরবার আগে অন্তত কষে এক ঘা তো বসাতে পারব! সে হাতিই হোক আর বাঘই হোক।

কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না আমাকে।

একটা ঝোপের ওপর যেই পা দিয়েছি, অমনি—

সড়াক্—ঝরঝরাৎ—

পায়ের তলার থেকে মাটি সরে গেল। আর তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলুম, মহাশূন্য বেয়ে আমি কোথায় কোন পাতালের দিকে পড়ে যাচ্ছি।

—মা—

তারপরেই আমার চোখ বুজে এল।

১২। শজারু সঙ্গীত

গর্তে পড়ে মনে হয়েছিল—পটলডাঙার প্যালারাম এবার একদম ফিনিশ—হাড়গোড় কিছু বুঝি আর রইল না। 'মরে গেছি—মরে গেছি'—ভাবতে ভাবতে দেখি, আমি মোটেই মারা যাইনি। দিব্যি বহাল তবিয়তে একরাশ নরম কাদার ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছি—পিঠটা ঠেস দেওয়া রয়েছে মাটির দেওয়ালে।

কোমরটা কেবল একটু ঝনঝন করছে—মাথাতেও ঝাঁকুনি লেগেছে। সেটুকু সামলে নিয়ে চোখ মেলে তাকালুম। মাথার হাত-দশেক ওপরে একটা গোল আকাশ—আরও ওপরে একা গাছের ডাল দুলছে। আশেপাশে চেয়ে দেখলুম অন্ধকার, গর্তটা কত বড় কিংবা আমি ছাড়া এর ভেতরে আর কী আছে, কিচ্ছু বুঝতে পারলুম না।

এমন সময় খুব কাছেই যেন একটা ঝমঝম করে শব্দ শুনতে পেলুম। ঠিক মনে হল কেউ যেন হাতে করে টাকার তোড়া বাজাচ্ছে।

আমার খাড়া খাড়া কান দুটো আরও খাড়া হয়ে উঠল। ব্যাপারখানা কী ?

গর্তে যখন পড়েছি তখন তো মারাই গেছি। কিন্তু মরবার আগে সব ভালো করে জেনেশুনে নেওয়া দরকার, কারণ বইতেই পড়েছি : 'মৃত্যুকাল পর্যন্ত জ্ঞান সঞ্চয় করিবে।' ওটা কীসের আওয়াজ ?

মাথায় ঝাঁকুনি লাগবার জন্যেই বোধহয় চোখ এখনও ঝাপসা হয়ে রয়েছে। খুব লক্ষ করেও একদিকে ছোট একটা ছায়ার মতো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না। কিন্তু আবার শুনলুম কে যেন ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে, আর শব্দ উঠছে : ঝম-ঝম-ঝম—

অ্যাঁ—যখের গর্ত নাকি ?

ভাবতেই আমার কানের ভেতরে গুবরে পোকারা কুর কুর করতে লাগল, নাকের ওপর যেন উচ্চিংড়ে লাফাতে লাগল, পেটের মধ্যে ছোট-হয়ে-যাওয়া সেই পালাজ্বরের পিলেটা কচ্ছপের মতো শুঁড় বের করতে লাগল। শেষকালে কি পাতালে যখের রাজ্যে এসে পৌঁছে গেলুম ? সেই কি অমন করে মোহরের থলি বাজিয়ে আওয়াজ করছে ? একটু পরেই থলিটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলবে : 'বৎস প্যালারাম, অনেক কষ্ট করে তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ দেখে ভারি খুশি হয়েছি, এবার এই মোহর নিয়ে তুমি দেশে চলে যাও—বিরাট অট্টালিকা বানাও—ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি—

হাতির কথা ভাবতেই মনে হল, আমাদের লিডার টেনিদা বুনো হাতির পিঠে চড়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। আমরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু কোথায় টেনিদা—আমিই বা কোথায় ? এই বিচ্ছিরি আফ্রিকার জঙ্গলে—না-না, ম্যাডাগাস্কারের অরণ্যে—দুত্তোর ডুয়ার্সের এই যাচ্ছেতাই বনের ভেতর, আমাদের চারমূর্তিরই বারোটা বেজে গেল।

সব ভুলে গিয়ে আমার এখন একটু একটু কান্না পেতে লাগল। মা'কে মনে পড়ছে, বাবা, ছোড়দি, বড়দা, ছোট বোন দুটোকে মনে পড়ছে, এমনকি, যে-মেজদা একবার পেট কামড়েছে বললেই দেড় হাত লম্বা একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার পেটে ইঞ্জেকশন দিতে আসে, তাকেও মনে পড়ে যাচ্ছে। খুব ছোটবেলায় বড়দা একবার আমায় বলেছিল ঘড়ি দেখে আসতে। ঘড়ি দেখে এসে আমি খুব গম্ভীর চালে বলেছিলুম, সাড়ে দেড়টা বেজেছে, আর শুনেই বড়দা আমার একটা লম্বা কানে তিড়িং করে চিড়িং মেরে দিয়েছিল। হায়—বড়দা আর কোনও দিন অমন করে আমার কানে মোচড় দেবে না !

বারোটা নয়, এবার সত্যিই আমার সাড়ে দেড়টা বেজে গেল।

আবার সেই ঝমঝম শব্দ ! চমকে উঠলুম।

চোখটা মুছে চাইতে এবার আমার জ্ঞান লাভ হয়। ধ্যেৎ—যখ-টখ কিচ্ছু বা—সব বোগাস। এতক্ষণে গর্তের ভেতরকার অন্ধকারটা চোখে খানিকটা ফিকে

হয়ে এসেছে। দেখলুম বেড়ালের চাইতে একটু বড় কী একটা জন্তু হাত-চারেক দূরে দাঁড়িয়ে সমানে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ করছে। তার খুদে-খুদে চোখ দুটো অন্ধকারে চিকচিক করছে—আর তার সারা শরীরে মোটা মোটা ঝাঁটার কাঠির মতো কী সব খাড়া হয়ে রয়েছে।

আমি বলে ফেললুম, তুই আবার কে রে ? ঝাঁটা-বাঁধা বেড়ালের মতো দেখতে ?

শুনেই জন্তুটা গা-ঝাড়া দিলে। আর তক্ষুনি আওয়াজ হল : ঝন-ঝম—ঝুমুর-ঝুমুর !

আরে, তাই বল ! এইবারে বুঝেছি। মিস্টার শজারু। ছেলেবেলায় মল্লিকা মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম শক্তিগড়ে। ওঁদের বাড়ির পাশে আমবাগানে রাত্তির বেলা শজারু ঘুরে বেড়াত আর ভয় পেলেই কাঁটা বাজিয়ে আওয়াজ করত ঝুম-ঝুম। মল্লিকা মাসিমা বলতেন, শজারুর মাংস খেতে খুব ভালো। যখন কাঁটা উঁচিয়ে দাঁড়ায়, তখন দুম করে ওর পিঠের উপর একটা কলাগাছ ফেলে দিতে হয়। ব্যস—জব্দ। কাঁটা কলাগাছে আটকে যায়—আর পালাতে পারে না।

বুঝতে পারলুম, আমি পড়বার আগে শজারু মশাইও কী করে গর্তে পড়েছেন। তাই আমি আসাতে খুব রাগ হয়েছে—ভাবছেন, আমিই বুঝি প্যাঁচ কষিয়ে ওঁকে ফেলে দিয়েছি। তাই খুব কাঁটা ফুলিয়ে আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে।

আমার খুব মজা লাগল। থাকত কলাগাছ—লম্ফঝম্ফ তোমার বেরিয়ে যেত ! এখন দাপাদাপি করো—যত ইচ্ছে !

আরে, মারা যখন গেছিই, তখন আর ভাবনা কী ! শজারুটার ফোঁসফোঁসানি দেখে আমার দস্তুরমতো গান পেয়ে গেল। তোমরা তো জানোই—দেখতে আমি রোগা-পটকা হলে কী হয়—গান ধরলে আমার গলা থেকে এমনি হালুম্ব রাগিণী বেরুতে থাকে যে ক্যাবলাদের রামছাগলটা পর্যন্ত দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে ম্যা-হ্যা-হ্যা বলে চিৎকার ছাড়ে। শজারুটা যাতে তেড়ে এসে আমাকে কয়েকটা খোঁচা-টোচা না লাগিয়ে দেয়, সেজন্যে ওকে ভেবড়ে দেবার জন্যে আমি হাউ-মাউ করে 'হ-য-ব-র-ল' থেকে গাইতে শুরু করলাম :

'বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই শজারু,
আজকে রাতে হবে একটা মজারু—'

সেই বন্ধ গর্তের ভেতর আমার বেয়াড়া গলার বাজখাঁই গান যে কেমন খোলতাই হল—সে বোধহয় না বললেও চলে। এমন পিলে-কাঁপানো আওয়াজ বেরুল যে শুনে নিজেই আমি চমকে গেলুম। শজারুটা তিড়িক করে একটা লাফ মারল।

এই রে, তেড়ে আসে নাকি আমার দিকে। ওর গোটা-কয়েক কাঁটা গায়ে ফুটিয়ে দিলেই তো গেছি—একেবারে ভীষ্মের শরশয্যা ! প্রাণের দায়ে জোর গলা-খাঁকারি দিয়ে আবার আরম্ভ করলুম :

'আসবে সেথায় প্যাঁচা এবং প্যাঁচানি—'

শজারুটা এবার কেমন একটা আওয়াজ করলে। তারপর আমার দিকে আর না

এগিয়ে—সুড়সুড়িয়ে আরও পেছনে সরে গেল, কাঁটা ফুলিয়ে কোণে গোল হয়ে বসে রইল। আমার গানের গুঁতোয় আপাতত বিপর্যস্ত হয়ে গেছে মনে হল—সহজে যে আর আক্রমণ করবে এমন বোধ হচ্ছে না।

ও থাক বসে। আমিও বসি।

কিন্তু আমিও বসব ? বসে থেকে আমার কী লাভ ? আমি তো এখনও মরিনি ! উপর থেকে হাত-দশেক নীচে একটা গর্তের মধ্যে পড়েছি বটে, তাই বলে এখনও তো আমার পঞ্চত্ব পাওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। একটু চেষ্টা করলে হয়তো আরও কিছুদিন শেয়ালদা বাজারের শিঙিমাছ আর কচি পটোল সাবাড় করবার জন্যে আমি বেঁচে থাকতে পারি।

আর শুধু নিজের বাঁচাটাই কি বড় কথা ? আমাদের বাংলার প্রফেসর একদিন পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন, 'নিজের জন্যে বাঁচে জানোয়ারেরা, সকলের জন্য বাঁচে মানুষ।' আমি পটলডাঙার প্যালারাম—রোগা-পটকা হতে পারি, ভিতু হতে পারি, কিন্তু আমি মানুষ। খালি আমার নিজের কথাই তো ভাবলে চলবে না ! আমাদের লিডার টেনিদাকে যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে, চার মূর্তির আর সবাই কোথাও যদি কেউ বিপদে পড়ে থাকে—তাদের বাঁচাতে হবে। আমি বাঁচব—সকলের জন্যেই বাঁচব !

গর্তের কোনায় গোল-হয়ে-বসে-থাকা শজারুটা কেমন ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে উঠল। আমার মনে হল, যেন রাষ্ট্রভাষায় বললে, 'কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ !' অর্থাৎ কিনা—শাবাশ, শাবাশ !

আবার মাথা তুলে চাইলুম।

ওপরে গর্ত জুড়ে সেই গোল আকাশটুকু। একটা গাছের ডাল নেমে এসেছে, তার পাতা কাঁপছে ঝিরঝিরিয়ে। পারব না—একটু চেষ্টা করলে উঠে যেতে পারব না ? তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারলেন—আমি একটা গর্ত বেয়ে উঠে যেতে পারব না ওপরে ? তেনজিংয়ের তো আমার মতো দু'খানা হাত আর দু'খানা পা-ই ছিল। তবে ?

দেখিই না একবার চেষ্টা করে। সেই-যে বইতে আছে না, 'যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে ?' মাটির ভেতর দিয়ে আছড়ে পড়েছি, মাটি ধরেই উঠে যাব।

যা থাকে কপালে বলে উঠতে যাচ্ছি, আর ঠিক তখন—

হঠাৎ কানে এল বন-বাদাড় ভেঙে কে যেন দুড়দাড় করে ছুটে আসছে। তার পরেই হুড়মুড়—সরসর—ঝরঝর করে আওয়াজ। ঠিক মনে হল, গোল আকাশটা তালগোল পাকিয়ে নিচে আছড়ে পড়ল। আমার মুখ-চোখে ধুলো-মাটি আর গাছের পাতার পুষ্পবৃষ্টি হল, আর কী একা পেল্লায় জিনিস ধপ-ধপপাস করে নেমে এল গর্তে—প্রায় আমার গা ঘেঁষে। তার প্রকাণ্ড ল্যাজটা চাবুকের মতো আমার গায়ে ঘা মারল।

আর সেই বিরাট জন্তুটা গুরুর্—হুম্—বলে কান-ফাটানো এক চিৎকার

ছাড়ল।

সে-চিৎকারে আমার মাথা ঘুরে গেল। চোখের সামনে দেখলুম সারি সারি সর্ষে ফুলের শোভা। উৎকট দুর্গন্ধে যেন দম আটকে আসতে চাইল।

গর্তে যে পড়েছে—তাকে আমি দেখেছি।

সে বাঘ ! বাঘ ছাড়া আর কেউ নয়।

আমার তা হলে বারোটা নয়—সাড়ে দেড়টাও নয়, পুরো সাড়ে আড়াইটে বেজে গেল। একবার আমি হাঁ করলুম, খুব সম্ভব গাঁ-গাঁ করে খানিক আওয়াজ বেরুল, তারপর—

তারপর থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে গর্তের মাটিতে একেবারে পপাত।

১৩। বাঘ ভার্সাস ঘোগ

খুব সম্ভব মরেই গিয়েছিলুম। কিন্তু মরা মানুষকেও যে জাগিয়ে তুলতে পারে সে হল বাঘের ডাক। কানের পাশে যেন একসঙ্গে পঁচিশটা বাজ পড়ল এইরকম মনে হল আমার, আর মুখের ওপর ফটাস করে মোটা কাছির মতো কিসের একটা ঘা লাগল। বুঝতে পারলুম, বাঘের ল্যাজ।

মাত্র একহাত দূরে আমার বাঘ পড়েছে— তারপরেও কি আমার বেঁচে থাকা সম্ভব ? আমি—পটলডাঙার প্যালারাম— এ-যাত্রা নির্ঘাত তাহলে মারাই গেছি। আর যদি মরেই গিয়ে থাকি— তা হলে আর কিসের ভয় আমার ? আমি তো এখন ভূত। ভূতকে কি কখনও বাঘে ধরে ?

আবার বিশটা বাজের মতো আওয়াজ করে, গর্ত ফাটিয়ে বাঘ হাঁক ছাড়ল—তারপরেই একটা পেল্লায় লাফ। আমি ঝট করে একটু সরে গিয়েছিলুম বলে বাঘ আমার গায়ে পড়ল না, কিন্তু ল্যাজটার ঘায়ে আমার নাক প্রায় থেঁতলে গেল। আর বাঘের নখের আঁচড়ে গর্তের গা থেকে খানিক মাটি ঝুরঝুর করে চোখময় ছড়িয়ে গেল।

এ তো ভালো ল্যাঠা দেখছি ! বাঘ যদি আমাকে না-ও ধরে— বাঘের দাপাদাপিতেই আমি— মানে আমার ভূতটা— মারা যাবে। কিংবা নাকে যখন ল্যাজের ঘা এসে এমন বেয়াড়াভাবে লেগেছে যে মনে হচ্ছে হয়তো আমি বেঁচেই আছি।

আবার বাঘের গর্জন। উঃ, কান দুটো তো ফেটে গেল। এসপার কি ওসপার।

এবার বাঘ লাফ মারবার আগেই আমি লাফ মারলুম। আর হাতে যা ঠেকল তা গোটাকয়েক গাছের শেকড়।

আমি পটলডাঙার প্যালারাম— জীবনে কোনও দিন একসারসাইজ করিনি—

পালাজ্বরে ভুগেছি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেয়েছি। দু'-একবার খেলতে নেমেছিলুম, কিন্তু কী কাণ্ড যে করেছি— তোমাদের ভেতর যারা প্যালারামের কীর্তি-কাহিনী পড়েছ তারা তা সবই জানো। সব্বাই আমাকে বলে— আমি রোগাপটকা, আমি অপদার্থ। কিন্তু এখন দেখলুম— রোগা-টোগা ও-সব কিছু না— স্রেফ বাজে কথা। মনে জোর এলে আপনি গায়ের জোর এসে যায়— দুনিয়ার কোনও কাজ আর অসম্ভব বলে বোধ হয় না। আমি প্রাণপণে সেই শেকড় ধরে ঝুলতে লাগলুম। তাকিয়ে দেখি আরও শেকড় রয়েছে ওপরে। কাঁচা মাটির গর্তে পা দিয়ে দিয়ে শেকড় টেনে টেনে—

আরে—আরে—আমি যে ওপরে উঠে গেছি প্রায়! একটু— আর একটু—

নীচের গর্তে তখন যে কী দাপাদাপি চলছে ভাবাই যায় না। বাঘের চিৎকারে বিশটা নয়—পঁচিশটা নয়— একশোটা বাজ যেন ফেটে পড়ছে। বাঘ লাফিয়ে উঠছে থেকে থেকে— একবার একটা থাবা প্রায় আমার পা ছুঁয়ে গেল। শেষ শক্তি দিয়ে আমি সবচেয়ে ওপরের শিকড়টা টেনে ধরলুম, সেটা মটমট করে উঠল, তারপর ছিঁড়ে পড়ার আগেই আমি গর্তের মুখে— আবার শক্ত মাটিতে উঠে পড়লুম।

আর তখন মনে হল, আমার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে যাচ্ছে। কাঁধ দুটোকে কে যেন আলাদা করে ছিঁড়ে নিচ্ছে দু'দিকে। কপাল থেকে ঘাম চোখে নেমে এসে সব ঝাপসা করে দিচ্ছে, আগুন ছুটছে সারা গায়ে। ঘাসের ওপর দাঁড়াতে গিয়েও আমি দাঁড়াতে পারলুম না— সত্যিই বেঁচে আছি না মরে গেছি ভালো করে বোঝবার আগেই সব অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা পরিষ্কার হতে লাগল। মুখের ওপর কী যেন সুড়সুড় করে হাঁটছে এমনি মনে হল। টোকা দিয়ে সেটাকে ফেলে দিয়ে দেখি, একটা বেশ মোটাসোটা গুবরে পোকা। চিৎ হয়ে পড়ে বোঁ-বোঁ করে হাত-পা ছুঁড়ছে।

আস্পর্ধা দ্যাখো একবার। আমার মুখখানাকে বোধহয় গোবরের তাল মনে করেছিল। এখন থাকো চিৎ হয়ে।

তক্ষুনি আবার যেন পাতাল থেকে কামানের ডাক এল। মাটিটা কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

দেখলুম, আমি মাটিতে পা ছড়িয়ে উবুড় হয়ে পড়ে আছি। আমার মাথার সামনে ঠিক ছ'ইঞ্চি দূরে কুয়োর মতো মস্ত একটা গর্তের মুখ। আমার হাতের মুঠোয় কতগুলো সরু-সরু ছেঁড়া শেকড়।

সব মনে পড়ে গেল। একটু আগেই গর্তটা থেকে আমি উঠে এসেছি। তারপর ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম।

কিন্তু গর্তের মধ্যে বাঘ কি এখনও আছে? নিশ্চয় আছে। নইলে সে উঠে এলে আমি আর মাটিতে থাকতুম না— আরও ভালো জায়গায় আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়ে যেত— মানে বাঘের পেটের ভেতর। আর সেই শজারু? সে-ও নিশ্চয় যথাস্থানেই রয়েছে— আর দু'জনে মিলে জোর মজারু চলছে গর্তে।

মজা? বাঘের চিৎকার তো ঠিক সে-রকমটা মনে হচ্ছে না।

আমি চার পায়ে ভর দিয়ে উঠলুম— গলাটা একটু বাড়িয়ে দিলুম গর্তের দিকে। ভেতরে প্রথমটা খালি অন্ধকার মনে হল— আর বোধ হল, বিষম একটা দাপাদাপি চলছে। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু একটু করে আমি সব দেখতে পেলুম।

শজারুটা কেমন তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে— তার চারটে পা আর মাথাটা অল্প অল্প নড়ছে। তার পাশেই পড়ে আছে বাঘ— লাফাচ্ছে না, সমানে হাঁপাচ্ছে, আর কী একটা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে একটানা।

এবারে ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি রইল না।

বাঘ পড়েছিল সোজা শজারুর ওপর। তার ধারালো কাঁটাগুলো বাঘের সর্বাঙ্গে বিঁধেছে শরশয্যার মতো। আর তারই যন্ত্রণায় বাঘ অমনভাবে লাফঝাঁপ করছে— আমি যে শেকড় ধরে ধরে গর্ত বেয়ে ওপরে উঠে এসেছি, সে তা দেখতেও পায়নি। ওই শজারুটা নিজের প্রাণ দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছে।

শজারুটার জন্যে আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। আর কেন জানি না— বাঘের জন্যেও মায়ায় মনটা আমার ভরে উঠল। সর্বাঙ্গে শজারুর কাঁটা বিঁধে না-জানি কত যন্ত্রণাই পাচ্ছে বাঘটা। এর চাইতে যদি একেবারে মরে যেত, তাহলেও ঢের ভাল হত ওর পড়ে।

একমনে দেখছি— হঠাৎ টপাস্।

কী একটা ঢিলের মতো এসে পড়ল পিঠের ওপর।— আরে—আরে করে উঠে বসলুম—আবার টপাস্! একেবারে চাঁদির ওপর। তাকিয়ে দেখি শুকনো সীমের মতো কী এরকম ফল।

ওপর থেকে আপনি পড়ছে নাকি?

না—না। যেই চোখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি গাছের ডালে বসে কে যেন বিশ্রীরকমভাবে ভেংচি কাটছে আমাকে। ইয়া বড় একটা গোদা বাঁদর। এখানে আসা অবধিই দেখছি হাড়বজ্জাত বাঁদরগুলো পেছনে লেগেছে আমাদের। নাকটাকে ছারপোকার মতো করে গাছ থেকে কতগুলো শুকনো ফল ছিঁড়ে ছিঁড়ে সে আমার পিঠ বরাবর তাক করছে, আর সমানে ভেংচি কেটে চলেছে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, এই! —তারপর বাঁদরটাকে আরও ঘাবড়ে দেবার জন্যে হিন্দী করে বললুম, ফের বদমায়েসী করেগা তো কান ধরকে এক থাপ্পড় মারেগা।

অবশ্য গাছের ওপর উঠে ওর কানটা হাতে পাওয়া মুস্কিল— থাপ্পড় মারা আরও মুস্কিল। কিন্তু যে করে হোক, বাঁদরটাকে নার্ভাস করে দেওয়া দরকার। আমি আবার বললুম, এক চাঁটিমে দাঁত উড়ায় দেগা। কেন ঢিল মারতা হ্যায়? হাম পটলডাঙার প্যালারাম হ্যায়— সমঝা?

বাঁদরটা দাঁত বের করে কী যেন বললে।—কিঙ্কিঙ্ কিঙ্কিঙ্ কাঁচাগোল্লা কিংবা অমনি একটা কিছু হবে।

কাঁচাগোল্লা ? আমার দারুণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আচ্ছা— তাই সই। তোমায় কাঁচাগোল্লাই খাওয়াচ্ছি।

সামনেই কয়েকটা শুকনো মাটির ঢেলা পড়ে ছিল। তার দু'-একটা তুলে নিয়ে বললুম, চলা আও—চলা আও—

সঙ্গে সঙ্গে নাকের ওপর আর-একটা ফল এসে পড়ল। বাঘের ল্যাজের ঘা খেয়ে নাকটা এমনিতেই বোঁচা হওয়ার জো— তার ওপর বাঁদরের এই বর্বর অত্যাচার। আমার শরীরে দস্তুরমতো ব্রহ্মতেজ এসে গেল।

চালাও ঢিল— লাগাও—

দমাদ্দম গাছের ওপর ঢিল চালাতে লেগে গেলুম। একেবারে মরিয়া হয়ে।

হঠাৎ বোঁ—ওঁ—ওঁ করে কেমন বেয়াড়া বিচ্ছিরি আওয়াজ।

এরোপ্লেন নাকি ? আরে না-না— এরোপ্লেন কোথায় ? গাছের একটা ডাল থেকে দল বেঁধে উড়ে আসছে ওরা কারা ? চিনতে আমার একটুও কষ্ট হল না— ছেলেবেলায় মধুপুরে ওদের একটার মোক্ষম কামড় আমি খেয়েছিলুম। সেই থেকে ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

ভীমরুল। আমার ঢিল বাঁদরের গায়ে লাগুক আর না-লাগুক—ঠিক ভীমরুলের চাকে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করেছে।

মর্‌চি—মরচি—খাউঞ্চি বলে বাঁদরটা এক লাফে কোথায় হাওয়া হল কে জানে ! ওর মধ্যেই দেখতে পেলুম ওর নাকে মুখে ল্যাজে ভীমরুলেরা চেপে বসেছে। বোঝো— আমাকে ভ্যাংচানোর আর ঢিল মারবার মজাটা বোঝো।

কিন্তু এ কী ! আমার দিকেও যে ছুটে আসছে ঝাঁক বেঁধে ! এখন ?

দৌড়—দৌড়—মার দৌড় !

তবু সঙ্গ ছাড়ে না যে। যত ছুটছি, ততই যে পেছনে পেছনে আসছে ঝাঁক বেঁধে ! এল—এল—এই এসে পড়ল— ! গেছি এবার ! কামড়ে আমাকে আর আস্ত রাখবে না !

এখন কী করি ? বাঘের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে শেষে কি ভীমরুলের হাতে মারা যাব ? আমি ঠিক এই সময়েই—

জয় গুরু ! সামনে একটা পচা ডোবা।

ঝপাং করে আমি সেই ডোবাতেই সোজা ঝাঁপ মারলুম।

১৪

কী পচা পাঁক, আর কী বিচ্ছিরি গন্ধ ! কতক্ষণ আর মাথা ডুবিয়ে থাকা যায় তার ভেতরে ! একটু মাথা তুলি, আর বোঁ—ওঁ—ওঁ ! সমানে চক্কর দিচ্ছে

ভীমরুলেরা। এ কী ল্যাঠায় পড়া গেল !

ভাগ্যিস ডোবাটায় বেশি জল নেই, নইলে তো ডুবে মরতে হত ! হাঁটু-সমান কাদা আর একটুখানি জলের ভেতর কোনওমতে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছি। চারিদিকে ব্যাঙ লাফাচ্ছে— নাকে-কানে পোকা ঢুকছে, ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। বাঘের গর্ত থেকে উঠে কি শেষতক পচা ডোবার মধ্যেই মারা যাব নাকি ?

একবার মাথা ওঠাই— অমনি বোঁ-ওঁ-ওঁ। আবার ডুব ! অমনি করে কতক্ষণ কাটল জানি না। তারপর যখন ভীমরুলেরা হতাশ হয়ে সরে পড়ল, তখন ভালো করে তাকিয়ে দেখে-টেখে আমি ডোবা থেকে উঠে এলুম।

ইঃ—কী খোলতাই চেহারাখানাই হয়েছে। একটু আগে আমি ছিলুম পটলডাঙার প্যালারাম— ওজন ছিল সর্বসাকুল্যে এক মন সাত সের। এখন আমি যে কে— ঠাহরই করতে পারলুম না। সারা গায়ে কাদার আস্তর পড়েছে, নিজের হাত-পা জামা-কাপড় কিছু দেখতে পাচ্ছি না— পা তো ফেলছি না, যেন হাতির মতো পদক্ষেপ করছি। আমি এখন ওজনে অন্তত সাড়ে তিন মন— মাথার ওপর আরও পোয়াটাক ব্যাঙাচি নাচানাচি করছে।

কিন্তু এখন কী করি। কোন্ দিকে যাই ?

কাদা-টাদাগুলো খানিক পরিষ্কার করলুম, জামা জুতো ডোবার জলেই ধুয়ে নিলুম। কিন্তু এখন কোন্ দিকে যাই। শীতে সারা শরীর জমে যেতে চাইছে। চারিদিকে ঘন জঙ্গল— কোথায় যাব, কী করব কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। টেনিদার কী হল— চারমূর্তির বাকি তিনজনই বা কোথায়—কুট্টিমামা তাঁর শিকারিদের নিয়েই বা কোন্ দিকে গেলেন ?

সে ভাবনা পরে হবে। এখন এই শীতের হাত থেকে কেমন করে রেহাই পাই ?

বনের পাতার ফাঁক দিয়ে এক জায়গায় ঝলমলে রোদ পড়েছে খানিকটা। বেলা এখন বোধহয় দুপুরের দিকে। আমি সেই রোদের মধ্যে এসে দাঁড়ালুম। বেশ ঝাঁঝালো রোদ— এতক্ষণে একটু আরাম পাচ্ছি।

কিন্তু ল্যাঠা কি আর একটা নাকি ? এইবারে টের পেলুম— পেটের মধ্যে চুঁই চুঁই করে উঠেছে। মানে—জোর খিদে পেয়েছে।

যেই খিদেটা টের পেলুম অমনি মনে হল আমি যেন কতকাল খাইনি—নাড়িভুঁড়িগুলো সব আবার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চাইছে। খিদের চোটে আর দাঁড়াতে পারছি না আমি। মনে পড়ল, আসবার সময় টিফিন-ক্যারিয়ার-ভর্তি খাবার আনা হয়েছিল—তাতে লুচি ছিল, আলুর দম ছিল, বেগুনি ভাজা ছিল, সন্দেশ ছিল—

হায়, কোথায় ভ্যান— কোথায় লুচি আর আলুর দম ! জীবনে কোনও দিন কি আর আলুর দমের মুখ দেখতে পাব আমি ! কিছুক্ষণ পরে বনের ভেতরই পটলডাঙার প্যালারামের বারোটা বেজে যাবে। যদি বাঘ-ভালুকে না খায়, খিদেতেই মারা যাব।

নাঃ, আর পারা যায় না। কিছু একটা খাবার-দাবার জোগাড় করা দরকার।

যেই খাবার-দাবারের কথা ভাবলুম— অমনি শরীরে তেজ এসে গেল। আমি দেখেছি, আমার এই রকমই হয়। সেই একবার হাবুলের ছোট ভাই বাবুলের অন্নপ্রাশনে নেমন্তন্ন ছিল। আগের দিন রাতে কোঁ-কোঁ করে জ্বর এসে গেল। ভাবলুম, পরদিন ওরা সবাই প্রেমসে মাংস-পোলাও সাঁটবে আর আমার বরাতে কেবল বার্লির জল। দারুণ মনের জোর নিয়ে এলুম। বললে বিশ্বাস করবে না, সকালেই জ্বর একদম রেমিশন। খেয়েছিলুমও ঠেসে। অবশ্য সেদিন রাত থেকে...কিন্তু সে-কথা বলে আর কাজ নেই। মানে, নেমন্তন্নটা তো আর ফসকাতে দিইনি!

আপাতত আমায় খেতেই হবে। শীত-ফীত চুলোয় যাক।

বনে তো অনেক রকম ফল-পাকড় থাকে শুনেছি। মুনি-ঋষিরা সেইসব খেয়েই তপস্যা করেন। আমি গাছের দিকে তাকাতে তাকাতে গুটি-গুটি এগোলুম। দুৎ— ফল কোথায়? কেবল পাতা আর পাতা। ছাগল হলে অবিশ্যি ভাবনা ছিল না। বড়দা আমাকে ছাগল বলে বটে, কিন্তু আমি তো সত্যিই-সত্যিই ঘাস-পাতা খেতে পারি না! ফল পাই কোথায়।

একটা গাছের তলায় কালো কালো ক'টা কী যেন পড়ে রয়েছে। একটা তুলে কামড় দিয়ে দেখি— বাপরে। ইটের চাইতেও শক্ত— দাঁত বসবে না। একটু দূরেই লাল টুকটুকে গোটা-দুই ফল লতা থেকে ঝুলছিল—দৌড়ে গিয়ে একটা ছিঁড়ে নিলুম। কামড় দিতেই— আরে রামো-রামো! কী বিচ্ছিরি ভেতরটাতে, আর কী দারুণ বদ গন্ধ। থু-থু করে ফেলে দিতে পথ পাই না। তখন মনে পড়ল— আরে, এ তো মাকাল! এ তো আমি দেখেছি আগেই। ছ্যা! ছ্যা!

মুনি-ঋষিদের নিকুচি করেছে! বনে ফল থাকে, না ঘোড়ার ডিম থাকে! এখন বুঝতে পাচ্ছি সব গুলপট্টি। আমাকে লাখ টাকা দিলেও আমি কখনও সাধু-সন্নিসি হব না— প্রাণ গেলেও না।

কিন্তু খাই কী!

—ক্র্যাং!

পেছনে কেমন একটা বিটকেল আওয়াজ। আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম।

আবার সেই শব্দ: ক্র্যাং। ক্র্যাং!

এ আবার কী রে বাবা! কোথাও কিছু দেখছি না— অথচ থেকে থেকে অমন যাচ্ছেতাই আওয়াজ করছে কে।

—ক্র্যাং—কর্-র্-র্—

একটা দৌড় মারব কি না ভাবছি—এমন সময়— হুঁ হুঁ! ঠিক আবিষ্কার করেছি! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি!

দেখি না, পাশেই একটা নালা। তার ভিতরে গোলগাল একটি ভদ্রলোক। ওই আওয়াজ তিনিই করছেন।

ভদ্রলোক? আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ— ভদ্রলোক ছাড়া কী বলা যায় আর? একটি নধর নিটোল কোলা ব্যাঙ! পিঠের ওপর বড় বড় টোপ তোলা— মস্ত মস্ত চোখ দুটো কানের মতো খাড়া হয়ে রয়েছে। আমার দিকে ড্যাবডেবে চোখ তুলে চেয়ে রয়েছে, আর থেকে থেকে শব্দ করছে; ক্রং-ক্রং—কর্-র্ কুর্-র্—

করছে কী জানো? ফুটবলের ব্লাডারে হাওয়া দিলে যেমন করে ফোলে, তেমনিভাবে গলার দু'পাশে বাতাস ভরে নিচ্ছে, গলাটা মোটা হয়ে উঠছে। আর বাতাসটা যেমনি ছেড়ে দিচ্ছে অমনি শব্দ হচ্ছে; ক্র্যাং—কড়াং—

বটে! তাহলে এমনি করেই কোলা-ব্যাঙ ডাকে। সারা বর্ষা এইভাবে গ্যাঙর-গ্যাঙর করে!

আমি ব্যাঙটাকে বললুম, খুব যে মেজাজে বসে আছিস দেখছি!

ব্যাঙ একটা মস্ত লাল জিভ বের করে দেখালে।

—আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস বুঝি?

ব্যাঙ গলার দু'ধারে বাতাস জড়ো করতে লাগল।

—এক চাঁটিতে তোকে উড়িয়ে দিতে পারি তা জানিস?

ব্যাঙটা আওয়াজ করলে; ক্র্যাং—কুর্র্! মানে যেন বলতে চাইল; ইস, ইয়ার্কি নাকি? চেষ্টা করেই দেখ না একবার!

—বটে!

—ক্রু—ফুর্র—

—জানিস, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে? আমি ইচ্ছে করলে তোকে এক্ষুনি ভেজে খেতে পারি?

—তবে তাই খা— বলেই কে আমার পিঠে ঠাস্ করে একটা চাঁটি মারল।

—বাপরে— ভূত নাকি?

আমি হাত-তিনেক লাফিয়ে উঠলুম। তারপর দেখি, একমুখ দাঁত বের করে হাবুল সেন।

—হাবলা—তুই?

হাবুল বললে, হ, আমি। কিন্তু তোর এ কী দশা হইছে প্যালা? কাদা মাইখ্যা, ভূত সাইজ্যা অ্যাকটা ব্যাঙের লগে মশ্‌করা করতে আছস?

এই ফাঁকে ব্যাঙটা মস্ত লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্যে কোথায় যেন চলে গেল।

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, খোশ-গল্প এখন থাক। কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারিস?

—আরে আমি খাবার পামু কই? সেই তখন থিক্যা জঙ্গলের মইধ্যে হারা উদ্দেশ্যে ঘুরতিস। কে যে কোথায় চইলা গেল খুঁইজাই পাই না। শ্যাষে একটা গাছের নীচে শুইয়া ঘুম দিলাম।

—বনের মধ্যে ঘুমুলি?

—হ, ঘুমাইলাম।

—তোকে যদি বাঘে নিত?

হাবুল আবার একগাল হাসল ; আমারে বাঘে খায় না।

—কী করে জানলি ?

—আমি হাবুল স্যান না ? উইঠ্যা বাঘেরে অ্যামন অ্যাক্‌টা চোপাড় দিমু যে—

বাকিটা হাবুল আর বলতে পারল না। হঠাৎ সমস্ত বন জঙ্গল কাঁপিয়ে কে যেন বিকট গলায় হ্যা-হ্যা-হ্যাঃ করে হেসে উঠল। একেবারে আমাদের কানের কাছেই।

—ওরে বাপরে—

হাবুল আর ডাইনে বাঁয়ে তাকাল না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।

আবার সেই শব্দ ; হ্যা-হ্যা-হ্যাঃ—

এবার সেই ভিজে কাপড়ে জামায় আমিও হাবুলের পেছন দে ছুট— দে ছুট।

—ওরে হাবলা, দাঁড়া-দাঁড়া যাসনি— আমাকে ফেলে যাসনি—

১৫

বেশি দূর দৌড়তে হল না। হাউ-মাউ করে খানিকটা ছুটেই একটা গাছের শেকড়ে পা লেগে হাবুল ধপাস্। সঙ্গে সঙ্গে আমিও তার পিঠের ওপর কুমড়োর মতো গড়িয়ে পড়লুম।

খাইছে— খাইছে !—হাবলা হাহাকার করে উঠল।

তারপর দু'জনে মিলে জড়াজড়ি। ভাবছি পেছন থেকে এবার সেই অট্টহাসির ভূতটা এসে আমাদের দু'জনকে বুঝি ক্যাঁক করে গিলে ফেলল।

কিন্তু মিনিট পাঁচেক গড়াগড়ি করেও যখন কিছুই হল না— আর মনে হল আমরা তো এখন কলেজে পড়ছি— ছেলেমানুষ আর নই, অমনি তড়াক করে উঠে পড়েছি। দুত্তোর ভূত ! বাঘের গর্তে পড়েই উঠে এলুম— ভূতকে কিসের ভয়।

হাবুল সেন তো বিধ্বস্তভাবে পড়ে আছে, আর চোখ বুজে সমানে 'রাম রাম' বলছে। বোধহয় ভাবছে ভূত ওর ঘাড়ের ওপর এসে চেপে বসেছে। থাক পড়ে। আমি উঠে জুল-জুল চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখলুম।

অমনি আবার সেই হাসির আওয়াজ ; হ্যাঁঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ !

শুনেই আমি চিংড়িমাছের মতো তিড়িং করে লাফ মেরেছি। হাবুল আবার বললে, খাইছে— খাইছে।

কিন্তু কথাটা হল, হাসছে কে ! আর আমাদের মতো অখাদ্য জীবকে খেতেই বা চাচ্ছে কে।

আরে ছ্যা ছ্যা ! মিথ্যেই দৌড় করালে ! কাণ্ডটা দেখেছ একবার ! ওই তো বকের মতো একটা পাখি, তার চাইতে গলাটা একটু লম্বা, কদমছাঁট চুলের মতো কেমন একটা মাথা কালচে রং, কুতকুতে চোখ। আবার দুটো বড়-বড় ঠোঁট ফাঁক করে ডেকে উঠল : হ্যাঃ—হ্যাঃ—

—ওরে হাবলা, উঠে পড়। একটা পাখি।

হাবুল সেন কি সহজে ওঠে ? ঠিক একটা জগদ্দল পাথরের মতো পড়ে আছে। চোখ বুজে, তিনটে কুইনাইন একসঙ্গে খাচ্ছে এইরকম ব্যাজার মুখ করে বললে, রাম-নাম কর প্যালা— রাম-নাম কর ! এইদিকে ভূতে ফ্যাকর ফ্যাকর কইর‍্যা হাসতাছে আর অর অখন পাখি দেখনের শখ হইল।

কী জ্বালা ! আমি কটাং করে হাবুলের কানে একটা চিমটি কেটে দিলুম। হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। আমি বললুম, আরে হতচ্ছাড়া, একবার উঠেই দ্যাখ্ না। ভূত-টুত কোথাও নেই— একটা লম্বা-গলার পাখি অমনি আওয়াজ করে হাসছে।

—কী, পাখিতে ডাকতাছে।— বলেই বীরের মতো লাফিয়ে উঠল হাবুল। আর তক্ষুনি সেই বিচ্ছিরি চেহারার পাখিটা হাবুলের দিকে তাকিয়ে, গলাটা একটু বাঁকিয়ে, চোখ পিটপিট করে, ঠিক ভেংচি কাটার ভঙ্গিতে হ্যা-হ্যা করে ডেকে উঠল।

হাবুল বললে, অ্যাঁ—মস্করা করতে আছস আমাগো সঙ্গে ? আরে আমার রসিক পাখি রে ! অখনি তবে ধইর‍্যা রোস্ট বানাইয়া খামু।

আমার পেটের ভেতরে সেই খিদেটা আবার তিং পাং তিং পাং করে লাফিয়ে উঠল। আমি বললুম, রোস্ট বানাবি ? তবে এক্ষুনি বানিয়ে ফ্যাল না ভাই। সত্যি বলছি, দারুণ খিদে পেয়েছে !

কিন্তু কোথায় রোস্ট— কোথায় কী ! হাবলাটা এক নম্বরের জোচ্চোর। তখুনি দু'-তিনটে মাটির চাঙড় তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে পাখিটার দিকে। আর পাখিটা অমনি ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ করে পাখা ঝাপটে বনের মধ্যে ভ্যানিশ।

—গেল-গেল—রোস্ট পালিয়ে গেল— বলে আমি পাখিটাকে ধরতে গেলুম। কিন্তু ও কি আর ধরা যায় !

ভীষণ ব্যাজার হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। পাখিদের ওই এক দোষ। হয় দুটো ঠ্যাং থাকে— সেই ঠ্যাং ফেলে পাঁই-পাঁই করে পালিয়ে যায়, নয় দুটো ডানা থাকে— সাঁই-সাঁই করে উড়ে যায়। মানে, দেখতে পেলেই ওদের রোস্ট করা যায় না ! খুব খারাপ—পাখিদের এ-সব ভারি অন্যায়।

আমি বললুম, এখন কী করা যায় হাবুল ?

হাবুল যেন আকাশজোড়া হাঁ করে হাই তুলল। বললে, কিছুই করন যায় না— বইস্যা থাক।

—কোথায় বসে থাকব ?

—যেখানে খুশি। এইটা তো আর কইলকাতার রাস্তা না যে ঘাড়ের উপর অ্যাকটা মটরগাড়ি আইস্যা পোড়ব !

—কিন্তু বাঘ তো এসে পড়তে পারে।

—আসুক না। —বেশ জুত করে বসে পড়ে হাবলা আর-একটা হাই তুলল ;

বাঘে আমারে খাইব না। তোরে ধইরা খাইতে পারে। কিন্তু তোরে খাইয়া বাঘটা নিজেই ফ্যাচাঙে পইড়্যা যাইব গা। বাঘের পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলা হইব। —বলেই মুখ-ভর্তি শাঁকালুর মতো দাঁত বের করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল।

ভিজে ভূত হয়ে আছি— সারা গা-ভর্তি এখনও পাঁক। ওদিকে পেটের ভিতর খিদেটা সমানে তেরে-কেটে-তাক বাজাচ্ছে। এদিকে এই হনোলুলু— না মাদাগাস্কার— না-না সুন্দরবন—দুত্তোর, ডুয়ার্সের এই যাচ্ছেতাই জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে রয়েছি। তার ওপর একটু পরেই রাত নামবে— তখন হাতি, গণ্ডার, বাঘ, ভালুক সবাই মোকাবিলা করতে আসবে আমাদের সঙ্গে। এখন এইসব ফাজলামি ভালো লাগে? ইচ্ছে হল, হাবলার কান পেঁচিয়ে একটা পেল্লায় থাপ্পড় লাগিয়ে দিই।

কিন্তু হাবলাটা আবার বক্সিং শিখেছে। ওকে ঘাঁটিয়ে সুবিধে করতে পারব না। কাজেই মনের রাগ মনেই মেরে জিজ্ঞেস করলুম, তোকে বাঘে খাবে না কী করে জানলি?

হাবুল গম্ভীর হয়ে বললে, আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে ব্যাঘ্রে আমারে ভোজন করব না।

আমি রেগে বললুম, দুত্তোর কুষ্ঠীর নিকুচি করেছে! আমাদের পাড়ার যাদবদার কুষ্ঠীতে তো লেখা ছিল সে অতি উচ্চাসনে আরোহণ করবে। এখন যাদবদা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দশতলার ঘরগুলো ঝাঁট দেয়।

হাবুল বললে তা উচ্চাসনই তো হইল।

আমি ভেংচে বললুম, তা তো হইল। কিন্তু ব্যাঘ্রে না-হয় ভোজন করবে না— ভালুক এসে যদি ভক্ষণ করে কিংবা হাতি এসে পায়ের তলায় চেপটে দেয়, তখন কী করবি?

এইবার হাবুল গম্ভীর হল।

—হ, এই কথাটা চিন্তা করন দরকার। ক্যাপ্টেন টেনিদা হাতির পিঠে উইঠ্যা কোথায় যে গেল— সব গোলমাল কইর‍্যা দিছে। অ্যাক্টা বুদ্ধি দে প্যালা। কোন্ দিকে যাওয়া যায়—ক দেখি?

—যাওয়ার কথা পরে হবে। সত্যি বলছি হাবুল, এখুনি কিছু খেতে না পেলে আমি বাঁচব না। কী খাওয়া যায় বল তো?

—হাতি-ফাতি ধইর‍্যা খা— আর কী খাবি?

ওর সঙ্গে কথা কওয়াই ধাষ্টামো। এদিকে এত ভূতের ভয়— ওদিকে দিব্যি আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। যেন নিজের মোলায়েম বিছানাটিতে নবাবি কেতায় গা এলিয়ে দিয়েছে। একটু পরেই হয়তো ঘুর-ঘুর করে খাস্যা নাক ডাকাতে শুরু করবে। ও-হতচ্ছাড়াকে বিশ্বাস নেই— ও সব পারে।

কিন্তু আমায় কিছু খেতেই হবে। আমি খাবই।

চারদিকে ঘুর-ঘুর করছি। নাঃ—কোথাও একটা ফল নেই— খালি পাতা আর পাতা। বনে নাকি হরেক রকমের ফল থাকে আর মুনি-ঋষিরা তাই তরিবত করে

খান। স্রেফ গুলপট্টি!

এমন সময় : ক্যাঁক-ক্যাঁক—কোঁর্-র্—

যেই একটা ঝোপের কাছাকাছি গেছি, অমনি একজোড়া বন-মুরগি বেরিয়ে ভোঁ-দৌড়। আমার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ইস্—পাখিদের কেন ঠ্যাং থাকে? বিশেষ করে মুরগিদের? কেন ওরা কারি কিংবা রোস্ট হয়ে জন্মায় না?

কিন্তু জয় গুরু! ঝোপের মধ্যে চারটে শাদা রঙের ও কী? অ্যাঁ— ডিম! মুরগির ডিম!

খপ্ করে দু'হাতে দুটো করে ডিম তুলে নিলুম। হাবুলের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক হতভাগা! ওকে আর ভাগ দিচ্ছি না। এ চারটে ডিম আমিই খাব। কাঁচাই খাব।

একটা ভেঙে যেই মুখে দিয়েছি— ব্যস! আমার চোয়াল সেইখানেই আটকে গেল। আমার সামনে কোত্থেকে এসে দাঁড়িয়েছে এক বিকট কালো মূর্তি—ঝোপের ভেতর মনে হল নির্ঘাত একটা মস্ত ভালুক!

এমনিতে গেছি— অমনিতেও গেছি! আমি একটা বিকট চিৎকার করে ডাকলুম : হাবুল! তারপর হাতের একটা ডিম সোজা ছুড়ে দিলুম ভালুকটার দিকে।

আর ভালুক তক্ষুনি ডিমটা লুফে নিয়ে স্পষ্ট মানুষের গলায় বললে, দে না। আর আছে?

১৬। শেষ পর্যন্ত কুট্টিমামা

ভালুকে বাংলা বলে! এমন পরিষ্কার ভাষায়!

আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হতে যাচ্ছিল, কিন্তু জলে-কাদায় মাখামাখি বলে খাড়া হতে পারল না। তার বদলে সারা গায়ে যেন পিঁপড়ে সুড়-সুড় করতে লাগল, কানের ভেতর কুটুং কুটুং করে আওয়াজ হতে লাগল। অজ্ঞান হব নাকি? উঁহু— কিছুতেই না! বারে বারে অজ্ঞান হওয়ার কোনও মানে হয় না—ভারি বিচ্ছিরি লাগে!

ঠিক এই সময় পেছন থেকে হাবুল বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল : পলা—পলাইয়া আয় প্যালা— তরে ভাল্লুকে খাইব।

'ভাল্লুকে খাইব' শুনেই আমি উল্লুকের মতো একটা লাফ দিয়েছি। আর ভালুকটা অমনি করেছে কী— তার চাইতেও জোরে লাফ দিয়ে এসে ক্যাঁক করে আমার ঘাড়টা চেপে ধরেছে।

আমি কাঁউ কাঁউ করে বললুম, গেছি— গেছি—

আর ভালুক ভেংচি কেটে বললে, গেছি— গেছি ! যাবি আর কোথায় ? কথা নেই, বার্তা নেই— গেলেই হল !

আরে রামঃ— এ যে ক্যাবলা ! একটা ধুমসো কম্বল গায়ে !

—ক্যাবলা—তুই !

—আমি ছাড়া আর কে ? পটলডাঙার শ্রীমান্ ক্যাবলা মিত্তির— অর্থাৎ শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মিত্র। দাঁড়া— সব বলছি। তার আগে ডিমটা খেয়ে নিই— বলে ডিমটা ভেঙে পট করে মুখে ঢেলে দিলে।

কী যে ভীষণ রাগ হল সে আর কী বলব। ভালুক সেজে ঠাট্টা— তার ওপর আবার এত কষ্টের ডিম বেশ আমেজ করে খেয়ে নেওয়া ! তাকিয়ে দেখি আমার হাতে একটাও ডিম নেই— সব মাটিতে পড়ে একেবারে গুঁড়ো। সেই যে লাফটা মেরেছিলুম—তাতেই ওগুলোর বারোটা বেজে গেছে।

এদিকে মজাসে ডিমটা খেয়ে ক্যাবলা গান জুড়ে দিয়েছে ; হাম্‌টি ডাম্‌টি স্যাট্ অন্ এ ওয়াল—

আমি ক্যাবলার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলুম। বললুম, রাখ তোর হাম্‌টি-ডাম্‌টি। কোন্ চুলোয় ছিলি সারাদিন ? একটা মোটা ধুমসো কম্বল গায়ে চড়িয়ে এসে এসব ফাজলামো করবারই বা মানে কী ?

ক্যাবলা বললে, আরে বলছি, বলছি— হড়বড়াতা কেঁউ ? লেকিন হাবুল কিধর ভাগা ?

তাই তো— হাবুল সেন কোথায় গেল ? এই তো গাছতলায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল। তারপর আমাকে ডেকে বললে, পালা— পালা ! কিন্তু পালিয়েছে দেখছি নিজেই। কোথায় পালাল ?

দু'জনে মিলে চেঁচিয়ে ডাক ছাড়লুম : ওরে হাবলা রে— ওরে হাবুল সেন রে—

হঠাৎ ওপর থেকে আওয়াজ এল : এই যে আমি এইখানে উঠেছি—

তাকিয়ে দেখি, ন্যাড়া-মুড়ো কেমন একটা গাছের ডালে উঠে হাবুল ঘুঘুর মতো বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, উঠেছিস, বেশ করেছিস। নেমে আয় এখন। উতারো।

—নামতে তো পারতাছি না। তখন বেশ তড়াং কইর্‌যা তো উইঠ্যা বসলাম। অখন দেখি লামন যায় না। কী ফ্যাচাঙে পইর্‌যা গেছি ক দেখি ? এইদিকে আবার লাসায় কামড়াইয়া গা ছুইল্যা দিতে আছে !

আমি বললুম, লাসায় কামড়ে তোকে তিব্বতে পাঠাচ্ছে।

হাবুল খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, ফালাইয়া রাখ তর মস্করা। অখন লামি ক্যামন কইর্‌যা ? বড় ল্যাঠায় পড়ছি তো !

ক্যাবলা বললে, লাফ দে।

—ঠ্যাং ভাঙব !

—তাহলে ডাল ধরে ঝুলে পড়। আমরা তোর পা ধরে টানি।

—ফালাইয়া দিবি না তো চালকুমড়ার মতন ?

—আরে না—না !

—তাই করি ! অখন যা থাকে কপালে—

বলেই হাবুল ডাল ধরে নিচে ঝুলে পড়ল। আমি আর ক্যাবলা তক্ষুনি ওপরে লাফিয়ে উঠে হাবুলের দু'পা ধরে হেঁইয়ো বলে এক হ্যাঁচকা টান।

—সারছে—সারছে—কম্মো সারছে— বলতে বলতে হাবুল আমাদের ঘাড়ে পড়ল। তারপরে তিনজনেই একসঙ্গে গড়িয়ে গেলুম। আমার নাকটায় বেশ লাগল— কিন্তু কী আর করা— বন্ধুর জন্যে সকলকেই এক-আধটু কষ্ট সইতে হয়।

উঠে হাত-পা ঝেড়ে তিনজনে গোল হয়ে বসলুম। আমার গল্প শুনে ক্যাবলা তো হেসেই অস্থির।

—খুব যে হাসছিস ? যদি বাঘের গর্তে গিয়ে পড়তিস, টের পেতিস তা হলে।

—বাঘের পাল্লায় আমিও পড়িনি বলতে চাস ?

—তুইও ?

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, পড়বই তো। ব্যাবাকে পড়ব। ক্যাবল আমি না। আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে ; ব্যাঘ্রে আমারে কক্ষনো ভোজন করব না।

আমি ধমকে বললুম, চুপ কর হাবলা— তোর কুষ্ঠীর গল্প বন্ধ কর। তোর কী হয়েছিল রে ক্যাবলা ?

—হবে আবার কী ! হাতির পায়ের দাগ ধরে ধরে আমি তো এগোচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল ধুড়ুম করে এক বন্দুকের আওয়াজ।

—হ, আওয়াজটা আমিও পাইছিলাম— হাবুল জানিয়ে দিলে।

—অঃ, থাম না হাবলা। বলে যা ক্যাবলা—

ক্যাবলা বলে চলল,—তারপরেই দেখি বনের মধ্যে দিয়ে একটা বাঘ পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে আসছে। দেখে আমার চোখ একেবারে চড়াং করে চাঁদিতে উঠে গেল। আমিও বাপ-বাপ করে দৌড়— একেবারে মোটরটার কাছে চলে গেলুম। তারপর মোটরের কাচ-টাচ বন্ধ করে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

—সেই বাঘটাই বোধহয় আমার গর্তে গিয়ে পড়েছিল— আমি বললুম।

—হতে পারে, ক্যাবলা বললে ; খুব সম্ভব সেটাই। যাই হোক, আমি তো মোটরের মধ্যে বসে আছি। ঘণ্টা-দুই পরে নেমে টেনিদার খোঁজে বেরুব— এমন সময়, ওরে বাবা !

—কী—কী ?—আমি আর হাবুল সেন একসঙ্গে জানতে চাইলুম।

—কী আর ?—ভীমরুলের চাক। একেবারে বোঁ-বোঁ করে ছুটে আসছে।

আমি বললুম, হুঁ—আমার ঢিল খেয়ে।

ক্যাবলা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, উ তো ম্যয় সমঝ লিয়া। তোর মতো গর্দভ ছাড়া এমন ভাল কাজ আর কে করবে ? দৌড়ে আবার গিয়ে মোটরে উঠলুম। ঠায় বসে থাকো আর-এক ঘণ্টা ! তারপর দেখি, ড্রাইভারের সিটের পাশে কম্বল রয়েছে একটা। বুদ্ধি করে সেটা গায়ে জড়িয়ে নেমে এলুম— ভীমরুল যদি ফের তেড়ে

আসে, তাহলে কাজে লাগবে। অনেকক্ষণ এদিকে ওদিকে খুঁজে শেষে আবিষ্কার করলুম, শ্রীমান প্যালারাম বনমুরগির ডিম হাতাচ্ছেন। তারপর—

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, তারপর আর বলতে হবে না— সব জানি। তুই তো তবু একটা ডিম খেলি— আর আমার হাত থেকে পড়ে সবগুলো গেল। ইস— এমন খিদে পেয়েছে যে এখন তোকে ধরে আমার কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ক্যাবলা বললে, এই খবর্দার, কামড়াসনি। আমার জলাতঙ্ক হবে।

—জলাতঙ্ক হবে মানে ? আমি কি খ্যাপা কুকুর নাকি ?

হাবুল বললে, —কইব কেডা ?

আমি হাবুলকে চড় মাতে যাচ্ছিলুম, ক্যাবলা বাধা দিলে। বললে, বন্ধুগণ, এখন আত্মকলহের সময় নয়। মনে রেখো, আমাদের লিডার টেনিদা হাতির পিঠে চড়ে উধাও হয়েছে। তাকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—সে কি আর আছে ? হাতিতে তারে মাইর‍্যা ফ্যালাইছে।— বলেই হাবলা হঠাৎ কেঁদে ফেলল ; ওরে টেনিদা রে— তুমি মইর‍্যা গেলা নাকি রে ?

শুনেই আমারও বুকের ভেতর গুরগুর করে উঠল। আমিও আর কান্না চাপতে পারলুম না।

—টেনিদা, ও টেনিদা—তুমি কোথায় গেলে গো—

এমন যে শক্ত, বেপরোয়া ক্যাবলা— তারও নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে গোটাকয়েক আওয়াজ বেরুল। তারপর আরশোলার মতো খুব করুণ মুখ করে সেও ডুকরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বললে, আরে— আরে— এই তো তিনজন বসে আছে !

চমকে তাকিয়ে দেখি, কুট্টিমামা, শিকারি আর বাহাদুর।

আমরা আর থাকতে পারলুম না। তিনজনে একসঙ্গে হাহাকার করে উঠলুম : কুট্টিমামা গো,- টেনিদা আর নেই !

কুট্টিমামার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—সে কি ! কী হয়েছে তার ?

হাবুল তারস্বরে ডুকরে উঠে বলল, তারে বুনা হাতিতে নিয়া গেছে কুট্টিমামা— তারে নিয়া গিয়া অ্যাক্কেবারে মাইর‍্যা ফ্যালাইছে !

কুট্টিমামার হাত থেকে বন্দুকটা ধপাৎ করে মাটিতে পড়ে গেল।

১৭। হাতি থেকে কাটলেট

একটু সামলে-টামলে নিয়ে কুট্টিমামা বললেন, বুনো হাতিতে নিয়ে গেল। আমরা সবাই কোরাসে গলা তুলে বললুম, হুঁ।

তাই শুনে কুট্টিমামা মাথার চাঁদির ওপর টাকটাকে কিছুক্ষণ কুর-কুর করে চুলকোলেন। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন, মানে, তা কী করে হয় ? হাতিতে নেবে কেমন করে ?

হাবুল বললে, হ, নিয়া গেল। হাতি আসতাছে দেইখ্যা আমরা গাছে উঠছিলাম। টেনিদা না— ডাল ভাইঙা একটা হাতির পিঠে গিয়া পড়ল। আর হাতিটাও গাছের পাতা চাবাইতে চাবাইতে তারে কোনখানে য্যান নিয়া গেল।

—তারপর ?

ক্যাবলা বললে, আমরা তিনজনে তাকে খুঁজতে বেরুলুম। আমি একটা বন্দুকের আওয়াজ পেলুম। তারপর দেখি একটা বাঘ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। আমি একেবারে এক লাফে গিয়ে মোটরে !

শিকারি বললে, হুঁ, সেই বাঘটা— যেটাকে আমরা গুলি করেছিলুম। পায়েও চোট লেগেছিল।

কুট্টিমামা বললেন, তারপর ?

হাবুল বললে, মনের দুঃখে এক বৃক্ষতলে শয়ন কইর‍্যা আমি ঘুমাইয়া পড়লাম। আমার ভাবনা কী— কুষ্ঠীতে লেখা আছে ব্যাঘ্রে নি আমারে কক্ষনো ভক্ষণ করব না। উইঠ্যা দেখি প্যালা সারা গায়ে কাদা মাইখ্যা ভূত সাইজ্যা একটা মস্ত কোলা ব্যাঙ ধইর‍্যা খাইতাছে।

কুট্টিমামা বললেন, কী সর্বনাশ ! কোলা ব্যাঙ ধরে খাচ্ছে !

হাবুল সেনটা কী মিথ্যুক দেখেছ ! আমি ভয়ঙ্কর আপত্তি করে বললুম, না মামা—আমি কোলা ব্যাঙ ধরে খাইনি। ওই হাবলাই তো পাখির ডাক শুনে দৌড়ে পালাল। আমি একটা গর্তের ভেতর পড়েছিলুম— আর বাঘটা গিয়ে সেই গর্তেই একটা শজারুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

মামা বললেন, অ্যাঁ ! তবে কুলিরা যে গর্ত কেটেছে, বাঘটা তাতেই পড়েছে নাকি ? কিন্তু প্যালারাম— তুমি উঠে এলে কী করে ?

—স্রেফ ইচ্ছাশক্তির জোরে, কুট্টিমামা ! নইলে বাঘটা যেভাবে দাপাদাপি করছিল, তাতে ওর ল্যাজের চোট খেয়েই আমার প্রাণটা বেরিয়ে যেত— থাবার ঘা খাওয়ার দরকার হত না।

কিছুক্ষণ কুট্টিমামা আমার মুখের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আবার কুরকুরিয়ে টাকটাকে চুলকে নিয়ে বললেন, বাঘটা তা হলে সেই গর্তের মধ্যেই আছে বলছ ?

—নির্ঘাত !

—যাক, বাঘের জন্যে তবে ভাবনা নেই। কাল তুলব বাছাধনকে। কিন্তু টেনি—

বলতেই আবার হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল হাবুল : তারে হাতিতেই মাইর‍্যা ফেলছে কুট্টিমামা—এতক্ষণে হালুয়া বানাইয়া রাখছে !

শুনে আমিও ফোঁসফোঁস করে কাঁদতে লাগলুম, আর ক্যাবলা নাক-টাক কুঁচকে

কেমন একটা কুঁ—কুঁ আওয়াজ করতে লাগল।

শিকারি মামার কানে-কানে কী বললে। মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে। নইলে এখানে বুনো হাতি কেমন করে আসবে। তা ছাড়া হাতি তো বটেই। যদি ভয়-টয় পেয়ে—

শিকারি মাথা নেড়ে বললে, তা ঠিক।

তখন কুট্টিমামা আমাদের দিকে তাকালেন। ডেকে বললেন, শোনো, এখন আর কান্নাকাটি করে লাভ নেই। চলো সব গাড়িতে। তোমাদের লিডারকে খুঁজতে যেতে হবে।

হাবুল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, তারে কি আর পাওন যাইব ?

কুট্টিমামা বললেন, একটা জায়গা আগে দেখে আসি। সেখানে যদি হদিস না পাই, তাহলে বনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে হবে। চলো এখন গাড়িতে—কুইক !

গাড়িটা দূরে ছিল না। আমরা উঠে বসতে না বসতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিলে। মামা তাকে কী একটা জায়গায় যেতে বলে দিলেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বনের ভেতর তখন অল্প-অল্প করে সন্ধ্যা নামছে। হেডলাইটের আলো জ্বেলে গাড়ি ছুটল।

হাবুল ফিসফিস করে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, এই প্যালা, আমরা কোথায় যাইতাছি ক' দেখি ?

বিরক্ত হয়ে বললুম, কুট্টিমামাকে জিজ্ঞেস কর, আমাকে কেন ?

—না, খুব ক্ষুধা পাইছে কিনা। গাড়িতে টিফিন ক্যারিয়ার-ভর্তি খাবার তো উঠেছিল ! সেইগুলি গেল কোথায় ?

ঠিক আমার মনের কথা বলে দিয়েছে। এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলুম, এইবার টের পেলুম, পেটের ভেতর তিরিশটা ছুঁচো যেন একসঙ্গে হা-ডু-ডু খেলছে। টিফিন ক্যারিয়ারটা পেলে সত্যি খুব কাজ হত। ওতে লুচি, আলুর দম, ডিমসেদ্ধ এইসব ছিল।

ইস—কতদিন যে আমি আলুর দম খাইনি। আর লুচি যে কী রকম সে তো বলতে গেলেই ভুলেই গেছি। লুচি কী দিয়ে বানায়— সুজি না পোস্ত দিয়ে ? লুচি কি হাতখানেক করে লম্বা হয় ?

আর থাকতে না পেরে আমি ক্যাবলাকে একটা খোঁচা দিলুম।

ক্যাবলা মুখটাকে ঠিক চামচিকের মতো করে বসে ছিল। আমার খোঁচা খেয়ে খ্যাঁচখেঁচিয়ে উঠল।

—ক্যা হুয়া ? জ্বালাচ্ছিস কেন ?

আমি চুপি চুপি বললুম, আঃ চ্যাঁচাসনি। কুট্টিমামা শুনতে পাবে। বলছিলুম, বড্ড খিদে পেয়েছে। সেই যে টিফিন ক্যারিয়ারটা সঙ্গে এসেছিল, সেটা কোথায় বল দিকি ?

ক্যাবলা হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল।

—ছিঃ প্যালা, তোর লজ্জা হওয়া উচিত। টেনিদার এখনও দেখা নেই—কোথায় হাতির পিঠে চেপে সে চলে গেল, আর তুই এখন খেতে চাইছিস ?

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, না-না-না—এমনিতে জানতে চাইছিলুম।

কী করা যায়— চুপ করে বসে থাকতে হল। সত্যি কথা— লিডার টেনিদার জন্যে আমারও বুকের ভেতর তখন থেকে আঁকুর-পাঁকুর করছে। কিন্তু— খিদেটাও যে আর সইতে পারছি না। টেনিদা বেঁচে আছে কি না জানি না, কিন্তু আমিও যে আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকব, সে-কথা আমার মনে হচ্ছে না।

কী আর করি—চুপ করে বসে আছি। গাড়িটা বনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে। অন্ধকার দু'ধারে বেশ ঘন হয়ে এসেছে— নানা রকম পাখি ডাকছে। ঝিঁঝিরা ঝিঁ ঝিঁ করছে।

হঠাৎ হাবুল চেঁচিয়ে উঠল, বাঘ—বাঘ—

আবার বাঘ ! এ কী বাঘা কাণ্ডে পড়া গেল রে বাবা।

কুট্টিমামা বললেন, কোথায় বাঘ ?

আমি ততক্ষণে দেখেছি। বললুম, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে! মোটরের আলোয় দুটো লাল চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ওখানে।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, বাঘ নয়, ও খরগোশ।

—খরগোশ ! অতবড় চোখ ! অমন জ্বলে ?

—জানোয়ারদের চোখ অমনিই হয়। আলো পড়লে ওইভাবেই জ্বলে। দ্যাখো— দ্যাখো—

গাড়িটা তখন কাছে এসে পড়েছে। দেখি, সত্যিই তো একটা খরগোশ। একেবারে গাড়ির সামনে দিয়ে লাফিয়ে পাশের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল।

ক্যাবলা বললে, খরগোশের চোখই এই। বাঘের চোখ হলে—

—আগুনের মতো দপ-দপ করত। শিকারে স্পটিংয়ের সময় চোখ দেখেই জানোয়ার ঠাহর করা যায়।

—স্পটিং কাকে বলে ?

—একটা সার্চলাইটের মতো আলো। স্পটলাইট বলে তাকে। রাত্রে বনের মধ্যে সেইটে ফেলে শিকার খুঁজতে হয়। জানোয়ারের চোখে পড়লে থমকে দাঁড়িয়ে যায়— ধাঁধা লেগে যায় ওদের। তখন গুলি করে মারে।

কথাটা শুনে আমার ভালো লাগল না। এ অন্যায়। মারতে চাও তো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মারো। চোখে আলো ফেলে, ধাঁধিয়ে দিয়ে গুলি করে মারা কাপুরুষের লক্ষণ। আমি পটলডাঙার প্যালারাম— জীবনে আমি হয়তো কখনও শিকারি হতে পারব না, কিন্তু যদি হই, এমন অন্যায় আমি কিছুতে করব না।

ঘ্যাস—স্—

গাড়িটা থেমে গেল। আরে— এ কোথায় এসেছি।

বনের বাইরে কয়েকটা তাঁবু। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। একদিকে তিন-চারটে হাতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলাগাছ খাচ্ছে। আর তাঁবুর সামনে—

একটা টেবিলে জনতিনেক লোক বসে বসে তরিবত করে খাচ্ছে। তাদের

একজন—

আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা !!!

টেনিদা গম্ভীর গলায় বললে, কী, এসে গেছিস সব ? এখন বিরক্ত করিসনি, আমি কাটলেট খাচ্ছি।

আর টেবিল থেকে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে কুট্টিমামাকে বললেন, এই যে গজগোবিন্দবাবু, আসুন— আসুন। আপনার ভাগ্নে আমাদের হাতির পিঠে সোয়ার হয়ে এসে উপস্থিত— ভয়ে হাফ ডেড ! আমরা অনেকটা চাঙ্গা করে তুলেছি এতক্ষণে। আসুন—আসুন—চা খান—

আমরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লুম। আর তাই দেখে টেনিদা গোগ্রাসে কাটলেটটা মুখে পুরে দিলে।

সেই ভদ্রলোক বললেন, এসো—এসো। তোমরা আসবে আন্দাজ করেছিলুম, তোমাদের জন্যেও কাটলেট ভাজা হচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝেছ তো এতক্ষণে ? না, না— ওরা বুনো হাতি নয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের পোষা হাতি। মাসখানেক হল ওঁরা কী কাজে এখানে ক্যাম্প করেছেন। ওঁদেরই হাতি চরতে চরতে এদিকে এসেছিল, আর টেনিদা তারই একটার পিঠে চড়াও হয়ে—

কী কাণ্ড ! কী কাণ্ড !

কাটলেট ভাজা হচ্ছে হোক— কিন্তু আমার যে প্রাণ যায়। ক্যাবলাকে বললুম, ক্যাবলা, সেই টিফিন ক্যারিয়ারটা—

ক্যাবলা বললে, দি আইডিয়া ! তারপর এক হ্যাঁচকা টানে কোত্থেকে সেটাকে টেনে নামাল।

তারপর ?

তারও পর ? উহুঁ, আর নয়। অনেকখানি গল্প আমি তোমাদের শুনিয়েছি, এর পরেরটুকু যদি নিজেরা ভেবে নিতে না পারো, তাহলে মিথ্যেই তোমরা চারমূর্তির অভিযান পড়েছ।

কম্বল নিরুদ্দেশ

১

অনেক ভেবে-চিন্তে চারজন শেষ পর্যন্ত বদ্রীবাবুর 'দি গ্রেট ইন্ডিয়ান প্রিন্টিং হাউস'-এ ঢুকে পড়লুম। নাম যতই জাঁদরেল হোক, প্রেসের ভেতরটায় কেমন আবছা অন্ধকার। এই দিনের বেলাতেও রামছাগলের ঘোলাটে চোখের মতন কয়েকটা হলদে হলদে ইলেকট্রিকের বাল্ব জ্বলছিল এদিকে-ওদিকে ; পুরনো কতকগুলো টাইপ-কেসের সামনে ঝুঁকে পড়ে ঘষা কাচের মতো চশমা পরা একজন বুড়ো কম্পোজিটার চিমটে দিয়ে অক্ষর খুঁটে খুঁটে 'গ্যালি' সাজাচ্ছিল ; ওধারে একজন ঘটাং ঘটাং করে প্রেসে কী ছেপে যাচ্ছিল, উড়ে পড়ছিল নতুন ছাপা-হওয়া কাগজ—আর একজন তা গুছিয়ে রাখছিল। পুরনো নোনাধরা দেওয়াল, কুলুঙ্গিতে সিদ্ধিদাতা গণেশ রয়েছেন, তাঁর পায়ের কাছে বসে একজোড়া আরশোলা বোধহয় ছাপার কাজই তদারক করছিল, হাত কয়েক দূরে পেটমোটা একটা টিকটিকি জ্বলন্ত চোখে লক্ষ করছিল তাদের। ঘরময় কালির গন্ধ, কাগজের গন্ধ, নোনার গন্ধ, আর তারই ভেতরে টেবিল-চেয়ার পেতে, খাতা-কাগজপত্র, কালি-কলম, টেলিফোন এই সব নিয়ে বদ্রীবাবু একমনে মস্ত একটা অ্যালুমিনিয়ামের বাটি থেকে তেলমাখা মুড়ি আর কাঁচালঙ্কা খাচ্ছিলেন।

টেনিদা আর হাবুলের পাল্লায় পড়ে বদ্রীবাবুর প্রেসে ঢুকে পড়েছি, নইলে আমার এখানে আসবার এতটুকুও ইচ্ছে ছিল না। ক্যাবলারও না। আমরা দু'জনেই প্রতিবাদ করে বলেছিলুম, 'কী দরকার ? যাদের বাড়ির ছেলে, তাদের যখন কোনও গরজ নেই, আমরা কেন খামকা নাক গলাতে যাই ?'

কিন্তু টেনিদার নাকটা একটু বেয়াড়া রকমের লম্বা আর লম্বা নাকের মুস্কিল এই যে, পরের ব্যাপারে না ঢোকালে সেটা সুড়সুড় করতে থাকে। টেনিদা খেঁকিয়ে উঠে বললে, 'বা-রে, তাই বলে পাড়ার একটা জলজ্যান্ত ছেলে দুম করে নিরুদ্দেশ হয়ে যাবে ?'

'হয়ে যাক না'—ক্যাবলা খুশি হয়ে বললে, 'অমন ছেলে কিছুদিন নিরুদ্দেশ থাকলেই পাড়ার লোকের হাড় জুড়োয়। কুকুরের ল্যাজে ফুলঝুরি বেঁধে দেবে, গোরুর পিঠে আছড়ে পটকা ফাটাবে, বেড়ালছানাকে চৌবাচ্চার জলে চুবোবে, গরিব ফিরিওলার জিনিস হাতসাফাই করবে, ছোট-ছোট বাচ্চাগুলোকে অকারণে মারধোর করবে, ঢিল ছুঁড়ে লোকের জানলার কাচ ভাঙবে—ও আপদ একেবারেই বিদায় হয়ে যাক না। হনোলুলু কিংবা হন্ডুরাস যেখানে খুশি যাক, মোদ্দা পাড়ায় আর না ফিরলেই হল।'

শুনে, নাকটাকে ঠিক বাদামবরফির মতো করে, টেনিদা কিছুক্ষণ চেয়ে রইল ক্যাবলার দিকে। তারপর বললে, 'ইস্-স্, কী পাষাণ প্রাণ নিয়ে জন্মেছিস ক্যাবলা। তুই শুধু পরীক্ষাতেই স্কলারশিপ পাস, কিন্তু মায়া-দয়া কিছু আছে বলে তো মনে হয় না। না হয় কম্বল এক-আধটু দুষ্টুমি করেই, তাই বলে একটা নিরীহ শিশুকে—'

'নিরীহ শিশু।'—ক্যাবলা বললে, 'দু'বার ক্লাস সেভেনে ডিগবাজি খেল, তলা থেকে ও শক্ত হয়ে আসছে—এখনও শিশু। তা হলে দেড় হাত দাড়ি গজানো পর্যন্তও কম্বল শিশুই থাকবে, ওর বয়েস আর বাড়বে না। আর নিরীহ! অমন বিচ্ছু, অমন বিটলে, অমন মারাত্মক—'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'মারাত্মক বলে মারাত্মক। কম্বলকে সাধুভাষায় সর্বার্থসাধক, কিঞ্জল্ক, ডিণ্ডিম, এমন কি সুপসুপা সমাস বললেও অন্যায় হয় না। এই তো সেদিন পয়লা বোশেখে আমায় বললে, প্যালাদা, তোমার একটা নববর্ষের পেন্নাম করব। আমি অবাক হয়ে ভাবছি, ব্যাপারটা কী, কম্বলের অত ভক্তি কেন—আর ভাবতে-ভাবতেই পেন্নামের নাম করে আমার দু'পায়ে বিচ্ছুটির পাতা ঘষে দিয়ে দৌড়ে পালিয়েছে। তারপর একঘণ্টা ধরে আমি দাপিয়ে মরি। ও রকম বহুব্রীহি-মার্কা ছেলের চিরকালের মতো নিরুদ্দেশ হওয়াই ভালো—আমি ক্যাবলার কথায় ডিটো দিচ্ছি।'

টেনিদা রেগে বললে, 'শাটাপ! ফের কুরুবকের মতো বকবক করবি, তা হলে এক-এক চড়ে কানগুলো কানপুরে পাঠিয়ে দেব।'

হাবুল অনেকক্ষণ ধরে একমনে কী যেন খাচ্ছিল, মুখটা বন্ধ ছিল তার। এতক্ষণে সেটাকে সাবাড় করে ঘাড় নেড়ে বললে, 'কানগুলান কর্ণাটেও পাঠাইতে পারো।'

'তাও পারি। নাক নাসিকে পাঠাতে পারি, দাঁত দাঁতনে পাঠাতে পারি, আরও অনেক কিছুই পারি। আপাতত কেবল ওয়ার্নিং দিয়ে রাখলাম। ক্যাবলা—প্যালা—নো তর্ক, ফলো ইয়োর লিডার—মার্চ।'

ক্যাবলা গোঁজ হয়ে রইল, আমি গোঁ গোঁ করতে লাগলুম। হাবুল আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললে, 'আরে, না হয় দিছেই তর পায়ে বিছুটা ঘইষ্যা—তাতে অত রাগ করস ক্যান? ক্ষমা কইরা দে। ক্ষমাই পরম ধর্ম—জানস না?' শুনে আমি হাবুলের কানে কুটুস করে একটা চিমটি দিলুম—হাবুল চ্যাঁ করে উঠল।

আমি বললুম, 'রাগ করিসনি হাবলা, ক্ষমাই পরম ধর্ম—জানিস না?'

টেনিদা বললে, 'কোয়ায়েট। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-ফাঁটির কোনও মানে হয় না। এখন অতি কঠিন কর্তব্য আমাদের সামনে। আমরা বদ্রীবাবুর ওখানে যাব। গিয়ে তাঁকে জানাব যে-কম্বলকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমরা তাঁকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

ক্যাবলা কান চুলকে বললে, 'কিন্তু তিনি তো আমাদের সাহায্য চাননি।'

'আমরা উপযাচক হয়ে পরোপকার করব।'

আমি বললুম, 'কিন্তু বদ্রীবাবু যদি আমাদের তাড়া করেন?'

ভুরু কুঁচকে টেনিদা বললে, 'তাড়া করবেন কেন?'

'বদ্রীবাবু সকলকে তাড়া করেন। দরজায় ভিখিরি গেলে তেড়ে আসেন, রিকশাওলাকে কম পয়সা দিয়ে ঝগড়া বাধান—তারপর তাকে তাড়া করেন, ঝি-চাকরকে দু' বেলা তাড়া করেন, বাড়ির কার্নিসে কাক বসলে তাকে—'

টেনিদা এবার ঠুকুস করে আমার চাঁদিতে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে।

'ওফ্—এই কুরুটার মুখ তো কিছুতেই বন্ধ হয় না। আমরা ভিখিরি, না রিকশাওলা, না দাঁড়কাক, না ওঁর ঝি-চাকর? যাচ্ছি উবগার করতে, ভদ্রলোক আমাদের তেড়ে আসবেন? কী যে বলিস তার ঠিক নেই। পাগল, না পেট খারাপ?'

'প্যাটই খারাপ'—হাবুল মাথা নেড়ে বললে, 'চিরকালটাই দেখতাছি প্যাট নিয়েই প্যালার যত ন্যাটা।'

টেনিদা বললে, 'চুলায় যাক ওর পেট। এখানে বসে আর গুলতানি করে দরকার নেই—নাউ টু অ্যাকশন। চলো এবার বদ্রীবাবুর কাছেই যাওয়া যাক।'

আমরা কেন এওসছি, বদ্রীবাবু সে-কথা শুনলেন। প্যাঁচার মতো গম্ভীর মুখে মুড়ির বাটিটা একটু-একটু করে সাবাড় করলেন, শেষে আধখানা কাঁচা লঙ্কা কচমচ করে চিবিয়ে খেলেন। তারপর কোঁচায় মুখ মুছে বললেন, 'হুঁ।'

টেনিদা বললে, 'কম্বলকে খোঁজবার জন্যে আপনি কী করছেন?'

বদ্রীবাবু খ্যারখেরে মোটা গলায় বললেন, 'আমি আবার কী করব? কী-ইবা করার আছে আমার?

হাবুল বললে, 'হাজার হোক, পোলাডা তো আপনার ভাইপো'

'নিশ্চয়।'—বদ্রীবাবু মাথা নাড়লেন: 'আমার মা-বাপ মরা একমাত্র ভাইপো, আমারও কোনও ছেলেপুলে নেই। আমার প্রেস, পয়সা-কড়ি—সবই সে পাবে।'

'তবু আপনি তাকে খুঁজবেন না?'—টেনিদা জানতে চাইল।

'কী করে খুঁজব?'—বদ্রীবাবু হাই তুললেন।

'কেন, কাগজে বিজ্ঞাপন তো দিতে পারেন।'

'কী লিখব? বাবা কম্বল, ফিরিয়া আইস? তোমার খুড়িমা তোমার জন্য মৃত্যু-শয্যায়? ঠিকানা দাও—টাকা পাঠাইব? সে অত্যন্ত ঘোড়েল ছেলে। ঠিকানা দেবে, আমি টাকা পাঠাব—টাকাও সে নেবে, কিন্তু বাড়ি ফিরবে না।'

'কেন ফিরবে না?'—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

'তার কারণ'—বদ্রীবাবু একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে দাঁতের গোড়া খুঁটতে খুঁটতে বললেন, 'দু'-দু'বার ক্লাস সেভেনে ফেল করায় আমি তার জন্যে যে-মাস্টার এনেছি, সে নামকরা কুস্তিগির। তার হাতের একটা রদ্দা খেলে হাতি পর্যন্ত অজ্ঞান হয়ে যায়। কম্বল স্বেচ্ছায় আসবে না। মাস্টার নিরুদ্দেশ না হলে তার উদ্দেশ মিলবে বলে আমার মনে হয় না।'

'আপনে থানায় খবর দিলেন না ক্যান ?—হাবুল বললে, 'তারা ঠিক—'

'থানা ?'—বদ্রীবাবু একটা বুক-ভাঙা নিঃশ্বাস ফেললেন : 'মাস দুই আগে আমার প্রেসের কিছু টাইপ চুরি হয়ে গিয়েছিল, আমি থানায় গিয়েছিলুম। সঙ্গে ছিল কম্বল। দারোগা এজাহার নিচ্ছিলেন, টেবিলের তলায় তাঁর পেয়ারের কুকুরটা ঘুমুচ্ছিল। কম্বল নিচু হয়ে কী করছিল কে জানে, কিন্তু হঠাৎ একটা বিটকেল কাণ্ড ঘটে গেল। বিকট সুরে ঘ্যাও-ঘ্যাও আওয়াজ ছেড়ে কুকুরটা একলাফে টেবিলে উঠে পড়ল, আর এক লাফে চড়ল একটা আলমারির মাথায়, সেখান থেকে একরাশ ধুলোভরা ফাইল নিয়ে নীচে আছড়ে পড়ে গেল। একজন পুলিশ তাকে ধরতে যাচ্ছিল—ঘোয়ঙ বলে তাকে কামড়ে দিয়ে ঘ্যাঁকে ঘ্যাঁকা বলে চেঁচাতে-চেঁচাতে দরজা দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেল কুকুরটা। সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। এজাহার চুলোয় গেল, থানায় হুলুস্থূল কাণ্ড—পাকড়ো পাকড়ো বলে দারোগা কুকুরের পেছনে ছুটলেন। কী হয়েছিল জানো ?'

বদ্রীবাবু একটু থেমে আমাদের মুখের দিকে তাকালেন। ক্যাবলা বললে, 'কী হয়েছিল ?'

'কম্বল পকেটে হোমিওপ্যাথিক শিশিতে ভর্তি করে লাল পিঁপড়ে নিয়ে গিয়েছিল আর সেগুলো ঢেলে দিয়েছিল কুকুরটাকে কানে। দারোগা কম্বলকে ঠাস ঠাস করে কয়েকটা চড় দিয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে তাকে কিংবা আমাকে থানার কাছাকাছি দেখলেও পুরোপুরি সাতদিন হাজতে পুরে রেখে দেবেন।'

টেনিদা বললে, 'আপনার কী দোষ ? আপনি তো আর কুকুরের কানে পিঁপড়ে দেননি।'

'কিন্তু দারোগার ধারণা, মন্ত্রটা আমিই দিয়েছি কম্বলের কানে। অভিভাবকের কাছ থেকেই তো ছেলেমেয়ে শিক্ষা পায়।'

'হুঁ, তা হলে আপনার থানার যাবার পথ বন্ধ'—টেনিদা মাথা নাড়ল, 'আচ্ছা, আমরা যদি আপনার হয়ে—'

বাধা দিয়ে বদ্রীবাবু বললেন, 'কিছু করতে হবে না। আমি জানি, কম্বলকে আর পাওয়া যাবে না। সে যেখানে গেছে, সেখান থেকে আর ফিরে আসবে না।'

'কী সর্বনাশ।'—আমি আঁতকে বললুম, 'মারা গেছে নাকি ?'

'মারা যাওয়ার পাত্র সে নয়।'—বদ্রীবাবু কান থেকে একটা বিড়ি নামিয়ে ফস করে সেটা ধরালেন : 'সে গেছে দূরে—বহু দূরে।'

হাবুল বললে, 'কই গেছে ? দিল্লি ?'

'দিল্লি।'—বদ্রীবাবু বললেন, 'ফুঃ।'

'তবে কোথায় ?'—টেনিদা বললে, 'বিলেতে ? আফ্রিকায় ?'

এক মুখ বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে বদ্রীবাবু বললেন, 'না, আরও দূরে। ছেলেবেলা থেকেই তার সেখানে যাওয়ার ন্যাক ছিল। সে গেছে চাঁদে।'

'কী বললেন ?'—চারজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম আমরা।

'বললুম—কম্বল চাঁদে গেছে'—এই বলে বদ্রীবাবু আমাদের ভ্যাবাচ্যাকা মুখের ওপর একরাশ বিড়ির ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলেন।

২

আমরা চারজন বদ্রীবাবুর কথা শুনে পরোটার মত মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলুম, আর টেনিদার উঁচু নাকটা ঠিক একটা ডিম-ভাজার মতো হয়ে গেল। বদ্রীবাবু আমাদের ঠাট্টা করছেন কি না বুঝতে পারলুম না। কিন্তু অমন হাঁড়ির মতো যাঁর মুখ আর বিতিকিচ্ছিরি তিরিক্ষি যাঁর মেজাজ—এই ঝুপসি প্রেসটার ভেতরে একটা হুতোম প্যাঁচার মতো বসে বসে আর কচর মচর করে করে মুড়ি চিবুতে চিবুতে তিনি আমাদের ঠাট্টা করবেন, এটা কিছুতেই বিশ্বাস হল না।

ঠিক সেই সময় প্রেসের দিকে, বদ্রীবাবুর রান্নাঘর থেকে কড়া রসুন আর লঙ্কার ঝাঁঝের সঙ্গে উৎকট গন্ধ ভেসে এল একটা, খুব সম্ভব শুঁটকী মাছ। সে-গন্ধ এমনি জাঁদরেল যে আমরা চার জন্যেই এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠলুম—আমাদের ঘোর কেটে গেল।

টেনিদা একবার মাথা চুলকে বললেন, 'আপনি ঠিক বলছেন স্যার, কম্বল চাঁদেই—'

বদ্রীবাবু বললেন, 'আই অ্যাম শিয়োর।'

ক্যাবলা তার চশমার ভেতর দিয়ে প্যাট প্যাট করে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। গত বছর চশমা নেবার পর থেকেই ওকে খুব ভারিক্কি গোছের দেখায়। মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বললে, 'আপনি এত শিয়োর হলেন কী করে, জানতে পারি কি ? যে-চাঁদে রাশিয়ানরা এখনও যেতে পারল না, আমেরিকানরাও আজ পর্যন্ত—'

'ওরা না পারলেও কম্বল পারে'—সংক্ষেপে জবাব দিলেন বদ্রীবাবু।

রান্নাঘর থেকে শুঁটকী মাছের সেই বিকট গন্ধটা আসছিল, তাতে নাক-টাক কুঁচকে বেজায় রকম একটা হাঁচতে যাচ্ছিল হাবুল। কী কায়দায় যে ও হাঁচিটাকে সামলে নিলে আমি জানি না। বিচ্ছিরি মুখ করে কেমন একটা ভুতুড়ে গলায় জিজ্ঞেস করলে : 'ডানা আছে বুঝি কম্বলের ? উইড়্যা যাইতে পারে ?'

'আমি ঠিক বলতে পারব না।' বদ্রীবাবু ভাবুকের মতো ঘাড় নাড়তে লাগলেন : 'তবে ও যা ছেলে, ওর এত দিনে যে ডানা গজায়নি এ-কথাও আমি বিশ্বাস করি

না। খুব সম্ভব জামার তলায় ওর ডানা লুকনো থাকত—আমি দেখতে পাইনি।'

'তা হলে আপনি বলছেন', টেনিদা খাবি খেয়ে বললে, 'সেই ডানা মেলে কম্বল পরীদের মতো উড়ে গেছে ?'

'এগজ্যাকটলি।'

ক্যাবলা বিড়বিড়িয়ে বললে, 'গাঁজা। ক্লিন গাঁজা।'

'তুমি ওখানে হুড়মুড় করে কী বলছ হে ছোকরা ?' বদ্রীবাবুর চোখ চোখা হয়ে উঠল, বেশ কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন : 'কী বকছ—অ্যাঁ ?'

'কিছু না স্যার—কিচ্ছু না।' হাবুল সেন চটপট সামলে নিলে : 'কইতাছিল—আহা, কী মজা।'

'মজা বই কি, দারুণ মজা', বদ্রীবাবু প্যাঁচার মতো প্যাঁচালো মুখে এবার এক টুকরো হাসি দেখা দিল : 'জানো, ছেলেবেলা থেকেই ওর চাঁদের দিকে ঝোঁক। পাঁচ বছর বয়সে আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ দেখে 'চাঁদ খাব, চাঁদ খাব' বলে পেল্লায় চিৎকার জুড়ল—রাত দুটো পর্যন্ত পাড়ার লোকে ঘুমুতে পারে না। শেষে পুরো একখানা পাটালি খাইয়ে ওকে থামাতে হয়। বারো বছরের সময় চাঁদ ধরবার জন্যে একটা নিমগাছে উঠে বাদুড়ের ঠোকর খেয়ে পানা পুকুরের ভেতরে পড়ে গিয়েছিল—ভাগ্যিস বেশি জল ছিল না, তাই রক্ষে। তারপর বড় হয়ে চাঁদা আদায় করতে ওর কী উৎসাহ ! সরস্বতী পুজো হোক, ঘেঁটু পুজো হোক আর ঘণ্টাকর্ণ পুজোই হোক—চাঁদার নাম শুনলেই স্রেফ নাওয়া-খাওয়া ভুলে যায়। সেই জন্যেই বলছিলুম, চাঁদ সম্পর্কে ওর বরাবরই একটা ন্যাক আছে।'

'চাঁদার ব্যাপারে ন্যাক অনেকেরই থাকে, সেটা কিছু নতুন কথা নয়'—টেনিদা একবার গলাখাঁকারি দিলে : 'কিন্তু আমরা যদি কম্বলকে খুঁজে বের করতে পারি, আপনার কোনও আপত্তি আছে বদ্রীবাবু ?'

'খুঁজে বের করতে পারলে আপত্তি নেই, না পারলেও আপত্তি নেই।' বদ্রীবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, 'কিন্তু পয়সা-কড়ি কিছু দিতে পারব না। তোমরা যে গোয়েন্দা-গিরির ফী চেয়ে বসবে সেটি হচ্ছে না। সেইটে বুঝে তাকে চাঁদ থেকেই ধরে আনো, কিংবা চাঁদোয়ার ওপর থেকেই টেনে নামাও।'

'আজ্ঞে কিছুই দিতে হবে না', টেনিদা আরও গম্ভীর হয়ে বললে, 'একটি পয়সাও খরচ করতে হবে না আপনাকে। শুধু একটু সাহায্য করতে হবে অন্য ভাবে।'

'পয়সা খরচ না হলে আমি সব রকম সাহায্যেই রাজি আছি তোমাদের। এবার বেশ উৎসাহিত দেখা গেল বদ্রীবাবুকে : 'বলো, কী করতে হবে ?'

টেনিদা একবার ক্যাবলার দিকে তাকাল। বললে, 'ক্যাবলা !'

'ইয়েস লিডার।'

'আমরা বদ্রীবাবুর কাছ থেকে কী সাহায্য পেতে পারি ?'

ক্যাবলা বললে, 'উনি আমাদের কিছু দরকারি ইনফর্মেশন দিতে পারেন।'

'জেনে নাও।' টেনিদা এর মধ্যেই বদ্রীবাবুর সামনে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়েছিল। এবারে গম্ভীর হয়ে পা নাচাতে লাগল।

ক্যাবলা তার চশমাপরা ভারিক্কি মুখে এমন ভাবে চারদিকে তাকাল যে ঠিক মনে হল, যেন ইনসপেক্টর স্কুল দেখতে এসেছেন। তারপর মোটা গলায় বললে, 'আচ্ছা বদ্রীবাবু !'

'হুঁ।'

'নিরুদ্দেশ হওয়ার আগে আপনি কোনও রকম ভাবান্তর লক্ষ করেছিলেন কম্বলের ?'

ক্যাবলার সেই দারুণ সিরিয়াস ভঙ্গি আর মোটা গলা দেখে আমার তাজ্জব লেগে গেল। হ্যাঁ, পুলিশে ঠিক এমনি ভাবেই জেরা-টেরা করে বটে। এমন কি, বদ্রীবাবুও যেন ঘাবড়ে গেলেন খানিকটা।

'ইয়ে—ভাবান্তর—মানে হ্যাঁ, একটু ভাবান্তর হয়েছিল বই কি। অমন একখানা জাঁদরেল মাস্টার দেখলে কেই বা খুশি হয় বলো। তার একটা ঘুষিতেই কম্বল তেঁতুলের অম্বল হয়ে যেত।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'তা হলে ঘুষি কম্বল খায়নি ?'

'খেপেছ তুমি।' বদ্রীবাবু মুখ বাঁকালেন : 'খেলে কি আর চাঁদে যেত ? স্বর্গে পৌঁছুত তার আগে। আসলে মাস্টার প্রথম দিন এসে খুব শাসিয়ে গিয়েছিল। বলেছি, কাল এসে যদি দেখি যে পড়া হয়নি, তা হলে পিটিয়ে তোকে ছাতু করে দেব।'

হাবুল বললে, 'অ—বুঝেছি। পলাইয়া আত্মরক্ষা কোরছে।'

'তা, ওভাবেও বলতে পারো কথাটা। পালিয়েছে মাস্টারের ভয়েই, তাতে সন্দেহ নেই।' বদ্রীবাবু হাবুলের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হলেন : 'এবং পালিয়ে সে চাঁদে গেছে।'

টেনিদা দারুণ বিরক্ত হয়ে বললে, 'দেখুন বদ্রীবাবু, সব জিনিসের একটা লিমিট আছে। চাঁদে গেলেই হল—ইয়ার্কি নাকি ? আর এত লোক থাকতে কম্বল ? সব জিনিস পাটালি খাওয়া নয়, তা মনে রাখবেন।'

বদ্রীবাবু বললেন, 'আমি প্রমাণ ছাড়া কথা বলি না।'

'বটে'—আমার ভারি উৎসাহ হল : 'কী প্রমাণ পেয়েছেন ? টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদের ভেতরে কম্বলকে লাফাতে দেখেছেন নাকি ?'

'টেলিস্কোপ আমার নেই।' বদ্রীবাবু হাই তুলে বললেন, 'কিন্তু যা আছে তা এই প্রমাণই যথেষ্ট—বলে বদ্রীবাবু এক-টুকরো কাগজ বাড়িয়ে দিলেন আমাদের সামনে।

একসারসাইজ বুকের পাতা ছিঁড়ে নিয়ে তার ওপর শ্রীমান কম্বল তাঁর দেবাক্ষর সাজিয়েছেন। প্রথমে মনে হল, কতগুলো ছাতারে পাখি এঁকেছে বোধহয়। তারপরে ক্রমে ক্রমে পাঠোদ্ধার করে যা দাঁড়াল, তা এই রকম :

'আমি নিরুদ্দেশ। দূরে—বহু দূরে চলিলাম। লোটা কম্বলও লইলাম না। আর ফিরিব না। ইতি ˝ কম্বলচন্দ্র।'

এই চিঠির নীচে আবার কতকগুলো সাংকেতিক লেখা :

'চাঁদ—চাঁদনি—চক্রধর। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর। নিরাকার মোষের দল। ছল ছল খালের জল। ত্রিভুবন থর-থর। চাঁদে চড়—চাঁদে চড়।'

সেগুলো পড়ে আমরা তো থ।

বদ্রীবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'কেমন, বিশ্বাস হল তো ? চাঁদে চড়—চাঁদে চড়, নির্ঘাত চড়ে বসেছে। এমন কি, ইতি লিখে চন্দ্রবিন্দু দিয়েছে নামের আগে, দেখতে পাচ্ছ না ? তার মানে কী ? মানে—স্বর্গীয় হয়নি, চন্দ্রলোকে—'

ক্যাবলা বললে, 'হুঁ, নিশ্চয় চন্দ্রলোকে। তা আমরা এই লেখাটার একটা কপি পেতে পারি ?'

'নিশ্চয়-নিশ্চয়। তাতে আর আপত্তি কী।'

ক্যাবলার হাতের লেখা ভালো, সে-ই ওটা টুকে নিলে। তারপর উঠে দাঁড়াল টেনিদা।

'তা হলে আসি আমরা। কিছু ভাববেন না বদ্রীবাবু। শিগগিরই কম্বলকে আপনার হাতে এনে দেব।'

'এনে দিতেও পারো, না দিলেও ক্ষতি নেই'—বদ্রীবাবু হাই তুললেন : 'সত্যি বলতে কী, ওটা এমনি অখাদ্য ছেলে যে আমার ওর ওপরে অরুচি ধরে গেছে। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করব। তোমরা কম্বলকে খুঁজে বের করতে চাও কেন ? সে কি তোমাদের কারও কিছু নিয়ে সটকান দিয়েছে ?'

টেনিদা বললে, 'আজ্ঞে না, কিছুই নেয়নি। আর নেবার ইচ্ছে থাকলেও নিতে পারত না—আমরা অত কাঁচা ছেলে নই। কম্বলকে আমরা খুঁজতে বেরিয়েছি নিতান্তই নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্যে।'

'পরোপকারের জন্যে! এ-যুগেও ও-সব কেউ করে নাকি ?' বদ্রীবাবু খানিকক্ষণ হাঁ-করা কাকের মতো চেয়ে রইলেন আমাদের দিকে : 'তোমরা তো দেখছি সাংঘাতিক ছেলে। তা ভবিষ্যতে গুড ক্যারাক্টারের সার্টিফিকেট দরকার থাকলে এসো আমার কাছে, আমি খুব ভালো করে লিখে দেব।'

'আজ্ঞে, আসব বই কি'—ক্যাবলা খুব বিনীতভাবে এ-কথা বলবার পর আমরা বদ্রীবাবুর প্রেস থেকে বেরিয়ে এলুম। রাস্তায় নেমে কেলব কয়েক পা হেঁটেছি, এমন সময়—

'বোঁ-ও-ও'

টেনিদার ঠিক কান ঘেঁষে কামানের গোলার মতো একটা পচা আম ছুটে বেরিয়ে গেল—ফাটল গিয়ে সামনে ঘোষেদের দেওয়ালে। খানিকটা দুর্গন্ধি কালচে রস পড়তে লাগল দেওয়াল বেয়ে। ওইটে টেনিদার মাথায় ফাটলে আর দেখতে হত না—নির্ঘাত নাইয়ে ছাড়ত।

তক্ষুনি আমরা বুঝতে পারলুম, কম্বলের নিরুদ্দেশ হওয়ার পেছন আছে কোনও গভীর চক্রান্তজাল, আর এরই মধ্যে আমাদের ওপর শত্রুপক্ষের আক্রমণ শুরু হয়েছে।

৩

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লুম। তারপর টেনিদা মোটা গলায় বললে, 'হুঁ, উড়ুম্বর।'

'উড়ুম্বর ?'—আমি অবাক হয়ে বললুম, 'তার মানে কী ?'

'মানে উড়ন্ত আক্রমণ—অম্বর হইতে।' টেনিদা আরও গম্ভীর হয়ে বললে।

'ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হতেই পারে না। আর অম্বর হইতে উড়ন্ত আক্রমণ—এ কিছুতেই উড়ুম্বরের ব্যাসবাক্য নয়। তাছাড়া উড়ুম্বর মানে—'

'শাটাপ—তক্কো করবি না আমার সঙ্গে।' টেনিদা দুমদাম করে পা ঠুকল : 'আমি যা বলব তাই কারেকট্, তাই গ্রামার। আমি যদি ক্যাবলা মিত্তির সমাস করে বলি, মিত্তির হইয়াছে যে ক্যাবলা—সুপসুপা সমাস, তা হলে কে প্রতিবাদ করে তাকে একবার আমি দেখতে চাই।'

বেগতিক বুঝে ক্যাবলা চশমাসুদ্ধ নাকটাকে আকাশের দিকে তুলে চিল-ফিল কী সব দেখতে লাগল, কোনও জবাব দিলে না। হাবুল সেন বললে, 'না, তারে দ্যাখতে পাইবা না। গাঁট্টা খাওনের লাইগা কারই বা চাঁদি সুড় সুড় কোরতেছে ? কী কস প্যালা, সৈত্য কই নাই ?'

আমি হাবুলের মতোই ঢাকাই ভাষায় জবাব দিলুম, 'হঃ, সৈত্যই কইছস।'

টেনিদা বললে, 'না, এখন বাজে কথা নয়। গোড়াতেই দেখছি ব্যাপার বেশ পুঁদিচ্চেরি—মানে, দস্তুরমতো ঘোরালো। অর্থাৎ কম্বল মাস্টারের থাপ্পড়ের ভয়েই পালাক আর চাঁদে চড়বার চেষ্টাই করুক, সে নিশ্চয় কোনও গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছে। তা না হলে একটা পচা আম অমন ভাবে আমার কান তাক করে ছুটে আসত না। বুঝেছিস, ওটা হল ওয়ার্নিং। যেন বলতে চাইছে, টেক কেয়ার, কম্বলের ব্যাপারে তোমরা নাক গলাতে চেয়ো না।'

আমি বললুম, 'তা হলে আমটা ছুঁড়ল কে ?'

টেনিদা একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল, যাকে বাংলায় বলে 'হাই ক্লাস।' তারপরে নাকটাকে কী রকম একটা ফুলকপির সিঙাড়ার মতো চোখা করে বললে, 'তা যদি এখুনি জানতে পারতি রে প্যালা, তা হলে তো রহস্যকাহিনীর প্রথম পাতাতেই সব রহস্য ভেদ হয়ে যেত। যেদিন কম্বলকে পাকড়াতে পারব, সেদিন আম কে ছুঁড়েছে তা-ও বুঝতে বাকি থাকবে না।'

বললুম, 'আচ্ছা, ছাতে ওই যে কাকটা বসে রয়েছে, ওর মুখ থেকেও তো হঠাৎ আমটা—'

ক্যাবলা বললে, 'বাজে বকিসনি। কাকে এক-আধটা আমের আঁটি ঠোঁটে করে হয়তো নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু অত বড় একটা আম তুলতে পারে কখন ? আর মনে কর, যদি ওই কাকটাকে ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়ন—মানে ওদের মধ্যেই—ধরা যায়, তা হলেও কি আমটা ও বুলেটের মতো ছুঁড়ে দিতে পারে ?'

হাবুল ঘাড় নেড়ে বললে 'যে-কাগটা আম ফেইক্যা মারছে, সে হইল গিয়া ডিসকাস-থোয়িং-এর চ্যাম্পিয়ান।'

টেনিদা হঠাৎ হাত বাড়িয়ে আমার আর হাবুলের মাথা কটাং করে একসঙ্গে ঠুকে দিলে। খুব খারাপ মুখ করে বললে, 'আরে গেল যা। এদিকে দিবা-দ্বিপ্রহরে কলকাতা শহরে আমার ওপর শত্রুর আক্রমণ—আর এ-দুটোতে সমানে কুরুবকের মতো বক বক করছে! শোন—একটাও আর বাজে কথা নয়। আমটা যে আমার দিকেই তাক করে ছোড়া হয়েছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কোন্ বাড়ি থেকে ছুঁড়েছে সেটা বোঝা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু খামকা আমার সঙ্গে লাগতে সাহস করবে, এমন বুকের পাটাও এ-পাড়ায় কারও নেই। টেনি শর্মাকে সকলেই চেনে। অতএব প্রতিপক্ষ অতিশয় প্রবল। সেইজন্যে মনে হচ্ছে, এখন পচা আম পড়েছে, একটু পরে ধপাৎ করে একটা পেঁপেও পড়তে পারে। আর বড় সাইজের তেমন-তেমন একখানা পেঁপে যদি হয়, তা হলে সে চিজ যারই মাথায় পড়ুক, আমরা কেউই অনাহত থাকব না।'

হাবুল সেন বললে, 'আর দশ কিলো ওজনের একখানা পচা কাঁঠাল পড়লে সকলেরেই ধরাশায়ী কইর‍্যা দিব। যদি আত্মরক্ষা কোরতে চাও, অবিলম্বে এইখান থিক্যা পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর।'

যুক্তিটা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, আমরা আর দাঁড়ালুম না। চটপট পা চালিয়ে একেবারে চাটুজ্যেদের রকে।

টেনিদা কি বলতে যাচ্ছিল, ক্যাবলা বললে, 'না—এখানে নয়। রাস্তার ধারে বসে কোনও সিরিয়াস আলোচনা করা যায় না। চলো আমাদের বৈঠকখানায়। বাবা টুরে বেরিয়েছেন, কাকা গেছেন দিল্লিতে, বেশ নিরিবিলিতে বসে সব প্ল্যান ঠিক করা যাবে।'

প্রস্তাবে আমরা একবাক্যে রাজি হয়ে গেলুম। সত্যিই তো, এখন আমাদের খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। শত্রুর চর সব সময় আমাদের গতিবিধির ওপর লক্ষ রাখছে কি না, কিছুই তো বলা যায় না। তা ছাড়া ক্যাবলার মা নানারকম খাবার করতে ভালোবাসেন, খাওয়াতেও ভালোবাসেন—তাঁকেও তো একটু খুশি করা দরকার।

তা খাওয়াটা মন্দ জমল না। ক্যাবলার মা কেক তৈরি করছিলেন, গরম গরম আমাদের কেটে এনে দিলেন। 'হট কেকে'র সঙ্গে চাটা খেয়ে আমাদের মেজাজ খুলে গেল।

টেনিদা আমাদের লিডার বটে, কিন্তু সে অ্যাকশনের সময়। মাথা ঠাণ্ডা করে বুদ্ধি জোগাবার বেলায় ওই খুদে চেহারার ক্যাবলা মিত্তির। তা না হলে কি আর টপাটপ পরীক্ষায় স্কলারশিপ পায়!

ক্যাবলা প্রথমেই পকেট থেকে কম্বলের লেখার সেই নকলটা বের করল।

—টেনিদা, এই লেখাটার মধ্যে একটা সূত্র আছে মনে হয়।

টেনিদা বললে, 'আহা, সূত্র তো বটেই। পরিষ্কার লিখছে, নিরুদ্দেশ হচ্ছি। মাস্টারের ঠ্যাঙানি খাওয়ার ভয়ে যেদিকে হোক লম্বা দিয়েছে। কিন্তু কম্বলের মতো একটা অখাদ্য জীব চাঁদে গেছে, এ হতেই পারে না। আমি কখনও বিশ্বাস করব না—তা বদ্রীবাবুই বলুক আর কেদারবাবুই বলুক।'

ক্যাবলা হিন্দী করে বললে, 'এ জী, জেরা ঠহরো না। আরে চাঁদ-উঁদ ছোড় দো, উতো বিলকুল দিল্লাগী মালুম হচ্ছে আমার, নীচের লেখাগুলোই একটু ভালো করে দেখা দরকার। ওদের কোনও মানে আছে।'

আমি বললুম, 'ওই চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর? তোর মাথা খারাপ হয়েছে ক্যাবলা। ওগুলো স্রেফ পাগলামি, ওদের কোনও মানেই হয় না।'

'বেশি ওস্তাদি করিসনি প্যালা, আমি কী বলছি তাই শোন। কম্বলকে আমরা সকলেই জানি। তার বিদ্যেবুদ্ধির দৌড়ও আমাদের অজানা নয়। সেদিনও সে আমায় জিজ্ঞেস করছিল, ইটালীর মুসোলিনী কি বেলাঘাটার মৃণালিনী মাসিমার বড় বোন? তার হাতের লেখা দেখলে উর্দু কিংবা কানাড়ী বলে মনে হতে থাকে। বন্ধুগণ একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, যাকে স্রেফ পাগলামি বলে মনে হচ্ছে, তা হল ছ-লাইনের একটি কবিতা। তাতে ছন্দ আছে, মিলও আছে। কম্বলের সাধ্যও নেই ওভাবে ছন্দ মিলিয়ে, মিল রেখে, ছটা লাইন দাঁড় করায়।'

হাবুল মাথা নাড়ল: 'হ, বুঝছি। আর কেউ লেইখ্যা দিছে।'

'ঠিক, আর কেউ দিয়েছে। কিন্তু খামকা লিখতে গেল কেন? নিশ্চয়ই ওর একটা মানে আছে।'—ক্যাবলা কাগজটা খুলে ধরে পড়তে লাগল: 'চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর। নিরাকার মোষের দল—আচ্ছা টেনিদা?'

টেনিদা বললে, 'ইয়েস।'

'আমার মাথায় প্ল্যান এসেছে একটা। একবার চাঁদনির বাজারে যাবে?'

'চাঁদনির বাজার!'—আমরা তিনজনে একসঙ্গে চমকে উঠলুম। টেনিদা নাক কুঁচকে, মুখটাকে শোনপাপড়ির মতো করে বললে, 'কী জ্বালা, চাঁদনির বাজারে যেতে যাব কেন?'

ক্যাবলা আরও বেশি গম্ভীর হল।

'ধরো, সেখানে যদি চক্রধরকে পেয়ে যাই? কিংবা কে জানে চন্দ্রকান্তের সঙ্গেই দেখা হয়ে যেতে পারে হয়তো।'

'নাকেশ্বর বইস্যা থাকতে পারে—কেডা কইব?'—হাবুল জুড়ে দিলে।

'সবই হতে পারে'—ক্যাবলা বললে, 'চলো না টেনিদা, ঘুরেই আসি একটু। যদি কোনও খোঁজ না-ই পাওয়া যায়, তাতেই বা ক্ষতি কী। ছুটির দিন, একটু বেড়িয়েই নয় আসা যাবে।'

'কিন্তু বেড়াবি কোথায়?'—টেনিদা বিরক্ত হল: 'চাঁদনি তো আর একটুখানি জায়গা নয়। সেখানে চক্রধর বলে কেউ যদি থাকেই, তাকে কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে?

'এক পাল খড়ের ভেতর থেকে গোয়েন্দারা ছুঁচ খুঁজে বের করতে পারে, আর

চাঁদনি থেকে একটা লোককে আমরা খুঁজে পাব না ? এই কি আমাদের লিডারের মতো কথা হল ? ছি-ছি, বহুৎ শরম কি বাত !'

আর বলতে হল না তড়াক করে টেনিদা লাফিয়ে উঠল : 'চল তা হলে, দেখাই যাক একবার।'

আমরা বেরিয়ে পড়লুম। চীনেবাদাম খেতে খেতে যখন চাঁদনির বাজারে যাওয়ার জন্যে ট্রাম চাপলুম, তখনও আমরা কেউ ভাবিনি যে সত্যি-সত্যিই আমরা এবারে একটা রহস্যের খাসমহলের সামনে গিয়ে দাঁড়াব। আমাদের সামনে এমন দুরন্ত অভিযান ঘনিয়ে আসবে।

চাঁদনির বাজারে ঢুকে টেনিদা কেবল এক ভদ্রলোককে বোকার মতো জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিল, 'মশাই, এখানে চক্রধর বলে কেউ'—হঠাৎ থাবা মেরে তাকে থামিয়ে দিলে। বললে 'টেনিদা—টেনিদা—ওই যে। লুক দেয়ার !'

একটি ছোট সাইনবোর্ড। ওপরে বড়-বড় অক্ষরে : 'শ্রীচক্রধর সামন্ত। মৎস ধরিবার সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বিক্রেতা। পরিক্ষা প্রার্থনীয়।'

অবশ্য 'মৎস্যে' য-ফল্য নেই, তাছাড়া লেখা রয়েছে 'পরিক্ষা প্রার্থনীয়।' কিন্তু তখন বানান ভুল ধরার মতো মনের অবস্থা ক্যাবলার মতো পণ্ডিতেরও নেই। আমরা চারজনেই হাঁ করে সাইনবোর্ডটার দিকে চেয়ে রইলুম কেবল।

৪

সাইনবোর্ডে যতই বানান ভুল থাক, মানে 'মৎস'-ই লিখুক আর 'পরিক্ষা'ই চালিয়ে দিক, আসল ব্যাপার হল : এটা চাঁদনির বাজার আর চক্রধর সামন্তের দোকান একেবারে সামনেই রয়েছে। অর্থাৎ কবিতাটার প্রথম দু' লাইনের মানে এখানেই পাওয়া যাচ্ছে যে।

হাবুল বললে, 'টেনিদা, অখন কী করন যাইব ?'

ক্যাবলা বললে, 'করবার কাজ তো একটাই রয়েছে। অর্থাৎ এখন সোজা ওখানে গিয়ে চক্রধর সামন্তের সঙ্গে দেখা করতে হবে।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, 'দেখা করে কী বলবি ?'

টেনিদা পেছন থেকে আমার মাথায় টুক করে একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে : 'চক্রধর সামন্তকে বাড়িতে নেমন্তন্ন করে লুচি-পোলাও খাইয়ে দিবি। দেখা করে কী আবার বলব ? পরিষ্কার জানতে চাইব, এই কবিতাটার মানে কী, আর শ্রীমান কম্বল কোথায় আছেন।'

ক্যাবলা ছুটে গিয়ে বললে, 'হুঁ, তাহলেই সব কাজ চমৎকার ভাবে পণ্ড হতে পারবে। কম্বলকে যদি এরাই কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকে, সঙ্গে সঙ্গেই হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। হয়তো কম্বলকে আমরা আর কোনওদিন খুঁজেই বের করতে পারব না।'

হাবুল বললে, 'না পাইলেই বা কী হইব। সেই পোলাখান না ? সে হইল গিয়া এক নম্বরের বিচ্ছু। তারে ধইর্‌য়া যদি কেউ চান্দে চালান কইর্‌য়া দেয়, দুই দিনে চান্দের গল্পা দিয়াও কান্দন বাইরাইব !'

টেনিদা ধমকে বললে, 'তুই থাম। কম্বল যত অখাদ্য ছেলেই হোক, তার কাকার কাছে আমরা তাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য, মানে ডিউটি-বাউন্ড। তারপর বদ্রীবাবু পিটিয়ে কম্বলের ধুলো ওড়ান কি কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়েই পড়ুন—সে তিনিই বুঝবেন। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে আর কতক্ষণ বকবক করব আমরা ? কিছু একটা করতে তো হবে।'

ক্যাবলা বলল, 'আলবাত করতে হবে। চলো, আমরা মাছধরার ছিপ-সুতো এই সব খোঁজ করিগে।'

আমি চ্যাঁ-চ্যাঁ শব্দে প্রতিবাদ করে বললুম, 'আমি কিন্তু ছিপ-সুতো নিয়ে বাড়ি যাব না। মেজদা তা হলে আমার কান কেটে নেবে।'

'তোর কান কেটে নেওয়াই উচিত'—চশমার ভেতর দিয়ে আমার দিকে কটকটিয়ে তাকাল ক্যাবলা : 'আরে বোকারাম, ছিপ-সুতো কিনছে কে ? আমরা এটা-ওটা বলে হালচাল বুঝে নেব।'

টেনিদা খুব মুরুব্বীর মতো বললে, 'প্যালা আর হাবলাকে নিয়েই মুস্কিল। এ-দুটোর তো মাথা নয়—যেন এক জোড়া খাজা কাঁটাল। কী বলতে কী বলবে আর সব মাটি হয়ে যাবে। শোন, তোরা দু'জন একেবারে চুপ করে থাকবি, বুঝেছিস ? যা বলবার আমরাই বলব—মানে আমি আর ক্যাবলা। মনে থাকবে ?'

আমরা গোঁজ হয়ে ঘাড় নাড়লুম। মনে থাকবে বই কি। এদিকে কিন্তু ভীষণ রাগ হচ্ছিল টেনিদার ওপর। বলতে ইচ্ছা করছিল, আমাদের মাথা নয় খাজা কাঁটাল, আর তোমার ? পণ্ডিত মশাই বলতেন না, 'বৎস টেনিরাম, ওরফে ভজহরি, জগদীশ্বর কি তোমার স্কন্ধের উপর মস্তকের বদলে একটি গোময়ের হাঁড়ি বসাইয়া দিয়াছেন ?' রাগ হলেই তাঁর মুখ দিয়ে সাধুভাষা বেরিয়ে আসত।

সে যাই হোক, আমরা তো চক্রধর সামন্তের দোকানে গিয়ে দাঁড়ালুম। সেখানে আঠারো-উনিশ বছরের একটা ছেলে খাকী হাফপ্যান্ট আর হাত-কাটা গেঞ্জি পরে একটা শালপাতার ঠোঙা থেকে তেলেভাজা খাচ্ছিল।

আমাদের দেখেই বেগুনি চিবুতে চিবুতে জিজ্ঞেস করলে, 'কী চাই ?'

ক্যাবলা বললে, 'আমরা ছিপ কিনব।'

'ওই তো রয়েছে, পছন্দ করুন না'—বলে সে আবার একটা আলুর চপে কামড় বসাল। বেশ বোঝা যাচ্ছিল, ছিপ বিক্রি করার চাইতে তেলে ভাজাতেই মনোযোগ তার বেশি।

'আপনিই বুঝি চক্রধরবাবু ?'—টেনিদা ভারি নরম-নরম গলায় ভাব করবার মতো করে জানতে চাইল।

'আমি চক্রধরবাবু হতে যাব কেন ?'—আলুর চপের ভেতরে একটা লঙ্কা চিবিয়ে ফেলে বিচ্ছিরি মুখ করল ছেলেটা :

'তিনি তো আমার মামা।'

ক্যাবলা বললে, 'ঠিক-ঠিক। তাই চক্রধরবাবুর মুখের সঙ্গে আপনার মুখের মিল আছে। ভাগনে বলেই।'

ভাগনে এবার চটে উঠল, শুনে আলুর চপের মতো ঘোরালো হয়ে উঠল তার মুখ। খ্যাঁকখ্যাঁক করে বললে, 'কী—কার মুখের সঙ্গে মিল আছে বললেন ? চক্রধরের ? সে সাত পুরুষে আমার মামা হতে যাবে কেন ? গাঁয়ের লোকে তাকে মামা বলে—আমিও বলি। আমার মুখ তার মতো ভীমরুলের চাকের মতো ? আমার কপালে তার মতো আব আছে ? আমার রং তার মতো কটকটে কালো ? আমার নাকের তলায় একটা ঝোল্লা গোঁফ দেখতে পাচ্ছেন ?'

ক্যাবলার মতো চটপটে ছেলেও কী রকম ঘাবড়ে গেল এবার। বার দুই বিষম খেলে।

'মানে—এই ইয়ে—'

'ইয়ে-টিয়ে নেই। ছিপ কিনতে এসেছেন কিনুন, নইলে ঝাঁ করে সরে পড়ুন এখান থেকে। খামকা যা তা বলে মেজাজ খারাপ করে দেবেন না স্যার।'

'সে তো বটেই, সে বটেই।'—টেনিদা মাথা নাড়ল : 'ওর কথা ছেড়ে দিন মশাই, ওটা কী বলে ইয়ে—মানে নেহাত নাবালক। আপনার মুখখানা—মানে—ঠিক চাঁদের মতো—অর্থাৎ কিনা চন্দ্রকান্ত বাবুও বলা যায় আপনাকে।

'আমার নাম হলধর জানা।'—বলেই সে হঠাৎ কী রকম চমকে উঠল : 'কী নাম বললেন ? চন্দ্রকান্ত ?'

টেনিদা ফস করে বলে বসল : 'নিশ্চয় চন্দ্রকান্ত। এমন কি আপনার টিকোলো নাক দেখে নাকেশ্বর বলতেও ইচ্ছে করছে।'

'কী বললেন ? নাকেশ্বর ? চন্দ্রকান্ত-নাকেশ্বর ?'—হলধর জানা তেলে ভাজার ঠোঙাটা মুড়ে ফেলে দিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : 'আপনারা যান। ছিপ বিক্রি হবে না। দোকান বন্ধ।'

ক্যাবলা বললে, 'দোকান বন্ধ।'

'হ্যাঁ, বন্ধ।'—হলধর কী রকম বিড়বিড় করতে লাগল : 'আজকে বিষুদ্‌বার না ? বিষুদবারে আমাদের দোকান বন্ধ থাকে।'

'মোটেই না, আজকে মঙ্গলবার'—আমি প্রতিবাদ করলুম।

'হোক মঙ্গলবার'—হলধর কাঁচা উচ্ছে চিবুনোর মতো মুখ করে বললে, 'আমরা মঙ্গলবারেও দোকান বন্ধ করে রাখি।'—বলেই সে ঘটাং ঘটাং করে আমাদের নাকের সামনেই ঝাঁপ বন্ধ করে দিলে। তারপর একটা ফুটোর ভেতর দিয়ে নাক বের করে বললে, 'অন্য দোকানে গিয়ে ছিপ কিনুন, এখানে সুবিধে হবে না।'

ব্যাস, হলধরের সঙ্গে আলাপ এখানেই খতম। হলধর জানাকে আর জানা হল না—তার আগেই ঝাঁপের আড়ালে সে ভ্যানিসড।

সে তো ভ্যানিসড—কিন্তু আমাদের মাথার ভেতরে একেবারে চক্কর লাগিয়ে দিলে যাকে বলে। পচা চীনেবাদাম চিবুলে যেরকম লাগে, ঠিক সেই রকম বোকাবোকা হয়ে আমরা এ ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম।

টেনিদা মাথা চুলকে বললে, 'ক্যাবলা—এবার ?'

ক্যাবলা বললে, 'হুঁ। এখন চলো, কোথাও গিয়ে একটু চা খাই। সেখানে বসে প্ল্যান ঠিক করা যাবে।'

কাছেই চায়ের দোকান ছিল একটা, নিরিবিলি কেবিনও পাওয়া গেল। ক্যাবলাই চা আর কেক আনতে বলে দিলে। এ-সব ব্যাপারে চিরকাল পয়সা-টয়সা ও-ই দেয়, আমাদের ভাববার কিছু ছিল না।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, 'ব্যাপারটা খুব মেফিস্টোফিলিস বলে মনে হচ্ছে। মানে সাংঘাতিক। এত সাংঘাতিক যে পুঁদিচ্চেরিও বলা যেতে পারে।'

হাবুল এতক্ষণ পরে মুখ খুলল : 'হ, সৈত্য কইছ।'

'চন্দ্রকান্ত আর নাকেশ্বর শুনেই হলধর কী রকম লাফিয়ে উঠল দেখেছ ?'—আমি বললুম, 'তা হলে ছড়াটার দ্বিতীয় লাইনেরও একটা মানে আছে।'

'সব কিছুরই মানে আছে—বেশ গভীর মানে।'—ক্যাবলা চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'এখন তো দেখছি ছড়াটার মানে বুঝতে পারলেই কম্বলেরও হদিস পাওয়া যাবে।'

টেনিদা এক কামড়েই নিজের কেকটাকে প্রায় শেষ করে ফেলল। আমিও চট্‌ করে আমারটা আধখানা মুখে পুরে দিলুম, পাছে ও-পাশ থেকে আমার প্লেটেও হাত বাড়ায়। টেনিদা আড় চোখে সেটা দেখল, তারপর ব্যাজার হয়ে বললে, 'কিন্তু পটলডাঙার কম্বল কী করে যে চাঁদনির বাজারে এল আর চক্রধরের সঙ্গে জুটলই বা কী ভাবে, সেইটেই বোঝা যাচ্ছে না।'

'সেটা বুঝলে তো সবই বোঝা যেত।'—ক্যাবলা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল : 'ভেবেছিলুম, কম্বলের পালানোটা কিছুই নয়—এখন দেখছি বদ্রীবাবুই ঠিক বলেছিলেন। কম্বল চাঁদে হয়তো যায়নি, কিন্তু যে-রহস্যময় চাঁদোয়ার তলায় সে ঘাপটি মেরে বসে আছে সে-ও খুব সোজা জায়গা নয়। ওয়েল, টেনিদা।'

'ইয়েস ক্যাবলা।'

'চলো, আমরা চারজনে চারিদিক থেকে চক্রধরের দোকানের ওপর নজর রাখি। আমাদের তাড়াবার জন্যেই হলধর দোকান বন্ধ করছিল, আবার নিশ্চয় ঝাঁপ খুলবে। দেখতে হবে ঝোল্লা গোঁফ আর কপালে আঁব নিয়ে কটকটে কালো চক্রধর আসে কি না কিংবা লম্বা নাক নিয়ে চন্দ্রকান্ত দেখা দেয় কি না। কিন্তু টেক্ কেয়ার—সব্বাইকেই একটু গা ঢাকা দিয়ে থাকতে হবে—হলধর যাতে কাউকে দেখতে না পায়।'

আমরা সবাই রাজি হয়ে গেলুম।

ক্যাবলা পরীক্ষায় স্কলারশিপ পাওয়াতে ওর বাবা ওকে একটা হাতঘড়ি কিনে দিয়েছিলেন। সেটার দিকে তাকিয়ে ক্যাবলা বললে, 'এখন সাড়ে চারটে। পড়াশুনোর সময় নষ্ট না করেও আমরা আরও দেড় ঘণ্টা থাকতে পারি এখানে। কে জানে, হয়তো আজকেই কোনও একটা ক্লু পেয়ে যেতে পারি কম্বলের। ফ্রেন্ডস—নাউ টু অ্যাকশান—এবার কাজে লাগা যেতে পারে।'

চাঁদনির বাজারে এদিক-ওদিক লুকিয়ে থাকা কিছু শক্ত কাজ নয়। আমরাও পাকা গোয়েন্দার মতো চারিদিকে চারটে জায়গা বেছে নিয়ে চক্রধরের দোকানের দিকে ঠায় চেয়ে রইলুম। টেনিদা আর ক্যাবলাকে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ঠিক আমার মুখোমুখি একটা লোহার দোকানের আড়াল থেকে মাঝে মাঝে কচ্ছপের মতো গলা বের করছিল হাবুল।

দাঁড়িয়ে আছি তো দাঁড়িয়েই আছি, চক্রধরের দোকানের ঝাঁপ আর খোলে না। চোখ টনটন করতে লাগল, পা ব্যথা হয়ে গেল। এমন সময়, হঠাৎ—পেছন থেকে আমার কাঁধে কে যেন টুক টুক করে দুটো টোকা মারল।

চমকে তাকিয়েই দেখি, ছিটের শার্ট গায়ে, ঢ্যাঙা তালগাছের মতো চেহারা, নাকের নীচে মাছিমার্কা গোঁফ, বেশ ওস্তাদ চেহারার লোক একজন। মিটমিট করে হেসে বললে, 'ছল ছল খালের জল'—তাই না?'

আমি এত অবাক হয়ে গেলুম যে মুখ দিয়ে কথাই বেরুল না।

লোকটা বলল, 'তা হলে হলধরকে নিয়ে আর সময় নষ্ট করা কেন? কাল বেলা তিনটের সময় তেরো নম্বর শেয়ালপুকুর রোডে গেলেই তো হয়।'

বলে আমার পিঠে টকটক করে আবার গোটা দুই টোকা দিয়ে, টুক করে কোনদিকে সরে পড়ল যে।

৫

কলকাতায় কাঁটাপুকুর আছে, ফড়েপুকুর আছে, বেনেপুকুর, মনোহরপুকুর, পদ্মপুকুর সব আছে, কিন্তু শেয়ালপুকুর আবার কোন্ চুলোয়। হিসেবমতো শেয়ালদার কাছাকাছিই তার থাকা উচিত, কিন্তু সেখানে তাকে পাওয়া গেল না পঞ্জিকার পৃষ্ঠায় কলকাতার রাস্তার যে-লিস্টি থাকে, তাই থেকেই শেষ পর্যন্ত জানা গেল, শেয়ালপুকুর সত্যিই আছে দক্ষিণের শহরতলিতে। জায়গাটা ঠিক কোনখানে, তা আর তোমাদের না-ই বললুম।

শেয়ালপুকুরের সন্ধান তো পাওয়া গেল, তেরো নম্বরও নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু প্রশ্ন হল, জায়গাটাতে আদৌ যাওয়া উচিত হবে কি না? কাঁটাপুকুরে

কোনও কাঁটা নেই—সে আমি দেখেছি; মনোহরপুকুরে আমার মাসতুতো ভাই লোটনদা থাকে—সেখানে কোনও মনোহরপুকুর আমি দেখিনি, ফড়েপুকুরেও নিশ্চয়ই ফড়েরা সাঁতরে বেড়ায় না। শেয়ালপুকুরের চারপাশেও খুব সম্ভব এখন আর শেয়ালের আস্তানা নেই—বেলা তিনটের সময় সেখানে গেলে নিশ্চয়ই আমাদের খ্যাঁক-খ্যাঁক করে কামড়ে দেবে না। কিন্তু—

কিন্তু চাঁদনির সেই সন্দেহজনক আবহাওয়া? সেই ঝোল্লা গোঁফ আর কপালে আবওলা চক্রধর সামন্ত কিংবা সেই নাকেশ্বর চন্দ্রকান্ত—যাদের এখনও আমরা দেখিনি? সেই তেলেভাজা-খাওয়া হলধর আর তালঢ্যাঙা সেই খলিফা-চেহারার লোকটা? এ-সবের মানে কী? ছড়াটা দেখছি ওরা সবাই-ই জানে আর এই ছড়ার ভেতরে লুকিয়ে আছে কোনও সাংকেতিক রহস্য। পটলডাঙার বিচ্ছুমার্কা কম্বল ও-ছড়াটা পেলেই বা কোথায়, আর কারাই বা তাকে নিরুদ্দেশ করল?

চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে ঝালমুড়ি খেতে-খেতে এই সব ঘোরতর চিন্তার ভেতরে আমরা চারজন হাবুডুবু খাচ্ছিলুম। বাঙাল হাবুল সেন বেশ তরিবত করে একটা লাল লঙ্কা চিবুচ্ছিল, আর তাই দেখে গা শিরশির করছিল আমার। টেনিদার খাড়া নাকটাকে দু-আনা দামের একটা তেলে-ভাজা সিঙাড়ার মতো দেখাচ্ছিল, আর ক্যাবলার নতুন চশমাটা ইস্কুলের ভূগোল-স্যারের মতো একেবারে ঝুলে এসেছিল ওর ঠোঁটের ওপর।

টেনিদা মুড়ি চিবুতে-চিবুতে বললে, 'পুঁদিচ্চেরি। মানে, ব্যাপার খুব ঘোরালো।'

আমরা তিনজনেই বললুম, 'হুঁ।'

টেনিদা বললে, 'যতই ভাবছি, আমার মনটা ততই মেফিস্টোফিলিস হয়ে যাচ্ছে।'

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে, 'মেফিস্টোফিলিস মানে শয়তান।'

'শাটাপ!'—টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, 'বিদ্যে ফলাসনি। লোকগুলোকে কী রকম দেখলি?'

আমি বললুম, 'সন্দেহজনক।'

হাবুল লঙ্কা চিবিয়ে জিভে লাল টেনে 'উস-উস' করছিল। তারই ভেতরে ফোড়ন কাটল: 'হ, খুবই সন্দেহজনক। ক্যামন শিয়াল-শিয়াল মনে হইল।'

আমি বললুম, 'তাই শেয়ালপুকুরে থাকে।'

ক্যাবলা বললে, 'খামোশ! চুপ কর দেখি। আমি বলি কি টেনিদা, আজ দুপুরবেলা যাওয়াই যাক ওখানে।'

টেনিদা শিঙাড়ার মতো নাকটাকে খুচুর-খুচুর করে একটুখানি চুলকে নিলে। তারপর বললে, 'যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু যদি ফেঁসে যাই? মানে—লোকগুলো—'

'চার-চারজন আছি, দিন-দুপুরে আমাদের কে কী করবে?'

'তা ঠিক। তবে কিনা—' টেনিদা গাঁইগুঁই করতে লাগল।

'হ, সকল দিক ভাইবা-চিন্তাই কাম করন উচিত।'—ভাবুকের মতো মাথা

নাড়তে লাগল হাবুল সেন :

'আর—তোমার হইল গিয়া—কম্বলটা একটা অখাদ্য মানকচু। অরে শুয়ারেও খাইব না। খামকা সেইটারে খুঁজতে গিয়া বিপদে পড়ুম ক্যান ?'

'হবে না ! ছিঃ ছিঃ !'—এমনভাবে ধিক্কার দিয়ে কথাটা বললে ক্যাবলা যে, হাবুল একেবারে নেতিয়ে গেল, স্রেফ মানকচু সেদ্ধর মতো। চশমাটাকে আরও ঝুলিয়ে দিয়ে এবারে সে অঙ্ক-স্যারের মতো কটকটে চোখে চাইল হাবুলের দিকে।

'তুই এত স্বার্থপর। একটা ছেলে বেঘোরে মারা যাচ্ছে, তার জনেয কিছু না করে স্বার্থপরের মতো নিজের গা বাঁচাতে চেষ্টা করছিস। শেম—শেম।'

হাবুল জব্দ হচ্ছে দেখে আমিও বললুম, 'শেম-শেম।' কিন্তু বলেই আমার মনে হল, হাবুলও কিছু অন্যায় বলেনি। কম্বলের মতো একটা বিকট বাঁদর ছেলে—যে কুকুরের কানে লাল পিঁপড়ে ঢেলে দেয়, লোকের গায়ে পটকা ফাটায় আর প্রণামের ছল করে খ্যাঁচখেঁচিয়ে পায়ে খিমচে দেয়, সে যদি আর নাই ফিরে আসে, তাতে দুনিয়ার বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কিন্তু তক্ষুনি আমি ভাবলুম, কম্বলের মা-র কী হবে ? ছেলে-হারানোর দুঃখ তিনি কেমন করে সহ্য করবেন ? আর, কোনও ছেলে যদি খারাপ হয়েই যায়, তা হলেই কি তাকে বাতিল করা উচিত ? খারাপ ছেলের ভালো হতে ক'দিনই বা লাগে ? না হলে, ক্লাইভ কী করে ভারতবর্ষ জিতে নিলেন ?

আমি ভাবছিলুম, ওরা কী বলছিল শুনতেই পাইনি। এবার কানে এল, টেনিদা বলছে, 'কিন্তু শেয়ালপুকুরে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে ওরা যদি আমাদের আক্রমণ করে ?'

'করুক না আক্রমণ। আমাদের লিডার টেনিদা থাকতে কী ভয় আমাদের ?—ক্যাবলা টেনিদাকে তাতিয়ে দিয়ে বললে, 'তোমার এক-একটা ঘুষি লাগবে আর এক-একজন দাঁত ছরকুটে পড়বে।'

'হে—হে, মন্দ বলিসনি।'—সঙ্গে-সঙ্গে টেনিদার দারুণ উৎসাহ হল আর সে ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দেবার জন্য হাত বাড়াল। কিন্তু ক্যাবলা চালাক, চট করে সরে গেল সে, তার পিঠ সঙ্গে-সঙ্গেই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল, আর চাঁটিটা এসে চড়াৎ করে আমার পিঠেই চড়াও হল

আমি চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠলুম, আর হাবলা দারুণ খুশি হয়ে বললে, 'সারছে—সারছে—দিছে প্যালার পিঠখান অ্যাক্কেবারে চ্যালা কইরা ! ইচ্-চ্—পোলাপান !'

টেনিদা বললে, 'সাইলেন্স—নো চ্যাঁচামেচি। বেশি গণ্ডগোল করবি তো সবগুলোকে আমি একেবারে জলপান করে ফেলব। যা—বাড়ি পালা এখন। খেয়েদেয়ে সব দেড়টার সময় হাজিরা দিবি এখানে। এখন ট্রুপ ডিসপার্স—কুইক !'

বাস থেকে নেমে একটু হাঁটতেই আমরা দেখলুম দুটো রাস্তা বেরিয়েছে দু' দিকে। একটা ধোপাপাড়া রোড, আর একটা শেয়ালপুকুর রোড। হাবুল আমাকে বললে, 'এই রাস্তার ধোপারা গিয়া না ওই রাস্তার শিয়ালপুকুরে কাপড় কাচে। বোঝছস না প্যালা ?'

আমি বললুম, 'তুই থাম, তোকে আর বোঝাতে হবে না।'

'তরে একটু ভালো কইর‍্যা বুঝান দরকার। তর মগজ বইল্যা তো কিছুই নাই, তাই উপকার করবার চেষ্টা কোরতে আছি। বুঝিস নাই ?'

এমন বিচ্ছিরি করে বলছিল যে ইচ্ছে হল হাবুলের সঙ্গে আমি মারামারি করি। কিন্তু তার আর দরকার হল না, বোধহয় ভগবান কান খাড়া করে সব শুনছিলেন, একটা আমের খোসায় পা দিয়ে দুম করে আছাড় খেল হাবুল।

টেনিদা আর ক্যাবলা-আগে-আগে যাচ্ছিল। টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'আঃ, এই প্যালা আর হাবলাকে নিয়ে কোনও কাজে যাওয়ার কোনও মানে নেই, দুটোই পয়লানম্বরের ভণ্ডুলরাম। এই হাবলা—কী হচ্ছে ?'

আমি বললুম, 'কিছু হয়নি। হাবলার মগজে জ্ঞান একটু বেশি হয়েছে কিনা, তাই বইতে পারছে না—ধপাধপ আছাড় খাচ্ছে।'

'হয়েছে, তোমায় আর ওস্তাদি করতে হবে না। শিগগির আয় পা চালিয়ে।'

রাস্তার দু'ধারে কয়েকটা সেকেলে বাড়ি, কাঁচা ড্রেন থেকে দুর্গন্ধ উঠছে। গাছের ছায়া ঝুঁকে পড়েছে এখানে-ওখানে। ভর দুপুরে লোকজন কোথাও প্রায় নেই বললেই চলে। কোথায় যেন মিষ্টি গলায় দোয়েল ডাকছিল। এখানে যে কোনওরকম ভয়ের ব্যাপার আছে তা মনেই হল না।

আরে, এই তো তেরো নম্বর ! উঁচু পাঁচিল-দেওয়া বাগানওলা একটা পুরনো বাড়ি। গেটের গায়ে শ্বেতপাথরের ফলকে বাংলা হরফে নম্বর লেখা। গেট খোলাই আছে, কিন্তু ঢোকবার জো নেই। গেট জুড়ে খাটিয়া পেতে শুয়ে আছে পেল্লায় এক হিন্দুস্থানী দারোয়ান, তার হাতির মতো পেট দেখে মনে হল, সে বাঘা কুস্তিগির আর দারুণ জোয়ান—আমাদের চারজনকে সে এক কিলে চিঁড়ে-চ্যাপটা করে দিতে পারে।

আমরা চারজন এ-ওর মুখের দিকে তাকালুম। এই জগদ্দল লাশকে ঘাঁটানো কি ঠিক হবে ?

টেনিদা একবার নাক-টাকগুলো চুলকে নিলে। চাপা গলায় বললে, 'পুঁদিচ্চেরি !' তারপর আস্তে আস্তে ডাকল :

'এ দারোয়ানজী !'

কোনও সাড়া নেই।

'ও দারোয়ান স্যার।'

এবারেও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

'পাঁড়ে মশাই !'

দারোয়ান জাগল। ঘুমের ঘোরে কী যেন বিড়বিড় করতে লাগল। আর তাই শুনেই আমরা চমকে উঠলুম।

দারোয়ান সমানে বলছিল : 'চাঁদ—চাঁদনি—চক্রধর—চাঁদ—চাঁদনি—চক্রধর—'

টেনিদা ফস করে বলে বসল : 'চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর।'

কথাটা মুখ থেকে পড়তেই পেল না। তক্ষুনি—যেন ম্যাজিকের মতো—উঠে বসল দারোয়ান। হড় হড় করে খাটিয়া সরিয়ে নিয়ে, আমাদের লম্বা সেলাম ঠুকে বললে, 'যাইয়ে—অন্দর যাইয়ে—'

আমরা বোধহয় বোকার মতো মুখ চাওয়া-চাউয়ি করছিলুম। ভেতরে নিয়ে গিয়ে ঠ্যাঙানি দেবে নাকি ? যা রাক্ষসের মতো চেহারা, ওকে বিশ্বাস নেই।

দারোয়ান আবার মুচকি হেসে বললে, 'যাইয়ে—যাইয়ে—'

এরপরে আর দাঁড়িয়ে থাকার কোনও মানে হয় না। আমরা দুরুদুরু বুকে দারোয়ানের পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকলুম। আর ঢুকতেই তক্ষুনি খাটিয়াটা টেনে গেট জুড়ে শুয়ে পড়ল দারোয়ান—যেন অঘোর ঘুমে ডুবে গেল।

কিন্তু আমরা কোথায় যাই ?

সামনে একটা গাড়িবান্দাওলা লাল রঙের মস্ত দোতলা বাড়ি। জানলার সবুজ খড়খড়িগুলো শাদাটে হয়ে কব্জা থেকে ঝুলে পড়ছে, তার গায়ের চুন-বালির বার্নিশ খসে যাচ্ছে, তার মাথায় বট-অশ্বত্থের চারা গজিয়েছে। একটা ভালো ফুলের বাগান ছিল, এখন সেখানে আগাছার জঙ্গল। একটা মরকুটে লিচু গাছের ডগায় কে যেন আবার খামকা একটা কালো কাক-তাড়ুয়ার হাঁড়ি বেঁধে রেখেছে।

আমরা এখানে কী করব বোঝবার আগেই বাড়ির ভেতরে থেকে তালঢ্যাঙা লোকটা—সেই যাকে আমরা চাঁদনির বাজারে দেখেছিলুম—মাছি-মার্কা গোঁফের নীচে মুচকি হাসি নিয়ে বেরিয়ে এল।

'এই যে, এসে গেছেন! তিনটে বেজে দু' সেকেন্ড—বাঃ, ইউ অর ভেরি পাংচুয়েল।'

আমরা চারজনে গা ঘেঁষে দাঁড়ালুম। যদি বিপদ কিছু ঘটেই, এক সঙ্গেই তার মোকাবেলা করতে হবে!

টেনিদা আমাদের হয়ে জবাব দিলে, 'আমরা সর্বদাই পাংচুয়াল!'

'গুড!—ভেরি গুড!'—লোকটা এগিয়ে চলল, 'তা হলে আগে চলুন মা নেংটীশ্বরীর মন্দিরে। তিনি তো এ-যুগের সব চাইতে জাগ্রত দেবতা।'

'নেংটীশ্বরী!'

লোকটা অবাক হয়ে ফিরে তাকালো : 'নাম শোনেননি ? মা নেংটীশ্বরীর নাম শোনেননি ? অথচ চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের খবর পেয়েছেন ? এটা কী রকম হল ?'

আমরা বুঝতে পারছিলুম, একটা-কিছু গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। ক্যাবলা সঙ্গে সঙ্গে সামলে নিলে। 'না-না, নাম শুনব না কেন ? না হলে আর এখানে এলুম কী করে ?'

'তাই বলুন।'—লোকটা যেন স্বস্তির শ্বাস ফেলল : 'আমায় একেবারে ধোঁকা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। জয় মা নেংটীশ্বরী!'

আমরাও সমস্বরে নেংটীশ্বরীর জয়ধ্বনি করলুম।

৬

আমরা যেই বলেছি, 'জয় মা নেংটীশ্বরীর জয়', সঙ্গে সঙ্গেই যেন চিচিংচন্দ্র ফাঁক হয়ে গেলেন। মানে, তক্ষুনি সেই সরু গুঁফো তালঢ্যাঙা চেহারার রোগা লোকটা হুড়মুড় করে একটা নকশা-কাটা কালো দরজা টেনে খুলে ফেললে। আর সেই দরজা দিয়ে তাকিয়েই আমরা চারজনে একেবারে থ।

মা কালী, মা দুর্গা, রাধাকৃষ্ণ, লক্ষ্মী-সরস্বতী-বিশ্বকর্মা-শীতলা-শিব, মায় ঘন্টাকর্ণ ঠাকুর পর্যন্ত অনেক দেবতাই তো আমরা দেখেছি—মানে দেবতা আর কী করে দেখব, তাঁদের মূর্তিটুর্তি তো সব সময়েই দেখে থাকি। পাটনার সেই কংগ্রেস ময়দানে দেখেছি, বাঁশ, কাগজ আর সেই সঙ্গে আরও কী সব দিয়ে তৈরি রাবণ-কুম্ভকর্ণ-ইন্দ্রজিতের আকাশ-ছোঁয়া মূর্তি—দশহরার দিন যাদের আগুনের তীর মেরে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু দরজা খুলতে আজ যা দেখতে পেলুম—এমন ঠাকুর এর আগে কোথাও কেউ দেখেছে বলে মনে হল না।

টেনিদা বিড়বিড় করে বললে, 'ডি লা গ্র্যান্ডি!'

আমি বললুম, 'মেফিস্টোফিলিস!'

হাবুল সেন বললে, 'খাইছে!'

আর ক্যাবলা কিছুই বললে না, হাঁ করে চেয়ে রইল, কেবল তার চশমাটা নাকের ওপর দিয়ে ঝুলে পড়ল নীচের দিকে।

কী দেখলুম, সে আর কী বলব তোমাদের। ছোট্ট ঘরটা এই দিন-দুপুরেই অন্ধকার, তার ভেতরে মালার মতো করে লাল-নীল অনেকগুলো ইলেকট্রিকের বাল্‌ব ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্‌বগুলো মিটমিটে হলেও ক'টা এক সঙ্গে জ্বলছে বলে একটা অদ্ভুত রঙিন আলো থমথম করছে ঘরময়। সেই আলোয় চিকচিক করছে মস্ত একটা সিংহাসন—রুপো-টুপো তাতে লাগানো আছে বোধহয়। সিংহাসনের মাথায় একটা সাদা ছাতা, সেই ছাতার তলায় ভেলভেটের গদিতে বসে—

স্বয়ং মা নেংটীশ্বরী। অর্থাৎ কিনা—ইয়া জাঁদরেল একটা নেংটি ইঁদুর।

নেংটি ইংদুরটার মূর্তি একটা ধুমসো হুলো বেড়ালের চাইতেও তিনগুণ বড়। সামনের পা দুটো জড়ো করে, কান খাড়া করে, ল্যাজটাকে পিঠের ওপর দিয়ে বাঁকিয়ে এমন কায়দায় বসে আছে যে আচমকা দেখলে জ্যান্ত বলে মনে হয়। চোখ দুটো বোধ করি কালো কাচ কিংবা পুঁতি দিয়ে তৈরি—লাল-নীল আলোতে সে দুটো যেন শয়তানিতে চিকচিক করছে। তার সামনে একটা মস্ত বারকোশে ছোলা-কলা-বাতাসা-চাল-ডাল এই সব সাজানো রয়েছে, দেবী নেংটীশ্বরীর ভোগ নিশ্চয়।

তাকিয়ে তাকিয়ে প্রাণ চমকে উঠল। রাত-বিরেতে ও-রকম একখানা পেল্লায় ইঁদুর যদি কারও ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে, তা হলে আর দেখতে হবে না।

কামড়ে-ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দেবে একেবারে।

লোকটা ধমক দিয়ে বললে, 'কী হে—হাঁ করে সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছ যে বড় ? বোম্বাচাক লেগে গেল নাকি তোমাদের ? মাকে পেন্নাম করলে না ?'

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা চারজনে একেবারে সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়লুম।

লোকটা বলে চলল, 'হেঁ—হেঁ, ভারি দুর্লভ মূর্তি ! দুনিয়ার কোথাও দেখতে পাবে না। এঁর প্রিতিষ্ঠে করেছেন কে জানো ? বাবা বিটকেলানন্দ। তাঁর নাম শুনেছ তো ?'

আমরা এ ওর মুখের দিকে চাইলুম। বিটকেলানন্দ ! স্বামী ঘটুঘুটানন্দের সঙ্গে একবার রায়গড়ের জঙ্গলে আমাদের দারুণ রকমের একটা মোলাকাত হয়েছিল—তাকে মুলা কাত-ও বলা যায়, কারণ তিনি আমাদের চারজনকে প্রায় কাত করে ফেলেছিলেন। বিটকেলানন্দ তাঁরই মাসতুতো ভাই কি না, কে জানে !

ক্যাবলা ঘাড়-টাড় চুলকে বললে, 'আজ্ঞে, তা—তা শুনেছি বইকি। বাবা বিটকেলানন্দের নাম কেই বা না জানে !'

লোকটা ফোঁস করে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল : 'সে কথা আর বোলো না। তোমরা বুদ্ধিমান বলে তাঁর খবর রাখো, তাই চাঁদনিতে গিয়ে খালের জলের কবিতা আউড়ে এখানে আসতে পেরেছ। কিন্তু অন্য কাউকে জিজ্ঞেস করে দ্যাখো, ঠোঁট উলটে অমনি বলে বসবে—'অ্যাঁ, বিটকেলানন্দ ? সে আবার কে !'—লোকটার মুখ মনের দুঃখে যেন লম্বা হয়ে গেল : 'ছ্যাঃ, এই জন্যই দেশটার কিছু হয় না।'

সঙ্গে-সঙ্গে টেনিদাও কেমন বাজখাঁই গলায় বলে বসল, 'আজ্ঞে যা বলেছেন—এই জন্যেই দেশের কিছু হয় না।' কী রকম বাঘাটে গলায় টেনিদা বলে ফেলল কথাটা, ঘর গম্‌গম্ করে উঠল, লোকটাও যেন চমকে গেল। তারপর বললে, 'অথচ দ্যাখো—বাবা বিটকেলানন্দ স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলেন। চালাকি নয় !'

—'খাইছে !'—হাবুল আর থাকতে পারল না।

—'খাইছে ?'—লোকটা আবার চমকে গেল : 'তার মানে ? কী খেয়েছে ? কোথায় খেয়েছে ? কেনই বা খেল ?' ক্যাব্‌লা বললে, 'যেতে দিন—যেতে দিন, ও মধ্যে মধ্যে ওই রকম বলে—কেউ কিচ্ছু খায়নি। এখন আপনি যা বলছিলেন বলুন।'

—'আমি বলছিলুম, স্বপ্নাদেশ।'—লোকটা একবার গলাখাঁকারি দিলে : বাবা বিটকেলানন্দ ছেলেবেলা থেকেই ভাবুক। ইস্কুলে মাস্টার পড়া জিজ্ঞেস করলে মৌনী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন, পাষণ্ড মাস্টারগুলো ভাবত—বাবার মাথায় কিছু নেই, তাই তাঁকে গোরুর মতো ঠ্যাঙাত। তারা তো জানত না—বাবা তখন ধ্যান করছেন। কিছু না বুঝেই মহাপাপী মাস্টারেরা পিটিয়ে তাঁর ধুদ্ধুড়ি উড়িয়ে দিত—ক্লাসে প্রোমোশন দিত না !'

আমি বললুম, 'আহা !'

ক্যাবলা বললে, 'আহা-হা !'

হাবুলও যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিল, ঘাড়ে একটা থাবড়া বসিয়ে টেনিদা

তাকে থামিয়ে দিলে। লোকটার গলার স্বর ভাবে কাঁদো-কাঁদো হয়ে উঠল, সে বললে, 'আহো-হো ! যাক, তারপরে শোনো। ঠ্যাঙানি খেতে খেতে বাবা বিটকেলানন্দের মতো মহাপুরুষেরও ধৈর্যচ্যুতি হল। তিনি ভেবে দেখলেন, মাস্টারের গাঁট্টাতেই যদি তাঁকে মহাপ্রস্থানে যেতে হয়, তা হলে তিনি ধ্যান-জপ করবেন কী করে—আবার জীবেরই বা গতি হবে কী ! তারপর একদিন তিনি বাড়ি ছেড়ে সটকালেন।

ক্যাবলা বললে, 'বুদ্ধের গৃহত্যাগ আর কি।'

লোকটা মাথা নাড়ল : 'যা বলেছ, ব্যাপার প্রায় সেই রকম। কিন্তু জানো, বুদ্ধের কাল তো এটা না, মহাপুরুষকে এখন আর চেনে কে ! তাই বাবা আর বোধিবৃক্ষের তলায় বসলেন না, তার বদলে গিয়ে চাকরি নিলেন বড়বাজারের পেটমোটা এক শেঠজীর গদিতে। সেখানে দেখলেন, অনেক শিখলেন, চালে কাঁকর মেশানো, আটায় ভুষি মেশানো, ওষুধে ভেজাল দেওয়া—সব জানলেন। জেনে-শুনে বাবার মগজ সাফ হয়ে গেল—তখন তিনি স্বপ্ন দেখলেন।'

—'কী স্বপ্ন ?'—টেনিদা জিজ্ঞেস করলে।

—'দেখলেন, স্বর্গে পালে-পালে নেংটি ইঁদুর হানা দিয়েছে—সেখানকার চাল-ডাল-মধু-সুজি-ফল-পাকড় সব খেয়ে ফেলেছে, দেবতাদের ঝাঁকে ঝাঁকে তাড়া করেছে, ইন্দ্র-চন্দ্র-কার্তিক-টার্তিক সবাই 'বাপ রে মা-রে' বলে ছুটে পালাচ্ছে। আর ইন্দ্রের ফাঁকা সিংহাসনে বসে গোঁফ ফুলিয়ে দেবী নেংটীশ্বরী বলছেন—'দেখছিস কি এখন থেকে স্বর্গে-মর্ত্যে-পাতালে আমারই রাজত্ব শুরু হল। আমার হুকুমমতোই সব চলবে। আজ থেকে তোদের কাজ হল নেংটি ইঁদুরের মতো চুরি করা—গর্ত কেটে, যেখানে যা পাওয়া যায়—সব লোপাট করা। বাঁচতে হলে এখন থেকে এই রাস্তাই তোদের ধরতে হবে।' দেবী এই পর্যন্ত বলতে বলতেই দুটো বেড়ালের ঝগড়ার আওয়াজে বিটকেলানন্দের ঘুম ভেঙে গেল, হুলোর ভয়েই দেবী উধাও হলেন কি না কে জানে ! আর বাবা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন, বললেন, 'পেয়েছি—পেয়েছি।' তারপরেই দেবী নেংটীশ্বরীর এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠা।'

ক্যাবলা বললে, 'উঃ, কী রোমাঞ্চকর !'

টেনিদা ঘাড় নেড়ে বললে, 'হুঁ, পয়লা নম্বরের মেফিস্টোফিলিস।'

—'মেফিস্টোফিলিস ?' লোকটা চোখ পিট্‌পিট্ করে বললে, 'তার মানে ?'

আমি বললাম, 'তার মানে—ইয়াক ইয়াক।'

—'ইয়াক ইয়াক ? সে আবার কী ?'—লোকটা খাবি খেল : 'তোমরা কোন্ দেশের লোক হে ? তোমাদের যে বোঝা যায় না।'

ক্যাবলা তাড়াতাড়ি বললে, ছেড়ে দিন, ওদের ছেলেমানুষি ছেড়ে দিন। মানে, খুশি হলে ওরা অনেক সময় ও-সব বলে, ওগুলোর কোনও মানে নেই। এখন আপনি যা বলেছিলেন বলুন।

লোকটা বিরক্ত হয়ে বললে, 'বলতেই তো চাচ্ছি, কিন্তু তোমরা কী সব বিচ্ছিরি ভাষা আউড়ে সব গোলমাল ক'রে দিচ্ছ ?'

আমি বললুম, 'বাবা বিটকেলানন্দ এখানে আছেন ?'

লোকটা আরও ব্যাজার হল : 'থাকতেই তো চেয়েছিলেন। কিন্তু ম্যাও ম্যাও।'

—'ম্যাও ম্যাও।'

—'আবার কী ?—ওরা কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেল, বলে কিনা, বাবা চোর, বাবা কালোবাজারী। সইবে না—সইবে না।—ভীষণ চটে গিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল : বাবা যোগবলে জেলের গরাদ ভেঙে বেরিয়ে আসবেন। আর যে হাকিম তাঁকে জেলে দিয়েছে—'

টেনিদা বললে, 'তাঁর কী হবে ?'

—'কী হবে ?'—দাঁত কিড়মিড় করে লোকটা বলতে লাগল : 'রাত্তিরে যখন সে ঘুমুবে, তখন মা নেংটীশ্বরী দল বেঁধে গিয়ে তার ভুঁড়ি ফুটো করে দেবে। নির্ঘাত দেখে নিয়ো।'

বলতে বলতেই হঠাৎ কোত্থেকে বিকট গলায় বিশটা হুলো বিড়াল এক সঙ্গে ডেকে উঠল : ম্যাও—ম্যাও—ম্যাও—

আর দারুণ চমকে উঠল লোকটা।

—'লুকোও—লুকোও—লুকোও। বাঁচতে চাও তো এখুনি লুকোও। না হলে—'

ঘরঘর শব্দে মা নেংটীশ্বরীর মন্দিরের দরজা বন্ধ হল, সেই তালঢ্যাঙা লোকটা জালে-পড়া গলদা চিংড়ির মতো ছটফটিয়ে উঠল, নেংটীশ্বরীর চোখ দুটো ঘরের সেই নানা রঙের আলোতে ঝকঝক করে জ্বলতে লাগল, কেমন যেন মনে হতে লাগল—মা আলোর দিকে কটমটিয়ে চেয়ে রয়েছেন, এখুনি 'ইচ্-কিচ্-খিচ্' বলে তেড়ে কামড়াতে আসবেন। তার উপরে আবার দরজাটা বন্ধ হয়ে যাওয়া বিচ্ছিরি গুমট গরমে আমরা সিদ্ধ হচ্ছিলুম—কেমন একটা বদখত গন্ধ আসছিল। একবার মনে হল ওটা নেংটি ইঁদুরের, তার পরেই মনে হল, না চামচিকের গন্ধ।

একেবারে বেকুব বনে গিয়ে আমরা চার মূর্তি—আলু সেদ্ধর মতো চারটে মুখ করে—এ ওর দিকে চেয়ে রইলুম। আর টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটাকে একবার চুলকে নিয়ে বললে, 'হুঁ, পুঁদিচ্চেরি।'

লোকটা কী রকম চমকে গেল। বললে, 'পুঁদিচ্চেরি ! সে আবার কী ?'

হাবুল বললে, 'ওটা হৈল গিয়া ফরাসী ভাষা। তার মানে হৈল, ব্যাপার খুবই সাংঘাতিক হইয়া উঠছে।'

তালঢ্যাঙা লোকটা তাই শুনে এমন ব্যাজার হয়ে গেল যে মনে হল, এক্ষুনি কেউ তাকে জোর করে একমুঠো নিমপাতা খাইয়ে দিয়েছে। সে বললে, 'ব্যাপার খুবই সাংঘাতিক, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু ফরাসী ভাষা বলো আর যাই বলো—ফিসফিসিয়ে বলবে। শুনলে না—ম্যাও ম্যাও এসেছে ? যদিও এ-ঘরে ঢুকতে পারবে না—আর ঘরটা কী বলে এমন কায়দায় তৈরি যে বাইরে থেকে বোঝাই যায় না এখানে ঘর আছে, তবু সাবধানের বিনাশ নেই—বুঝতে পারছ না ?'

মি বললুম, 'আজ্ঞে সবই বুঝতে পারছি। কিন্তু ম্যাও-ম্যাওটা—'

ক্যাবলা আমাকে একটা চিমটি কাটল, কিন্তু যখন বলেই ফেলেছি, তখন কথাটা আর সামলে নেওয়া যায় না। লোকটা আশ্চর্য হয়ে বললে, 'কেন, ম্যাও ম্যাও বুঝতে পারছ না। আচ্ছা নেংটি ইঁদুরের শত্রু কে ?'

হাবুল বুদ্ধি করে বললে, 'মানুষ।'

—'উঁহু হল না।'—লোকটা হ-য-ব-র-ল'র কাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো মাথা নেড়ে বললে, 'হয়নি, ফেল। তোমার মগজে দেখছি কিছু নেই।'

ক্যাবলা বললে, 'আজ্ঞে না, সেই জন্যেই তো ওর নাম হাবলা। নেংটি ইঁদুরের শত্রু হচ্ছে বেড়াল।'

—'ইয়া, রাইট। তা হলে মা নেংটীশ্বরীর শত্রু কে হতে পারে ?'

ক্যাবলা বললে, 'পুলিশ।'

—'ঠিক, একদম করেক্ট্। এইবার বুঝতে পারছ তো ? আড্ডায় পুলিশ হানা দিয়েছে। ধরতে যদি পারে আমাদের সকলকে একেবারে সোজা শ্রীঘর।'

—'শ্রীঘর ?'—টেনিদা খাবি খেয়ে বললে, 'মানে জেল ?'

লোকটা ঠোঁটে আঙুল দিলে।

—'স্-স্-স্। তোমার তো দেখছি একেবারে হাঁড়িচাঁচার মতো গলা হে। একটু আস্তে কথা বলতে পারো না ? তা ভেবেছ কী ? পুলিশে একবার ধরতে পারলে তোমায় কি নেমন্তন্ন করে পোলাও-কালিয়া খাওয়াবে ? একেবারে তিনটি বছর ঘানিগাছে ঘুরিয়ে দেবে—খেয়াল থাকে যেন।'

টেনিদা ধুপ করে সেই চামচিকের গন্ধভরা মেঝেটার উপরে বসে পড়ল, আমার পেটের ভেতরে পিলে-টিলেগুলো যেন কী রকম তালগোল পাকিয়ে যেতে লাগল, হাবুল মুখটাকে ফাঁক করে এমন ভাবে চেয়ে রইল যে, মনে হল, সে এখুনি হাঁউ-মাউ করে ডুকরে কেঁদে উঠবে। এ আবার কী ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল রে বাপু। সেই উনপাঁজুরে বিশ্বখাটে কম্বলকে খুঁজতে এসে শেষে জেল খাটতে হবে—কে জানে কোন্ চুরি বাটপাড়ির দায়েই জেল খাটতে হবে ! আগে একটুখানি বুঝতে পারলেও কে এমন ফ্যাচাঙের মধ্যে পা বাড়িয়ে দিত। কিংবা আমাদের গোড়াতেই বোঝা উচিত ছিল—টেনিদার নাক বরাবর পচা আমটা যখন শত্রুর অদৃশ্য আক্রমণ থেকে ছুটে এসেছিল—সেই তখন।

আসলে, সব দোষ ক্যাবলার। ও-ই তো কী রকম বক্তৃতা দিয়ে আমাদের উত্তেজিত করে দিলে। মনে হল, নিরুদ্দেশ কম্বলকে খুঁজে বের করার মতন মহৎ কাজ দুনিয়ায় আর বুঝি দ্বিতীয়টি নেই। আমার একটা ভীষণ জিঘাংসা জাগল, ইচ্ছে করল, ক্যাবলার গায়ে কয়েকটা লাল পিঁপড়ে ছেড়ে দিই, কয়েকটা বিছুটির পাতা ঘষে দিই ওর পায়ে। কিন্তু এখানে লাল পিঁপড়েও নেই, বিছুটিও নেই। এখন কেবল পুলিশের হাতে পড়া, তারপর জেল খাটতে যাওয়া।

জেল খাটতেও নয় রাজি আছি, কিন্তু জেল থেকে বেরুবার পর ? বড়দা কি পিঠের একফালি চামড়া বাকি রাখবে ? কিংবা জেলে যাওয়ার আগেই এসে এমন ধড়াধ্ধম্ পিটুনি লাগিয়ে যাবে তাতেই ছ'মাস কাটাতে হবে হাসপাতালে।

আমার চোখের সামনে সর্ষের ফুল-টুল কী সব দুলতে লাগল। যেন দেখতে পেলুম, মা নেংটীশ্বরী মুখটা একটুখানি ফাঁক করে আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত খিঁচুচ্ছেন, তাঁর বাঁকা লেজটা যেন অল্প অল্প নড়ছে মনে হল, আমি যেন এখুনি অজ্ঞান হয়ে পড়ব, আমার দাঁত কপাটি লেগে যাচ্ছে।

এরই মধ্যে শুনতে পেলুম, টেনিদা তোতলা হয়ে বলতে লাগল : 'পুল পুল পুলিশ—'

তাই শুনে লোকটা উচ্চিংড়ের মতো ভেংচি কেটে বললে, 'ডোন্ট বি ফুলিশ। বললুম, তো সাড়া কিছু করো না—তা হলেই আর টের পাবে না। আজই তো আর প্রথম নয়, এর আগে আরও তিন-চারবার তো ম্যাও ম্যাও এসে গেছে, কিন্তু ধরতে পেরেছে কাউকে? নেংটি ইঁদুর একবার গর্তে ঢুকলে বেড়াল কিছু করতে পারে তার? এটা হল মা নেংটীশ্বরীর গর্ত, যতক্ষণ এখানে আছ—ততক্ষণ ওই যে ইংরেজিতে কী বলে—একেবারে সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি।'

এর ভেতরে ক্যাবলা পণ্ডিতি করবার লোভ সামলাতে পারল না। টিক-টিক করে বলতে লাগল : 'আজ্ঞে ভুল করছেন। ওটা সাউন্ড এন্ড ফিউরি নয়—সেফ অ্যান্ড সাউন্ড।'

'তাই শুনে লোকটার মুখ ঠিক একটা ছারপোকার মতো হিংস্র হয়ে গেল। বললে, 'তুমি থামো হে ছোকরা, বেশি পণ্ডিতি করো না। চল্লিশ বছর এই সাউন্ড অ্যান্ড ফিউরি দিয়ে চালিয়ে দিলুম, তুমি এসেছ ওস্তাদি করতে। বেশি বকিয়ো না এখন, বাইরে শত্রু ঝাঁ করে হয়তো-বা কান ধরেই পেঁচিয়ে দেব তোমার।'

ক্যাবলা রেগে ঠিক একটা টোমাটোর মতো রাঙা হয়ে গেল, তারপর কী একটা গোঁ-গোঁ করে উঠেই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। ক্যাবলার পণ্ডিতি আমরা অবশ্য কেউ-ই পছন্দ করি না, কিন্তু তাই বলে বাইরের একটা উটকো লোক এসে তার কান ধরতে চাইবে—সে স্কলারশিপ-পাওয়া কলেজের ছাত্র, এ-ও তো আমাদের পটলডাঙার একটা জ্বালাময়ী অপমান।

যা ভেবেছি তাই—আমাদের লিডার টেনিদা সঙ্গে-সঙ্গে গাঁ গাঁ করে উঠল।

—'কী বলছেন মশাই, কান ধরে পেঁচিয়ে দেবেন। আমরা পটলডাঙার ছেলে—খেয়াল রাখবেন সেটা। হয় আপনার কথা উইথড্র করুন, নইলে এগিয়ে আসুন—হয়ে যাক এক হাত।'

লোকটা বোধহয় এতটা আশা করেনি, কীরকম ভেবড়ে গেল কথাটা শুনে। একটু আগেই আমি অজ্ঞান হব হব ভাবছিলুম, এখন মনে হল মারামারিটা না দেখে অজ্ঞান হবার কোনও মানেই হয় না। চোখ-কান খুলে খুব খুশি হয়ে দেখতে পেলুম, টেনিদা আস্তিন গোটাচ্ছে।

—'শিগগির উইথড্র করুন বলছি, নইলে—'

লোকটা তালগাছের মতো ঢ্যাঙা হলে কী হয়, বেজায় কাপুরুষ। আড়চোখে টেনিদার চওড়া চিতনো বুকের দিকে তাকিয়ে দেখল একবার। তারপর বললে, 'আহা—যেতে দাও, মানে—বাইরে পুলিশ, এখন আত্মকলহ করে দরকার নেই।

গোলমাল শুনলেই টের পেয়ে যাবে। তার চেয়ে এসো—সরি বলে ফেলা যাক। ওই যে ইংরেজীতে কী বলে—ফরফিট অ্যান্ড ফরগেট—'

ক্যাবলা বললে, 'উঁহু, আবার ভুল। ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট।'

লোকটার মুখ আবার একটা ছারপোকার মুখের মতো হিংস্র হতে যাচ্ছিল, কিন্তু টেনিদার আস্তিনের দিকে তাকিয়ে কী রকম বিবর্ণ হয়ে গেল, তার মুখটাকে ফড়িংয়ের মুখের মতো মনে হল এখন। সে কেমন যেন পিঁপড়ে-পিঁপড়ে গলায় চুঁ চুঁ করে বললে, 'আচ্ছা-আচ্ছা, তাই হল, ফরগিভ অ্যান্ড ফরফিট।'

—'আবার ভুল করলেন। ফরফিট, নয় ফরগেট।'

—'তাই হবে, ফরগেট। আমি উইথড্র করলুম। ওহে ছোকরা, তুমি আর আস্তিন-ফাস্তিন গুটিয়ো না। ওদিকে বাইরে পুলিশ, এদিকে আবার হার্ট খারাপ, এর মধ্যে তুমি আবার যদি দুড়দ্দুম করে আমাকে ঘুষি লাগিয়ে দাও—তা হলে আর আমি বাঁচব না।'

টেনিদা খুশি হয়ে বললে, 'বেশ আসুন, হ্যান্ডশেক করি। ভাব হয়ে যাক।'

—'হ্যান্ডশেক?' লোকটা সন্দেহে মিটমিটে চোখে চেয়ে রইল : 'শেষকালে পাঞ্জা ধরে আঙুল-টাঙুল ভেঙে দেবে না তো? আমার শরীর ভালো নয়, সে আগেই বলে রাখছি।'

টেনিদা বললে, 'না-না, কোনও ভয় নেই আপনার। মা কালী, মা নেংটীশ্বরীর দিব্যি, আপনার আঙুলে চাপ দেব না নিন—আসুন হা ডু ডু—'

লোকটা বললে, 'হা-ডু ডু? আমি তো কপাটি খেলিনি। আমি—'

কিন্তু কথাটা শেষ হওয়ার আগেই বাইরে থেকে পরপর কয়েকটা জোরাল চিঁচির আওয়াজ উঠল। লোকটা সঙ্গে-সঙ্গে লাফিয়ে উঠে বলল, 'জয়গুরু—লাইন ক্লিয়ার। ম্যাও ম্যাও চলে গেছে!'

ঘড়ঘড়িয়ে দরজাটা খুলে গেল। যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলুম আমরা। সব ভুলে-টুলে গিয়ে টেনিদা গলা খুলে চেঁচিয়ে উঠল : 'ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—'

সঙ্গে-সঙ্গে আমরা বললাম, 'ইয়াক-ইয়াক!'

লোকটা খানিকক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল—এবার ঠিক আরশোলার মতো হয়ে গেল ওর মুখটা।' কী বলে তোমরা চেঁচালে?'

—'ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—ইয়াক-ইয়াক' আমি জবাব দিলুম।

—'মানে কী ওর?'

হাবুল সেন বললে, 'এটা হৈল ফরাসী ভাষা। মানেটা হৈল গিয়া বড়ই কঠিন।'

লোকটা পিরপির করে বললে, 'তাই দেখছি। কিন্তু যাই বলো বাপু তোমাদের হালচাল আমি বুঝতে পারছি না। তোমরা কোন্ ব্রাঞ্চ থেকে আসছ? চট না চিটেগুড়? সতরঞ্চি না ধুচনি?'

আমরা আর কেউ কিছু বলববার আগেই ফস করে ক্যাবলা বললে, 'কম্বল।'

—'কম্বল ?' লোকটা ভুরু কোঁচকাল : 'বুঝেছি, কোনও নতুন ব্রাঞ্চ হবে। কিন্তু এখন ও-সম্বন্ধে আমরা কোনও খবর পাইনি। যাই হোক, ছড়া যখন জানো আর চাঁদনি পর্যন্তও গেছ তখন চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের কাছেই এবার চলো। তার পারমিট পেলে তখনই ছল ছল খালের জল পেরুতে পারবে। আর ঘর থেকে বেরুবার আগে আরও একবার মা নেংটীশ্বরীকে প্রণাম করো, তিনি সব সিদ্ধি দেবেন।

আমরা আবার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললুম, 'জয় মা নেংটীশ্বরীর জয়।'

৭

সেই তালঢ্যাঙা লোকটার সঙ্গে আমরা গুটি গুটি পায়ে বেরোলুম নেংটীশ্বরীর মন্দির থেকে। লোকটা বলল, 'এবার হাওয়া মহল। এই ডানদিকের সিঁড়ি।'

একটা চওড়া সিঁড়ি ওপর দিকে উঠে গেছে, আমরা দেখতে পেলুম। এক সময়ে সিঁড়িটা খুব ভালো ছিল, পাথর-টাথর দিয়ে বাঁধানো ছিল বলে মনে হয়। এখন এখানে-ওখানে পাথর উঠে গিয়ে গর্ত হয়ে গেছে, এই দুপুর-বেলাতেও কেমন যেন একটা গুমোট অন্ধকার। মাঝে মাঝে রেলিং ভেঙে গেছে। লোকটা বললে, 'একটু সাবধানে এসো হে—ইয়ে, কী বলে, সিঁড়িটা তেমন সুবিধের নয়। আমরাই কখনও কখনও আছাড়-টাছাড় খাই। দুঃখের কথা আর কী বলব হে, আমাদের গুরুদেব বিটকেলানন্দ তো সিদ্ধপুরুষ, তা তিনিই একবার এমন কুমড়ো-গড়ান গড়ালেন যে—'

হাবুল বললে, 'সিদ্ধপুরুষ অ্যাকেবারে ভাজাপুরুষ হইয়া গেলেন।'

লোকটা থেমে দাঁড়িয়ে কটকট করে হাবুলের দিকে তাকালো। বললে, 'তুমি তো দেখছি ভারি ফক্কড় হে ছোকরা! গুরুদেবকে নিয়ে মস্করা।'

ক্যাবলা-বললে, 'ছেড়ে দিন, ওর কথা ছেড়ে দিন। ওটা একটা ঢাকাই পরোটা।'

'ঢাকাই পরোটা! তার মানে ?'

মানেটা বোঝার আগেই একটা চিৎকার ছাড়লুম আর গুরুজী বিটকেলানন্দের মতোই একটা কুমড়ো-গড়ান অনেক কষ্টে সামলে গেলুম। আমার দু-কানে দুটো ঝাপটা মেরে ই-কিঁচ-কিঁচ বলতে বলতে একজোড়া চামচিকে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল।

লোকটা খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠল : 'ভয় নেই হে, ওরা আমাদের পোষা। কিচ্ছু বলে না কাউকে।'

টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, 'কী যা-তা বলছেন। চামচিকে কারও পোষা

হয় ?'

'হয়—হয়। গুরুজী বিটকেলানন্দ চামচিকে তো দূরের কথা ছারপোকাকে পর্যন্ত বশ মানাতে পারেন। হয়তো ডেকে বললেন, এই খটমল—নিকাল আও বাচ্চা—জেরা ড্যানস করো, অমনি দেখবে তক্তপোশের ফাটল থেকে দলে দলে ছারপোকা বেরিয়ে 'ট্যাঙ্গো' নাচ শুরু করেছে।'

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলুম, 'ট্যাঙ্গো নাচ কাকে বলে ?'

লোকটা বললে, 'আমি কী করে জানব ? অতই যদি জানব, তা হলে তো অ্যাদ্দিনে একটা কেষ্ট-বিষ্টু হতে পারতুম। এ-সব ধাষ্টামো করে বেড়াতে হত না।'

হাবুল মাথা চুলকোতে লাগল। ভেবে-চিন্তে বললে, 'তা হলে পাটকেলানন্দেরে ম্যাও-ম্যাও-তে ধইর‍্যা লইয়া গ্যাল ক্যান ? তিনি তো তাগোও ট্যাঙ্গো কইর‍্যা নাচাইতে পারতেন।'

লোকটা আরশোলার মতো ঘাবড়ানো-ঘাবড়ানো মুখ করে বললে, 'বোকো না। এখন সবাই বেশ লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপ করে থাকো দিকি। এইবার কাজের কথা হবে। আমরা এসে গেছি।'

সত্যিই আমরা এসে গিয়েছিলুম। দোতলায়। সামনেই একটা ফাটল-ধরা ময়লা মতন মস্ত বড় ন্যাড়া ছাদ। আর এক কোনায় একটা ঘর। ঘরের সামনে বড় একটা খাঁচা, তার ভেতরে একটা বাদুড়—নীচে মাথা দিয়ে ঝুলে রয়েছে। আমাদের দিকে ঘুম-ঘুম চোখ মেলে চেয়ে দেখল একবার।'

ক্যাবলা বলে, 'ও কী স্যার—ওখানে একটা বাদুড় কেন ?'

'বাদুড় বোলো না, ওর নাম অবকাশরঞ্জিনী।'

'অবকাশরঞ্জিনী!'—ক্যাবলা খাবি খেলো : 'বাদুড়ের কখনও অমন নাম হয় ?'

'হয়—হয়। নামের তোমরা কী জানো হে ? এ-সব গুরুদেবের লীলা। জানো—উনি একটা ছারপোকার নাম দিয়েছেন বিক্রমসিংহ। আর এই-যে বাদুড় দেখছ, ইটি সামান্যি নয়। এই-যে অবকাশরঞ্জিনী—এ খবু ভালো ধামার গাইতে পারে।'

টেনিদা হঠাৎ গাঁ-গাঁ করে বললে, 'কিচ্ছু বিশ্বাস করি না—একদম গুল।'

'গুল ?'—লোকটা কী রকম যেন কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল : 'বেশ, তা হলে এ-সব কথা থাক। এখন কাজের কথা হোক।'

'কার সঙ্গে কাজের কথা ?'—আমি ভীষণ আশ্চর্য হয়ে গেলুম : 'ওই অবকাশরঞ্জিনীর সঙ্গে নাকি ?'

'চুপ!'—ঠোঁটে আঙুল দিয়ে লোকটা বললে, 'দাঁড়াও।'

সামনে ঘরটারর দরজা ভেজানো ছিল। ঢ্যাঙা লোকটা আলগোছে একটা ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল। আর তক্ষুনি ভেতর থে কেকে যেন ক্যাঁ-ক্যাঁ করে বললে, 'দোহাই হুজুর, আমার জ্বর হয়েছে, ডিপথিরিয়া হয়েছে, পেটের মধ্যে রিং-ওয়ার্ম হয়েছে, কে জানে জলাতঙ্কও হয়েছে কিনা। আমি এখন যাকে-তাকে কামড়ে দিতে পারি। আমি কোনও কথাই জানিনে হুজুর—আমাকে ছেড়ে দিন।'

আমরা দেখতে পেলুম, ঘরের ভেতরে মাদুর পাতা। তার ওপর একটা লোক একরাশ কাঁথা-কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আর খালি বিচ্ছিরি গলায় বলছে, 'আমার জলাতঙ্ক হয়েছে স্যার—মাইরি বলছি—এখন লোক পেলেই কামড়ে দেব।'

তিন লাফ দিয়ে আমরা চারজন পিছিয়ে এলুম। ঢ্যাঙা লোকটা বললে, 'আঃ, কী হচ্ছে হে চক্রধর। খামকা ভদ্দরলোকের ছেলেদের ঘাবড়ে দিচ্ছ কেন? কম্বল ফেলেই চেয়ে দ্যাখো না একবার। ম্যাও ম্যাও নেই, তারা অনেকক্ষণ চলে গেছে, আমি বিন্দেবন কথা কইছি।'

শুনেই, কাঁথা-কম্বলের ভেতর যেন তুফান উঠল একটা। সেগুলোকে চারিদিকে ছিটকে ফেলে সোজা উঠে বসল একটা লোক—যার বর্ণনা এর আগেই আমরা শুনেছি। আমরা চারজন দেখলুম, লোকটার কটকটে কালো রঙ, মুখে একটা ঝোল্লা গোঁফ, কপালের বাঁ-দিকে মস্ত আব। এই দারুণ গরমে কাঁথা-কম্বল চাপা দিয়ে সে ঘামে নেয়ে গেছে, কেমন ম্যাড়মেড়ে মুখ করে সে গঙ্গারামের মতো আমাদের দিকে চেয়ে রইল।

তারপর সে বিন্দেবন,—অর্থাৎ ঢ্যাঙা লোকটাকে বললে, 'তা তুমি এয়েচ, সেটা আগে কইতি কী হয়েচেল?'

'কইব কখন?'—বিন্দেবন বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমাদের সাড়া পেয়েই তুমি ক্যাঁথার ভেতরে সেন্ধিয়ে ক্যাঁচর-ম্যাচর করতে লাগলে।' বিন্দেবন দিব্যি তখন দেশী ভাষায় কথা বলতে লাগল।

'সাবধানের বিনেশ নেই—বুয়েচো না?'—চক্রধর ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেলল: 'অ্যাই দ্যাকো—গরম কম্বল চাপিয়ে ঘেমে নেয়ে গেইচি, এখন বুঝি সর্দি লেগে গেল আবার। সে যাক—এঁয়ারা?'

'এঁয়ারা খদ্দের।'

'খদ্দের! আমরা এ ওর মুখের দিকে তাকালুম। টেনিদা কী একটা বলতেও যাচ্ছিল, ক্যাবলা তার পাঁজরায় ছোট্ট একটা চিমটি কাটল, আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম। আর চক্রধরও চোখ কুঁচকে আমাদের দিকে চেয়ে রইল—যেন ব্যাপারটা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না।

বললে, 'খদ্দের? এত ছেলেমানুষ?'

টেনিদা বললে, 'আমরা কলেজে পড়ি। ছেলেমানুষ নই।'

'তা বটে—তা হলে তো আর ছেলে-মানুষ কওয়া যায় না।'

বিন্দেবন মাথা নাড়ল: 'তা ছাড়া ওঁরা ছড়া বলেচেন; চাঁদনিতে তোমার দোকানেও গেছলেন।'—বিন্দেবন আমাদের দিকে তাকাল: 'বুঝছেন তো, ইনিই হচ্ছেন গুরুদেবের প্রধান শিষ্য—পাটকেলানন্দ। একেই বাইরের লোক চক্রধর সামন্ত বলে জানে। বসুন—বসুন আপনারা।'

আমরা মাদুরে বসে পড়লুম।

পাটকেলানন্দ ওরফে চক্রধর এবার গম্ভীর হয়ে ঝোল্লা গোঁফে তা দিলে।

তারপর খানিকক্ষণ ভাবুক-ভাবুক মুখ করে চোখ বুজে বসে রইল। সে যে আর চক্রধর নয়, একেবারে মূর্তিমান পাটকেলানন্দ, সেইটেই যেন বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগল আমাদের। এতক্ষণ যে কম্বলের তলায় পড়ে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছিল, এখন আর তা বোঝবারও জো নেই।

বাইরে বাদুড়টা হঠাৎ খ্যাঁচম্যাচে আওয়াজ করে উঠল।

সেই আওয়াজে চক্রধর চোখ খুলল।

'ঠিক আছে। অবকাশরঞ্জিনী সাড়া দিয়েছে। ঠিক আছে।'

টেনিদা বোকার মতো বললে, 'মানে?'

'মানে অবকাশরঞ্জিনীর ভেতরে গুরুদেব যোগশক্তি সঞ্চার করেছেন। ও ক্যাঁচমেচিয়ে উঠলেই আমরা বুঝতে পারি, কোথাও কোনও গোলামাল নেই।'

'যদি ক্যাঁচম্যাচ না করে?'—আমি জানতে চাইলুম।

'তা হলে খোঁচা দিতে হয়।'

'যদি তাও চুপ কইরা থাকে?'—হাবুল কৌতূহলী হল।

'তখন বুঝতে হবে ব্যাপার খুব সঙ্গিন। তখন তক্তপোশের ফাটল থেকে বিক্রমসিংহকে ডাকতে হবে। যাকগে, সে সব অনেক কথা।'—চক্রধর বললে, 'তা হলে আপনারা চারজন?'

টেনিদা বললে, 'হুঁ, চারজন।'

'কোথায় থাকেন?'

'—পটলডাঙা।'

'ছড়া বলুন'—সঙ্গে সঙ্গে নামতা পড়ার মতো আমরা কোরাসে আরম্ভ করলুম: 'চাঁদ-চাঁদনি-চক্রধর, চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর—'

চক্রধর বললে, 'থাক—থাক, আর দরকার নেই। চন্দ্রকান্তকে ওখানে গিয়েই পাবেন—মানে মহিষাদলে। এই বিন্দেবনই আপনাদের নিয়ে যাবে। টাকার রসিদ আছে তো?'

টাকার রসিদ! আমি চমকে কী বলতে যাচ্ছিলুম, ক্যাবলা আমাকে একটা খোঁচা মারল। তারপর বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, রসিদ-টসিদ সব আছে। বাড়িতে রেখে এসেছি।'

'তা হলে আর কী? কবে যাবেন?'

ক্যাবলা ফস করে বললে, 'রবিবার?'

'সে তো বেশ কথা। আমার দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবেন। ভোর ছ'টার মধ্যে এলে চটপট চলে যেতে পারবেন, সন্দের মধ্যে ফিরেও আসতে পারবেন। রাজি?'

'আমরা কিছু বলার আগেই ক্যাবলা বললে, 'রাজি।'

'তা হলে এই কথা রইল।'—চক্রধর আবার ফ্যাঁচ করে হেঁচে উঠল: 'ইঃ, জব্বর সর্দিটাই লাগল। খামকা ক্যাঁথা-কম্বল চাপিয়ে—মরুকগে, এখন মা নেংটীশ্বরীকে প্রণাম করে বাড়ি চলে যান। আর রবিবারে ভোর ছ'টায় আমার

দোকানের সামনে এসে দাঁড়াবেন। ঠিক ?'

ক্যাবলা বললে, 'ঠিক।'

'জয় মা নেংটীশ্বরী—তোমারই ইচ্ছে মা!—চক্রধর শিবনেত্র হয়ে যেন ধ্যানে বসল। তারপর বললে, 'হ্যাঁ, আর একটা কথা। যাবার আগে অবকাশরঞ্জিনীর ভোগের জন্য স'পাঁচ আনা পয়সা রেখে যাবেন মনে করে।'

৮

সে তো হল। রবিবার না হয় মহিষাদলেই গেলুম। কিন্তু তারপর ?

সবটাই কী রকম গোলমালে ঠেকছে। হতচ্ছাড়া কম্বলের আগাগোড়াই বিটকেল ব্যাপার। যখন নিরুদ্দেশ হয়নি, তখন পাড়াসুদ্ধ লোকের হাড় ভাজাভাজা করে ফেলছিল ; যখন উধাও হল তখনও মাথার ভেতরে বনবনিয়ে কুমোরের চাক ঘুরিয়ে দিলে।

আচ্ছা—তোমারই বলো, লোকে কি আর নিরুদ্দেশ হয় না। পরীক্ষায় ফেল-টেল করে ঠেঙানি খাওয়ার ভয়ে কিংবা হয়তো ঠাকুর্দার কাছ থেকে একটা গিটার আদায় করবার আশায়, কেউ হয়তো বন্ধুর বাড়িতে চম্পট দেয়—আবার কেউ বা মাসি-পিসির বাড়িতে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। তারপর যেই বিজ্ঞাপন বেরুল : 'প্রিয় ট্যাঁপা, শীঘ্র ফিরিয়া আইস। মা মৃত্যুশয্যায়, তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না', কিংবা 'স্নেহের ন্যাদা, তোমার ঠিকানা দাও—সকলেই কাঁদিতেছে—' তখন গর্তের থেকে পিঁপড়ের মতো সব সুড়সুড় করে একে-একে বেরিয়ে এল। তারপর বরাত বুঝে কারও অদৃষ্টে চাঁটানি, কারও বা হাওয়াইয়ান গিটার!

কিন্তু এই সব ভালো ছেলেদের মতো বুঝে-সুঝে 'নিরুদ্দেশ' হবে, কম্বলচন্দর কি সে জাতের নাকি ? তার কাকা বলে বসল—সে চাঁদে গেছে, তার নাকি ছেলেবেলা থেকেই চাঁদে যাওয়ার 'ন্যাক' আছে একটা। এ-সব বাজে কথা কে কবে শুনেছে ? তারপরে ল্যাঠার পর ল্যাঠা! কোত্থেকে কান ঘেঁষে এক আমের আঁঠি, একটা যাচ্ছেতাই ছড়া—চাঁদনির বাজার, শেয়ালপুকুর, পাটকেলানন্দ, মা নেংটীশ্বরী, ঝোল্লা-গোঁফ চক্রধর সামন্ত—বাদুড়ের নাম অবকাশরঞ্জিনী—ধুত্তোর, কোনও মানে হয় এ-সবের ?

এতেও শেষ নয়। এখন আবার ঘাড়ে চড়াও হয়েছে এক তালঢ্যাঙা বিন্দেবন। আবার তার সঙ্গে রবিবারে মহিষাদলে যেতে হবে। মহিষাদল নামটাই যেন কী রকম—শুনলেই মনে হয় একদল বুনো মোষ শিং বাগিয়ে তাড়া করে আসছে। কপালে কী আছে, কে জানে। চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বর আমাদের কোন্ চাঁদে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেবে—তাই বা কে বলতে পারে।

তারপর আবার কী সব রসিদ-ফসিদের কথাও বলছি চক্রধর। তার মানে, অনেক গণ্ডগোল আছে ভেতরে। ক্যাবলা সমানে তো টিকটিক করছে, কিন্তু মহিষাদলের মোষদের পাল্লায় পড়ে—

আমি আর হাবুল সেন এ-সব নিয়ে অনেক গবেষণা করলুম।

হাবুল ভেবে-চিন্তে বললে, সত্য কইছিস প্যালা। আমরা ফ্যাচাঙে পড়ুম।

আমি বললুম, পেছনে আবার পুলিশ আছে ওদের। কী করছে লোকগুলো কে জানে। শেষকালে আমাদের সুদ্ধু ধরে নিয়ে যাবে।

হাবুল—'তা লইয়া যাইব। লইয়া গিয়া রাম-পিটানি দিব।'

আমি বললুম, 'আর বাড়িতে ?'

—'কান ধইরা ছিড়্যা দিব। পুলিশের পিটুনির থিক্যাও সেটা খারাপ।'

আমি বললুম, 'অনেক খারাপ। তোর হয়তো একটা কান ছিঁড়ে দেবে, কিন্তু মেজদার বরাবর নজর আমার কানের দিকেই। ওর ডাক্তারি কাঁচি দিয়ে কচাকচ করে কেটে নেবে।'

হাবুল কিছুক্ষণ ভাবুকের মতো আমার কানের দিকে চেয়ে রইল। শেষে মাথা নেড়ে বললে, 'তা কাইট্যা নিলে তোরে নেহাত মন্দ দ্যাখাইব না। তোর খাড়া খাড়া কান দুইখান—'

আমি বললুম, 'শাট আপ। বন্ধু-বিচ্ছেদ হয়ে যাবে হাবলা!'

হাবুল ফের বললে, 'আইচ্ছা, মনে যদি কষ্ট পাস, তাইলে ওই সব কথা থাকুক। তোর আদরের কান দুইখ্যান লইয়া তুই ঘাস-ফাস চাবা। তা অখন কী করন যায়, তাই ক'।

আমার ইচ্ছে করছিল হাবলাকে একটা চড় বসিয়ে দিই, কিন্তু ভেবে দেখলুম এখন গৃহযুদ্ধের সময় নয়। এই সব ঝামেলা মিটে যাক, তারপর হাবলার সঙ্গে একটা ফয়সালা করা যাবে।

রাগ-টাগ সামলে নিয়ে বললুম, 'তা হলে চল, ক্যাবলার কাছে যাই। তাকে গিয়ে বলি—যা হয়েছে বেশ হয়েছে। আর দরকার নেই, চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের চাঁদবদন না দেখলেও আমাদের চলবে।'

হাবুল বললে, 'হ। দ্যাখনের তো কত কী-ই আছে। ইচ্ছা হইলেই তো চিড়িয়াখানায় গিয়া আমরা জলহস্তীর বদনখান দেইখ্যা আসতে পারি। আর কম্বলের দিয়াই বা আমাগো কী হইব ? পোলা তো না—য্যান, একখানা চামচিকা। চক্রধরের অবকাশরঞ্জিনীর থিক্যাও খারাপ।'

আমি সায় দিয়ে বললুম, 'বিক্রমসিংহের চাইতেও খারাপ। সে তো শুধু ছারপোকা, ও একটা কাঁকড়াবিছে।'

এই সব ভালো ভালো আলোচনা করে আমরা ক্যাবলার কাছে গেলুম। কিন্তু তাকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। তার মা—মানে মাসিমা ছানার মুড়কি তৈরি করছিলেন, আমাদের বসিয়ে তাই খেতে দিলেন। আমরা ক্যাবলার ওপর রাগ করে এত বেশি খেয়ে নিলুম যে ক্যাবলার জন্যে কিছু রইল বলে মনে হল না।

পেট ঠাণ্ডা হলে মন খুশি হয়, আমরা দুজনে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গাইতে-গাইতে যেই টেনিদার বাড়ির কাছে পৌঁছেছি, অমনি কোত্থেকে হাঁ-হাঁ করে বেরিয়ে এল টেনিদা।

—'বেলা দশটার সময় অমন গাঁক-গাঁক করে চ্যাঁচাচ্ছিস যে দু'জনে ? ব্যাপার কী ?'

হাবুল বললে, 'আমারা সঙ্গীত-চর্চা করতে আছিলাম।'

—'সঙ্গীত-চর্চা ? ওকে চচ্চড়ি বলে। তোদের গানের চোটে পাড়ায় আর কুকুর থাকবে না মনে হচ্ছে। তা এত আনন্দ কেন ? কী হয়েছে ?'

—'আমরা ক্যাবলার বাড়িতে গিয়ে ছানার মুড়কি খেয়ে এসেছি।' আমি জানালুম।

—'অ, তাই এত ফুর্তি হয়েছে। তা আমাকে ডেকে নিলি না কেন ? ক্যাবলাও এমন বিশ্বাসঘাতক ?'

—'ক্যাবলাকে বাড়িতে পাইনি। আর তোমার কথা আমাদের মনে ছিল না।'

—'মনে ছিল না ?'—টেনিদা চটে গেল। মুখটাকে বেগুনভাজার মতো করে বলল, 'ভালো কাজের সময় মনে থাকবে কেন ?—যা বেরো এখান থেকে, গেট আউট।'

আমি বললুম, 'আউট আবার কোথায় হব ? বেরুবার আর জায়গা কোথায় ? আমরা তো রাস্তাতেই দাঁড়িয়ে রয়েছি।'

টেনিদার মুখটা এবারে ধোঁকার ডালনার মতো হয়ে গেল। আরও ব্যাজার হয়ে বললে, 'ইচ্ছে করছে, দুই চড়ে তোদের দাঁতগুলোকে দাঁতনে পাঠিয়ে দিই। তা হলে মর গে যা—রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে কুকুর তাড়া গে।'

হাবুল বললে, 'না, কুকুর তাড়ামু না। তোমার কাছে আসছি।'

—'আমাকে তাড়াতে চাস ?'

—'বালাই, ষাইট। তোমারে তাড়াইব কেডা ? তুমি হইলা আমাগো লিডার—যারে কয় ছত্রপতি। তোমার কাছে অ্যাকটা নিবেদন আছিল।

—'ইস্, ছানার মুড়কি খেয়ে খুব যে ভালো-ভালো কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছে। টেনিদা একটা ভেংচি কাটল : 'তা, নিবেদন কী ?'

'আমরা মহিষাদলে যামু না। মইষে গুঁতাইয়া মারব।'

'যাসনে।' বাঘাটে গলায় টেনিদা বললে, 'লোকের বাড়ি-বাড়ি চেয়ে-চিন্তে খেয়ে বেরা। কাপুরুষ কোথাকার। কাওয়ার্ডস মেনি ডেথ ডাইজ—ইয়ে—টাইম—মানে বিফোর—'

আমি বললুম, 'উঁহু, ভুল হল। কাওয়ার্ডস ডাই মেনি ডেথস—'

ছানার মুড়কির রাগ টেনিদা ভুলতে পারছিল না, চিৎকার করে বললে, 'শাটাপ্! তোকে আর আমার ইংরিজী শুদ্ধু করতে হবে না—নিজে তো একত্রিশের ওপরে নম্বর পাস্ না। মরুক যে, কোথাও যেতে হবে না তোদের। আমি আর ক্যাবলা যাব, একটা দারুণ চক্রান্ত থেকে উদ্ধার করব কম্বলকে, বীরচক্র পুরস্কার পাব আর তোরা ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকবি। কম্বলের কাকা যখন খ্যাঁট দেবে, তখন পোলাওয়ের গন্ধে দরজায় তোরা ঘুরঘুর করবি, ঢুকতে দেবে না, পিটিয়ে তাড়িয়ে দেবে।'

এই বলে টেনিদা বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ল, তারপর ধড়াস করে বন্ধ করে দিল দোরটা।

তখন আমি আর হাবুল সেন এ ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম। আমি বললুম, 'বুঝলি হাবল, ব্যাপারটা রীতিমতো সঙ্গিন।'

হাবুল বললে, 'হ। টেনিদা যারে পুঁদিচ্চেরি কয়, তাই। কীরকম য্যান মেফিস্টোফিলিস মেফিস্টোফিলিস মনে হইত্যাছে।'

আমি বললুম, 'তা হলে তো যেতেই হয়, কী বলিস ?'

'হইবোই তো। বীরচক্র আমরাই বা পামু না ক্যান ? আর কম্বলের কাকা যখন অগো মাংস-পোলাউ খাওয়াইব—'

আমি ওকে থামিয়ে দিয়ে বললুম, 'আর বলিসনি, মেজাজ খারাপ হয়ে যাচ্ছে। দেখিস, আমরাও খাব, নিশ্চয় খাব।'

যা থাকে কপালে—পটলডাঙা জিন্দাবাদ! আমরা চারজন—সেই কথামতো—চক্রধরের দোকানের সামনে থেকে, বিন্দেবনের সঙ্গে, মহিষাদলে বেরিয়ে পড়েছি। বাড়িতে বলে এসেছি, রবিবারে এক বন্ধুর ওখানে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছি, সন্ধেবেলায় ফিরে আসব।

আসবার আগে মেজদা বলে দিয়েছে, 'পরের বাড়িতে গিয়ে মওকা পেয়ে যা-তা খাসনে। ওই তোর পিলে-পটকা শরীর, শেষকালে একটা কেলেঙ্কোরি বাধাবি।'

কী খাওয়া যে কপালে আছে—সে শুধু আমিই বুঝতে পারছি। কিন্তু বেঁচে থাকতে কাওয়ার্ড হওয়া যায় না—না হয় মোষের গুঁতোতেই প্রাণ দেব। আমি কেবল বললুম, 'আচ্ছা—আচ্ছা।'

'—আচ্ছা-আচ্ছা কী ? যদি পেটের গোলমাল হয়, তা হলে তোকে ধরে আটটা ইন্‌জেকশন দেব—সে-কথা খেয়াল থাকে যেন।'

বাড়ির ছোট ছেলে হওয়ার সব-চাইতে অসুবিধে এই যে, কোথাও কোনও সিমপ্যাথি পাওয়া যায় না। এমনি ভালোমানুষ ছোট্‌দি পর্যন্ত খ্যা-খ্যা করে হাসছিল। আমি চটে-মটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। এই সব অপমান সহ্য করার চাইতে মৃত্যুও ভালো।

পাঁশকুড়া লোক্যালে চেপে আমরা রওনা হয়েছি হাওড়া থেকে। বিন্দেবন বললে, 'আমাদের নামতে হবে মেচেদায়, সেখান থেকে বাসে করে তমলুক হয়ে মহিষাদল। শুনে যতদূর মনে হচ্ছে তা নয়—যেতে বেশি সময় লাগবে না।'

কিন্তু মেচেদা নাম শুনেই আমার কী-একটা ভীষণভাবে মনে পড়ছিল। একবার মামার সঙ্গে মেদিনীপুরে যাওয়ার সময়—এই মেচেদাতে—ঠিক ঠিক!

আমি বলে ফেললুম, 'খুব ভালো সিঙাড়া পাওয়া যায় কিন্তু!'

টেনিদার চোখ চকচক করে উঠল। কিন্তু বিন্দেবনের সামনে প্রেস্টিজ রাখবার

জন্যেই বোধহয়, দাঁত খিঁচিয়ে আমাকে ধমক দিলে একটা : 'এটা একটা রাক্ষস। রাতদিন কেবল খাই-খাই।

বিন্দেবনকে যতটা খারাপ লোক ভেবেছিলুম, দেখলুম সে তা নয়। মিটমিট করে বললে, 'তা ছেলেমানুষ, খিদে তো পেতেই পারে। খাওয়াব খোকাবাবু—মেচেদার সিঙাড়া খাওয়াব, কিচ্ছুটি ভাবতে হবে না। তারপর কলেজের ছেলে হয়েও তোমরা যখন আমাদের দলে এয়েছ, তখন তো মাথার মণি করে রাখব তোমাদের।'

'দলে এয়েচ!' এই কথাটাই আমার কেমন ভালো লাগল না। মনে পড়ল মা নেংটীশ্বরীর সেই মূর্তি—যেন দাঁত বের করে কামড়াতে আসছে। মনে পড়ল, হঠাৎ সেই 'ম্যাও-ম্যাও' এসে হাজির—চারিদিকে কী রকম সামাল-সামাল রব। এদের পাল্লায় পড়ে কোথায় চলেছি আমরা? কী আছে আমাদের কপালে?'

টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম। হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে রয়েছে। বীরচক্র পাবার জন্যে তখন খুব লাফালাফি করছিল বটে, কিন্তু এখন যেন কেমন ভেবড়ে গেছে বলে মনে হল। হাবুলকে বোধহয় গাড়ির বেঞ্চিতে ছারপোকায় কামড়াচ্ছিল—সেই বিক্রমসিংহই কি না কে জানে—সে কিছুক্ষণ পা-টা চুলকে হঠাৎ বিচ্ছিরি গলায় গান ধরল :

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি—সকল দেশের রানী—' ইয়ে 'একবার খুব জোরে গা চুলকে প্রায় দাপিয়ে উঠল : 'ইস্—কী কামড়াইতেছে রে। 'সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি—'

তার গান আর গা চুলকোনোতে প্রায় খেপে গেল টেনিদা। চেঁচিয়ে বললে, 'জন্মভূমি না তোর মুণ্ডু। চুপ কর বলছি হাবলা, নইলে জানালা গলিয়ে বাইরে ফেলে দেব তোকে।'

বিন্দেবন বললে, 'আহা দাদাবাবু তো ভালোই গাইছেন! থামিয়ে দিচ্ছেন কেন?

তা হলে হাবুলের গানও কারও ভালো লাগে। হাবুল এত আশ্চর্য হল যে, গা চুলকোতে পর্যন্ত ভুলে গেল। ক্যাবলা একটা ওয়াইড ওয়ার্লড ম্যাগাজিন পড়ছিল, সেটা খসে পড়ল তার হাত থেকে। টেনিদা বললে, 'কী ভয়ানক!'

বিন্দেবন জানলার বাহিরে মুখ বাড়িয়ে বললে, 'এই যে, কোলাঘাট এসে গিয়েচে। এর পরেই আমরা পৌঁছে যাব মেচেদায়।'

৯

মেচেদার সিঙাড়া-টিঙাড়া খেয়ে, সেখান থেকে বাসে করে তমলুক পৌঁছনো গেল। সেখান থেকে আবার বাস বদলে মহিষাদলে।

নাম শুনে যে-রকম ভয়-টয় ধরে যায়, গিয়ে দেখলুম আদৌ সে-রকম নয়। বরং বেশ ছিমছাম জায়গাটা—দেখে-টেখে ভালোই লাগে। খুব বড় একটা রাজার বাড়ি আছে, একটা উঁচু রথ আছে, বাজার আছে, অনেক লোকজন আছে। মানুষগুলোকেও তো বেশ সাদা-মাটা মনে হল, কোথাও যে কোনও ঘোর-প্যাঁচ আছে সেটা বোঝা গেল না। আর একটা মোটে মোষ দেখতে পেলুম, একজন তার গলায় দড়ি বেঁধে নিয়ে যাচ্ছিল, সুড়সুড় করে চলে যাচ্ছিল, আমাদের দেখে সে মোটেই গুঁতোতে চাইল না।

বিন্দেবন তিনটে রিকশা ডাকল। বললে, 'তা হলে চলুন, একেবারে মালখানাতেই যাওয়া যাক।'

টেনিদা বললে, 'মালখানা? সে আবার কোথায়?'

বিন্দেবন বললে, 'দেখা নেই তো সব। চন্দ্রকান্তদার সঙ্গে সেখানেই দেখা হবে। তিনি মালপত্তর সব দেখিয়ে দেবেন। তারপর কলকাতায় কোথায় আপনারা ডেলিভারি নেবেন, সে-সবও ওখানেই ঠিক হয়ে যাবে।'

মালপত্তর। আমি আর ক্যাবলা একটা রিকশায় চেপে বসেছিলুম। মালপত্তর শুনেই আমার কীরকম যেন বিচ্ছিরি লাগল, সেই শেয়ালপুকুরের কথা মনে পড়ে গেল, মনে পড়ল সেই ম্যাও ম্যাও আসবার কথা, আমি ক্যাবলাকে চিমটি কাটলুম একটা।

ক্যাবলা আমাকে পালটা এমন আর-একটি চিমটি কাটল যে আমি প্রায় চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে সামলে নিলুম। ক্যাবলা আমার কানে-কানে বললে, 'এখন চুপ করে থাক না—গাধা কোথাকার।'

চিমটি আর গাধা শব্দ এ-অবস্থাতে আমাকে হজম করে নিতে হল—কী আর কথা। সব ব্যাপারটাই এখন এমন ঘোলাটে মনে হচ্ছে যে আমি গাধার মতোই চুপ করে বসে রইলুম। অবিশ্যি গাধা যে সব সময়ে চুপচাপ বসে থাকে তা নয়—মনে একটু ফুরতি-টুরতি হলেই বেশ দরাজ গলায় 'প্যাঁহোঁ হ্যাঁ হোঁ' বলে তারস্বরে গান গাইতে থাকে। আমার গলায় টান-টান শুকিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু—

কিন্তু কুঁই কুঁই করে কেমন একটা বেয়াড়া গানের আওয়াজ আসছে না? আসছেই তো। তাকিয়ে দেখলুম, সামনের রিকশাতে বসে গান ধরেছে তালঢ্যাঙা বিন্দেবন।

'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভালো—'

এ যে দেখছি গানের একেবারে গন্ধর্ব। আমার চাইতেও সরেস, হাবলার ওপরেও এক কাঠি। এমন ভালো গানটারই বারোটা বাজিয়ে দিলে। তা ছাড়া এমন সকালের রোদ্দুরে চাঁদের আলোই বা পেলে কোত্থেকে! সেই চাঁদের আলোয় বিন্দেবন আবার মরতেও চাইছে। তা নিতান্তই যদি মরতে চায়, তা হলে নয় মারাই যাক, আমরাও ওর জন্যে শোকসভা করতে রাজি আছি, কিন্তু সে-জন্যে অমন চামচিকের মতো গলায় গান গাইবার মানে কী? নিজে এমন গাইয়ে বলেই বোধহয় সে হাবলার গানের তারিফ করছিল।

রিকশা বেশ ঠনুঠুন করে নিরিবিলি রাস্তা দিয়ে এগোচ্ছিল। দু-দিকে বাড়ি-টাড়ি আছে, গাছপালা, মাঠ এইসব আছে, ভারি সুন্দর হাওয়া দিয়েছে, আকাশটা যেন নীল চোখ মেলে চেয়ে রয়েছে, এদিকে আবার একটা খালের জল রোদে ঝিলমিল করে উঠছে। বিন্দেবনের মনে ফুর্তি হতেই পারে, কিন্তু তাই বলে—

আমি আর থাকতে পারলুম না। ক্যাবলাকে জিজ্ঞেস করলুম, 'চামচিকের গান শুনেছিস কখনও ?'

ক্যাবলা বললে, 'না।'

'তা হলে ওই শোন। বিন্দেবন গান গাইছে।'

ক্যাবলা বললে, 'চামচিকে তো তবু ভালো। তুই গান গাইলে তো মনে হয় যেন হাঁড়িচাঁচা ডাকছে। এখন আর ইয়ার্কি করিসনে প্যালা—অবস্থা খুব সঙ্গিন। আমরা দারুণ বিপদের মধ্যে পড়তে যাচ্ছি।'

দারুণ বিপদ। শুনেই আমি খাবি খেলুম। বিন্দেবনের গান শুনে, সবুজ, মাঠ, নীল আকাশ আর ঝিরঝিরে হাওয়ার ভেতরে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ক্যাবলা আমাকে এমন দমিয়ে দিলে যে বুকের ভিতরটা ধড়ফড় করতে লাগল।

চিঁ চিঁ করে বললুম, 'কী বিপদ ?'

'একটু পরেই জানতে পারবি।'

'তা হলে আমরা রিকশা চেপে কেন যাচ্ছি বিন্দেবনের সঙ্গে ? নেমে পড়ে সোজা চম্পট দিলেই তো পারি। ইচ্ছে করে কেন পা বাড়াচ্ছি বিপদের ভেতর ?'

ক্যাবলা আরও গম্ভীর ভাবে বললে, 'আর ফেরবার পথ নেই। এখন একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু ওসপার করে কী লাভ ? এসপারে থাকলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়।'

—'তা যায় কিন্তু কম্বলকে তা হলে পাওয়া যাবে কী করে ?'

ঠিক কথা। ওই লক্ষ্মীছাড়া কম্বল। যত গণ্ডগোল ওকে নিয়েই। মাস্টারের ভয়ে পালালি তো পালালি—আবার বিটকেল একটা ছড়া লিখে গেলি কী জন্যে ? চাঁদে গেছে না হাতি। সেই-যে কারা সব 'নরমাংস' খায়, তাদের ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছে, আর তারা কম্বলকে দিয়ে অম্বল বেঁধে খেয়ে বসে আছে।

কিন্তু কম্বলকে কি কেউ খেয়ে হজম করতে পারবে ? আমার সন্দেহ হল। ও ঠিক বাতাপি কিংবা ইম্বলের মতো তাদের পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসবে। যেদিন কম্বল কোত্থেকে দুটো গুবরে পোকা এনে আমার শার্টের পকেটে ছেড়ে দিয়েছিল, সেদিন থেকেই ওকে আমি চিনে গেছি।

এই সব ভাবছি, হঠাৎ ক্যাবলা আমার কানে কানে বললে, 'প্যালা।'

আমি দারুণ চমকে গিয়ে বললুম, 'আবার কী হল ?'

—এই যে খালের ধার দিয়ে আমরা যাচ্ছি, এ দেখে কিছু মনে হচ্ছে না তো ?'

—'কী আবার মনে হবে ?'

ক্যাবলা আরও ফিসফিস করে বললে, 'আভিতক তুম্ নেহি সমঝা ? আরে,'

সেই যে ছড়াটা, 'ছল ছল খালের জল—'

ঠিক ঠিক। 'নিরাকার মোষের দল'—মানে 'মোষ-টোষ' বিশেষ কিছু নেই অথচ 'মহিষাদল' আছে, আর দেখাতেই 'ছল ছল'—আরে অক্ষরে-অক্ষরেই মিলে যাচ্ছে যে !

ক্যাবলা মিটমিট করে হেসে বললে 'কী বুঝছিস ?'

—'কিছুই না।'

—'তোর মাথা তো মাথা নয়, যেন একটা খাজা কাঁটাল।' চশমাপরা নাকটাকে কুঁচকে, মুখখানাকে স্রেফ আমড়ার চাটনির মতো করে ক্যাবলা বললে, 'এটাও বুঝতে পারছিস না ? এবার রহস্য প্রায় ভেদ হয়ে এল।'

—'কিন্তু ভেদ করবার পরে আমাদের অবস্থা কী হবে ? আমাদের সুদ্ধ ভেদ করে দেবে না তো ?'

—'দেখাই যাক। আগেই ঘাবড়াচ্ছিস কেন ?'

বলতে বলতে রিকশা থেমে গেল। সামনেই একটা হলদে দোতলা বাড়ি। তার নাম লেখা আছে বড়-বড় হরফে : 'চন্দ্র নিকেতন।'

রিকশা থেকে নেমে বিন্দেবন ডাকতে লাগল : 'আসুন দাদাবাবুরা, নেমে আসুন। এই বাড়ি।'

ক্যাবলা আবার আমার কানে-কানে বললে, 'এইবারে শেষ খেল—বুঝেছিস ? বাড়ির নাম চন্দ্র নিকেতন—অর্থাৎ কিনা—'চাঁদে চড়—চাঁদে চড়।' এইটেই তা হলে শ্রীকম্বলের সেই চাঁদ।'

—'কম্বলের চাঁদ ! এইখানে ?'—আমি কিছুই বুঝতে পারলুম না।

ক্যাবলা বললে, 'বোকার মতো বসে আছিস কী ? টেনিদা, হাবলা আর বিন্দেবন যে ভেতরে চলে গেল। নেবে আয়—নেবে আয়—'

ওদিক থেকে বিন্দেবনের হাঁক শোনা গেল : 'অ রিকশোওলারা—একটু দেঁইড়ো যাও, আমি এক্ষুনি তোমাদের পয়সা এনে দিচ্ছি।'

বিন্দেবন একটা মস্ত ঘরের ভেতর আমাদের নিয়ে বসাল।

ঘরের আধখানা জুড়ে ফরাস পাতা—তার ওপর শাদা চাদর বিছানো। বাকি আধখানায় মস্ত একটা দাঁড়ি-পাল্লা আর কতগুলো কিসের বস্তা যেন সাজানো রয়েছে। একটা ছোট্ট কুলুঙ্গিতে সিঁদুর-মাখানো গণেশের মূর্তি। দেওয়ালে একটা রঙিন ক্যালেন্ডার রয়েছে—তাতে লেখা আছে 'বিখ্যাত মশলার দোকান—শ্রীরামধন খাঁড়া, খড়্গপুর বাজার, মেদিনীপুর।' দেওয়ালে আবার দু'তিন জায়গায় সিঁদুর দিয়ে লেখা রয়েছে 'জয় মা'। মা যে কে ঠিক বুঝতে পারলুম না, বোধ হল নেংটীশ্বরীই হবেন। কিন্তু এ-সব 'জয় মা' আর 'খাঁড়া টাঁড়া' আমার একদম ভালো লাগল না, বুকের ভেতরটায় কী রকম ছ্যাঁৎ করে উঠল, একেবারে পাঁঠাবলির কথা মনে পড়ে গেল।

আমরা চারজনে বসে আছি। ক্যাবলা গম্ভীর, টেনিদা, মিট-মিট করে তাকাচ্ছে এদিক-ওদিক, হাবুল এক মনে পা চুলকোচ্ছে—বোধহয় ট্রেনের ছারপোকাগুলো

ঢুকে আছে ওর জামাকাপড়ের তলায়। আমি ভাবছি, ওই খাঁড়া-টাড়া দিয়ে ওরা 'জয় মা' বলে কম্বলকে বলি দিয়েছে কি না, এমন সময়—

দু'জন লোক ঘরে এল। বেশ ভালো মানুষের মতোই তাদের চেহারা, তার চাইতেও ভালো তাদের হাতের প্লেট নামিয়ে দিয়ে বলা, 'একটু জলযোগ করুন বাবুরা, কত্তা এখনি আসছেন।'

মেচেদার সিঙাড়া এর মধ্যেই যখন তলিয়ে গিয়েছিল, আমরা খুশি হয়েই কাজে লেগে গেলুম। প্লেটে তিন-চার রকমের মিষ্টি, কাজু বাদাম, কলা। মোতিচুরের লাড্ডুতে কামড় দিয়েই আবার আমার মনটা ছটফটিয়ে উঠল। বলির পাঁঠাকেও তো বেশ করে কাঁটাল পাতা-টাতা খাওয়ায়। এরাও কি—

আমি বললুম, 'ক্যাবলা—এরা—'

ক্যাবলা কেবল ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বললে, 'চুপ!'

এর মধ্যেই দেখলুম টেনিদা হাবুলের প্লেটের থেকে কী একটা খপ করে তুলে নিলে। আর তুলেই গালে পুরুল। হাবুল চ্যাঁ-চ্যাঁ করে কী যেন বলতেও চাইল, সঙ্গে-সঙ্গেই তার মাথায় বাঁ-হাত দিয়ে ছোট্ট একটা গাঁট্টা মারল টেনিদা।

—'যা-যা, ছেলেমানুষের বেশি খেতে নেই। অসুখ করে।'

একটা শান্তিভঙ্গ ঘটতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনই ঘরে ঢুকল বিন্দেবন। আর পেছনে যিনি ঢুকলেন—'

বলবার দরকার ছিল না, তিনি কে। তাঁর নাকের দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারলুম। আমাদের টেনিদার নাক চেয়ে দেখবার মতো—আমরা সেটাকে মৈনাক বলে থাকি, কিন্তু এর নাকের সামনে কে দাঁড়ায়। প্রায় আধ-হাতটাক লম্বা হবে মনে হল আমার—এ-নাক দিয়ে দস্তুরমতো লোককে গুঁতিয়ে দেওয়া চলে।

আধ-বুড়ো লোকটা চকচকে টাক আর কাঁচা পাকা গোঁফ নিয়ে এক গাল হাসল। সে-হাসিতে নাকটা পর্যন্ত জ্বল-জ্বল করে উঠল তার। বললে, 'দাদাবাবুরা দয়া করে আমার বাড়িতে এয়েচেন, বড্ড আনন্দ হল আমার। অধমের নাম হচ্ছে চন্দ্রকান্ত চাঁই—এঁরা আদর করে আমায় নাকেশ্বর বলেন।'

টেনিদা আবার কী-একটা হাবুলের প্লেট থেকে তুলে নিয়ে গালে চালান করল। তারপর ভরাট-মুখে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমাদেরও ভারি আনন্দ হল।'

চন্দ্রকান্ত ফরাসে বসে পড়ে বললে, 'অল্প বয়সেই আপনারা ব্যবসা-বাণিজ্যে মন দিয়েচেন। এ ভারি সুখের কথা। দিনকাল তো দেখতেই পাচ্ছেন। চাকরি-বাকরিতে আর কিচ্ছু নেই, একেবারে সব ফক্কা! এখন এই সব করেই নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আমাদের বিটকেলানন্দ গুরুজী সেই জন্যেই আমাদের মন্তর দিয়েছেন: 'ধনধাত্রী মা নেংটীশ্বরী, তোমারই ল্যাজ পাকড়ে ধরি।'—আহা!'

শুনেই বিন্দেবনের চোখ বুজে এল। সেও বললে, 'আহা-হ!'

চন্দ্রকান্ত বলে চলল, 'মা নেংটীশ্বরীর অপার দয়া যে আপনারা এই বয়েসেই মা-র ল্যাজে আশ্রয় পেলেন। জয় মা!'

বিন্দেবনও সঙ্গে-সঙ্গেই বলে উঠল: 'জয় মা!' তাই দেখে আমরা চারজনও বললুম, 'জয় মা!'

আমরা তিনজন ভালোই খেয়ে নিয়েছিলুম এর ভেতর, কেবল হাবুল সেন হাঁড়ির মত মুখ করে বসে ছিল।

টেনিদা খেয়ে-দেয়ে খুশি হয়ে বললে, 'আপনাদের এখানে তো বেশ ভালোই মিঠাই পাওয়া যায় দেখছি। মানে, কলকাতায় আমরা তো বিশেষ পাই-টাই না—মানে ছানা-টানা বন্ধ—'

চন্দ্রকান্ত বললে, 'বিলক্ষণ! আমাদের এখানকার মিষ্টি তো নাম-করা। আরও কিছু আনাব?'

টেনিদা ভদ্রতা করে বললে, 'না—মানে, ইয়ে—এই হাবুল একটা চমচম খেতে চাইছিল—'

—'নিশ্চয়-নিশ্চয়', চন্দ্রকান্ত ব্যতিব্যস্ত হয়ে ডাকল, 'ওরে বিধু, আরও ক'টা চমচম নিয়ে আয়। আরও কিছু এনো।'

'চন্দরদা, এত আদর করে খাওয়াচ্ছ কাকে?'—বাজখাঁই গলায় সাড়া দিয়ে আর একটি লোক ঘরে ঢুকল। হাতকাটা গেঞ্জির নীচে তার চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি, ডুমো ডুমো হাতের মাস্‌ল, ছাঁটা ছাঁটা ছোট চুল, করমচার মতো টকটকে লাল তার চোখের দৃষ্টি।

চন্দ্রকান্ত বললে, 'এঁরা কলকাতা থেকে এয়েচেন—ছড়া বলেচেন—আমাদের হেড আপিসে গিয়েচেন—'

সেই প্রকাণ্ড জোয়ান লোকটা হঠাৎ ঘর ফাটিয়ে একটা হুঙ্কার করল। বললে, 'চন্দরদা, সর্বনাশ হয়েছে। এরা শত্রু।'

আমরা যত চমকালুম, তার চাইতেও বেশি চমকাল চন্দ্রকান্ত আর বিন্দেবন!—শত্রু!'.

'আলবাত!'—দাঁতে দাঁতে কিশ কিশ করতে করতে একটা রাক্ষসের মতো আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে লাগল জোয়ানটা: 'আমি খগেন মাশ্চটক—আমার সঙ্গে চালাকি। এরা সেই পটলডাঙার চারজন—চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে থাকে, আমার সেই বিচ্ছু ছাত্র কম্বলকে এদের পিছে-পিছেই আমি ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি!'—করমচার মতো চোখ দুটোকে বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে খগেন মাশ্চটক বললে, 'এত বড় এদের সাহস যে আজ একেবারে বাঘের গর্তে এসে মাথা গলিয়েছে। আজ যদি আমি এদের পিটিয়ে মোগলাই পরোটা না করে দিই, তা হলে আমি মিথ্যেই স্বামী বিটকেলানন্দের চ্যালা।'

১০

একেই বলে আসল পরিস্থিতি—টেনিদার ভাষায় বলা—'পুঁদিচ্চেরি।

ঘরের ভিতরে বাজ পড়েছে—এই রকম মনে হল। চন্দ্রকান্ত আর বিন্দেবন হাউমাউ করে উঠল, আমরা চারজন একেবারে চারটে জিবেগজার মতো ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে রইলুম। আর পাকা করমচার মতো খুদে-খুদে লাল চোখ দুটোকে বনবন করে ঘোরাতে ঘোরাতে খ্যাপা মোষের মতো চেঁচাতে লাগল সেই ভয়ঙ্কর জোয়ান খগেন মাশ্চটক।

আর এতক্ষণে আমার মনে হল, এই মোষের মতো খগেনটা আছে বলেই জায়গাটার বোধহয় নাম হয়েছে মহিষাদল। সেই সঙ্গে আরও মনে পড়ল, আজ সকালে বাড়ি থেকে বেরুবার সময় কেন যেন খামকাই আমার বাঁ কানটা কটকট করছিল। তখনই বোঝা উচিত ছিল, আজ একটা যাচ্ছেতাই রকমের কিছু ঘটে যাবে।

আমরা পটলডাঙার চারজন—বিপদে পড়লে কি আর ভয়-টয় পাই না ? আমি যখন আগে ছোট ছিলুম, পেট-ভর্তি পিলে নিয়ে প্রায় জ্বরে পড়তুম, তখন, রাত্তিরে জানালার বাইরে একটা হুতুম প্যাঁচা হুমহাম করে ডেকে উঠলেও, ভয়ে আমার দম আটকে যেত। তারপর বড় হলুম, দু-একটা ছোটখাটো অ্যাডভেঞ্চার জুটে গেল বরাতে। তখন দেখতে পেলুম, বিপদে ঘাবড়ে যাবার মতো বেকুবি আর কিছু নেই। তাতে বিপদ কমে না—বরং বেড়েই যায়। তার চাইতে মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভাবতে হয়, এখন কী করা যায়—কী করলে সব চাইতে ভালো হয়। তা ছাড়া আরও দেখেছি—যারা আগ বাড়িয়ে ভয় দেখাতে আসে, তারা নিজেরাই মনে মনে ভীরু। পিঠে সোজা করে, বুক টান করে, মনে জোর নিয়ে রুখে দাঁড়ালে তারাই অনেক সময় পালাতে পথ পায় না।

আমি দলের তিনজনের দিকে চেয়ে দেখলুম। আমার বুকটা একটু দুরদুর করছিল, হাবুল পা চুলকোতে-চুলকোতে আমার কানে-কানে ফিসফিস করে বলল, 'এখন একটা মজা করব, চুপ কইর‍্যা বইস্যা থাক।' ক্যাবলার হাতে একটা ঘড়ি ছিল, সে বার বার তাকাচ্ছিল তার দিকে। আর আমাদের টেনিদা—বিপদ এলেই যে সঙ্গে-সঙ্গে লিডার হয়ে যাবে—আমি দেখলুম, সে এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে খগেনের দিকে, আর একটু একটু করে শার্টের আস্তিন তুলছে ওপরদিকে।

তখন আমার মনে পড়ল—টেনিদা বক্সিং জানে, 'জুডো —মানে জাপানী কুস্তিটাও সে শিখে নিয়েছিল গত বছর ; তখুনি আমর বুকের ধুকধুকুনি থেমে গেল খানিকটা। বুঝতে পারলুম, খগেন মাশ্চটক যত সহজে আমাদের পিটিয়ে পরোটা করতে চাইছে, ব্যাপারটা অত সোজা হবে না। আর যদি টেনিদা একা ওকে সামাল দিতে না পারে, আমরা তিনজন তো আছি, এক সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়ব খগেনের

ওপর। যদি কিছু অঘটন ঘটেই যায়—ওই মোষের মতো খগেনটার ঘুষি-টুষি খেয়ে—আমি, রোগা-পট্‌কা প্যালারাম যদি বেমক্কা মারাই যাই, তাতেই বা কী আসে যায়। একবার বই তো দু'বার মরব না ! ভয় পেয়ে, কেঁচোর অধম হয়ে মাটিতে মুখ লুকিয়ে, বেঁচে থাকার চাইতে মরে যাওয়া ঢের ভালো।

আমি বুঝতে পারছিলুম—আমরা বাঘের গর্তে পা-ই দিই আর যা-ই করি, আমাদের চাইতেও ঢের বেশি ঘাবড়েছে বিন্দেবন-চন্দ্রকান্তের দলবল। খগেন লম্ফঝম্ফ করে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিল, চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরই হাত বাড়িয়ে তাকে আটকে দিলে। 'আহা-হা, আগে থেকেই অমন মার মার করচ কেন হে খগেন ? এঁয়ারা তো দেখচি ভদ্দরলোকের ছেলে সব—শত্রু হতে যাবেন কী করে ? বিত্তেন্তটা একবার খোলসা করে বলো দিকি।'

'বৃত্তান্ত আমার মাথা আর মুণ্ডু !'—খগেন গাঁ গাঁ করে উঠল।—'কলকাতায় আমি একটা বিচ্ছু ছেলেকে পড়াতে গিয়েছিলুম একদিন—তার নাম কম্বল। অমন হতচ্ছাড়া ঊনপাঁজুরে ছেলে দুনিয়ায় আর দুটো হয় না। গিয়ে তাকে পাঁচটা শক্ত শক্ত অঙ্ক কষতে দিয়ে বললুম, এগুলো চটপট করে ফ্যাল—কাল সারা রাত পাড়ার জলসায় গান শুনে আমার গা ম্যাজম্যাজ করছে, আমি আধ ঘণ্টা ঝিমিয়ে নিই। ঘুম ভেঙে যদি দেখি অঙ্ক হয়নি, তা হলে একটি কিলে তোকে একটা কোলা ব্যাং বানিয়ে দেব। বলেই ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙতে একটু দেরিই হয়ে গেল। জেগে দেখি, ঘরে কম্বল নেই, একটা অঙ্কও সে কষেনি। উঠে হাঁকডাক করতে তার কাকা এসে বললে, কম্বলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না—তোমাকে দেখেই সে নিরুদ্দেশ হয়েছে।'

আমরা কান খাড়া করে শুনতে লাগলুম। বিন্দেবন বললে, 'তাপ্পর ?'

—'তারপর আমার পকেটে হাত দিয়েই বুঝতে পারলুম, হতভাগা ছেলে আমার পকেট হাঁটকেছে। একটা কমলালেবু রেখেছিলুম খাব বলে—সেটা নেই, তার বদলে কাগজে মোড়া দুটো আরশোলা। আর সাংকেতিক কবিতা লেখা আমাদের কাগজটা, তাতে কালির দাগ-টাগ লাগা—নিশ্চয়ই কিছু করেছে সেটা নিয়ে। এখন বুঝতে পারছি, ছড়াটা নকল করে সে এদের হাতে দিয়েছে, আর এরা তাই থেকে খুঁজতে-খুঁজতে হাজির হয়েছে এখানে।

আমরা চারজনে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলুম।

চন্দ্রকান্ত বললে, 'কিন্তু এঁয়ারা যে বললে রসিদ-টসিদ—'

—'একদম বাজে কথা, এরা রসিদ কোথায় পাবে ? এ-চারটেকে আমি পটলডাঙায় চাটুজ্যেদের রকে বসে পাকৌড়ি-ডালমুট খেতে দেখেছি। আর কম্বলটাও এদের পেছনে প্রায় ঘুরঘুর করত। চন্দরদা, আর দেরি নয়, তুমি পারমিশন দাও—আমি আগে এদের আচ্ছা করে ঠেঙিয়ে নিই। তারপরে—হাতের সুখ হয়ে গেলে—পোড়ো বাড়িটার ঠাণ্ডি গারদে সাত দিন আটকে রাখা যাক, কাঁকড়াবিছে আর চামচিকের সঙ্গে ক'দিন কাটাক—ব্যাস, দুরস্ত হয়ে যাবে। এর মধ্যে এখানকার মালপত্তর সরিয়ে দাও—শেয়ালপুকুরের আস্তানায় খবর পাঠাও।'

চন্দ্রকান্ত তার প্রকাণ্ড নাকটা চুলকে বললে 'কিন্তুক খগেন—'

'—কিন্তু পরে হবে, আগে আমি এদের দেখছি—'

যমদূতের মতো এগিয়ে এল খগেন। বিন্দেবন বললে, 'ওরে তোরা সব দেখছিস কী। দরজাগুলো বন্দ করে দে—'

অর্থাৎ খাঁচায় বন্ধ করে ইঁদুর মারবার বন্দোবস্ত।

আর তক্ষুনি দাঁড়িয়ে উঠল টেনিদা। ঘর কাঁপিয়ে সিংহনাদ ছাড়ল : বুঝে-সুঝে গায়ে হাত দেবেন মশাই, নইলে—'

'—ওরে, এ যে বুলি ঝাড়ছে!' খগেন মাশ্চটকের দাঁত কিচ কিচ করে উঠল : 'তাহলে এইটেকেই আগে মেরামত করি। বাকিগুলো তো ছারপোকা, এক-একটা টিপুনি দিয়েই ম্যানেজ করে ফেলব।'

বলেই, খগেন টেনিদার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

সেই লম্বা ঘরটার ভেতরে—যেখানে দেওয়া ভর্তি করে 'জয় মা' আর 'খাড়া-টাঁড়া' এই সব লেখা রয়েছে, দেখতে-দেখতে তার ভেতরে যেন ভীম আর জরাসন্ধের যুদ্ধ বেধে গেল। আমরা সরে এলুম দেওয়ালের একদিকে—বিন্দেবনের দল আর-এক দিকে। খগেন টেনিদাকে জাপটে ধরতে গিয়েও পারল না—বক্সিংয়ের সাইড স্টেপিং করে সে চট করে সরে গেল একদিকে, আর দু'হাতে খানিক বাতাস জাপটে ধরে মুখ থুবড়ে পড়তে-পড়তে সামলে গেল খগেন।

টেনিদা ঠাট্টা করে বললে, 'আহা, মাশ্চটক মশাই-ফসকে গেল বুঝি?'

রাগে খগেনের মুখটা নিটোল একটা খাজা কাঁটালের মতো হয়ে গেল। লাল করমচার মতো চোখ দুটোকে ঘোরাতে ঘোরাতে খগেন বললে, 'অ্যাঁ—আবার এয়ার্কি হচ্ছে। আমি খগেন মাশ্চটক, আমার সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি! আমি যদি এক্ষুনি তোকে চটকে আলুসেদ্ধ বানিয়ে না দিই তো'—খগেন আবার ঝাঁপ মারল।

আর তক্ষুনি বোঝা গেল টেনিদা কী, আর আমরাই বা তাকে লিডার বলে মেনে নিয়েছি কেন। এবার খগেন টেনিদাকে চেপে ধরল আর ধরার সঙ্গে-সঙ্গেই সে ইলেকট্রিক কারেন্টের শক খেলো একটা। জাপানী জুডোর একটা মোক্ষম প্যাঁচে দড়াম করে তিন-হাত দূরে ছিটকে পড়ল খগেন—চিৎপটাং। আর তার গলা দিয়ে বেরুল বিটকেল এক আওয়াজ : গাং!

ঘরসুদ্ধ লোক একদম চুপ। চন্দ্রকান্ত, বিন্দেবন, দুটো চাকর—চোখ কপালে তুলে পাথর হয়ে রইল। টেনিদা বললে, 'কী মাশ্চটক মশাই, আমাকে মেরামত করবেন না?'

খগেন মাশ্চটক একবার ওঠবার চেষ্টা করেই আবার ধপাৎ করে শুয়ে পড়ল। কেবল বললে, 'গাং—ওফ্-ফ।'

হঠাৎ বিন্দেবন লাফিয়ে উঠল : 'চন্দর দা—দেখচ কী? এরা খুদে ডাকাতের দল। খগেনের মতো অত বড় লাশকেও অমন করে শুইয়ে দিলে? আমি দলের আরও লোকজন ডাকি—সবাই মিলে ওদের—'

টেনিদা আস্তিন গুটিয়ে বললে, 'কাম অন—'

সঙ্গে-সঙ্গে আমরা তিনজনও লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলুম লিডারের পাশে। বললুম, 'কাম অন—কাম অন—'

হাবুল আমার কানে-কানে বললে, 'অখন আরও মজা হইব।'

ঠিক তখন—

ঠিক তখন বন্ধ দরজার গায়ে ঝনঝন করে ঘা পড়ল। কে যেন মোটা গলায় ডাক দিয়ে বললে, 'পুলিশ—শিগগির দরজা খোলো—'

১১

'চাঁদ-চাঁদনি'র রহস্য তো বোঝা গেল। আসলে চোরাকারবারীর এক বিরাট দল—ওই ছড়াই হল ওদের সাংকেতিক বাক্য। ছড়া বলতে পারলে আর চক্রধর সামন্তের দোকানে একবার গিয়ে পৌঁছতে পারলেই ওরা তাকে চিনে নেয় নিজের লোক বলে। তারপরে সব একসুতোয় গাঁথা। শেয়ালপুকুরের বাড়ি, গুরু বিটকেলানন্দ, দেবী নেংটীশ্বরী সব জলের মতো সোজা। ম্যাও ম্যাও যে কেন হানা দেয়, কেন ঝোল্লা গোঁফ আর আব নিয়ে চক্রধর কম্বলের তলায় শুয়ে পড়ে—সব পরিষ্কার। তারপর 'ছল ছল খালের জল, নিরাকার মোষের দল' থেকে একেবারে মহিষাদল—একদম আদত ঘাঁটিতে।

সব রহস্যের সমাধান। জিয়োমেট্রিতে যাকে বলে 'কিউ-ই-ডি'—অর্থাৎ কিনা—'ইহাই উপপাদ্য বিষয়'।

ক্যাবলা আগে থেকেই হুঁশিয়ার। তার যে মামা পুলিশে চাকরি করে, গোড়াগুড়িই তাঁকে সব খবর সে জুগিয়ে যাচ্ছিল। তিনি শুনে বলেছিলেন, 'হুঁ বদমায়েসদের একটা গ্যাং আছে। এবার ধরে ফেলব। তোরা চালিয়ে যা ওদের সঙ্গে। আমি পেছনে লোক রাখব। তা ছাড়া মহিষাদলেও পুলিশকে খবর দিয়ে রেখেছি।'

এমন কি পাঁশকুড়ো লোকালে, ঠিক আমাদের পাশের কামরায় বসে বৈরাগী-বৈরাগী চেহারায় যে-ভদ্রলোক মধ্যে-মধ্যে ট্রেনের বাইরে গলা বাড়িয়ে গেয়ে উঠছিলেন : 'হরিনাম বলো রে, নিতাই-গৌর ভজো রে'—তিনি নাকি আমাদের ওয়াচ করছিলেন। 'চন্দ্র নিকেতন' পর্যন্ত দূর থেকে আমাদের ফলো করেছিলেন এবং চন্দ্রকান্ত নাকেশ্বরের ঘরে যখন টেনিদা খগেন মাশ্চটককে 'কীচক বধ' করে ফেলেছে, তখন তিনিই থানা থেকে পুলিশ নিয়ে চলে এসেছিলেন।

পুলিশের লোকেরা ওদের তো দলটল সুদ্ধ ধরে ফেলল, তারপর চন্দ্রকান্তের বাড়ি থেকে অনেক রকম কী সব লুকনো জিনিস-টিনিসও পেল; আর আমাদের

কী বলল ? সে-সব শুনলে তোমাদের হিংসে হবে। আমরা তো লজ্জায় কান-টান লাল করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর পুলিশের দারোগা টেনিদার হাত-টাত ঝাঁকিয়ে বললেন, 'তুমি তো দেখছি ছোকরা রীতিমতো গ্রেট্‌ম্যান। অত বড় একটা তিন মনী জোয়ানকে তক্তাপাট করে দিলে—অ্যাঁ। তোমরাই হচ্ছ দেশের গৌরব—তোমাদের মতো ছেলেই এখন দরকার।'

শুনে, টেনিদার মৈনাকের মতো উঁচু নাকটা বিনয়ে কীরকম যেন ছোট একটা সিঙাড়ার মতো হয়ে গেল। আমার কানে-কানে বললে, 'জানিস প্যালা—খগেন মাশ্চটককে জুডোর প্যাঁচ কষিয়ে কীরকম খিদে পেয়ে গেল। পেটের ভেতরে চুঁই চুঁই করছে।'

আমি অবাক হয়ে বললুম, 'খিদে পেল ? এখুনি খেয়ে—'

দারোগা শুনতে পেলেন। আমাকে আর কথাই বলতে দিলেন না। বললেন, 'খিদে পেয়েছে ? বিলক্ষণ! এই রামভজন, জলদি রসগোল্লা-সন্দেশ-মোতিচুর-সিঙাড়া—বাজারসে যা মিলেগা—ঝুড়ি ভর্তি করকে লে আও।'

সবই তো হল। চোরাকারবারীরা তো ধরা পড়ল—অবকাশরঞ্জিনী আর বিক্রমসিংহ ওদের সঙ্গে হাজতে গেল কি না কে জানে। কিন্তু আসল গণ্ডগোল রয়েই গেল।

কম্বল এখনও নিরুদ্দেশ। তার টিকিরও তো খবর পাওয়া গেল না। সে কি সত্যি-সত্যিই চাঁদে চলে গেল নাকি ? ওর কাকা তো বলেছিলেন—কম্বলের চাঁদে চলে যাওয়ার একটা ন্যাক আছে।

আমরা চোরাকারবারী ধরতে চাইনি, কম্বলকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম। তার পাত্তাই পাওয়া গেল না। তার মানে, আমাদের অভিযান এ-যাত্রা ব্যর্থ হয়ে গেল। এখন আমরা কী বলব বদ্রীবাবুকে ? কী করে মুখ দেখাব তাঁর কাছে ?

চাটুজ্যেদের রকে বসে আমি, টেনিদা আর হাবুল এই নিয়ে গবেষণা করছিলুম। তা হলে কি আবার নতুন করে খোঁজা আরম্ভ করতে হবে ? একটা ক্লু-টু তো চাই।

টেনিদা দাঁত কিড়মিড় করে বললে, 'পেতেই হবে হতচ্ছাড়াকে। তারপরে যদি কম্বলকে পিটিয়ে কার্পেট না বানিয়েছি, তা হলে আমার নাম টেনি শর্মাই নয়।'

হাবুল বললে, 'ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও। অমন পোলার নিরুদ্দেশ থাকনই ভালো। পোলা তো না—য্যান অ্যাকখান ভাউয়া ব্যাং।'

টেনিদা হাবুলের দিকে তাকাল : 'ভাউয়া ব্যাং কাকে বলে ?'

'—ভাউয়া ব্যাং কয় ভাউয়া ব্যাংরে।'

—'শাটাপ!'—বিচ্ছিরি মুখ করে টেনিদা বললে, 'ইদিকে নানান ভাবনায় মরে যাচ্ছি, এর মধ্যে উনি আবার এলেন মস্করা করতে। ফের যদি কুরুবকের মতো বকবক করবি, তা হলে এক থাপ্পড়ে তোর গাল—

আমি জুড়ে দিলুম : 'গালুডিতে উড়িয়ে দেব।'

'—বাঃ—এটা তো বেশ নতুন রকম বলেছিস!' বিরক্ত হতে গিয়েও টেনিদা খুশি হয়ে উঠল : 'এর আগে তো কখনও শুনিনি।'

'—হুঁ হুঁ, আমি সব সময়েই ওরিজিন্যাল'—মাথা নেড়ে বললুম।

'—ওরিজিন্যাল তুই তো হবিই। তোর লম্বা লম্বা কান দুইখান দ্যাখলেই সেইডা বোঝন যায়'—হাবুল ফোড়ন কাটল।

'ওফ্‌!' টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : 'আমি মরছি নিজের জ্বালায় এগুলো বাজে বকুনিতে তো পাগল করে দিলে। এখন ওই কম্বলটাকে—'বলতে আমাদের পেছনে আর একটা রাম চিৎকার।

'কম্বল-সম্বল যথা দরবেশ কাঁপে চুপে চুপে—'

আমরা ভীষণভাবে চমকে তাকিয়ে দেখি, ক্যাবলা। কচরমচর করে পরমানন্দে কী চিবুচ্ছে।

টেনিদা বাঘাটে গলায় বললে, 'খামকা অমন করে যাঁড়ের মতো চ্যাঁচালি যে ক্যাবলা ?'

ক্যাবলা বললে, 'এমনি'।

'এমনি'। ভেংচি কেটে টেনিদা বললে, 'একেবারে পিলেসুদ্ধ চমকে গেল। খাচ্ছিস কী ?'

'—কাজুবাদাম।'

হাত বাড়িয়ে টেনিদা বললে, 'আমার ভাগ দে।'

—'নেই। খেয়ে ফেলেছি।'

'খেয়ে ফেলেছিস ?' টেনিদা গজ গজ করতে লাগল : 'এই জন্যই দেশের কিচ্ছু হয় না।'

হাবুল সেন বলল, 'হইবও না। আমারেও দ্যায় নাই।'

টেনিদা হাবুলকে চড় মারতে গেল : 'এটা এমন বক্তিয়ার হয়েছে না যে কোনও সিরিয়াস কথা এর জন্য বলার জো নেই। ওয়েল ক্যাবলা—এখন কম্বলের কী করা যায় বল তো ?'

ক্যাবলা বাদাম চিবুতে-চিবুতে, কিছুই করা যায় না। করার দরকার নেই।'

—'মানে ?'

—'মানেটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, এসো। চলো সবাই আমার সঙ্গে।'

বেশি দূর যেতে হল না। আমাদের পাড়াতেই একটুকুরো পোড়ো জমি, কারা যেন বাড়ি টাড়ি- করছে। তিন-চারটে ছেলে সেখানে ইট পেতে একটা টেনিস বল নিয়ে ক্রিকেট খেলছে। তাদের একজনের মাথায় একটা ভাঙা শোলা-হ্যাট, সে চিৎকার করে বল দিচ্ছিল—এই সোবার্স বল দিচ্ছেন, ব্যারিংটন আউট হয়ে গেলেন—'

আমি হাবুল আর টেনিদা চোখ গোল করে বললুম : 'ওই তো কম্বল!'

ক্যাবলা বললে, 'নির্ঘাত।'

আমি বলুম, ও এখানে কী করে এল ?'

—'তার মানে, ও কোথাও যায়নি। এখেনেই ছিল।'

—'এখানেই ছিল ?'—টেনিদার মুখটা হালুয়ার মত হয়ে গেল। 'তা হলে নিরুদ্দেশ হল কী করে ? ওর কাকা যে বললেন, কম্বল নিশ্চয় চাঁদে চলে গেছে ?'

ক্যাবলা বললে, 'চাঁদে ঠিক যায়নি, চাঁদের রাস্তায় খানিকটা গিয়েছিল।'

—'চাঁদের রাস্তায় ?'—হাবুল একটা হাঁ করল : 'রকেট পাইল কই ?'

—'রকেটের দরকার হয়নি।' ক্যাবলা মিটমিটি করে হাকল : 'চিলেকোঠার ঘরে লুকিয়েছিল দিন কতক।'

—'অ্যাঁ !'—আমরা তিনজনে খাবি খেলুম।

—'হুঁ, সব খবরই আমি যোগাড় করে এনেছি। এই দশাসই মাস্টার খগেন মাশ্চটকের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে কম্বলের কাকিমাই সে ব্যবস্থা করেছিলেন। কাকা তো বসে আছেন প্রেস নিয়ে, বাড়ির ভিতরে কতটুকু যান, কীই বা খবর রাখেন। আমরা যখন কম্বলের খোঁজে চাঁদনি-ধোপাপুকুর-মহিষাদল ছুটে বেড়াচ্ছি, তখন শ্রীকম্বল কাকিমার আদরে দিব্যি চিলেকোঠার ঘরে খেয়ে-দেয়ে মোটা হচ্ছেন। সেই প্রথম দিনে আমাদের দিকে কে পচা আম ছুঁড়েছিল—এবার বুঝতে পারছ টেনিদা।'

—'বিলক্ষণ !'—টেনিদা হুঙ্কার করল : 'ওই হতভাগাই চিলেকোঠা থেকে আমার নাকটাকে পচা আমের টার্গেট করেছিল।'

টেনিদার হুঙ্কারেই কি না কে জানে—কম্বল আমাদের দিকে ফিরে তাকাল। আর তাকিয়েই বিকট ভেংচি কাটল একটা। স্বভাব যাবে কোথায় ! এবার আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ভাউয়া ব্যাং কাকে বলে ! ভাউয়া ব্যাং না হলে অমন ভেংচি কেউ কাটতেই পারে না।

টেনিদা আর সিন্ধুঘোটক

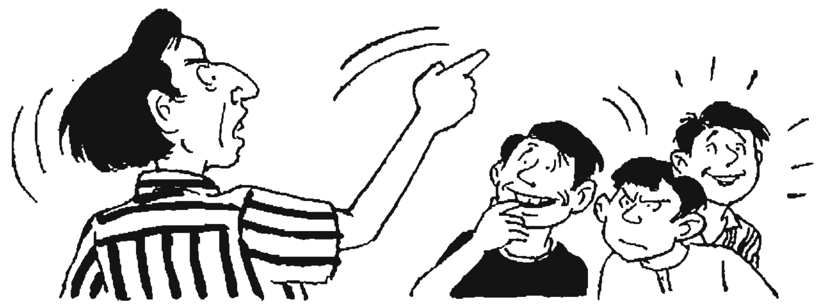

১

গড়ের মাঠ। সারাটা দিন দারুণ গরম গেছে, হাড়ে-মাংসে যেন আগুনের আলপিন ফুটছিল। এই সন্ধ্যেবেলায় আমি আর টেনিদা গড়ের মাঠে এসে যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছি। কেল্লার এ-ধারটা বেশ নিরিবিলি, অল্প-অল্প আলো-আঁধারি, গঙ্গা থেকে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা হাওয়া।

একটা শুকনো ঘাসের শিষ চিবুতে-চিবুতে টেনিদা বললে, ধ্যেৎ।

—কী হল ?

—সব বাজে লাগছে। এমন গরমের ছুটিটা—লোকে আরাম করে সিমলা-শিলং বেড়াতে যাচ্ছে আর আমরা এখানে বসে বসে স্রেফ বেগুনপোড়া হচ্ছি। বোগাস।

—একমন বরফ কিনে তার ওপর শুয়ে থাকলেই পারো—আমি ওকে উপদেশ দিলুম।

টেনিদা তক্ষুনি হাত বাড়িয়ে বললে, টাকা দে।

—কীসের টাকা ?

—বরফ কেনবার।

—আমি টাকা পাব কোথায় ?

—টাকা যদি দিতে পারবিনে, তা হলে বুদ্ধি জোগাতে বলেছিল কে র‍্যা ?—টেনিদা দাঁত খিঁচোল বিচ্ছিরিভাবে ; ইদিকে গরমের জ্বালায় আমি ব্যাং-পোড়া হয়ে গেলুম আর উনি বসে বসে ধ্যাষ্টামো করছেন।

—এখন গরম আবার কোথায়—আমি টেনিদাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলুম : কেমন মনোরম রাত, গঙ্গার শীতল বাতাস বইছে—আরও একটু কবিতা করে বললুম : পাতায় পাতায় পড়ে নিশির শিশির—'

নিশির শিশির।—টেনিদা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল : দ্যাখ প্যালা, ফাজলামিরও

লিমিট আছে। এই জষ্টিমাসে শিশির ! দেখা দিকিনি, কোথায় তোর শিশির !

ভারি ল্যাঠায় ফেলল তো ! এ-রকম কাঠগোঁয়ার বেরসিকের কাছে কবিতা-টবিতা বলতে যাওয়াই বোকামো। আমি অনেকক্ষণ মাথা-টাথা চুলকে শেষে একটু বুদ্ধি করে বললুম, আচ্ছা, কালকে সকালে তোমাকে শিশির দেখাব, মানে সীতারাম ঘোষ স্ট্রিট থেকে শিশিরদা-কে ডেকে আনব।

বুদ্ধি করে আগেই সরে গিয়েছিলুম, তাই টেনিদা-র চাঁটিটা আমার কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল। টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, তুই আজকাল ভারি ওস্তাদ হয়ে গেছিস। কিন্তু এই আমি তোকে লাস্ট ওয়ার্নিং দিলুম। ফের যদি গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি করবি, তা হলে এক ঘুষিতে তোকে—

আমি বললুম, ঘুঘুড়িতে উড়িয়ে দেবে !

বদমেজাজী হলে কী হয়, টেনিদা গুণের কদর বোঝে। সঙ্গে-সঙ্গে একগাল হেসে ফেলল।

—ঘুষি দিয়ে ঘুঘুড়িতে ওড়ানো। এটা তো বেশ নতুন শোনাল। এর আগে তো কখনও বলিসনি !

আমি চোখ পিট-পিট করে কায়দাসে বললুম, হুঁ—হুঁ—আমি আরও অনেক বলতে পারি। সব একসঙ্গে ফাঁস করি না, স্টকে রেখে দিই।

—আচ্ছা, স্টক থেকে আরও দু'-চারটে বের কর দিকি।

আমি বললুম, চাঁটি দিয়ে চাটগাঁয় পাঠানো, চিমটি কেটে চিমেশপুরে চালান করা—

—চিমেশপুর ? সে আবার কোথায় ?

—ঠিক বলতে পারব না। তবে আছে কোথাও নিশ্চয়।

—তোর মুণ্ডু।—টেনিদা হঠ্যাৎ ভাবুকের মতো ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল। খানিকক্ষণ ড্যাবড্যাব করে আকাশের তারা-টারা দেখল খুব সম্ভব, তারপর করুণ স্বরে বললে, ডাক—ডাক !

—কাকে ডাকব টেনিদা ? ভগবানকে ?

—আঃ, কচুপোড়া খেলে যা ! খামকা ভগবানকে ডাকতে যাবি কেন ? আর তোর ডাক শুনতে তো ভগবানের বয়ে গেছে। ডাক ওই আইসক্রিমওলাকে।

আমার সন্দেহ হল।

—পয়সা কে দেবে ?

—তুই-ই দিবি। একটু আগেই তো একমন বরফের ফরমাশ করছিলি।

বোকামোর দাম দিতে হল। আইসক্রিম শেষ করে, কাঠিটাকে অনেকক্ষণ ধরে চেটেপুটে পরিষ্কার ক'রে টেনিদা ঘাসের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়তে যাচ্ছে, হঠাৎ—ফ্যাঁচ।

আমিই হেঁচে ফেললুম। একটা মশা-টশা কী যেন আমার নাকের ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিল।

টেনিদা চটে উঠল : এই, হাঁচলি যে ?

—হাঁচি পেলে।

—পেল ? আমি শুতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই তুই হাঁচলি ? যদি একটা ভালোমন্দ হয়ে যায় ? মনে কর এই যদি আমার শেষ শোয়া হয় ? যদি শুয়েই আমি হার্টফেল করি ?

বললুম অসম্ভব ! স্কুল-ফাইনালে তুমি এত বেশি হার্টফেল করেছ যে সব ফেলপ্রুফ হয়ে গেছে।

টেনিদা বোধহয় এক চাঁটিতে আমাকে চাটগাঁয়ে পাঠানোর জন্যেই উঠে বসতে যাচ্ছিল, ঠিক তক্ষুনি ঘটে গেল ব্যাপারটা।

কে যেন মোটা গলায় বললে, ওঠো হে কম্বলরাম—গেট আপ।

আমরা দু'জনেই একসঙ্গে দারুণভাবে চমকে উঠলুম।

দুটো লোক আমাদের দু'পাশে দাঁড়িয়ে। একজন তালগাছের মতো রোগা আর ঢ্যাঙা, এই দারুণ গরমেও তার মাথা-টাথা সব একটা কালো র‍্যাপার দিয়ে জড়ানো। আর একজন ষাঁড়ের মতো জোয়ান, পরনে পেণ্টুলুন, গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি। তারও নাকের ওপর একটা ফুলকাটা রুমাল বাঁধা আছে।

এবার সেই রোগা লোকটা হাঁড়িচাঁচার মতো চ্যাঁ-চ্যাঁ গলায় বললে, আর পালাতে পারবে না কম্বলরাম, তোমার সব ওস্তাদি এবার খতম। ওঠো বলছি—

টেনিদা হাঁকপাঁক করে উঠে বসেছিল। দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কে মশাইরা এই গরমের ভেতরে এসে খামকা কম্বল-কম্বল বলে চ্যাঁচাচ্ছেন ? এখানে কাঁথা-কম্বল বলে কেউ নেই। আমরা কী বলে—ইয়ে—এই গঙ্গার শীতল সমীর-টমীর সেবন করছি, এখন আমাদের ডিসটার্ব করবেন না !

—ও, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না দেখছি !—ষণ্ডা লোকটা ফস করে প্যান্টের পকেট থেকে কী একটা বের করে বললে, দেখছ ?

দেখেই আমার চোখ চড়াৎ করে কপালে চড়ে গেল। আমি কাঁউ-মাঁউ করে বললুম, পিস্তল !

ঢ্যাঙা লোকটা বললে, আলবাত পিস্তল ! আমার হাতেও একটা রয়েছে। এ-দিয়ে কী হয়, জানো ? দ্রুম করে আওয়াজ বেরোয়—ধাঁ করে গুলি ছোটে, যার গায়ে লাগে সে দেন অ্যান্ড দেয়ার দুনিয়া থেকে কেটে পড়ে।

টেনিদার মতো বেপরোয়া লিডারেরও মুখ-টুখ শুকিয়ে প্রায় আলু-কাবলীর মতো হয়ে গেছে, খাঁড়ার মতো লম্বা-নাকটা ঝুলে পড়েছে নীচের দিকে। কুক্ষণে বেশ কায়দা করে দু'জনে একটা নিরিবিলি জায়গা বেছে নিয়েছিলুম—আশেপাশে লোকজন কোথাও কেউ নেই। চেঁচিয়ে ডাক ছাড়লে, দু'-পাঁচজন নিশ্চয় শুনতে পাবে, কিন্তু আমরা আর তাদের বিশেষ কিছু শোনাতে পারব না, তার আগেই দু'-দুটো পিস্তলের গুলিতে আমাদের দুনিয়া থেকে কেটে পড়তে হবে। একেবারে দেন অ্যান্ড দেয়ার !

আমার সেই ছেলেবেলার পিলেটা আবার যেন নতুন করে লাফাতে শুরু করল কানের ভেতরে যেন ঝিঁঝি পোকারা ঝিঁঝি করতে লাগল, নাকের মধ্যে উচ্চিংড়েরা

দাঁড়া নেড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে এমনি মনে হতে লাগল ! ভীষণ ইচ্ছে করতে লাগল অজ্ঞান হয়ে যাই, কিন্তু দু'-দুটো পিস্তলের ভয়ে কিছুতেই অজ্ঞান হতে পারলুম না ।

টেনিদা-ই আবার সাহস করে, বেশ চিনি-মাখানো মোলায়েম গলায় তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলতে লাগল : দেখুন মশাইরা, আপনারা ভীষণ ভুল করছেন। এখানে কম্বল বলে কেউ নেই, কম্বল বলে কাউকে আমরা চিনি না, শীতকালে আমরা কম্বল গায়ে দিই না—লেপের তলায় শুয়ে থাকি। এ হল আমার বন্ধু পটলডাঙার প্যালারাম, আর আমি হচ্ছি শ্রীমান টেনি, মানে—

মোটা লোকটা ঘোঁত-ঘোঁত করে বললে, মানে কম্বলরাম। প্যালারামের বন্ধু কম্বলরাম—রামে রামে মিলে গেছে। যাকে বলে, রামে এক, রামে দো। ঘুঁ—ঘুঁ—ঘুঁত—

শেষের বিটকেল আওয়াজটা বের করল নাক দিয়ে। হাসল বলে মনে হল। আর সেই বিচ্ছিরি হাসিটা শুনে অত দুঃখের ভেতরেও আমার পিত্তিসুদ্ধু জ্বালা করে উঠল।

সেই ঢ্যাঙা লোকটা খ্যাচম্যাচ করে বললেন, কী হাসি মস্করা করছ হে অবলাকান্ত। ফস করে একটা পুলিশ-ফুলিশ এসে যাবে, তা হলেই কেলেঙ্কারি। ওদিকে সিন্ধুঘোটক তখন থেকে খাপ পেতে বসে রয়েছে, কম্বলরামকে নিয়ে তাড়াতাড়ি না ফিরলে আমাদের জ্যান্ত চিবিয়ে খাবে। চলো—চলো ! ওঠো হে কম্বলরাম, আর দেরি নয়। গাড়ি রেডিই রয়েছে।

রেডি রয়েছে, তাতে আর সন্দেহ কী ! একটু দূরেই দরজাবন্ধ একটা ঘোড়ার গাড়ি ঠায় দাঁড়িয়ে। বুঝতে পারলুম, ওটা কম্বলরামকেই অভ্যর্থনা করবার জন্যে এসেছে।

টেনিদা বললে, দেখুন—বুঝতে পারছেন—

—আমাদের আর বোঝাতে হবে না, সিন্ধুঘোটককেই সব বুঝিয়ো। নাও—চলো—বলেই ঢ্যাঙা লোকটা পিস্তলের নল টেনিদার পিঠে ঠেকিয়ে দিলে।

আর এ-অবস্থায় হাত তুলে নির্বিবাদে সুড়সুড় করে হেঁটে যেতে হয়, গোয়েন্দার গল্পের বইতে এই রকমই লেখা আছে। টেনিদা ঠিক তাই করল। আমি সরে পড়ব ভাবছি—দেখি বেঁটে লোকটার পিস্তলের নল আমাকেও খোঁচা দিচ্ছে।

—বা-রে, আমাকে কেন ?—আমি ভাঙা গলায় বলতে চেষ্টা করলুম : আমি তো কম্বলরাম নই।

—না, তুমি কম্বলের দোস্ত কাঁথারাম। তোমাকে ছেড়ে দিই, তুমি দৌড়ে পুলিসে খবর দাও—আর ওরা গাড়ি ছুটিয়ে আমাদের ধরে ফেলুক ! চালাকি চলবে না, চাঁদ—চলো।

এ-অবস্থায় হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত পর্যন্ত চলতে বাধ্য হয়, আমি কোন্ ছার। আমরা চললুম, ঘোড়ার গাড়িতে উঠলুম, গাড়ির দরজা বন্ধ হয়ে গেল, আর গাড়ি গড়গড়িয়ে চলতে শুরু করে দিলে।

হায় গঙ্গার শীতল সমীর ! বেশ বুঝতে পারলুম, এই আমাদের বারোটা বেজে গেল !

২

গাড়িটা বাজে—একদম লক্কড়-মার্কা। ছক্কর-ছক্কর করে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই। কোন্ চুলোয় যে যাচ্ছে বোঝবার জো নেই। সেই জাঁদরেল অবলাকান্ত প্রায় আমাকে চেপ্টে বসে আছে—ওর নাম যদি অবলাকান্ত হয়, তবে বলেন্দ্রনাথের মানে, স্বয়ং সিন্ধুঘোটকের চেহারা যে কেমন হবে কে জানে ! দরজা খোলবার জো নেই—এমন কি, কথাটি কইবার জো নেই। টেনিদা একবার বলতে চেষ্টা করেছিল, ও মশাই, খামকা ভুল লোককে হয়রান করে—

ঢ্যাঙা লোকটা খ্যাঁ-খ্যাঁ করে বললে, চোপ !

—যাকে তাকে কম্বলরাম ঠাউরে—

—যাকে তাকে ? এমনি খাঁড়ার মতো নাক, এমনি চেহারা—কম্বলরাম ছাড়া আর, কারও হয় ? কম্বলরামের কোনও যমজ ভাই নেই, তিনকুলে তার কেউ আছে বলেও আমরা শুনিনি ! ইয়ার্কি ?

—স্যার, দয়া করে যদি পটলডাঙায় একটা খবর নেন—

—শাট আপ ইয়োর পটলডাঙা-আলুডাঙা ! আর একটা কথা বলেছ কি, এই পিস্তলের এক গুলিতে—

কাজেই আমরা চুপ করে আছি। যা হওয়ার হয়ে যাক। শুধু থেকে থেকে আমর পেটের ভেতর থেকে কেমন গুড়গুড় করে একটা কান্না উঠে আসছিল। আর কখনও পটলডাঙায় ফিরে যেতে পারব না, আর কোনওদিন পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেতে পাব না। টেনিদা-র সঙ্গে আড্ডা দিয়েই আমার এই সর্বনাশ হয়ে গেল ! মেজদা ঠিকই বলে, 'ওই টেনিদার চ্যালা হয়েই প্যালা স্রেফ গোল্লায় গেল।'

আমি তখন বিশ্বাস করিনি। ভাবলুম, যে-যাই বলুক, টেনিদা একজন সত্যিকারের গ্রেটম্যান। দু'-একটা চাঁটি-টাঁটি লাগায়, জোর করে খাওয়া-টাওয়াও আদায় করে, কিন্তু আসলে তার মেজাজটা ভীষণ ভালো, বিপদ-টিপদ হলে লিডারের মতো বুক ঠুকে সামনে এগিয়ে যায়। কিন্তু সে যে এত মারাত্মক—কম্বলরাম হলেও হতে পারে, আর কোথাকার এক বিটকেল সিন্ধুঘোটক তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, এ জানলে কে তার ত্রিসীমানায় এগোত।

ওদিকে হঠাৎ অবলকান্ত খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হেসে উঠল। বললে, ঘেঁটুদা !

ঘেঁটুদা, ওরফে ঢ্যাঙা লোকটা বললে, কী বলছ হে অবলকান্ত ?

—এটা যে কম্বলরাম, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই।

ঘেঁটুদা বললে, আলবাত !
অবলাকান্ত বললে, তা না হলে এমন ভোম্বলরাম হয় ।
ঘেঁটুদা বললে, নির্ঘাত ! ভোম্বলরাম বলে ভোম্বলরাম !
অবলাকান্ত বললে, হ্যাঁ, ভোম্বলরামও বলা যায় ।
বলেই দুজনে খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হেসে উঠল ।

আমরা নিজের জ্বালায় মরছি, কিন্তু ওদের যে কেন এত হাসি পেল, সে আমি বুঝতে পারলুম না । জুলজুল করে আমি একবার টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম । গাড়ির ভেতরে ওকে ভালো দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু যেটুকু দেখলুম তাতে মনে হল রাগে ওর দাঁত কিড়মিড় করছে । নিতান্তই দু'-দুটো পিস্তল না থাকলে এতক্ষণে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেত ।

গাড়িটা চলছে তো চলছেই । মাঝে-মাঝে গাড়োয়ান এক-একবার জিভে-টাক্‌রায় এক-একটা কটকট আওয়াজ করছে, আর সাঁই সাঁই করে চাবুক হাঁকড়াচ্ছে । গাড়িটার থামবার নামই নেই । একসময় মনে হল, পিচের রাস্তা ছেড়ে খোয়াওঠা পথ ধরল আর থেকে-থেকে এক-একটা বেয়াড়া ঝাঁকুনিতে পিলেসুদ্ধু নড়ে যেতে লাগল ।

এতক্ষণ পথের পাশে গাড়ি-টাড়ির আওয়াজ পাচ্ছিলুম, ট্রামের ঘণ্টি কানে আসছিল, লোকের গলা পাওয়া যাচ্ছিল, কানে আসছিল রেডিয়ো-টেডিয়োর শব্দ । এখন মনে হল, হঠাৎ যেন সব নিঝুম মেরে গেছে, কোথায় যেন ঝিঁঝি-টিঝি ডাকছে, থেকে থেকে পেঁকো গন্ধ বন্ধ গাড়ির ভেতরেও এসে ঢুকছে । তার মানে উদ্ধারের শেষ আশাটুকুও গেল । এখন আমরা চলেছি একেবারে সিন্ধুঘোটকের খপ্পরে—কোন্ পোড়োবাড়ির পাতালে নিয়ে আমাদের দুম করে গুম করে ফেলবে—কে জানে !

হঠাৎ ক্যাবলার কথা মনে পড়ে আমার ভারি রাগ হতে লাগল । ক্যাবলা বলে 'ও-সব গোয়েন্দা-গল্প স্রেফ গাঁজা—বানিয়ে বানিয়ে লেখে, আমি এক বর্ণও বিশ্বাস করি না ।' কিন্তু আজ রাতে সিন্ধুঘোটকের পাল্লায়—

খ্যাড়—খ্যাড়—খ্যাড়াৎ—

গাড়িটা কাত হয়ে উল্টে পড়তে-পড়তে সামলে নিলে মনে হল, কোনও নালা-ফালায় নেমে যাচ্ছিল । আমি একেবারে অবলাকান্তের ঘাড়ে গিয়ে পড়লুম—সে বললে, উহু-উহু, নাকটা গেল মশাই । ওদিকে ঘেঁটুদার গলা থেকে আওয়াজ বেরুল : ক্যাঁক—গেলুম !

আর তক্ষুনি টেনিদা বললে, ঘেঁটুচন্দর—এবার ! তোমার পিস্তল তো কেড়ে নিয়েছি—আগে তোমার দফা নিকেশ করে ছাড়ব !

আমি চমকে উঠলুম । অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছি না, কিন্তু বুঝতে পারলুম, গাড়িটা কাত হওয়ার ঝাঁকুনিতে টেনিদা সুযোগ পেয়ে ফস করে ঘেঁটুর পিস্তলটা ছিনিয়ে নিয়েছে ! একেই বলে লিডার । কিন্তু অবলাকান্তের হাতে তো পিস্তলটা এখনও রয়েছে । টেনিদা না হয় ঘেঁটুকে ম্যানেজ করল, কিন্তু অবলাকান্ত যে এক্ষুনি আমায় সাবাড় করে দেবে ।

টেনিদা বললে, ওয়ান-টু-থ্রি । শিগগির গাড়ির দরজা খোলো, নইলে—

আমি তো কাঠ হয়ে বসে আছি—খালি মনে হচ্ছে, এখুনি আমি গেলুম ! এইবারে দু'-দুটো পিস্তলের আওয়াজ—ঘেঁটুচন্দর চিৎ, আমারও বাতচিত চিরতরে ফিনিশ ! তারপর রইল টেনিদা আর অবলাকান্ত—কিন্তু মহাযুদ্ধের সেই শেষ অংশটা আমি আর দেখতে পাব না, কারণ আমি ততক্ষণে দুনিয়া থেকে অনেক দূরে সরে পড়েছি !

গোয়েন্দা-উপন্যাসে এ-সব জায়গায় একটা দারুণ অবস্থার সৃষ্টি হয় । পড়তে-পড়তে লোকের মাথার চুল খাড়া হয়ে যায় । অথচ ঘেঁটু আর অবলাকান্ত হঠাৎ খ্যাঁ খ্যাঁ করে অট্টহাসি হাসল ।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অবলাকান্ত বললে, শাবাশ কম্বলরাম, তুমি বীর বটে । তোমার বীরত্ব দেখে আমার চন্দ্রগুপ্ত নাটকের পার্ট বলতে ইচ্ছে করছে আলেকজান্ডারের মতো—'যাও বীর, মুক্ত তুমি ।' কিন্তু সে আর হওয়ার জো নেই, কারণ আমরা সিন্ধুঘোটকের আস্তানায় ঢুকে পড়েছি ।

আর তক্ষুনি চট করে গাড়িটা থেমে গেল । কোচোয়ান ঘরঘর করে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে বললে, নামো ।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : সাবধান, আমি এখুনি গুলি ছুঁড়ব বলে দিচ্ছি—আমার হাতে পিস্তল—

বলতে-বলতে গাড়ির ওধারটা খুলে অবলাকান্ত টপ করে নেমে গেল । আর ঘেঁটুদা বললে থাম ছোকরা, বেশি বকিসনি । পিস্তল-ফিস্তল ছুড়ে আর দরকার নেই, নেবে আয়—

আর এদিক থেকে অবলাকান্ত এক হ্যাঁচকায় আমাকে নামিয়ে ফেলল, ওদিক থেকে টেনিদা আর ঘেঁটুদা জড়াজড়ি করতে-করতে একসঙ্গে কুমড়োর মতো গড়িয়ে পড়ল গাড়ি থেকে ।

আমি দেখলুম, সামনে একটা ভুতুড়ে চেহারার পোড়োমতো পুরনো বাড়ি । তার ভাঙা সিঁড়ির সামনে গাড়ি এসে থেমেছে, চারজন লোক দুটো লণ্ঠন হাতে করে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে ।

একজন হেঁড়ে গলায় বললে, কী ব্যাপার—কুস্তি লড়ছে কারা ?

টেনিদা ততক্ষণে ধাঁ করে একটা ল্যাং কষিয়ে ঘেঁটুকে উল্টে ফেলে দিয়েছিল । ঘেঁটু গ্যাঙাতে-গ্যাঙাতে উঠে দাঁড়াল । বললে, তোমরা তো বেশ লোক, হে ! দিব্যি বুঝিয়ে দিলে, কম্বলরামটা এক নম্বরের ভিতু, একটু ভয় দেখালেই ভিরমি খেয়ে পড়বে । এ তো দেখছি সমানে লড়ে যাচ্ছে, আবার একটা প্যাঁচ কষিয়ে আমায় চিত করে ফেললে । ইঃ—একগাদা গোবর-টোবর না কীসের মধ্যে যেন ফেলে দিয়েছে হে—কী গন্ধ । ওয়াক ।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : হুঁশিয়ার, আমার হাতে তৈরি পিস্তল ।

লোক চারটে থমকে দাঁড়িয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে । শেষে একজন বললে,

পিস্তল ! পিস্তল আবার কোত্থেকে এল হে ।

অবলাকান্ত বললে, দুত্তোর পিস্তল । সেই যে কম্বলরামকে ভয় দেখাব বলে ফিরিওলার কাছ থেকে আড়াই টাকা দিয়ে দুটো কিনেছিলুম, তারই একটা কেড়ে নিয়েছে আর তখন থেকে শাসাচ্ছে আমাদের ! —বলেই আমার হাতে নিজের পিস্তলটা জোর করে গুঁজে দিয়ে বললে, ওহে কম্বলরামের দোস্ত কাঁথারাম, তোমারও গুলি ছোড়বার সাধ হয়েছে নাকি । তা হলে এটা তোমায় প্রেজেন্ট করলুম, চার আনার ক্যাপ কিনে নিয়ো—আর সারাদিন দুম-ফটাক করে বাড়ির কাক-টাক তাড়িয়ো ।

বলে, অবলাকান্ত তো খ্যাঁ-খ্যাঁ করে হাসলই, সেই সঙ্গে গোবরমাখা ঘেঁটুচন্দর, গাড়ির কোচোয়ান আর দুটো লণ্ঠন হাতে চারটে লোক—সবাই একসঙ্গে হেসে উঠল । আর সেই হাসির আওয়াজে পাশের একটা ঝুপসি-মতন আমগাছ থেকে গোটা দু-তিন বাদুড় ঝটপট করে উড়ে পালাল ।

ঘেঁটু বললে, কই হে কম্বলরাম, গুলি ছুড়লে না ?

টেনিদা কিছুক্ষণ ঘুগনিদানার মতো মুখ করে চেয়ে রইল, তারপর খেলনা পিস্তলটা তার হাত থেকে টপ করে পড়ে গেল । ইস—ইস—আমরা কী গাড়ল । দুটো লোক আমাদের স্রেফ বোকা বানিয়ে গড়ের মাঠ থেকে ভর সন্ধেবেলায় এমন করে ধরে আনল । আগে জানলে—

কিন্তু পিস্তল-ফিস্তল চুলোয় যাক—এখন আর কিছুই করবার নেই । আমরা দু'জন—কোচোয়ান সুদ্ধু ওরা সাতজন । টেনিদার কুস্তির প্যাঁচ-ট্যাঁচ কোনও কাজে লাগবে না—সোজা চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাবে ।

সেই হেঁড়ে গলার লোকটা বললে, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর কতক্ষণ ভ্যারেণ্ডা ভাজবে, হে । রাত তো প্রায় আটটা বাজল । চলো—চলো শিগগির । সিন্ধুঘোটক তখন থেকে হা-পিত্যেশ করে বসে আছে ।

টেনিদা একবার আমার দিকে তাকাল, আমি টেনিদার দিকে তাকালুম । তারপর—কী আর করা যায়—দু'জনে সুড়সুড় করে এগিয়ে চললুম লোকগুলোর সঙ্গে-সঙ্গে ।

কোন আদিকালের একটা রদ্দিমার্কা বাড়ি—মানুষজন বিশেষ থাকে-টাকে বলে মনে হল না । ভাঙাচোরা সব ঘর—কোথাও একটা তেপায়া কিংবা খাটিয়া, কোথাও বা দু'-একখানা ধুলোবালি-মাখা টেবিল-চেয়ার । দুটো লণ্ঠনের আলোয় ঘরগুলোকে যেমন বিচ্ছিরি, তেমনি ভয়ঙ্কর মনে হচ্ছিল । থেকে-থেকে মাথার ওপর দিয়ে চামচিকে উঠে যাচ্ছিল, তাই দেখে আমি শক্ত করে নিজের কান দুটোকে হাত চাপা দিলুম । চামচিকেকে আমার ভীষণ সন্দেহজনক মনে হয়—কেন যে হঠাৎ লোকের ঘরে ঢুকে ফরফর করে উড়তে থাকে তার কোনও মানেই বোঝা যায় না । ছোড়দি বলে, ওরা নাকি লোকের কান ধরে ঝুলে পড়তে ভীষণ ভালোবাসে । আমার লম্বা-লম্বা কান দুটো তাই আগে থেকেই সামলে রাখাটা বুদ্ধিমানের কাজ বলেই মনে হল আমার ।

এ-ঘর থেকে ও-ঘর, ও-ঘর থেকে সে-ঘর । তারপরেই ঘরটাই বোধহয় শ্রীঘর । ভেবেই আমার মনে হল, শ্রীঘর তো থানার হাজতকে বলে । সিন্ধুঘোটক নিশ্চয় পুলিশ নয় যে আমাদের দুম করে হাজতে পুরে দেবে ।

এদিকে একটা সিঁড়ি বেয়ে আমরা ওপরে উঠছি । খুব বাজে মার্কা সিঁড়ি, রেলিং ভাঙা, ধাপগুলো দাঁত বের করে রয়েছে । ঠিক এমনকি একটা বাড়িতেই যত রকম ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়—দস্যুসর্দার চিং চুং বেপরোয়া গোয়েন্দা দিগ্বিজয় রায়কে গুম করে ফেলে, কিংবা কাঞ্চীগড়ের রাজরানী মৃদুলাসুন্দরীর হীরের নেকলেস নিয়ে গুণ্ডা হাতিলালের সঙ্গে ওস্তাদ কলিমুদ্দির গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ বেধে যায় । আমার প্রিয় লেখক কুণ্ডু মশাইয়েরও যত সব দুর্ধর্ষ রোমাঞ্চকর কাহিনী একে-একে আমার মনে পড়ে যেতে লাগল ।

কিন্তু খালি একটা খটকা লাগছে । সে-সব গল্পে খেলনা পিস্তলের কথা কোনও দিন পড়িনি !

আবার এ-সব দারুণ দারুণ ভাবনায় হঠাৎ বাধা পড়ে গেল । সিঁড়ি পেরিয়েই সামনে মস্ত একটা ঘর । তার দরজাটা ভেজানো, কিন্তু ভেতর থেকে একটা জোরালো আলো বাইরে এসে পড়েছে । আমরা সেইখানে থেমে দাঁড়ালুম ।

অবলাকান্ত বেশ মিহি গলায় ডাকল : স্যার ।

ভেতর থেকে ব্যাঙের ডাকের মতো আওয়াজ এল : কে ?

—আমরা সবাই । মানে কম্বলরাম সুদ্ধ এসে গেছে ।

—এসে গেছে ? অলরাইট ! ভেতরে চলে এসো ।

অবলাকান্ত দরজাটা খুলে ফেলল । আর পেছন থেকে লোকগুলো আমাকে আর টেনিদাকে ধাক্কা দিয়ে বললে, যাও—যাও, এবার স্যারের সঙ্গে মোকাবেলা করো ।

সবাই আমরা ঘরে পা দিলুম ।

বাড়িটা নীচে থেকেই যতই খারাপ মনে হোক—এ-ঘরটা একেবারে আলাদা । টিমটিমে লণ্ঠন নয়—মেঝেতে সোঁ-সোঁ করে একটা পেট্রোম্যাক্স বাতি জ্বলছে । মস্ত ফরাসের ওপর ধপধপে সাদা চাদর বিছানো, সেখানে তিন-চারটে তাকিয়া, আর একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে—গড়গড়ার নল মুখে পুরে—

কে ?

কে আর হতে পারে—সিন্ধুঘোটক ছাড়া ?

চেহারা বটে একখানা । হঠাৎ দেখলে মনে হয় বোধহয় স্বপ্ন দেখছি, নিজের কানে চিমটি কেটে পরখ করতে ইচ্ছে করে । একটা লোক যে এমন মোটা হতে পারে, এক পিপে আলকাতারায় ডুব দিয়ে উঠে আসার মতো তার যে গায়ের রঙ হতে পারে, মন চারেক শরীরের ওপর এত ছোট যে একটা মাথা থাকতে পারে, আর ছোট মাথায় যে আরও ছোট এমন দুটো কুঁতকুঁতে চোখ থাকতে পারে—এ না দেখলে তবুও বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু দেখলে আর কিছুতেই বিশ্বাস করবার জো নেই ।

আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম, 'ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস'—কিন্তু সামলে নিলুম আর সিন্ধুঘোটক ব্যাঙের গলায় গ্যাং-গ্যাং করে বললে, বোসো সব, সিট ডাউন।

এমন কায়দা করে বললে যে, আমরা যেন সব স্কুলের ছাত্র আর হেডমাস্টার আমাদের বসতে হুকুম দিচ্ছেন।

ঘেঁটুদা কাঁউমাঁউ করে বললে, আমি বসতে পারব না স্যার—এই কম্বলরামটা আমাকে গোবরের ভেতরে ল্যাং মেরে ফেলে দিয়েছে। গায়ে দারুণ গন্ধ।

সিন্ধুঘোটক বললে, তুমি একটা থার্ডক্লাস। আমার ফরাসে গোবর লাগিয়ো না—আগে চান করে এসো। যাও—গেট আউট।

ঘেঁটুদা তখুনি সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল।

আমরা সবাই তখন ফরাসে বসে পড়েছি, সিন্ধুঘোটক তাকিয়া ছেড়ে পিঠ খাড়া করে উঠে বসল। জিজ্ঞেস করলে, কে কম্বলরাম?

অবলাকান্ত টেনিদাকে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, এইটে।

সিন্ধুঘোটক আমার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, আর রোগা চিমটে খাড়া-খাড়া কানওলা ওটা কে?

অবলাকান্ত বললে, নাম জানিনে স্যার। কম্বলরামের দোস্ত—কাঁথারাম বোধ হয়।

হেঁড়ে গলায় লোকটা বললে, শতরঞ্চিরাম হতেও বাধা নেই।

বাকি সবাই একসঙ্গে বললে, হ্যাঁ, শতরঞ্চিরামও হওয়া সম্ভব।

সিন্ধুঘোটক বললে, অর্ডার—অর্ডার!—বলেই আবার গড়গড়ার নলটা মুখে তুলে নিলে। আর এইবার আমি লক্ষ করে দেখলুম, গড়গড়ায় কলকে-টলকে কিচ্ছু নেই, শুধু-শুধু একটা নল মুখে পুরে সিন্ধুঘোটক বসে আছে।

—তারপর কম্বলরাম—

এতক্ষণ টেনিদা আলু-চচ্চড়ির মতো মুখ করে বসে ছিল, এবার গাঁ-গাঁ করে উঠল।

—দেখুন স্যার, এরা গোড়া থেকেই ভুল করেছে। আমি তো কম্বলরাম নই-ই, আমাদের সাতপুরুষের মধ্যে কেউ কম্বলরাম নেই। আমি হচ্ছি টেনি শর্মা—ওরফে ভজহরি মুখুজ্যে, আর এ হল প্যালারাম—ওর ভালো নাম স্বর্ণেন্দু ব্যানার্জি। আমরা পটলডাঙায় থাকি। গরমের জ্বালায় অস্থির হয়ে আমরা গঙ্গার স্নিগ্ধ-সমীর সেবন করছিলুম, আপনার ঘেঁটুচন্দর আর অবলাকান্ত গিয়ে আমাদের জোর করে ধরে এনেছে।

শুনে, সিন্ধুঘোটকের মুখ থেকে টপ করে নলটা পড়ে গেল। তিনটে কোলা ব্যাঙের ডাক একসঙ্গে গলায় মিশিয়ে সিন্ধুঘোটক প্রায় হাহাকার করে উঠল : ওহে অবলাকান্ত, এরা কী বলে?

অবলাকান্ত ব্যস্ত হয়ে বললে, বাজে কথা বলছে, স্যার। এই কম্বলরামটা দারুণ খলিফা—তখন থেকে আমাদের সমানে ভোগাচ্ছে। আপনিই ভালো করে দেখুন না, স্যার। কম্বলরাম ছাড়া এমন চেহারা কারও হয়? এমন লম্বা তাগড়াই চেহারা, এমন একখানা মৈনাকের মতো খাড়া নাক, এমনি তোবড়ানো চোয়াল—

—দাঁড়াও—দাঁড়াও।—সিন্ধুঘোটক হঠাৎ তার ছোট্ট মাথা আর কুঁতকুঁতে চোখ দুটো সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলে : কিন্তু কম্বলরামের নাকের পাশে যে একটা কালো জড়ুল ছিল, সেটা কোথায়?

সঙ্গে সঙ্গে বাকি লোকগুলো সবাই ঝুঁকে পড়ল টেনিদার মুখের ওপর : তাই তো, জড়ুলটা কোথায়?

টেনিদা খ্যাঁচম্যাচ করে বললে, আমি কি কম্বলরাম যে জড়ুল থাকবে? এইবার আপনারাই বলুন তো মশাই, এই দারুণ গ্রীষ্মের সন্ধেবেলায় খামকা দুটো ভদ্র সন্তানকে হয়রান করে আপনাদের কী লাভ হল?

কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। তারপর সিন্ধুঘোটক ডাকল : অবলাকান্ত।

—বলুন স্যার।

—এটা কী হল?

—আজ্ঞে, অন্ধকার স্যার—ভালো করে ঠাওর পাইনি।—মাথা চুলকোতে-কুলকোতে অবলাকান্ত বললে, কিন্তু আমার মনে হয় স্যার, এটাই কম্বলরাম। চালাকি করে জড়ুলটাও কোথাও লুকিয়ে রেখেছে।

—শাট আপ। জড়ুল কি একটা মার্বেল যে ফস করে লুকিয়ে ফেলা যায়?

—যদি অপারেশন করায়?

—হুঁ। সে একটা কথা বটে—সিন্ধুঘোটক আবার নলটা তুলে নিলে : কিন্তু অপারেশনের দাগ তো থাকবে।

—নাও থাকতে পারে স্যার। আজকাল ডাক্তারদের অসাধ্য কাজ নেই।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দোরগোড়া থেকে কোচোয়ান বললে, হুজুর, আমার একটা নিবেদন আছে।

—বলে ফেলো পাঁচকড়ি। আউট উইথ ইট।

—কম্বলরামকে আমি চিনি, স্যার। রোজ বিকেলে মনুমেন্টের নীচে আমরা খইনি খাই। সে কলকাতায় নেই, আজ দুপুরবেলায় রেলে চেপে তার মামাবাড়ি বাঁকুড়া চলে গেছে।

শুনে, অবলাকান্ত তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। পাঁচকড়িকে এই মারে তো সেই মারে।

—তবে এতক্ষণ বলিসনি কেন হতভাগা বুদ্ধু কোথাকার? খামকা আমাদের খাটিয়ে মারলি?

—বলে কী হবে? আমার কথা তো কেউ বিশ্বাস করে না।—বলে, ভারি নিশ্চিন্ত মনে পাঁচকড়ি হাতের মুঠোয় খইনি ডলতে লাগল আর গুনগুনিয়ে গান ধরল : 'বনে চলে সিয়ারাম, পিছে লছমন ভাই—'

সিন্ধুঘোটক বললে, অর্ডার, অর্ডার। পাঁচকড়ি, নো সিংগিং নাউ। কিন্তু এ-পরিস্থিতিতে কী করা যায়?

অবলাকান্ত প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে রইল। আর বাকি সবাই একসঙ্গে বললে, তাই তো, কী করা যায়।

টেনিদা বললে, কিছুই করবার দরকার নেই স্যার। বেশ রাত হয়েছে, আমাদের তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিন, নইলে বাড়িতে গিয়ে বকুনি খেতে হবে।

সিন্ধুঘোটক কিছুক্ষণ খালি খালি গড়গড়া টানতে লাগল। কলকে-টলকে কিচ্ছু নেই, শুধু গড়গড়ার ভেতর থেকে উঠতে লাগল জলের গুড়গুড় আওয়াজ।

তারপর সিন্ধুঘোটক বললে, হয়েছে।

অবলাকান্ত ছাড়া বাকি সবাই একসঙ্গে জিজ্ঞেস করলে, কী হয়েছে।

—প্ল্যান। কম্বলরাম যখন নেই, তখন একে দিয়েই কাজ চালাতে হবে। নাকের নীচে একটা জড়ুল বসিয়ে দিলেই ব্যস—কেউ আর চিনতে পারবে না।

অবলাকান্ত ভারি খুশি হয়ে হাত কচলাতে লাগল : আমিও তো স্যার সেই কথাই বলছিলুম।

হায়—হায়, ঘাটে এসে শেষে নৌকো ডুবল। এতক্ষণ বেশ আরাম বোধ করছিলুম, কিন্তু সিন্ধুঘোটকের কথায় একেবারে 'ধুক করে নিবে গেল বুকভরা আশা।' টেনিদার দিকে চেয়ে দেখলুম, ওর মুখখানা যেন ফজলি আমের মতো লম্বা হয়ে ঝুলে পড়েছে।

টেনিদা শেষ চেষ্টা করল : স্যার, আমাদের আর মিথ্যে হ্যারাস করবেন না। ভুল যখন বুঝেইছেন—

সিন্ধুঘোটক এবার কুঁতকুঁতে চোখ মেলে টেনিদার দিকে তাকিয়ে রইল খানিকটা। কী ভেবে মিনিট খানেক খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল, তারপর বললে, আচ্ছা ছোকরারা, তোমরা আমাদের কী ভেবেছে বলো দেখি? রাক্ষস? খপ করে খেয়ে ফেলব?

ভাবলে অন্যায় হয় না—অন্তত সিন্ধুঘোটকের চেহারা দেখলে সেই রকমই সন্দেহ হয়। এতক্ষণে আমি বললুম, আমরা কিছুই ভাবছি না স্যার, কিন্তু বাড়ি ফিরতে আর দেরি হলে বড়দা আমার কান ধরে—

—হ্যাং ইয়োর বড়দা!—বিরক্ত হয়ে বললে, তোমার কান দুটো এমনিতেই বেশ বড় হয়েছে, একটু ছাঁটাই করে দিলে নেহাত মন্দ হবে না। ও-সব বাজে কথা রাখো। তোমাদের দিয়ে আজ রাতে আমরা একটা মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে চাই। যদি সফল হই—তোমাদের খুশি করে রিওয়ার্ড দেব।

—মহৎ উদ্দেশ্য!—টেনিদা চিড়বিড় করে উঠল : এইভাবে ভদ্দর লোকদের পথ থেকে পাকড়াও করে এনে কোন্ মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে স্যার?

সিন্ধঘোটক চটে বললে, চোপরাও। এই বাড়ির পেছনে একটা পচা ডোবা আছে, তাতে কিলবিল করছে জোঁক। বেশি চালাকি করো তো, দু'জনকে আধঘণ্টা তার মধ্যে চুবিয়ে রাখব।

শুনে আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল। জোঁক আমি কখনও দেখিনি, কিন্তু তারা কী করে কুটুস করে মানুষকে কামড়ে ধরে আর নিঃশব্দে রক্ত শুষে খায়, তার ভয়াবহ বিবরণ অনেক শুনেছি। তা থেকে জানি, আর যাই হোক, জোঁকের সঙ্গে কখনও 'জোক' চলে না।

টেনিদা হাঁউমাউ করে বললে, না স্যার, জোঁক নয়, জোঁক নয়। ওরা খুব বাজে জিনিস।

—তা হলে আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাও।

—কী করতে হবে, স্যার?

—বেশি কিছু নয়। শুধু একজনের পকেট থেকে একটা কৌটো তুলে আনতে হবে। আর সে-কাজ কম্বলরাম ছাড়া আর কেউ করতে পারবে না।

—কীসের কৌটো স্যার?

—জারমান সিলভারের।

—কী আছে তাতে?—টেনিদা হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠল : হীরে-মুক্তা-মানিক? কোহিনুর? নাকি আরও, আরও দামী, আরও দুর্মূল্য কোনও দুর্লভ রত্ন?

সিন্ধুঘোটক গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে কিছুক্ষণ প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইল। তারপর বিষম বিরক্ত হয়ে বললে, ধেৎ, হীরে-মুক্তো কোত্থেকে আসবে? অত সস্তা নাকি?

—তবে কী আছে স্যার? কোনও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গোপন ফরমুলা?

—নাঃ ও-সব কিচ্ছু নয়!—চিরতা-খাওয়ার মতো তেতো মুখ করে সিন্ধুঘোটক বললে, কৌটোয় কী আছে, জানো? নস্যি, এক নম্বরের কড়া নস্যি। তার দাম দু'-পয়সা কিংবা চার পয়সা!

—অ্যাঁঃ! সেই কৌটোর জন্যে—

সিন্ধুঘোট বললে, শাট আপ। এর বেশি আর জানতে চেয়ো না এখন। ওহে অবলাকান্ত, এই নকল কম্বলরামকে এবার নিয়ে যাও—কাঁথারামকেও ছেড়ো না। মেক-আপ করে দশ মিনিটের মধ্যে রেডি করে ফেলো।

আর একবার মনে হল, জেগে আছি, না স্বপ্ন দেখছি? তক্ষুনি নিজের গায়ে চিমটি কেটে আমি চমকে উঠলুম, আর কে যেন আমার কাঁধে হাত দিয়ে বললে, চলো ব্রাদার—আর দেরি নয়!

৩

যেতে হল পাশের একটা ছোট ঘরে।

সঙ্গে এল অবলাকান্ত, পাঁচকড়ি কোচম্যান আর হেঁড়ে গলার সেই লোকটা। দেখলুম ঘরে একটা আয়না রয়েছে, আর থিয়েটারের সময়ে যে-সব রং-টং মাখে

তা-ও রয়েছে একগাদা। এমন কি, কয়েকটা পরচুলো, নকল গোঁফ, এ-সবও আমি দেখতে পেলুম।

কিন্তু মানে কী এ-সবের?

টেনিদা বললে, আপনারা কী চান স্যার? মতলব কী আপনাদের?

—আমাদের মতলব তো সিন্ধুঘোটকের কাছ থেকেই শুনেছ।—সেই হেঁড়ে গলার লোকটা ফস করে টেনিদার মুখে আঠার মতো কী খানিকটা মাখিয়ে দিয়ে বললে, একটা নস্যির কৌটো পাচার করতে হবে।

—কার নস্যির কৌটো?

—বিজয়কুমার?

—নামজাদা ফিল্মস্টার বিজয়কুমার।

অভিনেতা বিজয়কুমার। শুনে আমি একটা খাবি খেলুম। কী সর্বনাশ—তিনি যে একজন নিদারুণ লোক! তাঁর কত ফিল্ম দেখতে-দেখতে আমার মাথার চুল স্রেফ আলপিনের মতো খাড়া হয়ে উঠেছে। ভদ্রলোকের অসাধ্য কাজ নেই। এই সুন্দরবনের জঙ্গলে ধড়াম-ধড়াম করে দুটো বাঘ আর তিনটে কুমির মেরে ফেললেন, এই একটা মোটরবাইকে চড়ে পাঁইপাঁই করে অ্যায়সা ছুট লাগালেন যে, দুরন্ত দস্যুদল ঝড়ের বেগে মোটর ছুটিয়েও তাঁকে ধরতে পারলে না। কখনও-বা দারুণ বৃষ্টির ভেতরে বনের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে করুণ সুরে গান গাইতে লাগলেন। (অত বৃষ্টিতে ভিজেও ওঁর সর্দি হয় না, আর কী জোরালো গলায় গান গাইতে পারেন)! আবার কখনও-বা ভারি নরম গলায় কী সব বলতে বলতে, হলসুদ্ধ সবাইকে কাঁদিয়ে-টাঁদিয়ে ফস করে চলে গেলেন। মানে, ভদ্রলোক কী যে পারেন না, তাই-ই আমার জানা নেই!

এহেন বিজয়কুমারের নর্স্যির কৌটো লোপাট করতে হবে। সেই কৌটোর দাম বড়োজোর আট আনা, তাতে খুব বেশি হলে দু' আনার কড়া নস্যি। হীরে নয়, মুক্তো নয়, সোনা-দানা নয়, ঘোরতর দস্যু ডাক্তার ক্যাডাভ্যারাসের দুরন্ত মারণ-রশ্মির রহস্য নয়। এরই জন্যে এত কাণ্ড! কোত্থেকে এক বিদঘুটে সিন্ধুঘোটক, সন্ধ্যেবেলায় গড়ের মাঠে দুটো বিটকেল লোক—অবলাকান্ত আর ঘেঁটুদা—দুটো খেলনা পিস্তল নিয়ে হাজির, একটা লক্কর ঘোড়ার গাড়িতে চাপিয়ে আমাদের লোপাট করা, ভুতুড়ে পোড়ো বাড়ি, টেনিদাকে কম্বলরাম আর আমাকে কাঁথারাম সাজানো। এ-সব ধাষ্ট্যামোর মানে কী?

লোকগুলো ফসফস করে আঠাফাটা দিয়ে আমার মুখে খানিকটা যাচ্ছেতাই গোঁফ দাড়ি লাগিয়ে দিলে, তা থেকে আবার শুঁটকো চামচিকের মতো কী রকম যেন বিচ্ছিরি গন্ধ আসছিল। আয়নার দিকে তাকিয়ে নিজের চেহারা দেখে আমার তাক লেগে গেল—ঠিক আমাদের পাড়ার ন্যাদাপাগলার মতো দেখাচ্ছে—যে-লোকটা হাঁটু অবধি একটা খাকি শার্ট ঝুলিয়ে, গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরে, হাতে একটা ভাঙা লাঠি নিয়ে মাঝে মাঝে রাস্তায় ট্র্যাফিক কন্ট্রোল করতে চেষ্টা করে। আর টেনিদার মুখভর্তি খোঁচা খোঁচা তিন-চারদিনের

না-কামানো দাড়ি, নাকের পাশে ইয়া বড়া এক কটকটে জড়ুল।

আমি কাঁথারাম কিংবা ন্যাদাপাগলা যাই হই, টেনিদা যে মোক্ষম একটি কম্বলরাম, তাতে আমার আর এতটুকু সন্দেহ রইল না। এমন কি, একথাও মনে হতে লাগল যে, আসলে টেনিদা ছদ্মবেশী কম্বলরাম ছাড়া আর কিছুই নয়! কিন্তু সব মিলিয়ে ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে? এ-সব সাজগোজ করে আমরা যাব কোথায়, আর এই রাতে? এই পোড়োবাড়িতে, ফিল্মস্টার বিজয়কুমারের পকেটটাই বা পাওয়া যাবে কোথায় যে, আমরা ফস করে তা থেকে নস্যির কৌটো লোপাট করে দেব?

আমি মুখ কাঁচুমাচু করে বললুম, বিজয়কুমার কোথায় আছেন স্যার?

যে-লোকটা আমার মুখে দাড়ি গোঁফ লাগাচ্ছিল, সে বললে, আছে কাছাকাছি কোথাও। সময় হলেই জানতে পারবে!

কিন্তু তাঁর পকেট মারবার জন্যে আমাদের ধরে আনা কেন?—টেনিদা গোঁ-গোঁ করে বললে, আমরা ও-সব কাজ কোনওদিন করিনি। আমরা ভালো ছেলে—কলেজে পড়ি।

আর একজন বললে, থামো হে কম্বলরাম, বেশি ফটফট কোরো না। তোমার গুণের কথা কে জানে না, তাই শুনি? বলি, বিজয়কুমারের খাস চাকর হিসেবে তার পকেট থেকে রোজ পয়সা হাতাওনি তুমি? দু'বার সে তোমায় বলেনি,—এই ব্যাটা কম্বল, তোর জ্বালায় আমি আর পারি না—তুই আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যা? নেহাত কান্নাকাটি করেছিলে বলে আর তোমার রান্না মোগলাইকারী না হলে বিজয়কুমারের খাওয়া হয় না বলেই তোমার চাকরিটা থেকে যায়নি? তুমি বলতে চাও, এগুলো সব মিথ্যে কথা?

টেনিদা ঘোঁতঘোঁত করে বললে, কেন বারবার বাজে কথা বলছেন? আমি কম্বলরাম নই।

—এতক্ষণ ছিলে না। কিন্তু এখন আর সে-কথা বলবার জো নেই। শ্রীমান কম্বলরাম নিজে সামনে এসে দাঁড়ালেও এখন ফয়সালা করা শক্ত হবে—কে আসল আর কে নকল! বুঝলে ছোকরা, আমার হাতের কাজই আলাদা। টালা থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত যত থিয়েটার হয়, তাদের কোনও মেক-আপ ম্যান আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে না। তোমাকে যা সাজিয়েছি না,—চোখ থাকলে তার কদর বুঝতে।

—কদর বুঝে আর দরকার নেই। এখন বলুন, আমাদের এই সং সাজিয়ে আপনাদের কী লাভ হচ্ছে।

—এত কষ্ট করে তোমাকে কম্বলরাম বানালুম, আর তুমি বলছ সং!—লোকটা ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : মনে ভারি ব্যথা পেলুম হে ছোকরা, ভারি ব্যথা পেলুম। নাও, চলো এখন সিন্ধুঘোটকের কাছে। তিনিই বলে দেবেন, কী করতে হবে।

আবার সুড়সুড় করে দোতলায় যেতে হল আমাদের। কথা বাড়িয়ে কোনও

লাভ নেই—সে তো বোঝাই যাচ্ছে। শুধু এইটেই বোঝা যাচ্ছে না যে, বিজয়কুমারের পকেট হাতড়াবার জন্যে আমাদের ধরে আনা কেন ? ও তো সিন্ধুঘোটকের দলের যে কেউ করতে পারত—লোকগুলোকে দেখলেই ছ্যাঁচড়া আর গাঁটকাটা বলে সন্দেহ হয়।

তা ছাড়া পকেট মারতে গিয়ে যদি ধরা পড়ি—

ধরা পড়লে কী হবে তা অবিশ্যি বলবার দরকার নেই। তখন রাস্তাসুদ্ধু লোক একেবারে পাইকারী হারে কিলোতে আরম্ভ করবে। হিতোপদেশের সেই 'কীলোৎপাটীত বানরঃ'—অর্থাৎ কিনা কিলের চোটে দাঁতের পাটি-ফাটি সব উপড়ে যাবে আমাদের।

কিন্তু কাজটা বোধহয় টেনিদা—ওরফে কম্বলরামকেই করতে হবে, কাজেই কিলচড় আমার বরাতে না-ও জুটতে পারে। তা ছাড়া টেনিদার ঠ্যাং দুটোও বেশ লম্বা-লম্বা। বেগতিক বুঝলে তিনলাফে এক মাইল রাস্তা পাড়ি দিতে পারে। দেখাই যাক না—কী হয়।

আর সত্যি বলতে কী, এতক্ষণে আমারও কেমন একটা উত্তেজনা হচ্ছিল। কলকাতায় এই দারুণ গরম—চটচটে ঘাম আর রাত্তিরে বিচ্ছিরি গুমোট—সব মিলে মন-মেজাজ খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। এমন কি, গঙ্গার ধারের শীতল সমীরেও যে খুব আরাম হচ্ছিল তা নয়। তারপরেই ঘেঁটুদা আর অবলাকান্ত এসে হাজির। দিব্যি জমে উঠেছিল, বিরাট একটা সিন্ধুঘোটক ছিল, বেশ একটা ভীষণ রকমের কিছু রোমাঞ্চকর ব্যাপার ঘটবে এমনি মনে হচ্ছিল, কিন্তু একটা নস্যির কৌটোতেই সব গোলমাল করে দিচ্ছে। একটা হীরে-মুক্তো হলেও ব্যাপারটা কিছু বোঝা যেত, কিন্তু—

সিন্ধুঘোটক সামনে গড়গড়া টানছে—আশ্চর্য, কলকে যে নেই সেটা কি ওর খেয়ালই হয় না ? নাকি, বিনা কলকেতেই গড়গড়া খাওয়াই ওর অভ্যেস। কে জানে !

আমরা ঘরে যেতেই সিন্ধুঘোটক কটমট করে তাকাল আমার দিকে।

—এটা আবার কে ? কোন্ পাগলাগারদ থেকে একে ধরে আনলে ?

—আজ্ঞে, পাগলা-গারদের আসামী নয়, ও কাঁথারাম।

—ওটাকে সাজাতে গেলে কেন ?

—এমনি একটু হাতমক্‌শ করলুম, আজ্ঞে !—যে আমার মুখে বাব্বু গোঁফদাড়ি লাগিয়ে দিয়েছিল, সে একগাল হেসে জবাব দিলে।

—কম্বলরামটা খাসা হয়েছে। হাঁ—নিখুঁত।—সিন্ধুঘোটক গড়াগড়া রেখে উঠে দাঁড়াল, তারপর এগিয়ে এল আমাদের দিকে। ঠিক যেন শুঁড়কাটা একটা হাতি দু' পায়ে এগিয়ে এল দুলতে-দুলতে।

প্রথমেই টেনিদার নাকটা নেড়েচেড়ে দেখল, তারপর আঙুল নিয়ে জড়ুলটা পরখ করল, তারপর একটা কান ধরে একটু টানল। টেনিদার মুখটা রাগের চোটে ঠিক একটা বেগুনের মতো হয়ে যাচ্ছিল—এ আমি পষ্ট দেখতে পেলাম। কিন্তু

কিচ্ছু করবার জো নেই—অনেকগুলো লোক রয়েছে চারপাশে, টেনিদা শুধু গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

—কান ধরছেন কেন, স্যার ?

—কেন, অপমান হল নাকি ?—সিন্ধুঘোটক একরাশ দাঁত বের করে খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠল : ওহে, মজার কথা শুনেছ ? কম্বলরামের অপমান হচ্ছে !

ঘরসুদ্ধ লোক অমনি একসঙ্গে ঘোঁকঘোঁক করে হেসে উঠল। সব চাইতে বেশি করে হাসল ঘেঁটুদা, টেনিদা যাকে ল্যাং মেরে গোবরের ভেতর ফেলে দিয়েছিল।

হাসি থামল সিন্ধুঘোটক বললে, যাক—আর সময় নষ্ট করে দরকার নেই। এবার অ্যাকশন।

—অ্যাকশন !—শুনেই আমার পিলে-টিলে কেমন চমকে উঠল, আমি টেনিদার দিকে চাইলুম। দেখলুম, খাঁড়ার মতো নাকটা যেন অনেকখানি খাড়া হয়ে উঠেছে, রাগে চোখ দুটো দিয়ে আগুন ছুটছে !

৪

সেই বাড়ি থেকে আমরা বেরিয়ে পড়লুম আবার। এবার ঘোড়ার গাড়িতে নয়, স্রেফ পায়দলে। আমাদের ঘিরে ঘিরে চলল আরও জনসাতেক লোক।

রাস্তাটা এবড়ো-খেবড়ো—দূরে দূরে মিটমিটিয়ে আলো জ্বলছে। পথের ধারে কাঁচা ড্রেন, কচুরিপানা, ঝোপজঙ্গল, কতকগুলো ছাড়া-ছাড়া বাড়ি, কয়েকটা ঠেলাগাড়িও পড়ে আছে ওদিকে-ওদিকে। দুজন লোক আসছিল—ভাবলুম চেঁচিয়ে উঠি, কিন্তু তক্ষুনি আমার কানের কাছে কে যেন ফ্যাঁসফ্যাঁস করে বন-বেড়ালের মতো বললে, এই ছোকরা, একেবারে স্পিকটি নট। চেঁচিয়েছিস কি তক্ষুনি মরেছিস, এবার খেলনা-পিস্তল নয়—সঙ্গে ছোরা আছে !

লোক দুটো বোধ হয় কুলি-টুলি হবে, যেতে-যেতে কটমটিয়ে কয়েকবার চেয়ে দেখল আমাদের দিকে। আমি প্রায় ভাঙা গলায় বলতে যাচ্ছিলুম—'বাঁচাও ভাই সব—' কিন্তু ছোরার ভয়ে নিজের আর্তনাদটা কোঁত করে গিলে ফেলতে হল।

এর মধ্যে টেনিদা একবার আমার হাতে চিমটি কাটল। যেন বলতে চাইল, এই—চুপ করে থাক !

হঠাৎ লোকগুলো আর-একটা ছোট রাস্তার সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। একজন সেই রাস্তা বরাবর আঙুল বাড়িয়ে বললে, দেখতে পাচ্ছ ?

আমরা দেখতে পেলুম।

রাস্তাটা বেশি দূর যায়নি—দু'পাশে কয়েকটা ঘুমিয়ে-পড়া টিনের ঘর রেখে আন্দাজ দুশো গজ দূরে গিয়ে থমকে গেছে। সেখানে একটা মস্তবড় লোহার

ফটক, তাতে জোরালো ইলেকট্রিক লাইট জ্বলছে আর ফটকের মাথার ওপর লেখা রয়েছে : 'জয় মা তারা স্টুডিয়ো।'

ঘেঁটুদা বললে, চলে যাও—ওইখানেই তোমাদের কাজ। এই কাঁথারামকেও সঙ্গে নিয়ো—নস্যির কৌটোটা বিজয়কুমারের পকেট থেকে লোপাট করে এর হাতে দেবে, তারপর যেমন গিয়েছিলে—সুট করে বেরিয়ে আসবে। ব্যস, তা হলেই কাজ হাসিল। তারপরেই তোমাদের হাত ভরে প্রাইজ দেবে সিন্ধুঘোটক।

—কিন্তু একটা নস্যির কৌটোর জন্যে—আমি গজগজ করে উঠলুম।

—নিশ্চয় নিদারুণ রহস্য আছে!—ঘেঁটুদা আবার বললে : কিন্তু তা জেনে তোমাদের কোনও দরকার নেই। এখন যা বলছি, তাই করো। সাবধান—স্টুডিয়োর ভেতরে গিয়ে যদি কোনও কথা ফাঁস করে দাও, কিংবা পালাতে চেষ্টা করো, তা হলে কিন্তু নিদারুণ বিপদে পড়বে। সিন্ধুঘোটকের নজরে পড়লে একটা পিঁপড়ে পর্যন্ত লুকিয়ে বাঁচতে পারে না, সেটা খেয়াল রেখো।

টেনিদা বললে, খেয়াল থাকবে।

ঘেঁটুদা আবার বললে, আমরা সব এখানেই রইলুম। গেটের দারোয়ান বিজয়কুমারের পেয়ারের চাকর কম্বলরামকে চেনে—তোমাকে বাধা দেবে না। আর তুমি কাঁথারামকেও নিজের ভাই বলে চালিয়ে দেবে। গেট দিয়ে ঢুকে একটু এগিয়েই দেখবে গুদামের মতো প্রকাণ্ড একটা টিনের ঘর—তার উপর লেখা রয়েছে ইংরিজিতে —২। ওটাই হচ্ছে দু' নম্বর ফ্লোর, ওখানেই বিজয়কুমারের শুটিং হচ্ছে।

—ফ্লোর! শুটিং! এ সব আবার কী ব্যাপার?—টেনিদা ঘাবড়ে গিয়ে জানতে চাইল : ওখানে আবার গুলিগোলার কোনও ব্যাপার আছে নাকি?

—আরে না—না, ও সমস্ত কোনও ঝামেলা নেই। বললুম তো ফ্লোর হচ্ছে গুদামের মতো একরকমের ঘর, ওখানে নানারকম দৃশ্য-টৃশ্য তৈরি করে সেখানে ফিল্ম তোলা হয়। আর শুটিং হল গিয়ে ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা—কাউকে গুলি করার সঙ্গে তার কোনও সম্পর্ক নেই!

—বুঝতে পারলুম। আচ্ছা—দু' নম্বর ফ্লোরে না হয় গেলুম—সেখানে না হয় দেখলুম, বিজয়কুমারের শুটিং হচ্ছে—তখন কী করব?

সুযোগ বুঝে তার কাছে গুটি গুটি এগিয়ে যাবে। সে হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'কী রে কম্বুলে, দেশে গিয়েই সঙ্গে সঙ্গে চলে এলি যে? আর স্টুডিয়োতেই বা এলি কেন?' উত্তরে তুমি বলবে, 'কী করব স্যার—দেশের বাড়িতে গিয়েই আপনার সম্পোক্কে একটা খারাপ স্বপ্ন দেখলুম—মেজাজ খিঁচড়ে গেল এজ্ঞে, তাই চলে এলুম। শুনলুম আপনি স্টুডিয়োতে এয়েচেন, তাই দর্শন করে চক্ষু সাথ্থক করে গেলুম!' শুনে বিজয়কুমার হয়তো হেসে বলবে, 'ব্যাটা তো মহা খলিফা!'—বলে তোমার পিঠে চাপড়ে দেবে, আর একটা টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বলবে, 'না—কিছু মিষ্টি-ফিষ্টি খেয়ে বাড়ি চলে যা। আমার ফিরতে রাত হবে, পারিস তো ভালো দেখে একটা মুরগি রোস্ট করে রাখিস।' যখন এই সব কথা বলতে থাকবে, তখন সেই ফাঁকে তুমি চট করে তার পকেট থেকে নস্যির ডিবেটা তুলে নেবে।

—যদি ধরা পড়ে যাই?

—বলবে, পকেট মারিনি স্যার, একটা পিঁপড়ে উঠেছে, তাই ঝাড়ছিলুম।

—যদি বিশ্বেস না করে?

—অভিমান করে বলবে, স্যার, আমার কথায় অবিশ্বাস? আমি আর এ-পোড়ামুখ দেখাব না—গঙ্গায় ডুবে মরব। বলতে-বলতে কাঁদতে থাকবে। বিজয়কুমার বলবে—কী মুস্কিল—কী মুস্কিল! তখন তার পা জড়িয়ে ধরার কায়দা করে তাকে পটকে দেবে। আর ধাঁই করে যদি একবার আছাড় খায়, আর ভাবতে হবে না—তৎক্ষণাৎ পকেট থেকে—বুঝেছ?

টেনিদা বললে, বুঝেছি।

—তা হলে এগোও।

—এগোচ্ছি।

—খবরদার, কোনও রকম চালাকি করতে যেয়ো না, তা হলেই—

—আজ্ঞে জানি, মারা পড়ব।

ঘেঁটুদা খুশি হয়ে বললে, শাবাশ—ঠিক আছে। এবার এগিয়ে যাও—

টেনিদা বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ, এগিয়ে চললুম।

আমরা দু'জনে গুটি-গুটি 'জয় মা তারা' স্টুডিয়োর দিকে চলতে লাগলুম। ওরা যে কোথায় কোনখানে ভুট করে লুকিয়ে গেল, আমরা পেছন ফিরেও আর দেখতে পেলুম না।

আমি চাপা গলায় বললুম, টেনিদা?

—হুঁ!

—এই তো সুযোগ।

টেনিদা আবার বললে, হুঁ!

—সমানে হুঁ-হুঁ করছ কী? এখন ওরা কেউ কোথাও নেই—আমরা মুক্ত—এখন একেবারে বেপরোয়া হয়ে—মানে যাকে বলে উদ্দাম উল্লাসে ছুটে পালাতে পারি এখান থেকে। ফিল্ম স্টুডিয়ো যখন রয়েছে, তখন জায়গাটা নিশ্চয় টালিগঞ্জ। আমরা যদি 'জয় মা তারা' স্টুডিয়োতে না গিয়ে পাশের খানা-খন্দ ভেঙে এখন চোঁ-চোঁ ছুটতে থাকি, তা হলে—

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, এখন কুরুবকের মতো বকবক করিসনি প্যালা, আমি ভাবছি।

—কী ভাবছ? সত্যি সত্যিই তুমি স্টুডিয়োতে ঢুকে ফিল্মস্টার বিজয়কুমারের পকেট মারবে নাকি?

—শাট আপ! এখন সামনে পুঁদিচ্চেরি!

খুব জটিল সমস্যায় পড়লে টেনিদা বরাবর ফরাসী আউড়ে থাকে। আমি বললুম, পুঁদিচ্চেরি? সে তো পণ্ডিচেরী! এখানে তুমি পণ্ডিচেরী পেলে কোথায়?

—আঃ, পণ্ডিচেরী নয়, আমি বলছিলুম, ব্যাপার অত্যন্ত ঘোরালো। বুদ্ধি করতে

হবে !

আমি বললুম, কখন বুদ্ধি করবে ? ইদিকে আমাকে আবার এক বিতিকিচ্ছিরি পাগল সাজিয়েছে, মুখে কিচমিচ করছে সাতরাজ্যের দাড়ি, কুটকুটুনিতে আমি তো মারা গেলুম। ওদিকে তুমি আবার চলেছ পকেট মারতে—ধরা পড়লে কিলিয়ে একেবারে কাঁটাল পাকিয়ে দেবে, এখন—

—চোপ রাও।

অগত্যা চুপ করতে হল। আর আমরা একেবারে 'জয় মা তারা' স্টুডিয়োর গেটের সামনে এসে পৌঁছলুম। ভয়ে আমার বুক দুরদুর করতে লাগল—মনে হতে লাগল, একটু পরেই একটা যাচ্ছেতাই কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে।

স্টুডিয়োর লোহার ফটক আধখোলা। পাশে দারোয়ানের ঘর আর ঘরের বাইরে খালি গায়ে এক হিন্দুস্থানী জাঁদরেল দারোয়ান বসে একমনে তার আরও জাঁদরেল গোঁফজোড়াকে পাকিয়ে চলেছে।

টেনিদাকে দেখেই সে একগাল হেসে ফেলল।

—কেয়া ভেইয়া কম্বলরাম, সব আচ্ছা হ্যায় ?

—হাঁ, সব আচ্ছা হ্যায়।

—তুমহারা সাথ ই পাগলা কৌন হো ?

আমাকেই পাগল বলছে নিশ্চয়। যে-লোকটা আমাকে হাতের কাছে পেয়ে মনের সুখে মেক-আপ দিয়েছিল, তাকে আমার স্রেফ কড়মড়িয়ে চিবিয়ে খেতে ইচ্ছে করল। প্রায় বলতে যাচ্ছিলুম, হাম পাগলা নেহি হ্যায়, পটলডাঙা-কা প্যালারাম হ্যায়, কিন্তু টেনিদার একটা চিমটি খেয়েই আমি থেমে গেলুম।

টেনিদা বললে, ই পাগলা নাহি হ্যায়—ই হ্যায় আমার ছোটা ভাই কাঁথারাম।

—কাঁথারাম ?—দারোয়ান হাঁ করে কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে বললে, রাম—রাম—সিয়ারাম। রামজী-যে দুনিয়ামে কেতনা অজীব চীজোঁকো পয়দা কিয়া ! আচ্ছা—চলা যাও অন্দরমে। তুমহারা বাবু দু-লম্বর মে হ্যায়—হুঁয়াই শুটিং চল রহা হ্যায়।

আমরা স্টুডিয়োর ভেতরে পা দিলুম। চারদিকে গাছপালা, ফুলের বাগান, একটা পরী-মার্কা ফোয়ারাও দেখতে পেলুম—আর কত যে আলো জ্বলছে, কী বলব। দেখলুম, সব সারি-সারি গুদামের মতো উঁচু-উঁচু টিনের ঘর, তাদের গায়ে বড় বড় শাদা হরফে এক-দুই করে নম্বর লেখা। দেখলুম, বড় বড় মোটরভ্যানে রেডিয়োর মতো কী সব যন্ত্র নিয়ে, কানে হেডফোন লাগিয়ে কারা সব বসে আছে, আর রেডিয়োর মতো সেই যন্ত্রগুলোতে থিয়েটারের পার্ট করার মতো আওয়াজ উঠছে।

প্যান্টপরা লোকজন ব্যস্ত হয়ে এ-পাশ ও-পাশ আসা-যাওয়া করছিল, আর মাঝে-মাঝে কেউ-কেউ তাকিয়ে দেখছিল আমার দিকেও। একজন ফস করে এগিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

—বাঃ, বেশ মেকআপ হয়েছে তো ! চমৎকার !

মেক আপ ! ধরে ফেলেছে !

আমার বুকের রক্ত সঙ্গে সঙ্গে জল হয়ে গেল। আমি প্রায় হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু টেনিদা পটাং করে আমাকে চিমটি কাটল।

লোকটা আবার বললে, এক্সট্রা বুঝি ?

এক্সট্রা তো বটেই, কম্বলরামের সঙ্গে কাঁথারাম ফাউ। আমি 'ক' বলবার জন্যে হাঁ করেছিলুম, কিন্তু তক্ষুনি টালিগঞ্জের গোটাকয়েক ধাড়ী সাইজের মশা আমার মুখ বরাবর তাড়া করে আসাতে ফস করে মুখটা বন্ধ করে ফেলুলম।

টেনিদা বললে, হ্যাঁ, স্যার, এক্সট্রা। থিয়োরেম নয়, প্রবলেম নয়, একদম এক্সট্রা ! আর এত বাজে এক্সট্রা যে বলাই যায় না।

—বা-রে কম্বলরাম, বিজয়কুমারের সঙ্গে থেকে তো খুব কথা শিখেছ দেখছি। তা এ কোন্ বইয়ের এক্সট্রা ?

—আজ্ঞে জিয়োমেট্রির। থার্ড পার্টের।

লোকটা এবারে চটে গেল। বললে, দেখো কম্বলরাম, বিজয়কুমার আদর দিয়ে-দিয়ে তোমার মাথাটি খেয়েছেন। তুমি আজকাল যাকে তাকে যা খুশি তাই বলো। তুমি যদি আমার চাকর হতে, তা হলে আমি তোমায় পিটিয়ে স্রেফ তক্তপোশ করে দিতুম।

বলেই হনহন করে চলে গেল সে।

আমি ভয় পেয়ে বললুম, টেনিদা—কী হচ্ছে এসব ?

টেনিদা বললে, এই তো সবে রগড় জমতে শুরু হয়েছে। চল—এবার ঢোকা যাক দু' নম্বর স্টুডিয়োতে।

৫

স্টুডিয়ো মানে যে এমনি একখানা এলাহি কাণ্ড, কে ভেবেছিল সে-কথা।

সামনেই যেন থিয়েটারের ছোট একটা স্টেজ খাটানো রয়েছে, এমনি মনে হল। সেখানে ঘর রয়েছে, দাওয়া রয়েছে, পেছনে আবার সিনে-আঁকা দু'-দুটো নারকেল গাছও উঁকি মারছে। সে সব তো ভালোই—কিন্তু চারদিকে সে কী ব্যাপার ! কত সব বড়-বড় আলো, কত মোটা-মোটা ইলেকট্রিকের তার, বনবনিয়ে ঘোরা সব মস্ত-মস্ত পাখা। ক'জন লোক সেই দাওয়াটার ওপর আলো ফেলছে, একজন কোটপ্যান্ট পরা মোটা মতন লোক বলছে : ঠিক আছে—ঠিক আছে।

ঢুকে আমরা দু'জন স্রেফ হাঁ করে চেয়ে রইলুম। সিনেমা মানে যে এইরকম গোলমেলে ব্যাপার, তা কে জানত ? কিছুক্ষণ আমরা কোনও কথা বলতে পারলুম

না, এককোণায় দাঁড়িয়ে ড্যাবডেবে চোখে তাকিয়ে থাকলুম কেবল।

কোত্থেকে আর একজন গেঞ্জি আর প্যান্টপরা লোক বাজখাঁই গলায় চেঁচিয়ে উঠল : মনিটার।

সঙ্গে-সঙ্গে মোটা লোকটা বললে, লাইটস!

তার আশপাশ থেকে, ওপর থেকে—অসংখ্য সার্চলাইটের মতো আলো সেই তৈরি-করা ঘরটার দাওয়ায় এসে পড়ল। মোটা লোকটা বললে, পাঁচ নম্বর কাটো।

—কার নম্বর আবার কেটে নেবে? এখানে আবার পরীক্ষা হয় নাকি—টেনিদাকে আমি ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলুম।

টেনিদা কুট করে আমার কানে একটা চিমটি দিয়ে ফ্যাস-ফ্যাস করে বললে, চুপ করে থাক।

মোটা লোকটা আবার চেঁচিয়ে বললে, কেটেছ পাঁচ নম্বর?

একটা উঁচুমতন জায়গা থেকে কে যেন একটা আলোর ওপর একটুকরো পিচবোর্ড ধরে বললে, কেটেছি।

গেঞ্জি আর প্যান্টপরা লোকটা আবার বাজখাঁই গলায় বললে, ডায়লগ।

আমাদের পাশ থেকে হাওয়াই শার্ট আর পাজামা পরা বেঁটেমতন একজন লোক মোটা একটা খাতা বগলদাবা করে এগিয়ে গেল। আর তখুনি আমরা রোমাঞ্চিত হয়ে দেখলুম—কোত্থেকে সুট করে আলোর মধ্যে এসে দাঁড়ালেন—আর কেউ নয়, স্বয়ং বিজয়কুমার। তাঁর পরনে হলদে জামা—হলুদ কাপড়—যেন ছুট পরব সেরে চলে এসেছেন।

সেই বিজয়কুমার! যিনি ঝপাং করে নদীর পুল থেকে জলে লাফিয়ে পড়েন—চলন্ত ট্রেনের জানালা দিয়ে উধাও হয়ে যান, যিনি কখনও কচুবন কখনও-বা ভ্যারেন্ডার ঝোপের মধ্যে দাঁড়িয়ে আকুল হয়ে গান গাইতে থাকেন, কথা নেই বার্তা নেই—দুম করে হঠাৎ মারা যান—সেই দুরন্ত—দুর্ধর্ষ—দুবার বিজয়কুমার আমাদের সামনে। একেবারে সশরীরে দাঁড়িয়ে। আর ওঁরই পকেট থেকে আমাদের নস্যির কৌটোটা লোপট করে দিতে হবে।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম 'টে'—সঙ্গে-সঙ্গে টেনিদা আমার কানে আবার দারুণ একটা চিমটি কষিয়ে ফ্যাস-ফ্যাস করে বললে, চুপ।

আমার বুকের ভেতর তখন দুর-দুর করে কাঁপছে। এখুনি—এই মুহূর্তে ভয়াবহ লোমহর্ষণ ব্যাপার ঘটে যাবে। এত আলো, এত লোকজন—এর ভেতর থেকে নস্যির কৌটো লোপাট করা। ধরা তো পড়তেই হবে, আর স্টুডিয়োসুদ্ধু লোক সেই ফাঁকে আমাদের পিটিয়ে তুলোধোনা করে দেবে। লেপ-টেপ করে ফেলাও অসম্ভব নয়।

আমি দেখলুম, বিজয়কুমার সেই পাজামা পরা বেঁটে লোকটার খাতা থেকে কী যেন বিড়বিড় করে পড়ে নিলেন খানিকক্ষণ। তারপর বললেন, ইয়েস—ঠিক আছে।

বলেই, এগিয়ে এসে ঘরের দাওয়াটায় বসলেন। অমনি যেন শূন্য দিয়ে একটা মাইক্রোফোন নেমে এসে ওঁর মাথার একটুখানি ওপরে থেমে দাঁড়াল। বিজয়কুমার ভাবে গদ্‌গদ্ হয়ে বলতে লাগলেন : 'না—না, এ আমার মাটির ঘর, আমার স্মৃতি, আমার স্বপ্ন—এ ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। জমিদারের অত্যাচারে যদি আমার প্রাণও যায়—তবু আমার ভিটে থেকে কেউ আমায় তাড়াতে পারবে না।'

আমি টেনিদার কানে-কানে জিজ্ঞেস করলুম, রবিঠাকুরের 'দুই বিঘা জমি' ছবি হচ্ছে, না?

টেনিদা বললে, তা হবে।

—তা হলে বিজয়কুমার নিশ্চয় উপেন। কিন্তু আমগাছ কোথায় টেনিদা? পেছনে তো দেখছি দুটো নারকেল গাছ। উপেনের যে নারকেল গাছও ছিল, কই—রবিঠাকুরের কবিতায় তো সে কথা লেখা নেই।

টেনিদা আবার আমাকে ফ্যাস-ফ্যাস করে বললে, বেশি বকিসনি, প্যালা। ব্যাপার এখন সুব সিরিয়াস—যাকে বলে পুঁদিচ্চেরি। এখন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাক—দ্যাখ আমি কী করি। ওই বিতিকিচ্ছিরি সিন্ধুঘোটকটাকে যদি ঠাণ্ডা না করতে পারি, তাহলে আমি পটলডাঙার টেনি শর্মাই নই!

এর মধ্যে দেখি, বিজয়কুমার বলা-টলা শেষ করে একখানা রুমাল নিয়ে চোখ মুছছেন। গেঞ্জি আর প্যান্টপরা মোটা লোকটা আকাশে মুখ তুলে চাঁছা গলায় চেঁচিয়ে উঠেছে : সাউন্ড, হাউইজ্ জ্যাট? (হাউজ দ্যাট) আর যেন আকাশবাণীর মতো কার মিহি সুর ভেসে আসছে : ও-কে, ও-কে—

বিজয়কুমার দাওয়া ছেড়ে উঠে পড়তেই—

টেনিদা আমার কানে-কানে বললে, প্যালা, স্টেডি—আর বলেই ছুটে গেল বিজয়কুমারের দিকে।

—স্যার—স্যার—

বিজয়কুমার ভীষণ চমকে বললে, আরে, কম্বলরাম যে। আরে, তুই না একমাসের জন্যে দেশে গিয়েছিলি? কী ব্যাপার, হঠাৎ ফিরে এলি যে? আর স্টুডিয়োতেই বা এলি কেন হঠাৎ? কী দরকার?

আমি দম বন্ধ করে দেখতে লাগলুম।

—স্যার, আমি কম্বলরাম নই—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল।

—তবে কি ভোম্বলরাম?—বিজয়কুমার খুব খানিকটা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে উঠলেন : কোথা থেকে সিদ্ধি-ফিদ্ধি খেয়ে আসিসনি তো? যা—যা—শিগগির বাড়ি যা, আর আমার জন্যে ভালো একটা মুরগির রোস্ট পাকিয়ে রাখ গে। রাত বারোটা নাগাদ আমি ফিরব।

—আমার কথা শুনুন স্যার, আপনার ঘোর বিপদ।

বিজয়কুমার দারুণ অবাক হয়ে কিছুক্ষণ হাঁ করে টেনিদার দিকে চেয়ে রইলেন : ঘোর বিপদ? কী বকছিস কম্বলরাম?

—আবার বলছি আপনাকে, আমি কম্বলরাম নই। আমি হচ্ছি পটলডাঙার

টেনিরাম, ভালো নাম ভজহরি মুখুজ্যে।

আর বলেই টেনিদা একটানে গাল থেকে জড়ুলটা খুলে ফেলল : দেখছেন ?

—কী সর্বনাশ। বিজয়কুমার হঠাৎ হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন।

স্টুডিয়োতে হইচই পড়ে গেল।

—কী হল স্যার ? কী হয়েছে ?

বিজয়কুমার বললেন, কম্বলরাম ওর গাল থেকে জড়ুল তুলে ফেলেছে!

সেই গেঞ্জি আর প্যান্টপরা মোটা ভদ্রলোক সোজা ছুটে এলেন টেনিদার দিকে।

—হোয়াট ? জড়ুল খুলে ফেলেছে! জড়ুল কি কখনও খোলা যায় ? আরও বিশেষ করে কম্বলরামের জড়ুল ? ইম্‌সিবল। ইম্‌পসিবল!

টেনিদা আবার মোটা গলায় বললে, এই থার্ড টাইম বলছি, আমি কম্বলরাম নই—লেপরাম, জাজিরাম, মশারিরাম, তোশকরাম—এমনি রামে-রামে—কোনও রামই নই। আমি হচ্ছি পটলডাঙার ভজহরি মুখুজ্যে! দুনিয়াসুদ্ধ লোক আমাকে এতটাকাল টেনি শর্মা বলে জানে।

স্টুডিয়োর ভেতরে একসঙ্গে আওয়াজ উঠল ; মাই গড!

বিজয়কুমার কেমন ভাঙা গলায় বললে, তা হলে কম্বলরামের ছদ্মবেশ ধরার মানে কী ? নিশ্চয়ই একটা বদমতলব আছে। খুব সম্ভব আমাকে লোপাট করবার চেষ্টা। তারপর হয়তো কোথাও-বা লুকিয়ে রেখে একেবারে একলাখ টাকার মুক্তিপণ চেয়েই চিঠি দেবে আমার বাড়িতে!

সিনেমার অমন দুর্ধর্ষ বেপরোয়া নায়ক বিজয়কুমার হঠাৎ যেন কেমন চামচিকের মতো শুঁটকো হয়ে গেলেন আর চিঁচিঁ করে বলতে লাগলেন : ওঃ গেলুম, আমি গেলুম। খুন—পুলিশ—ডাকাত।

আর একজন কে চেঁচিয়ে উঠল : অ্যাম্বুলেন্স—ফায়ার ব্রিগেড—সৎকার সমিতি।

কে যেন আরও জোরে চ্যাঁচাতে লাগল : মড়ার খাটিয়া, হরিসংকীর্তনের দল—টেনিদা হঠাৎ বাঘাটে গলায় হুঙ্কার ছাড়ল ; সাইলেন্স।

আর সেই নিদারুণ হুঙ্কারে স্টুডিয়োসুদ্ধ লোক কেমন ভেবড়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল।

টেনিদা বলতে লাগল : সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ। (বেশ বক্তৃতার ভঙ্গিতে হাত-পা নেড়ে বলে চলল) আপনারা মিথ্যে বিচলিত হবেন না। আমি ডাকাত নই, অত্যন্ত নিরীহ ভদ্রসন্তান। পুলিশ যদি ডাকতেই হয়, তা হলে ডেকে সিন্ধুঘোটক গ্রেপ্তার করবার জন্যে ব্যবস্থা করুন। সেই আমাদের পাঠিয়েছে বিজয়কুমারের পকেট থেকে নস্যির কৌটো—

আর বলতে হল্যে না।

'সিন্ধুঘোটক' বলতেই সেই মোটা ভদ্রলোক—'উঃ গেলুম'—বলে একটা সোফার ওপর চিতপাত হয়ে পড়লেন। আর 'নস্যির কৌটো' শুনেই বিজয়কুমার

গলা ফাটিয়ে আর্তনাদ করলেন : প্যাক আপ—প্যাক আপ।

মোটা ভদ্রলোক তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন সোফা থেকে। তেড়ে গেলেন বিজয়কুমারের দিকে।

—যখনই শুনেছি সিন্ধুঘোটক তখনই জানি একটা কেলেঙ্কারি আজ হবে। কিন্তু প্যাক আপ চলবে না—আজ শুটিং হবেই।

বিজয়কুমার ভীষণ এক গর্জন করে বললেন, না—শুটিং হবে না। ওই অযাত্রা নাম শোনাবার পরে আমি কিছুতেই কাজ করব না আজ। আমার কন্ট্রাক্ট খারিজ করে দিন।

—খারিজ মানে ?—প্যান্টপরা মোটা ভদ্রলোক দাপাদাপি করতে লাগলেন : খারিজ করলেই হল ? পয়সা লাগে না—না ? যেই শুনেছি সিন্ধুঘোটক—আমারও মাথায় খুন চেপে গেছে। এক-দুই-তিন—আই মিন দশ পর্যন্ত গুনতে রাজি আছি—এর মধ্যে আপনি যদি ক্যামেরার সামনে গিয়ে না দাঁড়ান, সত্যি একটা খুনোখুনি হয়ে যাবে।

বিজয়কুমার রেগে আগুন হয়ে গেলেন। মাটিতে পা ঠুকে বললেন, কী, আমাকে ভয় দেখানো। খুনোখুনি হয়ে যাবে!—আস্তিন গোটাতে গোটাতে বললেন, চলে আয় ইদিকে, এক ঘুষিতে তোর দাঁত উপড়ে দেব।

—বটে। দাঁত উপড়ে দেবে! আমাকে তুই-তোকারি!—বলেই মোটা লোকটা বিজয়কুমারের দিকে ঝাঁপ মারল : ইঃ, ফিল্মস্টার হয়েছেন! তারকা। যদি এক চড়ে তোকে জোনাকি বানিয়ে দিতে না পারি—

আমি হাঁ করে ব্যাপারটা দেখছিলুম আর আমার মাথার ভেতরে সব যেন কীরকম তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু মোটা লোকটা ঝাঁপিয়ে এগিয়ে আসতেই কেলেঙ্কারির চরম। ঘরভর্তি ইলেকট্রিকের সরু মোটা তার ছড়িয়ে ছিল, লোকটার পায়ে একটা তার জড়িয়ে গেল দুড়ুম করে আছাড় খেল সে। একটা আলো আছড়ে পড়ল তার সঙ্গে। তক্ষুনি দুম—ফটাস!

কোথা থেকে যেন কী কাণ্ড হয়ে গেল—স্টুডিও জুড়ে একেবারে অথই অন্ধকার।

তার মধ্যে আকাশ-ফাটানো চিৎকার উঠতে লাগল : চোর— ডাকাত— খুন— অ্যাম্বুলেন্স— সৎকারসমিতি— হরিসংকীর্তন— মড়ার খাটিয়া—

আর সেই অন্ধকারে কে যেন কাকে জাপটে ধরল, দুমদাম করে কিলোতে লাগল। অনেক গলার আওয়াজ উঠতে লাগল : মার—মার—মার—

টেনিদা টকাৎ করে আমার কানে একটা চিমটি দিয়ে বললে, প্যালা—এবার—কুইক—

কীসের কুইক তা আর বলতে হল না! সেই অন্ধকারের মধ্যে টেনে দৌড় লাগালুম দু'জনে।

'জয় মা তারা' স্টুডিয়োর বাইরে বাগানেও সব আলো নিবে গেছে, গেটে যে দারোয়ান বসেছিল, সে কখন গোলমাল শুনে ভেতরে ছুটে এসেছে। আমরা

খোলা দরজা দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলুম, তারপর ঢোকবার সময় ডানদিকে যে পালানোর রাস্তা দেখেছিলুম, তাই দিয়ে আরও অনেকখানি দৌড়ে দেখি—সামনে একটা বড় রাস্তা।

কিন্তু সিন্ধুঘোটক ?

তার দলবল ?

না—কেউ কোথাও নেই। শুধু একটু দূরে মিটার তুলে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে, আর তাতে বসে মস্ত গালপাট্টা দাড়িওলা এক শিখ ড্রাইভার একমনে ঝিমুচ্ছে।

টেনিদা বললে, ভগবান আছেন প্যালা, আর আমাদের পায় কে ! সর্দারজী—এ সর্দারজী—

সর্দারজী চোখ মেলে উঠে বসে ঘুম-ভাঙা জড়ানো-গলায় বললে, কেয়া হুয়া ?

—আপ ভাড়া যায়েগা ?

—কাঁহে নেহি যায়েগা ? মিটার তো খাড়া হ্যায়।

—তব চলিয়ে—বহুৎ জলদি।

—কাঁহা ?

—পটলডাঙা।

—ঠিক হ্যায়। বৈঠিয়ে।

গাড়ি ছুটল। একটু পরেই দেখলুম আমরা রসা রোডে এসে পড়েছি। তখনও পথে সমানে লোক চলছে, ট্রাম যাচ্ছে—বাস ছুটছে।

আমি তখনও হাঁপাচ্ছি।

বললুম, টেনিদা, তা হলে সত্যিই সিন্ধুঘোটকের হাত থেকে বেঁচে গেলুম আমরা।

টেনিদা বললে, তাই তো মনে হচ্ছে।

—কিন্তু ব্যাপার কী, টেনিদা ? হঠাৎ গেঞ্জি-পরা ওই মোটা লোকটা অত চটে গেল কেন, আর নস্যির কৌটোর কথা শুনেই বা বিজয়কুমার—

টেনিদা কটাং করে আমায় একটি চিমটি কেটে বললে, চুলোয় যাক। পড়ে মরুক তোর সিন্ধুঘোটক আর যমের বাড়ি যাক তোর ওই বিজয়কুমার। এখন ঘরের ছেলে ঘরে ফিরতে পারলে বাঁচি আমরা দু'জনে।

আমাদের নিয়ে গাড়ি যখন পটলডাঙার মোড়ে এসে থামল—তখন মহাবীরের পানের দোকানের ঘড়িতে দেখি—ঠিক দশটা বাজতে আট মিনিট।

মাত্র তিন ঘণ্টা।

তিন ঘণ্টার মধ্যে এত কাণ্ড—একেবারে রহস্যের খাসমহল। কিন্তু তখনও কিছু বাকি ছিল।

টেনিদা বললে সর্দারজী, কেতনা হুয়া ?

পরিষ্কার বাংলায় সর্দারজী বললে, পয়সা লাগবে না—বাড়ি চলে যাও।

আমরা দু'জনেই একসঙ্গে চমকে উঠলুম—সে কী !

হঠাৎ সর্দারজী হা-হা করে হেসে উঠল। একটানে দাড়িটা খুলে ফেলে বললে, চিনতে পারছ ?

আমরা লাফিয়ে পেছনে সরে গেলুম। টেনিদার মুখ থেকে বেরুল : ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস।

সর্দারজী আর কেউ নয়—স্বয়ং সেই অবলাকান্ত। সেই মেফিস্টোফিলিসদের একজন !

আর একবার অট্টহাসি, তারপরেই তীরবেগে ট্যাক্সিটা শিয়ালদার দিকে ছুটে চলল।

আমি বুদ্ধি করে নম্বরটা পড়তে চেষ্টা করলুম, কিন্তু পড়া গেল না—একরাশ নীল ধোঁয়া বেরিয়ে গাড়ির পেছনের নম্বর-টম্বর সব ঢেকে দিয়েছে !

৬

সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম—বেশ ভালো একটা উপদেশপূর্ণ ইংরেজি বই, এইসব বলে-টলে তো কোনওমতে বাড়ির বকুনির হাত থেকে রেহাই পাওয়া গেল। কিন্তু মেজাজ ভীষণ খারাপ হয়ে রইল। বলতে ভুলে গেছি, গাড়িতে বসেই মুখের রং-টংগুলো ঘসে-টসে তুলে ফেলেছিলুম—আর বাড়িতে ঢুকেই সোজা বাথরুমে ঢুকে একদম সাফসুফ হয়ে নিয়েছিলুম। ভাগ্যিস, অত রাতে কারও ভালো করে নজরে পড়েনি, নইলে শেষ পর্যন্ত হয়তো একটা কেলেঙ্কারিই হয়ে যেত।

কিন্তু ব্যাপারটা কী হল ? কেন আমাদের অমন করে ধরে নিয়ে গেল সিন্ধুঘোটক, কেনই বা মুখে রং মেখে রং সাজাল, আর জয় মা তারা স্টুডিয়োর ভেতরেই বা এ সব কাণ্ড কেন ঘটে গেল—সে-সবের কোনও মানেই বোঝা যাচ্ছে না ! আরও বোঝা যাচ্ছে না, দাড়ি লাগিয়ে অবলাকান্ত কেনই বা আমাদের বিনে পয়সায় পৌঁছে দিলে, আমরা বিজয়কুমারের নস্যির কৌটো লোপাট না করেই পালিয়ে এসেছি জেনেও হাতে পেয়ে সে আমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে গুম করল না কেন !

ভীষণ গোলমেলে সব ব্যাপার। মানে, সেই সব অঙ্কের চাইতেও গোলমেলে—যেখানে দশমিকের মাথার ওপর আবার একটা ভেঙ্কুলাম থাকে, কিংবা তেল মাখা উঁচু বাঁশের ওপর থেকে এক কাঁদি কলা নামাতে গিয়ে একটা বাঁদর ছ' ইঞ্চি ওঠে তো সোয়া পাঁচ ইঞ্চি পিছলে নেমে আসে !

সকালে বসে-বসে এই সব যতই ভাবছি, ততই আমার চাঁদির ওপরটা সুড়সুড় করছে, গলার ভেতরটা কুটকুট করছে, কানের মাঝপথে কটকট করছে আর নাকের

দু'পাশে সুড়সুড় করছে। ভেবে-চিন্তে থই না পেয়ে শেষে মনের দুঃখে টেবিল বাজিয়ে বাজিয়ে আমি সত্যেন দত্তের লেখা বিখ্যাত সেই ভুবনের গানটা গাইতে শুরু করে দিলুম

"ভুবন নামেতে ব্যাদড়া বালক
তার ছিল এক মাসি,
আহা—ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না
সে মাসি সর্বনাশী।
শেষে—কলাচুরি মুলোচুরি করে বাড়ে
ভুবনের আশকারা,
চোর হতে পাকা ডাকাত হল সে
ব্যবসা মানুষ মারা—"

এই পর্যন্ত বেশ করুণ গলায় গেয়েছি, এমন সময় হঠাৎ তেতলা থেকে অ্যায়সা মোটা ডাক্তারি বই হাতে নিয়ে মেজদা তেড়ে নেমে এল।

—এই প্যালা, কী হচ্ছে এই সকালবেলায় ?

বললুম, গান গাইছি।

—এর নাম গান ? এ তো দেখছি একসঙ্গে স্টেন-গান, ব্রেন-গান, অ্যান্টি-এয়ারক্রাফ্‌ট গান—মানে স্বর্গে মা সরস্বতীর গায়ে পর্যন্ত গিয়ে গোলা লাগবে।

আমি বললুম, তুমি তো ডাক্তার—গানের কী জানো ? এর শেষটা যদি শোনো—তা আরও করুণ। বলে আবার টেবিল বাজিয়ে যেই শুরু করেছি—

'ধরা পড়ে গেল, বিচার হইল
ভুবনের হবে ফাঁসি,
হাউ হাউ করে লাড়ু-মুড়ি বেঁধে
ছুটে এল তার মাসি—'

অমনি বেরসিক মেজদা ধাঁই করে ডাক্তারি বইয়ের এক ঘা আমার পিঠে বসিয়ে দিলে। বিচ্ছিরি রকম দাঁত খিঁচিয়ে বললে, আরে, যা খেলে কচুপোড়া। মাথা ধরিয়ে দিলি তো ! লেখা নেই, পড়া নেই, বসে বসে ষাঁড়ের মতো চ্যাঁচাচ্ছে !

—বা-রে, এই তো সব আমাদের স্কুলে সামার ভ্যাকেশন শুরু হল, এখুনি পড়ব ?

—তবে বেরো, রাস্তায় গিয়ে চ্যাঁচা।

আমি গাঁ-গাঁ করে বেরিয়ে এলুম রাস্তায়। এ-সব বেরসিকদের কাছে সঙ্গীতচর্চা না করে আমি বরং চাটুজ্যেদের রকে বসে পটলডাঙার নেড়ী কুকুরগুলোকেই গান শোনাব।

কিন্তু গান আর গাইতে হল না। তার আগেই দেখি টেনিদা হনহন করে আসছে। আসছে আমার দিকেই।

আমায় দেখেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললে, প্যালা, কুইক কুইক। তোর কাছেই যাচ্ছিলুম—চটপট চলে আয়।

—আবার কী হল ?

টেনিদা বললে, সিন্ধুঘোটক।

—অ্যাঁ !—কপাৎ করে আমি একা খাবি খেলুম : সিন্ধুঘোটক ? কোথায় ?

—আমাদের বাড়িতে। বৈঠকখানায় বসে আছে।

—অ্যাঁ !

তখুনি দু' চোখ কপালে তুলে আমি প্রায় রাস্তার মধ্যেই ধপাস করে বসে পড়তে যাচ্ছিলুম, টেনিদা খপ করে আমাকে ধরে ফেলল। বললে, দাঁড়া না, এখুনি ঘাবড়াচ্ছিস কেন ? চলে আয় আমার সঙ্গে—

চলেই এলুম।

বুকের ভেতরটা হাঁকপাঁক করছিল। কিন্তু এই বেলা সাড়ে ন-টার সময়—টেনিদাদের বাড়ির বৈঠকখানায় বসে, সিন্ধুঘোটক আমাদের আর কী করবে ?

কিংবা, এ-সব মারাত্মক লোককে কিছুই বিশ্বাস নেই, রামহরি বটব্যাল কিংবা যদুনন্দন আঢ্যের গোয়েন্দা উপন্যাসে দিনে-দুপুরেই যে কত বড় দুর্ধর্ষ ব্যাপার ঘটে যায় সে-ও তো আর আমার অজানা নেই।

আমি আর একবার ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলুম, টেনিদা—সঙ্গে দস্যুদল—মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র—

—কিছু না—কিছু না, একেবারে একা।

—পুলিশে খবর দিয়েছ ?

—কিছু দরকার নেই। তুই আয় না—

'জয় মা তারা'—বলতে গিয়ে সেই অলক্ষুণে স্টুডিয়োটাকে মনে পড়ল, সামলে নিয়ে বললুম, জয় মা কালী—আর ঢুকে পড়লুম টেনিদাদের বাড়িতে।

আর ঢুকেই দেখি—চেয়ারে বসে সিন্ধুঘোটক।

সেই চেহারাই নেই। গায়ে মুগার পাঞ্জাবি, হাতে গোটাকয়েক আংটি, একমুখ হাসি। বললে, এসো প্যালারাম এসো—তোমার জন্যেই বসে আছি।

আমি হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলুম। তারপর ভয়টা কেটে গেলে জিজ্ঞেস করলুম, আপনি—আপনি কে ?

—আমার নাম হরিকিঙ্কর ভড় চৌধুরী। 'মনোরমা ফিল্ম কোম্পানি'-র নাম শুনেছ তো ? আমি সেই ফিল্ম কোম্পানির মালিক।

—কিন্তু কাল রাতে—আমাদের নিয়ে আপনি এ-সব কী কাণ্ড করলেন ?

—খুলে বললেই সবটা বুঝতে পারবে। এসে বোসো বলছি।

৭

তারপর যা বললেন, তা সংক্ষেপে এই :

তিনি একটা ছবি আরম্ভ করবেন, বিজয়কুমারকে তার নায়ক করতে চান। কিন্তু বিজয়কুমার বলে বসেছেন গজানন মাইতির 'পথে পথে বিপদে' ছবির কাজ শেষ না হলে তিনি কোনও ছবিতে নামবেন না। এখন গজানন মাইতির সঙ্গে হরিকিঙ্কর ভড় চৌধুড়ীর ঘোর শত্রুতা। হরিকিঙ্কর তাই পণ করলেন গজাননের ছবির শুটিং পণ্ড করে দেবেন।

কাল রাতেই ছিল গজাননের ছবির প্রথম শুটিং।

গজানন ঘুঘু লোক—সে হুকুম দিয়েছিল, তার শুটিং-এ কোনও বাইরের লোক ঢুকতে পারবে না। সুতরাং এমন কাউকে দরকার—যে চট করে স্টুডিয়োতে ঢুকে যেতে পারে। আর সে পারে কম্বলরাম!

কিন্তু কম্বলরাম তো দেশে চলে গেছে। তাই তিনি চারদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছেন—ঠিক কম্বলরামের মতো একটা লোক কোথায় পাওয়া যায়!

তারপর গড়ের মাঠে আমাদের দেখে—

—কিন্তু বিজয়কুমারের নস্যির কৌটোর মানে কী? আর সিন্ধুঘোটক সাজবারই বা আপনার কী দরকার ছিল?

হরিকিঙ্কর মিটি মিটি হাসলেন।

বিজয়কুমার ছেলেবেলায় খুব নস্যি নিতেন। একদিন স্কুলের ক্লাসে বসে নস্যি নিচ্ছেন, হেডমাস্টারমশাই দেখতে পেয়ে কান ধরে নিয়ে গিয়ে আচ্ছা করে বেত পিটিয়ে দিলেন সেই থেকে নস্যির নাম শুনলেই বিজয়কুমার খেপে যান। এখন ফিল্মে ঢুকেও বিজয়কুমারের প্রতিজ্ঞা—তার ছবি তোলার সময় কেউ নস্যি টানলে কিংবা নস্যির নাম উচ্চারণ করলে তিনি তক্ষুনি স্টুডিয়ো থেকে চলে যাবেন। আর সিন্ধুঘোটক?

—লোকে আড়ালে গজাননকে সিন্ধুঘোটক বলে। গজানন তা জানেন, তাঁর ধারণা কথাটা অপয়া, শুটিংয়ের সময় ওটা কানে গেলে একটা কিছু কেলেঙ্কারি হবেই।

টেনিদা বললে, এর জন্যে এত কাণ্ড করলেন আমাদের নিয়ে? যদি গজাননবাবু আমাদের ধরে ঠেঙিয়ে দিতেন, তা হলে?

—তা হলে আমি তোমাদের হাসপাতালে পাঠাতুম। সে-সব ব্যবস্থা ছিলই।

হরিকিঙ্কর আবার ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন : যাক—সব কিছুই ভালোয় ভালোয় হয়ে গেছে, আজ সকালে নিজে থেকে এসেই বিজয়কুমার আমার সঙ্গে ছবির কন্ট্রাক্ট সই করে গেছেন।

—কিন্তু আপনি আমাদের ঠিকানা জানলেন কী করে?

—কাল অবলাকান্ত তোমাদের রাস্তার মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেল না? আর পটলডাঙার টেনি শর্মা তো বিখ্যাত লোক, তাকে খুঁজে বের করতে কতক্ষণই বা লাগে?

আমরা চুপ।

হরিকিঙ্কর বললেন, এইবার কাজের কথা, তোমাদের কিছু পুরস্কার দেব বলেছিলুম। অনেক কষ্ট করেছ, রং-চং মাখিয়ে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছি—আমার একটা কৃতজ্ঞতা তো আছে। এই প্যাকেট তোমাদের দুজনকে দিয়ে গেলুম, আমি যাওয়ার পরে খুলো দেখো।

কাগজে মোড়া দুটো ভারি বাক্স তিনি তুলে দিলেন আমাদের দুজনের হাতে। টেনিদা গাঁইগুঁই করে বললে, আমাদের একদিন ছবির শুটিং দেখাবেন স্যার?

—আলবাত—আলবাত! যেদিন ভালো শুটিং হবে, সেদিন আগে থেকে খবর দিয়ে গাড়ি পাঠিয়ে তোমাদের নিয়ে যাব। চাই কি জনতার দৃশ্যে নামিয়েও দিতে পারি।

একটু হেসে আবার বললেন, সেখানে গিয়ে যেন নস্যির কৌটো-ফৌটো বলো না যেন আবার!

—পাগল! আর বলে!—আমরা দু'জনে একসঙ্গে সাড়া দিয়ে উঠলুম।

—তা হলে আসি আমি—টা-টা—

হরিকিঙ্কর চলে গেলেন। আমরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখলুম, গলির মোড়ে একটা মস্ত লাল মোটর দাঁড়িয়েছিল, সেইটেতে চড়ে তিনি দেখতে-দেখতে উধাও হলেন।

তারপর হাতের প্যাকেট দুটো খুললুম আমরা।

কী দেখলুম?

টেনিদার হাতের প্যাকেটে একটা ট্রানজিস্টার রেডিয়ো আর আমার প্যাকেটে একটা ক্যামেরা।

দুটো নতুন—ঝকঝক করছে।

আর আকাশ ফাটিয়ে টেনিদা হাঁক ছাড়ল : ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস—

আমি বললুম, ইয়াক—ইয়াক!

ঝাউ-বাংলোর রহস্য

ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তী

কথা ছিল, আমরা পটলডাঙার চারজন—টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা আর আমি শ্রীমান্ প্যালারাম—গরমের ছুটিতে দার্জিলিং বেড়াতে যাব। কলকাতায় একশো সাত ডিগ্রি গরম চলছে, দুপুর বেলা মোটর গাড়ির চাকার তলায় লেপটে যাচ্ছে গলে যাওয়া পিচ, বাতাসে আগুন ছুটছে। গরমের ধাক্কায় আমাদের পটলডাঙার গোপালের মতো সুবোধ কুকুরগুলো পর্যন্ত খেঁকি হয়ে উঠেছে। একটাকে তাক করে যেই আমের আঁটি ছুঁড়েছি, অমনি সেটা ঘ্যাঁক করে তেড়ে এল। আমের আঁটিটা একবার চাটা তো দূরে থাক, শুঁকে পর্যন্ত দেখলে না!

এরপর আর থাকা যায় কলকাতায়? তোমরাই বলো?

আমরা চারজনেই এখন সিটি কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ছি, আর ছেলেমানুষ নই। তায় সামার ভ্যাকেশন। কাজেই বাড়ি থেকে পারমিশন পেতে দেরি হল না। খালি মেজদার বকবকানিতেই কানের পোকা বেরিয়ে যাওয়ার জো। নতুন ডাক্তার হয়েছে—সব সময়ে তার বিদ্যে ফলানো চাই। আরও বিশেষ করে মেজদার ধারণা, আমি একটা জলজ্যান্ত হাসপাতাল। পৃথিবীর সমস্ত রোগের মূর্তিমান ডিপো হয়ে বসে আছি, তাই যত বিটকেল ওষুধ আমার গেলা দরকার। সারাদিন ধরে আমাকেই পুটুস-পুটুস করে ইনজেক্‌শন দিতে পারলে তবেই মেজদার আশা মেটে!

মেজদা বলল—যাচ্ছিস যা, কিন্তু খুব সাবধান! তোর তো খাবার জিনিস দেখলেই আর মাথা ঠিক থাকে না। সে চীনেবাদামই হোক আর ফাউল-কাটলেটই হোক। হুঁশিয়ার হয়ে খাবি, সিঞ্চল লেক থেকে দার্জিলিঙে যে-জল আসে, সেটা এমনিতেই খারাপ, তার সঙ্গে যদি যা-তা খাস, তাহলে স্রেফ হিলডাইরিয়া হয়ে বেঘোরে মারা যাবি।

এ-সব কথার জবাব দেবার কোনও মানে হয় না। আমি গোঁজ হয়ে রইলুম।

তারপরে বাবা আর মায়ের উপদেশ, বড়দার শাসানি—লেখাপড়া শিকেয় তুলে দিয়ে একমাস ধরে ওখানে আড্ডা দিয়ো না। ছোড়দির তিন ডজন গোল্ড স্টোন, ছ-ছড়া পাথরের মালা, ছ-খানা ওয়ালপ্লেটের ফরমাস। শুনতে শুনতে দিকদারি ধরে গেল। কোনওমতে পেন্নাম-টেন্নাম সেরে শিয়ালদা স্টেশনে এসে হাড়ে বাতাস লাগল।

বাকি তিন মূর্তি অনেক আগেই এসে একটা থার্ড ক্লাস কামরায় জমিয়ে বসেছে। বেশি খুঁজতে হল না, টেনিদার বাজখাঁই গলার ডাক শোনা গেল—চলে আয় প্যালা, ইদিকে চলে আয়—

দেখি তিনজনেই তারিয়ে-তারিয়ে অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাচ্ছে।

গাড়িতে উঠে ঝুপ করে বাক্স-বিছানা রেখে প্রথমেই বললুম,—বারে, আমার অরেঞ্জ স্কোয়াশ?

—তরটা কাটা গেছে। লেট কইর‍্যা আসছস, তার ফাইন।

হাবুল সেন জানিয়ে দিলে।

আমি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে প্রতিবাদ জানালুম—লেট মানে? এখনও কুড়ি মিনিট দেরি আছে ট্রেন ছাড়তে।

—যদি কুড়ি মিনিট আগেই ট্রেন ছেড়ে দিত, কী করতিস তা হলে? টেনিদা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলে।

—কেন কুড়ি মিনিট আগে ছাড়বে?

—রেখে দে তোর টাইম টেবিল! চোঁ-চোঁ করে অরেঞ্জ স্কোয়াশটা সাবাড় করল টেনিদা। ও তো রেল কোম্পানির একটা হাসির বই। এই তো পরশু জেঠিমা এল হরিদ্বার থেকে দুন এক্সপ্রেসে চেপে। ভোর পাঁচটায় গাড়িটা আসবে বলে টাইম টেবলে ছাপা রয়েছে, এল বেলা বারোটার সময়। সাতঘন্টা লেট করে গাড়ি আসতে পারে, আর কুড়ি মিনিট আগে ছেড়ে দিতে পারে না? কী যে বলিস তার ঠিক নেই।

যত বাজে কথা!—আমি চটে বললুম, আমিও একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ খাব।

টেনিদা বললে—খাবিই?

—খাবই।

—নিজের পয়সায়?

—নিশ্চয়।

ক্যাবলা বললে, তোর যে-রকম তেজ হয়েছে দেখছি তাতে তোকে ঠেকানো যাবে না। তা হলে কিনেই ফেল। চারটে। মানে চারটেই তোর নিজের জন্য নয়, আমরাও আছি।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে—হ, এই প্রস্তাব আমি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করতাছি।

টেনিদা বললে—ডিটো।

ছাড়ল না। চারটে কেনাল আমাকে দিয়ে। আর সেগুলো আমরা শেষ

করতে-না-করতেই টিং-টিং-টিঙা-টিং করে নর্থ বেঙ্গল এক্সপ্রেসের ঘণ্টা পড়ল।

পথের বর্ণনা আর দেব না, তোমরা যারা দার্জিলিঙে গেছ তারা সবাই তা ভালো করেই জানো। সকরিগলির স্টিমারে গলাগলি করে মনিহারিতে হারি-কি-জিতি বলে বাক্স ঘাড়ে করে বাড়ির ওপর দিয়ে রেস লাগিয়ে সে যে কী দারুণ অভিজ্ঞতা সে আর বলে কাজ নেই। ক্যাবলা আছাড় খেয়ে একেবারে কুমড়োর মতো গড়িয়ে গেল, কোত্থেকে কার এক ভাঁড় দই এসে হাবুল সেনের মাথায় পড়ল, আমার বাঁ পা-টা একটুখানি মচকে গেল আর ছোট লাইনের গাড়িতে উঠবার সময় একটা ফচকে চেহারার লোকের সঙ্গে টেনিদার হাতাহাতির জো হল।

এই সব দুর্ঘটনার পাট মিটিয়ে গুড়গুড়িয়ে আমরা শিলিগুড়িতে পৌঁছলুম ভোরবেলায়। দূরে নীল হয়ে রয়েছে হিমালয়ের রেখা, শাদা মেঘ তার ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্টেশনের বাইরে বাস আর ট্যাক্সির ভিড়।

দার্জিলিং—দার্জিলিং—খরসাং—

—কালিম্পং—কালিম্পং—

টেনিদার সঙ্গে মনিহারিতে যে-মারামারি করবার চেষ্টা করছিল সেই ফচকে চেহারার মিচকে লোকটা একটা বাসের ভেতরে বসে মিটমিট করে তাকাচ্ছিল আমাদের দিকে। দেখলুম, শিলিগুড়ির এই গরমের ভেতরই লোকটা গায়ে নীল রঙের একটা মোটা কোট চড়িয়েছে, গলায় জড়িয়েছে মেটে রঙের আঁশ-ওঠা-ওঠা একটা পুরনো মাফলার। মুখের সরু গোঁফটাকে বাগিয়ে এমন একখানা মুচকি হাসি হাসল যে পিত্তি জ্বলে গেল আমাদের।

লোকটা গলা বাড়িয়ে দিয়ে বললে—কী হে খোকারা, দার্জিলিং যাবে?

এ-সব বাজে লোকের বাজে কথায় কান দিতে নেই। কিন্তু মনিহারি থেকে চটেই ছিল টেনিদা। গাঁ-গাঁ করে বলল—আপনার মতো লোকের সঙ্গে আমরা কোথাও যেতে চাই না।

লোকটা কি বেহায়া! এবারে দাঁত বের করে হাসল। আমরা দেখতে পেলুম, লোকটার উঁচু-উঁচু দাঁতগুলো পানের ছোপ লাগানো, তার দুটো আবার পোকায় খাওয়া।

—যাবে না কেন? বাসে বিস্তর জায়গা রয়েছে, উঠে পড়ো।

—না।

—না কেন?—তেমনি পানে-রাঙানো পোকায়-খাওয়া দাঁত দুটো দেখিয়ে ফচকে লোকটা চোখ কুঁচকে হাসল। অ—রাগ হয়েছে বুঝি? তা রেলগাড়িতে ওঠা-নামার সময় অমন দু'চারটে কথা-কাটাকাটি হয়েই থাকে। ও-জন্যে কিছু মনে করতে নেই। তোমরা হচ্ছ আমার ছোট ভাইয়ের মতো, আদর করে একটু কান-টান মলে দিলেই বা কী করতে পারতে? এসো খোকারা, উঠে এসো। আমি তোমাদের পথের সিনারি দেখাতে-দেখাতে নিয়ে যাব।

অস্পর্ধা দেখ, আমাদের কান মলে দিতে চায়। লোকটা বাসে চেপে না থাকলে নির্ঘাত টেনিদার সঙ্গে হাতাহাতিই হয়ে যেত। টেনিদা চিৎকার করে বলল—শাট আপ।

লোকটা এবার হি-হি করে হাসল।

—গেলে না তো আমার সঙ্গে? হায়, তোমরা জানো না, তোমরা কী হারাইতেছ!

—আমরা জানতে চাই না।

ভোঁপ ভোঁপ শব্দ করে বাসটা ছেড়ে দিলে। লোকটা গলা বাড়িয়ে আবার বললে—তোমাদের একটা চকোলেট প্রেজেন্ট করে যাচ্ছি। হয়তো পরে আমার কথা ভাববার দরকার হবে তোমাদের। তখন আর এত রাগ থাকবে না।

বলতে বলতে কী একটা ছুঁড়ে দিলে আমাদের দিকে আর পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবের উইকেটকিপার ক্যাবলা নিছক অভ্যাসেই সেটা খপ করে ধরে ফেলল।

চকোলেট-বটে। পেল্লায় সাইজের একখানা।

ক্যাবলা বলল—এটা ফেলে দিই টেনিদা?

চটে গেলেও খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে টেনিদার ভুল হয় না। ঝাঁ করে চকোলেটটা কেড়ে নিল ক্যাবলার হাত থেকে। মেজাজ চড়েই ছিল, একেবারে খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল।

—ইঃ, ফেলে দেবেন! অত বড় একটা চকোলেট ফেলে দিতে যাচ্ছেন। একেবারে নবাব সেরাজদ্দৌল্লা এসেছেন। এটা আমার। আমিই তো ঝগড়া করে আদায় করলুম।

—আমরা ভাগ পামু না টেনিদা?—হাবুল সেন জানতে চাইল।

টেনিদা গম্ভীর হল!—পরে কনসিডার করা যাবে।—বলে চকোলেটটা পকেটস্থ করল।

সামনে বাস আর ট্যাক্সি সমান ডাকাডাকি করছে—দার্জিলিং—খরসাং—কালিম্পং—

আমি বললুম—দাঁড়িয়ে থেকে কী হবে টেনিদা? একটা বাসে-টাসে উঠে পড়া যাক।

—দাঁড়া না ঘোড়ার ডিম। আগে সোরাবজীর রেস্তোরাঁ থেকে ভালো করে রেশন নিয়ে নিই। নইলে পঞ্চাশ মাইল পাহাড়ি রাস্তায় যেতে যেতে পেটের নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত হজম হয়ে যাবে। চল, খেয়ে আসা যাক।

খেয়ে-দেয়ে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সি ঠিক করতে আরও ঘণ্টাখানেক গেল। তারপর বাক্স খুলে গরম কোট-টোট বের করে নিয়ে আমরা রওনা হলুম দার্জিলিঙের পথে।

নীল পাহাড়ের দিকে আমাদের গাড়িখানা ছুটে চলল তীরের বেগে। চমৎকার রাস্তা। একটু এগিয়ে চায়ের বাগান, তারপর দু'ধারে শুরু হয়ে গেল শালের বন। ঠাণ্ডা ছায়া আর হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে গেল যেন। আমি বেশ উদাস গান জুড়ে দিলাম—'আমার এই দেশেতেই জন্ম যেন এই দেশেতেই মরি—'

হাবুল সেন কানে হাত চাপা দিয়ে বললে—ইস, কী একখানা সুরই বাইর

করতাছস ! গানটার বারোটা তো বাজাইলি !

না হয় গলার সুর-টুর আমার তেমন নেই। তাই বলে হাবুল সেন সে-কথা বলবার কে ? ও তো গলা দিয়ে একটি সুর বের করতে পারে, সেটা হল গর্দভ-রাগিণী। আমি চটে বললুম—আহা-হা, তুই তো একেবারে সাক্ষাৎ গন্ধর্ব।

ক্যাবলা বললে—তুমলোগ কাজিয়া মত করো। (ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে থাকত, তাই মধ্যে মধ্যে হিন্দী জবান বেরিয়ে আসে ওর মুখ দিয়ে) আসল কথা হল, প্যালার এই গানটি এখানে গাইবার কোনও রাইট নেই। এই বনের ভেতর ও স্বচ্ছন্দেই মারা যেতে পারে। আমরা বাধা দিলেও মারা যেতে পারে, কিন্তু এখানে কিছুতেই ওর জন্ম হয়নি। যদি তা হত, তাহলে ও গাছে-গাছে লাফিয়ে বেড়াত, আমাদের সঙ্গে এই মোটরে কিছুতেই বসে থাকত না।

আমাকে বাঁদর বলছে নাকি ? একটু আগেই গাছে গোটাকতককে দেখা গেছে—সেইটেই ওর বক্তব্য নয় তো ?

আমি কী যেন বলতে যাচ্ছিলুম, হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল টেনিদা।—এর মানে কী ? কী মানে হয় এ-কবিতার ?

—কবিতা ? কিসের কবিতা ?

আমরা তিনজনে টেনিদার দিকে তাকালুম। একটা নীল রঙের ছোট কাগজ ওর হাতে।

—কোথায় পেলে ওটা ?

টেনিদা বললে—ওই চকোলেটের প্যাকেটের ভেতর ভাঁজ করা ছিল।

টেনিদার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে হাবুল সেন পড়ল—

মিথ্যে যাচ্ছ দার্জিলিং
সেখানে আছে হাতির শিং।
যাবে তো যাও নীলপাহাড়ি,
সেথায় নড়ে সবুজ দাড়ি।
সেইখানেতে ঝাউ-বাংলায়
(লেখা নেইকো 'বুড়ো আংলা'য়)
গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নাচায়।

শ্রীঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তী

আমরা চারজন কবিতা পড়ে তো একেবারে থ। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে মাথা চুলকে ক্যাবলা বলল—এর অর্থ কী ?

দু'ধারের ছায়াঘেরা শালবনের ভেতর থেকে এক কোনও অর্থ খুঁজে পাওয়া গেল না।

সেই সবুজ দাড়ি

তারপর দার্জিলিঙে গিয়ে আমরা তো সব ভুলে গিয়েছি। আর দার্জিলিঙে গেলে কারই-বা অন্য কথা মনে থাকে বলো। তখন আকাশ জুড়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা ঝলমল করে, ম্যাল দিয়ে টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটে, জলাপাহাড়ে উঠছি তো উঠছিই। সিঞ্চলের বুনো পথে ক' রকম পাখি ডাকছে। কলকাতার গরমে মানুষ যখন আইঢাই করছে আর মনের দুঃখে আইসক্রিম খাচ্ছে, তখন গরম কোট গায়ে দিয়েও আমরা শীতে ঠকঠক করে কাঁপছি।

আমরা উঠেছিলাম স্যানিটোরিয়ামে। হুল্লোড়ের এমন জায়গা কি আর দার্জিলিঙে আছে। পাহাড় ভেঙে ওঠানামা করতে এক-আধটু অসুবিধা হয় বটে, কিন্তু দিব্যি জায়গাটি। তাছাড়া খাসা সাজানো ফুলের বাগান, মস্ত লনে ইচ্ছে করলে ক্রিকেট-ফুটবল খেলা যায়, লাইব্রেরির হলে টেবিল-টেনিস আর ক্যারামের বন্দোবস্ত। খাই-দাই, খেলি, ঘোড়ায় চড়ি, বেড়াই আর ফটো তুলি। এক বটানিকসেই তো শ-খানিক ছবি তোলা হল। এমনি করেষযার-পাঁচদিন মজাসে কাটাবার পর একদিন ক্যাবলাটাই টিকটিক করে উঠল।

—দুৎ, ভালো লাগছে না।

আমরা তিনজন এক সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম।

—ভালো লাগছে না মানে ?

—মানে, ভালো লাগছে না।

টেনিদা চটে বললেন—কলেজে ক্লাস করতে পারছে না কিনা, তাই ওর মন খারাপ। এখানকার কলেজ তো খোলাই রয়েছে। যা না কাল লজিকের ক্লাসে ঢুকে পড়।

ক্যাবলা বললে—যাও-যাও !

হাবুল সেন বললে—আমরা যামু ক্যান ? আমরা এইখানে থাকুম। তর ইচ্ছা হইলে তুই যা গিয়া। যেইখানে খুশি।

ম্যালের বেঞ্চিতে বসে আমরা চারজনে চীনেবাদাম খাচ্ছিলুম, ক্যাবলা তড়াক্ করে উঠে পড়ল। বললে—তা হলে তাই যাচ্ছি। যাচ্ছি গাড়ি ঠিক করতে। কাল ভোরে আমি একাই যাব টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে !

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে একখানা লম্বা হাত বের করে ক্যাবলাকে পাকড়ে ফেলল।

—আরে তাই বল, টাইগার হিলে যাবি ! এ তো সাধু প্রস্তাব। আমরাও কি আর যাব না ?

—না, তোমাদের যেতে হবে না। আমি একাই যাব।

হাবুল গম্ভীর হয়ে বললে—পোলাপানের একা যাইতে নাই টাইগার হিলে। বাঘে ধইর‍্যা খাইব।

—ওখানে বাঘ নেই। —ক্যাবলা আরও গম্ভীর।

আমি বললুম—বেশ তো, মোটরের ভাড়াটা তুই একাই দিস। তোর যখন এত জেদ চেপেছে তখন না হয় একাই যাস। আমরা শুধু তোর বডিগার্ড হয়ে যাব এখন। মানে তোকে যদি বাঘে-টাঘে ধরতে আসে—

ক্যাবলা হাত-পা নেড়ে বললে—দুত্তোর, এগুলোর খালি বকর-বকর। সত্যই যদি যেতে হয়, চলো এইবেলা গাড়ি ঠিক করে আসি, ক'দিন ধরে আবহাওয়া ভালো যাচ্ছে—বেশি মেঘ বা কুয়াশা হলে গিয়ে শীতে কাঁপাই সার হবে।

পরদিন ভোর চারটায় টাইগার হিলে রওনা হলুম আমরা। বাপস্, কী ঠাণ্ডা! দার্জিলিঙ ঠাণ্ডায় জমে আছে। ঘুম স্টেশন রাশি রাশি লেপ কম্বল গায়ে জড়িয়ে ঘুমে অচেতন। শীতের হাওয়ায় নাক-কান ছিঁড়ে উড়ে যাওয়ার জোর। ল্যান্ড রোভার গাড়ি, ঢাকাঢুক বিশেষ নেই, প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে উঠল।

টেনিদা চটে বললে—ধুত্তোর ঘোড়ার ডিমের টাইগার হিল। ক্যাবলার বুদ্ধিতে পড়ে যত ভোগান্তি। একেবারে জমিয়ে দিলে।

হাবুল বললে—হ, আমাগো আইসক্রিম বানাইয়া ছাড়ব।

লেপ-টেপগুলো গায়ে জড়িয়ে এলে ভালো হত। —আমি জানালুম।

ক্যাবলা বললে—অত বাবুগিরির শখ যখন, কলকাতায় থাকলেই পারতে। পৃথিবীর কত দেশ থেকে কত লোক টাইগার হিলে সানরাইজ দেখতে আসে আর এইটুকু ঠাণ্ডায় ওঁদের একেবারে প্রাণ বেরিয়ে গেল!

—অ—এইটুকু ঠাণ্ডা।—দাঁত ঠকঠকিয়ে টেনিদা বললে।—এইটুকু ঠাণ্ডায় বুঝি তোর মন ভরছে না! আচ্ছা বেশ; কাল মাঝরাতে তোকে এক বালতি বরফ জল দিয়ে স্নান করিয়ে দেব এখন।

আমি বললুম—শরীর গরম করার বেস্ট উপায় হচ্ছে গান। এসো, কোরাসে গান ধরা যাক।

টেনিদা গজগজ করে কী যেন বললে, ক্যাবলা চুপ করে রইল, কিন্তু গানের নামে হাবুল একপায়ে খাড়া। দু'জনে মিলে যেই গলা ছেড়ে ধরেছি: 'হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো' অমনি নেপালী ড্রাইভার দারুণ আঁতকে হাঁই-হাঁই করে উঠল! পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বললে—অমন বিচ্ছিরি করে চেঁচিয়ে চমকে দেবেন না বাবু। খাড়া পাহাড়ি রাস্তা—শেষে একটা অ্যাক্সিডেন্ট করে ফেলব।

কী বেরসিক লোক।

টেনিদা মোটা গলায় বললে—রাইট। গান তো নয় যেন একজোড়া শেয়াল কাঁঠাল গাছের তলায় বসে মরা কান্না জুড়েছে।

ক্যাবলা ফিকফিক করে হাসতে লাগল। আর আমি ভীষণ মন খারাপ করে বসে রইলুম। হাবুল আমার কানে ফিসফিস করে সান্ত্বনা দিয়ে বললে—তুই দুঃখ পাইস না প্যালা। কাইল তুই আর আমি নিরিবিলিতে বার্চ-হিলে গিয়া গান করুম। এইগুলান আমাগো গানের কদর কী বুঝব।

যাই হোক, টাইগার-হিলে তো গিয়ে পৌঁছানো গেল। সেখানে এর মধ্যেই বিস্তর গাড়ি আর বিস্তর লোক জড়ো হয়েছে। পাহাড়ের মাথায় সানরাইজ দেখার যে-জায়গাটা রয়েছে তার একতলা-দোতলা একেবারে ভর্তি। আমরা পাশাপাশি করে দোতলায় একটুখানি দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে নিলুম।

সামনের অন্ধকার কালো পাহাড়টার দিকে চেয়ে আছি সবাই। ওখান থেকেই সূর্য উঠবে, তারপর বাঁ দিকের ঘুমন্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপর সাতরঙের মায়া ছড়িয়ে দেবে। রাশি রাশি ক্যামেরা তৈরি হয়ে রয়েছে। পাহাড় আর বনের কোলে থেকে-থেকে কুয়াশা ভেসে উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে।

তারপর সেই সূর্য উঠল। কেমন উঠল? কী রকম রঙের খেলা দেখা দিল মেঘ আর কাঞ্চনজঙ্ঘার ওপরে? সে আর আমি বলব না। তোমরা যারা টাইগার হিলে সূর্যোদয় দেখেছ, তারা তো জানোই; যারা দেখোনি, না দেখলে কোনওদিন তা জানতে পারবে না।

ক্লিক ক্লিক ক্লিক! খালি ক্যামেরার শব্দ। আর চারদিকে শুনতে পাচ্ছি, 'অপূর্ব! অদ্ভুত! ইউনিক!'

টেনিদা বললে—সত্যি ক্যাবলাকে মাপ করা যেতে পারে। এমন গ্র্যান্ড সিনারি কোনওদিন দেখিনি।

ঠিক সেই সময় পাশ থেকে মোটা গলায় কে বললে—তাই নাকি? কিন্তু এর চেয়েও ভালো সিনারি দেখতে হলে নীল-পাহাড়িতেই যাওয়া উচিত তোমাদের।

নীলপাহাড়ি! আমরা চারজনেই একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলুম। সঙ্গে-সঙ্গে সেই অদ্ভুত ছড়াটার কথা মনে পড়ে গেল আমাদের।

একটা ঢাউস কম্বলে লোকটার মুখ-টুক সব ঢাকা, শুধু নাকটা বেরিয়ে আছে। সে আবার মোটা গলায় সুর টেনে বললে—

গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নাচায়।

বলেই সে কম্বলটা সরিয়ে নিলে আর আবছা ভোরের আলোয় আমরা দেখলুম, তার গলায় আঁশ-ওঠা একটা চকোলেট রঙের মাফলার জড়ানো, তার মিচকি মুখে মিচকি হাসি।

—কে?—কে?—বলে টেনিদা যেই চেঁচিয়ে উঠেছে, অমনি চারদিকের ভিড়ের মধ্যে কোথায় সুট করে মিলিয়ে গেল লোকটা।

কিন্তু সেই গাদাগাদি ভিড়ের ভেতর কোথাও আর তাকে দেখা গেল না। দোতলায় নয়, একতলায় চায়ের স্টলে নয়, এমনকি বাইরে যে-সব গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, তাদের ভেতরেও কোথাও নয়। যেন কুয়াশার ভেতর থেকে সে দেখা দিয়েছিল, আবার কুয়াশার মধ্যেই কোথায় মিলিয়ে গেল।

আমরা চারজনে অনেকক্ষণ বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। সূর্য অনেকখানি উঠে পড়ল আকাশে, চারদিক ভরে গেল সকালের আলোয়, ঝকমক করে জ্বলতে লাগল কাঞ্চনজঙ্ঘা। একটার-পর-একটা গাড়ি নেমে যেতে লাগল দার্জিলিঙের দিকে। সেই রহস্যময় লোকটা কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল কে জানে!

টেনিদা বললে—স্ট্রেঞ্জ !

আমি বললুম—রীতিমতো গোয়েন্দা কাহিনী। হেমেন্দ্রকুমারের উপন্যাসের চেয়েও রহস্যময়।

হাবুল সেন কান-টান চুলকে বললে—আমার মনে হয়—এই সমস্ত ভূতের কাণ্ড।

ক্যাবলাটাই আমাদের ভেতর সব চাইতে মাথা ঠাণ্ডা এবং আগে ঝণ্টিপাহাড়িতে কিংবা ডুয়ার্সের জঙ্গলে সব সময়েই দেখেছি ও কিছুতেই ঘাবড়ায় না। ক্যাবলা বললে—ভূত হোক কিংবা পাগলই হোক, সুবিধে পেলেই ওর সঙ্গে মোকাবিলা করা যাবে। কিন্তু এখন ও-সব ভেবে লাভ নেই, চলো, বেশ করে চা খাওয়া যাক।

চা-টা খেয়ে বেরিয়ে আমরা কেভেন্টারের ডেয়ারি দেখতে গেলুম। সেখানে পেল্লায় পেল্লায় গোরু আর ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা মোটা শুয়োর। শুয়োর দেখলেই আমার গবেষণা করতে ইচ্ছা হয়। কেমন মনে হয় ছুঁচো আর শুয়োর পিসতুতো ভাই। একটা ছুঁচোর ল্যাজ একটু কেটে দিয়ে বেশ করে ভিটামিন খাওয়ালে সেটা নির্ঘাত একটা পুরুষ্টু শুয়োরে দাঁড়িয়ে যাবে বলে আমার ধারণা। প্রায়ই ভাবি, ডাক্তার মেজদাকে একটু জিগ্‌গেস করে দেখব। কিন্তু মেজদার যা খিটখিটে মেজাজ, তাকে জিগ্‌গেস করতে ভরসা হয় না। আচ্ছা, মেজাজওয়ালা দাদাই কি সংক্ষেপে মেজদা হয় ? কে জানে !

ওখান থেকে বেরিয়ে আমরা গেলুম সিঞ্চল লেক দেখতে—লেক মানে কলকাতার লেক নয়, চিল্‌কাও নয়। দুটো মস্ত চৌবাচ্চায় ঝরনার জল ধরে রেখেছে, আর তাই পাইপে করে দার্জিলিঙের কলে পাঠিয়ে দেয়। দেখে মেজাজ বিগড়ে গেল।

কিন্তু জায়গাটা বেশ। চারিদিকে বন, খুব নিরিবিলি। বসবার ব্যবস্থাও আছে এখানে-ওখানে। ভোরবেলায় গানটা গাইবার সময় বাধা পড়তে মনটা খারাপ হয়েই ছিল, ভাবলুম এখানে নিরিবিলিতে একটুগলা সেধে নিই।

ওরা তিনজন দেখছিল, কী করে জল পাম্প করে তোলে। আমি একা একটা বাঁধানো জায়গাতে গিয়ে বসলুম। তারপর বেশ গলা ছেড়ে ধরলুম—

'খর বায়ু বয় বেগে, চারদিক ছায় মেঘে
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো—'

ঠিক তক্ষুনি পেছন থেকে কে বললে—শাবাশ।

তাকিয়ে দেখি বনের রাস্তা দিয়ে এক ভদ্রলোক উঠে এসেছেন। মাথায় একটা বাঁদুরে রঙের কান ঢাকা টুপি, চোখে নীল চশমা, হাতে মোটা লাঠি, মুখে পাকা গোঁফ।

ভদ্রলোক বললেন—বেশ গাইছ তো ! তোমার অরিজিনালিটি আছে। মানে গানটা রবিঠাকুরের হলেও বেশ নিজের মতো সুর দিয়েছ !

চটব, না খুশি হব—বুঝতে পারলুম না।

ভদ্রলোক বললেন—তোমার মতো প্রতিভাবান ছেলেই আমার দরকার। যাবে আমার সঙ্গে ?

অবাক হয়ে আমি বললুম—কোথায় ?

ভদ্রলোক হেসে বললেন—নীলপাহাড়ি।

সেই নীলপাহাড়ি। আমি বিষম খেলুম একটা।

ভদ্রলোক হেসেই বললেন—কী আছে দার্জিলিঙে ? কিছু না ! ভিড়—ভিড়—ভিড়। শুধু ম্যালে বসে হাঁ করে থাকা, নয় খামকা ঘোড়া দাবড়ানো আর নইলে শীতে কাঁপতে-কাঁপতে একবার টাইগার-হিল দেখে আসা। কোনও মানে হয় ও-সবের ! চলো নীলপাহাড়িতে। দেখবে, কী আশ্চর্য জায়গা—কী ফুল—কী অপূর্ব রহস্য ! আমি সেইখানেই থাকি। সেখানকার ঝাউ বাংলোয়।

ঝাউবাংলো ! আমি আবার খাবি খেলুম।

তখন ভদ্রলোক একটানে বাঁদুরে টুপিটা খুলে ফেললেন। টুপির আড়ালে একমুখ দাড়ি। কিন্তু আসল রহস্য সেখানে নয়, আমি দেখলুম তাঁর দাড়ির রং সবুজ। একেবারে ঘন সবুজ।

একবার হাঁ করেই মুখটা বন্ধ করলুম আমি। আমার মাথাটা ঘুরতে লাগল—লাট্টুর মতো বনবনিয়ে।

ফরমুলা বনাম কাগামাছি

আমার মাথাটা সেই-যে বনবনিয়ে লাট্টুর মতো ঘুরতে লাগল, তাতে মনে হল, সারা সিঞ্চল পাহাড়টাতেই আর গাছগাছালি কিছু নেই, সব সবুজ রঙের দাড়ি হয়ে গেছে। আর সেই দাড়িগুলো আমার চারপাশে বোঁ বোঁ করে পাক খাচ্ছে।

দাঁড়িয়ে উঠেছিলুম, সঙ্গে সঙ্গেই ধপাস করে বাঁধানো বেঞ্চিটায় বসে পড়তে হল।

বুড়ো ভদ্রলোক বললেন—কী হল খোকা ?

আমি উত্তরে বললুম—ওফ।

—ওফ, মানে ? ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে বললেন—ব্যাপার কী হে ? পেট কামড়াচ্ছে ? ফিক-ব্যথা উঠেছে ? নাকি মৃগী আছে তোমার ? এইটুকু বয়সেই এইসব রোগ তো ভালো নয়।

মাথাটা একটু একটু সাফ হচ্ছে, আমি কিছু একটা বলতে গেলুম। তাঁর আগেই তিনমূর্তি—টেনিদা, ক্যাবলা, আর হাবুল সেন এসে পৌঁছেছে। আর বুড়ো ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়েই—হাবুল সেন 'খাইছে' বলে দু'হাত লাফিয়ে সরে গেল। ক্যাবলার চোখ দুটো ঠিক আলুর চপের মতো বড় বড় হয়ে উঠল। আর টেনিদা বলে ফেলল—ডিলা গ্রাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস !

ভদ্রলোক ভুরু কুঁচকে চারদিক তাকালেন। বললেন—কী হয়েছে বলো দেখি? তোমরা সবাই আমাকে দেখে অমন ঘাবড়ে যাচ্ছ কেন? আর ওই যে কী বললে—'ডিলা মেফিস্টোফিলিস'—ওরই বা মানে কী?

টেনিদা বললে—ওটা ফরাসী ভাষা।

—ফরাসী ভাষা! ভদ্রলোক তার সবুজ দাড়ি বেশ করে চুমরে নিয়ে বললেন—আমি দশ বছর ফ্রান্সে ছিলুম, এরকম ফরাসী ভাষা তো কখনও শুনিনি। আর মেফিস্টোফিলিস মানে তো শয়তান। তোমরা আমাকে বুড়ো মানুষ পেয়ে খামকা গালাগালি দিচ্ছ নাকি হে?

এবার মনে হল, ভদ্রলোক রীতিমতো চটেই গেছেন।

আমাদের ভেতর ক্যাবলাই সবচাইতে চালাক আর চটপটে, ও কিচ্ছুতেই কখনও ঘাবড়ে যায় না। ও-ই সাহস করে ভদ্রলোকের কাছে এগিয়ে এল। বলল—আজ্ঞে আপনার দাড়িটা...

—কী হয়েছে দাড়িতে?

—মানে সবুজ দাড়ি আমরা কেউ কখনও দেখিনি কিনা, তাই—

—ওঃ এই কথা!—ভদ্রলোক এবার গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন আর আমরা দেখতে পেলুম ওঁর সামনের পাটিতে একটা দাঁত নেই, আর একটা দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। হাসির সঙ্গে সঙ্গে ওঁর নাক দিয়ে ফোঁতফোঁত আওয়াজ হল।

বেশ খানিকটা সোনালি দাঁতের ঝিলিক আর ফোকলা দাঁতের ফাঁক দেখিয়ে হাসি থামালেন। তারপর বললেন—ওটা আমার শখ। আমি একজন প্রকৃতি-প্রেমিক, মানে বন-জঙ্গল গাছপালা এইসব নিয়ে পড়ে থাকি। একটা বইও লিখছি গাছ-টাছ নিয়ে। তাই শ্যামল প্রকৃতির সঙ্গে ছন্দ মেলাবার জন্যে দাড়িটাকেও সবুজ রঙে রাঙিয়ে নিয়েছি। বুঝতে পারলে?

টেনিদা হঠাৎ ফস করে জিগ্‌গেস করলে—আপনি কবিতা লেখেন স্যার?

হাবুল বললে—হ-হ, আপনি পদ্য লিখতে পারেন?

—পদ্য? কবিতা?—ভদ্রলোকের মুখখানা আবার আহ্লাদে ভরে উঠল—তা লিখেছি বই কি এককালে। তোমাদের তখন জন্ম হয়নি। তখন কত কবিতা মাসিকপত্রে বেরিয়েছে আমার। এখন অবিশ্যি ছেড়েছুড়ে দিয়েছি। কিন্তু মগজে ভাব চাগিয়ে উঠলে মাঝে-মাঝে দুটো-চারটে বেরিয়ে আসে বই কি। এই তো সেদিন রাত্তিরে চাঁদ উঠেছে, পাইনগাছের মাথাগুলো ঝলমল করছে, আর আমি বসে বসে একটা ইংরেজি প্রবন্ধ লিখছি। হঠাৎ সব কী রকম হয়ে গেল। তাকিয়ে দেখি আমার কলমটা যেন আপনিই তরতর করে কবিতা লিখে চলেছে। কী লিখেছিলুম একটু শোনো—

ওগো চাঁদিনী রাতের পাইন—
ঝলমল করছে জ্যোৎস্না
দেখাচ্ছে কী ফাইন!
ঝিরঝির করে ঝরনা ঝরছে

প্রাণের ভেতর কেমন করছে
ভাবগুলো সব দাপিয়ে মরছে
ভাঙছে ছন্দের আইন—
ওগো পাইন।

—কী রকম লাগল?

আমরা সমস্বরে বললুম—ফাইন! ফাইন!

ভদ্রলোক আর একবার দাড়িটা চুমরে নিয়ে গম্ভীর হয়ে গেলেন। আরও কোনও কবিতা বোধহয় তাঁর মাথায় আসছিল। কিন্তু ক্যাবলা ফস করে জিগ্‌গেস করলে— আপনি মুণ্ডু নাচাতে পারেন?

—মুণ্ডু নাচাব? কার মুণ্ডু নাচাতে যাব আবার?

টেনিদা জিগ্‌গেস করলে—আপনি কুণ্ডুমশাই বুঝি?

—কুণ্ডুমশাই? আমার চৌদ্দপুরুষেও কেউ কুণ্ডুমশাই নেই। আমার নাম সাতকড়ি সাঁতরা। আমার বাবার নাম পাঁচকড়ি সাঁতরা। আমার ঠাকুর্দার নাম—

হাবুল বলে ফেলল—তিনকড়ি সাঁতরা।

সাতকড়ি অবাক হয়ে গেলেন—তুমি জানলে কী করে?

—দুইটা কইর‍্যা সংখ্যা বাদ দিতে আছেন কিনা, তাই হিসাব কইর‍্যা দেখলাম। আপনের ঠাকুর্দার বাবার নাম হইব এককড়ি সাঁতরা। তেনার বাবার নাম যে কী হইব—হিসাবে পাইতেছি না; মাইনাস দিয়া করন লাগব মনে হয়।

—শাবাশ-শাবাশ!—সাতকড়ি সাঁতরা হাবুলের পিঠটা বেশ ভালো করে থাবড়ে দিলেন।—তোমার তো খুব বুদ্ধি আছে দেখছি। কিন্তু আমার ঠাকুর্দার কথা ভেবে আর মন খারাপ কোরো না—তাঁর নাম আমারও জানা নেই। যাই হোক, ভারি খুশি হলুম। আমি তোমাদের চারজনকেই ঝাউ-বাংলোয় নিয়ে যাব।

—ঝাউ-বাংলো!—ওরা তিনজনেই এক সঙ্গে লাফিয়ে উঠল।

—আহা! সেই কথাই তো বলছিলুম তোমার এই বন্ধুকে। আহা, কী জায়গা! দার্জিলিঙের মতো ভিড় নেই, চেঁচামেচি নেই, নোংরাও নেই। পাইন আর ঝাউয়ের বন। তার ভেতর দিয়ে সারি সারি ঝরনা নামছে। কত ফুল ফুটেছে এখন। শানাই, হাইড্রেনজিয়া, ফরগেট-মি-নট, রডোডেনড্রন এখন লালে লাল। আর আর তার মাঝে আমার বাংলো।

সাতকড়ি যেন ঘুমপাড়ানি গানের মতো সুর টেনে চললেন—তিনদিন যদি ওখানে থাকো, তা হলে তোমাদের মধ্যে যারা নিরেট বেরসিক, তারাও তরতর করে কবিতা লিখতে শুরু করে দেবে।

—কিন্তু তার আগে যদি ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তীর ছড়াটার মানে বোঝা যেত—

সাতকড়ি বললেন—কী বললে? ঝুমুরলাল চৌবে চক্রবর্তীর ছড়া? কী বিটকেল নাম! ও-নামে কেউ আবার ছড়া লেখে নাকি?

—আজ্ঞে লেখে, তাও আবার আপনার ঝাউ-বাংলোকে নিয়ে।

—অ্যাঁ!

—তাতে আপনার সবুজ দাড়ির কথাও আছে।

—বটে! লোকটার নামে আমি মানহানির মামলা করব।

টেনিদা বললে—তাকে আপনি পাচ্ছেন কোথায়? সেই মিচকেপটাশ লোকটা এক-একবার দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। সে বলেছে, আপনার ঝাউ-বাংলোয় নাকি হাঁড়িচাঁচায় গান গায়।

সাতকড়ি চটে গেলেন—হাঁড়িচাঁচায় গান গায়? নীলপাহাড়িতে হাঁড়িচাঁচা কোত্থেকে আসবে? ও বুঝেছি। আমি মধ্যে-মধ্যে শ্যামাসঙ্গীত গেয়ে থাকি বটে। তার নাম হাঁড়িচাঁচার গান? লোকটাকে আমি জেলে দেব।

—আরও বলেছে, সেখানে কুণ্ডুমশায় মুণ্ডু নাচায়।

—স্রেফ বাজে কথা। সেখানে কুণ্ডুমশায় বলে কেউ নেই। আমি আছি আর আছে আমার চাকর কাঞ্ছা। নিজের মুণ্ডু নাচানো আমি একদম পছন্দ করি না। কাঞ্ছাও করে বলে মনে হয় না আমার।

ক্যাবলা বললে—শুধু তাই নয়। আপনি বলার আগে সে-ই আমাদের ঝাউ-বাংলোয় নেমন্তন্ন করেছে।

—আমার বাড়িতে মিচকে আর ফচকে লোক তোমাদের নেমন্তন্ন করে বসেছে? আচ্ছা ফেরেব্বাজ তো। লোকটাকে ফাঁসি দেওয়া উচিত।

হাবুল বললে—তারে আপনি পাইবেন কই?

তখন সাতকড়ি সাঁতরা মিনিটখানেক খুব গম্ভীর হয়ে রইলেন। তারপর হঠাৎ সেই বেঞ্চিটায় বসে পড়লেন। আর ভীষণ করুণ সুরে বললেন—হুঁ, বুঝেছি, সব বুঝতে পেরেছি এইবার।

আমরা চারজনে চেঁচিয়ে উঠলুম।—কী বুঝেছেন?

—এ সেই কদম্ব পাকড়াশির কাণ্ড।

—কে কদম্ব পাকড়াশি?

—আমার চিরশত্রু। যখন কবিতা লিখেছি, তখন কাগজে-কাগজে আমার কবিতার নিন্দে করত। এখন সে বিখ্যাত জার্মানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছির গুপ্তচর। আমার নতুন আবিষ্কৃত ফরমুলাগুলো সে লোপাট করে নিতে চায়! আমি বুঝতে পারছি—ঝাউ-বাংলোর এক দারুণ দুর্দিন আসছে। চুরি, ডাকাতি, হত্যা, রক্তপাত। ওফ!

এক দারুণ রহস্যের সন্ধান পেয়ে আমরা চারজনে শিউরে উঠলুম। হাবুল সেন তো সঙ্গে-সঙ্গে এক চিৎকার ছাড়ল। টেনিদার মুখের দিকে দেখি, ওর মৈনাকের মতো লম্বা নাকটা কীরকম ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছে, ঠিক একটা সিঙাড়ার মতো দেখাচ্ছে এখন। খানিকক্ষণ মাথা-টাথা চুলকে বললে—চুরি-ডাকাতি-হত্যা-রক্তপাত। এ যে ভীষণ কাণ্ড মশাই। পুলিশে খবর দিন।

—পুলিশ! পৃথিবীর সবকটা মহাদেশের পুলিশ দশ বছর চেষ্টা করেও কাগামাছির টিকিটি ছুঁতে পারেনি। অবশ্যি কাগামাছির কোনও টিকি নেই—তার মাথা-জোড়া সবটাই টাক। নানা ছদ্মবেশে সে ঘুরে বেড়ায়। কখনও তিব্বতী লামা, কখনও মাড়োয়ারি বিজনেসম্যান, কখনও রাত্তিরবেলা কলকাতার গলিতে দু'মুখো আলো হাতে মুশকিল আসান। পৃথিবীর সব ভাষায় কাগামাছি কথা কইতে পারে। শুধু তাই? একবার সে এক কাঁটাবনের মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, এমন সময় সেদিকে পুলিশ এসে খোঁজাখুঁজি করতে লাগল। ধরে ফেলে—এমন অবস্থা। তখন সেই ঝোপের মধ্য থেকে পাগলা শেয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক আওয়াজ করতে লাগল। পুলিশ ভাবল, কামড়ালেই জলাতঙ্ক—তারা পালিয়ে বাঁচল সেখান থেকে।

—তা হলে আপনি বলছেন সেই মিচকে চেহারার ফচকে লোকটাই কাগামাছি?—আমি জানতে চাইলুম।

—না, ওটা কদম্ব পাকড়াশি। ওর মুখে একজোড়া সরু গোঁফ ছিল?

—ছিল।—হাবুল পত্রপাঠ জবাব দিল।

—আর গলায় একটা রোঁয়া-ওঠা মেটে রঙের ধুসো কম্ফর্টার?

—তাও ছিল।—এবার ক্যাবলাই সাতকড়িবাবুকে আলোকিত করল।

—তবে আর সন্দেহ নেই। ওই হচ্ছে সেই বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো হাড়-হাবাতে রাম-ফক্কড় কদম্ব পাকড়াশি।

—তা হঠাৎ আপনার ওপরে ওদের নজর পড়ল কেন?—টেনিদা আবার জিগ্‌গেস করল।

হাবুল বললে—আহা শোন না-ই? ওনার কী য্যান্ মুলার উপর তারগো চক্ষু পড়ছে।

টেনিদা বললে—মুলো? মুলোর জন্য এত কাণ্ড? আমাদের শেয়ালদা বাজারে পয়সায় তো একটা করে মুলো পাওয়া যায়। তার জন্যে চুরি-ডাকাতি-রক্তপাত? কী যে বলেন স্যার—কোনও মানে হয় না।

সাতকড়ি সাঁতরা বিষম ব্যাজার হয়ে বললেন—মুলো কে বলেছে? মুলো আমার একদম খেতে ভালো লাগে না, খেলেই চোঁয়া ঢেকুর ওঠে। আমি বলছিলুম ফরমুলা।

হাবুল বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে বললে—অ—ফরমুলা! তা ফরমুলার কথা ক্যাবলারে কন। আমাদের মধ্যে ও-ই হইল অঙ্কে ভালো—সব বুঝতে পারব।

—তোমরাও বুঝতে পারবে। আমি গাছপালা নিয়ে রিসার্চ করতে-করতে এক আশ্চর্য আবিষ্কার করে বসেছি। অর্থাৎ একই গাছে এক সঙ্গে আম-কাঁঠাল-কলা-আনারস-আপেল আর আঙুর ফলবে। আর বারো মাসেই ফলবে।

—তাই নাকি?—শুনে তো আমরা থ।

—সেইজন্যেই।—সাতকড়ি সাঁতরা বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়লেন।—সেইজন্যেই এই চক্রান্ত! ওহো হো! আমার কী হবে।

কিন্তু কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ক্যাবলাকে একটু সন্দিগ্ধ মনে হল।—ফরমুলা চুরি করতে হলে সেটা তো চুপি চুপি করাই ভালো। সে-জন্য পথেঘাটে এমন করে ছড়ার ছড়াছড়ি করার কী মানে হয় ? সবই তো জানাজানি হয়ে যাবে।

—ওই তো কাগামাছির নিয়ম। গোড়া থেকেই এইভাবে সে রহস্যের খাসমহল তৈরি করে নেয়। বলতে-বলতে সাতকড়ি সাঁতরা প্রায় কেঁদে ফেললেন।—এই বিপদে তোমরা আমায় বাঁচাবে না ? তোমরা এ-যুগের ইয়ংম্যান। এই দুঃসময়ে পাশে এসে দাঁড়াবে না আমার ?

এমন করুণ করে বললেন যে, আমারই বুকের ভেতরটা 'আ-হা আ-আ' করতে লাগল। আর ফস করে টেনিদা বলে ফেলল—নিশ্চয় করব, আলবাত করব !

—কথা রইল।

—কথা রইল।

—বাঁচালে। বলে সাতকড়ি সাঁতরা উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বললেন—তা হলে আজ বিকেল সাড়ে-চারটেয় দেখা হবে তোমাদের সঙ্গে। ন্যাচারাল মিউজিয়মের ওপরে যে-পার্কটা আছে সেখানে !

আর বলেই সুট করে কাঠবেড়ালির মতো পাশের বনটার ভেতর তাঁর সবুজ দাড়ি, ওভারকোট আর হাতের লাঠিটা নিয়ে ঠিক সেই মিচকেপটাশ কদম্ব পাকড়াশির মতোই হাওয়া হয়ে গেলেন তিনি।

চকোলেট নাম্বার টু

সবুজ দাড়ি, বাঁদুরে টুপি, নীল চশমা আর ধুসো ওভারকোট-পরা সাতকড়ি সাঁতরা তো সাঁ করে সিঙ্কলের সেই বনের মধ্যে টুপ করে ডুব মারলেন। আর কলকাতার কাকেরা যেমন হাঁ করে বসে থাকে, তেমনি করে আমরা চারজন এ-ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলুম। শেষে হাবুল সেনই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল। একটা খুদে পাহাড়ি মৌমাছি ওর কান তাক করে এগিয়ে আসছিল দেখে তিন পা নেচে নিয়ে মৌমাছিটাকে তাড়িয়ে দিলে।

হাবুল বললে—কাণ্ডটা কী হইল টেনিদা ?

টেনিদার মাথায় কোনও গভীর চিন্তা এলেই সে ফরাসী ভাষা শুরু করে। বললে —ডি-লুক্স !

আমি বললুম—তার মানে ?

টেনিদা আবার ফরাসী ভাষায় বললে—পুঁদিচ্চেরি।

ক্যাবলা বললে—পুঁদিচ্চেরি ? সে তো পণ্ডিচেরি। এর সঙ্গে পণ্ডিচেরির কী সম্পর্ক ?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে—থাম থাম। পণ্ডিচেরি ! খুব যে পণ্ডিতি ফলাতে এসেছিস। ফরাসী ভাষায় পুঁদিচ্চেরি মানে হল,—ব্যাপার অত্যন্ত ঘোরালো।

ক্যাবলা প্রবল প্রতিবাদ করে বললে—কক্ষনো না। আমার পিসেমশাই পণ্ডিচেরিতে ডাক্তারি করতেন। আমি জানি।

—জানিস ?

—জানি।

টেনিদা খটাং করে তক্ষুনি ক্যাবলার চাঁদিতে একটা গাঁট্টা মারল। ক্যাবলা উ-হু-হু করে বাগদা চিংড়ির মতো ছটকে গেল টেনিদার সামনে থেকে।

—এখনও বল, জানিস ?—বাঘাটে গলায় টেনিদার প্রশ্ন।

—না, জানিনে। —ক্যাবলা চাঁদিতে হাত বুলোতে লাগল—যা জানতুম তা ভুলে গেছি। তোমার কথাই ঠিক। পুঁদিচ্চেরি মানে ব্যাপার অত্যন্ত সাংঘাতিক। আর কত যে সাংঘাতিক, নিজের মাথাতেই টের পাচ্ছি সেটা !

টেনিদা খুশি হয়ে বললে—অল রাইট। বুঝলি ক্যাবলা, ইস্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পেয়ে তোর ভারি ডেপোমি হয়েছে। আবার যদি কুরুবকের মতো বক-বক করিস তাহলে এক চড়ে তোর কান—

হাবুল বললে—কানপুরে উইড়্যা যাইব।

—কারেক্ট ! এইজন্যেই তো বলি, হাবলাই হচ্ছে আমার ফার্স্ট অ্যাসিসট্যান্ট। সে যাক ! এখন কী করা যায় বল দিকি ? এই সবুজদেড়ে লোকটা তো মহা ফ্যাচাঙে ফেলে দিলে !

ক্যাবলা বললে—আমরা কথা দিয়েছে ওকে হেলপ করব।

—তারপর যদি সেই জাপানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছি এসে আমাদের ঘাড়ে চড়াও হয় ?

আমি বললুম—তাকে মাছির মতোই সাবাড় করে ফেলব !

—কে স্যাবাড় করবে, তুই ! টেনিদা আমার দিকে তাকিয়ে নাক-টাক কুঁচকে, মুখটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে—ওই পুঁটি-মাছের মতো চেহারা নিয়ে। তোকে ওই কাগামাছি আর কদম্ব পাকড়াশি স্রেফ ভেজে খেয়ে ফেলবে, দেখে নিস।

হাবুল সেন বললে—এখন ওইসব কথা ছাড়ান দাও। আইজ বৈকালেই তো বুইড়ার লগে দেখা হইব ! তখন দেখা যাইব, কী করন যায় ! অখন ফিব়্যা চল, বড়ই ক্ষুধা পাইছে।

টেনিদা দাঁত খেঁচিয়ে কী যে বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ একটা গগনভেদী চিৎকার। আমাদের সংস্কৃতের প্রফেসার যাকে বলেন 'জীমূতমন্দ্র' কিংবা 'অম্বরে ডম্বরু'—অনেকটা সেই রকম।

আর কে ? সেই যে বেরসিক নেপালী ড্রাইভার আমার গানে বাগড়া দিয়েছিল ! ড্রাইভার এতক্ষণ নীচে গাড়ি নিয়ে বসেছিল, এইবার অধৈর্য হয়ে পাহাড় ভেঙে উঠে এসেছে ওপরে।

—আপনাদের মতলব কী স্যার। সারাটা দিন সিঞ্চলেই কাটাতে চান নাকি। তা হলে ভাড়া মিটিয়ে আমায় ছেড়ে দিন, আমি দার্জিলিঙে চলে যাই।

টেনিদা বললে—আর আমরা ফিরে যাব কী করে।

—হেঁটে ঘুমে যাবেন, সেখান থেকে ট্রেন ধরবেন। —পরিষ্কার বাংলায় সাফ গলায় জানিয়ে দিলে ড্রাইভার।

আমি বললুম—থাক আর উপদেশ দিতে হবে না। আমরা যাচ্ছি।

আমরা চারজনে গুম হয়ে এসে গাড়িতে বসলুম। মাথার ভেতরে সাতকড়ি সাঁতরা, এক গাছে চার রকম ফল ফলানোর বৈজ্ঞানিক গবেষণা, জাপানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছি আর ধড়িবাজ কদম্ব পাকড়াশি, এই সবই ঘুরপাক খাচ্ছে তখন। বনের পথ দিয়ে এঁকেবেঁকে আমাদের ল্যান্ড রোভার নেমে চলেছে।

আমি বজ্রবাহাদুরের পাশে বসেছিলুম। হঠাৎ ডেকে জিগ্‌গেস করলুম—আচ্ছা ড্রাইভার সাহেব—

—আমি ড্রাইভার নই, গাড়ির মালিক। আমার নাম বজ্রবাহাদুর।

—আচ্ছা বজ্রবাহাদুর সিং—

—সিং নয়, থাপা।

তার মানে শিংওলা নিরীহ প্রাণী নয়, দস্তুরমত থাবা আছে। মেজাজ আর গলার স্বরেই সেটা বোঝা যাচ্ছিল। আমি সামলে নিয়ে বললুম—আপনি নীলপাহাড়ি চেনেন?

বজ্রবাহাদুর বললে—চিনব না কেন? সে তো পুবং-এর কাছেই। আর পুবং-এই তো আমার ঘর।

—তাই নাকি! এবর ক্যাবলা আকৃষ্ট হল—আপনি সেখানকার ঝাউ-বাংলো দেখেছেন?

—দেখেছি বই কি। ম্যাকেঞ্জি বলে একটা বুড়া সাহেব তৈয়ার করেছিল সেটা। তারপর হিন্দুস্থান স্বাধীন হল আর বুড়া সেটাকে বেচে দিয়ে বিলায়েত চলে গেল। এখন কলকাতার এক বাঙালী বাবু তার মালিক।

আমি জিজ্ঞেস করলুম—কেমন বাড়ি?

বজ্রবাহাদুর বললে—রামরো ছ।

—রামরো ছ।—হাবুল বললে—অঃ বুঝছি। সেইখানেই বোধ হয় ছয়বার রাম রাম কইতে হয়।

বজ্রবাহাদুরের গোমড়া মুখে এবার একটু হাসি ফুটল—না-না, রাম রাম বলতে হয় না, 'রামরো ছ' হল নেপালী ভাষা। ওর মানে, ভালো আছে। খুব খাসা কুঠি।

ক্যাবলা জিগ্‌গেস করলে—ওখানে কে থাকে এখন? কলকাতার সেই বাঙালী বাবু?

—সে আমি জানি না।

—আমরা যদি ওখানে বেড়াতে যাই, কেমন হয়?

বজ্রবাহাদুর আবার বললে—রামরো। আমার গাড়িতে যাবেন, সস্তায় নিয়ে যাব আর পুবং-এর খাঁটি দুধ আর মাখনের বন্দোবস্ত করে দেব।

আমরা যখন স্যানিটরিয়ামে ফিরে এলুম, তখন খাবার ঘণ্টা পড়ো-পড়ো। তাড়াতাড়ি চান-টান সেরে খেয়ে-দেয়ে নিয়ে ফোয়ারাটার পাশে এসে আমরা কনফারেন্স বসালুম।

—কী করা যায়।

টেনিদা গোটা চল্লিশেক লিচু নিয়ে বসেছিল, খাওয়ার পর ওইটেই তার মুখশুদ্ধি। একটা লিচু টপাৎ করে গালে ফেলে বললে—চুলোয় যাক, আমরা ও-সবের ভেতর নেই। দু'দিনের জন্যে দার্জিলিঙে বেড়াতে এসেছি, খামকা ও-সব ঝঞ্ঝাট কে পোয়াতে যায় বাপু! ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে, দিব্যি ওজন বাড়িয়ে ফিরে যাব—ব্যস!

ক্যাবলা বললে ভদ্রলোককে সকালে যে কথা দেওয়া হল?

লিচুর আঁটিটা সামনের পাইনগাছে একটা কাককে তাক করে ছুড়ে দিলে টেনিদা—বিকেলে সে-কথা ফিরিয়ে নিলেই হল? সবুজ দাড়ি, কাগামাছি। হুঃ। যত সব বোগাস!

আমি বললুম—কিন্তু বজ্রবাহাদুর বলছিল, পুবং থেকে খাঁটি দুধ আর মাখন খাওয়াবে।

টেনিদা আমার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললে—ধুৎ। এটার রাতদিন খাইখাই—এই করেই মরবে। দুধ-মাখনের লোভে কাগামাছির খপ্পরে গিয়ে পড়ি, আর সে আমাদের আরশোলার চাটনি বানিয়ে ফেলুক।—বলেই আর একটা লিচু গালে পুরে দিলে।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে—হ, সেই কথাই ভালো। ঝামেলার মইধ্যে গিয়া কাম নাই।

তখন আমি বললুম—তা হলে থাক। সাতকড়ি সাঁতরাকে দেখে আমরাও কেমন সন্দেহজনক মনে হল। কেমন ঝাঁ করে বনের ভেতর লুকিয়ে গেল—দেখলে না।

হাবুল বলল—আমার তো ভূত বইলাই মনে হইতাছে।

ক্যাবলা ভীষণ চটে গেল—দুত্তোর। দিন-দুপুরে সিঞ্চল থেকে ভূতের আসতে বয়ে গেছে। আসল কথা, তোমরা সবাই হচ্ছ পয়লা নম্বরের কাওয়ার্ড—হিন্দিতে যাকে বলে একদম ডরপোক!

—কী বললি! কাওয়ার্ড।—টেনিদা হুংকার ছাড়ল। খুব সম্ভব ক্যাবলাকে একটা চাঁটি কষাতে যাচ্ছিল, এমন সময় স্যানিটারিয়ামের এক কাঞ্ছা এসে হাজির। তার হাতে একটা ছোট প্যাকেট।

এসেই বললে—তিমিরো লাই।

টেনিদা বললে—তার মানে? তিমিরো লাই? এই দুপুর বেলা তিমির কোথায় পাব? আর 'লাই' মানে তো শোয়া। খামকা শুতেই বা যাব কেন?

ক্যাবলা হেসে বলল—না-না—বলছে, তোমাদের জন্যে।

—তাই নাকি ?—টেনিদা একটানে প্যাকেট নিয়ে খুলে ফেলল। আর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটি মস্ত চকোলেট।

—চকোলেট ? কে দিলে ?

কাঞ্ছা আবার নেপালী ভাষায় জানালে একটু আগেই সে 'মাথি' অর্থাৎ উপরে বাজারে গিয়েছিল। সেখানে সরু গোঁফ আর গলায় মেটে রঙের মাফলার জড়ানো একটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হয়। সে তার হাতে এইটে দিয়ে বলে, কলকাতা থেকে যে-চারজন ছোকরা বাবু এসেছে তাদের কাছে যেন পৌঁছে দেয়।

সরু গোঁফ, মেটে রঙের মাফলার ! তা হলে—

টেনিদা একটানে চকোলেটটা খুলে ফেলল। টুপ করে মাটিতে পড়ল চার ভাঁজ করা একটি চিরকুট। তাতে লেখা :

'যাচ্ছ না তো নীলপাহাড়ি !
অকর্মা সব ধাড়ি ধাড়ি !
এতেই প্রাণে লাগল ত্রাস
গড়ের মাঠে খাওগে ঘাস।'

হাবুল সুর করে কবিতাটা পড়ল। আর আমরা তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম—কদম্ব পাকড়াশি !

কিছুক্ষণ চুপচাপ। টেনিদা গম্ভীর। একটা লিচু ছাড়িয়ে মুখের কাছে সেই থেকে ধরে রয়েছে, কিন্তু খাচ্ছে না। টেনিদার এমন আশ্চর্য সংযম এর আগে আমি কোনওদিন দেখিনি।

ক্যাবলা বলল—টেনিদা, এবার ?

টেনিদার নাকের ভেতর থেকে আওয়াজ বেরুল—হুম !

—আমাদের অকর্মার ধাড়ি বলেছে : গড়ের মাঠে গিয়ে ঘাস খাবার উপদেশ দিয়েছে।

হাবুল সেন বললে—হ, শত্রুকে চ্যালেঞ্জ কইরা পাঠাইছে।

ক্যাবলা আবার বললে—কদম্ব পাকড়াশির কাছে হার মেনে কলকাতায় ফিরে যাবে টেনিদা ? গিয়ে গড়ের মাঠে ঘাস খাবে ?

টেনিদা এবারে চিৎকার করে উঠল—কভি নেই। নীলপাহাড়িতে যাবই।

—আলবাত ?

—আলবাত !—বলেই টপাৎ করে লিচুটা মুখে পুরে দিলে। আমার মনটা চকোলেটের জন্য ছোঁক ছোঁক করছিল, বললুম—তা হলে কদম্ব পাকড়াশির চকোলেটটা ভাগযোগ করে—

টেনিদা সংক্ষেপে বললে, শাট আপ।

বিকেল পাঁচটার সময় আমরা গিয়ে হাজির হলুম ন্যাচারাল মিউজিয়ামের কাছে পার্কটায়।

যারা বেড়াতে বেরিয়েছে, সবাই গিয়ে ভিড় করেছে ম্যালে। সামনে দিয়ে টকাটক করে ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে বার্চহিলের দিকে। প্রায় ফাঁকা পার্কে আমরা

চারজন ঘুঘুর মতো একটা বেঞ্চিতে অপেক্ষা করে আছি। এখানেই সেই সবুজ দাড়িওলা সাতকড়ি সাঁতরার আসবার কথা।

দশ-পনেরো-বিশ মিনিট কাটল, বসে আছি তো বসেই আছি। চার আনার চীনেবাদাম শেষ হয়ে পায়ের কাছে ভাঙা খোলার একটা পাহাড় জমেছে। সাতকড়ির আর দেখা নেই।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বলল—কই রে ক্যাবলা, সেই সবুজদাড়ি গেল কোথায় ?

হাবুল বললে—কইলাম না, ওইটা সিঞ্চল পাহাড়ের ভূত। বনের ভূত বনে গেছে, এইখানে আর আইব না।

ক্যাবলা বললে—ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? একটু দেখাই যাক না। আমার মনে হয় ভদ্রলোক নিশ্চয়ই আসবেন।

ঠিক তখন পেছন থেকে কে বললে—এই তো এসে গেছি।

আমরা চমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। পার্কে সন্ধ্যার ছায়া নেমেছে। তার ওপর বেশ করে কুয়াশা ঘনিয়েছে। এই পার্কটা যেন চারদিকের পৃথিবী থেকে আলাদা হয়ে গেছে এখন। আর এরই মধ্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই লোকটা ! মাথায় বাঁদুরে টুপি, চোখে নীল চশমা।

টেনিদা কী বলতে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক ঠোঁটে আঙুল দিলেন।

—স—সস্। আশেপাশে কাগামাছির চর ঘুরছে। কাজের কথা সংক্ষেপে বলে নিই। তোমরা নীলপাহাড়িতে যাচ্ছ তো ?

টেনিদা বললে, যাচ্ছি।

—কাল সকালে ?

ভদ্রলোক এবার চাপা গলায় বললেন—ঠিক আছে। মোটর ভাড়া করে চলে যেয়ো, ঘণ্টা দেড়েক লাগবে। ওখানে গিয়ে পাহাড়ি বস্তিতে জিগ্‌গেস করলেই ঝাউ-বাংলো চিনিয়ে দেবে এখন। আর তোমরা আমার গেস্ট হবে। মোটর ভাড়াও আমি দিয়ে দেব এখন। রাজি ?

হাবুল বললে—হ, রাজি।

—তা হলে আমি চলি। দাঁড়াবার সময় নেই। কালই ঝাউ-বাংলোয় দেখা হবে। আর একটা কথা মনে রেখো। ছুঁচোবাজি।

—ছুঁচোবাজি ? আমি আশ্চর্য হয়ে জিগ্‌গেস করলুম—ছুঁচোবাজি আবার কী ?

—কাগামাছির সংকেত ! আচ্ছা চলি। টা-টা—

বলেই ভদ্রলোক ঝাঁ করে চলে গেলেন, কুয়াশার ভেতর দিয়ে কোন্ দিকে যে গেলেন ভালো করে ঠাহরও পাওয়া গেল না।

ক্যাবলা উঠে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গেই।

—চলো টেনিদা।

—কোথায় ?

মোটর স্ট্যান্ডে। বজ্রবাহাদুরের গাড়িটা ঠিক করতে হবে।

বলতে না বলতেই ফড়—ফড়-ফড়-ড়াং করে আওয়াজ উঠল একটা। আর হাবুলের ঠিক কানের পাশ দিয়ে একটা ছুঁচোবাজি এসে পড়ল সামনের ঘাসের উপর

—আগুন ঝরিয়ে তিড়িক করে নাচতে নাচতে ফটাত্ শব্দে একটা ফরগেট-মি-নটের ঝাড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল।

ঝাউ-বাংলোয়

আমরা ক'জনে হাঁ করে সেই ছুঁচোবাজির নাচ দেখলাম। তারপর ঝোপের মধ্যে ঢুকে যখন সেটা ফুস করে নিবে গেল তখনও কারও মুখে একটা কথা নেই। পার্কটা তখন ফাঁকা, ঘন শাদা কুয়াশায় চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে, আশেপাশে যে আলোগুলো জ্বলে উঠেছিল, তারাও সেই কুয়াশার মধ্যে ডুব মেরেছে। আর আমরা চারজন যেন কোনও রোমাঞ্চকর গোয়েন্দা-কাহিনীর মধ্যে বসে আছি।

টেনিদাই কথা কইল প্রথম।

—হাঁ রে, এটা কী হল বল দিকি?

হাবুল একটা চীনেবাদাম মুখে দিয়ে গিলতে গিয়ে বিষম খেল। খানিকক্ষণ খকখক করে কেশে নিয়ে বললে—এইটা আর বুঝতে পারলা না? সেই কদম্ব পাকড়াশি আমাগো পিছে লাগছে।

আমি বললুম—হয়তো বা কাগামাছি নিজেই এসে ছুঁড়ে দিয়েছে ওটা।

টেনিদা বলল—ধুত্তোর, এ তো মহা ঝামেলায় পড়া গেল! কোথায় গরমের ছুটিতে দিব্যি ক'দিন দার্জিলিঙে ঘুরে যাব, কোত্থেকে সেই মিচকেপটাশ লোকটা এসে হাজির হল। তারপর আবার সবুজদেড়ে সাতকড়ি সাঁতরা—কী এক জাপানী বৈজ্ঞানিক কাগামাছি না বগাহাঁছি—ভালো লাগে এ-সব?

হাবুল দুঃখ করে বললে—বুঝলা না, আমাগো বরাতই খারাপ। সেইবারে ঝণ্টিপাহাড়িতে বেড়াইতে গেলাম—কোথিকা এক বিকট ঘুটঘুটানন্দ জুটল।

ক্যাবলা বললে—তাতে ক্ষেতিটা কী হয়েছিল শুনি? ওদের দলটাকে ধরিয়ে দিয়ে সবাই একটা করে সোনার মেডেল পাওনি?

টেনিদা মুখটাকে আলুকাবলীর মতো করে বললে, আরে রেখে দে তোর সোনার মেডেল। ঘুটঘুটানন্দ তবু বাঙালী, যা-হোক একটা কায়দা করা গিয়েছিল। আমি ডিটেকটিভ বইতে পড়েছি, এ-সব জাপানীরা খুব ডেঞ্জারাস হয়।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ-হ, আমিও পড়ছি সেই সব বই। আমাগো ধইরা-ধইরা পুট্‌ত-পুট্‌ত কইরা এক একখান ইন্‌জেকশন দিব, আর আমরা ভাউয়া ব্যাঙের মতো চিতপটান হইয়া পইড়্যা থাকুম। তখন আমাগো মাথার খুলি ফুটা কইর্যা তার মইধ্যে বান্দরের ঘিলু ঢুকাইয়া দিব।

আমি বললুম—আর তক্ষুনি আমাদের একটা করে ল্যাজ বেরুবে, আমরা লাফ দিয়ে গাছে উঠে পড়ব, তারপর কিচমিচ করে কচিপাতা খেয়ে বেড়াব। আর

আমাদের টেনিদা—

হাবুল বলল—পালের গোদা হইব। যারে কয় গোদা বান্দর।

ধাঁই করে টেনিদা একটা গাঁট্টা বসিয়ে দিলে হাবুলের চাঁদির ওপর। দাঁত খিঁচিয়ে বললে—গুরুজনের সঙ্গে ইয়ার্কি? আমি মরছি নিজের জ্বালায় আর এগুলো সব তখন থেকে ফাজলামো করছে। অ্যাই—ভাউয়া ব্যাঙ মানে কী রে?

হাবুল বললে—ভাউয়া ব্যাঙ! ভাউয়া ব্যাঙেরে কয় ভাউয়া ব্যাঙ।

ক্যাবলা বিরক্ত হয়ে বলল—আরে ভেইয়া আব উস বাতচিত ছোড় দো, লেকিন টেনিদা, আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে।

—কী সন্দেহ শুনি?

—আমার মনে হল, ওই বুড়োটাই ছুঁচোবাজি ছেড়েছে।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে চমকে উঠলুম।

—সে কী!

—আমার যেন তাই মনে হল। বুড়ো ওঠবার আগে নিজের পকেটটা হাতড়াচ্ছিল, একটা দেশলাইয়ের খড়খড়ানিও যেন শুনেছিলুম।

আমি বললুম—তবে বোধহয় ওই বুড়োটাই—

হাবুল ফস করে আমার কথাটা কেড়ে নিয়ে বললে—কাগামাছি।

টেনিদা মুখটাকে ডিমভাজার মতো করে নিয়ে বললে—তোদের মুণ্ডু। ও নিজেই যদি কাগামাছি হবে, তা হলে কাগামাছির নামে ভয় পাবে কেন? আর আমাদের ঝাউ-বাংলোয় যেতে নেমন্তন্নই বা করবে কেন?

হাবুল আবার টিকটিক করে উঠল—'প্যাটে ইনজেকশন দিয়া দিয়া ভাউয়া ব্যাঙ বানাইয়া দিব, সেইজন্য।'

—ফের ভাউয়া ব্যাঙ! টেনিদা আবার হুঙ্কার ছাড়ল—যদি ভাউয়া ব্যাঙ-এর মানে বলতে না পারিস—

—ভাউয়া ব্যাঙ-এর মানে হইল গিয়া ভাউয়া ব্যাঙ।

টেনিদা একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে হাবুলের কান পাকড়াতে যাচ্ছিল, হাবুল তিড়িং করে লাফিয়ে সরে গেল—ভাউয়া ব্যাঙ-এর মতই লাফাল খুব সম্ভব। আর ক্যাবলা দারুণ বিরক্ত হল।

—তোমরা কি বসে-বসে সমানে বাজে কথাই বলবে নাকি? ঝাউ-বাংলোতে যাবার ব্যবস্থা করতে হবে না?

টেনিদা দমে গেল।

—যেতেই হবে?

ক্যাবলা বললে—যেতেই হবে। কদম্ব পাকড়াশি দু'নম্বর চকোলেট পাঠিয়ে ভিতু বলে ঠাট্টা করে গেল, ছুঁচোবাজি ছেড়ে আমাদের চ্যালেঞ্জ করলে, সেগুলো বেমালুম হজম করে চলে যাব? আমাদের পটলডাঙার প্রেস্টিজ নেই একটা?

আমি আর হাবুল বললুম—আলবাত!

—ওঠো তা হলে। বজ্রবাহাদুরের গাড়িটাই ঠিক করে আসি। কাল ভোরেই

তো বেরুতে হবে।

সত্যি কথা বলতে কী, আমি ভালো করে ঘুমুতে পারলুম না। রাত্তিরে মাংসটা একটু বেশিই খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে শরীরটা হাঁইফাঁই করতে লাগল। তারপর স্বপ্ন দেখলুম, একটা মস্ত কালো দাঁড়কাক আমার মাথার কাছে বসে টপটপ করে মাছি খাচ্ছে, একটা একটা করে ঠোক্কর দিচ্ছে আমার চাঁদিতে। আর ফ্যাক-ফ্যাক করে বুড়ো মানুষের মতো বলছে—যাও না একবার নীলপাহাড়ি, তারপর কী হাঁড়ির হাল করি দেখে নিয়ো।

আঁকপাঁক করে জেগে উঠে দেখি, পুরো বত্রিশটা দাঁত বের করে হাবুল সেন দাঁড়িয়ে। তার হাতে একটা সন্দেহজনক পেনসিল। তখন আমার মনে হল, দাঁড়কাক নয়, হাবুলই পেনসিল দিয়ে আমার মাথায় ঠোকর দিচ্ছিল।

বললুম—এই হাবলা কী হচ্ছে ?

হাবুল বললে—চায়ের ঘণ্টা পইড়্যা গেছে। রওনা হইতে হইব না নীল-পাহাড়িতে ? তরে জাগাইতে আছিলাম।

—তাই বলে মাথায় পেনসিল দিয়ে ঠুকবি ?

হাবুলের বত্রিশটা দাঁত চিকচিক করে উঠল—বোঝস নাই, একসপেরিমেন্ট করতাছিলাম।

—আমার মাথা দিয়ে তোর কিসের এক্সপেরিমেন্ট শুনি ?

—দেখতাছিলাম, কয় পার্সেন্টি গোবর আর কয় পার্সেন্টি ঘিলু।

—কী ধড়িবাজ, দেখেছ একবার। আমি দারুণ চটে বললুম—তার চাইতে নিজের মাথাটাই বরং ভালো করে বাজিয়ে নে। দেখবি গোবর—সেন্ট পার্সেন্টি।

—চ্যাতস ক্যান ? চা খাইয়া মাথা ঠাণ্ডা করবি, চল।

টেনিদা আর ক্যাবলা আগেই চায়ের টেবিলে গিয়ে জুটেছিল, আমি গেলুম হাবুলের সঙ্গে। চা শেষ না হতেই খবর এল, বজ্রবাহাদুর তার গাড়ি নিয়ে হাজির।

ক্যাবলা বললে—নে, ওঠ ওঠ। আর গোরুর মত বসে বসে টোস্ট চিবতে হবে না।

—নিজেরা তো দিব্যি খেলে, আর আমার বেলাতেই—

—আটটা পর্যন্ত ঘুমুতে কে বলেছিল, শুনি ?—টেনিদা হুঙ্কার ছাড়ল।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, ওরাই দলে ভারি। টোস্টটা হাতে নিয়েই উঠে পড়লুম। সন্দেশ দুটোও ছাড়িনি, ভরে নিলুম জামার পকেটে। যাচ্ছি সেই নীলপাহাড়ির রহস্যময় ঝাউ-বাংলোয়, বরাতে কী আছে কে জানে। যদি বেঘোরে মারাই যেতে হয়, তাহলে মরবার আগে অন্তত সন্দেশ দুটো খেয়ে নিতে পারব।

শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের দুর্দান্ত অ্যাডভেঞ্চারে বেরিয়ে পড়লুম। আরও আধঘণ্টা পরেই।

দার্জিলিং রেল স্টেশনের পাশ থেকে আমাদের গাড়িটা ছাড়তেই টেনিদা হাঁক ছাড়ল—পটলডাঙা—

আমরা তিনজন তক্ষুনি শেয়ালের মতো কোরাসে বললুম—জিন্দাবাদ!

বজ্রবাহাদুর স্টিয়ারিং থেকে মুখ ফেরাল। তারপর তেমনি পরিষ্কার বাংলায় জিজ্ঞেস করল—কী জিন্দাবাদ বললেন ?

চারজনে একসঙ্গে জবাব দিলুম—পটলডাঙা।

—সে আবার কী ?

লোকটা কী গেঁয়ো, আমাদের পটলডাঙার নাম পর্যন্ত শোনেনি। আর সেখানকার বিখ্যাত চারমূর্তি যে তার গাড়িতে চেপে একটা লোমহর্ষক অ্যাডভেঞ্চারে চলেছি, তা-ও বুঝতে পারছে না।

টেনিদা মুখটাকে স্রেফ গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে—পটলডাঙা আমাদের মাদারল্যান্ড।

হাবুল বললে—উঁহু, ঠিক কইলা না। মাদারপাড়া।

—ওই হল, মাদারপাড়া। যাকে বলে—

ক্যাবলা বললে—ডি-লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস।

বজ্রবাহাদুর কিছুক্ষণ হাঁ করে চেয়ে রইল, কী বুঝল সে-ই জানে। তারপর নিজের মনে কী একবার বিড়বিড় করে বলে গাড়ি চালাতে লাগল।

আমরাও মন দিয়ে প্রকৃতির শোভা দেখতে লাগলুম বসে বসে। পাহাড়ের বুকের ভেতর দিয়ে বাঁকে বাঁকে পথ চলেছে, কখনও চড়াই, কখনও উতরাই। কত গাছ, কত ফুল, কোথাও চা বাগান, কোথাও দুধের ফেনার মতো শাদা শাদা ঝরনা পথের তলা দিয়ে নীচে কুয়াশাঢাকা খাদের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ঘুম বাঁ-দিকে রেখে পেশক রোড ধরে আমরা তিস্তার দিকে এগিয়ে চলেছে।

আমার গলায় আবার গান আসছিল—এমন শুভ্র নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়'—কিন্তু বজ্রবাহাদূরের কথা ভেবেই সেই আকুল আবেগটা আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে হল। একেই লোকটার মেজাজ চড়া তার ওপর 'ডি-লা গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস' শুনেই চটে রয়েছে। ওকে আর ঘাঁটানোটা ঠিক হবে না। পুবং-এর ঘি-দুধ খাওয়াবে বলেছে, তা ছাড়া গাড়ি তো ওরই হাতে। আমার গানের সুরে খেপে গিয়ে যদি একটু বাঁ দিকে গাড়িটা নামিয়ে দেয়, তা হলেই আর দেখতে হবে না। হাজার ফুট খাদ হা-হা করছে সেখানে।

হঠাৎ ক্যাবলা বললে—আচ্ছা টেনিদা ?

—হুঁ।

—যদি গিয়ে দেখি সবটাই বোগাস ?

—তার মানে ?

মানে, ঝাউ-বাংলোয় সাতকড়ি সাঁতরা বলে কেউ নেই ? ওই সবুজ দাড়িওয়ালা লোকটা আমাদের ঠকিয়েছে ? রসিকতা করেছে আমাদের সঙ্গে !

টেনিদার সে-জন্য কোনও দুশ্চিন্তা দেখা গেল না। বরং খুশি হয়ে বললে—তা

হলে তো বেঁচেই যাই। হাড়-হাবাতে কাগামাছির পাল্লায় আর পড়তে হয় না।

হাবুল বললে—কষ্টডাই সার হইব।

—কষ্ট আবার, কিসের ? বজ্রবাহাদুরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টেনিদা বললে—পুবং-এর ছানা তা হলে আছে কী করতে ?

গাড়িটা এবার ডানদিকে বাঁক নিলে। পথের দু'ধারে চলল সারবাঁধা পাইনের বন, টাইগার ফার্নের বন ঝোপ, থরে থপরে শানাই ফুল। রাস্তাটা সরু—ছায়ায় অন্ধকার, রাশি রাশি প্রজাপতি উড়ছে। অত প্রজাপতি একসঙ্গে আমি কখনও দেখিনি। দার্জিলিং থেকে অন্তত মাইল বারো চলে এসেছি বলে মনে হল।

বজ্রবাহাদুর মুখ ফিরিয়ে বলল—নীলপাহাড়ি এরিয়ায় এসে গেছি আমরা।

নীলপাহাড়ি। আমরা চারজনেই নড়ে উঠলুম।

ঠিক তক্ষুনি ক্যাবলা বললে—টেনিদা, দেখেছ ? ওই পাথরটার গায়ে খড়ি দিয়ে কী লেখা আছে ?

গলা বাড়িয়ে আমরা দেখতে পেলুম, বড় বড় বাংলা হরফে লেখা: 'ছুঁচোবাজি।'

সঙ্গে-সঙ্গেই আর একটা পথেরের দিকে আমার চোখ পড়ল। তাতে লেখা: কুণ্ডুমশাই'।

হাবুল চেঁচিয়ে উঠল—আরে, এইখানে আবার লেইখ্যা রাখছে: 'হাঁড়িচাঁচা।'

টেনিদা বললে—ড্রাইভার সায়েব, গাড়ি থামান। শিগগির।

বজ্রবাহাদুর কটমট করে তাকাল—আমি ড্রাইভার নই, মালিক।

—আচ্ছা, আচ্ছা, তা-ই হল। থামান একটু।

—থামাচ্ছি। বলে তক্ষুনি থামাল না বজ্রবাহাদুর। গাড়িটাকে আর-এক পাক ঘুরিয়ে নিয়ে ব্রেক কষল। তারপর বললে—নামুন! এই তো বাউ-বাংলো।

আমরা অবাক হয়ে দেখলুম, পাশেই একটা ছোট টিলার মতো উঁচু জায়গা। পাথরের অনেকগুলো সিঁড়ি উঠেছে সেইটে বেয়ে। আর সিঁড়িগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে পাইন আর ফুলবাগানে ঘেরা চমৎকার একটি বাংলো। ছবির বইতে বিলিতি ঘরদোরের চেহারা যেমন দেখা যায়, ঠিক সেই রকম। চোখ যেন জুড়িয়ে গেল।

আমরা আরও দেখলুম, চোখে নীল গগল্স, বাঁদুরে টুপিতে মাথা মুখ ঢাকা, গায়ে ওভারকোট আর হাতে একটা লাঠি নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন সাতকড়ি সাঁতরা।

বাঁদুরে টুপির ভেতর থেকে ভরাট মোটা গলার ডাক এল—এসো এসো! খোকারা, এসো! আমি তোমাদের জন্যে সেই কখন থেকে অপেক্ষা করে আছি।

আর সেই সময় একটা দমকা হাওয়া উঠল, কী একটা কোত্থেকে খরখর করে আমার মুখে এসে পড়ল। আমি থাবা দিয়ে পাকড়ে নিয়ে দেখলুম, সেটা আর কিছুই নয়—চকোলেটের মোড়ক।

বিনামূল্যে ফিল্ম শো

বজ্রবাহাদুর গাড়ি নিয়ে পুবং-এ চলে গেল।

যাওয়ার আগে বলে গেল কাল সকালে সে আবার আসবে। আমরা যদি কোথাও বেড়াতে যেতে চাই, নিয়ে যাবে। টেনিদা কিন্তু আসল কথা ভোলেনি। চেঁচিয়ে বললে—বাঃ, পুবং-এর মাখন ?

—দেখা যাক।—বলে বজ্রবাহাদুর হেসে চলে গেল। এর ট্যাক্সি ভাড়াটা সাতকড়ি সাঁতরা আগেই মিটিয়ে দিয়েছিলেন।

আমরা চারজনে ঝাউ-বাংলোয় গিয়ে উঠলুম। সত্যি, বেড়ে জায়গা। চারদিক পাইন গাছে ঘেরা, নানা রকমের ফুলে ভরে আছে বাগান, কুলকুল করে একটা ঝরনাও বয়ে যাচ্ছে আবার। এ-সব মনোরম দৃশ্য-টৃশ্য তো আছেই, কিন্তু তার চাইতেও সেরা বাংলোর ভেতরটা। সোফা-টোফা দেওয়া মস্ত ড্রয়িংরুম, কত রকম ফার্নিচার, দেওয়ালে কত সব বিলিতি ছবি।

সাতকড়ি আমাদের একতলা দোতলা সব ঘুরিয়ে দেখালেন। তারপর দোতলার এক মস্ত হলঘরে নিয়ে গিয়ে বললেন—এইটে তোমাদের শোবার ঘর। কেমন, পছন্দ হয় ?

পছন্দ বলে পছন্দ! প্রকাণ্ড ঘরটায় চারখানা খাটে বিছানা পাতা, একটা ড্রেসিং টেবিল, দুটো পোশাকের আলমারি (ক্যাবলা বললে, ওয়ার্ডরোব), একটা মস্ত টেবিলের দু'দিকে চারখানা চেয়ার, টেবিলের ওপরে ফুলদানি, পাশে স্নানের ঘর। আমি লক্ষ করে দেখলুম বইয়ের শেলফও রয়েছে একটা, তাতে অনেকগুলো ছবিওলা বিলিতি মাসিক পত্রিকা। ঘরটার তিনদিকে জানালা, তাই দিয়ে এন্তার পাহাড়-জঙ্গল আর দূরের চা বাগান দেখা যায়।

সাতকড়ি বললেন—ওই চা বাগানটা দেখছ ? ওর একটা ভারি মজার নাম আছে।

আমরা জিজ্ঞেস করলুম—কী নাম ?

—রংলি রংলিওট!

—কী দারুণ নাম। টেনিদা চমকে উঠল—মানে কী ওর ?

হাবুল পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়ল—এইটা আর বুঝতে পারলা না ? তার মানে হইল, মায়ে পোলারে ডাইক্যা কইতাছে—এই রংলি, সকাল হইছে, আর শুইয়া থাকিস না। উইঠ্যা পড়, উইঠ্যা পড়।

সাতকড়ি তার সবুজ দাড়িতে তা দিয়ে হাসলেন। বললেন—না, ওটা পাহাড়ি ভাষা। ওর মানে হল, 'এই পর্যন্তই, আর নয়।'

—অদ্ভুত নাম তো। এ-নাম কেন হল ?—আমি জানতে চাইলুম।

—সে একটা গল্প আছে, পরে বলব। আর ওই চা বাগানের ওপারে

যে-পাহাড়টা দেখছ, তার নাম মংপু !

—মংপু ?—ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—ওখানেই বুঝি রবীন্দ্রনাথ এসে থাকতেন ?

—ঠিক ধরেছ। —সাতকড়ি হাসলেন। সেইজন্যেই তো ওই পাহাড়টা চোখে পড়লেই আমার সব গোলমাল হয়ে যায়। ধরো, খুব একটা জটিল বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখছি, যেই মংপুর দিকে তাকিয়েছি—ব্যস।

—ব্যস। হাবুল বললে—অমনি কবিতা আইস্যা গেল।

—গেল বই কি। তরতর করে লিখতে শুরু করে দিলুম।

আমার মনে পড়ে গেল, সিঞ্চলে বসে কবিতা শুনিয়েছিলেন সাতকড়ি—ওগো পাইন। ঝলমল করছে জ্যোৎস্না, দেখাচ্ছে কী ফাইন।

টেনিদা বললে—তা হলে তো প্যালাকে নিয়ে মুস্কিল হবে। ওর আবার একটু কাব্যিরোগ আছে, রাত জেগে কবিতা লিখতে শুরু করে না দেয়। যদিও অঙ্কে বারো-টারোর বেশি পায় না, তবে কবিতা নেহাত মন্দ লেখে না।

কাব্যিরোগের কথা শুনে মন্দ লাগেনি, কিন্তু অঙ্কে বারোর কথা শুনেই মেজাজটা দারুণ খিঁচড়ে গেল। আমি নাকমুখ কুঁচকে বিচ্ছিরিভাবে দাঁত বের করে বললুম—আর তুমি ? তুমি ইংরেজিতে সাড়ে সাত পাওনি ? তুমি পণ্ডিতমশাইকে ধাতুরূপ বলোনি, গৌ-গৌবৌ-গৌবর ?

—ইয়ু প্যালা, শাট আপ। —বলে টেনিদা আমায় মারতে এল, কিন্তু মাঝখানে হাঁ-হাঁ করে সাতকড়ি ওকে থামিয়ে দিলেন—আহা-হা, এখন এ-সব গৃহযুদ্ধ কেন ? লড়াই করবার সময় অনেক পাবে, কাগামাছি তো আছেই।

সেই বিদঘুটে কাগামাছি। শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। এতক্ষণ বেশ ছিলুম, দিব্যি প্রাকৃতিক শোভাটোভা দেখা হচ্ছিল, হঠাৎ অলুক্ষণে কাগামাছির কথা শুনে খুব খারাপ লাগল !

টেনিদা বললে—জানেন, কাল আপনি চলে আসবার পরেই পার্কের ভেতর কে একটা ছুঁচোবাজি ছুঁড়েছিল।

—অ্যাঁ, তবে ওর গুপ্তচর ওখানেও ছিল ? সাতকড়ি একটা খাবি খেলেন। লোকটা নিশ্চয় কদম্ব পাকড়াশি।

—আসবার সময় দেখলাম, এক জায়গায় খড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে লেখা আছে—'কুণ্ডুমশাই।'—আমি জানালুম।

—আর একখানে লেইখ্যা রাখছে—'হাঁড়িচাঁচা'। হাবুল সরবরাহ করল।

—ওফ। আর বলতে হবে না !—সাতকড়ি বললে—তবে তো শত্রু এবার দস্তুর-মতো আক্রমণ করবে। আমার ফরমুলাটা বুঝি আর কাগামাছির হাত থেকে বাঁচানো যাবে না।

সাতকড়ি হাহাকার করতে লাগলেন।

ক্যাবলা বললে—তা পুলিশে খবর দিলেই তো—

—পুলিশ ! সাতকড়ি মাথা নাড়লেন। পুলিশ কিছু করতে পারবে না। বন্ধুগণ, তোমরাই ভরসা ! বাঁচাবে না আমাকে, সাহায্য করবে না আমাকে ?

বলতে-বলতে তাঁর চোখে প্রায় জল এসে গেল।

ওঁর অবস্থা দেখে আমার বুকের ভেতরটা প্রায় হায়-হায় করতে লাগল। মনে হল, দরকার পড়লে প্রাণটা পর্যন্ত দিয়ে দিতে পারি। এমনকি, টেনিদা পর্যন্ত করুণ সুরে বললে—কিছু ভাববেন না সাতকড়িবাবু, আমরা আছি।

হাবুলও একটা ঘোরতর কিছু বলতে যাচ্ছিল, এমন সময় সাতকড়িবাবুর কাঞ্ছা এসে খবর দিলে, খানা তৈরি।

এটা সুখবর। দার্জিলিঙের রুটি-ডিম অনেক আগেই রাস্তায় হজম হয়ে গিয়েছিল। আর সত্যি কথা বলতে কী, সাতকড়িবাবুর রান্নাঘর থেকে মধ্যে-মধ্যে এক-একটা বেশ প্রাণকাড়া গন্ধের ঝলক এসে থেকে-থেকে আমাদের উদাস করেও দিচ্ছিল বই কি !

সারাটা দিন বেশ কাটল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হল, দুপুরে সাতকড়িবাবু অনেক কবিতা-টবিতা শোনালেন। সেই ফরমুলাটার কথা বললেন—যা দিয়ে একটা গাছে আম কলা আঙুর আপেল সব একসঙ্গে ফলানো যায়। আমি একবার ফরমুলাটা দেখতে চেয়েছিলুম, তাতে বিকট ভ্রূকুটি করে সাতকড়িবাবু আমার দিকে তাকালেন।

—এনসাইক্লোপিডিক ক্যাটাস্ট্রফি বোঝো ?

সর্বনাশ ! নাম শুনেই পিলে চমকে গেল। আমি তো আমি, স্কুল ফাইনালে স্কলারশিপ পাওয়া ক্যাবলা পর্যন্ত থই পেল বলে মনে হল না।

—প্রাণতোষিণী মহাপরিনির্বাণ-তন্ত্রের পাতা উল্টেছ কোনওদিন ?

টেনিদা আঁতকে উঠে বললেন—আজ্ঞে না। ওল্টাতেও চাই না।

—নেবু চাডনাজার আর পজিট্রপেনর কম্বিনেশন কী জানো ?

—জানি না।

—থিয়োরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে অ্যাকোয়া টাইকোটিস যোগ করলে কী হয় বলতে পারো ?

হাবুল বললে—খাইছে !

মিটিমিটি হেসে সাতকড়ি বললেন—তা হলে ফরমুলা দেখে তো কিছু বুঝতে পারবে না।

ক্যাবলা মাথা চুলকোতে লাগল। একটু ভেবে-চিন্তে বললে—দেখুন—কী বলে, অ্যাকোয়া টাইকোটিস মানে তো জোয়ানের আরক—তাই নয় ? তা জোয়ানের আরকের সঙ্গে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি—

—ওই তো আমার গবেষণার রহস্য ! সাতকড়ি আবার মিটমিট করে হাসলেন—ওটা বুঝলে তো ফরমুলাটা তুমিই আবিষ্কার করতে পারতে !

টেনিদা বললে—নিশ্চয়-নিশ্চয় ! ক্যাবলার কথায় কান দেবেন না। সব জিনিসেই ওর সব সময় টিকটিক করা চাই। এই ক্যাবলা ফের যদি তুই ওস্তাদি করতে যাবি, তা হলে এক চড়ে তোর কান—

আমি বললুম—কানপুরে উড়ে যাবে।

সাতকড়ি বললে—আহা থাক, থাক ; নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই। যাক বিকেল তো হল, তোমরা এখন চা-টা খেয়ে একটু ঘুরো এসো—কেমন ? রাত্তিরে আবার গল্প করা যাবে।

সাতকড়ি উঠে গেলেন।

আমরা বেড়াতে বেরুলুম। বেশ নিরিবিলি জায়গাটি গ্রামে লোকজন অল্প, পাহাড়-জঙ্গল-ফুল আর ঝরনায় ভরা। থেকে-থেকে ফগ ঘনিয়ে আসছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। দূরে সমতলের একটুখানি সবুজ রেখা দেখা যায়, সেখানে একটা রুপোলি নদী চিকচিক করছে। একজন পাহাড়ি বললে—ওটা তিস্তা ভ্যালি।

সত্যি দার্জিলিঙের ভিড় আর হট্টগোলের ভেতর থেকে এসে মন যেন জুড়িয়ে গেল। আর মংপুর পাহাড়টাকে যতই দেখছিলুম, ততই মনে হচ্ছিল, এখানে থাকলে সবাই-ই কবি হতে পারে, সাতকড়ি সাঁতরার কোনও দোষ নেই। কেবল হতভাগা কাগামাছিটাই যদি না থাকত—

কিন্তু কোথায় কাগামাছি। আশেপাশে কোথাও তার টিকি কিংবা নাক-ফাক কিছু আছে বলে তো বোধ হচ্ছে না। তাহলে পাথরের গায়ে খড়ি দিয়ে ও-সব লিখলই বা কে। কে জানে!

রাত হল, ড্রয়িংরুমে বসে আবার আমরা অনেক গল্প করলুম। সাতকড়ি আবার একটা বেশ লম্বা কবিতা আমাদের শোনালেন—আমরা বেড়াতে বেরুলে ওটা লিখেছেন। তার কয়েকটা লাইন এই রকম—

ওগো শ্যামল পাহাড়—
তোমার কী বা বাহার,
আমার মনে জাগাও দোলা
করো আমায় আপনভোলা
তুমি আমার ভাবের গোলা
জোগাও প্রাণের আহার—

টেনিদা বললে—পেটের আহার লিখলেও মন্দ হত না।

সাতকড়ি বললেন—তা-ও হত। তবে কিনা, পেটের আহারটা কবিতায় ভালো শোনায় না।

হাবুল জানাল—ভাবের গোলা না লেইখ্যা ধানের গোলাও লিখতে পারতেন।

এইসব উঁচুদরের কাব্যচর্চায় প্রায় নটা বাজল। তারপর প্রচুর আহার এবং দোতলায় উঠে সোজা কম্বলের তলায় লম্বা হয়ে পড়া।

নতুন জায়গা, সহজে ঘুম আসছিল না! আমরা কান পেতে বাইরে ঝিঁঝির ডাক আর দূরে ঝরনার শব্দ শুনছিলুম। ক্যাবলা হঠাৎ বলে উঠল—দ্যাখ, আমার কী রকম সন্দেহ হচ্ছে। জোয়ানের আরকের সঙ্গে থিয়োরি অফ রিলেটিভিটি—ইয়ার্কি নাকি! তারপর লোকটা নিজেকে বলছে বৈজ্ঞানিক—অথচ সারা বাড়িতে একটাও

সায়েন্সের বই দেখতে পেলুম না। খালি কতকগুলো বিলিতি মাসিকপত্র আর ডিটেকটিভ বই। আমার মনে হচ্ছে—

বলতে বলতে ক্যাবলা চমকে থেমে গেল—ওটা কিসের আওয়াজ রে!

কির-কির-কির—পাশের বন্ধ ঘরটা থেকে একটা মেশিন চলবার মতো শব্দ উঠল। আর তারপরেই—

অন্ধকার ঘরের সাদা দেওয়ালে মাঝারি সাইজের ছবির ফ্রেমের মতো চতুষ্কোণ আলো পড়ল একটা। আরে এ কী! আমরা চারজনেই তড়াক করে বিছানায় উঠে বসলুম—ছবি পড়ছে যে!

ছবি বই কি! সিনে ক্যামেরায় তোলা রঙিন ছবি! কিন্তু কী ছবি! এ কী—এ যে আমরাই! ম্যালে ঘুরছি—সিঞ্চলে সাতকড়ির সঙ্গে কথা কইছি—টেনিদা ক্যাবলাকে চাঁটি মারতে যাচ্ছে—ঝাউ-বাংলোর নীচে আমাদের গাড়িটা এসে থামল।

তারপর আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা :

কাটা মুণ্ডুর নাচ দেখবে
শুনবে হাঁড়িচাঁচার ডাক
কাগামাছির প্যাঁচ দেখে নাও—
একটু পরেই চিচিংফাঁক।

সব শেষে :

'ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার জন্য প্রস্তুত হও।'

—ঝুমুরলাল
ফর কাগামাছি।

চৌকো আলোটা শাদা হয়ে দপ করে নিবে গেল। কির-কির করে আওয়াজটাও আর শোনা গেল না।

অন্ধকারে ক্যাবলাই চেঁচিয়ে উঠল—পাশের ঘর, পাশের ঘর। ওখান থেকেই প্রোজেক্টার চালিয়েছে।

টেনিদা আলো জ্বালাল। ক্যাবলা ছুটে গিয়ে পাশের বন্ধ ঘরের দরজায় লাথি মারল একটা।

দরজাটা খুলল না, ভেতর থেকে বন্ধ।

হাবুল ছুটে গিয়ে আমাদের ঘরের দরজা খুলতে গেল। সেটাও খুলল না। বাইরে থেকে কেউ শেকল বা তালা আটকে দিয়েছে বলে মনে হল।

কাটামুণ্ডুর নাচ

যতই টানাটানি করি আর চেঁচিয়ে গলা ফাটাই, দরজা আর কিছুতে খোলে না। শেষ পর্যন্ত হাবুল সেন থপ করে মেজের ওপরে বসে পড়ল।

—এই কাগামাছি অখন আমাগো মাছির মতন টপাটপ কইরা ধইরা খাইব।

—চার-চারটে লোককে গিলে খাবে—ইয়ার্কি নাকি? ক্যাবলা কখনও ঘাবড়ায় না। সে বললে—পুবদিকের জানলার কাছে বড় একটা গাছ রয়েছে টেনিদা। একটু চেষ্টা করলে সেই গাছ বেয়ে আমরা নেমে যেতে পারি।

আমি বললুম—আর নামবার সঙ্গে-সঙ্গে কাগামাছি আমাদের এক একজনকে—

—রেখে দে তোর কাগামাছি! সামনে আসুক না একবার, তারপর দেখা যাবে। টেনিদা তুমি আমাদের লিডার, তুমিই এগোও।

কনকনে শীত, বাইরে অন্ধকার, তার ওপর এই সব ঘোরতর রহস্যময় ব্যাপার। জানালা দিয়ে গাছের ওপর লাফিয়ে পড়াটড়া সিনেমায় মন্দ লাগে না, কিন্তু টেনিদার খুব উৎসাহ হচ্ছে বলে মনে হল না। মুখটাকে বেগুনভাজার মতো করে বললে—তারপর হাত-পা ভেঙে মরি আর কি? ও-সব ইন্দ্রলুপ্ত—মানে ধাষ্টামোর মধ্যে আমি নেই।

ক্যাবলা বললে—ইন্দ্রলুপ্ত মানে টাক। ধাষ্টামো নয়।

টেনিদা আরও চটে বললে—শাট আপ্। আমি বলছি ইন্দ্রলুপ্ত মানে ধাষ্টামো। আমাকে বকাসনি ক্যাবলা, আমি এখন খুব সিরিয়াসলি সবটা বোঝবার চেষ্টা করছি।

ক্যাবলা বিরক্ত হয়ে বললে—তা হলে তুমি বোঝবার চেষ্টাই করো। আর আমি ততক্ষণে গাছ বেয়ে নামতে চেষ্টা করি।

টেনিদা বললে—এটা তো এক নম্বরের পুঁইচচ্চড়ি—মানে পুঁদিচ্চেরি বলে মনে হচ্ছে। এই প্যালা, শক্ত করে ওর ঠ্যাং দুটো টেনে ধর দিকি। এখুনি গাছ থেকে পড়ে একটা কেলেঙ্কারি করবে।

পত্রপাঠ আমি ক্যাবলাকে চেপে ধরতে গেলুম আর ক্যাবলা তক্ষুণি পটাং করে আমাকে একটা ল্যাং মারল। আমি সঙ্গে-সঙ্গে হাবুলের ঘাড়ের ওপর গিয়ে পড়লুম আর হাবুল হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল—খাইছে—খাইছে।

টেনিদা চিৎকার করে বললে—অল কোয়ায়েট! এখন সমূহ বিপদ। নিজেদের মধ্যে মারামারির সময় নয়। বালকগণ, তোমরা সব স্থির হয়ে বসো, আর আমি যা বলছি তা কান পেতে শোনো। দরজা বন্ধ হয়ে আছে থাকুক—ওতে আপাতত আমাদের কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হচ্ছে না। আমরা আপাততত কম্বল গায়ে চড়িয়ে শুয়ে থাকি। সকাল হোক—তারপরে—

টেনিদা আরও কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক তখনি বাইরে থেকে বিকট আওয়াজ উঠল—চ্যাঁ চ্যাঁ চ্যাঁ—

হাবুল বললে—প্যাঁচা!

আওয়াজটা এবার আরও জোরালো হয়ে উঠল: চ্যাঁ—চ্যাঁ—ঘ্যাঁচ—ঘ্যাঁচ—ঘ্যাঁচা—

ক্যাবলা বললে—প্যাঁচা তো অত জোরে ডাকে না, তা ছাড়া ঘ্যাঁচা ঘ্যাঁচা করছে যে!

আমি পটলডাঙার প্যালারাম, অনেক দিন পালাজ্বরে ভুগেছি আর বাসকপাতার রস খেয়েছি। পেটে একটা পালাজ্বরের পিলে ছিল, সেটা পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেতে-খেতে কোথায় সটকে পড়েছিল। কিন্তু ওই বিকট আওয়াজ শুনে কোত্থেকে সেটা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, আবার গুরুগুরু করে কাঁপুনি ধরে গেল তার ভেতর।

তখনি আমি বিছানায় উঠে পড়ে একটা কম্বল মুড়ি দিলুম। বললুম—আমি গোবরডাঙায় পিসিমার বাড়ি ও-আওয়াজ শুনেছি। ওটা হাঁড়িচাঁচা পাখির ডাক।

বাইরে থেকে সমানে চলতে লাগল সেই ঘ্যাঁচা—ঘ্যাঁচা শব্দ আর হাবুল ঝুমুরলালের সেই প্রায়-কবিতাটা আওড়াতে লাগল:

'গান ধরেছে হাঁড়িচাঁচায়,
কুণ্ডুমশাই মুণ্ডু নাচায়।'

সবাই চুপ, আরও মিনিটখানেক ঘ্যাঁচার ঘ্যাঁচার করে হাঁড়িচাঁচা থামল। ততক্ষণে আমাদের কান ঝাঁ-ঝাঁ করছে, মাথা বনবন করছে, আর বুদ্ধি-সুদ্ধি সব হালুয়ার মতো তালগোল পাকিয়ে গেছে একেবারে। বেপরোয়া ক্যাবলা পর্যন্ত স্পিকটি নট। জানালা দিয়ে নামবর কথাও আর বলছে না।

হাবুল অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বললে—খুবই ফ্যাসাদে পইড়া গেলাম দেখতাছি। অখন কী করন যায়?

আমি আরও ভালো করে কম্বল মুড়ি দিয়ে বললুম—বাপ রে! কী বিচ্ছিরি আওয়াজ! আর-একবার হাঁড়িচাঁচার ডাক উঠলে আমি সত্যিই হার্টফেল করব, টেনিদা।

টেনিদা হাত বাড়িয়ে টকাস করে আমার মাথার ওপর একটা গাঁট্টা মারল।

—খুব যে ফুর্তি দেখছি, হার্টফেল করবেন। অঙ্কে ফেল করে-করে তোর অভ্যেসই খারাপ হয়ে গেছে। আমরা মরছি নিজের জ্বালায় আর ইনি দিচ্ছেন ইয়ার্কি। চুপচাপ বসে থাক প্যালা! হার্ট-ফার্ট ফেল করাতে চেষ্টা করবি তো এক চাঁটিতে তোর কান—

এত দুঃখের মধ্যেও হাবুল বললে—কানপুরে উইড়া যাইব।

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বসেছিল। ডাকল—টেনিদা?

—বলে ফেল।

রাত্তিরে হাঁড়িচাঁচা ডাকে নাকি?

আমি বললুম—কাগামাছি-স্পেশাল হাঁড়িচাঁচা। যখন খুশি ডাকতে পারে।

—দুত্তোর।—ক্যাবলা বিষম ব্যাজার হয়ে বললে—আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে, টেনিদা।

—কী সন্দেহ শুনি?

—কাগামাছি-টাছি সব বোগাস। ওই সবুজদাড়ি সাতকড়ি লোকটাই সুবিধের নয়। রাত্তিরে ইচ্ছে করে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে। প্রকৃতিকে ভালোবাসলেই সবুজ রঙের দাড়ি রাখতে হবে—এমন একটা যা-তা ফরমুলা বলছে—যার কোনও মানেই হয় না। থিয়োরি অভ রিলেটিভিটির সঙ্গে জোয়ানের আরক? পাগল না পেট-খারাপ ভেবেছে আমাদের।

টেনিদা বললে—কিন্তু সেই মিচকেপটাশ লোকটা?

—আর সিনে ক্যামেরা দিয়া আমাগো ছবিই বা তুলল কেডা? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

—আর ছুঁচোবাজিই বা ছুঁড়ল কে? আমি জানতে চাইলুম।

ক্যবলা বললে—হুঁ। তবে সাতকড়ির পকেটে আমি দেশলাইয়ের খড়খড়ানি ঠিকই শুনতে পেয়েছিলুম। আমার মনে হয় সাতকড়িই কুয়াশার ভেতর থেকে ওটা ছুঁড়ে দিয়ে—

বলতে বলতেই আবার :

—চ্যাঁ-চ্যাঁ-ঘ্যাঁচ-ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা—

হাবুল বললে—উঃ—সারছে।

আমি প্রাণপণে কান চেপে ধরলুম।

ক্যবলা তড়াক করে উঠে দাঁড়াল। বললে—বুঝেছি—জানলার নীচ থেকেই শব্দটা আসছে। আচ্ছা, দাঁড়াও।

বলেই আর দেরি করল না। টেবিলের ওপর কাচের জগভর্তি জল ছিল, সেইটে তুলে নিয়ে জানালা দিয়ে গব-গব করে ঢেলে দিলে। ঘ্যাঁচ—ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচ করে আওয়াজটা থেমে গেল মাঝপথেই। তারপরেই মনে হল, বাইরে কে যেন হুড়মুড় করে ছুটে পালাল। আরও মনে হল, কে যেন অনেক দূরে ফ্যাঁচ্চো করে হেঁচে চলেছে।

ক্যাবলা হেসে উঠল।

—দেখলে টেনিদা, হাঁড়িচাঁচা নয়—মানুষ। এক জগ ঠাণ্ডা জলে ভালো করে নাইয়ে দিয়েছি, সারা রাত ধরে হেঁচে মরবে এখন। রাত্তিরে আর বিরক্ত করতে আসবে না।

হাবুল বললে—কাগামাছি হাঁচতে আছে। আহা—ব্যাচারাম শ্যাষকালে নিমোনিয়া না হয়।

টেনিদা বললে—হোক নিউমোনিয়া, মরুক। ফিলিম দেখাচ্ছে, সমানে ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা করছে—একটু ঘুমুতে দেবার নামটি নেই! চুলোয় যাক ও-সব। দরজা যখন খুলবেই না—তখন আর কী করা যায়। তার চাইতে সবাই শুয়ে পড়া যাক।

কাল সকালে যা হোক দেখা যাবে।

ক্যবলা বললে—হুঁ, তা হলে শুয়েই পড়া যাক। আবার যদি হাঁড়িচাঁচা বিরক্ত করতে আসে, তা হলে ওপর থেকে এবার চেয়ার ছুঁড়ে মারব।

কম্বল জড়িয়ে আমরা বিছানায় লম্বা হলুম, মিনিট পাঁচেকের ভেতরেই টেনিদার নাক কুরকুর করে ডাকতে লাগল, হাবুল আর ক্যাবলাও ঘুমিয়ে পড়ল বলে মনে হল। কিন্তু আমার ঘুম আসছিল না। বাইরে রাত ঝমঝম করছে, ঝিঁঝি ডাকছে—জানালার কাচের ভেতর থেকে কালো-কালো গাছের মাথা আর আকাশের জ্বলজ্বলে একরাশ তারা দেখা যাচ্ছে। সে-দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মনে হচ্ছিল বেশ ছিলুম দার্জিলিঙে, খামকা কাগামাছির পেছনে এই পাহাড়-জঙ্গলে এসে পড়েছি। কাছাকাছি জন-মানুষ নেই, এখন যদি কাগামাছি ঘরে ঢুকে আমাদের এক-একজনকে মাছির মতোই টপাটপ গিলে ফেলে, তা হলে আমরা ট্যাঁ-ফোঁ করবারও সুযোগ পাব না। তার ওপর এই শীতে এক-জগ ঠাণ্ডা জল গায়ে ঢেলে দেওয়ায় কাগামাছি নিশ্চয় ভয়ঙ্কর চটে রয়েছে। যদিও হাবুল আমার পাশেই শুয়েছে। তবু সাহস পাবার জন্যে ওকে আমি আস্তে আস্তে ধাক্কা দিলুম।

—এই হাবলা, ঘুমুচ্ছিস নাকি?

আর হাবুল তক্ষুনি হাঁউমাউ করে এক রাম-চিৎকার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

নাকের ডাক বন্ধ করে টেনিদা হাঁক ছাড়ল—কী—কী—হয়েছে?

ক্যাবলা কম্বলসুদ্ধু নেমে পড়তে গিয়ে কম্বলে জড়িয়ে দড়াম করে আছাড় খেল একটা।

টেনিদা বললে—কী হয়েছে রে হাবুল, চেঁচালি কেন?

—কাগামাছি আমারে গুঁতো মারছে।

—কাগামাছি নয়, আমি। —আমি এই কথাটা কেবল বলতে যাচ্ছি, ঠিক তখন—

তখন সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটা ঘটল।

বড় আলো দুটো নিবিয়ে একটা নীল বাতি জ্বেলে আমরা শুয়ে পড়েছিলুম। হালকা আলোয় ছায়া-ছায়া ঘরটার ভেতর দেখা গেল এক রোমহর্ষক দৃশ্য।

আমরাই চোখে পড়েছিল প্রথম। আমি চেঁচিয়ে উঠলুম—ও কী?

ঘরের ঠিক মাঝখানে—শূন্যে কী ঝুলছে ওঠা!

আবছা আলোতেও স্পষ্ট দেখা গেল—ঠিক যেন হাওয়ায় একটা প্রকাণ্ড কাটামুণ্ডু নাচছে। তার বড়-বড় দাঁত, দুটো মিটমিটে চোখ—ঠিক যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসছে সে।

আমরা চারজনেই এক সঙ্গে বিকট চিৎকার ছাড়লুম। তৎক্ষণাৎ ঘরের নীল আলোটাও নিবে গেল, যেন বিশ্রী গলায় হেসে উঠল, আর আমি—

আমার দাঁতকপাটি লাগল নির্ঘাত। আর অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার আগেই টের

পেলুম, খাটের ওপর থেকে একটা চাল-কুমড়োর মতো আমি ধপাস করে মেঝেতে গড়িয়ে পড়েছি।

রাতের তদন্ত

খুব সম্ভব দাঁতকপাটি লেগে গিয়েছিল। আর রাত দুপুরে মাথার ওপর বেমক্কা একটা কাটা মুণ্ডু এসে যদি নাচতে শুরু করে দেয় তাহলে কারই বা দাঁতকপাটি না লাগে ? কিন্তু বেশিক্ষণ অজ্ঞান হয়েও থাকা গেল না, কে যেন পা ধরে এমন এক হ্যাঁচকা টান মারল যে, কম্বল-টম্বল সুদ্ধ আমি আর এক পাক গড়িয়ে গেলুম।

তখনও চোখ বন্ধ করেই ছিলুম। হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে বললুম—কাগামাছি—কাগামাছি।

—দুত্তোর কাগামাছি। ওঠ বলছি—কোত্থেকে যেন ক্যাবলাটা চেঁচিয়ে উঠল।

উঠে বসে দেখি কাটা মুণ্ডু-টুণ্ডু কিচ্ছু নেই—ঘরে আলো জ্বলছে। টেনিদা হাঁ করে ওপর দিকে তাকিয়ে আছে। হাবুল সেন গুটি-গুটি বেরিয়ে আসছে একটা খাটের তলা থেকে।

টেনিদা বললে—ভূতের কাণ্ড রে ক্যাবলা। কাগামাছি স্রেফ ভূত ছাড়া কিছু নয়।

হাবুল কাঁপতে কাঁপতে বললে—মুলার মতো দাঁত বাইর কইর‍্যা খ্যাঁচখ্যাঁচ কইর‍্যা হাসতে আছিল। ঘাঁক কইর‍্যা একখান কামড় দিলেই তো কম্ম সারছিল।

ক্যাবলা বললে—হুঁ।

আমি বললুম—হুঁ কী ? রাত ভোর হোক, তারপরেই আমি আর এখানে নেই। সোজা দার্জিলিং পালিয়ে যাব।

ক্যাবলা বললে—পালা, যে-চুলোয় খুশি যা। কিন্তু যাওয়ার আগে একবার ওই স্কাই-লাইটটা লক্ষ করে দেখ।

—আবার মুণ্ডু আসছে নাকি ?—বলেই হাবুল তক্ষুনি খাটের তলায় ঢুকে পড়ল। টেনিদা একটা লাফ মারল আর আমি পত্রপাঠ বিছানায় উঠে কম্বলের তলায় ঢুকে গেলুম।

ক্যাবলা ভীষণ বিরক্ত হয়ে বললে—আরে তুম্‌লোগ বহুত ডরপোক হো। দ্যাখ না তাকিয়ে ও-দিকে। স্কাই-লাইটটা খোলা। ওখান দিয়ে দড়ি বেঁধে একটা মুণ্ডু যদি ঝুলিয়ে দেওয়া যায় আর তারপরেই যদি কেউ সুড়ুত করে সেটাকে টেনে নেয়—তা হলে কেমন হয় ?

টেনিদা জিগ্‌গেস করলে—তা হলে তুই বলছিস ওটা—

—হ্যাঁ যদ্দুর মনে হচ্ছে, একটা কাগজের মুখোশ।

হাবুল আবার গুটি-গুটি বেরিয়ে এল খাটের নীচের থেকে। আপত্তি করে

বললে—না না, মুখোশ না। মুখে মুলার মতন দাঁত আছিল।

—তুই চুপ কর।—ক্যাবলা চেঁচিয়ে -ঠল—কাওয়ার্ড কোথাকার। শোন, আমি বলছি। যাওয়ার আগে যদি মুলোর মতো দাঁতগুলোকে গুঁড়ো করে দিয়ে যেতে না পারি, তাহলে আমার নাম কুশল মিত্তিরই নয় !

—তার আগে ওইটাই আমাগো কচমচাইয়া চাবাইয়া খাইব।

ক্যাবলা গজগজ করে কী বলতে যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় দরজা দিয়ে সাতকড়ি সাঁতরা এসে ঢুকলেন।

—ব্যাপার কী হে তোমাদের ? রাত সাড়ে বারোটা বাজে—এখনও তোমরা ঘুমোওনি নাকি। আমি হঠাৎ জেগে উঠে দেখি তোমাদের ঘরে আলো জ্বলছে। তাই খবর নিতে এলুম।

টেনিদা চটে বললে—আচ্ছা লোক মশাই আপনি ! এতক্ষণে খবর নিতে এলেন ! ওদিকে আমরা মারা যাওয়ার জো ! বাইরে থেকে দরজা বন্ধ, ভেতরে ভূতের কাণ্ড চলছে, আর আপনি বলছেন ঘুমুইনি কেন !

সাতকড়ি অবাক হয়ে বললেন—কেন, দরজা তো খোলাই ছিল !

—খোলা ছিল ! আধঘণ্টা টানাটানি করে আমরা খুলতে পারিনি।

সাতকড়ি ঘাবড়ে গেলেন। একটা চেয়ারে বসে পড়ে বললেন—কী হয়েছিল বলো দেখি ?

আমি বললুম—বিনামূল্যে ফিলিম শো দেখেছি।

টেনিদা বললে—ঘ্যাঁচা-ঘ্যাঁচা করে কানের কাছে বিচ্ছিরিভাবে হাঁড়িচাঁচা ডাকছিল। এককুঁজো জল তার মাথায় ঢেলে ক্যাবলা তাকে তাড়িয়েছে।

হাবুল বললে—আর চালের থনে অ্যাকটা কাটা মুণ্ডু বত্রিশটা দাঁত বাইর কইরা তুরুক-বুরুক লাফাইতে আছিল।

টেনিদা কষে একটা গাঁট্টা বাগাল। দাঁতে দাঁত ঘষে বললে—ব্যাটা নির্ঘাত মেফিস্টোফিলিস। একবার সামনে পেলে এমন দুটো ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেরে দেব যে ইয়াক-ইয়াক হয়ে যাবে।

সাতকড়ি বললে—দাঁড়াও-দাঁড়াও, ব্যাপারটা বুঝে দেখি। তার আগে তোমাদের একটু ভুল শুধরে দিই। মেফিস্টোফিলিস হল শয়তান। পুরুষ—ফরাসী ভাষায় মাসক্যুল্যাঁ ! আর মাসক্যুল্যাঁ হলে বলা উচিত ল্য গ্রাঁ। অর্থাৎ কিনা মস্ত বড়। আর 'ডি'—অর্থাৎ 'দ্য' টা ওখানে—

টেনিদা বললে—থামুন-থামুন। আমরা মরছি নিজের জ্বালায়, আর আপনি এই মাঝরাত্তিরে ফরাসী শোনাতে এসেছেন। আচ্ছা লোক তো !

—আচ্ছা, থাক-থাক। এখন খুলে বলো !

আমি বললুম—আপনি হাঁড়িচাঁচার ডাক শোনেননি ?

—হাঁড়িচাঁচার ডাক ? না তো !—সাতকড়ি যেন গাছ থেকে পড়লেন।

হাবুল বললে—কন কী মশায় ? আপনে কুম্ভকর্ণ নাকি ! আমাগো কান ফাইটা যাইতাছিল আর আপনে শুনতেই পান নাই ?

ক্যাবলা বললে—আঃ। তোরা একটু থাম তো বাপু। এমনভাবে সবাই মিলে বক-বক করলে কোনও কাজ হয়? আমি বলছি শুনুন!

টেনিদা বললে—রাইট। অর্ডার—অর্ডার।

ক্যাবলা সব বিশদ বিবরণ শুনিয়ে দিলে সাতকড়িবাবুকে। সাতকড়ি কখনও হাঁ করলেন, কখনও চোখ গোল করলেন, কখনও বললেন, মাই গঃ—! শেষ পর্যন্ত শুনে একটা হুতোম প্যাঁচার মতো থ হয়ে রইলেন।

টেনিদা বললে—তা হলে—

—তা হলে সেই কাগামাছি। এবার ঘোর বেগে আমাকে আক্রমণ করেছে দেখছি! না, ফরমুলাটা আর বাঁচানো যাবে না মনে অচ্ছে। আমার এতদিনের সাধনা—এমন যুগান্তকারী আবিষ্কার—সব গেল—

আমি বললুম—এত ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে যদি পুলিশে খবর দেন—

—পুলিশ!—সাতকড়ি সাঁতরা কিছুক্ষণ এমন বিচ্ছিরি মুখ করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন যে, মনে হল এর চাইতে অদ্ভুত কথা জীবনে কোনওদিন তিনি শোনেননি।

ক্যাবলা বললে—আচ্ছা সাঁতরামশাই, আমাদের পাশের ঘরে কী আছে?

সাতকড়ি বললে—ওটা? ওটা স্ট্যাকরুম। মানে বাড়ির বাড়তি আর ভাঙাচুরো জিনিসপত্র জড়ো করে রাখা হয়েছে ওতে।

—ওর দরজায় চৌকো ফুটোটা এল কী করে? মানে যা দিয়ে এ-ঘরের দেওয়ালে প্রজেকটার দিয়ে ছবি ফেলা যায়?

—চৌকো ফুটো? সাতকড়ি আকাশ থেকে পড়লেন—ফুটো আবার কে করবে? ফুটোফাটার কথা আবার কেন? কোনও ফুটোর খবর তো আমি জানিনে।

—তা হলে জেনে নিন। ওই দেখুন।

সাতকড়ি উঠে দেখলেন আর দেখেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

—সর্বনাশ! কাগামাছি দেখছি আমার ঘরে আড্ডা গেড়েছে। এবার আমি গেলুম!—সবুজ দাড়ি মুঠোয় চেপে ধরে তিনি হায় হায় করতে লাগলেন—একেবারে মারা গেলুম দেখছি।

ক্যাবলা বললে—মারা একটু পরে যাবেন। তার আগে ওই ঘরটা খুলবেন চলুন।

—ঘর? মানে ও-ঘরটা? ও খোলা যায় না।

—কেন খোলা যায় না?

সাতকড়ি বুঝিয়ে বললেন—মানে আসবার সময় ও-ঘরের চাবি কলকতায় ফেলে এসেছি কিনা। আর দুটো পেল্লায় তালা ও-ঘরে লাগানো আছে।

—সে-তালা ভাঙতে হবে।

সাতকড়ি হেসে বললেন—তা হলে দার্জিলিং থেকে কামার আনতে হয়। এমনিতে ও ভাঙবার বস্তু নয়।

টেনিদা বললে—চলুন, দেখা যাক।

সবাই বেরুলুম। সারা বাড়িতে আলো জ্বলছে তখন। সাতকড়িই জ্বেলে দিয়েছেন নিশ্চয়। পাশের ঘরের সামনে গিয়ে দেখা গেল ঠিকই বলেছেন ভদ্রলোক। আধ হাত করে লম্বা দুটো তালা ঝুলছে। কামারেরও শানাবে বলে মনে হল না—খুব সম্ভব কামান দাগাতে হবে।

টেনিদা বললে—কাল সকালে দেখতে হবে ভালো করে।

ক্যাবলা বললে—এবার চলুন, বাইরে বেরুনো যাক।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—আবার বাইরে কেন? কোথায় কাগামাছির লোক ঘাপটি মেরে বসে আছে। তার ওপর এই হাড়-কাঁপানো শীত—বরং কালকে—

ক্যাবলা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললে—তবে তুই একলা ঘরে শুয়ে থাক। আমরা দেখে আসি।

সর্বনাশ, বলে কী! একলা ঘরে থাকব! আর কায়দা পেয়ে ওপর থেকে কাটা মুণ্ডুটা ঝাঁ করে আমাকে তেড়ে আসুক! কামড়াবারও দরকার হবে না—আর-একবার দন্ত-বিকাশ করলেই আমি গেছি।

দাড়িটা চুলকে নিয়ে বললুম—না-না, চলো, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাচ্ছি। মানে, তোমাদেরও তো একটু সাহস দেওয়া দরকার!

বাইরে ঠাণ্ডা কালো রাত। পাইনের বন কাঁপিয়ে হু হু করে বাতাস দিচ্ছে—কুয়াশা ছিড়ে ছিড়ে যাচ্ছে হাওয়ায়। দূরের কালো কালো পাহাড়ের মাথায় মোটা ভুটিয়া কম্বলের মতো পুরু পুরু মেঘ জমেছে, লাল বিদ্যুৎ ঝলসাচ্ছে তার ভেতরে। সব মিলিয়ে যেন বুকের মধ্যে কাঁপুনি ধরে গেল আমার। এমন রাতে কোথায় ভরপেট খেয়ে লেপ-কম্বলের তলায় আরামসে ঘুম লাগাব, তার বদলে হতচ্ছাড়া কাগামাছির পাল্লায় পড়ে—উফ!

সাতকড়ি সঙ্গে টর্চ এনেছিলেন। সেই আলোয় আমরা দেখলুম, ঠিক আমাদের জানালার নিচে মাটিতে খানিকটা জল রয়েছে তখনও, আর তার ভেতর কার জুতোপরা পায়ের দাগ।

ক্যাবলা বললে—হাঁড়িচাঁচা। মাথায় জল পড়তে কেটে পড়েছে।

পাশেই ঘাস। কাজেই জুতোপরা হাঁড়িচাঁচা কোন্‌দিকে যে পালিয়েছে বোঝা গেল না। আরও খানিকক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করে আমরা আবার ফিরে এলুম।

সাতকড়ি বললেন—যা হওয়ার হয়েছে—এবার তোমরা শুয়ে পড়ো। আজ আর কোনও উৎপাত হয়তো হবে না। যাই হোক—আমি রাত জেগে পাহারা দেব এখন।

টেনিদা বললে—আমরাও পাহারা দেব!

—না-না, সে কী হয়। হাজার হোক তোমরা আমার অতিথি। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো। দরকার হলে তোমাদের আমি ডাকব এখন।

আমরা যখন শুতে গেলাম, তখন ঝাউ-বাংলোর হলঘরের ঘড়িটায় টং করে একটা বাজল।

শোবার আগে দুটো কাজ করল ক্যাবলা। প্রথমে দড়ি টেনে টেনে সব ক'টা স্কাইলাইট ভালো করে বন্ধ করল, তারপর ড্রেসিং টেবিলটা টেনে এনে পাশের ঘরের দরজার সামনে দাঁড় করালে যাতে ওখান থেকে কাগামাছি আবার আমাদের দেওয়ালে প্রজেক্টারের আলো ফেলতে না পারে।

তারপর কাগামাছির কথা ভাবতে-ভাবতে আমাদের ঘুম এল, আর সেই ঘুম একটানা চলল সকাল পর্যন্ত। কিন্তু তখন আমরা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি—পরের দিন কী নিদারুণ বিভীষিকা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে।

সাতকড়ি গায়েব

ঘুমব কী ছাই! সকলকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠতে হল কাঞ্ছার হাঁউমাউ চিৎকারে।

—কী হল কাঞ্ছা—ব্যাপার কী?

কাঞ্ছা বললে—বাবু গায়েব।

—গায়েব?

কাঞ্ছা জবাব দিল—জু!

—কোথায় গায়েব? কেমন করে গায়েব?

কাঞ্ছা হাঁউমাউ করে অনেক কথাই বলে গেল নেপালী ভাষায়। তোমরা তো আর সবাই নেপালী বুঝবে না, সন্দেশের সম্পাদকমশাইরাও সে কান্না-ভেজানো ভাষা কতটা বুঝবেন তাতে আমার সন্দেহ আছে। তাই সকলের সুবিধের জন্যে কাঞ্ছার কথাগুলো মোটামুটি শাদা বাংলায় লিখে দিচ্ছি—

কাঞ্ছার বক্তব্য হচ্ছে—

রোজ ভোর পাঁচটায় নাকি সাতকড়ি সাঁতরা এককাপ চা খেতেন। কাঞ্ছা বললে—'ব্যাড-টি'। আর শৌখিন লোক সবুজদাড়ি সাঁতরামশাই খারাপ চা খেতেন ভাবতেই আমরা বিচ্ছিরি লাগল। ক্যাবলা আমার কানে-কানে বললে—বোধ হয় বেড-টি মিন করেছে। যাই হোক, ভোরবেলা কাঞ্ছা চা নিয়ে ঘরে ঢুকতেই একেবারে থ। বাংলা ডিটেকটিভ বইতে লেখা থাকে—হুবহু ঠিক তাই ঘটেছে। অর্থাৎ ঘরটি একেবারে তছনছ—বালিশ কম্বল সব মেঝেয় পড়ে আছে, এক কোণে একটা টিপয় কাত হয়ে রয়েছে, কার একটা ভাঙা হুঁকো রয়েছে সাতকড়ির বিছানার ওপর, দরজার বাইরে একগাছা মুড়ো ঝাঁটা, সিঁড়িতে দেখা যাচ্ছে কুকুরে-চিবুনো একপাটি চপ্পল। মানে অনেক কিছুই আছে—কেবল নেই সাতকড়ি সাঁতরা। তিনি স্রেফ হাওয়া হয়ে গেছেন।

টেনিদা বললে—বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছেন।

কাঞ্ছা জানালে, সেটা অসম্ভব। কারণ ভোর পাঁচটায় ব্যাড-টি না পেলে, পাঁচটা বেজে সাত মিনিটের সময় সাতকড়ি চিৎকার করে কাঞ্ছাকে ডাকেন আর গ্যাড-ম্যাড করে ইংরেজিতে গাল দিতে থাকেন। সুতরাং চা না খেয়ে ঘর থেকে বেরুবেন এমন বান্দাই তিনি নন। তা ছাড়া নিজের বালিশ-বিছানা নিয়ে এর আগে তাঁকে কোনওদিন কুস্তি লড়তেও দেখা যায়নি। আরও বড় কথা, ভাঙা হুঁকো, মুড়ো ঝাঁটা আর কুকুরে-চিবনো চপ্পলই বা এল কোত্থেকে? তবু দেড় ঘণ্টা-দু' ঘণ্টা ধরে কাঞ্ছা সব জায়গায় তাঁকে খুঁজেছে। কিন্তু কোথাও তাঁর সবুজ দাড়ির ডগাটি পর্যন্ত খুঁজে না পেয়ে শেষ পর্যন্ত এসে ডেকে তুলেছে আমাদের।

কিছুক্ষণ আমরা বোকার মতো দাঁড়িয়ে রইলুম। শেষে টেনিদা বললে—তা হলে একবার দেখে আসা যাক ঘরটা।

হাবুল সেন বললে—দেইখ্যা আর হইব কী! কাগামাছিতে তারে লইয়া গেছে।

ক্যাবলা বললে—তুই একটু চুপ কর তো হাবুল। দেখাই যাক না একবার।

আমরা সাতকড়ি সাঁতরার ঘরে গেলুম। ঠিকই বলেছে কাঞ্ছা। ঘরের ভেতরে একেবারে হইহই কাণ্ড—রইরই ব্যাপার! সবকিছু ছড়িয়ে-টড়িয়ে একাকার। ভাঙা হুঁকো ছেঁড়া চপ্পল, মুড়ো-ঝাঁটা—সব রেডি।

টেনিদা ভেবে-চিন্তে বললে—ওই ছেঁড়া চপ্পল পায়ে দিয়ে হুঁকো খেতে খেতে কাগামাছি এসেছিল!

হাবুল মাথা নেড়ে বললে—হ। আর ওই ঝাঁটাটা দিয়া সাঁতরা মশাইরে রাম-পিটানি দিছে।

তখন আমার মগজে দারুণ একটা বুদ্ধি তড়াং করে নেচে উঠল। আমি বললুম—ভাঙা হুঁকোতে তামাক খাবে কী করে? ওর একটা গভীর অর্থ আছে। জাপানীরা হুঁকো কবিতা লেখে কিনা, তাই কাগামাছি হুঁকোটা রেখে জানিয়ে গেছে যে সে জাপানী।

শুনে ক্যাবলা ঠিক ডিমভাজার মতো বিচ্ছিরি মুখ করে আমাকে ভেংচে উঠল—থাম থাম, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না। হাইকু কবিতা হুঁকো হবে কোন্ দুঃখে? আর কার এমন দায় পড়েছে যে সাত বছরের পুরনো কুকুরের-খাওয়া চটি পায়ে দেবে? পায়ে কি দেওয়াই যায় ওটা? তা ছাড়া কে কবে শুনেছে যে ডাকাত মুড়ো-ঝাঁটা নিয়ে আসে? সে তে পিস্তল-টিস্তল নিয়ে আসবে।

—হয়তো কাগামাছির পিস্তল-টিস্তল নেই, সে গরিব মানুষ। আর ওটা যে সাধারণ একটা বুড়ো খ্যাংরা তাই বা কে বললে? হয়তো ওর প্রত্যেকটা কাঠিতে সাংঘাতিক বিষ রয়েছে, হয়তো ওর মধ্যে ডিনামাইট ফিট করা আছে—

ক্যাবলার ডিমভাজার মতো মুখটা এবার আলু-কাবলির মতো হয়ে গেল—হয়তো ওর মধ্যে একটা অ্যাটম বম আছে, দুটো স্পুটনিক আছে, বারোটা নেংটি উঁদুর আছে? যত সব রদ্দিমার্কা ডিটেকটিভ বই পড়ে তোমাদের মাথাই

খারাপ হয়ে গেছে দেখছি !—বলে, আমরা হাঁই-হাঁই করে ওঠবার আগেই সে মুড়ো-ঝাঁটায় জোর লাথি মারল একটা। বোমা ফাটল না, দাড়ুম-দুড়ুম কোনও আওয়াজ হল না, ক্যাবলা মারা পড়ল না, কেবল ঝাঁটাটা সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে সোজা বাগানে গিয়ে নামল।

ঠিক তখন ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—আরে এইটা কী ?

হুঁকোর মাথায় যেখানটায় কলকে থাকে, সেখানে একটা কাগজের মতো কী যেন পাকিয়ে গোল করে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে। হাবুল হুঁকোটা তুলে আনতেই টেনিদা ছোঁ মেরে কাগজটা তুলে নিলে।

ডিটেকটিভ বইতে যেমন লেখা থাকে, অবিকল সেই ব্যাপার।

একখানা চিঠিই বটে। আমরা একসঙ্গে ঝুঁকে পড়ে দেখলুম, চিঠিতে লেখা আছে :

'প্রিয় চার বন্ধু !

কাগামাছি দলবল নিয়ে ঘেরাও করেছে—দু'মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে। আমি জানি, এক্ষুনি তারা লোপাট করবে আমাকে। তাই ঝটপট লিখে ফেলছি চিঠিটা। আমাকে গায়েব করে ফরমুলাটা জেনে নেবে। তোমরা আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কোরো। কিন্তু সাবধান—পুলিশে খবর দিয়ো না। তা হলে তক্ষুনি আমায় খুন—'

আর লেখা নেই। কিন্তু চিঠিটা যে সাতকড়িরই লেখা তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বেশ বোঝা যাচ্ছে, এটুকু লেখবার পরেই সদলবলে কাগামাছি এসে ওঁকে খপ করে ধরে ফেলেছে।

রহস্য নিদারুণ গভীর ! এবং ব্যাপার অতি সাংঘাতিক !

আমরা চারজনেই দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে মাথা চুলকোতে লাগলুম। এখন কী করা যায় ?

একটু পরে টেনিদা বললে—দা-দার্জিলিঙেই চলে যাব নাকি রে ?

হাবুল বললে—হ, সেইডা মন্দ কথা না। বজ্রবাহাদুর গাড়ি নিয়া আসলেই—

ক্যাবলা চটে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল—তোমাদের লজ্জা করে না ? বিপদে পড়ে ভদ্রলোক ডেকে পাঠিয়েছিলেন, তাঁকে ডাকাতের হাতে ফেলে পালাবে ? পটলডাঙার ছেলেরা এত কাপুরুষ ? এর পরে কলকাতায় ফিরে মুখ দেখাবে কী করে ?

হাবুল সেনের একটা গুণ আছে—সব সময়েই সকলের সঙ্গে সে চমৎকার একমত হয়ে যেতে পারে। সে বললে—হ সত্য কইছ। মুখ দ্যাখান দাইব না।

আমি বললুম—কিন্তু সাঁতরামশাইকে কোথায় পাওয়া যাবে ? হয়তো এতক্ষণে তাঁকে কোনও গুপ্তগৃহে—

—শাট আপ—গুপ্তগৃহ ! রাগের মাথায় ক্যাবলার মুখ দিয়ে হিন্দীতে বেরুতে লাগল—কেয়া, তুমলোগ মজাক কর রহে হো ? বে-কোয়াশ বাত ছোড়ো। গুপ্তগৃহ অত সহজে মেলে না—ও শুধু ডিটেকটিভ বইতেই লেখা থাকে। চলো—বাড়ির পেছনে পাইনের বনটা আগে একটু খুঁজে দেখি ! তারপর যা হয় প্ল্যান করা যাবে !

টেনিদা মাথা চুলকে বললে—এক্ষুনি ?

—এক্ষুনি।

টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকের ডগাটা কেমন যেন বেঁটে হয়ে গেল—মানে একটু চা-টা খেয়ে বেরুলে —কী বলে ঠিক গায়ের জোর পাওয়া যাবে না। খিদেও তো পেয়েছে—তাই—

ক্যাবলা বললে—এই কি তোমার খাবার সময় ? শেম—শেম !

'শেম—শেম' শুনেই আমাদের লিডার সঙ্গে সঙ্গে বুক টান করে দাঁড়িয়ে গেল। ঘরের একটা খুঁটি ধরে বার তিনেক বৈঠক দিয়ে টেনিদা বললে—অলরাইট ! চল—এই মুহূর্তেই বেরিয়ে পড়া যাক।

কিন্তু কাঞ্ছা অতি সুবোধ বালক। সাতকড়ি লোপাট হয়ে গেছেন বটে, কিন্তু কাঞ্ছা নিজের ডিউটি ভুলে যায়নি। সে বললে—ব্রেকফাস্ট তৈরিই আছে বাবু। খেয়েই বেরোন।

ক্যাবলার দিকে আমরা ভয়ে-ভয়ে তাকালুম। ক্যাবলা বললে—বেশ, তা হলে খেয়েই বেরুনো যাক। কিন্তু মাইন্ড ইট—পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমাদের বেরুতে হবে। আর এই প্যালাটা যে আধ ঘণ্টা ধরে বসে টোস্ট চিবুবে সেটা কিছুতেই চলবে না।

—বা-রে, যত দোষ আমার ঘাড়েই ! আমার রাগ হয়ে গেল। বললুম—আমিই বুঝি আধ ঘণ্টা ধরে টোস্ট চিবুই ? আর তুই যে কালকে এক ঘণ্টা ধরে মুরগির ঠ্যাং কামড়াচ্ছিলি, তার বেলায় ?

টেনিদা কড়াং করে আমার কানে জোর একটা চিমটি দিয়ে বললে—অ্যাই চোপ—বিপদের সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই।

আমি চেঁচিয়ে বললুম—খালি আমাকেই মারলে ? আর ক্যাবলা যে—

—ঠিক ! ও-ও বাদ যাবে না—বলেই টেনিদা ক্যাবলাকে লক্ষ্য করে একটা রাম চাঁটি হাঁকড়াল। ক্যাবলা সুট করে সরে গেল, আর চাঁটিটা গিয়ে পড়ল হাবুলের মাথায়।

—খাইছে খাইছে ! বলে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল। এক্কেবারে ষাঁড়ের মতো গলায়।

শত্রুর ভীষণ আক্রমণ

খেয়েদেয়ে আমরা বনের মধ্যে ঢুকে পড়লুম।

ঝাউ-বাংলোর ঠিক পেছনেই জঙ্গলটা! পাহাড়ের মাথার ওপর দিয়ে কত দূর পর্যন্ত চলে গেছে কে জানে! সারি সারি পাইনের গাছ, এখানে-ওখানে টাইগার ফার্নের ঝোপ, বড় ধুতরোর মতো সানাই ফুল, পাহাড়ি ভুঁই-চাঁপা। শাদায়-কালোয় মেশানো সোয়ালোর ঝাঁক মধ্যে-মধ্যে আশপাশ দিয়ে উড়ে যেতে লাগল তীর বেগে, কাকের মতো কালো কী পাখি লাফাতে-লাফাতে বনের ভেতর অদৃশ্য হল আর লতা-পাতা, সোঁদা মাটি, ভিজে পাথরের ঠাণ্ডা গন্ধ—সব মিলিয়ে ভীষণ ভালো লাগল জঙ্গলটাকে।

আমি ভাবছিলুম এই রকম মিষ্টি পাহাড় আর ঠাণ্ডা বনের ভেতর সন্নিসি-টন্নিসি হয়ে থাকতে আমিও রাজি আছি, যদি দু'বেলা বেশ ভালোমতন খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। সত্যি বলতে কী, আমার সকালবেলাটাকে ভীষণ ভালো লাগছিল, এমন কি সবুজদাড়ি, সাতকড়ি সাঁতরা, সেই হতচ্ছাড়া কাগামাছি, সেই মিচকেপটাশ কদম্ব পাকড়াশি—সব মুছে গিয়েছিল মন থেকে। বেশ বুঝতে পারছিলুম, এই বনের মধ্যে ঘুরে বেড়ান বলেই সাতকড়ির মগজে কবিতা বিজ বিজ করতে থাকে :

ওগো পাইন,
ঝিলমিল করছে জ্যোৎস্না
দেখাচ্ছে কী ফাইন।

আমিও প্রায় কবি-কবি হয়ে যাচ্ছি, এমন সময় টেনিদা বললে—দুৎ, এ-সবের কোনও মানেই হয় না। কোথায় খুঁজে বেড়াবে বল দিকি বনের মধ্যে? আর তা ছাড়া সাতকড়িবাবুকে নিয়ে জঙ্গলের দিকেই তারা গেছে তারও তো প্রমাণ নেই।

আমি বললুম—ঠিক। সামনে অত বড় রাস্তা থাকতে খামকা জঙ্গলেই বা ঢুকবে কেন?

ক্যাবলা বললে—প্রমাণ চাও? ওই দ্যাখো!

আরে তাই তো! একটা ঝোপের মাথায় রঙচঙে কী আটকে আছে ওটা? এক লাফে এগিয়ে গিয়ে সেটাকে পাকড়াও করল হাবুল

এই জিনিসটা আর কিছুই নয়। চকোলেটের মোড়ক! তা হলে নিশ্চয়—

আমি বললুম—কদম্ব পাকড়াশি!

হাবুল ঝোপের মধ্যে কী খুঁজছিল।

ক্যাবলা বললে—আর কিছু পেলি নাকি রে?

হাবুল বললে—না—পাই নাই। খুঁইজ্যা দেখতাছি। যদি চকোলেটখানাও এইখানে পইড়্যা থাকে, তাহলে জুত কইরা খাওন যাইব।

—জুত করে আর খেতে হবে না! চলে আয়!—কড়া গলায় ডাকল ক্যাবলা।

ব্যাজার হয়ে হাবুল চলে এল। আর এর মধ্যেই আর-একটা আবিষ্কার করল টেনিদা।

মোড়কটার পেছন দিকে শাদা কাগজের ওপর পেনসিল দিয়ে কী সব লেখা।

—এ আবার কী রে ক্যাবলা?

ক্যাবলা কাগজটা নিয়ে পড়তে লাগল। এবারেও একটা ছড়া—

সাঁতরামশাই গুম
টাক ডুমাডুম ডুম।
বৃক্ষে ও কী লম্ব
বলছে শ্রীকদম্ব!

সেই কদম্ব পাকড়াশি! সেই ধুসো মাফলার জড়ানো, সেই মিচকে-হাসি ফিচকে লোকটা!

লেখা পড়ে আমরাও গুম হয়ে রইলুম। তারপর টেনিদা বললে—ক্যাবলা!

ক্যাবলা গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে—হুঁ!

—কী বুঝছিস?

—এই জঙ্গলের মধ্যেই তা হলে কোথাও ওরা আছে।

—কিন্তু কোথায় আছে? আমি বললুম—জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমরা একেবারে সিকিম-ভুটান পার হয়ে যাব নাকি?

ক্যাবলা আরও গম্ভীর হয়ে বললে—দরকার হলে তাও যেতে হবে।

—খাইছে! হাবুলের আর্তনাদ শোনা গেল।

ক্যাবলা তাতে কান দিল না। ছড়াটা আর একবার নিজে নিজেই আউড়ে নিয়ে বললে—সাঁতরামশাই গুম হয়েছেন এটা তো পরিষ্কার দেখাই যাচ্ছে।

—আর সেইজন্য আনন্দে কাগামাছি আর কদম্ব বলছে টাক-ডুমাডুম। আমি ব্যাখ্যা করে দিলুম।

হাবুল বললে—কদম্ব সেই কথাই কইতে আছে।

ক্যাবলা ভুরু কোঁচকাল। শার্টের পকেট থেকে একটা চুয়িংগাম মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বললে—এ-সব ঠিক আছে। কিন্তু বৃক্ষে ও কী লম্ব—এর মানে কী?—গাছে কী ঝুলছে?

—গাছে কী ঝুলব? পাকা কাঁটাল ঝুলতে আছে বোধ হয়।

শুনেই টেনিদা ভীষণ খুশি হয়ে উঠল!

—পাকা কাঁটাল ঝুলছে? তাই নাকি? কোথায় ঝুলছে রে?

—তুমলোগ কেতনা বেফায়দা বাত কর রহে হো?—ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল—খাওয়ার কথা শুনলেই তোমাদের কারও আর মাথা ঠিক থাকে না। পাইন বনের ভেতর পাকা কাঁটাল কোত্থেকে ঝুলছে? আর এই সময়? ওর একটা গভীর অর্থ আছে, বলে আমার মনে হয়।

—কী অর্থ শুনি?—কাঁটাল না পেয়ে ব্যাজার হয়ে জিগ্‌গেস করল টেনিদা।

—একটু দেখতে হচ্ছে। চলো, এগোনো যাক।

বেশি দূর এগোবার দরকার হল না। এবারে চেঁচিয়ে উঠল হাবুলই।

—ওই—ওইখানেই ঝুলতাছে।

—কী ঝুলছে ? কী ঝুলছে ?—আমরা আরও জোরে চিৎকার করলুম।

—দেখতে আছ না ? ওই গাছটায় ?

কী একটা পাহাড়ী গাছ। বেশি উঁচু নয়, কিন্তু অনেক ডালপালা আর তাতে বানর-লাঠির মতো লম্বা লম্বা সব ফল রয়েছে। সেই গাছের মগডালে শাদা কাপড়ের একটা পুঁটলি !

আমরা খানিকক্ষণ হাঁ করে সেদিকে তাকিয়ে রইলুম। তারপর টেনিদা বললে—তা হলে ওটাই সেই বৃক্ষে লম্ব ব্যাপার।

ক্যাবলা বললে—হুঁ।

টেনিদা বললে—তা হলে ওটাকে তো পেড়ে আনতে হয় !

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম—দরকার কী টেনিদা—যা লম্বা হয়ে আছে তা ওই লম্বমান থাকুক না ! ওটাকে নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করে কাজ নেই।

হাবুল বললে—হ, সত্য কইছস। কয়েকটা বোম্বা-টোম্বা লম্ব কইরা রাখছে কি না কেডা কইব ? দুড়ুম কইরা ফাইট্যা গিয়া শ্যাষে আমাগো উড়াইয়া দিব।

টেনিদা বললে—হুঁ—তা-ও অসম্ভব নয়।

ক্যাবলা বললে—ভীতুর ডিম সব ! ছো ছো, এমনি কাওয়ার্ডের মতো তোমরা কাগামাছির সঙ্গে মোকাবিলা করতে চাও ! যাও—এখুনি সবাই মুখে ঘোমটা টেনে দার্জিলিঙে পালিয়ে যাও !

টেনিদা মধ্যে-মধ্যে বেগতিক দেখলে এক-আধটু ঘাবড়ে যায় বটে, কিন্তু কাওয়ার্ড কথাটা শুনলেই সে সিংহের মতো লাফিয়ে ওঠে। আর আমি—পটলডাঙার পালারাম, এককালে যার কচি পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলই নিত্য বরাদ্দ ছিল, আমার মনটাও সঙ্গে সঙ্গে শিঙিমাছের মতো তড়পে ওঠে।

টেনিদা বললে—কী বললি ! কাওয়ার্ড ! ঠিক আছে, মরতে হয় তো আমিই মরব ! যাচ্ছি গাছে উঠতে। শুনে আমার রবীন্দ্রনাথের কবিতা মনে পড়ে গেল :

'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান' ইত্যাদি ইত্যাদি। আরও মনে হল, বীরের মতো মরবার সুযোগ যদি এসেই থাকে আমিই বা ছাড়ব কেন ? এগিয়ে গিয়ে বললুম—তুমি আমাদের লিডার—মানে সেনাপতি। প্রাণ দিতে হলে সৈনিকদেরই দেওয়া উচিত। সেনাপতি মরবে কেন ? আমিই গাছে উঠব।

ক্যাবলা বললে—শাবাশ—শাবাশ !

আর টেনিদা আর হাবুল মিলে দারুণ ক্ল্যাপ দিয়ে দিলে একখানা ! ক্ল্যাপ পেয়ে ভীষণ উৎসাহ এসে গেল। আমি তড়াক করে গাছে চড়তে গেলুম ! কিন্তু একটু উঠেই টের পেলুম, প্রাণ দেওয়াটা শক্ত কাজ নয়—তার চাইতে আরও কঠিন ব্যাপার আছে। মানে কাঠপিঁপড়ে !

টেনিদা বললে—তাতে কী হয়েছে ! বীরের মতো উঠে যা ! আর নজরুলের মতো ভাবতে থাক : আমি ধূর্জটি—আমি ভীম ভাসমান মাইন !

কামড়ে ত্রিভুবন দেখিয়ে দিচ্ছে—এখন মাইন-টাইন কারও ভালো লাগে ? দাঁত-টাঁত খিঁচিয়ে—মুখটাকে ঠিক ডিমের হালুয়ার মতো করে আমি গাছের ডগায় উঠে গেলুম !

সামনেই দেখছি কাপড়ের পুঁটলিটা। একবারের জন্য হাত কাঁপল, বুকের ভেতরটা হাঁকপাঁক করে উঠল। যদি সত্যিই একটা বোমা ফাটে ? যদি—কিন্তু ভেবে আর লাভ নেই। কবি লিখেছেন—মরতে হয় তো মর গে ! আর যে-রকম পিঁপড়ে কামড়াচ্ছে, তাতে বোমার ঘায়ে মরাই ঢের বেশি সুখের বলে মনে হল এখন।

দিলুম হাত। ভেতরে কতগুলো কী সব রয়েছে। ফাটল না।

টেনিদা বললে,—টেনে নামা। তারপর নীচে ফেলে দে।

আমি দেখলুম, পুঁটলিটা আলগা করেই বাঁধা আছে, খুলতে সময় লাগবে না, নীচে ওদের ডেকে বললুম—আমি ফেলছি, তোমরা সবাই সরে যাও ! যদি ফাটে-টাটে—

ফেলে দিলুম, তারপরেই ভয়ে বন্ধ করলুম চোখ দুটো। পুঁটলিটা নীচে পড়ল, কিন্তু কোনও অঘটন ঘটল না, কোনও বিস্ফোরণও হল না। তাকিয়ে দেখি, ওরা গুটি-গুটি পুঁটলিটার দিকে এগিয়ে আসছে। কিন্তু গাছে আর থাকা যায় না—কাঠপিঁপড়েরা আমার ছাল-চামড়া তুলে নেবার প্ল্যান করেছে বলে মনে হল। আমি প্রাণপণে নামতে আরম্ভ করলুম।

আর নেমে দেখি—

ওরা সব থ হয়ে পুঁটলিটাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। ওটা খোলা হয়েছে আর ওর ভেতরে—কাঁচাকলা ! স্রেফ চারটে কাঁচকলা ! সাধুভাষায় যাকে তরুণ কদলী বলা যায়।

টেনিদা নাকটাকে ছানার জিলিপির মতো করে বললে—এর মানে কী ? এত কাণ্ড করে চারটে কাঁচকলা !

ক্যাবলা মোটা গলায় বললে—হুঁ, ঠিক চারটে। আমরাও চারজন। মানে, মাথা-পিছু একটা করে।

হাবুল বললে—তা হলে আমাগো—

আর বলতে পারল না, তক্ষুনি ছটাং-ছটাং—

অদৃশ্য শত্রুর অস্ত্র ছুটে এল আমাদের দিকে। একটা পড়ল টেনিদার নাকে, আর একটা হাবুলের মাথায়। টেনিদা লাফিয়ে উঠলো—ইঁ—ইঁ—ইঁ—

হাবুল হাউ হাউ করে বললে—খাইছে—খাইছে—।

তা 'খাইছে খাইছে' ও বলতেই পারে ! দুটো সাংঘাতিক অস্ত্র—মানে পচা ডিম। পড়েই ভেঙেছে। টেনিদার মুখ আর হাবুলের মাথা বেয়ে নামছে বিকট দুর্গন্ধের স্রোত !

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, সঙ্গে সঙ্গে আর একটা পচা ডিম এসে আমার পিঠেও

পড়ল। আর একটা ক্যাবলার কান ঘেঁষে বোঁ করে বেরিয়ে গেল—একটুর জন্য লক্ষ্যভ্রষ্ট!

ক্যাচ-কট-কট

চারটে কাঁচকলার ধাক্কা যদি বা সামলানো গিয়েছিল, পচা ডিম আমাদের একেবারে বিধ্বস্ত করে দিলে! বিশেষ যে লেগেছিল তা নয়—কিন্তু তার কী খোশবু! সে-গন্ধে আমি তো তুচ্ছ—স্বয়ং গন্ধরাজ ছুঁচোর পর্যন্ত দাঁতকপাটি লেগে যাবে!

হাবুল বললে—ইস, দফাখান সাইরা দিছে একেবারে। অখনি গিয়া সাবান মাইখ্যা চান করন লাগব!

আমি মিষ্টি গলায় পিনপিন করে বললুম—আমার এমন ভালো কোটটাকে—

কথাটা শেষ হল না। তার আগেই ক্যাবলা বললে—টেনিদা, উয়ো দেখ্‌খো!

ক্যাবলা অনেকদিন পশ্চিমে ছিল, চটে গেলে কিংবা খুশি হলে কিংবা উত্তেজিত হলে ওর গলা দিয়ে হিন্দি বেরুতে থাকে। পচা ডিমের গন্ধে টেনিদা তখন তিড়িং-মিড়িং করে লাফাচ্ছিল, দাঁত খিঁচিয়ে বললে—কী আবার দেখব র‍্যা? তোর কুবুদ্ধিতে পড়ে সেই জোচ্চোর কাগামাছিটার হাতে—

ক্যাবলা বললে—আরে জী, জেরা আঁখসে দেখো না উধার—উয়ো পেড় কি পিছে।

টেনিদা থমকে গেল।

—আরে তাই তো! ওই গাছটার পেছনে কেউ লুকিয়ে আছে মনে হয়। ওই লোকটাই তাহলে ডিম ছুঁড়ে মেরেছে, নির্ঘাত! পীরের সঙ্গে মামদোবাজি—বটে!

টেনিদা এমনিতে বেশ আছে, খাচ্ছে-দাচ্ছে, আমাদের পকেটে হাত বুলিয়ে দিব্যি আলুকাবলি থেকে চপ-কাটলেট পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছে, কিছু বলতে গেলেই চাঁটি কিংবা গাঁট্টা বাগিয়ে তেড়ে আসছে, কিন্তু কাজের সময় একেবারে অন্য চেহারা—যাকে বলে সিংহ। তখনই আমাদের আসল লিডার। আমাদের পাড়ায় ওদিকে গত বছর বস্তিতে আগুন ধরে গেল, ফায়ার ব্রিগেড পৌঁছুবার আগেই একটা বাচ্চাকে পাঁজাকোলা করে বেরিয়ে এল তিন লাফে! সাধে কি টেনিদাকে এত ভালবাসি আমরা।

গাছের আড়ালে শত্রুকে দেখতে পেয়েই টেনিদা গায়ের কোটটাকে ছুঁড়ে ফেলল। বললে—হা-রে-রে-রে! আজ এক চড়ে কাগামাছির মুণ্ডু যদি কাটমুণ্ডুতে পৌঁছে না দিই তবে আমি টেনি মুখুজ্যেই নই।

বলেই 'ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস' শব্দে এক রাম-চিৎকার। তারপরেই এক লাফে ঝোপ-জঙ্গল ভেঙে তীরের মতো গাছটার দিকে ছুটে গেল; আমরা হতভম্বের মত চেয়ে রইলুম, 'ইয়াক ইয়াক' পর্যন্ত বলতে পারলুম না।

টেনিদাকে তীরের মত ছুটতে দেখেই লোকটা ভোঁ দৌড়! ঝোপজঙ্গলের মধ্যে ভালো দেখা যাচ্ছিল না, তবু যেন মনে হল, লোকটা যেন আমাদের অচেনা নয়, কোথাও ওকে দেখেছি!

বনের মধ্যে দিয়ে ছুটল লোকটা। টেনিদা তার পেছনে। এক মিনিট পরেই আর কিছু দেখতে পেলুম না, শুধু দৌড়ানোর আওয়াজ আসতে লাগল। তারপরেই কে যেন ধপাস করে পড়ল, খানিকটা ঝটাপটির আওয়াজ আর টেনিদার চিৎকার কানে এল: হাবুল-প্যালা-ক্যাবলা, ক্যাচ-কট-কট! কুইক—কুইক!

ক্যাচ-কট-কট! তার মানে কাউকে ধরে ফেলেছে!

ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস, ইয়াক-ইয়াক! আমরা তিনজনে বোঁ-বোঁ করে ছুটলুম সেদিকে। পাহাড়ি উঁচু-নিচু রাস্তায় ছুটতে গিয়ে নুড়িতে পা পিছলে যায়, ডান হাতে বিছুটির মতো কী লেগে জ্বালাও করতে লাগল, কিন্তু আর কি কোনওদিকে তাকাবার সময় আছে এখন! এক মিনিটের মধ্যেই টেনিদার কাছে পৌঁছে গেলুম আমরা।

দেখি, টেনিদা বসে আছে মাটিতে। তার এক হাতে একটা মেটে রঙের ধুসো মাফলার, আর এক হাতে দুটো চকোলেট। সামনে কতকগুলো কাগজপত্র ছড়ানো!

আমরা কিছু বলবার আগেই টেনিদা করুণ গলায় বললে—ধরেছিলুম লোকটাকে, একদম জাপটে। কিন্তু দেখছিস তো, পাথর কী রকম পেছল, স্লিপ করে পড়ে গেলুম। লোকটাও খানিক দূরে কুমড়োর মতো গড়িয়ে উঠে ছুট লাগাল! এদিকে দেখি, একটা পা একটু মচকে গেছে—আর তাড়া করতে পারলুম না।

ক্যাবলা বললে—কিন্তু এগুলো কী?

—সেই হতচ্ছাড়া কাগামাছি না বগাহাঁচির পকেট থেকে পড়েছে। আর ধুসো মাফলারটা আমি কেড়ে নিয়েছি। বলেই একটা চকোলেটের মোড়ক খুলে তার এক-টুকরো ভেঙে নির্বিকারভাবে মুখে পুরে দিলে!

ক্যাবলা বললে—দাঁড়াও—দাঁড়াও, চকোলেট খেয়ো একটু পরে। এই মাফলারটাকে চিনতে পারছ?

—চিনতে বয়ে গেছে আমার। চকোলেট চিবোতে চিবোতে টেনিদা বললে—যেমন বিচ্ছিরি দেখতে, তেমনি তেল-চিটচিটে, বুঝলি, কাগামাছিটা বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক হলে কী হয়, লোকটার কোনও টেস্ট নেই, নইলে অমন একটা বোগাস মাফলার গলায় জড়িয়ে রাখে।

ক্যাবলা বললে—দুত্তোর।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে—থাম। —'দুত্তোর দুত্তোর' করিসনি। পায়ে ভীষণ ব্যথা করছে—কষ্ট হচ্ছে উঠে দাঁড়াতে। ওই যাচ্ছেতাই মাফলারটা দিয়ে আমার

পাটা বেঁধে দে দিকিনি।

এতক্ষণ পরে হাবুল সেনের মাথাটা যেন সাফ হয়ে গেল একটুখানি। হাবুল বললে—হ—চিনছি তো। এই মাফলারটাই তো দেখছিলাম কদম্ব পাকড়াশির গলায়।

আমি বললুম—ঠিক—ঠিক।

টেনিদা বললে—তাই তো! আরে, এতক্ষণ তো খেয়াল হয়নি। সেই লোকটাই তো চকোলেট প্রেজেন্ট করে শিলিগুড়ি স্টেশনে আমাদের ঝাউ-বাংলোয় আসতে নেমন্তন্ন করেছিল। আর সে-ই তো কাগামাছির চীপ অ্যাসিস্টান্ট—স্যাতকড়ি সাঁতরার কী সব মুলোটুলো চুরি করবার জন্যে—

ক্যাবলা ততক্ষণে মাটিতে-পড়া গোটা দুই কাগজ কুড়িয়ে নিয়েছে। আমি দেখলুম, দু'খানাই ছাপা কাগজ—হ্যাণ্ডবিল মনে হল। তাতে লেখা আছে :

শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে
বিখ্যাত গোয়েন্দা-লেখক
পুণ্ডরীক কুণ্ডুর
রহস্য উপন্যাস— ??
পাতায় পাতায় শিহরন—ছত্রে-ছত্রে লোমহর্ষণ!
প্রকাশক :
জগবন্ধু চাকলাদার এন্ড কোং
১৩ নং হারান ঝম্পটি লেন, কলিকাতা—৭২

ক্যাবলার সঙ্গে-সঙ্গে আমি আর হাবুলও হ্যান্ডবিলটা পড়ছিলুম। ওদিকে টেনিদা তখন তেমনি নিশ্চিন্ত হয়ে চকোলেট চিবিয়ে চলেছে, বিশ্ব-সংসারের কোনও দিকে তার কোন লক্ষ আছে বলে মনে হল না।

পড়া শেষ করে ক্যাবলা বললে—এর মানে কী?

এইবার আমার পালা। ক্যাবলা ভারি বেরসিক ছেলে, ডিটেকটিভ বই-টই পড়ে না, বলে বোগাস! হাবুলের সমস্ত মন পড়ে আছে ক্রিকেট খেলায়—সেও বিশেষ খবর-টবর রাখে না। কিন্তু আমি? আমার সব কণ্ঠস্থ! রামহরি বটব্যালের 'রক্তমাখা ছিন্নমুণ্ড', 'কঙ্কালের হুঙ্কার', 'নিশীথ রাতের চামচিকে' থেকে শুরু করে যদুনন্দন আঢ্যের 'কেউটে সাপের ল্যাজ', 'ভীমরুল বনাম জামরুল', 'অন্ধকারের কন্ধকাটা'—মানে বাংলাভাষায় যেখানে যত গোয়েন্দা-বই আছে—সব প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছি। আর পুণ্ডরীক কুণ্ডু? হ্যাঁ, তাঁর বইও আমি পড়েছি। তবে ভদ্রলোক সে-রকম জমিয়ে লিখতে পারেন না, দাঁড়াতেই পারেন না রামহরি কিংবা যদুনন্দনের পাশে। কিন্তু তাঁর 'তক্তপোশের পোক্ত ছারপোকা' আমার মন্দ লাগেনি। বিশেষ করে সেই বর্ণনাটা যেখানে হত্যাকারীর তক্তপোশের নীচে গোয়েন্দা হীরক সেন একটা মাইক্রোফোন লুকিয়ে ফিট করে রেখেছিলেন; হত্যাকারী ঘুমের ঘোরে কথা কইত, আর দু' মাইল দূরে বসে গোয়েন্দা মাইক্রোফোনের সাহায্যে তার সব গোপন কথা শুনতে পেতেন।

দু' নম্বর কাগজটাও ওই একই হ্যান্ডবিল। ক্যাবলা সেটাও একবার পড়ে নিলে। তারপর আবার বললে—এর মানে কী? এই হ্যান্ডবিল কেন? কে পুণ্ডরীক কুণ্ডু? জগবন্ধু চাকলাদার বা কে?

আমি বললুম—পুণ্ডরীক কুণ্ডু গোয়েন্দা বই লেখেন, কিন্তু ওঁর বই ভালো বিক্রি হয় না। আর জগবন্ধু চাকলাদার ওঁর পাবলিশার।

—হুঁ।

হাবুল ধুসো মাফলারটা নাড়াচাড়া করছিল, হঠাৎ 'উঃ' বলে চেঁচিয়ে উঠে মাফলারটা ফেলে দিলে আর প্রাণপণে হাত ঝাড়তে শুরু করে দিলে।

আমি চমকে উঠে বললুম—কী হল রে হাবলা? মাফলারের মধ্যে কী কোনও বিষাক্ত ইন্‌জেকশন—

—আর ফালাইয়া থো তোর বিষাক্ত ইন্‌জেকশন! একটা লাল পিঁপড়ে আছিল, একখান মোক্ষম কামড় মারছে।

আহত পিঁপড়েটা তখন মাটিতে পড়ে হাত-পা ছুঁড়ছিল। ক্যাবলা একবার সেদিকে তাকাল, তারপর আমার কোটের দিকে তাকিয়ে দেখল। কিছুক্ষণ কী ভাবল—মনে হল, কী যেন একটা গভীর রহস্যের সমাধান করবার চেষ্টা করছে।

তারপর বললে—তোর কোটেও তো দেখছি কয়েকটা মরা পিঁপড়ে লেগে আছে প্যালা।

বললুম—বাঃ! গাছে উঠে ওদের সঙ্গেই তো আমাকে ঘোরতর যুদ্ধ করতে হচ্ছিল।

—হুঁঃ। আচ্ছা ভালো করে চারদিকের ঝোপজঙ্গল লক্ষ করে দেখ তো, এ-রকম পিঁপড়ে এখানে আছে কি না!

এতক্ষণ পরে টেনিদা বললে—কী পাগলামো হচ্ছে ক্যাবলা। কাগামাছিকে ছেড়ে শেষে পিঁপড়ে নিয়ে গোয়েন্দাগিরি করবি নাকি? উঃ, কদম্বটাকে ঠিক জাপটে ধরেছিলুম—একটুর জন্যে—ক্যাবলা বললে—একটু থামো দিকি। কদম্ব আর পালাতে পারবে না, ঠিক ধরা পড়বে এবার। কী রে হাবুল, প্যালা, আর লাল পিঁপড়ে পেলি এখানে?

হাবুল বললে—না, আর দেখতে আছি না।

বলতে বলতে হাবুলের পিঠ থেকে কী একটা ঝোপের ওপর পড়ল। দেখলুম, সেই পচা ডিমের খোলার একটা টুকরো।

হাওয়ায় সেটা উড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাবলা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে সেটাকে ধরে ফেলল। একমনে কী যেন দেখেই সেটাকে রুমালে জড়িয়ে বুক-পকেটে পুরে ফেলল।

টেনিদা বললে—ও আবার কী রে! পচা ডিমের গন্ধে প্রাণ যাচ্ছে—গিয়ে জামাকাপড় ছাড়তে পারলে বাঁচি, তুই আবার সেই ডিমের খোলা কুড়িয়ে নিচ্ছিস!

ক্যাবলা সে-কথার জবাব দিলে না। বললে—টেনিদা, উঠতে পারবে?

—পারব মনে হচ্ছে। ব্যথাটা কমেছে একটুখানি।

—তবে চলো। আর দেরি নয়।

—কোথায় যেতে হবে ?

—ঝাউ-বাংলোয়। এক্ষুনি।

আর সাঁতরামশায় ? যদি তেনারে এর মইধ্যে কাগামাছি একেবারে লোপাট কইর‍্যা ফ্যালায় ?—হাবুল সন্দিগ্ধ হয়ে জানতে চাইল।

—আরে, কাগামাছি কো বাত আভি ছোড় দো ! আগে ঝাউ-বাংলোয় চলো। সব ব্যাপারগুলোরই একটা ক্লু পাওয়া যাচ্ছে মনে হয়—শুধু একটুখানি বাকি। সেটা মেলাতে পারলেই—

আর তখুনি একটা কথা আমার মনে পড়ল। বড় বড় লেখকের অটোগ্রাফ জোগাড় করবার বাতিক আছে আমার, সেই সুবাদে আমি বছর তিনেক আগে একবার পুণ্ডরীক কুণ্ডুর সালকিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলুম। একটা জলচৌকির উপর উবু হয়ে বসে পুণ্ডরীক তামাক খাচ্ছিলেন, গলায় একটা ঢোলের মত মস্ত মাদুলি দুলছিল। ছবিটা চোখের সামনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। গোয়েন্দা-গল্পের লেখক, অথচ শার্লক হোমসের মতো পাইপ খান না। —বসে বসে হুঁকো টানেন আর তাঁর গলায় ঘাসের নীলচে রং-ধরা একটা পেতলের মস্ত মাদুলি থাকে, এটা আমার একেবারেই ভালো লাগেনি। কিন্তু সবটা এখন নতুন করে মনে জাগল, আর সেই সঙ্গে—

আমার মগজের ভেতরে হঠাৎ যেন বুদ্ধির একটা জট খুলে গেল। তা হলে—তা হলে—

আমি তখুনি কানে-কানে কথাটা বলে ফেললুম।

আর ক্যাবলা ? মাটি থেকে একেবারে তিন হাত লাফিয়ে উঠল। আকাশ ফাটিয়ে আর্কিমিডিসের মতো চিৎকার করল—পেয়েছি—পেয়েছি !

—কী পেয়েছিস ?—হাবুলের কাঁধে ভর দিয়ে আস্তে আস্তে হাঁটছিল টেনিদা, চমকে দাঁড়িয়ে পড়ল—কী পেলি—হাতি না ঘোড়া ? খামকা চেঁচাচ্ছিস কেন ষাঁড়ের মতো ?

ক্যাবলা বললে—যা পাবার পেয়েছি। একেবারে দুইয়ে দুইয়ে চার—চারে চার আট !

—মানে ?

—সব জানতে পারবে পনেরো মিনিটের মধ্যেই। কিন্তু তার আগে প্যালাকেও কনগ্র্যাচুলেট করা দরকার। ওর ডিটেকটিভ বই পড়ারও একটা লাভ আছে দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় ফিরেই ওকে চাচার হোটেলে গরম-গরম কাটলেট খাইয়ে দেব।

টেনিদা বললে—উঁহু উঁহু, মারা যাবে। ওর ও-সব পেটে সইবে না। ওর হয়ে আমিই বরং ডবল খেয়ে নেব।

হাবুল মাথা নেড়ে বললে—সত্য কথা কইছ। আমিও তোমারে হেলপ করুম। কী কস প্যালা ?

আমি মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে চলতে লাগলুম। এ-সব তুচ্ছ কথায় কর্ণপাত করতে নেই।

পুণ্ডরীক কুণ্ডু এবং রহস্যভেদ

ঝাউ-বাংলোর কাছাকাছি এসে পৌঁছুতেই একটা কাণ্ড ঘটে গেল। সামনের বাগানের ভেতরে কাঞ্ছা যেন কী করছিল—আমাদের ফিরে আসতে দেখেই থ' হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরেই ভেতর দিকে টেনে দৌড়।

টেনিদা বললে—ও কী ! আমাদের দেখে কাঞ্ছা অমন করে পালাল কেন !

ক্যাবলা বললে—পালাল না, খবর দিতে গেল !

—কাকে ?

ক্যাবলা হেসে বললে—কাগামাছিকে।

হাবুল দারুণ চমকে উঠল।

—আরে কইতে আছ কী ! কাঞ্ছা কাগামাছির দলের লোক ?

—হুঁ। টেনিদা বললে—আর কাগামাছি লুকিয়ে আছে এই বাড়িতেই !

ক্যাবলা হেসে বললে—হ্যাঁ, সবাই আছে এখানে। কাগামাছি, বগাহাঁচি, দুধের চাঁছি—কেউ বাদ নেই।

টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে—ঠাট্টা নয় ক্যাবলা ! ওরা যদি আমাদের আক্রমণ করে ?

—কী নিয়ে আক্রমণ করবে ? ওদের সম্পত্তির মধ্যে তো একটা ভাঙা হুঁকো, একগাছা মুড়ো-ঝাঁটা আর একপাটি কুকুরে-চিবুনো ছেঁড়া চটি। সে-আক্রমণ আমরা প্রতিরোধ করতে পারব।

—ইয়ার্কি করছিস না তো ?

—একদম না। চলেই এসো না আমার সঙ্গে।

আমরা সিঁড়ি বেয়ে ঝাউ-বাংলোর দোতলায় উঠে গেলুম। বাড়িতে কোথাও কেউ আছে বলে মনে হয় না। চারদিক একেবারে নিঝুম। কাঞ্ছা পর্যন্ত কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেছে। টেনিদা খোঁড়াচ্ছিল বটে, তবু সেই ফাঁকেই এক কোণা থেকে একটুকরো ভাঙা কাঠ কুড়িয়ে নিলে।

আমি জিগগেস করলুম—ওটা দিয়ে কী হবে টেনিদা ?

—ঝাঁটা আর হুঁকোর আক্রমণ ঠেকানো যাবে।

ক্যাবলা বললে—কিচ্ছু দরকার নেই। অনেক বড় অস্ত্র আছে আমার কাছে। এসো সবাই—

কী যে ঘটতে যাচ্ছে ক্যাবলাই শুধু তা বলতে পারে ! আমি মনে-মনে কিছুটা আন্দাজ করছি বটে, কিন্তু এখনও পুরোটা ধরতে পারছি না। দুরু দুরু বুকে ক্যাবলার পেছনে-পেছনে চললুম আমরা। এন্তার গোয়েন্দা-বই পড়েছি আমরা রামগড়ের সেই বাড়িতে আর ডুয়ার্সের জঙ্গলে। এর মধ্যে আমাদের দু-দুটো অভিযানও হয়ে গেছে, কিন্তু এবার যেন সবটাই কেমন বিদঘুটে লাগছিল। আর সাতকড়ি—

নিশ্চয় সেই লোক ? এখন আর আমার কোনও সন্দেহ নেই। আর ওই হ্যান্ডবিলটা—

ক্যাবলা বললে—এখানে ।

দেখলুম সেই বন্ধ ঘরটার সামনে আমরা দাঁড়িয়ে আছি। যেটায় দু'দুটো পেল্লায় তালা লাগানো ! সাতকড়ি যাকে বলেছিলেন স্ট্যাকরুম—মানে যার ভেতর বাড়ির সব পুরনো জিনিসপত্র ডাঁই করে রাখা হয়েছে।

ক্যাবলা বললে—এই ঘর খুলতে হবে।

টেনিদা আশ্চর্য হয়ে বললে—এই ঘর ? হাতি আনতে হবে তালা ভাঙবার জন্যে, আমাদের কাজ নয়।

ক্যাবলা মরিয়া হয়ে বললে—চারজনে মিলে ধাক্কা লাগানো যাক। তালা না খোলে, দরজা ভেঙে ফেলব।

ভাবছি চারজনে মিলে চার বছর 'মারো জোয়ান—হেঁইয়ো'—বলে ধাক্কা লাগলেও খোলা সম্ভব হবে কি না, এমন সময় কোত্থেকে নেহাত ভালো মানুষের মতো গুটি-গুটি কাঞ্ছা এসে হাজির। যেন কিছুই জানে না, এমনি মুখ করে বললে—চা খাবেন বাবুরা ? করে দেব ?

তক্ষুনি তার দিকে ফিরল ক্যাবলা। বলল—চা দরকার নেই, এই ঘরের চাবিটা বার করো দেখি।

—চাবি ? কাঞ্ছা আকাশ থেকে পড়ল।—চাবি তো আমি জানি না।

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে—মিথ্যে কথা বোলো না কাঞ্ছা, ওতে পাপ হয়। চাবি তোমার প্যান্টের পকেটেই আছে। সুড়সুড় করে বের করে ফেলো।

কাঞ্ছা পাপ-টাপের কথা শুনে একটু ঘাবড়ে গেল। মাথা-টাথা চুলকে বললে—জু। চাবি আমার কাছেই আছে তা ঠিক। কিন্তু মনিবের হুকুম নেই—দিতে পারব না।

—তোমাকে দিতেই হবে !

কাঞ্ছা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।—না, দেব না।

ক্যাবলা বললে—টেনিদা, কাঞ্ছা নেপালীর ছেলে, জান দিয়ে দেবে, কিন্তু মনিবের বেইমানি করবে না। কাজেই চাবি ও কিছুতেই দেবে না। অথচ, চাবিটা আমাদের চাই-ই। তুমি যদি পায়ের মচকানিতে খুব কাতর না হয়ে থাকো—তা হলে—

ব্যস, ওইটুকুই যথেষ্ট। টেনিদাকে আর উসকে দেবার দরকার হল না। 'ডি-লা গ্রান্ডি' বলেই তক্ষুনি টপাং করে চেপে ধরল কাঞ্ছাকে, আর পরক্ষণেই কাঞ্ছার প্যান্টের পকেট থেকে বেরিয়ে এল চাবির গোছা।

কাঞ্ছা চাবিটা কেড়ে নিতে চেষ্টা করল—নির্ঘাত একটা দারুণ মারামারি হয়ে যাবে এবারে এই রকম আমার মনে হল। কিন্তু সে বিচ্ছিরি ব্যাপারটা থেমে গেল তক্ষুনি। কোথা থেকে আকাশবাণীর মতো মোটা গম্ভীর গলা শোনা গেল—কাঞ্ছা, চাবি দিয়ে দাও, গোলমাল কোরো না।

চারজনেই থমকে গেলুম আমরা। কে বললে কথাটা ? কাউকেই তো দেখা যাচ্ছে না।

আবার সেই গম্ভীর গলা ভেসে এল—লম্বা পেতলের চাবি দুটো লাগাও। তা হলে বেশি পরিশ্রম করতে হবে না।

এবার আর বুঝতে বাকি রইল না।

হাবুল রোমাঞ্চিত হয়ে বললে—আরে, সাঁতরামশাইয়ের গলা শুনতাছি যে।

টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে সরভাজার মতো করে বললে, মনে হচ্ছে যেন বন্ধ ঘরটার ভেতর থেকেই।

ততক্ষণে বিদ্যুৎবেগে তালা দুটো খুলে ফেলেছে ক্যাবলা। দরজায় এক ধাক্কা দিতেই—

কে বলে স্ট্যাকরুম ! খাসা একখানা ঘর। সোফা রয়েছে, খাটে ধবধবে বিছানা। ও-পাশে যেদিকে আমাদের শোবার ঘর সেদিকের বন্ধ দরজাটার মুখোমুখি ছোট একটা প্রজেক্টার ! আর—আর সোফায় যিনি বসে আছেন তিনি সাতকড়ি সাঁতরা স্বয়ং ! একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে।

ক্যাবলা বললে—নমস্কার পুণ্ডরীকবাবু। দাড়িটা খুলুন।

বিনা বাক্যব্যয়ে সাতকড়ি একটানে নকল সবুজ দাড়িটা খুলে ফেললেন। আর আমি পরিষ্কার দেখতে পেলুম সেই ভদ্রলোককেই—তিন বছর আগে যাঁর শালকিয়ার বাড়িতে অটোগ্রাফ আনতে গিয়েছিলুম আর যিনি উবু হয়ে মোড়ার ওপর বসে বসে তামাক টানছিলেন।

টেনিদা আর হাবুল একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল।

—আরে !—আরে !

—এইটা আবার কী রে মশায় !

ক্যাবলা বললে—তোমরা চুপ করো। এখনি সব বুঝতে পারবে।—কুণ্ডুমশাই !

গম্ভীর হয়ে সাতকড়ি বললেন—বলে ফেলো !

—আপনার সোফার পেছনে যিনি লুকিয়ে আছেন আর ঢুকেই যাঁর নাকটা আমি একটুখানি দেখতে পেয়েছি, উনিই বোধহয় জগবন্ধু চাকলাদার ?

সাতকড়ি—না, না, পুণ্ডরীক কুণ্ডু, ওরফে কুণ্ডুমশাই বললেন—ঠিক ধরেছ। তোমাদের বুদ্ধি আছে। ও জগবন্ধুই বটে।

—সোফার পেছনে ঘাপটি মেরে বসে উনি মিথ্যেই কষ্ট পাচ্ছেন ! ওঁকে বেরিয়ে

আসতে বলুন।

পুণ্ডরীক ডাকলেন—বেরোও হে জগবন্ধু।

জগবন্ধু সোফার পেছনে দাঁড়িয়ে উঠল। সেই মিচকে-গোঁফ ফিচকে চেহারা—শুধু গলার মেটে রঙের বিটকেল মাফলারটাই বেহাত হয়ে গেছে। কেমন বোকার মতো চেয়ে রইল আমাদের দিকে। এখন একদম নিরীহ বেচারা, যেন জীবনে কোনওদিন ভাজা মাছটি উলটে খায়নি!

সাতকড়ি বললেন—বসে পড়ো হে ছোকরা, বসে পড়ো। ওরে কাঞ্ছা, আমাদের জন্য ভালো করে চা আন। আচ্ছা এখন বলো দেখি, ধরে ফেললে কী করে?

ক্যাবলা বললে—এক নম্বর, আপনার পাইন বনের কবিতা আর কদম্ব পাকড়াশির ছড়া। আপনার কবিতা শুনেই মনে হয়েছিল, ছড়াগুলোর সঙ্গে এর যোগ আছে।

—হুঁ। তারপর?

—দু'নম্বর, আপনার অদ্ভুত ফরমুলা। বাড়িতে একখানা সায়েন্সের বই নেই, আছে একগাদা ডিটেকটিভ ম্যাগাজিন—অথচ আপনি সায়েন্টিস্ট? আর ধাঁ করে আপনি থিয়োরি অব রিলেটিভিটির সঙ্গে জোয়ানের আরক মিলিয়ে দিলেন? আমরা অন্তত কলেজে পড়ি, এত বোকা আমাদের ঠাওরালেন কী করে? তখনি মনে হল, আপনি আমাদের নিয়ে মজা করতে চান—কাগামাছি-টাছি সব বানানো!

—বলে যাও।

—কত বলব? জগবন্ধুবাবুকে নিয়ে দার্জিলিঙে সিঞ্চলে আমাদের ছবি তুললেন সিনে ক্যামেরায়, পাশের ঘর থেকে প্রজেক্টার ফেলে ছবি দেখালেন, কাঞ্ছা না জগবন্ধু কাকে দিয়ে হাঁড়িচাঁচার ডাক শোনালেন—কাগজের মুণ্ডু নাচালেন—

জগবন্ধু এইবার ব্যাজার গলায় বললে—হাঁড়িচাঁচার ডাক আমি ডেকেছিলুম। কিন্তু তোমরাই বা মাঝরাতে আমার মাথায় জল ঢাললে কী বলে—হ্যাঁ, এখনও সর্দিতে আমার মাথা ভার, নাক দিয়ে জল পড়ছে।

ক্যাবলা বললে—তবু আপনার ভাগ্যি ভালো যে ইট ফেলিনি! মাঝরাত্তিরে লোককে ঘুমুতে দেবেন না ভেবেছেন কী? তারপর শুনুন কুণ্ডুমশাই! জগবন্ধুবাবুর ধুসো মাফলার টেনিদা কেড়ে নিয়েছিল—তা থেকে একটা লাল পিঁপড়ে হাবুলকে কামড়ে দিয়েছে। তখনই বোঝা গেল, গাছে উঠে কাঁচকলা বেঁধেছিল কে! তারপরে পচা ডিম। কিন্তু এই দেখুন—পকেট থেকে হাবুলের পিঠে লেগে থাকা সেই ভাঙা ডিমের খোলাটা বের করে বললে—দেখুন, এতে এখনও বেগুনে পেন্সিলে-লেখা নম্বর পড়া যায়—৩২। আপনার রান্নাঘরে ডিমের গায়ে এমনি নম্বর দেওয়া আছে, সে আমি আগেই লক্ষ করেছি।

পুণ্ডরীক বললে—শাবাশ। আমি গোয়েন্দা-গল্প লিখে থাকি, তোমরা আমার শ্রেষ্ঠ গোয়েন্দা হীরক সেনকেও টেক্কা দিয়েছ। কিন্তু আমাদের পরিচয় পেলে কী করে?

ক্যাবলা বললে—এটা ভুলে যাচ্ছেন কেন, আপনারা সাহিত্যিক। সবুজ দাড়ি লাগালেও ভক্তরা আপনাদের চিনতে পারে—যেমন প্যালা চিনে নিয়েছে। তা ছাড়া এই দেখুন হ্যান্ডবিল—টেনিদা যখন জগবন্ধুকে চেপে ধরেছিল, তখন ওঁর পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিল। আর জানতে কী বাকি থাকে!

পুণ্ডরীক আর জগবন্ধু দু'জনেই হাঁড়ির মতো মুখ করে চুপ করে রইলেন।

ক্যাবলা বললে—এবার বলুন আমাদের সঙ্গে এ-ব্যবহারের মানে কী?

শুনে খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে উঠলেন কুণ্ডুমশাই।

—এত বুঝেছ, আর এটুকু মাথায় ঢুকল না যে আমার বই ভালো বিক্রি হচ্ছে না—আমি আর জগবন্ধু—দু'জনেরই মন মেজাজ খারাপ। বিলিতি বই থেকে টুকতে যাব, দেখি আমার আগেই যদুনন্দন আঢ্য আর রামহরি বটব্যাল সব মেরে দিয়ে বসে আছে। প্লট ভাববার জন্যেই এখানে এসেছিলুম। জগবন্ধুও আসছিল আমার এইখানেই, পথে তোমাদের সঙ্গে দেখা। দেখে ওর মাথায় মতলব খেলে যায়—তোমাদের কাজে লাগিয়ে একটা সত্যিকারের গোয়েন্দা গল্প বানালে কেমন হয়? একটা কথা বলি—কবিতা-টবিতা আমার একদম আসে না। জগবন্ধু পাবলিশার হলে কী হয়, মনে-মনে ও দারুণ কবি—ওগো পাইনটাও ওরই লেখা। ও-ই ছড়া লিখে তোমাদের ঘাবড়ে দেয়—আমাকে সবুজ দাড়ি পরায়, সব প্ল্যান করে তক্কে থেকে আমরা তোমাদের সঙ্গে টাইগার হিলে আর সিঞ্চলে যাই, জগবন্ধু ছবি তোলে আর ছুঁচোবাজি ছাড়ে—তারপর—তারপর তো দেখতেই পাচ্ছ। কিন্তু তোমরা সব ভণ্ডুল করে দিলে হে। আর একটু জমাতে পারলে আমার দুর্দান্ত একটা ডিটেকটিভ বই তৈরি হয়ে যেত!

কুণ্ডুমশাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন—আর সত্যজিৎ রায় মশাইকে ধরে-টরে যদি সেটাকে ফিল্ম করা যেত—

ক্যাবলা চটে বললে—সত্যজিৎ রায় ও-সব বাজে গল্প ফিল্ম করেন না। সে যাক—পচা ডিম ছুঁড়ে যে আমাদের জামা-টামা খারাপ করে দিলেন, ধোয়াবার খরচা এখন কে দেবে?

কুণ্ডুমশাই আবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লেন—আমিই দেব। ওহে জগবন্ধু, একখানা চকোলেট বার করো দেখি, খেয়ে মনটা ভাল করি।

জগবন্ধু বললে—চকোলেট কোথায় স্যার? পকেটে যা ছিল এরাই তো মেরে দিয়েছে।

তারপর?

তারপর আবার কী থাকবে? দুপুরে বজ্রবাহাদুর গাড়ি নিয়ে এল পুবং থেকে। আমরা সেই গাড়িতে চেপে তার ওখানে বেড়াতে গেলুম।—তার বাড়িতে খুব খাওয়া-দাওয়া হল। তার নাম ভাবভঙ্গি যেমনই হোক, সে ভীষণ ভালো লোক—কত যে আদর-যত্ন করলে সে আর কী বলব! তারপর সন্ধেবেলায় তারই মোটরে দার্জিলিঙে ফিরে এলুম। সেই স্যানিটোরিয়ামে।

কিন্তু আমাদের বোকা বানিয়ে পুণ্ডরীক কুণ্ডু গোয়েন্দা গল্প লিখবেন, তা-ও কি হতে পারে ? তাই তিনি তাঁর উপন্যাস ছাপবার আগেই সব ব্যাপারটা আমি 'সন্দেশে' ছেপে দিলুম। তারপরেও যদি কুণ্ডুমশাই বইটা লিখে ফেলেন, তা হলে আমি তার নামে গল্প চুরির মোকদ্দমা করব।

আর তোমরাও তখন আমার পক্ষেই সাক্ষী দেবে নিশ্চয়।

গ ল্প

একটি ফুটবল ম্যাচ

গোলটা আমিই দিয়েছি। এখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছে ওদের—থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে। এখন আমাকে ঘাড়ে করে নাচা উচিত ছিল সকলের। পেট ভরে খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল ভীমনাগের দোকানে কিংবা দেলখোস রেঁস্তোরায়। কিন্তু তার বদলে একদল পিনপিনে বিতিকিচ্ছি মশার কামড় খাচ্ছি আমি। চটাস করে মশা মারতে গিয়ে নিজের নাকেই লেগে গেল একটা রাম-থাপ্পড়। একটু উ-আঁ করে কাঁদব তারও উপায় নেই। প্যাচপেচে কাদার ভেতরে কচুবনের আড়ালে মূর্তিমান কানাই সেজে বসে আছি, আর আমার চারিদিকে মশার বাঁশি বাজছে।

—থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম। আবার চিৎকার শোনা গেল। একটা মশা পটাস করে হুল ফোটাল ডান গালে। ধাঁ করে চাঁটি হাঁকালুম—নিজের চড়ে নিজেরই মাথা ঘুরে গেল। অঙ্কের মাস্টার গোপীবাবুও কখনও এমন চড় হাঁকড়েছেন বলে মনে পড়ল না।

গেছি-গেছি বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে বাপ-বাপ করে সামলে নিলুম। দমদমার এই কচুবনে আপাতত আরও ঘণ্টাখানেক আমার মৌনের সাধনা। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগে এখান থেকে বেরুবার উপায় নেই।

চিৎকার ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে: থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—পালাজ্বরে ভুগি আর বাসক পাতার রস খাই। কিন্তু পটলডাঙা ছেড়ে শেষে এই দমদমার কচুবনে আমার পটল তোলবার জো হবে—এ-কথা কে জানত!

আমাদের পটলডাঙা থান্ডার ফুটবল ক্লাবের আমি একজন উৎসাহী সদস্য। নিজে কখনও খেলি না, তবে সব সময়েই খেলোয়াড়দের প্রেরণা দিয়ে থাকি।

আমাদের ক্লাব কোনও খেলায় গোল দিলে সাত দিন আমার গলা ভাঙা সারে না। হঠাৎ যদি কোনও খেলায় জিতে যায়—যা প্রায় কোনও দিনই হয় না—তা হলে আনন্দের চোটে আমার কম্প দিয়ে পালাজ্বর আসে।

সদস্য হয়েই ছিলুম ভালো। গোলমাল বাধল খেলোয়াড় হতে গিয়ে।

দমদমার ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ। তিনদিন আগে থেকে ছোটদির ভাঙা হারমোনিয়ামটা নিয়ে আমি ধ্রুপদ গাইতে চেষ্টা করছি। গান গাইবার জন্যে নয়—খেলার মাঠে যাতে সারাক্ষণ একটানা চেঁচিয়ে যেতে পারি—সেই উদ্দেশ্যে। তেতলার ঘর থেকে মেজদা যখন বড় একটা ডাক্তারির বই নিয়ে তেড়ে এল, তারপরেই বন্ধ করতে হল গানটা।

কিন্তু দমদমে পৌঁছেই একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শোনা গেল।

আমাদের দুই জাঁদরেল খেলোয়াড় ভণ্টু আর ঘণ্টু দুই ভাই। দুজনেই মুগুর ভাঁজে আর দমাদ্দম ব্যাকে খেলে। বলের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেয় অন্য দলের সেণ্টার ফরোয়ার্ডকে। আজ পর্যন্ত দুজনে যে কত লোকের ঠ্যাং ভেঙেছে তার হিসেব নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবেরই ঠ্যাং ভাঙল। একেবারে দুটো ঠ্যাং ভাঙল। একেবারে দুটো ঠ্যাংই একসঙ্গে।

কাশীতে ওদের কুট্টিমামা থাকে। তা থাক—কাশি-সর্দি-পালাজ্বর—যেখানে খুশি থাক। কিন্তু কুট্টিমামা কি আর বিয়ে করার দিন পেল না? ঠিক আজ দুপুরেই টেলিগ্রামটা এসে হাজির। আর বিশ্বাসঘাতক ভণ্টু আর ঘণ্টু সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে হাওড়া স্টেশনে। থান্ডার ক্লাবকে যেন দুটো আন্ডার-কাট ঘুষি মেরে চিৎ করে ফেলে দিয়ে গেল!

দলের ক্যাপ্টেন পটলডাঙার টেনিদা বাঘের মতো গর্জন করে উঠল।—মামার বিয়ের ঘ্যাঁট গেলবার লোভ সামলাতে পারলে না। ছোঃ। নরাধম—লোভী—কাপুরুষ। ছোঃ!

গাল দিয়ে গায়ের ঝাল মিটতে পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবের সদস্যরা তখন বাসী মুড়ির মতো মিইয়ে গেছে সবাই। ভণ্টু ঘণ্টু নেই—এখন কে বাঁচাবে ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের হাত থেকে? ওদের দুঁদে ফরোয়ার্ড ন্যাড়া মিত্তির দারুণ ট্যারা। আমাদের গোলকিপার গোবরা আবার ট্যারা দেখলে বেজায় ভেবড়ে যায়—কোন্ দিক থেকে যে বল আসবে ঠাহর করতে পারে না। ওই ট্যারা ন্যাড়াই হয়তো একগণ্ডা গোল ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকবে।

এখন উপায়?

টেনিদার ছোকরা চাকর ভজুয়া গিয়েছিল সঙ্গে। বেশ গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা—মারামারি বাধলে কাজে লাগবে মনে করেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টেনিদা কটমট করে খানিকটা তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, এই ভজুয়া—ব্যাকে খেলতে পারবি?

ভজুয়া খৈনি টিপছিল। টপ করে খানিকটা খৈনি মুখে পুরে নিয়ে বললে, সেটা

ফির কী আছেন ছোটবাবু?

—পায়ের কাছে বল আসবে—ধাঁই করে মেরে দিবি। পারবি না?

—হাঁ। খুব পারবে। বল ভি মারিয়ে দিবে—আদমি ভি মারিয়ে দিবে।—ভজুয়ার চোখে-মুখে জ্বলন্ত উৎসাহ।

—না না, আদমিকে মারিয়ে দিতে হবে না। শুধু বল মারলেই হবে। পারবি তো ঠিক?

—কেনো পারবে না? কাল রাস্তামে একঠো কুত্তা ঘেউ-ঘেউ করতে করতে আইল তো মারিয়ে দিলাম একঠো জোরসে লাথি। এক লরি যাইতেছিল—লাথ্ খাইয়ে একদম উস্‌কো উপর চড়িয়ে গেল। বাস্—সিধা হাওড়া টিশন।

—থাম থাম—মেলা বকিসনি—টেনিদা একটা নিশ্চিন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল; একটা ব্যাক তো পাওয়া গেল! আর একটা—আর একটা—এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখ পড়ল আমার ওপরে—ঠিক হয়েছে। প্যালাই খেলবে।

—আমি!

একটা চীনেবাদাম চিবুতে যাচ্ছিলুম, সেটা গিয়ে গলায় আটকাল।

—কেন—তুই তো বলেছিলি, শিমুলতলায় বেড়াতে গিয়ে কাদের নাকি তিনটে গোল দিয়েছিলি একাই? সে-সব বুঝি স্রেফ গুলপট্টি?

গুলপট্টি তো নির্ঘাত। চাটুজ্যেদের রকে বসে তেলে-ভাজা খেতে খেতে সবাই দুটো-চারটে গুল দেয়, আমিও ঝেড়েছিলুম একটা। কিন্তু টেনিদা দু'বার ম্যাট্রিকে গাড্ডা খেয়েছে, তার মেমোরি এত ভাল কে জানত?

বাদামটা গিলে ফেলে আমি বললুম, না, না, গুলপট্টি হবে কেন? পালাজ্বরে কাহিল করে দিয়েছে—নইলে এতদিনে আমি মোহনবাগানে খেলতুম, তা জানো? এখন দৌড়োতে গেলে পিলেটা একটু নড়ে—এই যা অসুবিধে।

—পিলেই তো নড়াবি। পিলে নড়লে তোর পালাজ্বরও সরে পড়বে—এই বলে দিলুম। নে—নেমে পড়—

ফুর্—র্—র্—র্—

রেফারির বাঁশির আওয়াজ। আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই এক ধাক্কায় টেনিদা আমাকে ছিটকে দিলে মাঠের ভেতরে। পড়তে-পড়তে সামলে নিলুম। ভেবে দেখলুম, গোলমাল বেশি বাড়ানোর চাইতে দু'-একটা গোল দেওয়ার চেষ্টা করাই ভাল।

যা থাকে কপালে! আজ প্যালারামেরই একদিন কি পালাজ্বরেরই একদিন!

খেলা শুরু হল।

ব্যাকে দাঁড়িয়ে আছি। ভেবেছিলুম ভজুয়া একাই ম্যানেজ করবে—কিন্তু দেখা গেল, মুখ ছাড়া আর কোনও পুঁজিই ওর নেই। একটা বল পায়ের কাছে আসতেই রাম শট হাঁকড়ে দিলে। কিন্তু বলে পা লাগল না—উলটে ধড়াস করে শুকনো মাঠে একটা আছাড় খেল ভজুয়া। ভাগ্যিস গোলকিপার গোবরা তক্কে-তক্কে ছিল—নইলে ঢুকেছিল আর-কি একখানা!

হাই কিক দিয়ে গোবরা বলটাকে মাঝখানে পাঠিয়ে দিলে। রাইট আউট হাবুল সেন বলটা নিয়ে পাঁই-পাঁই করে ছুটল—ফাঁড়া কাটল এ-যাত্রা।

কিন্তু ফুটবল মাঠে সুখ আর কতক্ষণ কপালে থাকে! পরক্ষণেই দেখি বল দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসছে আমাদের দিকে—আর নিয়ে আসছে ট্যারা ন্যাড়া মিত্তির।

ভজুয়া বোঁ-বোঁ করে ছুটল—কিন্তু ন্যাড়া মিত্তিরকে ছুঁতেও পারল না। খুট করে ন্যাড়া কাটিয়ে নিলে, ভজুয়া একেবারে লাইন টপকে গিয়ে পড়ল লাইনসম্যান ক্যাবলার ঘাড়ে।

কিন্তু ভজুয়ার যা খুশি হোক—আমার তো শিরে সংক্রান্তি। এখন আমি ছাড়া ন্যাড়া মিত্তির আর গোলকিপার গোবরার ভেতরে আর কেউ নেই। আর গোবরাকে তো জানি। ন্যাড়ার ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে—কোন্ দিক দিয়ে বল যে গোলে ঢুকছে টেরও পাবে না।

—চার্জ! চার্জ!—সেন্টারহাফ টেনিদার চিৎকার: প্যালা, চার্জ—

জয় মা কালী! এমনিও গেছি—অমনিও গেছি। দিলুম পা ছুড়ে! কিমাশ্চর্যম। ন্যাড়া মিত্তির বোকার মতো দাঁড়িয়ে—বলটা সোজা ছুটে চলে গেছে হাবুল সেনের কাছে।

—ব্রেভো, ব্রেভো প্যালা!—চারদিক থেকে চিৎকার উঠল: ওয়েল সেভড!

তাহলে সত্যিই আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি। আমি পটলডাঙার প্যালারাম, ছেলেবেলায় টেনিস বল ছাড়া যে কখনও পা দিয়ে ফুটবল ছোঁয়নি—সেই আমি ঠেকিয়েছি দুর্ধর্ষ ন্যাড়া মিত্তিরকে! আমার চব্বিশ ইঞ্চি বুক গর্বে ফুলে উঠল। মনে হল, ফুটবল খেলাটা কিছুই নয়। ইচ্ছে করে এতদিন খেলিনি বলেই মোহনবাগানে চান্স পাইনি।

কিন্তু আবার যে ন্যাড়া মিত্তির আসছে। ওর পায়ে কি চুম্বক আছে! সব বল কি ওর পায়ে গিয়ে লাগবে?

দু'বার অপদস্থ হয়ে ভজুয়া খেপে গিয়েছিল। মরিয়া হয়ে চার্জ করল। কিন্তু রুখতে পারল না। তবু এবারেও গোল বাঁচল। তবে গোবরা নয়—একরাশ গোবর। ঠিক সময়মতো তাতে পা পিছলে পড়ে গেল ন্যাড়া মিত্তির, আর আমি ধাঁই করে শট মেরে ক্লিয়ার করে দিলুম। ওদের লেফট আউটের পায়ে লেগে থ্রো হয়ে গেল সেটা।

কিন্তু আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে। পটলডাঙার থান্ডার ক্লাবের চিৎকার সমানে শুনছি। ব্রেভো প্যালা—শাবাশ। আরে, আবার যে বল আসে! আমাদের ফরোয়ার্ডগুলো কি ঘোড়ার ঘাস কাটছে নাকি? গেল-গেল করতে করতে ওদের বেঁটে রাইট ইনটা শট করলে—আমার পায়ের তলা দিয়ে বল উড়ে গেল গোলের দিকে।

গো—ও—ও—

ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের চিৎকার। কিন্তু 'ওল' আর নয়, স্রেফ কচু। অর্থাৎ বল তখন পোস্ট ঘেঁষে কচুবনে অন্তর্ধান করেছে।

গোল কিক্।

কিন্তু এর মধ্যেই একটা কাণ্ড করেছে ভজুয়া। বলকে তাড়া করতে গিয়ে শট করে দিয়ে গোল-পোস্টের গায়ে। আর তার পরেই আঁই-আঁই করতে করতে বসে পড়েছে পা চেপে ধরে।

ভজুয়া ইনজিওর্ড! ধরাধরি করে দু'-তিনজন তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

আপদ গেল! যা খেলছিল—পারলে আমিই ওকে ল্যাং মেরে দিতুম। গোলপোস্টটাই আমার হয়ে কাজ সেরে দিয়েছে। কিন্তু এখন যে আমি একেবারে একা! 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়—'! এলোপাথাড়ি কাটল কিছুক্ষণ। ভগবান ভরসা—আমাকে আর বল ছুঁতে হল না। গোটা দুই শট গোবরা এগিয়ে এসে লুফে নিলে, গোটা তিনেক সামলে নিলে হাফ-ব্যাকেরা। তারপর হাফ-টাইমের বাঁশি বাজল।

আঃ—কোনওমতে ফাঁড়া কাটল এ-পর্যন্ত। বাকি সময়টুকু সামলে নিতে পারলে হয়!

পেটের পিলেটা একটু টনটন করছে—বুকের ভেতরও খানিকটা ধড়ফড়ানি টের পাচ্ছি। কিন্তু চারদিক থেকে তখন থাণ্ডার ক্লাবের অভ্যর্থনা: বেড়ে খেলছিস প্যালা, শাবাশ! এমনকি ক্যাপ্টেন টেনিদা পর্যন্ত আমার পিঠ থাবড়ে দিলে: তুই দেখছি রেগুলার ফার্স্ট ক্লাস প্লেয়ার। নাঃ—এবার থেকে তোকে চান্স দিতেই হবে দু'-একবার!

এতে আর কার পিলে-টিলের কথা মনে থাকে! বিজয়গর্বে দু'-গ্লাস লেবুর শরবত খেয়ে নিলুম। শুধু ভজুয়া কিছু খেল না—পায়ে একটা ফেটি বেঁধে বসে রইল গোঁজ হয়ে। টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, শুধু এক-নম্বরের বাক্যি-নরেশ! এক লাথ্‌সে কুত্তাকো লরিমে চড়া দিয়া! তবু একটা বল ছুঁতে পারলে না—ছোঃ—ছোঃ?

ভজুয়া দু'-চোখে জিঘাংসা নিয়ে তাকিয়ে রইল।

আবার খেলা শুরু হল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভজুয়া আবার নামল মাঠে। আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, দেখিয়ে প্যালাবাবু—ইস্ দফে হাম মার ডালেঙ্গে!

ভজুয়ার চোখ দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সর্বনাশ—আমাকে নয় তো?

—সে কী রে! কাকে?

—দেখিয়ে না—

কিন্তু আবার সে আসছে! 'ওই আসে—ওই অতি ভৈরব হরষে'! আর কে? সেই ন্যাড়া মিত্তির! ট্যারা চোখে সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি! এবার গোল না দিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না!

ক্ষ্যাপা মোষের মতো ছুটল ভজুয়া। তারপরই 'বাপ' বলে এক আকাশ-ফাটা চিৎকার! বল ছেড়ে ন্যাড়া মিত্তিরের পাঁজরায় লাথি মেরেছে ভজুয়া, আর ন্যাড়া

মিত্তির ঝেড়েছে ভজুয়ার মুখে এক বোম্বাই ঘুষি। তারপর দুজনেই ফ্ল্যাট এবং দুজনেই অজ্ঞান। ভজুয়া প্রতিশোধ নিয়েছে বটে, কিন্তু এটা জানত না যে ন্যাড়া মিত্তির নিয়মিত বক্সিং লড়ে।

মিনিট-তিনেক খেলা বন্ধ। পটলডাঙার থান্ডার ক্লাব আর দমদম ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের মধ্যে একটা মারামারি প্রায় বেধে উঠেছিল—দু'-চারজন ভদ্রলোক মাঝখানে নেমে থামিয়ে দিলেন। ফের খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু ভজুয়া আর ফিরল না—ন্যাড়া মিত্তিরও না।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, ন্যাড়া বেরিয়ে যাওয়াতে দলের কোমর ভেঙে গেছে ওদের। তবু হাল ছাড়ে না ভ্যাগাবণ্ড ক্লাব। বারবার তেড়ে আসছে। আর, কী হতচ্ছাড়া ওই বেঁটে রাইট-ইনটা!

—অফ সাইড। রেফারির হুইসল। আর-একটা ফাঁড়া কাটল।

পটলডাঙা ক্লাবের হাফ-ব্যাকেরা এতক্ষণে যেন একটু দাঁড়াতে পেরেছে। আমার পা পর্যন্ত আর বল আসছে না। খেলার প্রায় মিনিট-তিনেট বাকি। এইটুকু কোনওমতে কাটাতে পারলেই মানে মানে বেঁচে যাই—পটলডাঙার প্যালারাম বীরদর্পে ফিরতে পারে পটলডাঙায়।

এই রে! আবার সেই বেঁটেটা! কখন চলে এসেছে কে জানে! এ যে ন্যাড়া মিত্তিরের ওপরেও এক-কাঠি! নেংটি ইঁদুরের মতো বল মুখে করে দৌড়তে থাকে! আমি কাছে এগোবার আগেই বেঁটে কিক করেছে। কিন্তু থাণ্ডার ক্লাব বাঁয়ে শেয়াল নিয়ে নেমেছিল নির্ঘাত। ডাইভ করে বলটা ধরতে পারলে না গোবরা—তবু এবারেও বল পোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে গেল।

কিন্তু ন্যাড়া মিত্তিরকে যে-গোবরটা কাত করেছিল—সেটা এবার আমায় চিত করল। একখানা পেল্লায় আছাড় খেয়ে যখন উঠে পড়লুম তখন পেটের পিলেটায় সাইক্লোন হচ্ছে। মাথার ভেতরে যেন একটা নাগরদোলা ঘুরছে বোঁ-বোঁ করে। মনে হচ্ছে, কম্প দিয়ে পালাজ্বর এল বুঝি।

আর এক মিনিট। আর এক মিনিট খেলা বাকি। রেফারি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে বারবার। ড্র যাবে নির্ঘাত। যা খুশি হোক—আমি এখন মাঠ থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি। আমার এখন নাভিশ্বাস! গোবরে আছড়া খেলে মাথা এমন বোঁ-বোঁ করে ঘোরে কে জানত!

গোল-কিক।

আবছাভাবে গোবরার গলার স্বর শুনতে পেলুম : কিক কর, প্যালা—

শেষের বাঁশি প্রায় বাজল। চোখে ধোঁয়া দেখছি আমি। এইবার প্রাণ খুলে একটা কিক করব আমি! মোক্ষম কিক! জয় মা কালী—

প্রাণপণে কিক করলুম। গো—ও-ওল—গো—ও-ও-ল! চিৎকারে আকাশ ফাটার উপক্রম! প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। এত জোরে কি শট মেরেছি যে আমাদের গোল-লাইন থেকেই ওদের গোলকিপারকে ঘায়েল করে দিয়েছি?

কিন্তু সত্য-দর্শন হল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। গোবরা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমাদের গোলের নেটের ভেতরেই বলটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন আমার কীর্তি দেখে বলটাও হতভম্ব হয়ে গেছে।

তারপর?

তারপর খেলার মাঠ থেকে এক মাইল দূরের এই কচুবনে কানাই হয়ে বসে আছি। দূর থেকে এখনও ভ্যাগাবণ্ড ক্লাবের চিৎকার আসছে : থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে।

দধীচি, পোকা ও বিশ্বকর্মা

আপাতত গভীর অরণ্যে ধ্যানে বসে আছি। বেশ মন দিয়েই ধ্যান করছি। শুধু কতকগুলো পোকা উড়ে উড়ে ক্রমাগত নাকে মুখে এসে পড়ছে আর এমন বিশ্রী লাগছে যে কী বলব! নাকে ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, কানের ভেতর ঢুকে ওই গভীর গহ্বরটার ভেতরে কোনও জটিল রহস্য আছে কিনা সেটাও বোঝবার চেষ্টা করছে। একবার ঢোক গিলতে গিয়ে ডজনখানিক খেয়েও ফেলেছি। খেতে বেশ মৌরি মৌরি লাগল—কিন্তু যা বিকট গন্ধ! বমি করতে পারতাম, কিন্তু ধ্যান করতে বসলে তো আর বমি করা যায় না। তাড়াব—সে-উপায়ও নেই, কারণ এখন আমি সমাধিস্থ—একেবারে নিবাত-নিষ্কম্প হয়েই থাকতে হবে আমাকে।

আমি গোড়াতেই বুঝেছিলাম এ-রকম হবে। হাবুলকেও বলেছিলাম কথাটা। কিন্তু সে তখন ইন্দ্রত্ব লাভ করে কৈলাসে শিবের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছে, আমলই দিলে না। বললে, যাঃ যাঃ, এসব ওসব ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি। অরণ্যে পোকা থাকেই এবং নাকে মুখেও তারা পড়ে। চুপচাপ বরদাস্ত করে যা—নইলে মহর্ষি হবি কেমন করে?

তা বটে। তবে একটা জিনিস বুঝেছি মহর্ষিদের মেজাজ অমন ভীমরুলের চাকের মতো কেন, আর কথায় কথায়ই তাঁরা অমন তেড়ে ব্রহ্মশাপ ঝাড়েন কেন। আরে বাপু, ধৈর্যের একটা সীমা তো আছে মানুষের। নাকে মুখে অমন পোকার উপদ্রব হলে শান্তনুর মতো শান্ত মানুষও যে দুর্বাসা হতে বাধ্য, এ ব্যাপারে আমার আর তিলমাত্রও সন্দেহ নেই।

আচ্ছা জ্বালাতনেই পড়া গেল বাস্তবিক। সত্যি বলছি, আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে, পালাজ্বরে ভুগি আর বাসকপাতার রস খাই, আমার কী দায়টা পড়েছে মহর্ষি-টহর্ষির মতো গোলমেলে ব্যাপারে পা বাড়িয়ে? পটলডাঙার গলিতে থাকি, পটোল দিয়ে শিংমাছের ঝোল আর আতপ চালের ভাত আমার বরাদ্দ, একমুঠো চানাচুর খেয়েছি কি পেটের গোলমালে আমার পটল তুলবার জো! এ-হেন আমি—একেবারে গোরুর মতো বেচারা লোক, আমিই শেষে পড়ে গেলাম ছ'হাত লম্বা আর বিয়াল্লিশ

ইঞ্চি বুক-ওলা টেনিদার পাল্লায় !

আর টেনিদার পাল্লায় পড়া মানে যে কী, যারা পড়োনি—উহু, ভাবতেই পারবে না। গড়ের মাঠের গোরা থেকে চোরাবাজারের চালিয়াত দোকানদার পর্যন্ত ঠেঙিয়ে একেবারে রপ্ত। হাত তুললেই মনে হবে রদ্দা মারলে, দাঁত বার করলেই বোধ হবে কামড়ে দিলে বোধ হয়। এই ভৈরব ভয়ঙ্কর লোকের খপ্পরে পড়েই আমাকে এখন মহর্ষি হয়ে ধ্যান করতে হচ্ছে।

কী আর করি ! বসে আছি তো বসেই আছি। অরণ্যের ভেতরে একটা ফুটো—সেখান দিয়ে দেখছি হতভাগ্য হাবুলের নাক বেরিয়ে আছে। পোকার কামড়ে জেরবার হয়ে ভাবছি ওই নাকেই একটা ধাঁ করে ঘুষি বসাব কিনা, এমন সময় শিষ্য দধিমুখের প্রবেশ।

দধিমুখ বললে, প্রভু আছে নিবেদন।

বললাম, কহ বৎস, শুনিব নিশ্চয়।

দধিমুখ বললে, কালি নিশিশেষে

দেখিলাম আশ্চর্য স্বপন।
দেখিলাম প্রভু যেন দেবদেহ ধরি
আরোহিয়া অগ্নিময় রথে,
চলেছেন মহাব্যোমে ছায়াপথ করি বিদারণ।
সত্রাসে কহিনু কাঁদি—
ওয়াক্—ওয়াক্ থুঃ।

আর কী, পোকা। থু থু করে দধিমুখ সেটা আমার গায়েই ঝেড়ে দিলে, শিষ্যের আস্পর্ধাখানা দ্যাখো একবার। রাগে আমার শরীর জ্বলে গেল,—টিকি খাড়া হয়ে উঠল ব্রহ্মতেজে। কিন্তু শিষ্যকে শাপ দিলেই তো সব মাটি। মনে মনে ভাবলাম, দাঁড়াও চাঁদ, তোমাকেও শায়েস্তা করতে হচ্ছে।

হেসে বললাম, আছে, আছে রহস্য অদ্ভুত।

নিরেট মগজ তব সহজে তো বুঝিবে না সেটা,
কাছে এসো কহি কানে কানে।

দধিমুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আমার মুখ থেকে যা আশা করছিল তা শুনতে পায়নি—কী যে করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। দধিমুখ অসহায়ভাবে একবার চারদিকে তাকাল।

আমি বললাম, দাঁড়াইয়া কেন ?

কাছে এসো, মুখ আনো কানের নিকটে,
তবে তো জানিবে সেই অদ্ভুত বারতা।
এসো বৎস—
বালক, আরও কাছে আয়—কাছে আয় না—

দধিমুখের বয়স অল্প—একেবারে আনাড়ি। ইতস্তত করে, যেই আমার কানের কাছে মুখ আনা, অমনি আমি পাল্টা জবাব দিলাম। মস্ত একটা হাঁ করলাম, সঙ্গে

সঙ্গেই এক ঝাঁক পোকা পড়ল মুখের ভেতর। আর পত্রপাঠ সেগুলো থু-থু শব্দে ফেরত গেল দধিমুখের গালে, নাকে, মুখে, কপালে। শিষ্যকে গুরুর স্নেহাশিস !

দধিমুখ অ্যাঁ-অ্যাঁ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়াং করে ড্রপ সিন। খট করে বাঁশটা আমার নাকে পড়ল, তারপর সোজা নীচে। সিন শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তক্ষুনি স্টেজের ভেতর ছুটে এল ইন্দ্রবেশী হাবুল আর বিশ্বকর্মাবেশী টেনিদা। টেনিদা বললে, এটা কী হল—অ্যাঁ ? এর মানেটা কী, শুনি ?

আমি বিদ্রোহ করে বললাম, কিসের মানে ?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল : প্লে-টা তুই মাটি করবি হতভাগা ? কেন ওভাবে থুতু দিলি ক্যাবলার মুখে ? একদম বরবাদ হয়ে গেল সিনটা। কী রকম হাসছে অডিয়ান্স—তা দেখছিস ?

আমি বললাম, ক্যাবলাই তো থুতু দিয়েছে আগে।

টেনিদা বললে, হুম। দুটোর মাথাই একসঙ্গে ঠুকে দেব এক জোড়া বেলের মতো। যাক যা হয়ে গেছে সে তো গেছেই। এখন পরের সিনগুলোকে ভালো করে ম্যানেজ করা চাই—বুঝলি ? যদি একটু বেয়াড়াপনা করিস তো একটা চাঁটির চোটে নাক একেবারে নাসিকে পাঠিয়ে দেব।

আমি বললাম, তুমি তো বলেই খালাস। কিন্তু স্টেজে হাঁ করে বসে ওই পোকা হজম করবে কে, সেটা শুনি ?

টেনিদা হুঙ্কার করল, তুই করবি। আলবাত তোকেই করতে হবে। থিয়েটার করতে পারবি আর পোকা খেতে পারবি না ? দরকার হলে মশা খেতে হবে, মাছি খেতে হবে—

হাবুল যোগ দিয়ে বললে, ইঁদুর খেতে হবে, বাদুড় খেতে হবে—

টেনিদা বললে, মাদুর খেতে হবে, এমন কি খাট-পালং খাওয়াও আশ্চর্য নয়। হুঁ হুঁ বাবা, এর নাম থিয়েটার।

—থিয়েটার করতে গেলে ও-সব খেতে হয় নাকি ?—আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালাম।

—হয় হয়। তুই এ-সবের কী বুঝিস র‍্যা—অ্যাঁ ? দানীবাবুর নাম শুনেছিস, দানীবাবু ? তিনি যখন সীতার ভূমিকায় প্লে করতেন, তখন মনুমেন্ট খেয়ে নামতেন, সেটা জানিস ?

—মনুমেন্ট খেয়ে !

—হ্যাঁ হ্যাঁ—মনুমেন্ট খেয়ে। যাঃ—যাঃ ক্যাঁচম্যাচ করিসনি। এক্ষুনি সিন উঠবে—কেটে পড়—নিজের পার্ট মুখস্থ করগে।

বেগুন-খেতে কাক-তাড়ানো কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে আমি স্টেজের একধারে এসে বসলাম। মনুমেন্ট খাওয়া। চালিয়াতির আর জায়গা পাওনি—মানুষে কখনও মনুমেন্ট খেতে পারে। কিন্তু প্রতিবাদ করলেই চাঁটি, তাই অমন বোম্বাই চালখানাও হজম করে গেছি।

থিয়েটার করতে এলেই পোকা খেতে হবে ! কেন রে বাপু, তোমাদের সঙ্গে থিয়েটার না করতে পারলে তো আমার আর শিঙিমাছের ঝোল হজম হচ্ছিল না কিনা ! আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে, আমার পেটজোড়া পিলে—দায় পড়েছিল আমার একমুখ কুটকুটে দাড়ি নিয়ে দধীচি সাজতে। যত সব জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে পড়ে এখন আমার এই হাঁড়ির হাল।

দিব্যি বসেছিলাম চাটুজ্যেদের রোয়াকে—ওরা উঠনে হাত-পা নেড়ে রিহার্সেল দিচ্ছিল। কিন্তু দধীচি সাজবার ছেলে পাওয়া যাচ্ছিল না। টেনিদা তার ভাঁটার মতো চোখ পাকিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এসে খপ করে আমার কাঁধটা ধরে ফেলল : অ্যাই পাওয়া গেছে।

আমি বললাম, অ্যাঁ—অ্যাঁ—

টেনিদা বাঘাটে গলায় বললে, অ্যাঁ-অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ হ্যাঁ। দিব্যি মুনি-ঋষির মতো চেহারা তোর, বেশ অহিংস ছাগল ছাগল ভাব। গালে ছাগলের মতো দাড়ি লাগিয়ে দেব,—যা মানাবে, আঃ ! দেখাবে একেবারে রায়বাড়ির কেশো-বুড়োটার মতো।

আপাতত এই তার পরিণতি।

এ-অঙ্কে আমার পার্ট নেই, তাই স্টেজের অন্ধকার একটা কোনায় ঝিম মেরে বসে আছি। দাড়িটা হাতে খুলে নিয়েছি, আর মশা তাড়াচ্ছি প্রাণপণে। নাঃ—এ অসম্ভব। আবার স্টেজে গেলেই ধ্যানে বসতে হবে এবং ধ্যানে বসা মানেই পোকা। আর কী মারাত্মক সে পোকা !

কী করা যায় ?

রাগে হাড়-পিত্তি জ্বলছে। দয়া করে পার্ট করছি এই ঢের, তার ওপর আবার অপমান। এমন করে শাসানো। চাঁটি হাঁকড়ে নাক নাসিকে উড়িয়ে দেবে। ইস, শখখানা দ্যাখো একবার। না হয় তোমার আছেই পিরামিডের মতো উঁচু একটা অতিকায় নাক, আর আমার নাকটা না হয় চীনেম্যানদের মতো থ্যাবড়া, তাই বলে নাক নিয়ে অপমান। আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। এই খাঁদা নাককেই—মৈনাকের মতো উঁচু করে তোমার ভরাডুবি করে ছাড়ব।

কিন্তু কী করা যায় বাস্তবিক ?

ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না, ও-দিকে স্টেজে তখন দারুণ বক্তৃতা দিচ্ছে টেনিদা। এমন এক-একটা লাফ মারছে যে চাটুজ্যেদের ছারপোকা-ভরা পুরনো তক্তপোশটা একেবারে মড়মড় করে উঠছে। থিয়েটার করছে না হাই-জাম্প দিচ্ছে বোঝা মুশকিল।

স্টেজ-ম্যানেজার হাবুল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বললে, এই প্যালা, অমন ভূতের মতো অন্ধকারে বসে আছিস যে ?

বললাম, একটু চা খাওয়া না ভাই হাবুল, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

হাবুল নাকটা কুঁচকে বললে, নেঃ নেঃ, অত চা খায় না। যা পার্ট করছিস, আবার চা।

অ্যাডিং ইনসাল্ট টু ইনজুরি—অ্যাঁ। আমি অন্ধকারে দাঁত বের করে হাবুলকে

ভেংচে দিলাম, হাবুল দেখতে পেলে না।

চম্পট দেব নাকি দাড়িফাড়ি নিয়ে ? সোজা চলে যাব বাড়িতে ? দধীচির সিনে যখন দেখবে আমি বেমালুম হাওয়া—তখন টের পাবে মজাটা কাকে বলে। উঁহু—তাতে সুবিধে হবে না। তারপর কাল সকালে আমায় বাঁচায় কে ? পটলডাঙার বিখ্যাত টেনিদার বিখ্যাত চাঁটিতে স্রেট পটল তুলে বসতে হবে।

না-না, ওসব নয়। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এমন জব্দ করে দেব যে কিল খেয়ে কিলটি সোনামুখ করে গিলে নিতে হবে। টেনিদার বত্রিশ পাটি দাঁতের সঙ্গে আর একটি দাঁত গজিয়ে দেব—যার নাম আক্কেল দাঁত। আর সেই সঙ্গে টেনিদার ধামাধরা ওই স্টেজ-ম্যানেজার শ্রীমান হাবুল সেনকেও টেরটি পাইয়ে দিতে হচ্ছে।

ভগবানকে ডেকে বললাম, প্রভু, আলো দাও—এ অন্ধকারে পথ দেখাও। এবং প্রভু আলো দিলেন।

হাবুলকে বললাম, ভাই, পাঁচ মিনিটের জন্যে একটু বাড়ি থেকে আসছি।

হাবুল আঁতকে বললে, কেন ?

—এই পেটটা একটু কেমন কেমন—

হাবুল বললে, সেরেছে। যত সব পেটরোগা নিয়ে কারবার—শেষটায় ডোবাবে বোধ হচ্ছে। একটু পরেই যে তোর পার্ট রে।

আমি বললাম, না, না, এক্ষুনি আসছি।

মনে মনে বললাম, পেট কার কেমন একটু পরেই দেখা যাবে এখন। মনুমেন্ট খাইয়ে পার্ট করাতে চাও—দেখি আরও কত গুরুপাক জিনিস হজম করতে পারো।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরলাম। ডাক্তার ছোটকাকার ওষুধের আলমারিটা হাতড়াতে বেশি সময় লাগেনি—একেবারে মোক্ষম ওষুধটি নিয়ে এসেছি। হিসেব করে দেখেছি আমার পার্ট আসতে আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি—এর মধ্যেই কাজ হয়ে যাবে।

চায়ের বড় কেটলিটা যেখানে উনানের ওপর ফুটছে, সেখানে গেলাম। তখন কেটলির দিকে কারও মন নেই, সবাই উইংসে ঝুঁকে পড়ে প্লে দেখছে। টেনিদা লাফাচ্ছে ভীমসেনের মতো—আর সে কী ঘন ঘন ক্ল্যাপ। দাঁড়াও দাঁড়াও—কত ক্ল্যাপ চাও দেখব।

পিরামিডের মতো নাক উঁচু করে বিজয়-গৌরবে ফিরে এল টেনিদা। একগাল হাসি ছড়িয়ে বললে, কেমন পার্ট হল রে হাবুল ?

হাবুল কৃতার্থভাবে বললে, চমৎকার, চমৎকার। তুমি ছাড়া এমন পার্ট আর কে করতে পারত ? অডিয়ান্স বলছে, শাবাশ, শাবাশ।

অডিয়ান্স কেন শাবাশ শাবাশ বলছে আমি জানি। তারা বুঝতেই পারেনি যে ওটা ভীমের না বিশ্বকর্মার পার্ট। কিন্তু আসল পার্ট করতে আর একটুখানি দেরি আছে—আমি মনে মনে বললাম।

স্টেজ কাঁপিয়ে টেনিদা হুঙ্কার ছাড়লে, চা—ওরে চা আন—

হাবুল উর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

আবার ড্রপ উঠেছে। দধীচির ভূমিকায় আমি ধ্যানস্থ হয়ে বসে পোকা খাচ্ছি। শিষ্য দধিমুখ এবার দূরে দাঁড়িয়ে আছে—আগের অভিজ্ঞতাটা ভোলেনি।

বিশ্বকর্মা আর ইন্দ্রের প্রবেশ। টেনিদা আর হাবুল।

হাবুল বললে, প্রভু, গুরুদেব,

আসিয়াছি শিবের আদেশে।
তব অস্থি দিয়া
যেই বজ্র হইবে নির্মাণ—

টেনিদা বললে, দেখাইব বিশ্বকর্মা যশ।
হেন অস্ত্র তুলিব গড়িয়া,
ঘোরনাদে কাঁপাইবে সসাগরা ব্রহ্মাণ্ড বিশাল
দীপ্ততেজে দগ্ধ হবে স্থাবর-জঙ্গম,—

তারপরেই স্বগতোক্তি করলে, উঃ, জোর কামড় মেরেছে পেটে মাইরি!

হাবুল চাপা গলায় বললে, আমারও পেটটা যেন কেমন গোলাচ্ছে রে!

আড়চোখে আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম মাত্র। মনুমেন্ট খেয়ে হজম করতে পারো, দেখিই না হজমের জোর কত।

আমি বললাম, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ—

আগে করি ইষ্ট নাম ধ্যান—
ধ্যান ভঙ্গ যতক্ষণ নাহি হয়,
চুপচাপ থাকো ততক্ষণ।
তারপরে তনুত্যাগ করিব নিশ্চয়।

আমি ধ্যানে বসলাম। সহজে এ-ধ্যান ভাঙছে না। পোকার উপদ্রব লেগেই আছে—তা থাক। আমি কষ্ট না করলে টেনিদা আর হাবুলের কেষ্ট মিলবে না। গরম চায়ের সঙ্গে কড়া পার্গেটিভ—এখনই কী হয়েছে!

টেনিদা মুখ বাঁকা করলে, শিগগির ধ্যান শেষ কর মাইরি। জোর পেট কামড়াচ্ছে রে!

আমি বললাম, চুপ। ধ্যান ভঙ্গ করিয়ো না

ব্রহ্মশাপ লাগিবে তা হলে—

ধ্যান কি সত্যি সত্যিই করছি নাকি। আরে ধ্যাৎ। আমি আড়চোখে দেখছি টেনিদার মুখ ফ্যাকাশে মেরে গেছে। হাবুলের অবস্থাও তথৈবচ। ভগবান করুণাময়।

টেনিদা কাতরস্বরে বললে, ওরে প্যালা, গেলাম যে। দোহাই তোর, শিগগির ধ্যান শেষ কর—তোর পায়ে পড়ছি প্যালা—

হাবুল বললে, ওরে, আমারও যে প্রাণ যায়—

আমি একেবারে নট-নড়ন-চড়ন। সামলাও এখন। মুনি-ঋষির ধ্যান—দেহত্যাগের ব্যাপার—এ কী সহজে ভাঙবার জিনিস।

—বাপস গেলাম—এক লম্ফে টেনিদা অদৃশ্য। একেবারে সোজা অন্ধকার আমতলার দিকে। পেছনে পেছনে হাবুল।

আর থিয়েটার?

সে-কথা বলে আর কী হবে!

খট্টাঙ্গ ও পলান্ন

ওপরের নামটা যে একটু বিদঘুটে তাতে আর সন্দেহ কী। খট্টাঙ্গ শুনলেই দস্তুরমতো খটকা লাগে, আর পলান্ন মানে জিজ্ঞেস করলেই বিপন্ন হয়ে ওঠা স্বাভাবিক নয়।

অবশ্য যারা গোমড়ামুখো ভালো ছেলে, পটাপট পরীক্ষায় পাশ করে যায়, তারা হয়তো চট করে বলে বসবে, ইঃ—এর আর শক্তটা কী! খট্টাঙ্গ মানে হচ্ছে খাট আর পলান্ন মানে হচ্ছে পোলাও। এ না জানে কে!

অনেকেই যে জানে না তার প্রমাণ আমি—আর আমার মতো সেই সব ছাত্র, যারা কমসে কম তিন-তিনবার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু ওই শক্ত কথা দুটোর মানে আমাকে জানতে হয়েছিল, আমাদের পটলডাঙার টেনিদার পাল্লায় পড়ে। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আচ্ছা গল্পটা তা হলে বলি।

খাটের সঙ্গে পোলাওয়ের সম্পর্ক কী? কিছুই না। টেনিদা খাট কিনল আর আমি পোলাও খেলাম। আহা সে কী পোলাও। এই যুদ্ধের বাজারে তোমরা যারা র‍্যাশনের চাল খাচ্ছ আর কড়মড় করে কাঁকর চিবুচ্ছ, তারা সে-পোলাওয়ের কল্পনাও করতে পারবে না। জয়নগরের খাসা গোপালভোগ চাল, পেস্তা, বাদাম, কিশমিশ—

কিন্তু বর্ণনা এই পর্যন্ত থাক। তোমরা দৃষ্টি দিলে অমন রাজভোগ আমার পেটে সইবে না। তার চাইতে গল্পটাই বলা যাক।

টেনিদাকে তোমরা চেনো না। ছ'হাত লম্বা, খাড়া নাক, চওড়া চোয়াল। বেশ দশাসই জোয়ান, হঠাৎ দেখলে মনে হয় ভদ্রলোকের গালে একটা গালপাট্টা থাকলে আরও বেশি মানাত। জাঁদরেল খেলোয়াড়—গড়ের মাঠে তিন-তিনটে গোরার হাঁটু ভেঙে দিয়ে রেকর্ড করেছেন। গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় ষাঁড় ডাকছে।

এমন একটা ভয়ানক লোক যে আরও ভয়ানক বদরাগী হবে, এ তো জানা কথা।

আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে—বছরে ছ'মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগি আর বাটি বাটি সাবু খাই। দু'পা দৌড়াতে গেলে পেটের পিলে খটখট করে। সুতরাং টেনিদাকে দস্তুরমতো ভয় করে চলি—শতহস্ত দূরে তো রাখিই। ওই বোম্বাই হাতের একখানা

জুতসই চাঁটি পেলেই তো খাটিয়া চড়ে নিমতলায় যাত্রা করতে হবে।

কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাবে কে ?

সবে দ্বারিকের দোকান থেকে গোটা কয়েক লেডিকেনি খেয়ে রাস্তায় নেমেছি—হঠাৎ পেছন থেকে বাজখাঁই গলা : ওরে প্যালা !

সে কী গলা ! আমার পিলে-টিলে একসঙ্গে আঁতকে উঠল। পেটের ভেতরে লেডিকেনিগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল একসঙ্গে। তাকিয়ে দেখি—আর কে ? মূর্তিমান স্বয়ং।

—কী করছিস এখানে ?

সত্যি কথা বলতে সাহস হল না—বললেই খেতে চাইবে। আর যদি খাওয়াতে চাই তা হলে ওই রাক্ষুসে পেট কি আমার পাঁচ-পাঁচটা টাকা না খসিয়েই ছেড়ে দেবে ! আর খাওয়াতে না চাইলে—ওরে বাবা !

কাঁচুমাচু করে বলে ফেললাম, এই কেত্তন শুনছিলাম।

—কেত্তন শুনছিলে ? ইয়ার্কি পেয়েছ ? এই বেলা তিনটের সময় শেয়ালদার মোড়ে দাঁড়িয়ে কী কেত্তন শুনছিলে ? আমি দেখিনি চাঁদ, এক্ষুনি দ্বারিকের দোকান থেকে মুখ চাটতে চাটতে বেরিয়ে এলে ?

এই সর্বনাশ—ধরে ফেলেছে তো। গেছি এবারে। দুর্গানাম জপতে শুরু করে দিয়েছি ততক্ষণে, কিন্তু কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম কে জানে, ফাঁড়াটা কেটে গেল ! না চটে টেনিদা গোটা ত্রিশেক দাঁতের ঝলক দেখিয়ে দিলে আমাকে। মানে, হাসল।

—ভয় নেই—আমাকে খাওয়াতে হবে না। শ্যামলালের ঘাড় ভেঙে দেলখোসে আজ বেশ মেরে দিয়েছি। পেটে আর জায়গা নেই।

আহা বেচারা শ্যামলাল ! আমার সহানুভূতি হল। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়েছে আজকে। দধীচির মতো আত্মদান করে আমার প্রাণ,—মানে, পকেট বাঁচিয়েছে।

টেনিদা বললে, এখন আমার সঙ্গে চল দেখি !

সভয়ে বললাম, কোথায় ?

—চোরাবাজারে। খাট কিনব একখানা—শুনেছি সস্তায় পাওয়া যায়।

—কিন্তু আমার যে কাজ—

—রেখে দে তোর কাজ। আমার খাট কেনা হচ্ছে না, তোর আবার কাজ কিসের রে ? ভারি যে কাজের লোক হয়ে উঠেছিস—অ্যাঁ ?—কথাটার সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো একটি রদ্দা আমার পিঠে এসে পড়ল।

বাঃ—কী চমৎকার যুক্তি ! টেনিদার খাট কেনা না হলে আমার কোনও আর কাজ থাকতে নেই। কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে ? সূচনাতেই যে রদ্দা পিঠে পড়েছে, তাতেই হাড়-পাঁজরাগুলো ঝনঝন করে উঠেছে আমার। আর একটি কথা বললেই সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তি অসম্ভব নয়।

—চল চল।

না চলে উপায় কী। প্রাণের চেয়ে দামি জিনিস সংসারে আর কী আছে ?

চলতে চলতে টেনিদা বললে, তোকে একদিন পোলাও খাওয়াতে হবে। আমাদের জয়নগরের খাসা গোপালভোগ চাল—একবার খেলে জীবনে আর ভুলতে পারবি না।

কথাটা আজ পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি। কাজ আদায় করে নেবার মতলব থাকলেই টেনিদা প্রতিশ্রুতি দেয়, আমাকে গোপালভোগ চালের পোলাও খাওয়াবে। কিন্তু কাজটা মিটে গেলেই কথাটা আর টেনিদার মনে থাকে না। গোপালভোগ চালের পোলাও এ-পর্যন্ত স্বপ্নেই দেখে আসছি—রসনায় তার রস পাবার সুযোগ ঘটল না।

বললাম, সে তো আজ পাঁচশো বার খাওয়ালে টেনিদা !

টেনিদা লজ্জা পেলে বোধহয়। বললে, না, না—এবারে দেখিস। মুশকিল কী জানিস—কয়লা পাওয়া যায় না—এ পাওয়া যায় না—সে পাওয়া যায় না।

পোলাও রাঁধতে কয়লা পাওয়া যায় না ! গোপালভোগ চাল কী ব্যাপার জানি না, তা সেদ্ধ করতে ক'মন কয়লা লাগে তাও জানি না। কিন্তু কয়লার অভাবে পোলাও রান্না বন্ধ আছে এমন কথা কে কবে শুনেছে ? আমাদের বাসাতেও তো পোলাও মাঝে মাঝে হয়, কই র‍্যাশনের কয়লার জন্য তাতে তো অসুবিধে হয় না ! হাইকোর্ট দেখানো আর কাকে বলে ! ওর চাইতে সোজা বলে দাও না বাপু—খাওয়াব না। এমনভাবে মিথ্যে মিথ্যে আশা দিয়ে রাখবার দরকার কী ?

টেনিদা বললে, ভালো একটা খাট যদি কিনে দিতে পারিস তা হলে তোর কপালে পলান্ন নাচছে, এ বলে দিলাম।

—পলান্ন !

—হ্যাঁ—মানে পোলাও ! তোদের বুকড়ি চালের পোলাওকে কি আর পলান্ন বলে নাকি। হয় গোপালভোগ চাল, তবে না—হুঁ।

হায় গোপালভোগ ! আমি নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

তারপরে খাট কেনার পর্ব।

টেনিদা বললে, এমন একটা খাট চাই যা দেখে পাড়ার লোক স্তম্ভিত হয়ে যাবে ! বলবে, হ্যাঁ—একটা জিনিস বটে ! বাংলা নড়বড়ে খাট নয়—একেবারে খাঁটি সংস্কৃত খট্টাঙ্গ। শুনলেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চমকে উঠবে।

কিন্তু এমন একটা খট্টাঙ্গ কিনতে গিয়েই বিপত্তি।

একেবারে বাঁশবনে ডোমকানা। গায়ে গায়ে অজস্র ফার্নিচারের দোকান। টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলনা, আয়না, পালঙ্কের একেবারে সমারোহ। কোন দোকানে যাই ?

চারদিক থেকে সে কী সংবর্ধনার ঘটা ! যেন এরা এতক্ষণ ধরে আমাদেরই প্রতীক্ষায় দস্তুরমতো তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে বসে ছিল।

—এই যে স্যার—আসুন—আসুন—

—কী লইবেন স্যার, লইবেন কী ? আয়েন, আয়েন, একবার দেইখ্যাই যান—

—একবার দেখুন না স্যার—যা চান, চেয়ার, টেবিল, সোফা, খাট, বাক্স, ডেক্সো, টিপয়, আলনা, আয়না, র‍্যাক, ওয়েস্ট-পেপার বাসকেট, লেটার বক্স—

লোকটা যেভাবে মুখে ফেনা তুলে বলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল একেবারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত বলে তবে থামবে।

টেনিদা বললে, দুত্তোর—এ যে মহা জ্বালাতনে পড়লাম।

উপদেশ দিয়ে বললাম, চটপট যেখানে হয় ঢুকে পড়ো, নইলে এর পরে হাত-পা ধরে টানতে শুরু করে দেবে।

তার বড় বাকিও ছিল না। অতএব দু'জনে একেবারে সোজা দমদম বুলেটের মতো সেঁধিয়ে গেলাম—সামনে যে-দোকানটা ছিল, তারই ভেতরে।

—কী চান দাদা, কী চাই ?

—একখানা ভালো খাট।

—মানে পালং ? দেখুন না, এই তো কত রয়েছে। যেটা পছন্দ হয় ! ওরে ন্যাপলা, বাবুদের জন্যে চা আন, সিগারেট নিয়ে আয়—

—মাপ করবেন, চা-সিগারেট দরকার নেই। এক পেয়ালা চা খাওয়ালে খাটের দরে তার পাঁচ গুণ আদায় করে নেবেন তো। আমরা পটলডাঙার ছেলে মশাই, ওসব চালাকি বুঝতে পারি। বাঙাল পাননি—হুঁ।

দোকানদার বোকার মতো তাকিয়ে রইল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, না খান তো না খাবেন মশাই—ব্যবসার বদনাম করবেন না।

—না করবে না ! ভারি ব্যবসা—চোরাবাজার মানেই তো চুরির আখড়া। চা-সিগারেট খাইয়ে আরও ভালো করে পকেট মারবার মতলব।

মিশকালো দোকানদার চটে বেগুনী হয়ে গেল : ইঃ, ভারি আমার ব্রাহ্মণ-ভোজনের বামুন রে। ওঁকে চা না খাওয়ালে আমার আর একাদশীর পারণ হবে না। যান যান মশাই—অমন খদ্দের ঢের দেখেছি।

—আমিও তোমার মতো ঢের দোকানদার দেখেছি—যাও—যাও—

এই রে—মারামারি বাধায় বুঝি। প্রাণ উড়ে গেল আমার। টেনিদাকে টেনে দোকান থেকে বার করে নিয়ে এলাম।

টেনিদা বাইরে বেরিয়ে বললে, ব্যাটা চোর।

বললাম, নিঃসন্দেহ। কিন্তু এখানে আর দাঁড়িয়ো না, চলো, অন্য দোকান দেখি।

অনেক অভ্যর্থনা এড়িয়ে আর অনেকটা এগিয়ে আর একখানা দোকানে ঢোকা গেল। দোকানদার একগাল হেসে বললে, আসুন—আসুন—পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করান। এ তো আপনাদেরই দোকান।

—আমাদের দোকান হলে কি আর আপনি এখানে বসে থাকতেন মশাই ? কোন কালে বার করে দিতাম, তারপর যা পছন্দ হয় বিনি পয়সায় বাড়িতে নিয়ে যেতাম।

এ-দোকানদারের মেজাজ ভালো—চটল না। একমুখ পান নিয়ে বাধিত হাসি হাসবার চেষ্টা করলে : হেঁঃ—হেঁঃ—হেঁঃ। মশাই রসিক লোক। তা নেবেন কী ?

—একখানা ভালো খাট।

—এই দেখুন না। এ-খানা প্লেন, এ-খানাতে কাজ করা। এটা বোম্বাই প্যাটার্ন, এটা লন্ডন প্যাটার্ন, এটা ডি-লুক্স প্যাটার্ন, এটা মানে-না-মানা প্যাটার্ন—

—থামুন, থামুন। থাকি মশাই পটলডাঙা স্ট্রিটে—অত দিল্লি-বোম্বাই-কামস-কাটকা প্যাটার্ন দিয়ে আমার কী হবে। এই এ-খানার দাম কত ?

—ও-খানা ? তা ওর দাম খুবই সস্তা। মাত্র সাড়ে তিনশো।

—সা—ড়ে তিনশো ?—টেনিদার চোখ কপালে উঠল।

—হ্যাঁ—সাড়ে তিনশো। এক ভদ্দরলোক পাঁচশো টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি

পরশু—তাঁকে দিইনি।

—কেন দেননি ?

—আমার এসব রয়্যাল খাট মশাই—যাকে-তাকে বিক্রি করব ? তাতে খাটের অমর্যাদা হয় যে। আপনাকে দেখেই চিনেছি—বনিয়াদী লোক। তাই মাত্র সাড়ে তিনশোয় ছেড়ে দিচ্ছি—আপনি খাটের যত্ন-আত্তি করবেন।

আহা—লোকটার কী অন্তর্দৃষ্টি। ঠিক খদ্দের চিনেছে তো। আমার শ্রদ্ধাবোধ হল। কিন্তু টেনিদা বশীভূত হবার পাত্র নয়।

—যান—যান মশাই, এই খাটের দাম সাড়ে তিনশো টাকা হয় কখনও ? চালাকি পেয়েছেন ? কী ঘোড়ার ডিম কাঠ আছে এতে ?

বলতে বলতেই খাটের পায়া ধরে এক টান—আর সঙ্গে সঙ্গেই মড়-মড়-মড়াৎ। মানে, খাটের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি।

—হায়—হায়—হায়—

দোকানদার হাহাকার করে উঠল : আমার পাঁচশো টাকা দামের জিনিস মশাই, দিলেন সাবাড় করে ? টাকা ফেলুন এখন।

—টাকা। টাকা একেবারে গাছ থেকে পাকা আমের মতো টুপটুপ করে পড়ে, তাই না ? খাট তো নয়—দেশলাইয়ের বাক্স, তার আবার দাম।

দোকানদার এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। খপ করে টেনিদার ঘাড় চেপে ধরেছে : টাকা ফেলুন—নইলে পুলিশ ডাকব।

বেচারা দোকানদার—টেনিদাকে চেনে না। সঙ্গে সঙ্গে জুজুৎসুর এক প্যাঁচে তিন হাত দূরে ছিটকে চলে গেল। পড়ল একটা টেবিলের ওপর—সেখান থেকে নীচের একরাশ ফুলদানির গায়ে। ঝন-ঝন করে দু-তিনটে ফুলদানির সঙ্গে সঙ্গে গয়াপ্রাপ্তি হয়ে গেল—খণ্ড-প্রলয় দস্তুরমতো।

দোকানদারের আর্তনাদ—হইহই হট্টগোল। মুহূর্তে টেনিদা পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলেছে আমাকে, তারপর বিদ্যুৎবেগে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বৌবাজার স্ট্রিটে। আর বেমালুম ঘুষি চালিয়ে ফ্ল্যাট করে ফেলেছে গোটা তিনেক লোককে। তারপরেই তেমনি স্প্রিংসক্রিগ করে সোজা লাফিয়ে উঠে পড়েছে একখানা হাওড়ার ট্রামে। যেন ম্যাজিক।

পিছনের গণ্ডগোল যখন বৌবাজার স্ট্রিটে এসে পৌঁছেছে, ততক্ষণে আমরা ওয়েলিংটন স্ট্রিট পেরিয়ে গেছি।

আমি তখনও নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না। উঃ—একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কী ! অতগুলো লোক একবার কায়দামতো পাকড়াও করতে পারলেই হয়ে গিয়েছিল, পিটিয়ে একেবারে পরোটা বানিয়ে দিত।

টেনিদা বললে, যত সব জোচ্চোর। দিয়েছি ঠাণ্ডা করে ব্যাটাদের।

আমি আর বলব কী। হাঁ করে কাতলা মাছের মতো দম নিচ্ছি তখনও। বহু ভাগ্যি যে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পেল আজকে।

ট্রাম চীনেবাজারের মোড়ে আসতেই টেনিদা বললে, নাম—নাম।

—এখানে আবার কী ?

—আয় না তুই। ...এক ঝটকায় উড়ে পড়েছি ফুটপাথে।

টেনিদা বললে, চীনেদের কাছে সস্তায় ভালো জিনিস মিলতে পারে। আয়

দেখি।

বাঙালীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি, আবার চীনেম্যানের পাল্লায়! নাঃ, প্রাণটা নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারব মনে হচ্ছে না। প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে নিতান্তই পটল তুলল আজকে। কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম—হায় হায়!

সভয়ে বললাম, আজ না হয়—

—চল চল—ঘাড়ে আবার একটি ছোট রদ্দা।

ক্যাঁক করে উঠলাম। বলতে হল, চলো।

চীনেম্যান বললে, কাম কাম, বাবু। হোয়াত্ ওয়ান্ত? (What want?)

টেনিদার ইংরেজি বিদ্যেও চীনেম্যানের মতোই। বললে, কট্ ওয়ান্ট্।

—কত্? ভেরি নাইস্ কত্। দেয়ার আর মেনি। হুইচ্ তেক? (Cot? Very nice cot. There are many. Which take?)

—দিস্।...একটা দেখিয়ে দিয়ে টেনিদা বললে, কত দাম?

—তু হান্দ্রেদ্ লুপিজ (Two hundred rupees)।

—অ্যাঁ—দুশো টাকা! ব্যাটা বলে কী! পাগল না পেট খারাপ? কী বলিস্ প্যালা—এর দাম দুশো হয় কখনও?

চুপ করে থাকাই ভালো। যা দেখছি তা আশাপ্রদ নয়। পুরনো খাট—রং-চং করে একটু চেহারা ফিরাবার চেষ্টা হয়েছে। খাট দেখে একটুও পছন্দ হল না। কিন্তু টেনিদা যখন পছন্দ করেছে, তখন প্রতিবাদ করে মার খাই আর কি! না হয় ম্যালেরিয়াতেই ভুগছি, তাই বলে কি এতই বোকা?

বললাম, হুঁ, বড্ড বেশি বলছে।

টেনিদা বললে, সব ব্যাটা চোর। ওয়েল মিস্টার চীনেম্যান, পনেরো টাকায় দেবে?

—হো-হোয়াত? ফিপ্‌তিন লুপিজ? দোন্ত জোক বাবু। গিভ্ এইতি লুপিজ। (What? Fifteen rupees? Don't joke, Babu! Give eighty rupees.)

—নাও—নাও চাঁদ—আর পাঁচ টাকা দিচ্ছি—

—দেন গিভ্ ফিপ্‌তি—

শেষ পর্যন্ত পঁচিশ টাকায় রফা হল।

খাট কিনে মহা উল্লাসে টেনিদা কুলির মাথায় চাপালে। আমাকে বললে, প্যালা, এবারে তুই বাড়ি যা—

পোলাও খাওয়ানোর কথাটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল—কিন্তু লাভ কী। দোকানদার ঠেঙিয়ে সেই থেকে অগ্নিমূর্তি হয়ে আছে—পোলাওয়ের কথা বলে বিপদে পড়ব নাকি। মানে মানে বাড়ি পালানোই প্রশস্ত।

কিন্তু পোলাও ভোজন কপালে আছেই—ঠেকাবে কে!

পরের গল্পটুকু সংক্ষেপেই বলি। রাত্রে বাড়ি ফিরে খাটে শুয়েই টেনিদার লাফ। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছারপোকা—কাঁকড়াবিছে, পিশু—কী নেই সেই চৈনিক খাটে? শোবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালাময়ী অনুভূতি!

খানিকক্ষণ জ্বলন্ত চোখে টেনিদা তাকিয়ে রইল খাটের দিকে। বটে, চালাকি! তিনটে গোরা আর চোরাবাজারের দোকানদার ঠ্যাঙানো রক্ত নেচে উঠেছে মগজের মধ্যে। তারপরেই একলাফে উঠনে অবতরণ, কুড়ুল আনয়ন—এবং—

অতগুলো বাড়তি কাঠ দিয়ে আর কী হবে! দিন কয়েক কয়লার অভাব তো মিটল। আর ঘরে আছে গোপালভোগ চাল—অতএব—

অতএব পোলাও।

খট্টাঙ্গের জয় হোক! আহা-হা কী পোলাও খেলাম! পোলাও নয়—পলান্ন। তার বর্ণনা আর করব না, পাছে দৃষ্টি দাও তোমরা!

মৎস্য-পুরাণ

'তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।'

বঙ্গে আর যাব কোথায়, বঙ্গেই তো আছি—একেবারে ভেজালহীন খাঁটি বঙ্গসন্তান। আসলে গিয়েছিলাম 'বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'।

সবে দিন সাতেক ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠেছি। এমনিতেই বরাবর আমার খাইখাইটা একটু বেশি, তার ওপর ম্যালেরিয়া থেকে উঠে খাওয়ার জন্যে প্রাণটা একেবারে ত্রাহি ত্রাহি করে। দিন-রাত্তির শুধু মনে হয় আকাশ খাই, পাতাল খাই, খিদেতে আমার পেটের বত্রিশটা নাড়ি একেবারে গোখরো সাপের মতো পাক খাচ্ছে। শুধু তো পেটের খিদে নয়, একটা ধামার মতো পিলেও জুটেছে সেখানে—আস্ত হিমালয় পাহাড়টাকে আহার করেও বোধহয় সেটার আশ মিটবে না।

সুতরাং 'বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে' বসে গোটা তিনেক ইয়া ইয়া রাজভোগকে কায়দা করবার চেষ্টায় আছি।

কিন্তু 'তুমি যাও বঙ্গে—'

হঠাৎ কানের কাছে সিংহনাদ শোনা গেল: এই যে প্যালা, বেড়ে আছিস—অ্যাঁ?

আমার পিলেটা ঘোঁৎ করে নেচে উঠেই কোঁৎ করে বসে পড়ল। রাজভোগটায় বেশ জুতসই একটা কামড় বসিয়েছিলাম, সেটা ঠিক তেমনি করে হাত আর দাঁতের মাঝখানে লেগে রইল ত্রিশঙ্কুর মতো। শুধু খানিকটা রস গড়িয়ে আদ্দির পাঞ্জাবিটাকে ভিজিয়ে দিলে।

চেয়ে দেখি—আর কে? পৃথিবীর প্রচণ্ডতম বিভীষিকা—আমাদের পটলডাঙার টেনিদা। পুরো পাঁচ হাত লম্বা খট্‌খটে জোয়ান। গড়ের মাঠে গোরা ঠেঙিয়ে এবং খেলায় মোহনবাগান হারলে রেফারি-পিটিয়ে স্বনামধন্য। আমার মুখে অমন সরস রাজভোগটা কুইনাইনের মতো তেতো লাগল।

টেনিদা বললে, এই সেদিন জ্বর থেকে উঠলি নি? এর ভেতরেই আবার ওসব যা তা খাচ্ছিস? এবারে তুই নির্ঘাত মারা পড়বি।

—মারা পড়ব ?—আমি সভয়ে বললাম।

—আলবাত। কোনও সন্দেহ নেই।—টেনিদা শব্দ-সাড়া করে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল : তবে আমি তোকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

এই বলে, বোধহয় আমাকে বাঁচাবার মহৎ উদ্দেশ্যেই নাকি দুটো রাজভোগ তুলে টেনিদা কপ-কপ করে মুখে পুরে দিলে। তারপর তেমনি সিংহনাদ করে বললে, আরও চারটে রাজভোগ।

আমার খাওয়া যা হওয়ার সে তো হল, আমারই পকেটের নগদ সাড়ে তিনটি টাকা খসিয়ে এ-যাত্রা আমার প্রাণটা বাঁচিয়ে দিলে টেনিদা। মনে মনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বেরুলাম দোকান থেকে। ভাবছি এবার হেদোর কোনা দিয়ে সট্ করে ডাফ স্ট্রিটের দিকে সটকে পড়ব, কিন্তু টেনিদা ক্যাঁক করে আমার কাঁধটা চেপে ধরল। সে তো ধরা নয়, যেন ধারণ। মনে হল কাঁধের ওপর কেউ একটা দেড়মনী বস্তা ধপাস করে ফেলে দিয়েছে। যন্ত্রণায় শরীরটা কুঁকড়ে গেল।

—অ্যাই প্যা-লা, পালাচ্ছিস কোথায় ?

ভয়ে আমার ব্রহ্মতালু অবধি কাঠ। বললাম, ন্-ন্ না, না, পা-পা পালাচ্ছি না তো।

—তবে যে মানিক দিব্যি কাঠবেড়ালির মতো গুটি-গুটি পায়ে বেমালুম হাওয়া হয়ে যাচ্ছিলে ? চালাকি না চলিষ্যতি। তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এখন।

—কোথায় ?

—দম্দমায়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, দম্দমায় কেন ?

টেনিদা চটে উঠল : তুই একটা গাধা।

আমি বললাম, গাধা হবার মতো কী করলাম ?

টেনিদা বাঘা গলায় বললে, আর কী করবি ? ধোপার মোট বইবি, ধাপার মাঠে কচি কচি ঘাস খাবি, না প্যাঁ-হোঁ প্যাঁ-হোঁ করে চিৎকার করবি ? আজ রবিবার, দম্দমায় মাছ ধরতে যাব—এটা কেন বুঝিস নে উজবুক কোথাকার ?

—মাছ ধরতে যাবে তো যাও—আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন ?

—তুই না গেলে আমার বঁড়শিতে টোপ গেঁথে দেবে কে, শুনি ? কেঁচো-টেঁচো বাবা আমি হাত দিয়ে ঘাঁটতে পারব না—সে বলে দিচ্ছি।

—বাঃ, তুমি মাছ মারবে আর কেঁচোর বেলায় আমি ?

—নে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখন আর ফ্যাঁচফ্যাঁচ করতে হবে না। চটপট চল শেয়ালদায়। পনেরো মিনিটের ভেতরেই একটা ট্রেন আছে।

আমি দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছি, টেনিদা একটা হ্যাঁচকা মারলে। টানের চোটে হাতটা আমার কাঁধ থেকে উপড়েই এল বোধ হল। 'গেছি গেছি' বলে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

—যাবি কোথায় ? আমার সঙ্গে দম্দমায় না গেলে তোকে আর কোথাও যেতে দিচ্ছে কে ! চল চল। রেডি—ওয়ান, টু—

কিন্তু থ্রি বলবার আগেই আমি যেন হঠাৎ দুটো পাখনা মেলে হাওয়ায় উড়ে গেলাম। মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল, কানে শব্দ বাজতে লাগল ভোঁ-ভোঁ। খেয়াল হতে দেখি, টেনিদা একটা সেকেন্ড ক্লাস ট্রামে আমাকে তুলে ফেলেছে।

আমাকে বাজখাঁই গলায় আশ্বাস দিয়ে বললে, যদি মাছ পাই তবে ল্যাজ থেকে কেটে তোকে একটু ভাগ দেব।

কী ছোটলোক। যেন মুড়ো-পেটি আমি আর খেতে জানি না। কিন্তু তর্ক করতে সাহস হল না। একটা চাঁটি হাঁকড়ালেই তো মাটি নিতে হবে, তারপরে খাটিয়া চড়ে খাঁটি নিমতলা-যাত্রা। মুখ বুজে বসে রইলাম। মুখ বুজেই শিয়ালদা পৌঁছুলাম। তারপর সেখান থেকে তেমনি মুখ বুজে গিয়ে নামলাম দমদমায় গোরাবাজারে।

রেল-লাইনের ধার দিয়ে বনগাঁর মুখে খানিকটা এগোতেই একটা পুরনো বাগানবাড়ি। টেনিদা বললে, চল, ওর ভেতরেই মাছ ধরবার বন্দোবস্ত আছে।

আমি তিন পা পিছিয়ে গেলাম। বললাম, খেপেছ ? এর ভেতরে মাছ ধরতে যাবে কী রকম ! ওটা নির্ঘাত ভুতুড়ে বাড়ি।

টেনিদা হনুমানের মতো দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তোর মুণ্ডু ! ওটা আমাদের নিজেদের বাগান-বাড়ি, ওর ভেতরে ভূত আসবে কোত্থেকে ? আর যদি আসেই তো এক ঘুষিতে ভূতের বত্রিশটা দাঁত উড়িয়ে দোব—হুঁ হুঁ। আয়—আয়—

মনে মনে রামনাম জপতে জপতে আমি টেনিদার পিছনে পিছনে পা বাড়ালাম।

বাগান-বাড়িটা বাইরে থেকে যতটা জংলা মনে হচ্ছিল, ভেতরে তা নয়। একটা মস্ত ফুলের বাগান। এখন অবশ্য ফুলটুল বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু পাথরের কতকগুলো মূর্তি এদিকে ওদিকে ছড়ানো রয়েছে। কিছু কিছু ফলের গাছ—আম, লিচু, নারকেল—এইসব। মাঝখানে পুরনো ধরনের একখানা ছোট বাড়ি। দেওয়ালের চুন খসে গেছে, ইট ঝরে পড়েছে এদিকে ওদিকে, তবু বেশ সুন্দর বাড়ি। মস্ত বারান্দা, তাতে খান কয়েক বেতের চেয়ার পাতা।

বারান্দায় উঠেই টেনিদা একখানা বোম্বাই হাঁক ছাড়লে, ওরে জগা—

দূর থেকে সাড়া এল, আসুচি।...তারপরেই দ্রুতবেগে এক উড়ে মালীর প্রবেশ। বললে, দাদাবাবু আসিলা ?

টেনিদা বললে, হঁ আসিলাম। এতক্ষণ কোথায় ছিলি ব্যাটা গোভূত ? শিগ্গির যা, ভালো দেখে গোটা কয়েক ডাব নিয়ে আয়।

—আনুচি—

বলেই জগা বিদ্যুৎবেগে বানরের মতো সামনের নারকেল গাছটায় চড়ে বসল, তারপর মিনিটখানেকের মধ্যেই নেমে এল ডাব নিয়ে। পর পর চারটে ডাব খেয়ে টেনিদা বললে, সব ঠিক আছে জগা ?

জগা বললে, হঁ।

—বঁড়শি, টোপ, চার—সব ?

জগা বললে, হুঁ।

—চল প্যালা, তাহলে পুকুরঘাটে যাই।

পুকুরঘাটে এলাম। সত্যিই খাসা পুকুরঘাট। সাদা প্যাথরে খাসা বাঁধানো। পুকুরে অল্প অল্প শ্যাওলা থাকলেও দিব্যি টলটলে জল। ঘাটটার ওপরে নারকেলপাতার ছায়া ঝিরঝিরে বাতাসে কাঁপছে। পাখি ডাকছে এদিকে ওদিকে। মাছ ধরবার পক্ষে চমৎকার জায়গা। ঘাটটার ওপরে দুটো বড় বড় হুইল বঁড়শি—বঁড়শি দুটোর চেহারা দেখলে মনে হয় হাঙর-কুমির ধরবার মতলব আছে।

টেনিদা আবার বললে, চার করেছিস জগা ?

—হুঁ।

—কেঁচো তুলেছিস ?

—হুঁ।

—তবে যা তুই, আমাদের জন্যে খিচুড়ির ব্যবস্থা করগে। আয় প্যালা, এবার আমরা কাজে লেগে যাই। নে বঁড়শিতে কেঁচো গাঁথ।

আমি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললাম, কেঁচো গাঁথব ?

টেনিদা হুঙ্কার ছাড়ল : নইলে কি তোর মুখ দেখতে এখানে এনেছি নাকি ? ওই তো বাংলা পাঁচের মতো তোর মুখ, ও-মুখে দেখবার মতো কী আছে র‍্যা ? মাইরি প্যালা, এখন বেশি বকাসনি আমাকে—মাথায় খুন চেপে যাবে। ধর, কেঁচো নে।

কী কুক্ষণেই আজ বাড়ি থেকে বাইরে পা বাড়িয়েছিলাম রে। এখন প্রাণটা নিয়ে ঘরের ছেলে মানে মানে ঘরে ফিরতে পারলে হয়। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে টেনিদার বোধহয় দয়া হল। বললে, নে নে, মন খারাপ করিসনি। আচ্ছা, আচ্ছা—মাছ পেলে আমি মুড়োটা নেব আর সব তোর। ভদ্দর লোকের এক কথা। নে, এখন কেঁচো গাঁথ।

মাছ টেনিদা যা পাবে সে তো জানাই আছে আমার। লাভের মধ্যে আমার খানিক কেঁচো-ঘাঁটাই সার। এরই নাম পোড়া কপাল।

কিন্তু ভদ্দরলোকের এক কথা। সে যে কী সাংঘাতিক কথা সেটা টেনিদা টের পেল একটু পরে।

ছিপ ফেলে দিব্যি বসে আছি।

বসে আছি তো আছিই। জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করতে লাগল। কিন্তু কা কস্য। জলের ওপর ফাতনাটি একেবারে গড়ের মাঠের মনুমেন্টের মতো খাড়া হয়ে আছে। একেবারে নট্ নড়ন-চড়ন—কিচ্ছু না।

আমি বললাম, টেনিদা, মাছ কই ?

টেনিদা বললে, চুপ, কথা বলিসনি। মাছে ভয় পাবে।

আবার আধঘণ্টা কেটে গেল। বুড়ো আঙুলে কাঁচকলা দেখাবার মতো ফাতনাটি তেমনি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জলের অল্প অল্প ঢেউয়ে একটু একটু

দুলছে, আর কিচ্ছু নেই।

আমি বললাম, ও টেনিদা, মাছ কোথায় ?

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, থাম না। কেন বকর-বকর করছিস র‍্যা ? এসব বাবা দশ-বিশ সেরী কাতলার ব্যাপার—এ কী সহজে আসে ? এ তো একেবারে পেল্লায় কাণ্ড। নে, এখন মুখে ইস্ক্রুপ এঁটে বসে থাক।

ফের চুপচাপ। খানিক পরে আমি আবার কী একটা বলতে যাচ্ছি, কিন্তু টেনিদার দিকে তাকিয়েই থমকে গেলাম। ছিপের ওপরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার।

সত্যিই তো—এ যে দস্তুর মতন অঘটন। চোখকে আর বিশ্বাস করা যায় না ; ফাতনা টিপ-টিপ করে নাচছে মাছের ঠোকরে।

আমাদের দু' জোড়া চোখ যেন গিলে খাচ্ছে ফাতনাটাকে। দু'হাতে ছিপটাকে আঁকড়ে ধরেছে টেনিদা—আর একটু গেলেই হয় ! টিপ-টিপ—আমাদের বুকও টিপ-টিপ করছে সঙ্গে সঙ্গে। আমি চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, টেনিদা—

—জয় বাবা মেছো পেত্নী, হেঁইয়ো—

ছিপে একটা জগঝম্প টান লাগাল টেনিদা। সপাং-সাঁই করে একটা বেখাপ্পা আওয়াজে বঁড়শি আকাশে উড়ে গেল, মাথার ওপর থেকে ছিঁড়ে পড়ল নারকেলপাতার টুকরো। কিন্তু বঁড়শি ! একদম ফাঁকা—মাছ তো দূরে থাক, মাছের একটি আঁশ পর্যন্ত নেই।

টেনিদা বললে, অ্যাঁ, ব্যাটা বেমালুম ফাঁকি দিলে ! আচ্ছা, আচ্ছা যাবে কোথায় ! আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন। নে প্যালা, আবার কেঁচো গাঁথ—

টান দেখেই বুঝতে পারছি কী রকম মাছ উঠবে। মাছ তো উঠবে না, উঠবে জলহস্তী। কিন্তু বলে আর চাঁটি খেয়ে লাভ কী, কেঁচো গাঁথা কপালে আছে, তাই গেঁথে যাই।

কিন্তু টেনিদার চারে আজ বোধ হয় গণ্ডা গণ্ডা রুই-কাতলা কিলবিল করছে। তাই দু' মিনিট না যেতেই এ কী ! দু' নম্বর ফাতনাতেও এবার টিপ-টিপ শুরু হয়েছে।

বললাম, টেনিদা, এবারে সামাল।

টেনিদা বললে, আর ফসকায় ? বারে বারে ঘুঘু তুমি—হুঁ হুঁ। কিন্তু কথা বলিসনি প্যালা—চুপ ! টিপ-টিপ-টিপ। টপ।

সাঁ করে আবার বঁড়শি আকাশে উঠল, আবার ছিঁড়ে পড়ল নারকেলপাতা। কিন্তু মাছ ? হায়, মাছই নেই।

টেনিদা বলেন, এবারেও পালাল ? উঃ—জোর বরাত ব্যাটার। আচ্ছা, দেখে নিচ্ছি। কেঁচো গাঁথ প্যালা ! আজ এসপার কি ওসপার।

তাজ্জব লাগিয়ে দিল বটে। বঁড়শি ফেলবামাত্র ফাতনা ডুবিয়ে নিচ্ছে, অথচ টানলেই ফাঁকা। এ কী ব্যাপার ! এমন তো হয় না—হওয়ার কথাও নয়।

টেনিদা মাথা চুলকোতে লাগল। পর পর গোটা আষ্টেক টানের চোটে মাথার

ওপরে নারকেলগাছটাই ন্যাড়ামুড়ো হয়ে গেল, কিন্তু মাছের একটুকরো আঁশও দেখা গেল না।

টেনিদা বললে, এ কীরে, ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি ?

পিছনে কখন জগা এসে দাঁড়িয়েছে আমরা টেরও পাইনি। হঠাৎ পানে রাঙা একমুখ হেসে জগা বললে, আইজ্ঞা ভুতো নয়, কাঁকোড়া অছি।

—কাঁকোড়া ? মানে কাঁকড়া ?

জগা বললে, হঁ।

—তবে আজ কাঁকড়ার বাপের শ্রাদ্ধ করে আমার শান্তি !... আকাশ কাঁপিয়ে হুঙ্কার ছাড়লে টেনিদা : বসে বসে নিশ্চিন্তে আমার চার আর টোপ খাচ্ছে ? খাওয়া বের করে দিচ্ছি। একটা বড় দেখে ডালা কিংবা ধামা নিয়ে আয় তো জগা।

—ডালা ! ধামা !—আমি অবাক হয়ে বললাম, তাতে কী হবে ?

—তুই চুপ কর প্যালা—বকালেই চাঁটি লাগাব। দৌড়ে যা জগা—ধামা নিয়ে আয়।

আমি সভয়ে ভাবলাম টেনিদার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি ? ধামা হাতে করে পুকুরে মাছ ধরতে নামবে এবারে ?... কিন্তু—

কিন্তু যা হল তা একটা দেখবার মতো ঘটনা। শাবাশ একখানা খেল, একেবারে ভানুমতীর খেল। এবার ফাতনা ডুবতেই আর হেঁইয়া শব্দে টান দিলে না টেনিদা। আস্তে আস্তে অতি সাবধানে বঁড়শিটাকে ঘাটের দিকে টানতে লাগল। তারপর বঁড়শিটা যখন একেবারে কাছে চলে এসেছে, তখন দেখা গেল মস্ত একটা লাল রঙের কাঁকড়া বঁড়শিটা প্রাণপণে আঁকড়ে আছে। টেনিদা বললে, বঁড়শি জলের ওপর তুললেই ও ব্যাটা ছেড়ে দেবে। বঁড়শি আমি তোলবার আগে ঠিক জলের তলায় ধামাটা পেতে ধরবি, বুঝলি জগা। তারপর দেখা যাবে কে বেশি চালাক—আমি, না ব্যাটাচ্ছেলে কাঁকড়া।

তারপর আরম্ভ হল সত্যিকারের শিকারপর্ব। টেনিদার বুদ্ধির কাছে এবারে কাঁকড়ার দল ঘায়েল। আধঘণ্টার মধ্যে ধামা বোঝাই।

দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হুইলের শিকার দু' কুড়ি কাঁকড়া !

টেনিদা বললে, মন্দ কী ! কাঁকড়ার ঝোলও খেতে খারাপ নয়। তোর খিচুড়ি কতদূর জগা ?

কিন্তু ভদ্দরলোকের এক কথা। আমি সেটা ভুলিনি।

বললাম, টেনিদা, মুড়োটা তোমার—আর ল্যাজা-পেটি আমার—মনে আছে তো ?

টেনিদা আঁতকে বললে, অ্যাঁ।

আমি বললাম, হ্যাঁ।

টেনিদা এক মিনিটে কাঁচুমাচু হয়ে গেল, তা হলে ?

—তা হলে মুড়ো, অর্থাৎ কাঁকড়ার দাঁড়া দুটো তোমার, আর বাকি কাঁকড়া আমার।

টেনিদা আর্তনাদ করে বললে, সে কী ?

আমি বললাম, ভদ্দরলোকের এক কথা।

—তা হলে কাঁকড়ার কি মুড়ো নেই ?

মুড়ো না থাকলেও মুখ আছে, কিন্তু আমি সে চেপে গেলাম। বললাম, ওই দাঁড়াই হল ওদের মুড়ো।

টেনিদা খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বসে পড়ল। বললে, প্যালা, তোর মনে এই ছিল ! ও হো-হো-হো—

তা যা খুশি বলো। বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে সাড়ে তিন টাকার শোক কি আমি এর মধ্যেই ভুলেছি !

আজ দু'দিন বেশ আরামে কাঁকড়ার ঝোল খাচ্ছি। টেনিদা দাঁড়া কী রকম খাচ্ছে বলতে পারব না, কারণ রাস্তায় সেদিন আমাকে দেখেও ঘাড় গুঁজে গোঁ-গোঁ করে চলে গেল, যেন চিনতেই পারেনি।

পেশোয়ার কী আমীর

চাটুজ্যেদের রকে বসে আমি একটা পাকা আমকে কায়দা করতে চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ খেতে হল না। গোটা-চারেক কামড় দিয়েই ফেলে দিতে হল—অ্যায়সা টক। দাঁতগুলো শিরশির করতে লাগল—মেজাজটা বেজায় খিঁচড়ে গেল আমার। বাড়িতে মাংস এসেছে দেখেছি—রাত্তিরে জুত করে হাড় চিবুতে পারব কি না কে জানে !

এই সময় কোত্থেকে পটলডাঙার টেনিদা এসে হাজির। গাঁক গাঁক করে বললে, এই প্যালা, আমটা ফেলে দিলি যে ?

—যাচ্ছেতাই টক। খাওয়া যায় নাকি ?

—টক ? টেনিদা ধুপ করে আমার পাশে বসে পড়ে বললে, টক বলে বুঝি গেরাহ্যি হল না ? সংসারে টক যদি না থাকত, তাহলে আচার পেতিস কোথায় ? টক যদি না থাকত তাহলে কী করে দই জমত ? টক যদি না থাকত তাহলে চালকুমড়োর সঙ্গে কামরাঙার তফাত কী থাকত ? টক যদি না থাকত তাহলে পিঁপড়েরা কী করে টক-টক হত ? টক না থাকলে—

টক না থাকলে পৃথিবীতে আরও অনেক অঘটন ঘটত—কিন্তু সে-সবের লম্বা লিস্টি শোনবার মতো উৎসাহ আমার ছিল না। আমি বাধা দিয়ে বললুম, তাই বলে অত টক আম কোনও ভদ্দরলোকে খেতে পারে নাকি ?

আমের গন্ধে কোত্থেকে একটা মস্ত নীল রঙের কাঁঠালে-মাছি এসেছে, সেটা শেষতক টেনিদার খাঁড়ার মতো মস্ত নাকটার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। আমার

কথা শুনে টেনিদার সেই পেল্লায় নাকের ভেতর থেকে রণ-ডম্বরুর মতো একটা বিদঘুটে আওয়াজ বেরুল। মাছিটা শূন্যে বার-দুই ঘুরপাক খেয়ে বোঁ করে মাটিতে পড়ে গেল—ভিরমি খেল না হার্টফেলই করল কে জানে ?

টেনিদা বললে, ইস-স্-স্। খুব যে ভদ্দরলোক হয়ে গেছিস দেখছি। তবু যদি পালাজ্বরে ভুগে দু-বেলা পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল না খেতিস ! তুই কি আমার গাবলু মামার চাইতেও ভদ্দরলোক ? জানিস, গাবলু মামা এখন চারশো টাকা মাইনে পায় ?

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, জেনে আমার লাভ কী ? তোমার গাবলু মামা তো আমায় টাকা ধার দিতে যাচ্ছে না ?

—তোর মতো অখাদ্যিকে টাকা ধার দিতে বয়ে গেছে গাবলু মামার ? টেনিদার নাক দিয়ে আবার একটা আওয়াজ বেরুল : জানিস—তিনবার আই-এ ফেল-করা গাবলু মামা অত বড় চাকরিটা পেল কী করে ? স্রেফ টক আমের জন্যে।

—টক আমের জন্যে ? আমি হাঁ করে রইলুম : টক আম খেলে বুঝি ওই রকম চাকরি হয় ?

—খেলে নয় রে গাধা—খাওয়ালে। তবে, তাক বুঝে খাওয়াতে জানা চাই। বলছি তোকে ব্যাপারটা—অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবি। তার আগে গলির মোড় থেকে দু'আনার ডালমুট নিয়ে আয়।

জ্ঞানলাভ করতে চাই আর না চাই, টেনিদা যখন ডালমুট খেতে চেয়েছে—তখন খাবেই। পকেটে পয়সা থাকলে ও ঠিক টের পায়। কী করি, আনতেই হল ডালমুট।

—তুই পেটরোগা, এসব তোর খেতে নেই—বলে হ্যাঁচকা টানে টেনিদা ঠোঙাটা কেড়ে নিলে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। খেতে যখন দেবে না, তখন বেশ করে নজর দিয়ে দিই। পরে টের পাবে।

টেনিদা ভ্রূক্ষেপ করলে না। বললে, তবে শোন। আমার মামার বাড়ি কোথায় জানিস তো ? খড়্গপুরে। সেই খড়্গপুর—যেখানে রেলের ইঞ্জিন-টিঞ্জিন আছে ?

সেবার গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে গেছি। ওই যে একটা ছড়া আছে না—'মামাবাড়ি ভারি মজা—কিল চড় নাই' ? কথাটা একদম বোগাস—বুঝলি ? কক্ষনো বিশ্বাস করিসনি।

অবিশ্যি মামাবাড়িতে ভালো লোক একেবারে নেই তা নয়। দিদিমা, দাদু এরা বেশ খাসা লোক। বড় মামিরাও মন্দ নয়। কিন্তু ওই গাবলু মামা-টামা—বুঝলি, ওরা ভীষণ ডেঞ্জারাস হয়।

বললে বিশ্বাস করবিনে, সাতদিনের মধ্যে গাবলু মামা দু'বার আমার কান টেনে দিলে। এমন কিছু করিনি, কেবল একদিন ওর ঘড়িটায় একটু চাবি দিয়েছিলুম—তাতে নাকি স্প্রিংটা কেটে গিয়েছিল। আর একদিন ওর শাদা নাগরাটা কালো কালি দিয়ে একটু পালিশ করেছিলুম, আর নেটের মশারিতে কাঁচি দিয়ে একটা গ্র্যাণ্ড জানলা বানিয়ে দিয়েছিলুম। এর জন্যে দু'দিন আমার কান ধরে

পাক দিয়ে দিলে। কী ভীষণ ছোটলোক বল দিকি।

তা করে করুক—গাবলু মামা—খড়্গপুরে দিনগুলো আমার ভালোই কাটছিল। দিব্যি খাওয়া-দাওয়া—মজাসে ইস্টিশানে রেল দেখে বেড়ানো, হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কাঁসাইয়ের পুল পর্যন্ত চলে যাওয়া, সেখানে বেশ চড়ুইভাতি—আরও কত কী ! বেশ ছিলুম।

বেশ মনের মতো বন্ধুও জুটে গিয়েছিল একটি। তার ডাকনাম ঘটা—ভালো নাম ঘটকর্পর। ওর ছোট ভাইয়ের নাম ক্ষপণক, ওর দাদার নাম বরাহ। ওদের বাবা গোবর্ধনবাবুর ইচ্ছে ছিল,—ওদের ন-ভাইকে নিয়ে নবরত্ন সভা বসাবেন বাড়িতে।

কিন্তু ক্ষপণকের পর আর ভাই জন্মাল না—খালি বোন আর বোন। রেগে গিয়ে গোবর্ধনবাবু তাদের নাম দিতে লাগলেন, জ্বালামুখী, মুণ্ডমালিনী এইসব। এমনকি খনা নাম পর্যন্ত রাখলেন না কারুর।

তা এই তিন রত্নেই যথেষ্ট—একেবারে তিন তিরিখ্খে নয় ! এক-একটা বিচ্ছু অবতার। আর ঘটা তো একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানির ঘট।

আগে কি আর বুঝতে পেরেছিলুম ? তাহলে ঘটার ত্রিসীমানায় কে যায় ! ওর ঠাকুরমার ভাঁড়ার থেকে আচার-টাচার চুরি করে এনে আমায় খাওয়াত—আমি ভাবতুম অমন ভালো ছেলে বুঝি দুনিয়ায় আর হয় না।

কিন্তু শেষকালে এই ঘটাই আমাকে এমন একখানা লেঙ্গি মেরে দিলে যে কী বলব।

একদিন দুপুরবেলা গাবলু মামা বেশ প্রেম্‌সে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আর আমি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছি। একটা ছিপ চাঁছব—গাবলু মামার দাড়ি-কামানোর চকচকে ক্ষুরটা হাত-সাফাই করতে পারলে ভীষণ সুবিধে হয়।

এমন সময় ফিসফিস করে ঘটা আমার কানে কানে বললে, এই টেনি, আম খাবি ?

কেন খাব না—খেতে আর ভয় কী। আর আমায় জানিস তো প্যালা—খাওয়ার ব্যাপারে কাপুরুষতা আমার একদম বরদাস্ত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠে আমি বললুম, কোথায় রে ?

—আমাদের বাগানে।

আমি বললুম, ওরে বাবা।

বলবার কারণ ছিল। গোবর্ধনবাবুর খুব ভালো একটা আমের বাগান আছে—বাছাই বাছাই কলমের আম। ল্যাংড়া, বোম্বাই, মিছরিভোগ—আরও কত কী ! দেড় মাইল দূর থেকেও আমের গন্ধে জিভে জল আসে। কিন্তু কাছে যায় সাধ্যি কার। যমদূতের মতো একটা অ্যায়সা জোয়ান মালী রাতদিন খাড়া পাহারা দিচ্ছে সেখানে। একটু উঁকিঝুঁকি দিয়েছ কি সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় হাঁক পাড়বে, ইখানে হৈচ্ছে কী ? ও-সব চলিবেনি ! না পালাইছ তো পিট্টি খাইছ ?

ঘটা বললে, কিছু ঘাবড়াসনি—বুঝলি ? আজ জামাইষষ্ঠী কিনা—মালী এ-বেলা

শ্বশুরবাড়ি গেছে। ভালোমন্দ খেয়ে-দেয়ে সন্ধের পরে ফিরবে। আজকেই সুযোগ।

অমন জাঁদরেল মালীরও শ্বশুরবাড়ি থাকে—আমার বিশ্বাসই হল না। ঘটা বললে, সত্যি বলছি টেনি। চল না বাগানে—গেলেই বুঝতে পারবি।

গেলুম বাগানে। বেগতিক দেখলেই রামদৌড় লাগাব। লম্বা লম্বা ঠ্যাং দুটো তো আছেই!

গিয়ে দেখি, সত্যিই তাই। মালীর ঘরে মস্ত একটা তালা ঝুলছে। আর বাগানে?

গাছ ভর্তি আম আর আম। তাদের কী রঙ, আর ক্যায়সা খোশবু! মনে হল যেন স্বর্গের নন্দনবনে এসে ঢুকেছি আর চারদিকে অমৃত ফল ঝুলছে। কিন্তু হলে কী হবে! প্রায় সবগুলো গাছই বিচ্ছিরি রকমের জাল দিয়ে ঘেরাও করা। ঢিল মারলে পড়বে না—আঁকশিতে নামবে না।

শুধু একদিকে বেঁটে চেহারার একটা গাছে কোনও জালই নেই। আর কী আম হয়েছে সে-গাছে। মাটির হাতখানেক কাছাকাছি পর্যন্ত আম ঝুলে পড়েছে। পেকে টুকটুক করছে আমগুলো—লালে আর হলদেতে কী আশ্চর্য তাদের রঙ! দেখেই আনন্দে আমার মূর্ছা যাবার জো হল।

ঘটা বললে, এ-আমের নাম হল পেশোয়ার কি আমীর। আমের সেরা। খেলে মনে হবে পেশোয়ারের আঙুর, ভীম নাগের সন্দেশ আর কাশীর চমচম একসঙ্গে খাচ্ছিস। লেগে যা টেনি—

বলবার আগেই লেগে গেছি আমি। চক্ষের নিমেষে টেনে নামিয়েছি গোটা পনেরো পেশোয়ার কি আমীর। তারপর বেশ টুসটুসে একটা আমে যেই কামড় বসিয়েছি—

সঙ্গে সঙ্গে কী হল সে আমার মনে নেই প্যালা! আমি মাথা ঘুরে সেইখানেই বসে পড়লুম। ওরে বাপ্‌স—কী টক! দশ মিনিট ধরে খালি মনে হতে লাগল, আমার দু'পাটি দাঁতের ওপর কেউ দমাদম হাতুড়ি ঠুকছে—আমার দু' কানে তিরিশটা ঝিঁঝি পোকা কোরাস গাইছে, আমার নাকের ওপর তিন ডজন উচ্চিংড়ে লাফাচ্ছে, আমার মাথার ওপর সাতটা কাঠঠোকরা এক নাগাড়ে ঠুকে চলেছে।

যখন জ্ঞান হল—তখন দেখি দু'ডজন পেশোয়ার কি আমীর সামনে নিয়ে আমি বসে আছি ধুলোর ওপর। ঘটার চিহ্নমাত্র নেই। ঘটকর্পর কর্পূরের মতোই উবে গেছে।

কী শয়তান, কী বিশ্বাসঘাতক। একবার যদি ওকে সামনে পাই, তাহলে ওর নাক খিমচে দেব, কান কামড়ে দেব, পিঠে জলবিছুটি ঘষে দেব, ওর ছুটির টাস্কের সব অঙ্কগুলো এমন ভুল করে রেখে দেব যে ইস্কুলে গেলেই সপাসপ বেত। কিন্তু সে তো পরের কথা পরে। এখন কী করি।

আমের লোভেই কি না কে জানে, পাটকিলে রঙের মস্ত দাড়িওলা একটা রামছাগল গুটি গুটি পায়ে আমার দিকে এগোচ্ছে। আমার সমস্ত রাগ ছাগলটার ওপরে গিয়ে পড়ল। বটে—আম খাবে। দ্যাখো একবার পেশোয়ার কি আমীরকে পরখ করে!

ছাগলে সব খায়—জানিস তো প্যালা? ছাতা খায়, খাতা খায়, হকিস্টিক খায়, জুতো খায়—জুতোবুরুশওয়ালাকেও যে বাগে পেলে খায় না এ-কথা জোর করে বলা যায় না। আমার সেই কামড়ে-দেওয়া আমটাকেই দিলুম ছুড়ে ওর দিকে।

মাটিতেও পড়তে পেল না—ক্রিকেটের বলের মতোই আকাশে লাফিয়ে উঠে ছাগলটা আমটাকে লুফে নিলে। তারপর?

—ব্য-আ-আ—করে গগনভেদী আওয়াজ হল একটা। একটা নয়—যেন সমস্ত ছাগলজাতি একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল। তারপরেই টেনে একখানা দৌড় মারল! সে কী দৌড় রে প্যালা! চক্ষের পলকে বাগান পেরুল, মাঠ পেরুল, লাফ মারতে মারতে খানা-খন্দল পেরুল। বোধহয় মেদিনীপুরে গিয়েই শেষতক সেটা থামল।

আমি জ্বলন্ত চোখে আমগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলুম। ঘটাকে একটা খাওয়াতে পারলে বুকের জ্বালা নিবত। কিন্তু সেটাকে আর পাই কোথায়? তিন দিনের মধ্যেও টিকির ডগাটি পর্যন্ত দেখতে পাব না এটা নিশ্চিন্ত।

তাহলে কাকে খাওয়াই?

নির্ঘাত গাবলু মামাকে। দু'দিন আমার কান দুটো বেহালার কানের মতো আচ্ছা করে মুচড়ে দিয়েছে। এ আম গাবলু মামারই খাওয়া দরকার।

গোটা আষ্টেক আম কোঁচড়ে লুকিয়ে ফিরে এলুম।

ভগবান ভরসা থাকলে সবই সম্ভব হয় প্যালা—বুঝলি? বাড়ি ফিরে দেখি ভীষণ হইচই। গাবলু মামা কোন্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে চাকরির চেষ্টায়। দইয়ের ফোঁটা-টোঁটা পরানো হচ্ছে—দিদিমা—বড়মামি—দাদু—সবাই একসঙ্গে দুর্গা দুর্গা—কালী কালী এই সব আওড়াচ্ছেন।

গাবলু মামার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি—কেউ নেই। শুধু টেবিলের ওপর রঙচঙে একটা বেতের ঝুড়ি। তাতে বাছা-বাছা সব বোম্বাই আম। ভগবান বুদ্ধি দিলেন রে প্যালা! কেউ দেখবার আগেই আমি ঘরে ঢুকে গোটাকয়েক বোম্বাই সরিয়ে ফেললুম—তার ওপর সাজিয়ে দিলুম সাতটা পেশোয়ার কি আমীর—মানে, সাতটা অ্যাটম বম্।

তারপরে গোয়ালঘরে লুকিয়ে বসে সেই বোম্বাই আমগুলো সাবাড় করছি—দেখি না, সেই ঝুড়িটা নিয়ে গাবলু মামা গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর দাদু দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে সমানে 'কালী কালী' বলতে লাগলেন।

এইবার আমার চটকা ভাঙল। অ্যাঁ—ওই আম সাহেবের কাছে ভেট যাচ্ছে! গাবলু মামার অবস্থা কী হবে ভেবে আমারই তো গায়ের রক্ত জমে গেল! চাকরি তো দূরে থাক—হাড়গোড় নিয়ে গাবলু মামা ফিরতে পারলে হয়। বেশ খানিকটা অনুতাপই হল এবার। ইস—এ যে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেল রে!

বললে বিশ্বাস করবিনি প্যালা—ওই আমের জোরেই শেষতক গাবলু মামার

চাকরি হয়ে গেল। কী ? সেইটেই তো আদত গল্প।

যে-সাহেবটার সঙ্গে মামা দেখা করতে গেল, তার নাম ডার্কডেভিল। যতটা না বুড়ো হয়েছে—তার চাইতে বেশি ধরেছে বাতে। প্রায় নড়তে-চড়তে পারে না, একটা চেয়ারে বসে রাত-দিন কোঁ কোঁ করছে। তার হাতেই গাবলু মামার চাকরি।

আমের ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে গাবলু মামা সায়েবকে সেলাম দিলে। তারপর নাক-টাক কুঁচকে, মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, মাই গার্ডেনস্ ম্যাংগো স্যার। ভেরি গুড স্যার—ফর ইয়োর ইটিং স্যার—

একদম চালিয়াতি—বুঝলি প্যালা। আমার মামার বাড়ির ধারে-কাছেও আমের গাছ নেই। তবু ও-সব বলতে হয়—গাবলু মামাও চালিয়ে দিলে।

সায়েবটা বেজায় লোভী, তায় রাত-দিন রোগে ভুগে লোভ আরও বেড়ে গিয়েছিল। আমের ঝুড়ি দেখেই সায়েবের নোলা লকলকিয়ে উঠল। তার ওপরে আবার সেই পেশোয়ার কি আমীর—তার যেমন গড়ন, তেমনি রঙ। তক্ষুনি সে ছুরি বের করলে টেবিলের টানা থেকে।

—কাম বাবু, হ্যাভ সাম (একটুখানি খাও)—বলেই এক টুকরো সে গাবলু মামার দিকে এগিয়ে দিলে।

—নো স্যার—আই ইট মেনি স্যার,—এইসব বলে গাবলু মামা হাত-টাত কচলাতে লাগল। কিন্তু সায়েবের গোঁ—জানিস তো ? ধরেছে যখন—খাইয়ে ছাড়বেই।

অগত্যা গাবলু মামাকে নিতেই হল টুকরোটা। আর মুখে দিয়েই—

—দাদা গো। গেলুম—বলে গাবলু মামা চেয়ারসুদ্ধ উলটে পড়ে গেল। কষে একটা দাঁত নড়ছিল, সেটাও খসে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

আর সায়েব ?

আমে কামড় দিয়েই বিটকেল আওয়াজ ছাড়লে : ও গশ্—ঘোঁয়াক ! তারপরেই তড়াক করে এক লাফে টেবিলে উঠে পড়ল, দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মাই গড—ঘ্যাচাং।

এই বলে আর-এক লাফ। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছিল, সায়েব তার একটা ব্লেডকে চেপে ধরলে। তারপর ঘুরন্ত ফ্যানের সঙ্গে শূন্যে ঘুরতে লাগল বাঁই-বাঁই করে।

সে কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড—তোকে কী বলব প্যালা। ঘরের ভেতর নানারকম আওয়াজ শুনে সায়েবের আর্দালি ছুটে এসেছিল। সে সায়েবকে ফ্যানের সঙ্গে বনবনিয়ে ঘুরতে দেখে বললে, রাম-রাম—এ কেইসা কাম ! বলে সে কাকের মতো হাঁ করে রইল।

আর সেই সময়েই ঘুরন্ত আর উড়ন্ত সায়েবের হাত থেকে পেশোয়ার কি আমীর টুপ করে খসে পড়ল। আর পড়বি তো পড় একেবারে আর্দালির হাঁ-করা মুখে। —এ দেশোয়ালী ভাই জান গইরে—বলে আর্দালি পাঁই-পাঁই করে একেবারে ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে এসে পড়ল। তখন মাদ্রাজ মেল ইস্টিশান ছেড়ে চলে যাচ্ছে—এক লাফে তাতেই উঠে পড়ল আর্দালি, তারপর পতন ও মূর্ছা। ওয়ালটেয়ারে গিয়ে নাকি তার জ্ঞান হয়েছিল।

ততক্ষণে গাবলু মামার চটকা ভেঙেছে। মাথার ওপরে সায়েবের বুটের ঠোক্কর কাঁধে এসে লাগতেই গাবলু মামা টেনে ছুট। একদৌড়ে বাড়িতে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল—তারপরেই একশো চার জ্বর, আর তার সঙ্গে ভুল বকুনি : ওই—ওই আম আসছে। আমায় ধরলে।

বাড়িতে তো কান্নাকাটি। আমার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস ! কিন্তু পরের দিন তাজ্জব কাণ্ড ! সকালেই সায়েবের দু' নম্বর চাপরাশি গাবলু মামার নামে এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির।

ব্যাপার কী ?

না—গাবলু মামার চাকরি হয়েছে। আড়াইশো টাকা মাইনের চাকরি !

কেমন করে হল ? আরে, কেন হবে না ? সায়েব তো ফ্যানের ব্লেড থেকে ছিটকে পড়ল। পড়তেই দেখে—আশ্চর্য ঘটনা। সায়েবের দশ বছরের বাত—হাত-পা ভালো করে নাড়তে পারত না—পেশোয়ার কি আমীরের এক ধাক্কাতেই সে-বাত বাপ-বাপ করে পালিয়েছে। কাল সারা বিকেল সায়েব মাঠে ফুটবল খেলেছে, আনন্দে সক্কলকে ভেংচি কেটেছে, বাড়ি ফিরে তার পেল্লায় মোটা মেমসায়েবের সঙ্গে মারামারি করেছে পর্যন্ত।

আর গাবলু মামার জ্বর ? তক্ষুনি রেমিশন ! দশ বালতি জলে চান করে, ভাত খেয়ে, কোট-পেন্টলুন পরে গাবলু মামা তক্ষুনি সায়েবকে সেলাম দিতে ছুটল।

বুঝলি প্যালা—তাই বলছিলুম, টক আমাকে অচ্ছেদ্দা করতে নেই। জুতমতো কাউকে খাইয়ে দিতে পারলে বরাত খুলে যায়।

ডালমুটের ঠোঙাটা শেষ করে টেনিদা থামল।

—আহা, এমন বাতের ওষুধ ! আমি বললুম, সে আমগাছটা—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনিদা বললে, ও-সব ভগবানের দান রে—বেশিদিন কি সংসারে থাকে ? পরদিনই কালবৈশাখী ঝড়ে গাছটা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল।

কাক-কাহিনী

বাড়ির সামনে রকে বসে একটু করে ডালমুট খাচ্ছি, আর একটা কাক আমাকে লক্ষ করছে। শুধু লক্ষই করছে না, দিব্যি নাচের ভঙ্গিতে এগিয়ে আসছে, আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছে, হঠাৎ কী ভেবে একটু উড়ে যাচ্ছে—আবার নাচতে-নাচতে চলে আসছে। 'কক্ কু' বলে মিহি সুরে একবার ডাকলও একটুখানি।

ঠোঙাটা শেষ করে আমি ওর দিকে ছুড়ে দিলুম। বললুম, 'ছুঁচো, পালা।'

আর ঠিক তক্ষুনি আমাদের পটলডাঙার টেনিদা এসে হাজির।

কাকটা ঠোঙাটা মুখে নিয়ে উধাও হয়েছে, টেনিদা ধপাৎ করে আমার পাশে বসে পড়ল। মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'তুই কাকটাকে ছুঁচো বললি নাকি?'

'বললুম বই কি।'

'বলিসনি, কক্ষনো বলিসনি। ওদের ওতে খুব অপমান হয়।'

'অপমান হয় তো বয়েই গেল আমার।' আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, 'কাকের মতো এমন নচ্ছার, এমন বিশ্ববকাটে জীব দুনিয়ায় আর নেই।'

'বলতে নেই রে প্যালা, বলতে নেই।'—টেনিদার গলার কেমন যেন উদাস-উদাস হয়ে গেল:

তুই জানিসনে ওরা কত মহৎ—কত উদার। তোদের কত বায়নাক্কা—এটা খাব না, ওটা খাব না, সেটা খেতে বিচ্ছিরি—কিন্তু কাকদের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ—যা দিচ্ছিস তাই খাচ্ছে, যা দিচ্ছিস না তা-ও খেয়ে নিচ্ছে। মনে কিচ্ছুতে 'না'টি নেই! একবার চিন্তা করে দ্যাখ প্যালা, মন কত দরাজ হলে—'

আমি বললুম, 'থামো। কাকের হয়ে তোমাকে আর ওকালতি করতে হবে না। আমি যাচ্ছি।

টেনিদা অমনি তার লম্বা হাতখানা বাড়িয়ে ক্যাঁক করে ধরে ফেলল আমাকে। বললে, 'যাবি কোথায়? হতচ্ছাড়া হাবুল সেনের বাড়িতে গিয়ে আড্ডা দিবি, নইলে ক্যাবলার ওখানে গিয়ে ক্যারম খেলবি—এই তো? খবরদার চুপ করে বসে থাক। আজ আমি তোকে কাক সম্পর্কে জ্ঞান—মানে সাধুভাষায় আলোকদান করতে চাই।'

অগত্যা বসে যেতে হল। টেনিদার পাল্লায় একবার পড়লে সহজে আর নিস্তার নেই।

টেনিদা খুব গম্ভীর হয়ে কিছুক্ষণ নাক-টাক চুলকে নিলে। তারপর বললে, 'আমার মোক্ষদা মাসিকে চিনিস?'

বললুম, 'না।'

—'না চিনে ভালোই করেছিস। যাক গে, মোক্ষদা মাসি তো তেলিনীপাড়ায় থাকে। মাসির আর সব ভালো বুঝলি, কিন্তু এন্তার তিলের নাড়ু তৈরি করে আর কেউ গেলেই তাকে খেতে দেয়।'

—'সে তো বেশ কথা।'—আমি শুনে অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করলুম: 'তিলের নাড়ু খেতে তো ভালোই।'

—'ভালোই?'—টেনিদা মুখটাকে বেগুনভাজার মতো করে বললে, 'মোক্ষদা মাসির নাড়ু একবার খেলে বুঝতে পারছিস। কী করে যে বানায় তা মাসিই বলতে পারে। মার্বেলের চাইতেও শক্ত—কামড় দিলে দাঁত একেবারে ঝনঝন করে ওঠে। সকালবেলায় একটা মুখে পুরে নিয়ে চুষতে থাক—সন্ধেবেলা দেখবি ঠিক তেমনটিই বেরিয়ে এসেছে।

'জানলি, ওই তিলের নাড়ুর ভয়েই আমি তেলিনীপাড়ায় যেতে সাহস পাই না। কিন্তু কী বলে—এই বিজয়া-টিজয়া তো আছে, প্রণাম করতে দু'-একবার যেতেই হয়। আর তক্ষুনি তিলের নাড়ু। গোটা আষ্টেক দিয়ে বসিয়ে দেবে। তার ওপর পাহারাওয়ালার মতো ঠায় দাঁড়িয়ে থাকবে—এক-আধটা যে এদিক-ওদিক পাচার করে দিবি, তারও জো-টি নেই। আর তোর মনে হবে, সারাদিন বসে স্রেফ লোহার গোলা চিবুচ্ছিস।

'সেবারও আমার ঠিক এই দশা হয়েছে। মাসি আমাকে তিলের নাড়ু খেতে দিয়েছে, দু'-দুটো ট্রেন ফেল হয়ে গেল—আধখানা নাড়ু কেবল খেতে পেরেছি। মাসি সমানে গল্প করছে—ছাগলের চারটে বাচ্চা হয়েছে, ভোঁদড় এসে রোজ পুকুরের মাছ খেয়ে যাচ্ছে—এই সব। এমনি সময় কী কাজে মাসি উঠে গেল আর উঠনে হাঁ-করে বসে-থাকা একটা কাকের দিকে তক্ষুনি একটা তিলের নাড়ু আমি ছুঁড়ে দিলুম। কাক সেটাকে মুখে করে সামনের জামরুল গাছটায় উড়ে বসল।

'মোক্ষদা মাসি ফিরে এসে আবার ভোঁদড়ের গল্প আরম্ভ করেছে, আর ঠিক এমনি সময় মেসোমশাই ফিরছেন সেই জামরুল গাছের তলা দিয়ে। আর তখন—

'টপাৎ করে একটি আওয়াজ আর 'হাঁইমাই' চিৎকার করে হাত তিনেক লাফিয়ে উঠলেন মেসোমশাই, তারপর স্রেফ শিবনেত্র হয়ে জামরুলতলায় বসে গেলেন।

'আমরা ছুটে গিয়ে দেখি, মেসোমশাইয়ের টাকের ওপরটা ঠিক একটা টোম্যাটোর মতো ফুলে উঠেছে। তখন আন জল—আন পাখা—সে এক হইচই ব্যাপার!

'কী হল বুঝেছিস তো? সেই তিলের নাড়ু! আরে, করাত দিয়ে যা কাটা যায় না, সে চিজ ম্যানেজ করবে কাকে? ঠিক যেন তাক করেই মেসোমশাইয়ের টাকে ফেলে দিয়েছে—একেবারে মোক্ষম ফেল্যা যাকে বলে! একটু সামলে নিয়েই মেসোমশাই মাসিকে নিয়ে পড়লেন। সোজা বাংলায় বললেন, তুমি যদি আর কোনও দিন তিলের নাড়ু বানিয়েছ, তা হলে তক্ষুনি আমি দাড়ি রেখে সন্নিসি হয়ে চলে যাব!

'বুঝলি প্যালা, এইভাবে একটা মহাপ্রাণ কাক মোক্ষদা মাসির সেই মারাত্মক তিলের নাড়ু চিরকালের মতো বন্ধ করে দিলে। তাই তো তোকে বলছিলুম, কাককে কক্ষনো অচ্ছেদ্দা করতে নেই।'

টেনিদার এই বাজে-মার্কা গল্প শুনে আমি বললুম, 'বোগাস! সব বানিয়ে বলছ।'

তাতে দারুণ চটে গেল টেনিদা। আমাকে বিচ্ছিরিভাবে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'বোগাস? তুই এসব কী বুঝবি র‍্যা? তোর মগজে গোবর আছে বললে গোবরেরও প্রেস্টিজ নষ্ট হয়। তেলিনীপাড়ার কাকের গল্প এখনও তো কিছু শুনিসইনি। জানিস, ওই কাকের জন্যেই মেসোমশাই আর তাঁর খুড়তুতো ভাই যদুবাবুর মধ্যে এখন গলায়-গলায় ভাব?'

আমার কৌতূহল হল।

'আগে বুঝি খুব ঝগড়া ছিল ?

'ঝগড়া মানে ? রাম-ঝগড়া যাকে বলে। সেই কোন্‌কালে দু'জনের ভেতরে কী হয়েছিল কে জানে, সেই থেকে কেউ আর কারও মুখ পর্যন্ত দেখেন না। যদুবাবু খুব রসগোল্লা খেতে ভালোবাসেন বলে মেসোমশাই মিষ্টি খাওয়াই ছেড়ে দিয়েছেন—সকালে বিকেলে স্রেফ দু' বাটি করে নিমপাতা বাটা খান। আর মেসোমশাই কোঁচা দুলিয়ে ফিনফিনে ধুতি পরেন বলে যদুবাবু মানে যদু মেসো, মোটা মোটা খাকি হাফ প্যান্ট পরে ঘুরে বেড়ান।

আমি বললুম, 'ব্যাপার তো খুব সাংঘাতিক।'

'সাংঘাতিক বলে সাংঘাতিক ! একেবারে পরিস্থিতি বলতে পারিস। শেষ পর্যন্ত এমন একটা কাণ্ড ঘটে গেল যে দু'জনে লাঠালাঠি হওয়ার জো।

'হয়েছিল কি, মেসোমশাই আর যদু মেসোর দুই বাড়ির সীমানার ঠিক মাঝ-বরাবর একটা কয়েতবেলের গাছ। এদিকে বেল পড়লে এরা কুড়োয়, ওদিকে পড়লে ওরা। একদিন সেই গাছে কোত্থেকে একটা চাঁদিয়াল ঘুড়ি এসে লটকে গেল।

'যদু মেসোর ছেলে পল্টন তো তক্ষুনি কাঠবেড়ালীর মতো গাছে উঠে পড়েছে। আর গাছে কাকের বাসা—নতুন বাচ্চা হয়েছে তাদের, পল্টনকে দেখেই তারা 'খা-খা' করে তেড়ে এল। পল্টন হাঁ-হাঁ করে ওঠবার আগেই তাকে গোটা দশেক রাম ঠোক্কর।

'চাঁদিয়াল ঘুড়ি মাথায় উঠল, 'বাবা রে মা-রে' বলতে বলতে পল্টন গাছ থেকে কাটা-কুমড়োর মতো ধপাৎ ! ভাগ্যিস গাছের নীচে যদুমেসোর একটা খড়ের গাদা ছিল—তাতে পড়ে বেঁচে গেল পল্টন—নইলে হাত-পা আর আস্ত থাকত না।

'মনে রাগ থাকলে—জানিসই তো, বাতাসের গলায় দড়ি দিয়েও ঝগড়া পাকানো যায়। পল্টন ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে কাঁদতে ছুটল বাড়ির দিকে আর লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এলেন যদু মেসো। রাগ হলে তাঁর মুখ দিয়ে হিন্দী বেরোয়, চিৎকার করে তিনি বলতে লাগলেন : "এই, তুমারা কাগ কাহে হামারা ছেলেকে ঠোকরায় দিয়া ?"

'মেসোমশাই-ই বা ছাড়বেন কেন ? তিনিও চেঁচিয়ে বলতে লাগলেন, "ও কাগ হামারা নেহি, তুমারা হ্যায়। তুমি উস্‌কো পুষা হ্যায়।"

"তুমি পুষা হ্যায়।"

"তোম্ পুষা হ্যায়।"

'শেষে দু'জনেই তাল ঠুকে বললেন, "আচ্ছা-আচ্ছা, দেখ্ লেঙ্গা।"

'ওঁরা আর কী দেখবেন, মজা দেখতে লাগল কাকেরাই। মানে নতুন বাচ্চা হয়েছে, তাদের দুটো ভালোমন্দ খাওয়াতে কোন্ বাপ-মা'র ইচ্ছে হয় না—তাই বল্ ? তার ওপর কাগের ছা—রাত্তির-দিন হাঁ করেই রয়েছে, তাদের রাক্ষুসে পেট ভরানোই কি চারটিখানি কথা ? কাজেই পোকামাকড়ে আর শানায় না—বাধ্য হয়েই—কী বলে "না বলিয়া পরের দ্রব্য গ্রহণ" করতে হয় তাদের। ধর—সারা

সকাল খেটে-খুটে মোক্ষদা মাসি এক থালা বড়ি দিয়েছেন, কাকেরা এসে পাঁচ মিনিটে তার থ্রি-ফোর্থ ভ্যানিশ করে দিলে। ওদিকে আবার যদু মেসোর মেয়ে—মানে আমার বুঁচিদি মাছ কুটে পুকুরে ধুতে যাচ্ছে, ঝপাট-ঝপাট খান দুই মাছ তুলে নিয়ে চম্পট !

'কাজেই ঝগড়াটা বেশ পাকিয়ে উঠল। কাক নিশ্চিন্ত কাজ গুছিয়ে যাচ্ছে আর দুই মেসো সমানে এ ওকে শাসাচ্ছেন : দেখ লেঙ্গা—দেখ লেঙ্গা !

'শেষে আমার রিয়্যাল মেসোমশাই ভাবলেন, একবার সরেজমিনে তদন্ত করা যাক। মানে, কয়েতবেল গাছে যে-ডালে কাকের বাসা সেটা তাঁর দিকে না যদু মেসোর দিকে। গুটি গুটি গিয়ে যেই গাছতলায় দাঁড়িয়েছেন, ব্যস।

'অমনি 'খা-খা' করে আওয়াজ, আর টকাস টকাস। মেসোমশাইয়ের মাথায় টাক আছে আগেই বলেছি, সেখানে কয়েকটা ঠোকর পড়তেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালালেন তিনি। আর চিৎকার করে বলতে লাগলেন : কিস্‌কো কাক, এখন আমি বুঝতে পারা হ্যায়।"

'ওদিকে যদু মেসোও ভেবেছেন, কাকের বাসাটা কার দিকে পড়েছে দেখে আসি। যদু মেসো রোগা আর চটপটে, তায় হাফপ্যান্ট পরেন, তিনি সোজা গাছে উঠতে লেগে গেলেন। যেই একটুখানি উঠেছেন—অমনি কাকদের আক্রমণ ! "মেরে ফেললে—মেরে ফেললে—" বলে যদু মেসোও খড়ের গাদায় পড়ে গেলেন, আর চেঁচিয়ে উঠলেন : "কিস্‌কা কাক, এখুনি প্রমাণ হো গিয়া।"

'মেসোমশাই সোজা গিয়ে থানায় হাজির। দারোগাকে বললেন, 'যদু চাটুজ্যের পেট ক্রো আমার ফ্যামিলিকে ঠোকরাচ্ছে, আমার সম্পত্তি নষ্ট করে ফেলছে। আপনি এর বিহিত করুন।"

—"পেট্ ক্রো !"—কিছু বুঝতে না পেরে দারোগা একটা বিষম খেলেন।

—"আজ্ঞে হ্যাঁ, পোষা কাক। যদু চাটুজ্জের পোষা কাক।"

দারোগা বললেন, "ইম্‌পসিব্‌ল ! কাক কখনও পোষ মানে ? কাক কারও পোষা হতে পারে ?"

'মেসোমশাই বললেন, "পারে স্যার। আপনি ওই ধড়িবাজ যদু চাটুজ্যেকে জানেন না। ওর অসাধ্য কাজ নেই।"

'দারোগা তখন কান পেতে সব শুনলেন। তারপর মুচকে হেসে বললেন, "আচ্ছা, আপনি এখন বাড়ি যান। আমি বিকেলে আপনার ওখানে যাব তদন্ত করতে।"

'মেসোমশাই বেরিয়ে যেতে না যেতেই যদু মেসো গিয়ে দারোগার কাছে হাজির।

"স্যার, মধু চাটুজ্যে কয়েতবেল গাছে কাক পুষেছে আমার সঙ্গে শত্রুতা করবার জন্যে। সেই কাকের উপদ্রবে আমি ধনে-প্রাণে মারা গেলুম।"

'দারোগা ভুরু কুঁচকে বললেন, "পেট্ ক্রো ?"

"নির্ঘাত !"

'দারোগা যদু মেসোর কথাও সব শুনলেন। তারপর বললেন, "ঠিক আছে। আমি বিকেলে যাব আপনার ওখানে তদন্ত করতে।"

'বাড়ি ফিরে দুই মেসোই সমানে এ-ওকে শাসাতে লাগলেন : "আজ বিকালে পুলিশ আয়েগা, তখন বোঝা যাবে কোন কাক পুষা হ্যায়।"

'দারোগা এসে প্রথমেই মেসোমশাই—অর্থাৎ মধু চাটুজ্যের বাড়িতে ঢুকলেন। মেসোমশাই তাঁকে আদর করে বসালেন, খুব করে চা আর ওমলেট খাওয়ালেন, কাকের বিশদ বিবরণ দিলেন। তারপর বললেন, "ও সব যদু চাটুজ্যের শয়তানি। দেখুন না, দুপুরবেলা ছাতে আমার গিন্নী শুকনো লঙ্কা রোদে দিয়েছিলেন, তার অদ্ধেক ওর কাকে নিয়ে গেছে।"

'দারোগা বললেন, "চলুন, ছাতে যাই।"

'কিন্তু ছাতে যেতেই দেখা গেল, তার এক কোণে ছোট একটা রুপোর ঝিনুক চিকচিক করছে।

'দারোগা সেটা কুড়িয়ে নিয়ে বললেন, "এ ঝিনুক কার ? আপনার বাড়িতে তো কোনও বাচ্চা ছেলেপুলে নেই।"

'মোক্ষদা মাসি ঝাঁ করে বলে ফেললেন, "ওটা ঠাকুরপোর ছোট ছেলে লোটনের, মুখপোড়া কাগে নিয়ে এসেছে।"

'শুনেই, দারোগা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন।

"বটে ! ও-বাড়ি থেকে রূপোর ঝিনুক এনে আপনার ছাতে ফেলেছে ! তবে তো এ কাক আপনার। দাঁড়ান—দেখাচ্ছি আপনাকে—"

'মেসোমশাই হাঁউমাউ করে উঠলেন, কিন্তু দারোগা কোনও কথা শুনলেন না। তক্ষুনি হনহনিয়ে চলে গেলেন যদু মেসোর বাড়িতে।

'ও-বাড়ির মাসি পুলিপিঠে তৈরি করে রেখেছিলেন, আদর করে দারোগাকে খেতে দিলেন। আর সেই ফাঁকে যদু মেসো সবিস্তারে বলে যেতে লাগলেন, মধু চাটুজ্যের কাকের জ্বালায় তিনি আর তিষ্ঠোতে পারছেন না।

'তক্ষুনি—ঠন্-ঠনাৎ ! দারোগার সামনেই যেন আকাশ থেকে একটা চামচে এসে পড়ল।

'দারোগা বললেন, "এ কা'র চামচে ?"

'যদু মেসো বলতে যাচ্ছিলেন, "আমারই স্যার"—কিন্তু পেল্লায় এক ধমকে দারোগা থামিয়ে দিলেন তাঁকে। বললেন, "শাট আপ—আমার সঙ্গে চালাকি ? ওই চামচে দিয়ে আমি মধুবাবুর ওখানে ওমলেট খেয়ে এলুম—এখনও লেগে রয়েছে। তা হলে কাক তো আপনারই—আপনিই তো তাকে চুরি করতে পাঠান। দাঁড়ান—দেখাচ্ছি—"

'যদু মেসোর দাঁত-কপাটি লাগার উপক্রম ! দারোগা হনহনিয়ে চলে গেলেন। তারপর পুলিশ পাঠিয়ে দুই মেসোকে থানায় নিয়ে গেলেন। বলির পাঁঠার মতো দাঁড়িয়ে রইলেন দু'জন।

'দারোগা চোখ পাকিয়ে বললেন, "এ ওর নামে নালিশ করবেন আর ?"

'দুই ভাই একসঙ্গে বললেন, "না—না।"

"কোনওদিন আর ঝগড়া-ঝাঁটি করবেন ?"

"না স্যার, কক্ষনো না।"

"তা হলে বলুন, ভাই-ভাই এক ঠাঁই।"

'ওঁরা বললেন, "ভাই-ভাই এক ঠাঁই।"

"এ ওকে আলিঙ্গন করুন।"

'দু'জনে পরস্পরকে জাপটে ধরলেন—প্রাণের দায়েই ধরলেন। আর মোটা মেসোমশাইয়ের চাপে রোগা যদু মেসোর চোখ কপালে উঠে গেল।

'তারপর ? তারপর থেকে দু'ভাই প্রাণের প্রাণ। কী যে ভালোবাসা—সে আর তোকে কী বলব প্যালা ! তাই বলছিলুম, কাক অতি মহৎ-হৃদয় প্রাণী, পৃথিবীর অনেক ভালো সে করে থাকে—তাকে ছুঁচো-টুচো বলতে নেই।'

গল্প শেষ করে টেনিদা আমাকে দিয়ে দু' আনার আলুর চপ আনাল। একটু ভেঙে যেই মুখে দিয়েছে, অমনি—

অমনি ঝপাট !

কাক এসে ঠোঙা থেকে একখানা আলুর চপ তুলে নিয়ে চম্পট।

অতি মহৎ-হৃদয় প্রাণী—সন্দেহ কী।

ক্রিকেট মানে ঝিঁঝি

ডেসিম্যালের পরে আবার একটা ভেঙ্কুলাম, তার সঙ্গে ভগ্নাংশ। এমন জটিল জিনিসকে সরল করা অন্তত আমার কাজ নয়। পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খাই—এ-সব গোলমালের মধ্যে পা বাড়িয়ে আমার কী দরকার ?

পণ্ডিতমশায় যখন দাঁত খিচিয়ে লুট-লুঙকে মাথায় ঢোকাতে চেষ্টা করেন, তখন আমি আকুলভাবে 'ঘিনুন' আর 'আলু' প্রত্যয়ের কথা ভাবতে থাকি। ওর সঙ্গে যদি 'দাদখানি চাল' প্রত্যয় থাকত—তাহলে আর কোনও দুঃখ থাকত না। তবে 'চাঁটি' আর 'গাঁট্টা' প্রত্যয়গুলো বাদ দেওয়া দরকার বলেই আমার ধারণা।

কিন্তু অঙ্ক আর সংস্কৃতর ধাক্কা যদি বা সামলানো যায়—ক্রিকেট খেলা ব্যাপারটা আমার কাছে স্রেফ রহস্যের খাসমহল। 'ক্রিকেট' মানে কী ? বোধহয় ঝিঁঝি ? দুপুরের কাঠফাটা রোদ্দুরে চাঁদিতে ফোস্কা পড়িয়ে ও-সব ঝিঁঝি খেলা আমার ভালো লাগে না। মাথার ভেতরে ঝিঁঝি করতে থাকে আর মনে হয়—মস্ত একটা হাঁ করে কাছে কেউ ঝিঁঝিট খাম্বাজ গাইছে। অবশ্য ঝিঁঝিট খাম্বাজ কী আমার জানা নেই—তবে আমার মনে হয়, ক্রিকেট অর্থাৎ ঝিঁঝি খেলার মতোই সেটাও

ভয়াবহ।

অথচ কী গেরো দ্যাখো! পটলডাঙার থান্ডার ক্লাবের পক্ষ থেকে আমাকেই ক্রিকেট খেলতে হচ্ছে। গোড়াতেই কিন্তু বলে দিয়েছিলুম—ও-সব আমার আসে না। আমি খুব ভালো 'চিয়ার আপ' করতে পারি, দু'-এক গেলাস লেমন স্কোয়াশও নয় খাব ওদের সঙ্গে—এমন কি লাঞ্চ খেতে ডাকলেও আপত্তি করব না। কিন্তু ও-সব খেলা-টেলার ভেতরে আমি নেই—প্রাণ গেলেও না।

কিন্তু প্রাণ যাওয়ার আগেই কান যাওয়ার জো! আমাদের পটলডাঙার টেনিদাকে মনে আছে তো? সেই—খাঁড়ার মতো উঁচু নাক আর রণডম্বরুর মতো গলা—যার চরিতকথা তোমাদের অনেকবার শুনিয়েছি? সেই টেনিদা হঠাৎ গাঁক-গাঁক করে তার আধ মাইল লম্বা হাতখানা আমার কানের দিকে বাড়িয়ে দিলে।

—খেলবিনে মানে? খেলতেই হবে তোকে। বল করবি—ব্যাট করবি—ফিল্ডিং করবি—ধাঁই করে আছাড় খাবি—মানে যা-যা দরকার সবই করবি। সই না করিস, তোর ওই গাধার মতো লম্বা-লম্বা কানদুটো একেবারে গোড়া থেকে উপড়ে নেব—এই পাকা কথা বলে দিলুম।

গণ্ডারের মতো নাকের চাইতে গাধার কান ঢের ভালো, আমি মনে-মনে বললাম। গণ্ডারের নাক মানে লোককে গুঁতিয়ে বেড়ানো, কিন্তু গাধার কান ঢের কাজে লাগে—অন্তত চটপট করে মশা-মাছি তো তাড়ানো যায়!

কিন্তু সেই কানদুটোকে টেনিদার হাতে বেহাত হতে দিতে আমার আপত্তি আছে। কী করি, খেলতে রাজি হয়ে গেলাম।

তা, প্যান্ট-ট্যান্ট পরতে নেহাত মন্দ লাগে না। বেশ কায়দা করে বুক চিতিয়ে হাঁটছি, হঠাৎ হতভাগা ক্যাবলা বললে, তোকে খাসা দেখাচ্ছে প্যালা!

—সত্যি?

একগাল হেসে ওকে একটা চকোলেট দিতে যাচ্ছি, সঙ্গে-সঙ্গে বলে ফেললে—বেগুনখেতে কাকতাড়ুয়া দেখেছিস? ওই যে, মাথায় কেলে হাঁড়ি পরে দাঁড়িয়ে থাকে? হুবহু তেমনি মনে হচ্ছে তোকে। আমি ক্যাবলাকে একটা চাঁটি দিতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু তার আর দরকার হল না। হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বললে—'আর তোরে ক্যামন দেখাইতে আছে? তুই তো বজ্রবাঁটুল—পেন্টুল পইর‍্যা য্যান চালকুমড়া সাজছস।'

ক্যাবলা স্পিকটি নট। একেবারে মুখের মতো। আমি খুশি হয়ে চকোলেটটা হাবুল সেনকেই দিয়ে দিলাম।

হঠাৎ ক্যাপ্টেন টেনিদার হুঙ্কার শোনা গেল—এখনও দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ভ্যারেণ্ডা ভাজছিস প্যালা? প্যাড পর—দস্তানা পর—তোকে আর ক্যাবলাকেই যে আগে ব্যাট করতে হবে।

আমাকে দিয়েই শুরু! পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলেটা ধপাৎ করে লাফিয়ে উঠল একবার।

টেনিদা বললে, ঘাবড়াচ্ছিস কেন? যেই বল আসবে ঠাঁই করে পিটিয়ে দিবি। অ্যায়সা হাঁকড়াবি যে এক বলেই ওভার-বাউন্ডারি—পারবি না?

—পারা যাবে বোধহয়—কান-টান চুলকে আমি জবাব দিলাম।

—বোধহয় নয়, পারতেই হবে। তাড়াতাড়ি যদি আউট হয়ে যাস, তোকে আর আমি আস্ত রাখব না। মনে থাকবে?

এর মধ্যে হাবুল সেন আমার পায়ে আবার প্যাড পরিয়ে দিয়েছে, সেইটে পরে, হাতে ব্যাট নিয়ে দেখি নড়াচড়া করাই শক্ত!

কাতর স্বরে বললাম: হাঁটতেই পারছি না যে! খেলব কী করে?

—তুই হাঁটতে না পারলে আমার বয়েই গেল! টেনিদা বিচ্ছিরি রকম মুখ ভ্যাংচাল: বল মারতে পারলে আর রান নিতে পারলেই হল।

—বা রে, হাঁটতেই যদি না পারি, তবে রান নেব কেমন করে?

—মিথ্যে বকাসনি প্যালা—মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে আমার। হাঁটতে না পারলে দৌড়নো যায় না? কেন যায় না—শুনি? তাহলে মাথা না থাকলেও কী করে মাথাব্যথা হয়? নাক না ডাকলেও লোকে ঘুমোয় কী করে? যা—যা, বেশি ক্যাঁচম্যাচ করিসনি! মাঠে নেমে পড়।

একেবারে মোক্ষম যুক্তি।

নামতেই হল অগত্যা। খালি মনে-মনে ভাবছি প্যাড-ফ্যাড সুদ্ধু পড়ে না যাই! ব্যাটটাকে মনে হচ্ছে ভীমের গদার মতো ভারি—আগে থেকেই তো কব্জি টনটন করছে! আমি ওটাকে হাঁকড়াব না ওটাই আমায় আগে হাঁকড়ে দেবে—সেইটেই ঠাহর করতে পারছি না।

তাকিয়ে দেখি, পিছনে আর দু'পাশে খালি চোরবাগান টাইগার ক্লাব। ওদের সঙ্গেই ম্যাচ কিনা।

কিন্তু এ আবার কী রকম ঝিঝি খেলা? ফুটবল তো দেখেছি সমানে-সমানে লড়াই—এ-ওর পায়ে ল্যাং মারছে—সে তার মাথায় ঢুঁ মারছে—আর বল সিধে এসপার ওসপার করবার জন্যে দুই গোলকিপার দাঁড়িয়ে আছে ঘুঘুর মতো। এ-পক্ষের একটা চিত হলে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গে ও-পক্ষের আর-একটা কাত। সে একরকম মন্দ নয়।

কিন্তু এ কী কাপুরুষতা। আমাদের দু'জনকে কায়দা করবার জন্যে ওরা এগারো জন! সেইসঙ্গে আবার দুটো আমপায়ার। তাদের পেটে-পেটে যে কী মতলব তা-ই বা কে জানে! আমপায়ারদের গোল-গোল চোখ দেখে আমার তো প্রায় ভ্যামপায়ার বলে সন্দেহ হল!

তারপরে লোকগুলোর দাঁড়িয়ে থাকার ধরন দ্যাখো একবার। কেমন নাড়ুগোপালের মতো নুলো বাড়িয়ে উবু হয়ে আছে—যেন হরির লুটের বাতাসা ধরবে। সব দেখে-শুনে আমার রীতিমতো বিচ্ছিরি লাগল।

এই রে—বল ছোড়ে যে! ব্যাট নিয়ে হাঁকড়াতে যাব—প্যাড-ট্যাড নিয়ে উলটে পড়ি আর কি। বলটা কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল দমদম বুলেটের

মতো—একটু হলেই কানটা উড়িয়ে নিত। একটা ফাঁড়া তো কাটল। কিন্তু ও কী ? আবার ছোড়ে যে !

জয় মা ফিরিঙ্গি পাড়ার ফিরিঙ্গি কালী। যা-হোক একটা-কিছু এবার হয়ে যাবে! বলি দেবার খাঁড়ার মতো ব্যাটটাকে মাথার ওপর তুলে হাঁকিয়ে দিলাম। বলে লাগল না...স্রেফ পড়ল আমার হাঁটুর ওপরে। নিজের ব্যাটাঘাতে 'বাপ্‌রে' বলে বসে পড়তেই দেখি, বলের চোটে স্টাম্প-ফাম্পগুলো কোথায় উড়ে বেরিয়ে গেছে।

—আউট—আউট!

চারিদিকে বেদম চিৎকার। আমপায়ার আবার মাথার ওপরে একটা হাত তুলে জগাই-মাধাইয়ের মতো দাঁড়িয়ে।

কে আউট হল ? ক্যাবলা বোধহয় ? আমি তক্ষুনি জানতাম, আমাকে কাকতাড়ুয়া বলে গাল দিয়েছে—আউট না হয়ে যায় কোথায় !

হাঁটুর চোটটা সামলে নিয়ে ব্যাট দিয়ে স্টাম্পগুলো সব ঠিক করতে যাচ্ছি—হঠাৎ হতচ্ছাড়া আমপায়ার বলে বসল—তুমি আউট, চলে যাও।

আউট ? বললেই হল ? আউট হবার জন্যেই এত কষ্ট করে প্যাড আর পেন্টলুন পরেছি নাকি ? আচ্ছা দ্যাখো একবার ! বয়ে গেছে আমার আউট হতে।

বললাম, আমি আউট হব না। এখন আউট হবার কোনও দরকার দেখছি না আমি।

আমি ঠিক বুঝেছিলাম ওরা আমপায়ার নয়, ভ্যামপায়ার। কুইনিন চিবোনোর মতো যাচ্ছেতাই মুখ করে বললে : দরকার না থাকলেও তুমি আউট হয়ে গেছ। স্টাম্প পড়ে গেছে তোমার।

—পড়ে গেছে তো কী হয়েছে—আমি রেগে বললাম, আবার দাঁড় করিয়ে দিতে কতক্ষণ ? ও-সব চালাকি চলবে না স্যার—এখনও আমার ওভার-বাউন্ডারি করা হয়নি !

কেন জানি না, চারিদিকে ভারি যাচ্ছেতাই একটা গোলমাল শুরু হয়ে গেল। চোরবাগান ক্লাবের লোকগুলোই বা কেন যে এ-রকম দাপাদাপি করছে, আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।

তার মধ্যে আবার চালকুমড়ো ক্যাবলাটা ছুটে এল ওদিক থেকে।

—চলে যা—চলে যা প্যালা ! তুই আউট হয়ে গেছিস।

আর কতক্ষণ ধৈর্য থাকে এ-অবস্থায় ? আমি চেঁচিয়ে বললাম, তোর ইচ্ছে থাকে তুই আউট হ-গে ! আমি এখন ওভার-বাউন্ডারি করব !

আমার কানের কাছে সবাই মিলে তখন সমানে কিচির-মিচির করছে। আমি কান দিতাম না—যদি না কটাং করে আমার কানে টান পড়ত।

তাকিয়ে দেখি—টেনিদা।

ধাঁই করে আমার কাছ থেকে ব্যাট নিয়ে কানে একটা চিড়িং মেরে দিল—তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

—যা—যা উল্লুক ! বেরো মাঠ থেকে। খুব ওস্তাদি হয়েছে, আর নয়।

রামছাগলের মতো মুখ করে অগত্যা আমায় চলে যেতে হল। মনে-মনে বললাম, আমাকে আউট করা ! আউট কাকে বলে সে আমি দেখিয়ে দেব !

গিয়ে তো বসলাম—কিন্তু কী তাজ্জব কাণ্ড ! আমাদের দেখিয়ে দেবার আগেই চোরাবাগানের টাইগার ক্লাব আউট দেখিয়ে দিচ্ছে। কাররও স্টাম্প উল্টে পড়েছে, পিছনে যে লোকটা কাঙালি-বিদায়ের মতো করে হাত বাড়িয়ে বসে আছে, সে আবার খুট্‌স করে স্টাম্প লাগিয়ে দিচ্ছে। কেউ বা মারবার সঙ্গে-সঙ্গেই লাফিয়ে উঠে বল লুফে নিচ্ছে। খালি আউট—আউট—আউট। এ আবার কী কাণ্ড রে বাবা !

আমাদের পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাব ব্যাট বগলে যাচ্ছে আর আসছে। এমন যে ডাকসাইটে টেনিদা, তারও বল একটা রোগাপটকা ছেলে কটাৎ করে পাকড়ে নিলে। হবেই তো ! এদিকে মোটে দু'জন—ওদিকে এগারো, সেইসঙ্গে আবার দু'টো আমপায়ার। কোন্ ভদ্দরলোকে ঝিঁঝি খেলতে পারে কখনও !

ওই চালকুমড়ো ক্যাবলাটাই টিকে রইল শেষতক। কুড়ি না একুশ রান করল বোধহয়। পঞ্চাশ রান না পেরুতেই পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাব বেমালুম সাফ।

এইবার আমাদের পালা। ভারি খুশি হল মনটা। আমরা এগারো জন এবারে তোমাদের নিয়ে পড়ব। আমপায়ার দুটোও দেখি ওদের দল ছেড়ে আমাদের সঙ্গে এসে ভিড়েছে। কিন্তু ওদের মতলব ভালো নয় বলেই আমার বোধ হল।

ক্যাপ্টেন টেনিদাকে বললাম, আমপায়ার দুটোকে বাদ দিলে হয় না ? ওরা নয় ওদের সঙ্গেই ব্যাট করুক।

টেনিদা আমাকে রদ্দা মারতে এল। বললে, বেশি ওস্তাদি করিসনি প্যালা ? ওখানে দাঁড়া। একটা ক্যাচ ফেলেছিস কি ঘ্যাঁচ করে কান কেটে দেব। ব্যাট তো খুব করেছিস—এবার যদি ঠিকমতো ফিল্ডিং করতে না পারিস, তা হলে তোর পালাজ্বরের পিলে আমি আস্ত রাখব না !

হাবুল সেন বল করতে গেল।

প্রথম বলেই—ওরে বাপ রে ! টাইগার ক্লাবের সেই রোগা ছোকরাটা কী একখানা হাঁকড়ালে ! বোঁ করে বল বেরিয়ে গেল, একদম বাউন্ডারি। ক্যাবলা প্রাণপণে ছুটেও রুখতে পারলে না।

পরের বলেও আবার সেই হাঁকড়ানি। তাকিয়ে দেখি, কামানের গুলির মতো বলটা আমার দিকেই ছুটে আসছে।

একটু দূরেই ছিল আমাদের পাঁচুগোপাল। চেঁচিয়ে বললে, প্যালা—ক্যাচ—ক্যাচ—

—ক্যাচ ! ক্যাচ ! দূরে দাঁড়িয়ে ও-রকম সবাই-ই ফ্যাঁচফ্যাঁচ করতে পারে ! ওই বল ধরতে গিয়ে আমি মরি আর-কি ! তার চাইতে বললেই হয়, পাঞ্জাব মেল ছুটছে প্যালা লুফে নে ? মাথা নিচু করে আমি চুপ করে বসে পড়লাম—আবার বল বাউন্ডারি পার।

হইহই করে টেনিদা ছুটে এল।

—ধরলিনে যে ?

—ও ধরা যায় না।

—ধরা যায় না ? ইস—এমন চমৎকার ক্যাচটা, এক্ষুনি আউট হয়ে যেত !

—সবাইকে আউট করে লাভ কী ? তা হলে খেলবে কে ? আমরাই তো আউট হয়ে গেছি—এখন খেলুক না ওরা !

—খেলুক না ওরা !—টেনিদা ভেংচি কাটল—তোর মতো গাড়লকে খেলায় নামানোই আমার ভুল হয়েছে ! যা—যা—বাউন্ডারি লাইনে চলে যা !

চলে গেলাম। আমার কী ! বসে-বসে ঘাসের শিষ চিবুচ্ছি। দুটো-একটা বল এদিক-ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল, ধরার চেষ্টা করেও দেখলাম। বোঝা গেল, ও-সব ধরা যায় না। হাতের তলা দিয়ে যেমন শোলমাছ গলে যায়—তেমনি সুড়ুৎ-সুড়ুৎ করে পিছলে বাউন্ডারি লাইন পেরিয়ে যেতে লাগল।

আর শাবাশ বলতে হবে চোরাবাগান টাইগার ক্লাবের ওই রোগা ছোকরাকে ! ডাইনে মারছে, বাঁয়ে মারছে, চটাং করে মারছে, সাঁই করে মারছে, ধাঁই করে মারছে ! একটা বলও বাদ যাচ্ছে না। এর মধ্যেই বেয়াল্লিশ রান করে ফেলেছে একাই। দেখে ভীষণ ভালো লাগল আমার। পকেটে চকোলেট থাকলে দুটো ওকে আমি খেতে দিতাম।

হঠাৎ বল নিয়ে টেনিদা আমার কাছে হাজির।

—ব্যাটিং দেখলাম, ফিল্ডিংও দেখছি। বল করতে পারবি ?

এতক্ষণ ঝিঁঝি খেলা দেখে আমার মনে হয়েছিল—বল করাটাই সবচেয়ে সোজা। একপায়ে দাঁড়িয়ে উঠলাম—খুব পারব। এ আর শক্তটা কী ?

—ওদের ওই রোগাপটকা গোসাঁইকে আউট করা চাই। পারবিনে ?

—এক্ষুনি আউট করে দিচ্ছি—কিছু ভেবো না।

আমি আগেই জানি, আমপায়ার-দু'টোর মতলব খারাপ। সেইজন্যেই আমাদের দল থেকে ওদের বাদ দিতে বলেছিলাম—টেনিদা কথাটা কানে তুলল না। যেই প্রথম বলটা দিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে বললে—নো বল !

নো বল তো নো বল—তোদের কী ! বলতেও যাচ্ছিলাম, কিন্তু গোসাঁই দেখি আবার ধাঁই করে হাঁকড়ে দিয়েছে, বাউন্ডারি তো তুচ্ছ—একেবারে ওভার-বাউন্ডারি !

আর চোরাবাগান টাইগার ক্লাবের সে কী হাততালি। একজন তো দেখলাম আনন্দে ডিগবাজি খাচ্ছে।

এইবার আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে আগুন জ্বলে গেল। মাথায় টিকি নেই—যদি থাকত, নিশ্চয় তেজে রেফের মতো খাড়া হয়ে উঠত। বটে—ডিগবাজি ! আচ্ছা—দাঁড়াও। বল হাতে ফিরে যেতেই ঠিক করলাম—এবার গোসাঁইকে একেবারে আউট করে দেব। মোক্ষম আউট।

প্যাডটা বোধহয় ঢিলে হয়ে গেছে—গোসাঁই পিছন ফিরে সেটা বাঁধছিল।

দেখলাম, এই সুযোগ। ব্যাট নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়ালে কিছু করতে পারব না—এই সুযোগেই কর্ণবধ।

মামার বাড়িতে আম পেড়ে পেড়ে হাতের টিপ হয়ে গেছে—আর ভুল হল না। আমপায়ার না ভ্যামপায়ার হাঁ-হাঁ করে ওঠবার আগেই বোঁ করে বল ছুঁড়ে দিলাম।

নির্ঘাত লক্ষ্য ! গোসাঁইয়ের মাথায় গিয়ে খটাং করে বল লাগল। সঙ্গে-সঙ্গেই—'ওরে বাবা !' গোসাঁই মাঠের মধ্যে ফ্ল্যাট !

আউট যাকে বলে ! অন্তত এক হপ্তার জন্যে বিছানায় আউট।

আরে—এ কী, এ কী ! মাঠসুদ্ধ লোক তেড়ে আসছে যে। 'মার মার' করে আওয়াজ উঠছে যে ! অ্যাঁ—আমাকেই নাকি ?

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম। কান ঝিঁঝি করছে, প্রাণপণে ছুটতে-ছুটতে এবারে টের পাচ্ছি—আসল ঝিঁঝি খেলা কাকে বলে !

পরের উপকার করিও না

আমি প্যালারাম, ক্যাবলা আর হাবুল সেন—তিনজনে নেহাত গো-বেচারার মতো কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছি। তাকিয়ে আছি কাঠগড়ার আসামীর দিকে। তার মুখ আমাদের চেয়েও করুণ। ছ' ফুট লম্বা অমন জোয়ানটা ভয়ে কেন্নোর মতো কুঁকড়ে গেছে। গণ্ডারের খাঁড়ার মতো খাড়া নাকটাও যেন চেপসে গেছে একটা থ্যাবড়া ব্যাংয়ের মতো। সাধুভাষায় যাকে বলে, দস্তুরমতো পরিস্থিতি !

কে আসামী ?

আর কে হতে পারে ? আমাদের পটলডাঙার সেই স্বনামধন্য টেনিদা। গড়ের মাঠের গোরা ঠ্যাঙানোর সেই প্রচণ্ড প্রতাপ এখন একটা চায়ের কাপের মতো ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে। চায়ের কাপ না বলে চিরতার গেলাসও বলতে পারা যায় বোধহয়।

—হুজুর ধর্মাবতার—

ফরিয়াদি পক্ষের উকিল লাফিয়ে উঠলেন। মনে হল যেন হাত দশেক ছিটকে উঠল একটা কুড়ি-নম্বরী ফুটবল। গলার আওয়াজ তো নয়—যেন আট-দশটা চীনে-পটকা ফাটল একসঙ্গে। ধর্মাবতার চেয়ারের ওপর আঁতকে উঠে পড়তে পড়তে সামলে গেলেন।

—অমন বাজখাঁই গলায় চেঁচাবেন না মশাই, পিলে চমকে যায়।—জজ সাহেব ভ্রূ কোঁচকালেন : কী বলতে হয় ঝটপট বলে ফেলুন।

উকিল একটা ঘুষি বাগিয়ে তাকালেন টেনিদার দিকে। একরাশ কালো কালো আলপিনের মতো গোঁফগুলো তাঁর খাড়া হয়ে উঠল।

—ধর্মাবতার, আসামী ভজহরি মুখুজ্যে (আমাদের টেনিদা) কী অন্যায় করেছে, তা আপনি শুনেছেন। অবোলা জীবের ওপর ভীষণ অত্যাচার সে করেছে, তার নিন্দের ভাষা নেই। একটা ছাগল পরশু থেকে কাঁচা ঘাস পর্যন্ত হজম করতে পারছে না। আর-একটা সমানে বমি করছে। আর-একটা তিন দিন ধরে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে—ফরিয়াদির একটা ট্যাঁক-ঘড়ি সুদ্ধু চিবিয়ে ফেলেছে!

রোগা সিঁটকে একটা লোক, হলধর পালুই—সে-ই ফরিয়াদি। হলধর ফোঁস-ফোঁস করে কাঁদতে লাগল।

—খুব ভালো ঘড়ি ছিল হুজুর—কী শক্ত! আমার ছেলে ওইটে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আম পাড়ত। চলত না বটে, তবু ঘড়ির মতো ঘড়ি ছিল একটা!—বলে, হলধর এবার ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল। কান্নার বেগ একটু কমলে বললে, ঘড়ি না-হয় যাক হুজুর, কিন্তু আমার অমন তিনটে ছাগল। বুঝি পাগল হয়ে গেল হুজুর—একেবারে উদ্দাম পাগল!

জজ কানে একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চুলকোতে চুলকোতে বিরক্ত মুখে বললেন, আঃ—জ্বালাতন! আরে বাপু, তুমি তো দেখছি একটা ছাগল। ছাগল কখনও পাগল হয়? সে যাক, অপরাধের গুরুত্ব চিন্তা করে আমি আসামী ভজহরি মুখুজ্যেকে তিন টাকা জরিমানা করলাম। এই তিন টাকা ফরিয়াদি হলধর পালুইকে দেওয়া হবে তার ছাগলদের রসগোল্লা খাওয়াবার জন্যে।

জজ উঠে পড়লেন।

টেনিদা আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ভাবটা এই : এ-যাত্রা তরিয়ে দে! আমার ট্যাঁক তো গড়ের মাঠ।

আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন—'চার মূর্তি'র তিন মূর্তি—চাঁদা করে তিন টাকা জমা দিয়ে টেনিদাকে খালাস করে আনলাম।

নিঃশব্দে চারজনে পথ দিয়ে চলেছি। কে যে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

খানিক পরে আমি বললাম, খুব ফাঁড়া কেটে গেছে।

ক্যাবলা বললে, হ্যাঁ—জেল হয়ে যেতে পারত!

হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, হ, দ্বীপান্তরও হইতে পারত। একটা ছাগলা যদি মইর‍্যা যাইতগা, তাইলে ফাঁসি হওনই বা আশ্চর্য আছিল কী।

এতক্ষণ পরে টেনিদা গাঁকগাঁক করে উঠল : চুপ কর,, মেলা বাজে বকিসনি। ইঃ, ফাঁসি! ফাঁসি হওয়া মুখের কথা কিনা!

আবার নিস্তব্ধতা। টেনিদার পেছু-পেছু আমরা গড়ের মাঠের দিকে এগিয়ে চললাম। খানিক পরে আমিই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, চানাচুর খাবে টেনিদা?

—নাঃ—টেনিদার মুখে-মুখে একটা গভীর বৈরাগ্য।

—আইসক্রিম কিনুম?—হাবুল সেনের প্রশ্ন।

—কিচ্ছু না।—টেনিদা একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : মন খিঁচড়ে গেছে—বুঝলি প্যালা। সংসারে কারও উপকার করতে নেই।

আমি বললাম, নিশ্চয় না।

—উপকারীকে বাঘে খায়।—ক্যাবলা বললে।

আমার মনের কথাটা বলে দিয়েছিস—বলে টেনিদা ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে ক্যাবলা 'উঃ উঃ,' করে উঠল।

হাবুল বললে, বিনা উপকারেই যখন পৃথিবী চলতে আছে, তখন উপকার করতে গিয়ে খামকা ঝামেলা বাড়াইয়া হইব কী?

—যা কইছস!—মনের আবেগে টেনিদা এবার হাবুলের ভাষাতেই হাবুলকে সমর্থন জানাল। তারপর গর্জন করে বললে, আমি আর-একখানা নতুন বর্ণ-পরিচয় লিখব। তার প্রথম পাঠ থাকবে : কখনও পরের উপকার করিও না।

ক্যাবলা বললে, সাধু, সাধু।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, সাধু! খবরদার—সাধু-ফাধুর নাম আমার কাছে আর করবিনে। যদি ব্যাটাকে পাই—বলে, প্রচণ্ড একটা ঘুষি হাঁকাল আকাশের দিকে।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি গোড়া থেকে।

মানুষের অনেক রকম রোগ হয় : কালাজ্বর, পালাজ্বর, নিমোনিয়া, কলেরা, পেটফাঁপা—এমনকি ঝিনঝিনিয়া পর্যন্ত। সব রোগের ওষুধ আছে, কিন্তু একটি রোগের নেই। সে হল পরোপকার। যখন চাগায় তখন অন্য লোকের প্রাণান্ত করে ছাড়ে।

টেনিদাকে একদিন এই রোগে ধরল। ছিল বেশ, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছিল-দাচ্ছিল, বাঁশি বাজাচ্ছিল। হঠাৎ কী যে হল—কালীঘাটের এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

হাতে চিমটে, মাথায় জটা, লেংটি পরা এক বিরাটকায় সাধু। খানিকক্ষণ কটমট করে টেনিদার দিকে তাকিয়ে হেঁড়ে গলায় বললে, দে পাঁচসিকে পয়সা।

পাঁচসিকে পয়সা! টেনিদা বলতে যাচ্ছিল, ইয়ার্কি নাকি! কিন্তু সাধুর বিশাল চেহারা, বিরাট চিমটে আর জবাফুলের মতো চোখ দেখে ভেবড়ে গেল। তো-তো করে বললে, পাঁচসিকে তো নেই বাবা, আনা-সাতেক হবে।

—আনা-সাতেক? আচ্ছা তাই দে, আর একটা বিড়ি।

—বিড়ি তো আমরা খাইনে বাবাঠাকুর।

—হুঁ, গুড-বয় দেখছি। তা বেশ। বিড়ি-ফিড়ি কক্ষনো খাসনি—ওতে যক্ষ্মা হয়। যাক—পয়সাই দে।

পয়সা হাতে পেয়ে সাধুর হাঁড়ির মতো মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। ঝুলি থেকে একটা জবা ফুল বের করে টেনিদার মাথায় দিয়ে বললে, তুই এখানে কেন রে?

—আজ্ঞে প্যাঁড়া খেতে এসেছিলাম।

সাধু বললে, তা বলছি না। তুই যে মহাপুরুষ রে। তোকে দেখে মনে হচ্ছে, পরোপকার করে তুই দেশজোড়া নাম করবি।

—পরোপকার।—টেনিদা একটা ঢোক গিলে বললে, দুনিয়ায় অনেক সৎকাজ

করেছি বাবা। মারামারি, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়া, ইস্কুলের সেকেন্ড পণ্ডিতের টিকি কেটে নেওয়া—কিন্তু কখনও তো পরোপকার করিনি!

—করিসনি মানে?—সাধু হেঁড়ে গলায় বললে, তুই ছোকরা তো বড্ড এঁড়ে তক্কো করিস। এই আমাকে নগদ সাত আনা পয়সা দিলি, খেয়াল নেই বুঝি? আমার কথা শোন। সংসার-টংসার ছেড়ে স্রেফ হাওয়া হয়ে যা। দুনিয়ায় মানুষের অশেষ দুঃখু—সেই দুঃখু দূর করতে আদা-নুন খেয়ে লেগে পড়। আর্তের সেবা কর—দেখবি তিন দিনেই তোর নামে টি-টি পড়ে যাবে। দে-দে একটা বিড়ি দে—

—বললাম যে বাবাঠাকুর, আমি বিড়ি খাই না।

—ওহো, তাও তো বটে! বেশ, বেশ, বিড়ি কখনও খাসনি। আর শোন—পরের উপকারে নশ্বর জীবন বিলিয়ে দে। আজ থেকেই লেগে যা—বলে কান থেকে একটা আধপোড়া বিড়ি নামিয়ে, সেটা ধরিয়ে সাধু ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল।

টেনিদা খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই—কালীঘাটের মা কালীর মহিমাতেই কি না কে জানে—সাধুর কথাগুলো তার মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল। পরোপকার? সত্যিই তো, তার মতো কি আর জিনিস আছে! জীবন আর ক'দিনের? সবই তো মায়া—স্রেফ ছলনা! সুতরাং যে-ক'দিন বাঁচা যায়—লোকের ভালো করেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

সেই রাত্রেই সংসার ছাড়ল টেনিদা। মানে কলকাতা ছাড়ল।

গেল দেশে। কলকাতা থেকেই মাইল-দশেক দূরে ক্যানিং লাইনে বাড়ি। গাঁয়ের নাম ধোপাখোলা। দেশের বাড়িতে দূর-সম্পর্কের এক বুড়ি জ্যাঠাইমা থাকেন। কানে খাটো। টেনিদাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁ রে, এমন অসময়ে দেশে এলি যে?

—পরোপকার করব জেঠিমা।

—পুরী খেতে এসেছিস? পুরী এখানে কোথায় বাবা? পোড়া দেশে কি আর ময়দা-ফয়দা কিছু আছে? ইংরেজ রাজত্বে আর বেঁচে সুখ নেই!

—ইংরেজ রাজত্ব কোথায় জেঠিমা? এখন তো আমরা স্বাধীন, মানে—টেনিদা বাংলা করে বুঝিয়ে দিলে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট।

—কোট-প্যান্ট?—জেঠিমা বললেন, ছি বাবা, আমি বিধবা মানুষ, কোট-প্যান্ট পরব কেন? থান পরি।

—দুত্তোর—এ যে মহা জ্বালা হল! আমি বলছিলাম, দেশে রোগ-বালাই কিছু আছে?

—মালাই। মালাই খাবি? দুধই পাওয়া যায় না! গো-মড়কে সব গোরু উচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

—উঃ—কানে হাত দিয়ে টেনিদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু দিন-তিনেক গ্রামে ঘুরে টেনিদা বুঝতে পারল, সত্যিই পরোপকারের অখণ্ড সুযোগ আছে। গ্রাম জুড়ে দারুণ ম্যালেরিয়া। পেটভরা পিলে নিয়ে সারা গাঁয়ের লোক রাত-দিন বোঁ-বোঁ করছে। সেইদিনই কলকাতায় ফিরল টেনিদা। পাঁচ বোতল তেতো পাঁচন কিনে নিয়ে দেশে চলে গেল। কিন্তু দুনিয়াটা যে কী যাচ্ছেতাই জায়গা, সেটা টের পেতে তার দেরি হল না।

অসুখে ভুগে মরবে, তবু ওষুধ খাবে না।

একটা জামগাছের নীচে বসে ঝিমুচ্ছিল গজানন সাঁতরা। সন্দেহ কী—নির্ঘাত ম্যালেরিয়া। টেনিদা গজাননের দিকে এগিয়ে এল। তারপর গজানন ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতে এবং ট্যাঁ-ফোঁ করে উঠবার আগেই টেনিদা তার মুখে আধ বোতল জ্বরারি পাঁচন ঢেলে দিলে। যেমন বিচ্ছিরি, তেমনি তেতো! আসলে গজাননের জ্বর-ফর কিছু হয়নি—খেয়েছিল খানিকটা তাড়ি। যেমন পাঁচন মুখে পড়া—নেশা ছুটে গিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর সোজা 'মার-মার' শব্দে টেনিদাকে তাড়া করল।

কিন্তু ধরতে পারবে কেন? লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে টেনিদা ততক্ষণে পগার পার।

কী সাঙ্ঘাতিক লোক এই গজানন! পরোপকার বুঝল না,—বুঝল না টেনিদার মধ্যে আজ মহাপুরুষ জেগে উঠেছে। তবু হাল ছাড়লে চলবে না। পরের ভালো করতে গেলে অমন কিছু-না-কিছু হয়ই। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে টেনিদা স্বগতোক্তি করলে, এই দ্যাখো না বিদ্যাসাগর মশাই—

পরদিন বিকেলে সে গেল গ্রামের পাঁচুমামার বাড়িতে।

একটা ভাঙা ইজিচেয়ারে শুয়ে পাঁচুমামা উঃ-আঃ করছেন।

—কী হয়েছে মামা?—বগল থেকে পাঁচনের বোতলটা বাগিয়ে দাঁড়াল টেনিদা।

—এই গেঁটে বাত বাবা! গাঁটে গাঁটে ব্যথা। করুণ স্বরে পাঁচুমামা জানাল।

—বাত? ওঃ!—টেনিদা মুহূর্তের জন্যে কেমন দমে গেল। তারপরেই উৎসাহের চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখেমুখে।

—আর ম্যালেরিয়া? ম্যালেরিয়া কখনও হয়নি?

—হয়েছিল বইকি। গত বছর।

—হতেই হবে!—বিজ্ঞের মতো গম্ভীর গলায় টেনিদা বললে, ওই হল রোগের জড়। ওই ম্যালেরিয়া থেকেই সব। কিন্তু ভেব না—বাত-ফাত সব ভালো করে দিচ্ছি।

—ভালো করে দিবি?—পাঁচমামার মুখে-চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে বেরুল: তুই তাহলে ডাক্তার হয়ে এসেছিস? কই শুনিনি তো!

—ডাক্তার কী বলছ মামা—তার চেয়ে ঢের বড়। একেবারে মহাপুরুষ।

অগাধ বিস্ময়ে পাঁচুমামা হাঁ করলেন। টেনিদার দিকেই মুখ করে ছিলেন: কাজেই হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গেই আর কথা নয়—জ্বরারি পাঁচন চলে গেল মামার

গলার মধ্যে।

—ওয়াক-ওয়াক্! ওরে বাবারে—ডাকাত রে—মেরে ফেললে রে—ওয়াক্-ওয়াক্—গেছি গেছি—প্যাঁচুমামা হাহাকার করে উঠলেন।

টেনিদা ততক্ষণে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে। শুনতে পেল, ভেতর থেকে মামা অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গাল দিচ্ছেন। তা দিন—তাতে কিছু আসে যায় না। পরোপকার তো হয়েছে! এর দাম মামা বুঝবে যথাসময়ে। তৃপ্তির হাসি নিয়ে টেনিদা পথ চলল।

খানিক দূর আসতেই চোখে পড়ল একটা আমগাছ-তলায় একটি বছর-আটেকের ছেলে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে।

—এই, কী নাম তোর?

ছেলেটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, লাড্ডু।

—লাড্ডু! তা অমন করে কাঁদছিস কেন? চোখের জলে যে হালুয়া হয়ে যাবি—আর লাড্ডু থাকবি না! কী হয়েছে তোর?

—বড়দা চাঁটি মেরেছে।

—কেন, তোকে তবলা ভেবেছিল বুঝি?

—না! লাড্ডু বললে, আমি কাঁচা আম খেতে চেয়েছিলাম।

—এই কার্তিক মাসে কাঁচা আম খেতে চেয়েছিস! শুধু চাঁটি নয়, গাঁট্টা খাওয়ার মতো শখ।

টেনিদা চলে যাচ্ছিল, কী মনে হতেই ফিরে দাঁড়াল হঠাৎ।

—তোর টক খেতে খুব ভালো লাগে বুঝি?

লাড্ডু মাথা নাড়ল।

—হুঁ—নির্ঘাত ম্যালেরিয়ার লক্ষ্মণ! তোর জ্বর হয়?

—হয় বইকি!

—তবে আর কথা নেই—টেনিদা বোতল বের করে বললে, হাঁ কর—

লাড্ডু আশান্বিত হয়ে বললে, আচার বুঝি?

—আচার বলে আচার! দুরাচার, কদাচার, সদাচার—সক্কলের সেরা এই আচার। হাঁ কর—হাঁ কর ঝটপট—

লাড্ডু হাঁ করল।

তার পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। 'বাপরে মা-রে বড়দা-রে' বলে লাড্ডু চেঁচিয়ে উঠল।

টেনিদা দ্রুত পা চালাল।

—বাপ্—

পিঠের উপর একটা ঢিল পড়তেই চমকে উঠল টেনিদা। লাড্ডু ঢিল চালাচ্ছে। অতএব যঃ পলায়তি—এবং প্রাণপণে। লাড্ডু বাচ্চা হলেও ঢিলে বেশ জোর আসছে, হাতের তাকও তার ফসকায় না।

কিন্তু আর চলে না। গ্রামের লোক খেপে উঠেছে তার ওপর। বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখলে হইহই করে ওঠে। রাস্তায় দেখলে তেড়ে আসে। তাকে দেখলে ছেলেপুলে পালাতে পথ পায় না।

জ্যাঠাইমা বললেন, তুই কী শুরু করেছিস বাবা? লোকে যে তোকে ঠ্যাঙাবার ফন্দি আঁটছে!

টেনিদা গম্ভীর হয়ে রইল। পরে বললে, পরের জন্যে আমি প্রাণ দেব জেঠিমা!

—কী বললি? ঘরের লোকের কান কেটে নিবি? কী সর্বনাশ! ওগো, আমাদের টেনু কি পাগল হয়ে গেল গো—মড়াকান্না জুড়লেন জ্যাঠাইমা।

উদাস ব্যথিত মনে পথে বেরিয়ে পড়ল টেনিদা। কী অকৃতজ্ঞ, নরাধম দেশ। এই দেশের উপকারের জন্যে সে মরিয়া হয়ে ঘুড়ে বেড়াচ্ছে, অথচ কেউ বুঝছে না তার কদর! ছিঃ ছিঃ! এইজন্যেই দেশ আজ পরাধীন—থুড়ি স্বাধীন! কিন্তু কী করা যায়? কীভাবে মানুষগুলোর উপকার করা যায়?

টেনিদা শূন্য মনে একটা গাছতলায় এসে বসল। ভরা দুপুর। কার্তিক মাসের নরম রোদের সঙ্গে ঝিরঝিরে হাওয়া। আকুল হয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ চটকা ভেঙে গেল।

একটু দূরে একটা নিমগাছের নীচে একটা ছাগল ঝিমুচ্ছে।

ঝিমুচ্ছে! ভারি খারাপ লক্ষ্মণ! এখানকার জলে হাওয়ায় ম্যালেরিয়া! ছাগলকেও ধরেছে। ধরাই স্বাভাবিক। আহা—অবোলা জীব। উপকার করতে হয়, তো ওদেরই! কেউ কখনও ওদের দুঃখ বোঝে না। আহা!

তাছাড়া সুবিধেও আছে। মানুষের মতো এরা অকৃতজ্ঞ নয়। উপকার করতে গেলে তেড়ে মারতেও আসবে না। ঠিক কথা—আজ থেকে সেই অসহায় প্রাণীগুলোর ভালো করাই তার ব্রত। ছিঃ ছিঃ! কেন এতদিন তার এ-কথা মনে হয়নি!

পাঁচনের বোতল বাগিয়ে নিয়ে টেনিদা ছাগলের দিকে পা বাড়াল?

তারপর?

তারপরের গল্প তো আগেই বলে নিয়েছি।

চেঙ্গিস আর হ্যামলিনের বাঁশিওলা

টেনিদা বললে, 'আজকাল আমি খুব হিস্ট্রি পড়ছি।'

আমরা বললুম, 'তাই নাকি।'

'যা একখানা বই হাতে পেয়েছি না, শুনলে তোদের চোখ কপালে উঠে যাবে।'

চুয়িং গামটাকে গালের আর একপাশে ঠেলে দিয়ে ক্যাবলা বললে, 'বইটার নাম কী,

শুনি ?'

টেনিদা 'হ য ব র ল'র কাক্কেশ্বর কুচকুচের মতো গলায় বললে, 'স্তোরিয়া দে মোগোরা পুঁদিচ্চেরি বোনানজা বাই সিলিনি কামুচ্চি।'

শুনে ক্যাবলার চশমাটা যেন এক লাফে নাকের নিচে ঝুলে পড়ল। হাবুল যেন 'আঁক' করে একটা শব্দ করল। আমি একটা বিষম খেলুম।

ক্যাবলাই সামলে নিয়ে বললে 'কী বললে ?'

'স্তোরিয়া দে মোগোরা পুঁদিচ্চেরি—'

'থাক—থাক। এতেই যথেষ্ট। যতদুর বুঝছি, দারুণ পুঁদিচ্চেরি।'

'আলবাত পুঁদিচ্চেরি। যাকে বাংলায় বলে ডেনজারাস। ল্যাটিন ভাষায় লেখা কিনা।'

কুঁচো চিংড়ির মতো মুখ করে হাবুল জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি আবার ল্যাটিন ভাষা শিখলা কবে ? শুনি নাই তো কোনওদিন।'

খুশিতে টেনিদার নাকটা আট আনার সিঙাড়ার মতো ফুলে উঠল : 'নিজের গুণের কথা সব কী বলতে আছে রে। লজ্জা করে না ? আমি আবার এ-ব্যাপারে একটু—মানে মেফিস্টোফিলিস—বাংলায় যাকে বলে বিনয়ী।'

ক্যাবলা বললে, 'ধেৎ। মেফিস্টোফিলিস মানে হল—'

টেনিদা বললে, 'চোপ।'

পশ্চিমে থাকার অভ্যেসটা ক্যাবলার এখনও যায়নি। মিইয়ে গিয়ে বললে, 'তব ঠিক হ্যায়, কোই বাত নেহি।'

'হ্যাঁ—কোই বাত নেহি।'

এর মধ্যে হাবলা আমার কানে কানে বলছিল, 'হঃ ঘোড়ার ডিম,—বিনয়ী না কচুর ঘণ্ট—' কিন্তু টেনিদার চোখ এড়াল না। বাঘা গলায় জিজ্ঞেস করলে, 'হাবলা, হোয়াট সেয়িং ? ইন প্যালাজ ইয়ার ?'

'কিচ্ছু না টেনিদা, কিচ্ছু না।'

'কিচ্ছু না ?'—টেনিদা বিকট ভেংচি কাটল একটা : 'চালাকি পায়া হ্যায় ? আমি তোকে চিনিনে ? নিশ্চয়ই আমার বদনাম করছিলি। এক টাকার তেলেভাজা নিয়ে আয় এক্ষুনি।'

'আমার কাছে পয়সা নাই।'

'পয়সা নেই ? ইয়ার্কি ? ওই যে পকেট থেকে একটাকার নোট উঁকি মারছে একখানা ? গো—কুইক—ভেরি কুইক—'

তেলেভাজা শেষ করে টেনিদা বললে, 'দুঃখ করিসনি হাবলা এই যে ব্রাহ্মণ ভোজন করালি, তাতে বিস্তর পুণ্যি হবে তোর। আর সেই ল্যাটিন বইটা থেকে এখন এমন একখানা গপ্পো বলব না, যে তোর একটাকার তেলেভাজার ব্যথা বেমালুম ভুলে যাবি।'

মুখ গোঁজ করে হাবুল বললে, 'হুঁ।'

ক্যাবলা বললে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? হিস্টরির এমন চমৎকার বইখানা পাওয়া গেল কোথায় ? ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে নাকি ?'

'ছোঃ। এ-সব বই ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে পাওয়া যায় ? ভীষণ রেয়ার। দাম কত জানিস ? পঞ্চাশ হাজার টাকা।'

'অ্যাঁঃ।'

ক্যাবলার চশমা লাফিয়ে আর একবার নেমে পড়ল। হাবুল কুট করে আমাকে চিমটি কাটল একটা, আমি চাটুজ্যেদের রোয়াক থেকে গড়িয়ে পড়তে-পড়তে সামলে নিলুম।

ক্যাবলা বোধ হয় আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু টেনিদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল :

'স্টপ। অল সাইলেন্ট। আচ্ছা, হ্যামলিন শহরের সেই বাঁশিওয়ালার গল্পটা তোদের মনে আছে ?'

'নিশ্চয়—নিশ্চয়—' আমরা সাড়া দিলুম। সে-গল্প আর কে না জানে। শহরে ভীষণ ইঁদুরের উৎপাত—বাঁশিওলা এসে তার জাদুকরী সুরে সব ইঁদুরকে নদীতে ডুবিয়ে মারল। শেষে শহরের লোকেরা যখন তার পাওনা টাকা দিতে চাইল না—তখন সে বাঁশির সুরে ভুলিয়ে সমস্ত বাচ্চা ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় যে পাহাড়ের আড়ালে চলে গেল, কে জানে !

টেনিদা বললে, 'চেঙ্গিস খাঁর নাম জানিস ?'

'কে না জানে ! যা নিষ্ঠুর আর ভয়ঙ্কর লোক।''

টেনিদা বললে, 'চেঙ্গিস দেশে দেশে মানুষ মেরে বেড়াত কেন জানিস ? হ্যামলিনের ওই বাঁশিওলাকে খুঁজে ফিরত সে। কোথাও পেত না, আর ততই চটে যেত, যাকে সামনে দেখত তারই গলা কুচ করে কেটে দিত।'

ক্যাবলা বললে, 'এ-সব বুঝি ওই বইতে আছে ?'

'আছে বইকি। নইলে আমি বানিয়ে বলছি নাকি ? তেমন স্বভাবই আমার নয়।'

আমরা একবাক্যে বললুম, 'না না, কখনও নয়।'

টেনিদা খুশি হয়ে বললে, 'তা হলে মন দিয়ে শুনে যা। এ সব হিস্টরিক্যাল ব্যাপার, কোনও তক্কো করবিনে এ-নিয়ে। এখন হয়েছে কি, আগে মোঙ্গলদের দেশে লোকের বিরাট বিরাট গোঁফদাড়ি গজাত। এমন কি, ছেলেপুলেরা জন্মাতই আধ-হাত চাপদাড়ি আর চার ইঞ্চি গোঁফ নিয়ে।'

ক্যাবলা পুরোনো অভ্যেসে বলে ফেলল : 'স্রেফ বাজে কথা। ওদের তো গোঁফ দাড়ি হয়ই না বলতে গেলে।'

'ইউ—চোপ রাও।' —টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, 'ফের ডিসটার্ব করবি তো—'

আমি বললুম, 'এক চড়ে তোর কান কানপুরে রওনা হবে।'

'ইয়াহ্—কারেকট।'—টেনিদা আমার পিঠ চাপড়ে দেবার আগেই আমি তার

হাতের নাগালের বাইরে সরে গেলুম : 'শুনে যা কেবল। সব হিস্টরি। দাড়ি আর গোঁফের জন্যেই মোঙ্গলরা ছিল বিখ্যাত। বারো হাত তেরো হাত করে লম্বা হত দাড়ি, গোঁফগুলো শরীরের দু'পাশ দিয়ে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঝুলে পড়ত। তখন যদি মঙ্গোলিয়ায় যেতিস তো সেখানে আর লোক দেখতে পেতিস না, খালি মনে হত চারদিকে কেবল গোঁফ-দাড়িই হেঁটে বেড়াচ্ছে। কী বিটকেল ব্যাপার বল দিকি ?'

'ওই রকম পেল্লায় দাড়ি নিয়ে হাঁটত কী করে ?'—আমি ধাঁধায় পড়ে গেলুম।

'করত কী, জানিস ? দাড়িটাকে পিঠের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঠিক বস্তার মতো করে বেঁধে রাখত। আর গোঁফটা মাথার ওপর নিয়ে গিয়ে বেশ চুড়োর মতো করে পাকিয়ে—'

হাবুল বললে, 'খাইছে।'—বলেই আকাশজোড়া হাঁ করে একটা।

'অমনভাবে হাঁ করবিনে হাবলা'—টেনিদা হাত বাড়িয়ে কপ করে হাবুলের মুখটা বন্ধ করে দিলে : 'মুড নষ্ট হয়ে যায়। খোদ চেঙ্গিসের দাড়ি ছিল কত লম্বা, তা জানিস ? আঠারো হাত। বারো হাত গোঁফ। যখন বেরুত তখন সাতজন লোক সঙ্গে সঙ্গে গোঁফ দাড়ি বয়ে বেড়াত। বিলেতে রানী-টানীদের মস্ত মস্ত পোশাক যেমন করে সখীরা বয়ে নিয়ে যেত না ? ঠিক সেই রকম।

আর দাড়ি-গোঁফের জন্যে মোঙ্গলদের কী অহঙ্কার। তারা বলত, আমরাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। এমন দাড়ি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি, সকল দাড়ির রাজা সে যে—হুঁহুঁ !

কিন্তু বুঝলি, সব সুখ কপালে সয় না। একদিন কোত্থেকে রাজ্যে ছারপোকার আমদানি হল, কে জানে ! সে কী ছারপোকা। সাইজে বোধ হয় এক-একটা চটপটির মতন, আর সংখ্যায়—কোটি-কোটি, অর্বুদ, নির্বুদ ! কোথায় লাগে হ্যামলিন শহরের ইঁদুর।

'সেই ছারপোকা তো দাড়িতে ঢুকেছে, গোঁফে গিয়ে বাসা বেঁধেছে। ছারপোকার জ্বালায় গোটা মঙ্গোলিয়া 'ইয়ে ব্বাস—গেছি রে—খেয়ে ফেললে রে—বলে দাপাদাপি করতে লাগল। দু'চারটে ধরা পড়ে—বাকি সব যে দাড়ির সেই বাঘা জঙ্গলে কোথায় লুকিয়ে যায়, কেউ আর তার নাগাল পায় না। আর স্বয়ং সম্রাট চেঙ্গিস রাতে ঘুমুতে পারেন না—দিনে বসতে পারেন না—'গেলুম গেলুম' বলে রাতদিন লাফাচ্ছেন আর সঙ্গে লাফাচ্ছে দাড়ি-গোঁফ ধরে-থাকা সেই সাতটা লোক। গোটা মঙ্গোলিয়া যাকে বলে জেরবার হয়ে গেল।'

হাবুল বললে, 'অত ঝঞ্ঝাটে কাম কী, দাড়ি-গোঁফ কামাইয়া ফ্যালাইলেই তো চুইক্যা যায়।'

'কে দাড়ি কামাবে ? মঙ্গোলিয়ানরা ? যা না, বলে আয় না একবার চেঙ্গিস খাঁকে।'—টেনিস বিদ্রূপ করে বললে, 'দাড়ি ওদের প্রেস্টিজ—গর্ব—বল না গিয়ে ! এক কোপে মুণ্ডুটি নামিয়ে দেবে।'

হাবুল বললে, 'থাউক, থাউক, আর কাম নাই।'

টেনিদা বলে চলল : 'হুঁ, খেয়াল থাকে যেন। যাই হোক, এমন সময় একদিন সম্রাটের সভায় এসে হাজির হ্যামিলনের সেই বাঁশিওলা। কিন্তু সভা আর কোথায়। দারুণ হট্টগোল সেখানে। পাত্র-মিত্র সেনাপতি-উজীর-নাজীর সব খালি লাফাচ্ছে, দাড়ি-চুল ঝাড়ছে—দু'একটা ছারপোকা বেমক্কা মাটিতে পড়ে গেল, সবাই চেঁচিয়ে উঠল : মার-মার—ওই যে ওই— যে—

বাঁশিওলা করল কী, ঢুকেই পিঁ করে তার বাঁশিটা দিলে বাজিয়ে। আর বাঁশির কী ম্যাজিক— সঙ্গে-সঙ্গে সভা স্তব্ধ ! এমন কি দাড়ি-গোঁফের ভেতর ছারপোকাগুলো পর্যন্ত কামড়ানো বন্ধ করে দিলে। গম্ভীর গলায় বাঁশিওলা বললে, 'সম্রাট তেমুজিন—'

'তেমুজিন আবার কোত্থেকে এল ?'—আমি জানতে চাইলুম।

ক্যাবলা বললে, 'ঠিক আছে। চেঙ্গিসের আসল নাম তেমুজিনই বটে।'

টেনিদা আমার মাথায় কটাং করে একটা গাঁট্টা মারল, আমি আঁতকে উঠলুম।

'হিস্টরি থেকে বলছি, বুঝেছিস বুরবক কোথাকার। সব ফ্যাক্টস। তোর মগজে তো কেবল ঘুঁটে—ক্যাবলা সমঝদার, ও জানে।'

হাবুল বললে, 'ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও— প্যালাডা পোলাপান।'

'এইসব পোলাপানকে পেলে চেঙ্গিস্ খাঁ একেবারে জলপান করে ফেলত। যত সব ইয়ে— !' একটু থেমে টেনিদা আবার শুরু করল : বাঁশিওলা বললে, সম্রাট তেমুজিন, আমি শহরের সব ছারপোকা এখনি নির্মূল করে দিতে পারি। একটিরও চিহ্ন থাকবে না। কিন্তু তার বদলে দশ হাজার মোহর দিতে হবে আমাকে।'

ছারপোকার কামড়ে তখন প্রাণ যায় যায়, দশ হাজার মোহর তো তুচ্ছ। চেঙ্গিস বললেন, দশ হাজার মোহর কেন কেবল, পাঁচ হাজার ভেড়াও দেব তার সঙ্গে। তাড়াও দেখি ছারপোকা।

বাঁশিওলা তখন মাঠের মাঝখানে মস্ত একটা আগুন জ্বালাতে বললে। আগুন যেই জ্বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে সে পিঁ-পিঁ-পিঁ করে তার বাঁশিতে এক অদ্ভুত সুর বাজতে আরম্ভ করল। আর—বললে বিশ্বাস করবিনে—শুরু হয়ে গেল এক তাজ্জব কাণ্ড। দাড়ি-গোঁফ থেকে লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি অর্বুদ-নির্বুদ ছারপোকা লাফিয়ে পড়ল মাটিতে— সবাই হাত-পা তুলে ট্যাঙ্গো-ট্যাঙ্গো জিঙ্গো-জিঙ্গো বলে হরিসংকীর্তনের মতো গান গাইতে গাইতে—

আমি আর থাকতে পারলুম না : 'ছারপোকা গান গায় !'

'চোপ'—টেনিদা, হাবুল আর ক্যাব্লা একসঙ্গে আমাকে থামিয়ে দিলে।

'তখন সারা দেশ ছারপোকাদের নাচে-গানে ভরে গেল। চারদিক থেকে, সব দাড়ি-গোঁফ থেকে, কোটি-কোটি অর্বুদ-নির্বুদ ছারপোকা লাইন বেঁধে নাচতে-নাচতে গাইতে-গাইতে গিয়ে 'জয় পরমাত্ম্' বলে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগল। ছারপোকা পোড়ার বিকট গন্ধে লোকের নাড়ি উলটে এল, নাকে দাড়ি চেপে বসে রইল সবাই।

'দু'ঘণ্টার ভেতরেই মঙ্গোলিয়ার সব ছারপোকা ফিনিস। সব দাড়ি, সব গোঁফ

সাফ। কাউকে একটুও কামড়াচ্ছে না। চেঙ্গিস খোশ মেজাজে অর্ডার দিলেন—রাজ্যের মহোৎসব চলবে সাতদিন।

'বাঁশিওলা বললে, কিন্তু সম্রাট, আমার দশ হাজার মোহর? পাঁচ হাজার ভেড়া?

'আরে, দায় মিটে গেছে তখন, বয়ে গেছে চেঙ্গিসের টাকা দিতে। চেঙ্গিস বললেন, ইয়ার্কি? দশ হাজার মোহর, পাঁচ হাজার ভেড়া? খোয়াব দেখছিস নাকি? এই, দে তো লোকটাকে ছ'গণ্ডা পয়সা।

'বাঁশিওয়ালা বললে, সম্রাট, টেক কেয়ার, কথার খেলাপ করবেন না। ফল তা হলে খুব ডেঞ্জারাস হবে।

'অ্যাঁ! এ যে ভয় দেখায়! চেঙ্গিস চটে বললেন, বেতমিজ, কার সঙ্গে কথা কইছিস, তা জানিস? এই—কৌন হ্যায়—ইসকো কান দুটো কেটে দে তো।

'কিন্তু কে কার কান কাটে? হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা তখন নতুন করে বাঁশিতে দিয়েছে ফুঁ। আর সঙ্গে-সঙ্গে আকাশ অন্ধকার করে উঠল ঝড়ের কালো মেঘ। চারদিকে যেন মধ্যরাত্রি নেমে এল। হু-হু করে দামাল বাতাস বইল আর সেই বাতাসে—

'চড়াৎ—চড়াৎ—চড়াৎ—

'না, আকাশ জুড়ে মেঘ নয়— শুধু দাড়ি-গোঁফ। ঠোঁট থেকে, গাল থেকে চড়াৎ চড়াৎ করে সব উড়ে যেতে লাগল— জমাট বাঁধা দাড়ি-গোঁফের মেঘ আকাশ বেয়ে ছুটে চলল, আর সেই দাড়ির মেঘে, যেন গদির ওপর বসে, বাঁশি বাজাতে বাজাতে হ্যামলিনের বাঁশিওলাও উধাও।

'আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেলে সারা মঙ্গোলিয়া এ-ওর দিকে থ হয়ে চেয়ে রইল। জাতির গর্ব— দাড়ি-গোঁফের প্রেস্টিজ—সব ফিনিশ! সব মুখ একেবারে নিখুঁত করে প্রায় কামানো, কারও কারও এখানে-ওখানে খাবলা-খাবলা একটু টিকে রয়েছে এই যা। সর্বনেশে বাঁশি তাদের সর্বনাশ করে গেছে।

'রইল মহোৎসব, রইল সব। একমাস ধরে তখন জাতীয় শোক। আর দাড়ি-গোঁফ সেই যে গেল, একবারেই গেল— মোঙ্গলদের সেই থেকে ও-সব গজায়ই না, ওই দু'-চারগাছা খাবলা খাবলা যা দেখতে পাস। হ্যামলিনের বাঁশিওলা—হুঁ হুঁ, তার সঙ্গে চালাকি!

'আর সেই রাত্রেই চেঙ্গিস মানুষ মারতে বেরিয়ে পড়ল। বাঁশিওয়ালাকে তো পায় না— কাজে-কাজেই যাকে সামনে দেখে, তার মুণ্ডুটিই কচাৎ! বুঝলি—এ হল রিয়্যাল ইতিহাস। স্তোরিয়া দে মোগোরা পুঁদিচ্চেরি বোনানজা বাই সিলিনি কামুচ্চি ফিফথ সেনচুরি বি-সি!'

টেনিদা থামল।

ক্যাবলা বিড় বিড় করে বললে, 'সব গাঁজা।'

ভালো করে টেনিদা শুনতে না পেয়ে বললে, 'কী বললি, প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা কী যে বলিস। তাঁর পায়ের ধুলো একটু মাথায় দিলে পারলে বর্তে যেতুম রে।

ঢাউস

চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে টেনিদা বললে, ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস ইয়াক ইয়াক!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, তার মানে কী?

টেনিদা টক টক করে আমার মাথার ওপর দুটো টোকা মারল। বললে, তোর মগজ-ভর্তি খালি শুকনো ঘুঁটে—তুই এ-সব বুঝবিনি। এ হচ্ছে ফরাসী ভাষা।

আমার ভারি অপমান বোধ হল।

—ফরাসী ভাষা? চালিয়াতির জায়গা পাওনি? তুমি ফরাসী ভাষা কী করে জানলে?

টেনিদা বললে, আমি সব জানি।

—বটে?—আমি চটে বললুম, আমিও তা হলে জার্মানি ভাষা জানি।

—জার্মানি ভাষা?—টেনিদা নাক কুঁচকে বললে, বল তো?

আমি তক্ষুনি বললুম, হিটলার—নাৎসি—বার্লিন-কটাকট!

হাবুল সেন বসে বসে বেলের আঠা দিয়ে একমনে একটা ছেঁড়া ঘুড়িতে পট্টি লাগাচ্ছিল। এইবার মুখ তুলে ঢাকাই ভাষায় বললে, হঃ, কী জার্মানি ভাষাডাই কইলি রে প্যালা! খবরের কাগজের কতগুলিন নাম—তার লগে একটা 'কটাকট' জুইড়্যা দিয়া খুব ওস্তাদি কোর্‌তে আছস্! আমি একটা ভাষা কমু? ক দেখি—'মেকুরে হুড়ুম খাইয়া হকৈড় করছে'—এইডার মানে কী?

টেনিদা ঘাবড়ে গিয়ে বললে, সে আবার কী রে! ম্যাডাগাস্কারের ভাষা বলছিস বুঝি?

—ম্যাডাগাস্কার না হাতি!—বিজয়গর্বে হেসে হাবুল বললে, মেকুর কিনা বিড়াল, হুড়ুম খাইয়া কিনা মুড়ি খাইয়া—হকৈড় করছে—মানে এঁটো করেছে।

হেরে গিয়ে টেনিদা ভীষণ বিরক্ত হল।

—রাখ বাপু তোর হুড়ুম দুড়ুম—শুনে আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়। এর চাইতে প্যালার জার্মানি 'কটাকট'ও ঢের ভালো।

বলতে বলতে ক্যাবলা এসে হাজির। চোখ প্রায় অদ্ধেকটা বুজে, খুব মন দিয়ে কী যেন চিবুচ্ছে। দেখেই টেনিদার চোখ দুটো জুলজুল করে উঠল।

—অ্যাই, খাচ্ছিস কী রে?

আরও দরদ দিয়ে চিবুতে চিবুতে ক্যাবলা বললে, চুয়িং গাম।

—চুয়িং গাম!—টেনিদা মুখ বিচ্ছিরি করে বললে, দুনিয়ায় এত খাবার জিনিস থাকতে শেষে রবার চিবুচ্ছিস বসে বসে। এর পরে জুতোর সুখতলা খাবি এই তোকে বলে দিলুম। ছ্যাঃ।

আমি বললুম, চুয়িং গাম থাক। কাল যে বিশ্বকর্মা পুজো—সেটা খেয়াল নেই

বুঝি ?

টেনিদা বললে, খেয়াল থাকবে না কেন ? সেই জন্যেই তো বলছিলুম, ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—

ক্যাবলা পট করে বললে, মেফিস্টোফিলিস মানে শয়তান।

—শয়তান !—চটে গিয়ে টেনিদা বললে, থাম থাম, বেশি পণ্ডিতি করিসনি। সব সময় এই ক্যাবলাটা মাস্টারি করতে আসে। কাল যখন মেফিস্টোফিলিস ইয়াক ইয়াক করে আকাশে উড়বে—তখন টের পাবি।

—তার মানে ? —আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম।

—মানে ? মানে জানবি পরে—টেনিদা বললে, এখন বল দিকি, কাল বিশ্বকর্মা পুজোর কী রকম আয়োজন হল তোদের ?

আমি বললুম, আমি দু' ডজন ঘুড়ি কিনেছি।

হাবুল সেন বললে, আমি তিন ডজন।

ক্যাবলা চুয়িং গাম চিবুতে চিবুতে বললে, আমি একটাও কিনিনি। তোদের ঘুড়িগুলো কাটা গেলে আমি সেইগুলো ধরে ওড়াব।

টেনিদা মিটমিট করে হেসে বললে, হয়েছে, বোঝা গেছে তোদের দৌড়। আর আমি কী ওড়াব জানিস ? আমি—এই টেনি শর্মা ?—টেনিদা খাড়া নাকটাকে খাঁড়ার মতো উঁচু করে নিজের বুকে দুটো টোকা মেরে বললে, আমি যা ওড়াব—তা আকাশে বোঁ বোঁ করে উড়বে, গোঁ গোঁ করে এরোপ্লেনের মতো ডাক ছাড়বে—হুঁ হুঁ ! ডি-লা-গ্র্যান্ডি—

বাকিটা ক্যাবলা আর বলতে দিলে না। ফস করে বলে বসল : ঢাউস ঘুড়ি বানিয়েছ বুঝি ?

—বানিয়েছ বুঝি ?—টেনিদা রেগে ভেংচে বললে, তুই আগে থেকে বলে দিলি কেন ? তোকে আমি বলতে বারণ করিনি ?

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, তুমি আমাকে ঢাউস ঘুড়ির কথা বললেই বা কখন, বারণই বা করলে কবে ? আমি তো নিজেই ভেবে বললুম।

—কেন ভাবলি ?—টেনিদা রকে একটা কিল মেরেই উঃ উঃ করে উঠল : বলি, আগ বাড়িয়ে তোকে এ-সব ভাবতে বলেছে কে র‍্যা ? প্যালা ভাবেনি, হাবলা ভাবেনি—তুই কেন ভাবতে গেলি ?

হাবুল সেন বললে, হ, ওইটাই ক্যাবলার দোষ। এত ভাইব্যা ভাইব্যা শ্যাষে একদিন ও কবি হইব।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, হুঁ, কবি হওয়া খুব খারাপ। আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা একবার কবি হয়েছিল। দিনরাত কবিতা লিখত। একদিন রামধন ধোপার খাতায় কবিতা করে লিখল :

পাঁচখানা ধুতি, সাতখানা শাড়ি
এ-সব হিসাবে হইবে কিবা ?
এ-জগতে জীব কত ব্যথা পায়

তাই ভাবি আমি রাত্রি-দিবা।
রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধা
মনটি তাহার বড়ই সাদা—
সে-বেচারা তার পিঠেতে চাপায়ে
কত শাড়ি-ধুতি-প্যান্ট লইয়া যায়—
মনোদুখে খালি বোঝা টেনে ফেরে গাধা
একখানা ধুতি-প্যান্ট পরিতে না পায়।

টেনিদা বললে, আহা-হা, বেশ লিখেছিল তো ! শুনে চোখে জল আসে !

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ, খুবই করুণ।

আমি বললুম, কবিতাটা পড়ে আমারও খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পিসিমা ধোপার হিসেবের খাতায় এইসব দেখে ভীষণ রেগে গেল ! রেগে গিয়ে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একটা চাল-কুমড়ো নিয়ে ফুচুদাকে তাড়া করলে। ঠিক যেন গদা হাতে নিয়ে শাড়িপরা ভীম দৌড়োচ্ছে।

টেনিদা বললে, তোর পিসিমার কথা ছেড়ে দে—ভারি বেরসিক। কিন্তু কী প্যাথেটিক কবিতা যে শোনালি প্যালা—মনটা একেবারে মজে গেল। ইস—সত্যিই তো। গাধা কত ধুতি-প্যান্ট-শাড়ি টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু একখানা পরিতে না পায়।—বলে টেনিদা উদাস হয়ে দূরের একটা শালপাতার ঠোঙার দিকে তাকিয়ে রইল।

সান্ত্বনা দিয়ে হাবুল বললে, মন খারাপ কইর‍্যা আর করবা কী। এই রকমই হয়। দ্যাখো না—গোবর হইল গিয়া গোরুর নিজের জিনিস, অন্য লোকে তাই দিয়া ঘুঁইট্যা দেয়। গোরু একখানা ঘুঁইট্যা দিতে পারে না।

দাঁত খিঁচিয়ে টেনিদা বললে, দিলে সব মাটি করে। এমন একটা ভাবের জিনিস—ধাঁ করে তার ভেতর গোবর আর ঘুঁটে নিয়ে এল। নে—ওঠ এখন, ঢাউস ঘুড়ি দেখবি চল।

—ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস ইয়াক ইয়াক—

বলতে বলতে আমরা যখন গড়ের মাঠে পৌঁছলুম তখন সবে সকাল হচ্ছে। চৌরঙ্গির এদিকে সূর্য উঠছে আর গঙ্গার দিকটা লালে লাল হয়ে গেছে। দিব্যি ঝির-ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে—কখনও-কখনও বাতাসটা বেশ জোরালো। চারদিকে নতুন ঘাসে যেন ঢেউ খেলছে। সত্যি বলছি—আমি পটলডাঙার প্যালারাম, পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই—আমারই ফুচুদার মতো কবি হতে ইচ্ছে হল।

কখন যে সুর করে গাইতে শুরু করেছি—'রবি মামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ওই'—সে আমি নিজেই জানিনে। হঠাৎ মাথার ওপর কটাং করে গাট্টা মারল টেনিদা।

—অ্যাই সেরেছে ! এটা যে আবার গান গায় !

—তাই বলে তুমি আমার মাথার ওপর তাল দেবে নাকি ?—আমি চটে গেলুম।

—তাল বলে তাল ! আবার যদি চামচিকের মতো চিচি করবি, তাহলে তোর পিঠে গোটাকয়েক ঝাঁপতাল বসিয়ে দেব সে বলে দিচ্ছি। এসেছি ঘুড়ি ওড়াতে—উনি আবার সুর ধরেছেন !

আমার মনটা বেজায় বিগড়ে গেল। খামকা সকালবেলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ-সন্তানের মাথায় গাঁট্টা মারলে। মনে মনে অভিশাপ দিয়ে বললুম, হে ভগবান, তুমি ওড়বার আগেই একটা খোঁচা-টোঁচা দিয়ে টেনিদার ঢাউস ঘুড়ির ঢাউস পেটটা ফাঁসিয়ে দাও। ওকে বেশ করে আক্কেল পাইয়ে দাও একবার।

ভগবান বোধহয় সকালে দাঁতন করতে করতে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমার প্রার্থনা যে এমন করে তাঁর কানে যাবে—তা কে জানত।

ওদিকে বিরাট ঢাউসকে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা চলছে তখন। টেনিদা দড়ির মস্ত লাটাইটা ধরে আছে—আর হাবুল সেন হাঁপাতে হাঁপাতে প্রকাণ্ড ঢাউসটাকে ওপরে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু ঢাউস উড়ছে না—ধপাৎ করে নীচে পড়ে যাচ্ছে।

টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, এ কেমন ঢাউস রে। উড়ছে না যে !

হাবুল সেন মাথা নেড়ে বললে, হ, এইখান উড়ব না। এইটার থিক্যা মনুমেন্ট উড়ান সহজ।

শুনে আমার যে কী ভালো লাগল। খামকা ব্রাহ্মণের চাঁদিতে গাঁট্টা মারা ! হুঁ হুঁ ! যতই পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই, ব্রহ্মতেজ যাবে কোথায় ! ও ঘুড়ি আর উড়ছে না—দেখে নিয়ো।

খালি ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল। বললে, ওড়াতে জানলে সব ঘুড়িই ওড়ে।

ওড়ে নাকি ? টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তবে দে না উড়িয়ে।

ক্যাবলা বললে, তোমার ঘুড়ি তুমি ওড়াবে, আমি ও-সবের মধ্যে নেই। তবে বুদ্ধিটা বাতলে দিতে পারি। অত নীচ থেকে অত বড় ঘুড়ি ওড়ে ? ওপর থেকে ছাড়লে তবে তো হাওয়া পাবে। ওই বটগাছটার ডাল দেখছ ? ওখানে উঠে ঘুড়িটা ছেড়ে দাও। ডালটা অনেকখানি এদিকে বেরিয়ে এসেছে—ঘুড়ি গাছে আটকাবে না—ঠিক বোঁ করে উঠে যাবে আকাশে।

টেনিদা বললে, ঠিক। এ-কথাটা আমিই তো ভাবতে যাচ্ছিলুম। তুই আগে থেকে ভাবলি কেন র‍্যা ? ভারি বাড় বেড়েছে—না ? তোকে পানিশমেন্ট দিলুম। যা—গাছে ওঠ—

ক্যাবলা বললে, বা-রে। লোকের ভালো করলে বুঝি এমনিই হয় ?

দাঁত খিঁচিয়ে টেনিদা বললে, তোকে ভালো করতে কে বলেছিল—শুনি ? দুনিয়ায় কারও ভালো করেছিস কি মরেছিস। যা—গাছে ওঠ—

—যদি কাঠপিঁপড়ে কামড়ায় ?

—কামড়াবে। আমাদের বেশ ভালোই লাগবে।

—যদি ঘুড়ি ছিঁড়ে যায় ?

—তোর কান ছিঁড়ব ! যা—ওঠ বলছি—

কী আর করে—যেতেই হল ক্যাবলাকে। যাওয়ার সময় বললে, ঘুড়ির দড়িটা ওই গোলপোস্টে বেঁধে দিয়ো টেনিদা। অত বড় ঢাউস—খুব জোর টান দেবে কিন্তু।

টেনিদা নাক কুঁচকে মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, যা—যা—বেশি বকিসনি। ঘুড়ি উড়িয়ে উড়িয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম—তুই এসেছিস ওস্তাদি করতে। নিজের কাজ কর।

ক্যাবলা বললে, বহুৎ আচ্ছা।

হু হু করে হাওয়া বইছে তখন। ডালের ডগায় উঠে ক্যাবলা ঢাউসকে ছেড়ে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ করে ডাক ছেড়ে সেই পেল্লায় ঢাউস আকাশে উড়ল।

টেনিদার ওপর সব রাগ ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছি। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে ঢাউসকে। মাথার দুধারে দুটো পতাকা যেন বিজয়গর্বে পতপত উড়ছে—গোঁ-গোঁ আওয়াজ তুলে ঘুড়ি ওপরে উঠে যাচ্ছে। টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : ডি-লা-গ্র্যান্ডি—

কিন্তু আচমকা টেনিদার চ্যাঁচানি বন্ধ হয়ে গেল। আর হাঁউমাউ করে ডাক ছাড়ল হাবুল।

—গেল—গেল—

কে গেল ? কোথায় গেল ?

কে আর যাবে ! অমন করে কেই বা যেতে পারে টেনিদা ছাড়া ? তাকিয়ে দেখেই আমার চোখ চড়াৎ করে কপালে উঠে গেল। কপালে বললেও ঠিক হয় না, সোজা ব্রহ্মতালুতে।

শুধু ঢাউসই ওড়েনি। সেই সঙ্গে টেনিদাও উড়ছে। চালিয়াতি করে লাটাই ধরে রেখেছিল হাতে, বাঘা ঢাউসের টানে সোজা হাত-দশেক উঠে গেছে ওপরে।

এক লাফে গাছ থেকে নেমে পড়ল ক্যাবলা। বললে, পাকড়ো—পাকড়ো—

কিন্তু কে কাকে পাকড়ায় ! ততক্ষণে টেনিদা পনেরো হাত ওপরে ! সেখান থেকে তার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে : হাবুল রে—প্যালা রে—ক্যাবলা রে—

আমরা তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম : —ছেড়ে দাও, লাটাই ছেড়ে দাও—

টেনিদা কাঁউ কাঁউ করে বললে, পড়ে যে হাত-পা ভাঙব।

হাবুল বললে, তবে আর কী করবা। উইড়্যা যাও—

ঢাউস তখন আরও উপরে উঠেছে। জোরালো পুবের হাওয়ায় সোজা পশ্চিমমুখো ছুটেছে গোঁ-গোঁ করতে করতে। আর জালের সঙ্গে মাকড়সা যেমন করে ঝোলে, তেমনি করে মহাশূন্যে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে টেনিদা।

পিছনে পিছনে আমরাও ছুটলুম। সে কী দৃশ্য। তোমরা কোনও রোমাঞ্চকর সিনেমাতেও তা দ্যাখোনি।

ওপর থেকে তারস্বরে টেনিদা বললে, কোথায় উড়ে যাচ্ছি বল তো ?

ছুটতে ছুটতে আমরা বললুম, গঙ্গার দিকে !

—অ্যাঁ—ত্রিশূন্য থেকে টেনিদা কেঁউ কেঁউ করে বললে, গঙ্গায় পড়ব নাকি ?

হাবুল বললে, হাওড়া স্টেশনেও যাইতে পারো !

—অ্যাঁ !

আমি বললুম, বর্ধমানেও নিয়ে যেতে পারে !

—বর্ধমান ! বলতে বলতে শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়ে গেল টেনিদা ।

ক্যাবলা বললে, দিল্লি গেলেই বা আপত্তি কী ? সোজা কুতুবমিনারের চূড়ায় নামিয়ে দেবে এখন ।

টেনিদা তখন প্রায় পঁচিশ হাত ওপরে । সেখান থেকে গোঙাতে গোঙাতে বললে, এ যে আরও উঠছে ! দিল্লি গিয়ে থামবে তো ? ঠিক বলছিস ?

আমি ভরসা দিয়ে বললুম, না থামলেই বা ভাবনা কী ? হয়ত মঙ্গল-গ্রহেও নিয়ে যেতে পারে ।

—মঙ্গল-গ্রহ !—আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে টেনিদা বললে, আমি মঙ্গল-গ্রহে এখন যেতে চাচ্ছি না । যাওয়ার কোনও দরকার দেখছি না !

ক্যাবলা বললে, তবু যেতেই হচ্ছে । যাওয়াই তো ভালো টেনিদা । তুমিই বোধহয় প্রথম মানুষ যে মঙ্গল-গ্রহে যাচ্ছ । আমাদের পটলডাঙার কত বড় গৌরব সেটা ভেবে দ্যাখো !

—চুলোয় যাক পটলডাঙা । আমি—কিন্তু টেনিদা আর বলতে পারলে না, তক্ষুনি শূন্যে আর-একটা ডিগবাজি খেলে । খেয়েই আবার কাঁউ কাঁউ করে বললে, ঘুরপাক খাচ্ছি যে । আমি মোটেই ঘুরতে চাচ্ছি না—তবু বোঁ বোঁ করে ঘুরে যাচ্ছি ।

ঘুড়ি তখন ক্যালকাটা গ্রাউন্ডের কাছাকাছি । আমরা সমানে পিছনে ছুটছি । ছুটতে ছুটতে আমি বললুম, ও-রকম ঘুরতে হয় । ওকে মাধ্যাকর্ষণ বলে । সায়েন্স পড়োনি ?

অনেক ওপর থেকে টেনিদা যেন কী বললে । আমরা শুনতে পেলুম না । কেবল কাঁউ কাঁউ করে খানিকটা আওয়াজ আকাশ থেকে ভেসে এল ।

কিন্তু ওদিকে ঢাউস যত গঙ্গার দিকে এগোচ্ছে তত হাওয়ার জোরও বাড়ছে । পিছনে ছুটে আমরা আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না । টেনিদা উড়ছে আর ডিগবাজি খাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে আর উড়ছে ।

স্ট্র্যান্ড রোড এসে পড়ল প্রায় । ঘুড়ি সমানে ছুটে চলেছে । এখুনি গঙ্গার ওপরে চলে যাবে । আমাদের লিডার যে সত্যিই গঙ্গা পেরিয়ে—বর্ধমান হয়ে—দিল্লি ছাড়িয়ে মঙ্গল-গ্রহেই চলল ! আমরা যে অনাথ হয়ে গেলুম !

আকাশ থেকে টেনিদা আবার আর্তস্বরে বললে, সত্যি বলছি—আমি মঙ্গল-গ্রহে যেতে চাই না—কিছুতেই যেতে চাই না—

আমরা এইবারে একবাক্যে বললুম, না—তুমি যেয়ো না ।

—কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে যে !

—তা হলে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো । —ক্যাবলা জানিয়ে দিলে ।

—আর পৌঁছেই একটা চিঠি লিখো—আমি আরও মনে করিয়ে দিলুম : চিঠি লেখাটা খুব দরকার ।

টেনিদা বোধহয় বলতে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই চিঠি লিখবে, কিন্তু পুরোটা আর বলতে পারলে না । একবার কাঁউ করে উঠেই কোঁক করে থেমে গেল । আমরা দেখলুম, ঢাউস গোঁত্তা খাচ্ছে ।

সে কী গোঁত্তা ! মাথা নিচু করে বোঁ-বোঁ শব্দে নামছে তো নামছেই ! নামতে নামতে একেবারে—ঝপাস করে সোজা গঙ্গায় । মঙ্গল-গ্রহে আর গেল না—মত বদলে পাতালের দিকে রওনা হল ।

আর টেনিদা ? টেনিদা কোথায় ? সেও কি ঘুড়ির সঙ্গে গঙ্গায় নামল ?

না—গঙ্গায় নামেনি । টেনিদা আটকে আছে । আটকে আছে আউটরাম ঘাটের একটা মস্ত গাছের মগডালে । আর বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে একদল কাক কা-কা করে টেনিদার চারপাশে চক্কর দিচ্ছে ।

ছুটতে ছুটতে আমরা গাছতলায় এসে হাজির হলুম । কেবল আমরাই নই । চারিদিক থেকে তখন প্রায় শ-দুই লোক জড়ো হয়েছে সেখানে । পোর্ট কমিশনারের খালাসি, নৌকোর মাঝি, দুটো সাহেব—তিনটে মেম ।

—ওঃ মাই—হোয়াজজ্যাট (হোয়াটস দ্যাট) ?—বলেই একটা মেম ভিরমি গেল ।

কিন্তু তখন আর মেমের দিকে কে তাকায় ? আমি চেঁচিয়ে বললুম, টেনিদা, তা হলে মঙ্গল-গ্রহে গেলে না শেষ পর্যন্ত ?

টেনিদা ঢাউস ঘুড়ির মতো গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে বললে, কাকে ঠোকরাচ্ছে ।

—নেমে এসো তা হলে ।

টেনিদা গাঁ-গাঁ করে বললে, পারছি না ! ওফ্—কাকে মাথা ফুটো করে দিলে রে প্যালা ।

পোর্ট কমিশনারের একজন কুলি তখুনি ফায়ার-ব্রিগেডে টেলিফোন করতে ছুটল । ওরাই এসে মই বেয়ে নামিয়ে আনবে ।

চাটুজ্যেদের রকে বসে আমি বললুম, ডি-লা-গ্র্যান্ডি—

সারা গায়ে আইডিন-মাখানো টেনিদা কাতর স্বরে বললে, থাক, ও আর বলিসনি । তার চাইতে একটা করুণ কিছু বল । তোর ফুচুদার লেখা 'রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধার' কবিতাটাই শোনা । ভারি প্যাথেটিক । ভারি প্যাথেটিক ।

নিদারুণ প্রতিশোধ

চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে পটলডাঙার টেনিদা বেশ মন দিয়ে তেলেভাজা খাচ্ছিল। আমাকে দেখেই কপকপ করে বাকি বেগুনি দুটো মুখে পুরে দিয়ে বললে, এই যে শ্রীমান প্যালারাম, কাল বিকেলে কোথায় গিয়েছিলে? খেলার মাঠে তোর যে টিকিটাও দেখতে পেলুম না, বলি ব্যাপারখানা কী ?

আমি বললুম, আমি মেজদার সঙ্গে সার্কাস দেখতে গিয়েছিলাম।

—বটে—বটে ! তা কী রকম দেখলি ?

—খাসা ! ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস যাকে বলে ! হাতি, বাঘ, সিঙ্গি, ফ্লায়িং ট্রাপিজ, মোটর সাইকেল কত কী ! কিন্তু জানো টেনিদা, সব চাইতে ভালো হল শিম্পাঞ্জির খেলা। চা খেল, চুরুট ধরাল।

—আরে ছোঃ ছোঃ !—টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে পাতিনেবুর মতো করে বললে, রেখে দে তোর শিম্পাঞ্জি। আমার কুট্টিমামার বন্ধু রামগিদ্ধড়বাবু একবার একটা গোদা হনুমানের যে-খেল দেখেছিলেন, তার কাছে কোথায় লাগে তোর সার্কাসের শিম্পাঞ্জি ! নস্যি—স্রেফ নস্যি।

—তাই নাকি ?—আমি টেনিদার কাছে ঘন হয়ে বললুম : রামগিদ্ধড়বাবু কোথায় দেখলেন সে-খেলা ?

—উড়িষ্যায়।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, বুঝেছি। পুরীতে গিয়ে জগন্নাথের মন্দিরে আমি কয়েকটা বড় হনুমান দেখেছিলুম।

ধ্যাত্তোর পুরী ! ওগুলো আবার মনিষ্যি—থুড়ি হনুমান নাকি ? গাদা-গাদা জগন্নাথের পেসাদ খেয়ে নাদাপেট নিয়ে বসে আছে—গলায় একটা করে মাদুলি পরিয়ে দিলেই হয়। হনুমান দেখতে গেলে জঙ্গলে যেতে হয়, মানে কেওনঝড়ের জঙ্গলে।

—কেওনঝড়। সে আবার কোথায় ?

—তাই যদি জানবি, তা হল পটলডাঙায় বসে পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাবি কেন র‍্যা ? নে, গপ্পো শুনবি তো এখন মুখে ইস্ক্রুপ এঁটে চুপটি করে বসে থাক—বকের মতো বকবক করিসনি।

—বক তো বকবক করে না—ক্যাঁ-ক্যাঁ করে।

—চোপ রাও ! বক বকবক করে না ? তা হলে তো কোন্‌দিন বলে বসবি কাক কা-কা করে না, পাঁঠার মতো ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে ডাকে !

—হয়েছে, হয়েছে, তুমি বলে যাও !

—বলবই তো, তোকে আমি তোয়াক্কা করি নাকি ? এখন আমাকে ডিসটার্ব করিসনি। মন দিয়ে রামগিদ্ধড়বাবুর গল্প শুনে যা—বিস্তর জ্ঞান লাভ করতে

পারবি। হয়েছে কী, রামগিদ্ধড়বাবু কনট্রাকটারের কাজ করতেন। মানে, পুল-টুল রাস্তাঘাট এইসব বানাতে হত তাঁকে। সেই কাজেই তাঁকে সেবার কেওনঝড়ের জঙ্গলে যেতে হয়েছিল।

কুলি, তাঁবু, জিপগাড়ি—এইসব নিয়ে সে-এক এলাহি কাণ্ড ! বনের ভেতরেই একটুখানি ফাঁকা জায়গা দেখে রামগিদ্ধড় তাঁবু ফেলেছেন। মাইল দুই দূরে পাহাড়ি নদীর ওপর একটা পুল তৈরি হচ্ছে, সকালে বিকালে সেখানে জিপ নিয়ে রামগিদ্ধড়বাবু কাজ দেখতে যান।

জঙ্গলে এনতার হনুমান, গাছে গাছে তাদের আস্তানা। কিন্তু লোকজনের উৎপাতে আর জিপের আওয়াজে তারা এদিক-ওদিক পালিয়ে গেল। রামচন্দ্রজী তো আর নেই—কার ওপরে আর ভরসা রাখবে বল্‌ ? কুলিরা অবিশ্যি মাঝে মাঝে ঢোল আর খঞ্জনি বাজিয়ে 'রামা হো রামা হো' বলে গান গাইত, কিন্তু সেই বিকট চিৎকার শুনে কি আর অবোলা জীব কাছে আসতে সাহস পায় ?

তবু একটা কাণ্ড ঘটল।

সেদিন দুপুরবেলা তাঁবুর বাইরে বসে রামগিদ্ধড় চাপাটি খাচ্ছিলেন। হঠাৎ দেখলেন, সামনে গাছের ডালে বসে একটা গোদা হনুমান জুলজুল করে তাকাচ্ছে। মুখের চেহারাটা ভারি করুণ—'কাঙালকে কিছু দিয়ে দিন দাতা'—ভাবখানা এই রকম।

রামগিদ্ধড়বাবুর ভারি মায়া হল। একটা চাপাটি ছুঁড়ে দিলেন, হনুমান সেটা কুড়িয়ে নিয়ে মাথাটা একবার সামনে ঝুঁকিয়ে দিলে, যেন বললে, 'সেলাম হুজুর।' তার পরেই টুপ করে গাছের ডালে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

পরের দিন রামগিদ্ধড় যেই খেতে বসেছেন, ঠিক হনুমানটা এসে হাজির। আজও রামগিদ্ধড় তাকে একটা চাপাটি দিলেন, সে-ও তেমনি করেই তাঁকে সেলাম দিয়ে, চাপাটি নিয়ে উধাও হল।

এমনি চলতে লাগল মাসখানেক ধরে। রোজ খাওয়ার সময় হনুমানটা আসে, তার বরাদ্দ চাপাটিখানা নিয়ে চলে যায়, যাওয়ার সময় তেমনি মাথা ঝুঁকিয়ে সেলাম করে। আর কোনওরকম বিরক্ত করে না, কোনওদিন একখানার বদলে দু'খানা চাপাটি চায় না। মানে সেই বর্ণ-পরিচয়ের সুবোধ বালক গোপালের মতো আর কি—যাহা পায়, তাহাই খায়।

তা খাচ্ছিল, চলছিলও বেশ, রামগিদ্ধড়বাবুই একদিন গোলমালটা পাকিয়ে বসলেন। সেদিন কুলিদের সঙ্গে বকাবকি করে মেজাজ অত্যন্ত খারাপ—অন্যমনস্কভাবে খেয়েই চলেছেন। ওদিকে সেই গোপাল-মার্কা সুবোধ হনুমান যে কখন থেকে ঠায় বসে আছে, সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই। ধীরে-সুস্থে সব ক'টা চাপাটি চিবুলেন, বড় একবাটি দুধ খেলেন, তারপর মোটাসোটা গোঁফজোড়া মুছতে-মুছতে উঠে গেলেন। হনুমানের কথা তাঁর মনেও পড়ল না।

পরদিন যেই চাপাটির থালা নিয়ে বসেছেন—অমনি 'হুপ' করে এক আওয়াজ। ব্যাপার কী যে হল ভালো করে ঠাহর করবার আগেই রামগিদ্ধড়

দেখলেন, থালার আটখানা চাপাটি বেমালুম ভ্যানিশ। তাঁর নাকের সামনে মস্ত একটা ল্যাজ একবার চাবুকের মতো দুলে গেল, 'হুপ' করে শব্দ, আর একবার গাছের ডাল ঝর-ঝর করে নড়ে উঠল—ব্যস, কোথাও আর কিছু নেই।

দু'-একজন কুলি হইহই করে উঠল, ঠাকুর হায়-হায় করতে লাগল আর রামগিদ্ধড় স্রেফ হাঁ করে রইলেন। আঁ—এইসা বেইমানি। রোজ রোজ হতচ্ছাড়া হনুমানকো চাপাটি খিলাচ্ছি—আর সে কিনা অ্যায়সা বেতমিজ। আর কোনও জানোয়ার হলে রামগিদ্ধড় তাকে গুলি করে মারতেন, কিন্তু মহাবীরজীর জাতভাইকে তো আর সত্যিই গুলি করা যায় না। সে তো মহাপাপ।

রাগের চোটে রামগিদ্ধড় মুখের এক গোছা গোঁফই টেনে ছিঁড়ে ফেললেন। বললেন, দাঁড়াও—রামগিদ্ধড় চৌধুরী খাস বালিয়া জিলার রাজপুত। আমিও তোমায় ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। পরদিন ঠাকুর-কে ডেকে বললেন, এখানে সব চাইতে ঝাল যে মিরচাই—মানে লঙ্কা পাওয়া যায়, তারই বাটনা কর ছটাকখানেক। আর তাই দিয়ে তৈরি কর দু'খানা চাপাটি। তারপর আমি দেখে নিচ্ছি হনুমানজীকে—

খেতে বসেই কোনওদিকে না তাকিয়ে—মানে থালাসুদ্ধু লোপাট হওয়ার কোনও চান্স না দিয়েই রামগিদ্ধড় সেই লঙ্কাবাটা ভর্তি চাপাটি দু'খানা ছুঁড়ে দিলেন মাটিতে। আবার শব্দ হল 'হুপ'—হনুমান নেমে পড়ল, কুড়িয়ে নিলে চাপাটি, রোজকার মতো সেলাম করলে, তারপরেই টুপ করে গাছের ডালে। রামগিদ্ধড়ের কুলিরা তাঁর দু'পাশে লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে রইল যাতে কোনও অঘটন না ঘটে। আর দু' মিনিটের ভেতরেই গাছের ওপর থেকে নিদারুণ এক চিৎকার শোনা গেল। হনুমান এ-ডাল থেকে ও-ডালে লাফিয়ে বেড়াতে লাগল, আওয়াজ হতে লাগল : খ্যাঁ—খ্যাঁ—খ্যাঁ, খোঁ—খোঁ উপুস-গুপুস। পাখিরা চিৎকার করে পালাতে লাগল, গাছের ছেঁড়া পাতা উড়তে লাগল চারদিকে। মানে, দ্বিতীয়বার হনুমানের মুখ পুড়ল, আর শুরু হয়ে গেল দস্তুরমতো লঙ্কাকাণ্ড!

গাছ থেকে হনুমান চেঁচাতে লাগল : খ্যাঁ-খ্যাঁ-খ্যোঁ-খ্যোঁঃ, আর নীচ থেকে সদলবলে রামগিদ্ধড় হাসতে লাগলেন : হ্যাঃ-হ্যাঃ-হোঃ-হোঃ! হনুমান আজ আচ্ছা জব্দ হয়েছে। রামগিদ্ধড়ের চাপাটি লুঠ! মানুষ চেনো না! বোঝো এখন।

খানিকক্ষণ দাপাদাপি করে হনুমান কোন্‌দিকে ছটকে পড়ল কে জানে। আর রামগিদ্ধড় আরও আধ ঘণ্টা ভুঁড়ি-কাঁপানো অট্টহাসি হেসে তাঁর সেই জিপগাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন কাজ দেখতে। হনুমানের মুখ পুড়িয়ে মনে মনে তো বেজায় খুশি হয়েছেন, কিন্তু রামায়ণে রাবণের যে কী দশা হয়েছিল, সেটা বেমালুম ভুলে গেছেন তখন, টের পেলেন বিকেলেই।

কাজ দেখে যখন ফিরে আসছেন, বনের মধ্যে তখন ছায়া নেমেছে। দিব্যি ঝিরঝিরে হাওয়া বইছে, চারিদিকে পাখিটাখি ডাকছে, রামগিদ্ধড়ের মেজাজটাও ভারি খুশি হয়ে রয়েছে। আস্তে-আস্তে জিপ চলেছে আর রামগিদ্ধড় গুনগুন করে গান গাইছেন : আরে হাঁ—বনমে চলে রামচন্দ্রজী, সাথমে চলে লছমন ভাই—এই সময় জিপের ড্রাইভার বাঁটকুল সিং বললে, আরে এ কোন্ বেকুবের কাণ্ড। রাস্তাজুড়ে গাছের ডাল ভেঙে রেখেছে! এখন যাই কী করে? রামগিদ্ধড় দেখলেন তাই বটে। ছোট-বড় ডালপালা দিয়ে বনের ছোট পথটি যেন একেবারে ব্যারিকেড করে রাখা হয়েছে। বুনো লোকগুলোর কারবারই আলাদা। বিরক্ত হয়ে বললেন, গাড়ি থামিয়ে রাস্তা সাফ করো বাঁটকুল সিং। বাঁটুল সিং জিপ থেকে নেমে রাস্তা পরিষ্কার করতে যাচ্ছে, আর ঠিক তখন—গুপ—গাপ, হুপ—হুপ—গবাৎ—

সমস্ত বন যেন একসঙ্গে ডাক ছেড়ে উঠল। গাছের মাথায় মাথায় ঝড় বয়ে গেল, আর বললে বিশ্বাস করবিনে প্যালা, দুপ-দাপ শব্দে কোত্থেকে কমসে কম দেড়শো হনুমান লাফিয়ে পড়ে রামগিদ্ধড়বাবুর জিপগাড়ি ঘেরাও করে ফেললে। দ্বিতীয় লঙ্কাকাণ্ডের পর এ যেন দ্বিতীয় রাবণবধের ব্যবস্থা।

ব্যাপার দেখেই তো বাঁটুল সিংয়ের হয়ে গেছে। সে তো 'আরে বাপ' বলে বনবাদাড় ভেঙে দৌড়! রামগিদ্ধড়ও জিপ থেকে লাফিয়ে পড়লেন, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে গোদা হনুমান তাঁকে জাপটে ধরলে।

—বাবা-রে মা-রে—গেছি রে—বলে পরিত্রাহি হাঁক ছাড়লেন রামগিদ্ধড়, কিন্তু দেড়শো হনুমানের গুপ গাপ শব্দে তাঁর চ্যাঁচানি কোথায় তলিয়ে গেল। তখন কী হল বল দিকি? দুটো হনুমান তাঁর দু'কান শক্ত করে পাকড়ে ধরলে, একটা তাঁর দু'গালে ঠাঁই ঠাঁই করে বেশ ক'বার চড়িয়ে দিলে।

—জান গিয়া জান গিয়া—বলে যেই রামগিদ্ধড় চেঁচিয়ে উঠে হাঁক ছেড়েছেন, সঙ্গে-সঙ্গে সেই যে হনুমান—সকালে যাকে খুব জব্দ করেছিলেন, সে রামগিদ্ধড়ের মুখের ভেতর একখানা চাপাটি গলা পর্যন্ত ঠেসে দিলে।

কোন্ চাপাটি বুঝেছিস তো? মানে, লঙ্কা বাটায় লাল টুকটুকে সেই দোসরা নম্বরের চিজটি। জিভে সেটা লাগতে না লাগতেই রামগিদ্ধড়ের মুখে যেন আগুন জ্বলে উঠল। একবার ফেলে দিতে গেলেন মুখ থেকে—কিন্তু সাধ্য কী। তক্ষুনি দু'গালে ধাম-ধাম করে দুই থাপ্পড়!

অগত্যা রামগিদ্ধড় নিজের কীর্তি সেই চাপাটি খেলেন, মানে খেতেই হল তাঁকে। দেড়শো হনুমানের সঙ্গে তো আর চালাকি নয়। দেড়শো হাতের দেড়শোটি চাঁটি খেলে রামগিদ্ধড়ও রাম-ইঁদুর হয়ে যাবেন। কিন্তু চাঁটি বাঁচাতে যা খেলেন তা চাপাটি নয়—সোজাসুজি দাবানল—যাকে বলে! চিবুনি দিতেই চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়তে লাগল, মনে হতে লাগল, গলা থেকে চাঁদি পর্যন্ত কী বলে—একেবারে লেলিহান শিখায় জ্বলছে। রামগিদ্ধড় কেবল তারস্বরে বলতে পারলেন : জল—তার পরেই সব অন্ধকার!

ওদিকে কুলির দল আর বন্দুক-টন্দুক নিয়ে বাঁটকুল যখন ফিরে এল, তখন হনুমানদের এতটুকু চিহ্ন কোথাও নেই। কেবল রামগিদ্ধড় পথের মাঝখানে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। তারপর সেই চাপাটির চোট সামলাতে পাক্কা একটি মাস হাসপাতালে।

তাই বলছিলুম, আমার কাছে সার্কাসের শিম্পাঞ্জির গপ্পো আর করিসনি। আসল খেল দেখতে চাস তো সোজা কেওনঝড়ের জঙ্গলে চলে যা।

এই বলে পটলডাঙার টেনিদা আমার চাঁদিতে কড়াং করে একটা গাঁট্টা মারল আর তার পরেই তিন-চারটে বড়-বড় লাফ দিয়ে সোজা শ্রদ্ধানন্দ পার্কের দিকে হাওয়া হয়ে গেল।

তত্ত্বাবধান মানে—জীবে প্রেম

রবিবারের সকালে ডাক্তার মেজদা কাছাকাছি কোথাও নেই দেখে আমি মেজদার স্টেথিসকোপ কানে লাগিয়ে বাড়ির হুলোবেড়াল টুনির পেট পরীক্ষা করছিলুম। বেশ গুরগুর করে আওয়াজ হচ্ছে, মানে এতদিন ধরে যতগুলো নেংটি ইঁদুর আরশোলা টিকটিকি খেয়েছে তারা ওর পেটের ভেতরে ডাকাডাকি করছে বলে মনে হচ্ছিল। আমি টুনির পেট সম্পর্কে এইসব দারুণ দারুণ চিন্তা করছি, এমন সময় বাইরে থেকে টেনিদা ডাকল : প্যালা, কুইক—কুইক।

স্টেথিসকোপ রেখে এক লাফে বেরিয়ে এলুম বাড়ি থেকে।

—কী হয়েছে টেনিদা?

টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে, পুঁদিচ্চেরি!

মনে কোনওরকম উত্তেজনা এলেই টেনিদা ফরাসী ভাষায় কথা বলতে থাকে। তখন কে বলবে, স্রেফ ইংরিজির জন্যেই ওকে তিন-তিনবার স্কুল ফাইন্যালে আটকে যেতে হয়েছে!

আমি বললুম, পুঁদিচ্চেরি মানে?

—মানে ব্যাপার অত্যন্ত সাঙ্ঘাতিক। এক্ষুনি তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে। ক্যাবলা কিংবা হাবুল সেন কাউকে বাড়িতে পেলুম না—তাই সঙ্গে তোকেই নিয়ে যেতে এসেছি।

—কোথায় নিয়ে যাবে?

—কালীঘাটে।

—কালীঘাটে কেন?—আমি উৎসাহ বোধ করলুম।—কোথাও খাওয়া-টাওয়ার ব্যবস্থা আছে বুঝি?

—এটার দিন-রাত খালি খাওয়ার চিন্তা!—বলে টেনিদা আমার দিকে তাক করে চাঁটি তুলল, সঙ্গে সঙ্গে এক লাফে তিন হাত দূরে ছিটকে গেলুম আমি।

—মারামারি কেন আবার? কী বলতে চাও, খুলেই বলো না।

চাঁটিটা কষাতে না পেরে ভীষণ ব্যাজার হয়ে টেনিদা বললে, বলতে আর দিচ্ছিস কোথায়?—সমানে চামচিকের মতো চ্যাকচ্যাক করছিস তখন থেকে। হয়েছে কী জানিস, আমার পিসতুতো ভাই ভোম্বলদার ফ্ল্যাটটা একটু তত্ত্বাবধান—মানে সুপারভাইজ করে আসতে হবে।

—তোমার ভোম্বলদা কী করছেন? কম্বল গায়ে দিয়ে লম্বা হয়ে পড়ে আছেন?

—আরে না না! ভোম্বলদা, ভোম্বল-বৌদি, মায় ভোম্বলদার মেয়ে ব্যাম্বি—সবাই মিলে ঝাঁসি না গোয়ালিয়র কোথায় বেড়াতে গেছে। আজই সকালে সাড়ে দশটার গাড়িতে ওরা আসবে। এদিকে আমি তো স্রেফ ভুলে মেরে বসে আছি, বাড়ির কী যে হাল হয়েছে কিচ্ছু জানি না। চল—দু-জনে মিলে এই বেলা একটু সাফ-টাফ করে রাখি।

শুনে পিত্তি জ্বলে গেল।—আমি তোমার ভোম্বলদার চাকর নাকি যে ঘর ঝাঁট দিতে যাব? তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও।

টেনিদা নরম গলায় আমাকে বোঝাতে লাগল তখন।—ছি প্যালা, ওসব বলতে নেই—পাপ হয়। চাকরের কথা কেন বলছিস র‍্যা—এ হল পরোপকার। মানে জীবসেবা। আর জানিস তো—জীবে প্রেম করার মতো এমন ভালো কাজ আর কিচ্ছুটি নেই?

আমি মাথা নেড়ে বললুম, তোমার ভোম্বলদাকে প্রেম করে আমার লাভ কী? তার চেয়ে আমার হুলো বেড়াল টুনিই ভাল। সে ইঁদুর-টিদুর মারে।

টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, কলেজে ভর্তি হয়ে তুই আজকাল ভারি পাখোয়াজ হয়ে গেছিস—ভারি ঢাঁট হয়েছে তোর! আচ্ছা চল আমার সঙ্গে—বিকেলে তোকে চাচার হোটেলে কাটলেট খাওয়াব।

—সত্যি?

—তিন সত্যি। কালীঘাটের মা কালীর দিব্যি।

এরপরে জীবকে—মানে ভোম্বলদাকে প্রেম না করে আর থাকা যায়? দারুণ উৎসাহের সঙ্গে আমি বললুম, আচ্ছা চলো তাহলে।

বাড়িটা কালীঘাট পার্কের কাছেই। তেতলার ফ্ল্যাটে ভোম্বলদা থাকেন, ভোম্বল-বৌদি থাকেন, আর তিন বছরের মেয়ে ব্যাম্বি থাকে।

টেনিদা চাবি খুলতে যাচ্ছিল, আমি হাঁ-হাঁ করে বাধা দিলুম।

—আরে আরে, কার ঘর খুলছ? দেখছ না—নেম-প্লেট রয়েছে অলকেশ ব্যানার্জি, এম. এস-সি?

—ভোম্বলদার ভাল নামই তো অলকেশ।

শুনেই মন খারাপ হয়ে গেল। এমন নামটাই বরবাদ? ভোম্বলদার পোশাকি নাম দোলগোবিন্দ হওয়া উচিত। ভূতেশ্বর হতেও বাধা নেই, এমনকি করালীচরণও হতে পারে। কিন্তু অলকেশ একেবারেই বেমানান—আর অলকেশ হলে কিছুতেই ভোম্বলদা হওয়া উচিত নয়।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ-সব ভাবছি আর নাক চুলকোচ্ছি, হঠাৎ টেনিদা একটা হাঁক ছাড়ল।

—ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকবি নাকি হাঁ করে? ভেতরে আয়।

ঢুকে পড়লুম ভেতরে।

গোছাবার সাজাবার কিছু নেই—সবই ভোম্বল-বৌদি বেশ পরিপাটি করে রেখে

গেছেন। দিব্যি বসবার ঘরটি—আমি আরাম করে একটা সোফার ওপর বসে পড়লুম।

—এই, বসলি যে ?

—কী করব, করবার তো কিছুই নেই।

—তা বটে।—টেনিদা হতাশ হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখল একবার,—ধুলো-টুলোও তো বিশেষ পড়েনি দেখছি।

—বন্ধ ঘরে ধুলো আসবে কোত্থেকে ?

—হুঁ, তাই দেখছি। কিছুক্ষণ নাক-টাক চুলকে টেনিদা বললে, কোনও উপকার না করে চলে গেলে মনটা যে বড্ড হু-হু করবে র‍্যা ! আচ্ছা—একটা কাজ করলে হয় না ? ঘরে ধুলো না থাকলেও মেজের ওই কার্পেটটায় নিশ্চয় আছে। আর ধুলো থাকবে না অথচ কার্পেট থাকবে—এ কখনও হতেই পারে না, এমন কোনওদিন হয়নি। আয়—বরং এটাকে—

কার্পেট ঝাড়বার প্রস্তাবটা আমার একেবারেই ভালো লাগল না। আপত্তি করে বললুম, কার্পেট নিয়ে আবার টানাটানি কেন ? ও যেমন আছে তেমনি থাক না। খামকা—

—শাট আপ ! কাজ করবি নে তো মিথ্যেই ট্রাম ভাড়া দিয়ে তোকে কালীঘাটে নিয়ে এলুম নাকি ? সোফায় বসে আর নবাবী করতে হবে না প্যালা, নেমে আয় বলছি—

অগত্যা নামতে হল, সোফা আর টেবিল সরাতে হল, কার্পেট টেনে তুলতে হল, তারপর একবার—মাত্র একটি বার ঝাড়া দিতেই—ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস।

ঘরের ভেতরে যেন ঘূর্ণি উঠল একটা ! চোখের পলকে অন্ধকার !

টালা থেকে ট্যাংরা আর শেয়ালদা থেকে শিয়াখালা পর্যন্ত যত ধুলো ছিল একসঙ্গে পাক খেয়ে উঠল।—সেরেছে, সেরেছে, বলে এক বাঘা চিৎকার দিলুম আমি, তারপর দু-লাফে আমরা বেরিয়ে পড়লুম ঘর থেকে—নাকে ধুলো, কানে ধুলো, মুখে ধুলো, মাথায় ধুলো। পুরো দশটি মিনিট খক-খক খকাখক করে কাশির প্রতিযোগিতা। এর মধ্যে আবার কোত্থেকে গোটা দুই আরশোলা আমার নাকের ওপর ডিগবাজি খেয়েও গেল।

কাশি বন্ধ হলে মাথা-টাথা ঝেড়ে, মুখ-ভর্তি কিচকিচে বালি নিয়ে আমি বললুম, এটা কী হল টেনিদা ?

টেনিদা গাঁক-গাঁক করে বললে, হুঁ ! কেমন বেয়াড়া হয়ে গেল রে ! মানে এত ধুলো যে ওর ভেতরে থাকতে পারে—বোঝাই যায়নি ! ইস—ঘরটার অবস্থা দেখছিস ?

হ্যাঁ—দেখবার মতো চেহারাই হয়েছে এবার। দরজা দিয়ে তখনও ধোঁয়ার মতো ধুলো বেরুচ্ছে—সোফা, টেবিল, টিপয়, বুক-কেস, রেডিয়ো—সব কিছুর ওপর নিট তিন ইঞ্চি ধুলোর আস্তর ! ভোম্বল-বৌদি ঘরে পা দিয়েই স্রেফ অজ্ঞান হয়ে পড়বেন।

দু'-হাতে মাথা চুলকোতে চুলকোতে টেনিদা বললে, ইঃ—একেবারে নাইয়ে দিয়েছে রে !

আমি বললুম, ভালোই তো হল। কাজ করতে চাইছিলে, করো এবার প্রাণ খুলে ! সারা দিন ধরেই ঝাঁট দিতে থাকো।

দাঁত খিঁচোতে গিয়েই বালির কিচকিচানিতে টেনিদা খপাৎ করে মুখ বন্ধ করে ফেলল।

—তা ঝাঁট তো দিতেই হবে। বাড়িতে এসে এই দশা দেখবে নাকি ভোম্বলদা ?

—আবার ঝাড়তে হবে কার্পেট।

—নিকুচি করেছে কার্পেটের ! চল—ঝাঁটা খুঁজে বের করি।

ঝাঁটা আর পাওয়া যায় না। বসবার ঘরে নয়—শোবার ঘরে নয়, শেষ পর্যন্ত রান্নাঘরে এসে হাজির হলুম আমরা।

—আরে ওই তো ঝাঁটা !

তার আগে জাল-দেওয়া মিট-সেফের দিকে নজর পড়েছে আমার।

—টেনিদা।

—কী হল আবার ?—টেনিদা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললে, সারা ঘর ধুলোয় একাকার হয়ে রয়েছে—এখন আবার ডাকাডাকি কেন ? আয় শিগগির—একটু পরেই তো ওরা এসে পড়বে।

—আমি বলছিলুম কী—কান দুটো একবার চুলকে নিয়ে জবাব দিলুম : মিট-সেফের ভেতর যেন গোটা-তিনেক ডিম দেখা যাচ্ছে !

—তাতে কী হল ?

—একটা মাখনের টিনও দেখতে পাচ্ছি।

টেনিদার মনোযোগ আকৃষ্ট হল।

—আচ্ছা, বলে যা।

—দুটো কেরোসিন স্টোভ দেখতে পাচ্ছি—দু'-বোতল তেল দেখা যাচ্ছে—ওখানে শেলফের ওপর একটা দেশলাইও যেন চোখে পড়ছে।

—হুঁ, তারপর ?

আমি ওয়াশ-বেসিনটা খুললাম।

—এতেও জল আছে—দেখতে পাচ্ছ তো ?

—সবই দেখতে পাচ্ছি। তারপর ?

আমি আর একবার বাঁ কানটা চুলকে নিলুম : মানে সামনে এখন অনেক কাজ—যাকে বলে দুরূহ কর্তব্য ! ঘর থেকে ওই মনখানেক ধুলো ঝেঁটিয়ে বের করতে ঘন্টাখানেক তো মেহনত করতে হবে অন্তত ? আমি বলছিলুম কী, তার আগে একটু-কিছু খেয়ে নিলে হয় না ? ধরো তিনটে ডিম দিয়ে বেশ বড়-বড় দুটো ওমলেট হতে পারে—

—ব্যস-ব্যস, আর বলতে হবে না ! টেনিদার জিভ থেকে সড়াক করে একটা আওয়াজ বেরুল : এটা মন্দ বলিসনি। পেট খুশি থাকলে মেজাজটাও খুশি

থাকে।—আর এই যে একটা বিস্কুটের টিনও দেখতে পাচ্ছি—

পত্রপাঠ টিনটা টেনে নামাল টেনিদা, কিন্তু খুলেই মুখটা গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে, ধেৎ!

—কী হল, বিস্কুট নেই?

—নাঃ, কতগুলো ডালের বড়ি! ছ্যা-ছ্যা!—টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, জানিস, ভোম্বল-বৌদি এম. এ. পাশ, অথচ বিস্কুটের টিনে বড়ি রাখে। রামোঃ।

আমি বললুম, তাতে কী হয়েছে? আমার এলাহাবাদের সোনাদিও তো কী-সব থিসিস লিখে ডাক্তার হয়েছে—সেও তো ডালের বড়ি খেতে খুব ভালোবাসে!

—রেখে দে তোর সোনাদি!—টেনিদা ঠক করে বড়ির টিনটাকে একপাশে ঠেলে দিয়ে বললে, বলি, মতলব কী তোর? খালি তক্কোই করবি আমার সঙ্গে, না ওমলেট-টোমলেট ভাজবি?

—আচ্ছা, এসো তাহলে, লেগে পড়া যাক।

লেগে যেতে দেরি হল না। সসপ্যান বেরুল, ডিম বেরুল, চামচে বেরুল, লবণ বেরুল, লঙ্কার গুঁড়োও পাওয়া গেল খানিকটা। শুধু গোটা-দুই পেঁয়াজ পাওয়া গেলেই আর দুঃখ থাকত না কোথাও।

টেনিদা বললে, ডি লা গ্র্যান্ডি! আরে, ওতেই হবে। তুই ডিম তিনটে ফেটিয়ে ফ্যাল—আমি স্টোভ ধরাচ্ছি ততক্ষণে।

ওমলেট বরাবর খেয়েই এসেছি, কিন্তু কী করে যে ফেটাতে হয় সেটা কিছুতেই মনে করতে পারলুম না। নাকি, ফোটাতে বলছে? তা হলে তো তা দিতে হয়। কিন্তু তা দিতে থাকলে ও কি আর ডিম থাকবে? তখন তো বাচ্চা বেরিয়ে আসবে। আর বাচ্চা বেরিয়ে এলে আর ওমলেট খাওয়া যাবে না—তখন চিকেন কারি রান্না করতে হবে। আর তাহলে—

টেনিদা বললে, অমন টিকটিকির মতো মুখ করে বসে আছিস কেন র‍্যা? তোকে ডিম ফেটাতে বললুম না?

—ফেটাতে বলছ? মানে ফাটাতে হবে? নাকি ফোটাতে বলছ? ফোটাতে আমি পারব না সাফ বলে দিচ্ছি তোমাকে।

—কী জ্বালা!—টেনিদা খেঁকিয়ে উঠল: কোনও কাজের নয় এই হতচ্ছাড়াটা—খালি খেতেই জানে। ডিম কী করে ফেটাতে হয় তাও বলে দিতে হবে? গোড়াতে মুখগুলো একটু ভেঙে নে—তারপর পেয়ালায় ঢেলে চামচ দিয়ে বেশ করে নাড়তে থাক। বুঝেছিস?

আরে তাই তো। এতক্ষণে মালুম হল আমার। আমাদের পটলডাঙার 'দি গ্রেট আবার-খাবো রেস্তোরাঁ'র বয় কেষ্টাকে অনেকবার কাচের গেলাসে ডিমের গোলা মেশাতে দেখেছি বটে।

পয়লা ডিমটা ভাঙতেই একটা বিচ্ছিরি বদ গন্ধে সারা ঘর ভরে উঠল। দোসরা ডিম থেকেও সেই খোশবু।

নাক টিপে ধরে বললুম, টেনিদা—যাচ্ছেতাই গন্ধ বেরুচ্ছে কিন্তু ডিম থেকে!

টেনিদা স্টোভে তেল ভরতে-ভরতে বললে, ডিম থেকে কবে আবার গোলাপ ফুলের গন্ধ বেরোয়? নাকি ডিম ভাঙলে তা থেকে হালুয়ার সুবাস বেরুবে? নে—নিজের কাজ করে যা।

—পচা বলে মনে হচ্ছে আমার।

—তোর মাথার ঘিলুগুলোই পচে গেছে—টেনিদা চটে বললে, একটা ভালো কাজের গোড়াতেই তুই বাগড়া দিবি! নে—হাত চালা। তোর ইচ্ছে না হয় খাসনি—আমি যা পারি ম্যানেজ করে নেব।

—করো, তুমিই করো তবে—বলে যেই তেসরা নম্বর ডিম মেজেতে ঠুকেছি—

গলগল করে মেজে থেকে যে বস্তু বেরিয়ে এল, তার যে কী নাম দেব তা আমি আজও জানি না। আর গন্ধ? মনে হল দুনিয়ার সমস্ত বিকট বদ গন্ধকে কে যেন ওর মধ্যে ঠেসে রেখেছিল—একেবারে বোমার মতো ফেটে বেরিয়ে এল তারা। মনে হল, এক্ষুনি আমার দম আটকে যাবে!

—গেছি—গেছি—বলে আমি একদম ঠিকরে পড়লুম বাইরে। সেই দুর্ধর্ষ মারাত্মক গন্ধের ধাক্কায় বোঁ করে যেন মাথাটা ঘুরে গেল, আর আমি দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লুম শিবনেত্র হয়ে।

—উরে ব্বাপ—ই কী গন্ধ র‍্যা!—টেনিদার একটা আর্তনাদ শোনা গেল। তারপর—

এবং তারপরেই—

টেনিদাও খুব সম্ভব একটা লাফ মেরেছিল। এবং পেল্লায় লাফ! পায়ের ধাক্কায় জ্বলন্ত কেরোসিন স্টোভটা তেল ছড়াতে ছড়াতে বলের মতো গড়িয়ে এল—সোজা গিয়ে হাজির হল ভোম্বলদার শোবার ঘরের দরজার সামনে। আর ভোম্বল-বৌদির সাধের সম্বলপুরী পর্দা দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল তৎক্ষণাৎ!

টেনিদা বললে, আগুন—আগুন—ফায়ার ব্রিগেড—বসবার ঘরে টেলিফোন আছে প্যালা—দৌড়ে যা—জিরো ডায়েল—ফায়ার ব্রিগেড—

ঊর্ধ্বশ্বাসে ফোন করতে ঢুকেছি, সেই স্তূপাকার কার্পেটে পা আটকে গেল। হাতে টেলিফোনও তুলেছিলুম, সেইটে সুদ্ধুই ধপাস করে রাম-আছাড় খেলুম একটা। ক্র্যাং—কড়াৎ করে আওয়াজ উঠল। টেলিফোনের মাউথ-পিসটা সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে দু'-টুকরো। যাক, নিশ্চিন্দি! ফায়ার ব্রিগেডকে আর ডাকতে হল না!

উঠে বসবার আগেই ঝপাস—ঝপাস!

টেনিদা দৌড়ে বাথরুমে ঢুকেছে, আর দু-বালতি পনেরো দিনের পচা জল চৌবাচ্চা থেকে তুলে এনে ছুড়ে দিয়েছে সম্বলপুরী পর্দার ওপর। আধখানা পর্দা পুড়িয়ে আগুন নিবেছে, কিন্তু শোবার ঘরে জলের ঢেউ খেলছে—বিছানা-পত্র ভিজে একাকার, খানিকটা জল চলকে গিয়ে ড্রেসিং টেবিলটাকেও সাফ-সুফ করে দিয়েছে।

নিজেদের কীর্তির দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম আমরা। বাড়ি-ভর্তি পচা ডিম আর পোড়া কাপড়ের গন্ধ—বসবার ঘরে দু'ইঞ্চি ধুলোর আস্তর—শোবার

ঘর আর বারান্দা জলে থই-থই—আধ-পোড়া পর্দাটা থেকে জল চুইয়ে পড়ছে, টেলিফোনটা ভেঙে চুরমার।

একেই বলে বাড়ি সুপারভাইজ করা—এর নামই জীবে প্রেম।

ঠিক তখনই নিচ থেকে ট্যাক্সির হর্ন বেজে উঠল—ভ্যাঁ—ভ্যাঁপ—প্!

টেনিদা নড়ে উঠল—সঙ্গে সঙ্গে মাথা সাফ হয়ে গেছে ওর। চিরকালই দেখে আসছি এটা।

—প্যাল্যা, কুইক!

কিসের কুইক সে-কথাও কি বলতে হবে আর? আমিও পটলডাঙার ছেলে—ট্যাক্সির হর্ন শুনেই বুঝতে পেরেছি সব। সিঁড়ি দিয়ে তো নামলুম না—যেন উড়ে পড়লুম রাস্তায়।

ট্যাক্সি থেকে ভোম্বলদা নামছেন, ভোম্বল-বৌদি নামছেন, ভোম্বলদার ছোকরা চাকর জলধরের কোলে ব্যাম্বি নামছে।

আমাদের দেখেই ভোম্বলদা চেঁচিয়ে উঠলেন—কিরে টেনি, বাড়িঘর সব—

—সব ঠিক আছে ভোম্বলদা—একেবারে ছবির মতো সাজিয়ে দিয়ে এসেছি!—বলেই টেনিদা চাবির গোছাটা ছুড়ে দিলে ভোম্বলদার দিকে। তারপর হতভম্ব ভোম্বলদা একটা কথা বলবার আগেই দু'-জনে দু-লাফে একটা দু'-নম্বর চলতি বাসের ওপর।

আর দাঁড়ানো চলে এরপর? এক সেকেণ্ডও?

দশাননচরিত

আমি খুব উত্তেজিত হয়ে টেনিদাকে বললুম, 'হ্যারিসন রোডের লোকে একটা পকেটমারকে ধরেছে।'

টেনিদা আমার দিকে কী রকম উদাসভাবে চেয়ে রইল খানিকক্ষণ।

'তারপর?'

'তারপর আর কী! থানায় নিয়ে গেল।'

'লোকে পিটতে চেষ্টা করেনি?'

'করেনি আবার? ভাগ্যিস একজন পুলিস এসে পড়েছিল। সে হাতজোড় করে বললে—দাদারা, মেরে আর কী করবেন? মার খেয়ে খেয়ে এদের তো গায়ের চামড়া গণ্ডারের মতো পুরু হয়ে গেছে। অনর্থক আপনাদের হাত ব্যথা হয়ে যাবে। তার চাইতে ছেড়ে দিন—এ মাসখানেক জেলখানায় কাটিয়ে আসুক, ততদিন আপনাদের পকেটগুলো নিরাপদে থাকবে।'

'বেশ হয়েছে।'—বলে টেনিদা গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর মস্ত একটা ঠোঙা

থেকে একমনে কুড়কুড় করে ডালমুট খেতে লাগল।

আমি ওর পাশে বসে পড়ে বললুম, 'আমাকে ডালমুট দিলে না?'

'তোকে?'—টেনিদা উদাস হয়ে ডালমুট খেতে খেতে বললে, 'না—তোকে দেবার মতো মুড নেই এখন। আমি এখন ভীষণ ভাবুক-ভাবুক বোধ করছি।'

'ভাবুক-ভাবুক!'—শুনে আমার খুব উৎসাহ হল: 'তুমি কবিতা লিখবে বুঝি?'

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বলল, 'দুত্তোর কবিতা! ও-সবের মধ্যে আমি নেই। যারা কবিতা লেখে, তারা আবার মনিষ্যি থাকে নাকি? তারা রাস্তায় চলতে গেলেই গাড়ি চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে যায়, নেমন্তন্ন-বাড়িতে তাদের জুতো চুরি হয়, বোশেখ মাসের গরমে যখন লোকের প্রাণ আইঢাই করে—তখন তারা দোর বন্ধ করে পদ্য লেখে—"বাদলরাণীর নূপুর বাজে তাল-পিয়ালের বনে!" দুদ্দুর।'

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, 'বোশেখ মাসের দুপুরে বাদলরাণীর কবিতা লেখে কেন?'

টেনিদা মুখটাকে ডিমভাজার মতো করে বললে, 'এটাও বুঝতে পারলি না? বোশেখ মাসে কবিতা লিখে না পাঠালে আষাঢ় মাসে ছাপা হবে কী করে? যা—যা, কবিতা লেখার কথা আমাকে আর তুই বলিসনি। যত্তো সব ইয়ে—!'

আমি বললুম, 'তবে তুমি ও-রকম ভাবুক-ভাবুক হয়ে গেলে কেন!'

'ওই পকেটমারের কথা শুনে।'

'পকেটমারের কথা শুনে কেউ ভাবুক হয় নাকি আবার?' আমি বললুম, 'সবাই তো তাকে রে-রে-রে করে ঠ্যাঙাবার জন্যে দৌড়ে যায়। আমারও যেতে ইচ্ছে করে। এই তো সেদিন হাওড়ার ট্রামে আমার বড় পিসেমশায়ের পকেট থেকে—'

'ইউ শাট আপ প্যালা—' টেনিদা চটে গেল: 'কুরুবকের মতো সব সময় বকবক করবি না—এই বলে দিচ্ছি তোকে। পঞ্চাননের ঠাকুর্দা দশাননের কথা যদি জানতিস, তা হলে বুঝতে পারতিস—এক-একটা পকেটমারও কী বলে গিয়ে—এই মহাপুরুষ হয়ে যায়।'

'কে পঞ্চানন? কে-ই বা দশানন? আমি তো তাদের কাউকেই চিনি না।'

'দুনিয়া-সুদ্ধ সবাইকে তুই চিনিস নাকি? জাপানের বিখ্যাত গাইয়ে তাকানাচিকে চিনিস তুই?'

আমি বললুম, 'না।'

'লন্ডনের মুরগির দোকানদার মিস্টার চিকেনসনের সঙ্গে তোর আলাপ আছে?'

'উহুঁ।'

'ফ্রান্সের সানাইওলা মঁসিয়ো প্যাঁকে দেখেছিস কোনওদিন?'

'না—দেখিনি। দেখতেও চাই না কখনও।'

'তা হলে?'—টেনিদা আলুকাবলির মতো গম্ভীর হয়ে গেল: 'তা হলে পঞ্চাননের ঠাকুর্দা দশাননকেই বা তুই চিনবি কেন?'

'ঢের হয়েছে, আর চিনতে চাই না। তুমি যা বলছিলে বলে যাও।'

'বলতেই তো যাচ্ছিলুম—টেনিদা আবার কিছুক্ষণ কুড়মুড় করে ডালমুট চিবিয়ে

ঠোঙাটা আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে, 'খা। আমি তোকে ব্যাপারটা বলি ততক্ষণে।'

আমি ঠোঙাটা হাতে নিয়ে দেখলুম খালি। ফেলে দিতে যাচ্ছি হঠাৎ দেখি একেবারে নীচের দিকে, টেনিদার চোখ এড়িয়ে কী করে একটা চীনেবাদামের দানা আটকে আছে। সেটা বের করেই আমি মুখে পুরে দিলুম। আড়চোখে দেখে টেনিদা বললে, 'ইস, একটা বাদাম ছিল নাকি রে ? একদম দেখতেই পাইনি। যাকগে, ওটা তোকে বকশিশ করে দিলুম।'

আমি বললুম, 'সবই পঞ্চাননের ঠাকুর্দা দশাননের দয়া।'

টেনিদা বললে, 'যা বলেছিস। আচ্ছা, এবার দশাননের কথাই বলি।'

—'বুঝলি, কখনও যদি তুই ঘুঁটেপাড়ায় যাস—'

'আমি বললুম, 'ঘুঁটেপাড়া আবার কোথায় ?'

'সে গোবরডাঙা থেকে যেতে হয়—সাত ক্রোশ হেঁটে। মানে, যাওয়া খুব মুস্কিল। কিন্তু যদি কখনও যাস—দেখবি দশানন হালদারের নাম শুনলে লোকে এখনও মাটিতে মাথা নামিয়ে পেন্নাম করে। বলে, "এমন ধার্মিক, এমন দানবীর আর হয় না। ইস্কুল করেছেন, গরিব-দুঃখীকে দু'বেলা খেতে দিয়েছেন, মন্দির গড়েছেন, পুকুর কেটেছেন।" কিন্তু আসলে এই দশানন কে ছিল, জানিস ? এক নম্বরের পকেটমার।'

'পকেটমার ?'

'তবে আর বলছি কী ? অমন ঘোড়েল পকেটমার আর দু'জন জন্মেছে কিনা সন্দেহ। পাঠশালায় যেদিন প্রথম পড়তে গেল, সেদিনই পণ্ডিত-মশাইয়ের ফতুয়ার পকেট থেকে তাঁর নস্যির ডিবে চুরি করে নিলে। পণ্ডিত তাকে কষে বেত-পেটা করে তাড়িয়ে দিলেন। বাপ-কাকা-দাদা—তার হাত থেকে কারও পকেটের রেহাই ছিল না। যত পিট্টি খেত, ততই তার রোখ চেপে যেত। শেষে যখন একদিন বাড়িতে গুরুদেব এসেছেন আর দশানন তার ট্যাঁক থেকে প্রণামীর বারো টাকা ছ'আনা পয়সা মেরে নিয়েছে—সেদিন দশাননের বাপ শতানন হালদারের আর সইল না। বাড়ির মোষবলির খাঁড়াটা উঁচিয়ে দশাননকে সে এমন তাড়া লাগাল যে দশানন এক দৌড়ে একেবারে কলকাতায় পৌঁছে তবে হাঁফ ছাড়ল।

'আর জানিস তো, কলকাতা মানেই পকেটমারের স্বর্গ। অনেক গুণী লোক তো আগে থেকেই ছিল, কিন্তু বছরখানেকের ভেতর দশানন তাদের সম্রাট হয়ে উঠল। তার উৎপাতে লোকে পাগল হয়ে গেল। টালা থেকে টালিগঞ্জ আর শেয়ালদা থেকে শালকে পর্যন্ত, কারুর পকেটের টাকা-কড়ি কলম থেকে মায় সুপুরির কুচি কিংবা এলাচ-দানা পর্যন্ত বাদ যেত না।

'ধরা যে পড়ত না, তা নয়। দু'মাস ছ'মাস জেল খাটত, তারপর বেরিয়ে এসে আবার যে-কে সেই। পুলিশ সুদ্ধু জেরবার হয়ে উঠল। তখন দেশে ইংরেজ রাজত্ব ছিল, জানিস তো ? পুলিশ কমিশনার ছিল এক কড়া সাহেব—মিস্টার প্যাম্প্টার না কী যেন নাম। লোকে তার কাছে গিয়ে ধরনা দিতে লাগল। প্যাম্প্টার তাদের বললে, "পকেটমারকে ফাঁসি ডেওয়া যায় না—নটুবা আমি ডশাননকে টাই ডিটাম। এবার ঢরিতে পারিলে টাহাকে এমন শিক্ষা ডিব যে সে আর পকেট কাটিবে না।"

'ধরা অবশ্য দশানন ক'দিন বাদেই পড়ল। পকেটমারের ব্যাপার তো জানিস, ওরা প্রায়ই জেলে গিয়ে মুখ বদলে আসে—ওদের ভালোই লাগে বোধ হয়। কিন্তু এবার দশানন ধরা পড়বামাত্র তাকে নিয়ে যাওয়া হল প্যাম্প্টার সাহেবের কাছে। সাহেব বললে, "ওয়েল ডশানন, টুমি টো কলিকাটায় লোককে ঠাকিটে ডিবে না। টাই এবার টোমার একটা পাকা বণ্ডোবসটো করিতেছি।"—এই বলে সে হুকুম দিলে, "ইহাকে লঞ্চে করিয়া লইয়া গিয়া সুণ্ডরবনে (মানে সুন্দরবনে) ছাড়িয়া ডাও—সেখানে গিয়া এ কাহার পকেট মারে ডেখিব। বাঘের তো আর পকেট নাই।"

'দশানন বিস্তর কান্নাকাটি করল, "আর করব না স্যার—এ-যাত্রা ছেড়ে দিন স্যার" বলে অনেক হাতে পায়ে ধরল, কিন্তু চিঁড়ে ভিজল না। সাহেব ঠাট্টা করে বললে, "যাও—বাঘের পকেট মারিটে চেষ্টা করো। যডি পারো, টোমাকে রায় সাহেব উপাটি ডিব।"

'তারপরে আর কী ? পুলিস লঞ্চে করে দশাননকে নিয়ে গেল সুন্দরবনে। সেখানে তাকে নামিয়েই তারা দে-চম্পট। তাদেরও তো বাঘের ভয় আছে।

'এদিকে দশাননের তো আত্মারাম খাঁচাছাড়া। জলে গিজগিজ করছে কুমির—ঝোপে ঝোপে মানুষখেকো বাঘ—সুন্দরবন মানেই যমের আড়ত। এর চাইতে সাহেব যে তাকে ফাঁসিতে ঝোলালেও ভালো করত !

'বেলা পড়ে আসছিল, একটু দূরেই কোথায় হালুম-হালুম ডাক শোনা গেল। দশানন একেবারে চোখ-কান বুজে ছুটল। সুঁদরী গাছের শেকড়ে হোঁচট খেয়ে, গোলপাতার ঝোপে আছাড় খেয়ে—দৌড়তে দৌড়তে দেখে সামনে এক মস্ত ভাঙা বাড়ি। আদ্যিকালের পুরনো—ইট-কাঠ খসে পড়ছে, তবু অনেকখানি এখনও দাঁড়িয়ে। মরিয়া হয়ে দশানন ঢুকে গেল তারই ভেতরে। হাজার হোক, বাড়ি তো বটে।

'ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতেই দেখে সামনে একটা মস্ত ঘর। দরজায় তার মাকড়সার জাল, ভেতরে কত জন্মের ধুলো। তবু ঘরটা বেশ আস্ত আছে। একটু সাফসুফ করে নিলে শোওয়াও যাবে একপাশে। দেশলাই জ্বেলে, সাবধানে সব দেখে নিলে দশানন। না-সাপ-খোপ নেই। আর দোতলার ঘর—বাঘও চট করে এখানে উঠে আসবে না। শুধু দশানন ঘরে ঢুকতে ঝটপট করে কতগুলো চামচিকে বেরিয়ে এল—তা বেরোক, চামচিকেকে তার ভয় নেই।

'ক্যানিং-এর বাজার থেকে পুলিশ তাকে এক চাঙারি খাবার দিয়েছিল, মনের দুঃখে তাই খানিকটা খেল দশানন। বাইরে তখন দারুণ অন্ধকার নেমেছে। ঝিঁঝিঁ ডাকছে, পোকা ডাকছে—অনেক দূর থেকে বাঘের ডাকও আসছে। "জয় মা কালী" বলে কাপড় জড়িয়ে ঘরের এক কোনায় শুয়ে পড়ল দশানন। রাতটা তো

কাটুক—কাল সকালে যা হয় দেখা যাবে।

'বাঘের ডাক, ঝিঁঝির শব্দ, জঙ্গলের পাতায়-পাতায় হাওয়ায় আওয়াজ আর মশার কামড়ের ভেতরে ভয়-ভাবনায় কখন যে দশানন ঘুমিয়ে পড়েছে জানে না। কতক্ষণ ধরে ঘুমুচ্ছিল, তাও না। হঠাৎ একসময়ে সে চমকে জেগে উঠল। দেখল, ভাঙা জানলা দিয়ে ঘরের ভেতরে জ্যোৎস্না পড়েছে—আর সেই জ্যোৎস্নার মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক বিরাট পুরুষ। তার পোশাক-আশাক থিয়েটারের মোগল সেনাপতির মতো। মুখে লম্বা দাড়ি, মাথায় পাগড়ি। আগুনের মতো তার চোখ দুটো দপদপ করে জ্বলছে।

'দশাননের হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বুঝতে বাকি রইল না—ওটা ভূত। তাও যে-সে ভূত নয়—একেবারে মোগলাই ভূত!

'ভূত বাজখাঁই গলায় বললে, "এই বেতমিজ, তুই কে রে? আমার প্রাসাদে ঢুকেছিস কেন?"

'দশানন একটু সামলে নিলে। উঠে সামনে এসে একেবারে মাটিতে লুটিয়ে প্রণাম করলে ভূতকে। বললে, "হুজুর, আমায় মাপ করবেন। আমি কিছুই জানতুম না। সন্ধেবেলায় বাঘের ভয়ে ছুটতে ছুটতে এখানে এসে আশ্রয় নিয়েছি। দয়া করে রাতটার মতো আমায় থাকতে দিন। ভেরে উঠেই চলে যাব।"

'ভূত খুশি হল। চাপদাড়ির ফাঁকে হেসে বললে, "ঠিক আছে, থেকে যা। তুই যখন আমার আশ্রয় নিয়েছিস, তখন তোকে কিছু বললে আমার গুণাহ্ (মানে পাপ) হবে। কিন্তু তোর বাড়ি কোথায়?"

"আজ্ঞে বাংলাদেশে।"

"বেশ—বেশ, উঠে দাঁড়া।"

'দশানন উঠে ভূতের সামনে দাঁড়াল। ভূত খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল তাকে। তারপর বললে, "তোর বেশ সাহস-টাহস আছে দেখছি। আমার একটা কাজ করতে পারবি?"

"আজ্ঞে, হুকুম করলেই পারি।"—দশানন খুব বিনীত হয়ে হাত কচলাতে লাগল।

"তুই একবার নবাব সিরাজদ্দৌলার কাছে যেতে পারিস?"

"আজ্ঞে কার কাছে?"—দশানন ঘাবড়ে গেল।

"কেন—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজদ্দৌলার নাম শুনিসনি?"—ভূত খুব আশ্চর্য হল: তুই কোথাকার গাধা রে।"

"নাম জানি বই কি হুজুর, বিলক্ষণ জানি।"—দশানন মাথা চুলকে বললে, "কিন্তু তিনি তো অনেকদিন আগে মারা গেছেন—আমি কী করে তাঁর কাছে—"

"মারা গেছেন? নবাব সিরাজদ্দৌলা! সে কি রে! পলাশীর যুদ্ধের পরে তিনি রাজমহলের দিকে রওনা হলেন, আমাকে বললেন—'মনসবদার জবরদস্ত খাঁ, তুমি আমার এইসব মণিমুক্তাগুলো নিয়ে কোথাও লুকিয়ে থাকো এখন। আমি এরপরে

আবার ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করব, তখন তোমাকে দরকার হবে—তোমায় আমি ডেকে পাঠাব। ততক্ষণ তুমি সুন্দরবনের প্রাসাদে গিয়ে লুকিয়ে থাকো।" সেই থেকে আমি আছি এখানে। কবে আমার এন্তেকাল (মানে মৃত্যু) হয়েছে, কিন্তু নবাবের ডাক শোনবার জন্যে আমি বসে আছি, আর আমার দুই জেবে (মানে পকেটে) লাখ লাখ টাকার হীরে-মোতি বয়ে বেড়াচ্ছি। দেখবি?"

'বলেই জবরদস্ত খাঁ তার জেবের পকেট থেকে দু'-হাত ভর্তি করে মণিমুক্তো বের করল। চাঁদের আলোয় সেগুলো ঝলমল করতে লাগল, দেখে চোখ ঠিকরে বেরুল দশাননের। মাথা ঘুরে যায় আর কি।

'জবরদস্ত খাঁ সেগুলো আবার পকেটে পুরে বললে—"আর তুই বলছিস নবাব বেঁচে নেই? না—হতেই পারে না। তা হলে নিজেকেই এবার আমায় খুঁজতে যেতে হচ্ছে।"

'দশানন চুপ করে রইল।

'জবরদস্ত খাঁ বললে, "প্রথমে যাই মুর্শিদাবাদে, তারপরে যাব রাজমহল, তারপর মুঙ্গের পর্যন্ত ঘুরে আসব। তুই আজ রাতে আমার প্রাসাদে থাকতে পারিস। কোনও ভয় নেই—মনসবদার জবরদস্ত খাঁর মঞ্জিলে বাঘও ঢুকতে সাহস পাবে না। কিন্তু কাল সকালেই কেটে পড়বি। ফিরে এসে যদি দেখি তুই রয়েছিস, তা হলে তক্ষুনি কিন্তু তোর গর্দান নিয়ে নেব।"

'এই বলেই, জবরদস্ত খাঁ ধাঁ করে চাঁদের আলোর মধ্যে মিশে গেল।

'আর দশানন? যা থাকে কপালে বলে, তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ল ভূতের বাড়ি থেকে। অন্ধকারে খানিক হেঁটে একটা গাছে উঠে রাত কাটালে। সকালে নদীর ধারে গিয়ে দূরে একটা জেলেদের নৌকো চোখে পড়ল—বিস্তর ডাকাডাকি করে, তাদের নৌকোয় উঠে দেশে চলে এল।

'আর তারপর?

'তারপর দেশে ফিরে অতিথিশালা করল, পুকুর কাটাল, গরিবকে দান-ধ্যান করতে লাগল, মহাপুরুষ হয়ে গেল—'

আমি বাধা দিয়ে বললুম, 'বা-রে, টাকা পেল কোথায়?'

'টাকার অভাব কী রে গর্দভ? জবরদস্ত খাঁর পকেট মেরে এক থাবা মণি-মুক্তো তুলে নিয়েছিল না?'

'অ্যাঁ!'—আমি খাবি খেলুম: 'ভূতের পকেট কেটে?'

'যে কাটতে পারে—ভূতের পকেটই বা সে রেয়াত করবে কেন?'—টেনিদা হাসল: 'অমন এক্সপার্ট হাত। কিন্তু ওইতেই তো তার স্বভাব-চরিত্তির একেবারে বদলে গেল।' স্বয়ং নবাব সিরাজদ্দৌলার মণি-মুক্তো—সেগুলো কি আর বাজে খরচ করা যায় রে? ও-সব বেচে লাখ লাখ টাকা পেল দশানন; আর তাই দিয়ে পরের উপকার করতে লাগল—মহাপুরুষ বনে গেল একেবারে।'

'আর প্যাম্বার সাহেব?'

'বাঘের পকেট কাটলে রায়সাহেব উপাধি দেবে বলেছিল, ভূতের পকেট

কেটেছে জানলে তো মহারাজা-টহারাজা করে দিত। কিন্তু জানিস তো—ইংরেজ নবাবের শত্রু। শুনলেই কেড়ে নিত ওগুলো। তাই বলছিলুম প্যালা, পকেটমারকেও তুচ্ছ করতে নেই, সেও যে কখন কী হয়ে যায়—'

আমি বললুম, 'বাজে কথা—সব বানানো।'

'বানানো?' টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'ইউ প্যালা—ইউ গেট আউট—।'

গেট-আউট আর কী করে হয়, রাস্তার ধারেই তো বসেছিলুম দু'-জনে। আমি টেনিদার গাঁট্টা এড়াবার জন্যে ঝাঁ করে পটলডাঙা স্ট্রিটে লাফিয়ে পড়লুম।

দি গ্রেট ছাঁটাই

—ডি-লা-গ্র্যাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—

এই পর্যন্ত যেই বলেছি, অমনি খ্যাঁক-খ্যাঁক করে তেড়ে এসেছে টেনিদা।

—টেক কেয়ার প্যালা, সাবধান করে দিচ্ছি। মেফিস্টোফিলিস পর্যন্ত সহ্য করেছি, কিন্তু 'ইয়াক ইয়াক' বলবি তো এক চাঁটিতে তোর কান দুটোকে কোন্নগরে পাঠিয়ে দেব।

সেই ঢাউস ঘুড়িতে ওড়বার পর থেকেই বিচ্ছিরি রকমের চটে রয়েছে টেনিদা। ইয়াক শব্দ শুনলেই ওর মনে হয়, এক্ষুনি বুঝি ঝপাং করে গঙ্গার জলে গিয়ে পড়বে। সেদিন গণেশমামা কায়দা করে ইংরেজীতে বলছিল: ইয়া-ইয়া। শুনে টেনিদা তাকে মারে আর কি।

শেষে হাবুল সেন গিয়ে ঠাণ্ডা করে: আহা, খামকা চেইত্যা যাওয়া ক্যান? পেন্টুলুন পইর‍্যা ইংরাজী কইত্যাছে।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বলেছি, কেন, স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ফলাবার দরকারটা কী? এই জন্যেই জাতির আজ বড় দুর্দিন।...শেষ কথাটা টেনিদা আমাদের পাড়ার শ্রদ্ধানন্দ পার্ক থেকে মেরে দিয়েছে। ওখানে অনেক মিটিং হয়, আর সবাই বলে, জাতির আজ বড় দুর্দিন। কাউকে বলতে শুনিনি, জাতির আজ ভারি সুদিন। অথচ যাওয়ার সময় দেখি, দিব্যি পান চিবুতে-চিবুতে মোটরে গিয়ে উঠল। মরুক গে, জাতির দিন যেমনই হোক আমার আজকের দিনটা দারুণ রকমের ভালো। মানে, আজ সন্ধেয় আমাদের বল্টুদার পিসতুতো ভাই হুলোদার বউভাত। বল্টুদা আমাকে খেতে বলেছে। আমি বললুম, বা-রে মন খুশি হলে একটুখানি ফুর্তিও করতে পারব না?

—ফুর্তি? বলি হঠাৎ এত ফুরতিটা কিসের? আমি সকাল থেকে একটুখানি আলু-কাবলী খেতে পাইনি—চার পয়সার ডালমুটও না। মনের দুঃখে মরমে মরে আছি, আর তুই কুচো চিংড়ির মতো লাফাচ্ছিস?

বললুম, লাফাব না তো কী? আজ হুলোদার বউভাত।

—হুলোদার বউভাত?—টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটার ভেতর থেকে ফুড়ুত করে একটা আওয়াজ বের করে বললে, তাতে তোর কী?

—দারুণ খ্যাঁট হবে সন্ধেবেলায়।

—হুলোদার বউভাতে খ্যাঁট?

টেনিদার নাক থেকে আবার ফুড়ুত করে আওয়াজ বেরুল: মানে নেংটি ইঁদুরের কালিয়া, টিকটিকির ডালনা, আরশোলার চাটনি—

—কক্ষনো না।—আমি ভীষণভাবে আপত্তি করে বললুম, লুচি-পোলাও-মাংস চপ-ফ্রাই-দই-ক্ষীর-দরবেশ—

টেনিদা প্রায় হাহাকার করে উঠল: আর বলিসনি, আমি এক্ষুনি হার্টফেল করব। সকাল থেকে একটুখানি আলু-কাবলি অবধি খাইনি, আর তুই আমাকে এমন করে দাগা দিচ্ছিস? গো-হত্যের পাপে পড়ে যাবি প্যালা, এই বলে দিচ্ছি তোকে।

শুনে আমার দুঃখু হল। আমি চুপ করে রইলুম।

—হ্যাঁ রে, আমাকে তো বলেনি।

আমি বললুম, না বলেনি।

—আমি যদি তোর সঙ্গে যাই? মানে, তোর তো পেট-টেট ভালো নয়—বেশি খেয়ে-টেয়ে একটা কেলেঙ্কারি যাতে না করিস, সেইজন্যে যদি তোকে পাহারা দিতে—

আমি বললুম, চালাকি চলবে না। হুলোদার বাবা ভীষণ রাগী লোক। কান পর্যন্ত গোঁফ। দু'বেলা দু'টো একমনী মুগুর ভাঁজেন। বিনা নেমন্তন্নে খেতে গেলে তোমাকে ছাদ থেকে ফুটপাথে ফেলে দেবেন।

টেনিদা ভারি ব্যাজার হয়ে গেল। বললে, আমি দেখছি, যে-সব বাবার বড়-বড় গোঁফ থাকে তারাই এমনি যাচ্ছেতাই হয়। বোধ হয় নিজেদের বাঘ-সিঙ্গী বলে ভাবে। আর যে-সব বাবা গোঁফ কামায় মেজাজ খুব মোলায়েম। দেখলেই মনে হয় এক্ষুনি মিহি গলায় বলবে, খোকা, দুটো রসগোল্লা খাবে? আর গোঁফওয়ালা বাবাদের ছেলেরা দু'বেলা গাঁট্টা খায়।

এই সকালবেলায় গোঁফ নিয়ে বকবকানি আমার ভালো লাগল না। চলে যাওয়ার জন্যে পা বাড়িয়েছি, অমনি টেনিদা বললে, খ্যাঁট তো সন্ধেবেলায়—এখুনি গিয়ে কলাপাতা কাটবি নাকি?

—কলাপাতা কাটব কেন? আমি কি ওদের চাকর রামধনিয়া? আমি যাচ্ছি চুল কাটতে।

বলে ডাঁটের মাথায় চলে যাচ্ছি, টেনিদা আবার পিছু ডাকল—কোথায় চুল কাটবি? সেলুনে?—চল, আমি তোর সঙ্গে যাই।

আমার মনে নিদারুণ একটা সন্দেহ হল।

—আবার তুমি কেন? আমি চুল ছাঁটতে যাচ্ছি—তোমার যাবার কী দরকার?

টেনিদা বললে, দরকার আছে বই কি। বউভাতের নেমন্তন্ন খাবি—যা-তা করে চুল ছেঁটে গেলে মান থাকবে নাকি? এমন একখানা মোক্ষম ছাঁট লাগাবি যে, লোকে দেখলেই হাঁ করে থাকবে। চল, আমি তোর চুল কাটার তদারক করব।

কথাটা আমার মনে লাগল। সত্যিই তো টেনিদা একটা চৌকস লোক—দশরকম বোঝে। আর, চুপি-চুপি বলতে দোষ নেই, একা সেলুনে ঢুকতে আমারও কেমন গা ছম-ছম করে। যে-রকম কচাকচ কাঁচি-টাচি চালায় মনে হয় কখন কচাং করে একটা কানই বা কেটে নেবে!

বললুম, চলো তা হলে।

প্রথমেই চোখে পড়ল, ওঁ তারকব্রহ্ম সেলুন।

যেই ঢুকতে যাচ্ছি, অমনি হাঁ-হাঁ করে বাধা দিল টেনিদা—খবর্দার প্যালা, খবর্দার। ওখানে ঢুকেছিস কি মরেছিস!

—কেন।

—নাম দেখছিস না? ওঁ তারকব্রহ্ম। ওখানে ঢুকলে কী হবে জানিস? সব চুলগুলো কদমছাঁট করে দেবে আর চাঁদির ওপর টিকি বানিয়ে দেবে একখানা; হয়তো টিকির সঙ্গে ফ্রিতে একটা গাঁদা ফুলও বেঁধে দিতে পারে—কিচ্ছুই বলা যায় না।

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, না, আমি টিকি চাই না, ফ্রি গাঁদা ফুলেও দরকার নেই।

—তবে চটপট চলে আয় এখান থেকে। দেখছিস না একটা হোঁতকা লোক কেমন জুলজুল করে তাকাচ্ছে? আর দেরি করলে হয়তো হাত ধরে হিড়হিড় করে ভেতরে টেনে নিয়ে যাবে।

তক্ষুনি পা চালিয়ে দিলুম। একটু এগোতেই বিউটি-ডি-সেলুনিকা।

একে বিউটি, তায় আবার সেলুনিকা! দেখেই আমার কেমন ভাব এসে গেল। বলতে ইচ্ছে করল: সত্যিই সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ। তারপর কী যেন—রাতে প্রচণ্ড সূর্য-টুর্য—ও—সব আর মনে পড়ল না।

—টেনিদা এইখানেই ঢোকা যাক!

শুনেই টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, হ্যাঁ, এইখানেই ঢুকবি বই কি! পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাস, তোর বুদ্ধি আর কত হবে।

—কেন? নামটা তো—

—হ্যাঁ, নামটাই তো। ঢুকেই দ্যাখ না একবার। ঠিক কবিদের মতো বাবরি বানিয়ে দেবে। পেছন থেকে দেখলে মনে হবে, মেমসায়েব হেঁটে যাচ্ছে। আর কেউ যদি তোকে ঠ্যাঙাতে চায়, তা হলে ওই বাবরি চেপে ধরে—

শুনেই আমার বুক দমে গেল। এমনিতেই ছোটকাকা আমার কান পাকড়াবার জন্যে তক্কে তক্কে থাকে, বাবরি পেলে কি আর রক্ষে থাকবে। কান প্লাস বাবরি একেবারে দু'দিক থেকে আক্রমণ!

—না—না, তবে থাক।

আমি বাঁইবাঁই করে প্রায় সিকি-মাইল এগিয়ে গেলুম। আর টেনিদা লম্বা-লম্বা ঠ্যাঙে তিন লাফেই ধরে ফেলল আমাকে: বুঝলি প্যালা, সেলুন ভারি ডেঞ্জারাস জায়গা। বলতে গেলে সুন্দরবনের চাইতেও ভয়াবহ। বুঝেসুঝে ঢুকতে না পারলেই স্রেফ বেঘোরে মারা যাবি। সেইজন্যেই তো তোর সঙ্গে এলুম। আর দেখলি তো, না থাকলে এতক্ষণে হয়তো তোর ঘাড় ফাঁপানো বাবরি কিংবা দেড়-হাত টিকি বেরিয়ে যেত।

—কিন্তু চুল তো ছাঁটতেই হবে টেনিদা!

—আলবাত ছাঁটাতেই হবে। —টেনিদার গলার আওয়াজ গম্ভীর হয়ে উঠল; চুল না ছাঁটলে কি চলে? ছাঁটবার জন্যেই তো চুলের জন্ম। যদি চুল ছাঁটবার ব্যবস্থা না থাকত, তা হলে কি আর চুল গজাত? দ্যাখ না ক্ষুর আছে বলেই মানুষের মুখে গোঁফ উঠেছে। তবু সংসারে এমন এক-একটা পাষণ্ড লোক আছে যারা গোঁফ কামায় না, আর ক্ষুরকে অপমান করে।

নিশ্চয় হুলোদার বাবার কথা বলছে। আমার কিন্তু ও-সব ভালো লাগছিল না। বলতে যাচ্ছি 'গোঁফ-টোফ এখন থামাও না বাপু'—এমন সময় দেখি আর-একটা সেলুন।

সুকেশ কর্তনালয়! আবার ইংরেজী করে লেখা: দি বেস্ট হেয়ার-কাটিং।

—টেনিদা, ওই তো সেলুন।

—সেলুন? —টেনিদা ভুরু কোঁচকালে, তারপর নাক বাঁকিয়ে পড়তে লাগল: সুকেশ কর্তনালয়। কর্তনালয়! বাপস!

—বাপস। —বাপস কেন?

টেনিদা এবার বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কটমট করে কিছুক্ষণ তাকাল আমার দিকে। তারপর হঠাৎ আমার চাঁদির ওপর পটাং করে গোটা দুই টোকা মেরে বললে, গাঁট্টা খেতে পারবি?

আমি বিষম চমকে উঠে বললুম, মিছিমিছি আমি গাঁট্টা খাব? আমার কী দরকার?

—গুরুজনের মুখে-মুখে তক্কো করিস ক্যান র‍্যা? যা বলছি জবাব দে। খেতে পারবি গাঁট্টা? পাঁচ-দশ পনেরোটা?

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, একটাও না, একটা খেতেও রাজি নই।

—সাতটা চাঁটি?

বললুম, কী বিপদ! হচ্ছে সেলুনের কথা— চাঁটি আসে কোত্থেকে?

—আসে, আসে। চাঁটাবার মওকা পেলেই আসে। নে— জবাব দে এখন। খাবি চাঁটি?

—কক্ষনো না।

—না? —টেনিদার গলা আরও গম্ভীর: 'জাড্যাপহ' শব্দের মানে জানিস?

—না।

—উড়ুম্বর?

—না, তাও জানি না। আমি বিব্রত হয়ে বললুম, যাচ্ছি চুল কাটতে— তুমি

কেন যে এ-সব ফ্যাচাং—

কথাটা শেষ করার আগেই টেনিদা গর্জন করে উঠল : স্তব্ধ হও, রে-রে বাচাল !—

তারপর আবার গদ্য করে বললে, জানিস্ কুটমল মানে কী ? বল দেখি, মৎকুণিকা অর্থ কী ?

আমি কাতর হয়ে বললুম, কী যে বলছ টেনিদা, কোনও মানে হয় না। তুমি কি পাগল, না পারশে মাছ যে খামকা এইসব বকবক করে—

টেনিদা আবার আমার চাঁদিতে পটাং করে একটা টোকা মারল— ওরে গাধা। সেলুনের নাম দেখেও বুঝতে পারিসনি ? কর্তনালয়, তার ওপর আবার সুকেশ। ও-রকম নাম কে দিতে পারে ? কোনও হেড পণ্ডিত নিশ্চয় ইস্কুল থেকে পেনশন নিয়ে এখন সেলুন খুলেছে। যেই ঢুকবি অমনি হয়তো জিজ্ঞেস করবে, 'আপনার শিরোরুহ কি সমূলে উৎপাটিত হইবে ?' তুই বুঝতে পারবি না, হাঁ করে তাকিয়ে থাকবি। তখন রেগে তোকে চাঁটি-গাঁট্টা লাগিয়ে বলবে, 'অরে-রে অনড়বান, সত্বর বিদ্যালয়ে গমনপূর্বক প্রথম ভাগ পাঠ কর'—না—না 'পাঠ করহ'।

শুনে, আমার পালাজ্বরের পিলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তবুও সাহসের ভান করে বললুম, যত সব বাজে কথা, গিয়েই দেখি না একবার।

টেনিদা বললে, যা না, যেতেই তো বলছি তোকে। যা ঢুকে পড়, এক্ষুনি যা—

এমনভাবে উৎসাহ দিলে আর যাওয়া যায় না, আমি তৎক্ষণাৎ এদিকের ফুটপাথে চলে এলুম।

—কিন্তু সেলুনে কি ঢোকা যাবে না টেনিদা ?

টেনিদা চিন্তা করে করে অনেকক্ষণ ধরে আস্তে-আস্তে মাথা নাড়ল : আমার মনে হচ্ছে ঢোকা উচিত নয়। একটু ভালো বাংলা-টাংলা যদি জানতিস তা হলেও বা কথা ছিল।

—তবে চুল কাটা হবে না ? —আমার পালাজ্বরের পিলে হাহাকার করে উঠল : কিন্তু ভালো করে চুল ছাঁটতে না পারলে হুলোদার বউভাতে যাব কী করে ?

টেনিদা বললে, দাঁড়া ভেবে দেখি। তার আগে চারটে পয়সা দে।

—আবার পয়সা কেন ?

—ডালমুট খাব, খেলে মগজ সাফ হবে, তখন বুদ্ধি বাতলে দেব।

কী আর করি, দিতেই হল চার পয়সা।

টেনিদা ওই চার পয়সার ডালমুখ কিনে বেশ নিশ্চিন্তে বুদ্ধি সাফ করতে লাগল, আমাকে একটুও দিলে না।

—টেনিদা, একবার ছোটকাকার অফিসে গেলে কেমন হয় ?

টেনিদার ডালমুট চিবোনো বন্ধ হল : সে কী-রে। তোর ছোটকাকার সেলুন আছে নাকি ?

—না-না, সেলুন না। ছোটকাকা বলছিল ওদের অফিসে ছাঁটাই হচ্ছে। গেলে আমার চুলটাও নিশ্চয় ছাঁটাই করে দেবে।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, দূর বোকা— অফিসে কি চুল ছাঁটে ? সে অন্য ছাঁটাই।

—কী ছাঁটাই ?

—বোধ হয় জামা-কাপড় ছাঁটাই। কান-টানও হতে পারে। কী জানি, ঠিক বলতে পারব না। তবে চুল ছাঁটে না। তা হলে আমার কুট্টিমামার ধামার মতো চুলগুলো কবে ছেঁটে দিত।

তাই তো।— মনটা দমে গেল।

—তবে কী করা যায় ?

টেনিদা ডালমুটের তলার নুনটা চাটতে-চাটতে বললে, ওই তো— গাছটার তলায় ইট পেতে পরামানিক বসে আছে, চল ওর কাছে—

—কিন্তু পরামানিক ? —আমি গজগজ করে বললুম, ওরা ভালো চুল কাটে না।

—তোকে বলেছে ! —টেনিদা রেগে বললে, ওই বিড়ালই বনে গেলে বাঘ হয়— বুঝলি ? এখন নিতান্ত ফুটপাথে বসে আছে, তাই ওর কদর নেই। একটা সেলুন খুললেই ওর নাম হবে 'দি গ্রেট কাটার'। চল চল— আমার পিঠে একটা থাবড়া দিয়ে টেনিদা বললে, আমি আছি না সঙ্গে ? এমন ডিরেকশন দিয়ে দেব লোকে বলবে, প্যালা ঠিক সায়েব-বাড়ি থেকে চুল ছেঁটে এসেছে। কোনও ভাবনা নেই— আয়—

কী আর করি, পরামানিকের সামনে বসেছি ইট পেতে। টেনিদা থাবা গেড়ে দাঁড়িয়ে আছে সামনে। দেখছে মনের মতো ছাঁট হয় কি না।

কুরকুর করে কাঁচি চলেছে, আমিও বসে আছি নিবিষ্টমনে। হঠাৎ টেনিদা হাঁ-হাঁ করে উঠল : এ পরামানিক জী, ঠারো ঠারো।

পরামানিক আশ্চর্য হয়ে বললে, ক্যা ভৈল বা ?

—ভৈল না। মানে, ঠিক হচ্ছে না। অ্যায়সা নেহি। ও-ভাবে ছাঁটলে চলবে না।

পরামানিক বললে, তো কেইসা ?

আমি বিরক্ত হয়ে বললুম, কেন বাগড়া দিচ্ছ টেনিদা ? বেশ তো কাটছে— কাটুক না।

টেনিদা দাঁত বের করে বললে, কাটুক না ! যা-তা করে কাটলেই হল ? এ হল বউভাতের ছাঁট, এর কায়দাই আলাদা। যা খুশি কেটে দেবে, আর শেষে লোকে আমারই বদনাম করে বলবে, ছি—ছি—পটলডাঙার টেনিরাম কাছে থাকতেও প্যালা যাচ্ছেতাই চুল ছেঁটে এসেছে ! রামোঃ !

পরামানিক অধৈর্য হয়ে বললে, কেইসা ছাঁটাই ? বোলিয়ে না।

—বোলতা তো হ্যায় ! —টেনিদা আমার মাথায় আঙুল দেখিয়ে বলে চলল : হিঁয়া দু' ইঞ্চি ছাঁটকে দেও, হিঁয়া তিন ইঞ্চি—

আমি কাতর হয়ে বললুম, আমার কায়দায় দরকার নেই টেনিদা— ও যেমন

কাটছে কাটুক।

—শট আপ! ছেলেমানুষ তুই— গুরুজনের মুখে-মুখে কথা বলিস কেন? —শুনো জী পরামানিক, হিঁয়া-সে চার ইঞ্চি কাট দেও— হিঁয়া ফের এক ইঞ্চি— হিঁয়া দু' ইঞ্চি ঘাড় ছাঁচকে দেও—

পরামানিক এবার রেগে গেল। ওইসা নেহি হোতা।

টেনিদা বললে, জরুর হোতা। তুম কাটো।

পরামানিক বললে, নেহি— ওইসা কভি নেহি হোতা।

আমি কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললুম, দোহাই টেনিদা, পায়ে পড়ছি তোমার, ওকে কাটতে দাও—

টেনিদা গর্জন করে বললে, চোপ রাও। তুম কাটো পরামানিক জী—

পরামানিকের আত্মসম্মানে ঘা লেগেছে তখন। নিজের সংকল্পে সে অটল।

—নেহি, হোতা নেহি।

—আলবাত হোতা। কয়ঠো ছাঁট দেখা. তুম? তুম ছাঁটের কেয়া জানতা? কাটো—

—নেহি কাটেগা। বদনাম হো যায়েগা হামকো। ওইসব নেহি হোতা।

—নেহি হোতা? —টেনিদা এবার চেঁচিয়ে উঠল: সব হোতা। আকাশে স্পুটনিক হোতা— মাথামে টাক হোতা— মুরগি আজ ঠ্যাং নিয়ে চলে বেড়াতা, কাল সেই ঠ্যাং প্লেটমে কাটলেট হো-যাতা। সব হোতা, তুমি নেহি জানতা!

—হাম নেহি জানতা?

—নেহি জানতা।—টেনিদার গলার স্বর বজ্র-কঠোর।

—আপ জানতে হেঁ— পরামানিক এবার চ্যালেঞ্জ করে বসল।

—জরুর জানতা হেঁ! —টেনিদা দারুণ উত্তেজিত।

—তো কাটিয়ে!

পরামানিকের বলবার অপেক্ষা মাত্র। পটাং করে টেনিদা তার কাঁচি হাত থেকে কেড়ে নিলে। আর আমি— 'বাবা-রে—মা-রে—পিসিমা-রে'—বলে চেঁচিয়ে লাফিয়ে ওঠবার আগেই আমার চুলে টেনিদার কাঁচি চলতে লাগল: এই দেখো চার ইঞ্চি— এই দেখো পাঁচ ইঞ্চি— এই দেখো— ইয়ে তিন ইঞ্চি— দেখো—

কিন্তু পরামানিক দেখবার আগেই আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখছি তখন। উঠে প্রাণপণে ছুট মেরেছি আর তারস্বরে চেঁচাচ্ছি: মেরে ফেললে—ডাকাত—খুন—

আমার পেছনে রাস্তার লোক ছুটছে, কুকুর ছুটছে, পরামানিক ছুটছে, পুলিশ ছুটছে। আর সকলের আগে ছুটছে কাঁচি হাতে টেনিদা। বলছে, দাঁড়া প্যালা— দাঁড়া। একবার ওকে ভালো করে দেখিয়ে দিই, ছাঁট কাকে বলে—

হলোদার বউভাতে সবাই পোলাও-মাংস-ফ্রাই-সন্দেশ খাচ্ছে এতক্ষণে, আর আমি? একেবারে মোক্ষম ছাঁট দিয়ে বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছি। অর্থাৎ ন্যাড়া হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না। এই ছাঁট নিয়ে কোনওমতেই বউভাতের নেমন্তন্ন খেতে যাওয়া চলে না। আর চাটুজ্যেদের রোয়াক থেকে কে যেন আমাকে শুনিয়ে-শুনিয়ে চিৎকার করে বললে, ডি-লা গ্রাণ্ডি মেফিস্টোফিলিস—ইয়াক—ইয়াক! মনে হল, টেনিদারই গলা।

ক্যামোফ্লেজ

চাটুজ্যেদের রোয়াকে গল্পের আড্ডা জমেছিল। আমি, ক্যাবলা, হাবুল সেন, আর সভাপতি আমাদের পটলডাঙার টেনিদা। একটু আগেই ক্যাবলার পকেট হাতড়ে টেনিদা চারগণ্ডা পয়সা রোজগার করে ফেলেছে, তাই দিয়ে আমরা তারিয়ে তারিয়ে কুলপি বরফ খাচ্ছিলাম।

শুধু হাঁড়ির মতো মুখ করে ক্যাবলা বসে আছে। হাতের শালপাতাটার ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় কুলপির রস গড়িয়ে পড়ছে, ক্যাবলা খাচ্ছে না।

টেনিদা হঠাৎ তার বাঘা গলায় হুঙ্কার ছাড়লে, এই ক্যাবলা, খাচ্ছিস না যে?

ক্যাবলার চোখে তখন জল আসবার জো। সে জবাব দিলে না, শুধু মাথা নাড়ল।

—খাবি না? তবে না খাওয়াই ভালো। কুলপি খেলে ছেলেপুলের পেট খারাপ করে—বলতে না বলতেই থাবা দিয়ে টেনিদা ক্যাবলার হাত থেকে কুলপিটা তুলে নিলে, তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে সোজা শ্রীমুখের গহ্বরে।

ক্যাবলা বললে, অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

—অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ। এর মানে কী? বলি, মানেটা কী হল এর?—টেনিদা বজ্রগর্ভ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

ক্যাবলা এবারে কেঁদে ফেলল: আমার চারআনা পয়সা তুমি মেরে দিলে, অথচ আমি ভাবছিলাম সিনেমা দেখতে যাব—একটা ভালো যুদ্ধের বই—

—যুদ্ধের বই—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল: বলি, যুদ্ধের বইতে কী দেখবার আছে র‍্যা? খালি দুড়ুম্ দাড়ুম্, খালি ধুমধড়াক্কা, আর খানিকটা বাহাদুর কা খেল! যুদ্ধের গল্প যদি শুনতে চাস তবে শোন আমার কাছে।

—তুমি যুদ্ধের কী জানো?—আমি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

—কী বললি প্যালা?—টেনিদার হুঙ্কারে আমার পালাজ্বরের পিলে নেচে উঠল: আমি জানিনে? তবে কে জানে শুনি? তুই?

—না, না, আমি আর জানব কোত্থেকে!—আমি তাড়াতাড়ি বললাম: বাসকপাতার রস খাই আর পালাজ্বরে ভুগি, ওসব যুদ্ধ-ফুদ্ধ আমি জানব কেমন করে? তবে বলছিলাম কিনা—টেনিদার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সোজা মুখে ইস্ক্রুপ এঁটে দিলাম।

—কিছুই বলছিলি না। মানে, কখনওই কিছু বলবি না।—টেনিদা চোখ দিয়েই যেন আমাকে একটা পেল্লায় রদ্দা কষিয়ে দিলে : ফের যদি যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিস তবে ক্রুদ্ধ হয়ে নাকের ডগায় এমন একটি মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেব যে, সোজা বুদ্ধদেব হয়ে যাবি—বুঝলি ? মানে মিউজিয়ামে নাকভাঙা বুদ্ধদেব দেখেছিস তো, ঠিক সেই রকম।

আতঙ্কে আমি একেবারে ল্যাম্প-পোস্ট হয়ে গেলাম।

টেনিদা গলা ঝেড়ে বললে, আমি যখন যুদ্ধে যাই—মানে বার্মা ফ্রন্টে যেবার গেলাম—

খুক-খুক করে একটা চাপা আওয়াজ। হাবুল সেন হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

—হাসছিস যে হাবলা ?—টেনিদা এবার হাবুলের দিকে মনোনিবেশ করলে।

মুহূর্তে হাবুল ভয়ে পানসে মেরে গেল। তোতলিয়ে বললে, এই ন্-ন্-না, ম্-মানে, ভাবছিলাম তুমি আবার কবে যু-যু-যুদ্ধে গেলে—

টেনিদা দারুণ উত্তেজনায় রোয়াকের সিমেন্টের উপর একটা কিল বসিয়ে দিয়ে উঃ উঃ করে উঠল। তারপর সেটাকে সামলে নিয়ে চিৎকার করে বললে, গুরুজনের মুখে মুখে তক্কো ! ওই জন্যেই তো দেশ আজও পরাধীন। বলি, আমি যুদ্ধে যাই না-যাই তাতে তোর কী ? গল্প চাস তো শোন, নইলে স্রেফ ভাগাড়ে চলে যা। তোদের মতো বিশ্ববকাটদের কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি।

—না, না, তুমি বলে যাও, আর আমরা তর্ক করব না। হাবুল সভয়ে আত্মসমর্পণ করল।

টেনিদা কুলপির শালপাতাটা শেষ বার খুব দরদ দিয়ে চেটে নিলে, তারপর সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ক্যাবলার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, তবে শোন—

আমি তখন যুদ্ধ করতে করতে আরাকানের এক দুর্গম পাহাড়ি জায়গায় চলে গেছি। জাপানীদের পেলেই এমন করে ঠেঙিয়ে দিচ্ছি যে ব্যাটারা 'ফুজিয়ামা টুজিয়ামা' বলে ল্যাজ তুলে পালাতে পথ পাচ্ছে না। তেরো নম্বর ডিভিশনের আমি তখন কম্যানডার—তিন-তিনটে ভিক্টোরিয়া ক্রস পেয়ে গেছি।

ক্যাবলা ফস করে জিজ্ঞেস করলে, সে ভিক্টোরিয়া ক্রসগুলো কোথায় ?

—অত খোঁজে তোর দরকার কী ? বলি গল্প শুনবি না বাগড়া দিবি বল তো ?

—যেতে দাও, যেতে দাও। অমৃতং ক্যাবলা ভাষিতং। তুমি গল্প চালিয়ে যাও টেনিদা—হাবুল মন্তব্য করলে।

—যুদ্ধ করতে করতে সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলাম—যার নাম তোরা কাগজে খুব দেখেছিস। নামটা ভুলে যাচ্ছি—সেই যে কিসের একটা ডিম—

আমি বললাম, হাঁসের ডিম ?

টেনিদা বললে, তোর মাথা।

ক্যাবলা বললে, তবে কি মুরগির ডিম ?

টেনিদা বললে, তোর মুণ্ডু।

আমি আবার বললাম, তবে নিশ্চয় ঘোড়ার ডিম। তাও না ? কাকের ডিম, বকের ডিম, ব্যাঙের ডিম—

ক্যাবলা বললে, ঠিক, ঠিক, আমার যেন মনে পড়েছে। বোধহয় টিকটিকির ডিম—

—অ্যাই, অ্যাই মনে পড়েছে।—টেনিদা এমনভাবে ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে যে ক্যাবলা আর্তনাদ করে উঠল—ঠিক ধরেছিস, টিড্ডিম।...হ্যাঁ—যা বলছিলাম। টিড্ডিমে তখন পেল্লায় যুদ্ধ হচ্ছে। জাপানী পেলেই পটাপট মেরে দিচ্ছি। চা খেতে খেতে জাপানী মারছি, ঝিমুতে ঝিমুতে জাপানী মারছি, এমন কি যখন ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছি তখনও কোনও রকমে দু-চারটে জাপানী মেরে ফেলছি !

—নাক ডাকাতে ডাকাতে জাপানী মারা! সে আবার কী রকম ?—আমি কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।

—হে-হে-হে—টেনিদা একগাল হাসল : সে ভারি ইন্টারেস্টিং। আমার এই কুতুবমিনারের মতো নাকই দেখেছিস, এর ডাক তো কখনও শুনিসনি ! একেবারে যাকে বলে রণ-ডম্বরু ! ওই জন্যেই তো মেজকাকা গেল-বছর বিলিতি ইঞ্জিনিয়ার ডেকে আমার ঘরটা সাউন্ড-প্রুফ করিয়ে নিলে, যাতে বাইরে থেকে ওর আওয়াজ কারও কানে না যায়। তা ছাড়া পাড়ার লোকেও কর্পোরেশনে লেখালেখি করছিল কিনা। একদিন তো পুলিশ এসে বাড়ি তছনছ—রোজ রাত্রে এ-বাড়িতে মেশিনগানের আওয়াজ পাওয়া যায়, নিশ্চয় এখানে বেআইনি অস্ত্রের কারখানা আছে। সে এক কেলেঙ্কারি কাণ্ড। যাক, সে-গল্প আর-একদিন হবে।

হ্যাঁ—গল্পটা বলি। রোজ রাত্রে ট্রেঞ্চ থেকে আমার নাকের এমনি আওয়াজ বেরুত যে আর সেন্ট্রি দরকার হত না। জাপানীরা ভাবত, সারা রাত বুঝি মেশিনগান চলছে, তাই পাহাড়ের ওপার থেকে তারা আর নাক গলাবার ভরসা পেত না। আমাদের যিনি সুপ্রিম কম্যান্ডার ছিলেন—নাম বোধহয় মিস্টার বোগাস—তাঁর মগজে শেষে একটা চমৎকার বুদ্ধি গজালে। তিনি একটা লোক রাখলেন। সে ব্যাটা সারারাত আমার পাশে বসে থাকত আর আমার নাকে একটার পর একটা সিসের গুলি, পাথরের টুকরো যা পারত বসিয়ে দিত। আধ সেকেন্ডের মধ্যেই দোনলা বন্দুকের দুটো গুলির মতো সেগুলো ছিটকে বেরিয়ে যেত—কত জাপানী যে ওতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার হিসেব নেই।

আমি বিড়-বিড় করে আওড়ালাম : সব গাঁজা !

টেনিদা বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ফিরল : কী বললি ?

—না, না, বলছিলাম, এই আর কী—আমি সামলে গেলাম : কী মজা !

—হ্যাঁ, সে খুব মজার ব্যাপার। ওই জন্যেই তো একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস পাই আমি—টেনিদা তার দুর্দান্ত নাকটাকে গণ্ডারের খাঁড়ার মতো সগৌরবে আকাশের দিকে তুলে ধরল।

—তারপর ? এই নাকের জোরেই বুঝি যুদ্ধ জয় হল ?—হাবুল জানতে চাইল।

—অনেকটা। জাপানীদের যখন প্রায় নিকেশ করে ছেড়েছি, তখন হঠাৎ একটা বিতিকিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল। আর সেইটেই হল আমাদের আসল গল্প।

—বলো, বলো—আমরা তিনজনে সমস্বরে প্রার্থনা জানালাম।

টেনিদা আবার শুরু করল : আমার একটা কুকুর ছিল। তোদের বাংলাদেশের ঘিয়ে ভাজা নেড়ী কুত্তো নয়, একটা বিরাট গ্রে-হাউন্ড। যেমন তার গাঁক গাঁক ডাক, তেমনি তার বাঘা চেহারা। আর কী তালিম ছিল তার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দু'পায়ে খাড়া হয়ে হাঁটতে পারত। বেচারা অপঘাতে মারা গেল। দুঃখ হয় কুকুরটার জন্যে, তবে বামুনের জন্যে মরেছে, ব্যাটা নির্ঘাত স্বর্গে যাবে।

—কী করে মরল ?—হাবুল প্রশ্ন করল।

—আরে দাঁড়া না কাঁচকলা। যত সব ব্যস্তবাগীশ, আগে থেকেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে গল্পটা মাটি করে দিচ্ছে।

যাক, যা বলছিলাম। একদিন বিকেলবেলা, হাতে তখন কোনও কাজ নেই—আমি সেই কুকুরটাকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়েছি। পাহাড়ি জঙ্গলে বেড়াচ্ছি হাওয়া খেয়ে। দু'দিন আগেই জাপানী ব্যাটারা ওখান থেকে সরে পড়েছে, কাজেই ভয়ের কোনও কারণ ছিল না। কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছে, আর আমি চলেছি পিছনে।

কিন্তু ওই বেঁটে ব্যাটাদের পেটে পেটে শয়তানি। দিলে এই টেনি শর্মাকেই একটা লেঙ্গি কষিয়ে। যেতে যেতে দেখি পাহাড়ের এক নিরিবিলি জায়গায় এক দিব্যি আমগাছ। যত না পাতা, তার চাইতে ঢের বেশি পাকা আম তাতে। একেবারে কাশীর ল্যাংড়া। দেখলে নোলা শক্‌শক্ করে ওঠে।

—আরাকানের পাহাড়ে কাশীর ল্যাংড়া!—আমি আবার কৌতূহল প্রকাশ করে ফেললাম।

—দ্যাখ প্যালা, ফের বাধা দিয়েছিস একটা চাঁটি হাঁকিয়ে—

—আহা যেতে দাও—যেতে দাও—হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, পোলাপান!

—পোলাপান!—টেনিদা গর্জে উঠল : আবার বকর-বকর করলে একেবারে জলপান করে খেয়ে ফেলব—এই বলে দিলাম, হুঁ।

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। খাস কাশীর ল্যাংড়া। কুকুরটা আমাকে একটা চোখের ইঙ্গিত করে বললে, গোটা কয়েক আম পাড়ো।

ক্যাবলা বললে, কুকুরটা আম খেতে চাইল ?

—চাইলই তো। এ তো আর তোদের এঁটুলি-কাটা নেড়ী কুত্তো নয়, সেরেফ বিলিতি গ্রে-হাউন্ড। আম তো আম, কলা, মুলো, গাজর, উচ্ছে, নালতে শাক, সজনেডাঁটা সবই তরিবত করে খায়। আমি আম পাড়তে উঠলাম। আর যেই ওঠা—টেনিদা থামল।

—কী হল ?

—যা হল তা ভয়ঙ্কর। আমগাছটা হঠাৎ জাপানী ভাষায় 'ফুজিয়ামা-টুজিয়ামা' বলে ডালপালা দিয়ে আমায় সাপটে ধরলে। তারপরেই বীরের মতো কুইক মার্চ।

তিন-চারটে গাছও তার সঙ্গে সঙ্গে 'নিপ্পন বান্‌জাই' বলে হাঁটা আরম্ভ করলে!

—সে কী!—আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম : গাছটা তোমাকে জাপটে ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলে!

—করলে তো। আরে, গাছ কোথায় ? স্রেফ ক্যামোফ্লেজ।

—ক্যামোফ্লেজ! তার মানে ?

—ক্যামোফ্লেজ মানে জানিসনে ? কোথাকার গাড়ল সব। টেনিদা একটা বিকট মুখভঙ্গি করে বলল : মানে ছদ্মবেশ। জাপানীরা ও-ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট ছিল। জঙ্গলের মধ্যে কখনও গাছ সেজে, কখনও ঢিবি সেজে ব্যাটারা বসে থাকত। তারপর সুবিধে পেলেই—ব্যস্!

—সর্বনাশ! তারপর ?

—তারপর ?—টেনিদা একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল : তারপর যা হওয়ার তাই হয়ে গেল।

—কী হল ?—আমরা রুদ্ধশ্বাসে বললাম, কী করলে তারপর ?

—আমাকে ধরে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল। ক্যামোফ্লেজটা খুলে ফেললে, তারপর বত্রিশটা কোদালে কোদালে দাঁত বের করে পৈশাচিক হাসি হাসল। কোমর থেকে ঝকঝকে একটা তরোয়াল বের করে বললে, মিস্টার, উই উইল কাট ইউ!

—কী ভয়ানক!—ক্যাবলা আর্তনাদ করে বললে, তুমি বাঁচলে কী করে ?

—আর কী বাঁচা যায় ?—বললে 'নিপ্পন বান্‌জাই'—মানে জাপানের জয় হোক তারপর তলোয়ারটা ওপরে তুলে—

হাবুল অস্ফুটস্বরে বললে, তলোয়ারটা তুলে ?

—ঝাঁ করে এক কোপ! সঙ্গে সঙ্গে আমার মুণ্ডু নেমে গেল। তারপর রক্তে রক্তময়!

—ওরে বাবা!—আমরা তিনজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম : তবে তুমি কি তা হলে—

—ভূত ? দূর গাধা, ভূত হব কেন ? ভূত হলে কারও কি ছায়া পড়ে ? আমি জলজ্যান্ত বেঁচেই আছি—কেমন ছায়া পড়েছে—দেখতে পাচ্ছিস না ?

আমাদের তিনজনের মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

হাবুল অতি কষ্টে বলতে পারল : মুণ্ডু কাটা গেল, তা হলে তুমি বেঁচে রইলে কী করে ?

—হুঁ হুঁ, আন্দাজ কর দেখি—টেনিদা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

—কিছু বুঝতে পারছি না—কোনওমতে বলতে পারলাম আমি। মনে মনে ততক্ষণ রাম নাম জপ করতে শুরু করেছি। টেনিদা বলে ভুল করে তা হলে কি এতকাল একটা স্কন্ধকাটার সঙ্গে কারবার করছি ?

—দূর গাধা—টেনিদা বিজয়গর্বে বললে, কুকুরটা পালিয়ে এল যে ?

—তাতে কী হল ?

—তবু বুঝলি না ? আরে এখানেও যে ক্যামোফ্লেজ !

—ক্যামোফ্লেজ !

—আরে ধ্যাৎ। তোদের মগজে বিলকুল সব ঘুঁটে, এক ছটাকও বুদ্ধি নেই। মানে আমি টেনি শর্মা—চালাকিতে অমন পাঁচশো জাপানীকে কিনতে পারি। মানে আমি কুকুর সেজেছিলাম, আর কুকুরটা হয়েছিল আমি। বেঁটে ব্যাটাদের শয়তানি জানতাম তো ! ওরা যখন আমার, মানে কুকুরটার মাথা কেটে ফেলেছে, সেই ফাঁকে লেজ তুলে আমি হাওয়া !

আর তার পরেই পেলাম তিন নম্বর ভিক্টোরিয়া ক্রসটা !

টেনিদা পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে আমাদের সকলের বোকাটে মুখগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর একটা পৈশাচিক হুঙ্কার ছাড়ল : দু আনা পয়সা বার কর প্যালা, ওই গরম গরম চানাচুর যাচ্ছে—

কুট্টিমামার হাতের কাজ

চিড়িয়াখানার কালো ভালুকটার নাকের একদিক থেকে খানিকটা রোঁয়া উঠে গেছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে আমাদের পটলডাঙার টেনিদা বললে, বল তো প্যালা—ভালুকটার নাকের ও-দশা কী করে হল ?

আমি বললাম, বোধহয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে, তাই—

টেনিদা বললে, তোর মুণ্ডু।

—তা হলে বোধহয় চিড়িয়াখানার লোকেরা নাপিত ডেকে কামিয়ে দিয়েছে। মানুষ যদি গোঁফ কামায়, তাহলে ভালুকের আর দোষ কী ?

—থাম থাম—বাজে ফ্যাক-ফ্যাক করিসনি ! টেনিদা চটে গিয়ে বললে : যদি এখন এখানে কুট্টিমামা থাকত, তাহলে বুঝতিস সব জিনিস নিয়েই ইয়ার্কি চলে না।

—কে কুট্টিমামা ?

—কে কুট্টিমামা ?—টেনিদা চোখ দুটোকে পাটনাই পেঁয়াজের মতো বড় বড় করে বললে : তুই গজগোবিন্দ হালদারের নাম শুনিসনি ?

—কখনও না—আমি জোরে মাথা নাড়লাম : কোনওদিনই না। গজগোবিন্দ। অমনও বিচ্ছিরি নাম শুনতে বয়ে গেছে আমার।

—বটে ! খুব তো তড়পাচ্ছিস দেখছি। জানিস আমার কুট্টিমামা আস্ত একটা পাঁঠা খায় ! তিন সের রসগোল্লা ফুঁকে দেয় তিন মিনিটে ?

—তাতে আমার কী ? আমি তো তোমার কুট্টিমামাকে কোনওদিন নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি না। প্রাণ গেলেও না।

—তা করবি কেন ? অমন একটা জাঁদরেল লোকের পায়ের ধুলো পড়বে তোর বাড়িতে—অমন কপাল করেছিস নাকি তুই ? পালাজ্বরে ভুগিস আর শিঙিমাছের ঝোল খাস—কুট্টিমামার মর্ম তুই কী বুঝবি র‍্যা ? জানিস, কুট্টিমামার জন্যেই ভালুকটার ওই অবস্থা।

এবারে চিন্তিত হলাম।

—তা তোমার কুট্টিমামার এসব বদ-খেয়াল হল কেন ? কেন ভালুকের নাক কামিয়ে দিতে গেল খামকা ? তার চাইতে নিজের মুখ কামালেই তো ঢের বেশি কাজ দিত।

—চুপ কর প্যালা, আর বাজে বকালে রদ্দা খাবি—টেনিদা সিংহনাদ করল ! আর তাই শুনে ভালুকটা বিচ্ছিরি-রকম মুখ করে আমাদের ভেংচে দিলে।

টেনিদা বললে, দেখলি তো ? কুট্টিমামার নিন্দে শুনে ভালুকটা পর্যন্ত কেমন চটে গেল।

এবার আমার কৌতূহল ঘন হতে লাগল।

—তা ভালুকটার সঙ্গে তোমার কুট্টিমামার আলাপ হল কী করে ?

—আরে সেইটেই তো গল্প। দারুণ ইন্টারেস্টিং ! হুঁ-হুঁ বাবা, এ-সব গল্প এমনি শোনা যায় না—কিছু রেস্ত খরচ করতে হয়। গল্প শুনতে চাস—আইসক্রিম খাওয়া।

অগত্যা কিনতেই হল আইসক্রিম।

চিড়িয়াখানার যেদিকটায় অ্যাটলাসের মূর্তিটা রয়েছে, সেদিকে বেশ একটা ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা এসে বসলাম। তারপর সারসগুলোর দিকে তাকিয়ে আইসক্রিম খেতে-খেতে শুরু করলাম টেনিদা :

আমার মামার নাম গজগোবিন্দ হালদার। শুনেই তো বুঝতে পারছিস ক্যায়সা লোক একখানা। খুব তাগড়া জোয়ান ভেবেছিস বুঝি ? ইয়া ইয়া ছাতি—অ্যায়সা হাতের গুলি ? উঁহু, মোটেই নয়। মামা একেবারে প্যাঁকাটির মতো রোগা—দেখলে মনে হয় হাওয়ায় উল্টে পড়ে যাবে। তার ওপর প্রায় ছ'হাত লম্বা—মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল দূর থেকে ভুল হয় বুঝি একটা তালগাছ হেঁটে আসছে। আর রং ! তিন পোঁচ আলকাতরা মাখলেও অমন খোলতাই হয় না। আর গলার আওয়াজ শুনলে মনে করবি—ডজনখানেক নেংটি ইঁদুর ফাঁদে পড়ে চি-চি করছে সেখানে।

সেবার কুট্টিমামা শিলিগুড়ি স্টেশনের রেলওয়ে রেস্তোরাঁয় বসে বসে দশ প্লেট ফাউল কারি আর সের-তিনেক চালের ভাত খেয়েছে, এমন সময় গোঁ-গোঁ করে একটা গোঙানি। তার পরেই চেয়ার-ফেয়ার উল্টে একটা মেমসাহেব ধপাৎ করে পড়ে গেল কাটা কুমড়োর মতো।

হইহই—রইরই। হয়েছে কী জানিস ? চা-বাগানের এক দঙ্গল সাহেব-মেম রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছিল তখন। মামার খাওয়ার বহর দেখে তাদের চোখ তো

উল্টে গেছে আগেই, তারপর আর দশ প্লেট খাওয়ার পরে মামা যখন আর দু'প্লেটের অর্ডার দিয়েছে, তখন আর সইতে পারেনি।

—ও গড। হেল্প মি, হেল্প মি।—বলে তো একটা মেম ঠায়-অজ্ঞান। আর তোকে তো আগেই বলেছি—মামার চেহারাখানা—কী বলে—তেমন 'ইয়ে' নয়!

মামার চক্ষুস্থির।

দলে গোটা-চারেক সাহেব—কাশীর যাঁড়ের মতো তারা ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। কুট্টিমামা ভাবলে, ওরা সবাই মিলে পিটিয়ে বুঝি পাটকেল বানিয়ে দেবে। মামা জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে পৈতে খুঁজতে লাগল—দুর্গানাম জপ করবে। কিন্তু সে পৈতে কি আর আছে, পিঠ চুলকোতে চুলকোতে কবে তার বারোটা বেজে গেছে।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে দুটো সায়েব তখন এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রাণপণে দেঁতো হাসি হেসে মামা বললেন, ইট ইজ নট মাই দোষ স্যর—আই একটু বেশি ইট স্যর—

কুট্টিমামার বিদ্যে ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত কিনা, তাও তিনবার ফেল। তাই ইংরেজী আর এগুলো না।

তাই শুনে সায়েবগুলো ঘোঁ—ঘোঁ—ঘুঁক—ঘুঁক—হোয়া—হোয়া করে হাসল। আর মেমেরা খি—খি—পিঁ—পিঁ—চি—হিঁ করে হেসে উঠল। ব্যাপার দেখেশুনে তাজ্জব লেগে গেল কুট্টিমামার। অনেকক্ষণ হোয়া-হোয়া করবার পরে একটা সাহেব এসে কুট্টিমামার হাত ধরল। কুট্টিমামা তো ভয়ে কাঠ—এই বুঝি হ্যাঁচকা মেরে চিত করে ফেলে দিলে। কিন্তু মোটেই তা নয়, সাহেব কুট্টিমামার হ্যান্ড শেক করে বললেন, মিস্টার বাঙালী, কী নাম তোমার?

কুট্টিমামার ধড়ে সাহস ফিরে এল। যা থাকে কপালে ভেবে বলে ফেলল নামটা।

—গাঁজা-গাবিন্ডে হাল্ডার? বাঃ, খাসা নাম। মিস্টার গাঁজা-গাবিন্ডে, তুমি চাকরি করবে?

চাকরি! এ যে মেঘ না-চাইতে জল। কুট্টিমামা তখন টো-টো কোম্পানির ম্যানেজার—বাপের, অর্থাৎ কিনা আমাদের দাদুর বিনা-পয়সার হোটেলে রেগুলার খাওয়া-দাওয়া চলেছে। কুট্টিমামা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইল।

সায়েবটা তাই দেখে হঠাৎ পকেট থেকে একটা বিস্কুট বের করে কুট্টিমামার হাঁ-করা মুখের মধ্যে গুঁজে দিলে। মামা তো কেশে বিষম খেয়ে অস্থির। তাই দেখে আবার শুরু হল ঘোঁ-ঘোঁ—হোঁয়া-হোঁয়া—পিঁ-পিঁ—চি চি—হি-হি। এবারেও মেম পড়ে গেল চেয়ার থেকে।

হাসি-টাসি থামলে সেই সায়েবটা আবার বললেন, হ্যালো মিস্টার বাঙালি, আমরা আফ্রিকায় গেছি, নিউগিনিতে গেছি, পাপুয়াতেও গেছি। গরিলা, ওরাং, শিম্পাঞ্জি সবই দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো একটি চিজ কোথাও চোখে পড়েনি। তুমি আমাদের চা-বাগানে চাকরি নাও—তা হলে এক্ষুনি তোমায় দেড়শো টাকা মাইনে দেব। খাটনি আর কিছু নয়, শুধু বাগানের কুলিদের একটু দেখবে আর আমাদের মাঝেমাঝে খাওয়া দেখাবে।

এমন চাকরি পেলে কে ছাড়ে? কুট্টিমামা তক্ষুনি এক পায়ে খাড়া। সায়েবরা মামাকে যেখানে নিয়ে গেল, তার নাম জঙ্গলঝোরা টি এস্টেট। মংপু নাম শুনেছিস—মংপু? আরে, সেই যেখানে কুইনিন তৈরি হয় আর রবীন্দ্রনাথ যেখানে গিয়ে কবিতা-টবিতা লিখতেন! জঙ্গলঝোরা টি এস্টেট তারই কাছাকাছি।

মামা তো দিব্যি আছে সেখানে। অসুবিধের মধ্যে মেশবার মতো লোকজন একেবারে নেই, তা ছাড়া চারিদিকেই ঘন পাইনের জঙ্গল। নানারকম জানোয়ার আছে সেখানে। বিশেষ করে ভাল্লুকের আস্তানা।

তা, মামার দিন ভালোই কাটছিল। সস্তা মাখন, দিব্যি দুধ, অঢেল মুরগি। তা ছাড়া সায়েবরা মাঝে-মাঝে হরিণ শিকার করে আনত, সেদিন মামার ডাক পড়ত খাওয়ার টেবিলে। একাই হয়তো একটা শম্বরের তিন সের মাংস সাবাড় করে দিত, তাই দেখে টেবিল চাপড়ে উৎসাহ দিত সায়েবরা—হোঁয়া হোঁয়া—হিঁ—হিঁ করে হাসত।

জঙ্গলঝোরা থেকে মাইল-তিনেক হাঁটলে একটা বড় রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে দার্জিলিঙে—বাসও পাওয়া যায় এখান থেকে। কুট্টিমামাকে বাগানের ফুট-ফরমাস খাটাবার জন্যে প্রায়ই দার্জিলিঙে যেতে হত।

সেদিন মামা দার্জিলিঙ থেকে বাজার নিয়ে ফিরছিল। কাঁধে একটা বস্তায় সেরতিনেক শুঁটকী মাছ, হাতে একরাশ জিনিসপত্তর। কিন্তু বাস থেকে নেমেই মামার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

প্রথম কারণ, সন্ধে ঘোর হয়ে এসেছে—সামনে তিন মাইল পাহাড়ি রাস্তা। এই তিন মাইলের দু'মাইল আবার ঘন জঙ্গল। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুস্থানী চাকর রামভরসার বাস-স্ট্যান্ডে লণ্ঠন নিয়ে আসার কথা ছিল, সেও আসেনি। মামা একটু ফাঁপরেই পড়ে গেল বইকি।

কিন্তু আমার মামা গজগোবিন্দ হালদার অত সহজেই দমবার পাত্র নয়। শুঁটকী মাছের বস্তা কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে মামা হাঁটতে শুরু করে দিলে। মামার অবার আফিং খাওয়ার অভ্যেস ছিল, তারই একটা গুলি মুখে পুরে দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পথ চলতে লাগল।

দু'ধারে পাইনের নিবিড় জঙ্গল আরও কালো হয়ে গেছে অন্ধকারে। রাশি-রাশি ফার্নের ভেতরে ভূতের হাজার চোখের মতো জোনাকি জ্বলছে। ঝিঁ-ঝিঁ করে ঝিঁঝির ডাক উঠছে। নিজের মনে রামপ্রসাদী সুর গাইতে-গাইতে কুট্টিমামা পথ চলবে:

নেচে নেচে আয় মা কালী
আমি যে তোর সঙ্গে যাব
তুই খাবি মা পাঁঠার মুড়ো
আমি যে তোর প্রসাদ পাব।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে টুকরো-টুকরো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছিল। হঠাৎ মামার

চোখে পড়ল, কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা লোক সেই বনের ভেতর বসে কোঁ-কোঁ করছে।

আর কে! ওটা নির্ঘাত রামভরসা।

রামভরসার ম্যালেরিয়া ছিল। যখন-তখন যেখানে-সেখানে জ্বর এসে পড়ল। কিন্তু ওষুধ খেত না—এমনকি এই কুইনিনের দেশে এসেও তার রোগ সারবার ইচ্ছে ছিল না। রামভরসা তার ম্যালেরিয়াকে বড্ড ভালোবাসত। বলত, উ আমার বাপ-দাদার ব্যারাম আছেন। উকে তাড়াইতে হামার মায়া লাগে।

কুট্টিমামার মেজাজ যদিও আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, তবু রামভরসাকে দেখে চিনতে দেরি হল না। রেগে বললে, তোকে না আমি বাস-স্ট্যান্ডে যেতে বলেছিলুম? আর তুই এই জঙ্গলের মধ্যে কোঁ-কো করছিস? নে—চল—

গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে রামভরসা উঠে দাঁড়াল।

কুট্টিমামা নাক চুলকে বললে, ইঃ, গায়ের কম্বলটা দ্যাখো একবার! কী বদখৎ গন্ধ! কোনওদিন ধুসনি বুঝি? শেষে যে উকুন হবে ওতে! নে—চল ব্যাটা গাড়ল! আর এই শুঁটকী মাছের পুঁটলিটাও নে। তুই থাকতে ওটা আমি বয়ে বেড়াব নাকি?

এই বলে মামা পুঁটলিটা এগিয়ে দিলে রামভরসার দিকে।

—এঃ, হাত তো নয়, যেন নুলো বের করেছে! যাক, ওতেই হবে।

মামা রামভরসার হাতে পুঁটুলিটা গুঁজে দিলে জোর করে।

রামভরসা বললে, গোঁ—গোঁ—ঘোঁক!

—ইস! সায়েবদের সঙ্গে থেকে খুব যে সায়েবি বুলি শিখেছিস দেখছি! চল্—এবার বাসামে ফিরে কুইনিন ইনজেকশন দিয়ে তোর ম্যালেরিয়া তাড়াব! দেখব কেমন সায়েব হয়েছিস তুই!

রামভরসা বললে, ঘুঁক্-ঘুঁক!

—ঘুঁক্—ঘুঁক? বাংলা-হিন্দী বলতে বুঝি আর ইচ্ছে করছে না? চল—পা চালা—কুট্টিমামা আগে-আগে, পিছে-পিছে শুঁটকী মাছের পুঁটলি নিয়ে রামভরসা। মামা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলে, কেমন থপাস থপাস হাঁটছে রামভরসা।

—উঃ, খুব যে কায়দা করে হাঁটছিস। যেন বুট পড়ে বড় সায়েব হাঁটছেন।

রামভরসা বললে, ঘঁচাৎ।

—ঘঁচাৎ? চল বাড়িতে, তোর কান যদি কচাৎ করে কেটে না নিয়েছি, তবে আমার নাম গজগোবিন্দ হালদার নয়।

মাইল-খানেক হাঁটবার পর কুট্টিমামার কেমন সন্দেহ হতে লাগল।

পেছনে-পেছনে থপ-থপ করে রামভরসা ঠিকই আসছে, কিন্তু কেমন কচর-মচর করে আওয়াজ হচ্ছে যেন। মনে হচ্ছে, কেউ যেন বেশ দরদ দিয়ে তেলেভাজা আর পাঁপর চিবুচ্ছে। রামভরসা শুঁটকী মাছ খাচ্ছে নাকি? তা কী করে সম্ভব? রামভরসা রান্না-করা শুঁটকীর গন্ধেই পালিয়ে যায়—কাঁচা শুঁটকী সে খাবে কী করে!

মামা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল—কিন্তু বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। একে তো নেশায় চোখ বুজে এসেছে, তার ওপর এদিকে একেবারে চাঁদের আলো নেই, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। শুধু দেখা গেল, পেছনে-পেছনে সমানে থপথপিয়ে আসছে রামভরসা,—ঠিক তেমনি গদাইলস্করি চালে।

পায়ের নীচে পাইনের অজস্র শুকনো কাঁটাওয়ালা পাতা ঝরে রয়েছে। মামা ভাবলে হয়তো তাই থেকেই আওয়াজ উঠেছে এইরকম।

তবু মামা জিজ্ঞেস করল, কী রে রামভরসা, শুঁটকী মাছগুলো ঠিক আছে তো?

রামভরসা জবাব দিলে, ঘু—ঘু।

—ঘু—ঘু? ইস, আজ যে খুব ডাঁটে রয়েছিস দেখছি—যেন আদত বাস্তুঘুঘু।

রামভরসা বললে,—হুঁ—হুঁ।

কুট্টিমামা বললে, সে তো বুঝতেই পারছি। আচ্ছা, চল তো বাড়িতে, তারপর তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

আরও খানিকটা হাঁটবার পর মামার বড্ড তামাকের তেষ্টা পেল। সামনে একটা খাড়া চড়াই, তারপর প্রায় আধমাইল নামতে হবে। একটু তামাক না খেয়ে নিলে আর চলছে না।

মামার বাঁ কাঁধে একটা চৌকিদারি গোছের ঝোলা ঝুলত সব সময়ে; তাতে জুতোর কালি, দাঁতের মাজন থেকে শুরু করে টিকে-তামাক পর্যন্ত সব থাকত। মামা জুত করে একখানা পাথরের ওপর বসে পড়ল, তারপর কল্কে ধরাতে লেগে গেল। রামভরসাও একটু দূরে ওত পেতে বসে পড়ল—আর ফোঁস-ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল।

—কী রে, একটান দিবি নাকি?

—হুঁ—হুঁ।

—সে তো জানি, তামাকে আর তোমার অরুচি আছে কবে? আচ্ছা, দাঁড়া আমি একটু খেয়ে নিই, তারপর প্রসাদ দেব তোকে।

চোখ বুজে গোটা-কয়েক সুখটান দিয়েছে কুট্টিমামা—হঠাৎ আবার সেই কচর-মচর শব্দ। শুঁটকী মাছ চিবোবার আওয়াজ—নির্ঘাত।

কুট্টিমামা একেবারে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর রেগে ফেটে পড়ল:

—তবে রে বেল্লিক, এই তোর ভণ্ডামি?—শুঁটকী মাছ হাম ছুঁতা নেই, রাম রাম।—দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে।

বলেই হুঁকো-টুকো নিয়ে মামা তেড়ে গেল তার দিকে।

তখন হঠাৎ আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল, জ্বলজ্বলে একটা চাঁদ দেখা গেল সেখানে। একরাশ ঝকঝকে দাঁত বের করে রামভরসা বললে, ঘোঁক—ঘরর—ঘরর—

আর যাবে কোথায়! হাতের আগুন-সুদ্ধ হুঁকোটা রামভরসার নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে 'বাপ রে—গেছি রে'—বলে কুট্টিমামার চিৎকার। তারপরই ফ্ল্যাট, একদম

অজ্ঞান।

রামভরসা নয়, ভালুক। আফিং-এর ঘোরে মামা কিচ্ছুটি বুঝতে পারেনি। ভালুকের জ্বর হয় জানিস তো ? তাই দেখে মামা ওকে রামভরসা ভেবেছিল। গায়ের কালো রোঁয়াগুলোকে ভেবেছিল কম্বল। আর শুঁটকী মাছের পুঁটলিটা পেয়ে ভালুক বোধহয় ভেবেছিল, এ-ও তো মজা মন্দ নয়। সঙ্গে সঙ্গে গেলে আরও বোধহয় পাওয়া যাবে। তাই খেতে-খেতে পেছনে আসছিল। খাওয়া শেষ হলেই মামার ঘাড় মটকাত।

কিন্তু ঘাড়ে পড়বার আগেই নাকে পড়ল টিকের আগুন। ঘোঁৎ-ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে ভালুক তিন লাফে পগার পার।

বুঝলি প্যালা—ওইটেই হচ্ছে সেই ভালুক।

গল্প শুনে আমি ঘাড় চুলকোতে লাগলুম।

—কিন্তু ওইটেই যে সে-ভালুক—বুঝলে কী করে ?

—হুঁ—হুঁ, কুট্টিমামার হাতের কাজ, দেখলে কি ভুল হওয়ার জো আছে ? আরে—আরে, ওই তো ডালমুট যাচ্ছে। ডাক—ডাক শিগগির ডাক—

সাংঘাতিক

সাত দিন পরেই পরীক্ষা। আর কী ? সেই কালান্তক স্কুল-ফাইন্যাল।

পর পর দু'বার সাদা কালিতে আমার নাম ছাপা হয়েছে, তিন বারের বার যদি তাই ঘটে—তাহলে বড়দা শাসিয়েছে আমাকে সোদপুরে রেখে আসবে।

—সোদপুরে তো গান্ধীজী থাকতেন। আমি গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম।

—তুমিও থাকবে। বড়দা আরও গম্ভীর হয়ে বললে, তবে গান্ধীজী যেখানে থাকতেন সেখানে নয়। তিনি যাদের দুধ খেতেন—তাদের আস্তানায়।

—মানে ?

—মানে পিঁজরাপোলে।

আমি ব্যাজার হয়ে বললাম, পিঁজরাপোলে কেন থাকতে যাব ? ওখানে কি মানুষ থাকে ?

—মানুষ থাকে না, গোরু-ছাগল তো থাকে। সেজন্যেই তো তুই থাকবি। কচি-কচি ঘাস খাবি আর ভ্যা-ভ্যা করে ডাকবি। শুনে মনটা এত খারাপ হল যে কী বলব। একদিন সন্ধেবেলা গড়ের মাঠে গিয়ে চুপি চুপি একমুঠো কাঁচা ঘাস খেয়ে দেখলাম—যাচ্ছেতাই লাগল। ছাদে গিয়ে একা-একা ব্যা-ব্যা করেও ডাকলাম, কিন্তু ছাগলের মতো সেই মিঠে প্রাণান্তকর আওয়াজটা কিছুতেই বেরুল না।

তাই ভারি দুশ্চিন্তায় পড়লাম। গিয়ে বললাম লিডার টেনিদাকে।

টেনিদার অবস্থা আমার মতোই। এবার নিয়ে ওর চারবার হবে। হাবুল সেনের দ্বিতীয় বার। শুধু হতভাগা ক্যাবলাটাই লাফে লাফে ফার্স্ট হয়ে এগিয়ে আসছে—তিন ক্লাস নীচে ছিল, ঠিক ধরে ফেলেছে আমাকে। এর পরে যদি টপকে চলে যায়—তাহলে সত্যিই পিঁজরাপোলে যেতে হবে।

চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে টেনিদা আতা খাচ্ছিল। গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে গোটাকয়েক বিচি খেয়ে ফেললে। তারপর অন্যমনস্কভাবে, খোসাটা যখন অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে, তখন সেটাকে থু—থু করে ফেলে দিয়ে বললে, ইউরেকা। হয়েছে।

—কী হয়েছে ?

—প্ল্যানচেট।

—প্ল্যানচেট কাকে বলে ?

টেনিদা বললে, তুই একটা গাধা। প্ল্যানচেট করে ভূত নামায়—জানিসনে ?

এর মধ্যেই কোত্থেকে পাঁঠার ঘুগনি চাটতে চাটতে ক্যাবলা এসে পড়েছে। বললে, উহুঁ, ভুল হল। ওর উচ্চারণ হবে প্লাঁসেৎ।

—থাম-থাম্—বেশি ওস্তাদি করিসনি। ভূতের কাছে আবার শুদ্ধ উচ্চারণ।

তারা তো চন্দ্রবিন্দু ছাড়া কথাই কইতে পারে না—বলেই ছোঁ মেরে ক্যাবলার হাত থেকে ঘুগনির পাতাটা কেড়ে নিল টেনিদা।

ক্যাবলা হায় হায় করে উঠল। টেনিদা একটা বাঘাটে হুঙ্কার করে বললে, থাম, চিল্লাসনি! এ হল তোর ধৃষ্টতার শাস্তি। বলতে বলতে জিভের এক টানে ঘুগ্‌নির পাতা একদম সাফ।

ভেবেছিলাম আমাকেও একটু দেবে—কিন্তু পাতার দিকে তাকিয়ে 'বুকভরা আশা' একেবারে 'ধুক করে নিবে গেল'। বললাম, মরুক গে, প্ল্যানচেট আর প্রাঁসেৎ—কিন্তু ওসব ভুতুড়ে কাণ্ড আবার কেন? ভূত-টুত আমার একেবারেই পছন্দ হয় না।

টেনিদা হেঁ-হেঁ করে বললে, আছে রে গোমুখ্যু—আছে। সবাই কি আর তালগাছের মতো হাত বাড়িয়ে ঘাড় মটকে দেয়? ওদের মধ্যেও দু'-চারটে ভদ্দর লোক আছে। তারা পরীক্ষার কোশ্চেন-টোশ্চেন বলে দেয়।

—অ্যাঁ?

—তবে আর বলছি কী। টেনিদা এবার শালপাতার উলটো দিকটা একবার চেটে দেখল। কিছু পেলে না—তালগোল পাকিয়ে ক্যাবলার মুখের ওপর পাতাটা ছুড়ে দিলে। বললে, আমার বিরিঞ্চি মামা কিছুতেই আর বি. এ পাশ করতে পারে না। শুনে শুনে আঠারো বার গাড্ডা খেলো। শেষকালে যখন আমার মামাতো ভাই গুবরে বি. এ ক্লাসে উঠল, তখন বিরিঞ্চি মামার আর সইল না। প্ল্যানচেটে বসল। আর বললে পেত্যয় যাবি না প্যালা—টপ টপ করে কোশ্চেন-পেপার এসে পড়তে লাগল টেবিলের ওপর।

—পরীক্ষার পরে না আগে? রোমাঞ্চিত হয়ে আমি জানতে চাইলাম।

—দূর উল্লুক! পরে হবে কেন রে, একমাস আগে।

হঠাৎ ক্যাবলা একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল।

—আচ্ছা টেনিদা—সবসুদ্ধ তোমার ক'টা মামা?

—অত খবরে তোর দরকার কী রে গর্দভ? পুলিশ কমিশনার থেকে পকেটমার পর্যন্ত সারা বাংলাদেশে আমার যত মামা, তাদের লিসটি করতে গেলে একটা গুপ্ত প্রেসের পঞ্জিকা হয়ে যায়—তা জানিস?

—ছাড়ান দে—ছাড়ান দে। বললে হাবুল সেন।

আমি বললাম, আমাদের অঙ্কের কোশ্চেন যে করেছে সে কি তোমার মামা হয় নাকি?

—কে জানে, হতেও পারে। টেনিদা তাচ্ছিল্য করে জবাব দিলে।

—তাহলে তাকেই প্ল্যানচেটে ডাকো না।

—চুপ কর বেল্লিক! জ্যান্ত মানুষ কি কখনও প্লানচেটে আসে? ভূতকে ডাকতে হয়। ভূতের অসীম ক্ষমতা—যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তেমন-তেমন ভূত যদি আসে—ব্যস্—মার দিয়া কেল্লা!

—বেশ তো—আনো না তবে ভূতকে? আমি অনুনয় করলাম।

—বললেই হল? টেনিদা প্রায় ভূতের মতো দাঁত খিঁচোল: ভূত কি চানাচুরওয়ালা যে ডাকলেই আসবে? তার জন্যে হ্যাপা আছে না? অন্ধকার ঘর চাই—টেবিল চাই—চারজন লোক চাই—

ক্যাবলার চোখ দুটো মিটমিট করছিল। বললে, ঠিক আছে। আমাদের গ্যারাজের পাশে একটা অন্ধকার ঘর আছে—একটা পা-ভাঙা টেবিল আমি দেব, আর চার মূর্তি আমরা তো আছিই।

টেনিদা বললে, বাঃ, গ্র্যান্ড! শুনে এত ভালো লাগছে যে তোর পিঠে আমার তিনটে চাঁটি মারতে ইচ্ছে করছে।

ক্যাবলা একলাফে রোয়াক থেকে নেমে পড়ল। বললে, তা হলে আজ রাত্রেই?

টেনিদা বললে, হ্যাঁ—আজ রাত্রেই।

আমার কেমন যেন সুবিধে মনে হচ্ছিল না। ভূত-টুত কেমন যেন গোলমেলে ব্যাপার! কিন্তু সাতদিন পরেই যে স্কুল ফাইন্যাল! আর তার দেড়মাস বাদেই পিঁজরাপোল!

অগত্যা নাক-টাক চুলকে আমায় রাজি হয়ে যেতে হল।

বাড়ির পেছনে গ্যারাজ—এমনি ঘুরঘুটটি অন্ধকার সেখানে, গ্যারাজের পাশের ছোট্ট টিনের ঘরটা যেন ভুষো কালি মাখানো। গিয়ে দেখি ক্যাবলা সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে। একটা পায়া-ভাঙা টেবিল। তার চারদিকে চারটে চেয়ার। একটু দূরে লম্বা দড়ির সঙ্গে ছোট একটা বস্তা ঝুলছে। টেবিলের ওপর ক্যাবলা একটা মোমবাতি জ্বেলে রেখেছিল—তার আলোতেই সব দেখতে পেলাম।

বস্তাটা দেখিয়ে হাবুল বললে, ওইটা কী ঝুল্যা আছে রে। খাওন-দাওনের কিছু আছে নাকি?

টেনিদা বললে, পেট-সর্বস্ব সব—খালি খাওয়াই চিনেছে! ওটা বকসিংয়ের বালির বস্তা।

—ভূত আইস্যা ওইটা লইয়া বকসিং কোরব নাকি? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

ক্যাবলা হেসে বললে, ওটা ছোড়দার।

টেনিদা বললে, থাম—এখন বেশি বাজে বকিসনি। এবার কাজ শুরু করা যাক। হ্যাঁ রে ক্যাবলা—এদিকে কেউ কখনও আসবে না তো?

—না, সে ভয় নেই।

—তবে দরজা বন্ধ করে দে।

ক্যাবলা দরজা বন্ধ করে দিলে। টেনিদা বললে, চারজনে চারটে চেয়ারে বসব আমরা। আলো নিবিয়ে দেব। তারপরে ধ্যান করতে থাকব।

—ধ্যান? কীসের ধ্যান?—আমি জানতে চাইলাম।

—ভূতের। মানে অঙ্কের কোশ্চেন বলে দিতে পারে—এমন ভূতের।

হাবুল বললে, সেইডা মন্দ কথা না। হারু পণ্ডিতের ডাকন যাউক।

হারু পণ্ডিত! শুনে আমার বুকের ভেতরে একেবারে ছ্যাঁত করে উঠল। তিন

বছর আগে মারা গেছেন হারু পণ্ডিত। দুর্দান্ত অঙ্ক জানতেন। তার চাইতেও জানতেন দুর্দান্তভাবে পিটতে। একটা চৌবাচ্চার নল দিয়ে জল-টল ঢোকার কী সব অঙ্ক দিতেন, আমরা হাঁ করে থাকতাম আর পটাৎ পটাৎ গাঁট্টা খেতাম। সেই হারু পণ্ডিতকে ডাকা।

আমি বললাম, বড্ড মারত যে।

—এখন আর মারবে না। ভূত হয়ে মোলায়েম হয়ে গেছে। তা ছাড়া কেউ তো ডাকে না—আমরা ডাকলে কত খুশি হবে দেখিস। শুধু অঙ্ক কেন—চাই কি আদর করে সব কোশ্চেনই বলে দেবে! টেনিদা আমাকে উৎসাহিত করলে।

ক্যাবলা বললে, তবে ধ্যানে বসা যাক।

আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই, একটু তাড়াতাড়ি! বেশি দেরি হয়ে গেলে বড়দা কান পেঁচিয়ে দেবে। আমি বলে এসেছি—ক্যাবলার কাছে অঙ্ক কষতে যাচ্ছি।

টেনিদা বললে, আমি আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। তার আগে শেষ কথাগুলো বলে নিই। সবাই হারু পণ্ডিতকে ধ্যান করবি। এক মনে, এক প্রাণে। সেই দাড়ি—সেই ডাঁটভাঙা চশমা, সেই টাক—সেই নস্যি নেওয়া—

ক্যাবলা বললে, সেই গাঁট্টা—

টেনিদা ধমক দিয়ে বললে, চুপ, বাজে কথা এখন বন্ধ। শুধু ধ্যান। এক মনে, এক প্রাণে। শুধু প্রার্থনা : "স্যার—দয়া করে একবার আসুন—আপনার অধম ছাত্রদের পরীক্ষার কোশ্চেনগুলো বলে দিয়ে যান।" আর কিছু না—আর কোনও কথা নয়। আচ্ছা আমি আলো নেবাচ্ছি। ওয়ান-টু-থ্রি—

টুক করে আলো নিবে গেল।

বাপ্‌স, কী অন্ধকার! দম যেন আটকে যায়। ভয়ে আমার গা শিরশির করতে লাগল। ধ্যান করব কী ছাই, এমনিতেই মনে হচ্ছিল, চারদিকে যেন সার বেঁধে ভূত দাঁড়িয়ে আছে।

তবু ধ্যানের চেষ্টা করা যাক। কিন্তু কী যাচ্ছেতাই মশা এ-ঘরে। পা দুটো একেবারে ফুটো করে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁত-টাঁত খিঁচিয়ে থেকে আর পারা গেল না। চটাস করে একটা চাঁটি মারলাম।

কিন্তু একি! পায়ে চাঁটি মারলাম—কিন্তু লাগল না তো? আমার পা কি একেবারে অসাড় হয়ে গেছে? আর আমার পাশ থেকে হাবুল তখুনি হাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠল : অ টেনিদা, ভূতে আমার পায়ে ঠাঁই কইর‍্যা একটা চোপাড় মারছে!

টেনিদা বললে, শাট আপ। ধ্যান করে যা।

—কিন্তু আমারে যে চোপাড় মারল!

—ধ্যান না করলে আরও মারবে। চোখ বুজে বসে থাক।

আমি একদম চুপ। এঃ হে-হে—ভারি ভুল হয়ে গেছে। অন্ধকারে নিজের ঠ্যাং ভেবে হাবুলের পায়েই চড় মেরে দিয়েছি।

আরও কিছুক্ষণ কাটল। ধ্যান করবার চেষ্টা করছি—কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হারু পণ্ডিতের টাক আর দাড়িটা বেশ ভাবতে পারছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গাঁট্টাটাও বিচ্ছিরিভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে। তক্ষুনি ধ্যান বন্ধ করে দিচ্ছি। ওদিকে আবার দারুণ খিদে পাচ্ছে। আসবার সময় দেখেছি—রান্নাঘরে মাংস চেপেছে। এতক্ষণে হয়েও গেছে বোধহয়। বাড়িতে থাকলে ঠাকুরের কাছে গিয়ে এক-আধটু চাখতে-টাখতেও পারতাম। যতই ভাবি, খিদেটা ততই যেন নাড়ির ভেতরে পাক খেতে থাকে।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে রব উঠল : ব্যা-ব্যা-ব্যা—অ্যা-অ্যা—

কী সর্বনাশ! ধ্যান করতে করতে শেষকালে পাঁঠার আত্মা ডেকে আনলাম নাকি! এতক্ষণ যে মাংসের কথাই ভাবছিলাম!

আমার পাশ থেকে হাবুল কাঁপা গলায় বললে, অ টেনিদা—পাঁঠা ভূত!

অন্ধকারে টেনিদা গর্জন করলে : যেমন তোরা পাঁঠা—পাঁঠা ভূত ছাড়া আর কী আসবে তোদের কাছে।

ক্যাবলা খিক-খিক করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার শোনা গেল : ভ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—

টেনিদা বললে, অমন কত আসবে। ধ্যানে বসলে সবাই আসতে চায় কিনা। এখন কেবল একমনে জপ করে যা—পাঁঠা ভূত, তুমি চলে যাও, স্বর্গে গিয়ে ঘাস খাও। আমরা শুধু হারু পণ্ডিতকে চাই। সেই টাক, সেই দাড়ি—সেই নস্যির ডিবে—আমাদের সেই স্যারকেই চাই। আর কাউকে না—কাউকেই না—

পাঁঠা ভূতকে যে আমিই ডেকে ফেলেছি সেটা চেপে গেলাম। কিন্তু আমার পায়ে ওটা কী সুড়সুড়ি দিয়ে গেল? প্রায় চেঁচিয়ে বলতে যাচ্ছি—হঠাৎ টের পেলাম—আরশোলা।

খিদেটা ভুলে গিয়ে প্রাণপণে স্যারকে ডাকতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ ধ্যানের জো আছে? ঘটাং করে কে যেন আমার পায়ে ল্যাং মারল।

—টেনিদা। ভূতে ল্যাং মারছে আমাকে—আমি আর্তনাদ করলাম।

হাবুল বলে উঠল : আঃ—খামখা গাধার মতন চ্যাচাস ক্যান? আমার পা-টা হঠাৎ লাইগ্যা গেছে।

টেনিদা দাঁত কিড়মিড় করে উঠল : উঃ—এই গাড়লগুলোকে নিয়ে কি ধ্যান হয়? তখন থেকে সমানে ডিসটার্ব করছে। এবার যে একটা কথা বলবে, তার কান ধরে সোজা বাইরে ফেলে দেব।

আবার ধ্যান শুরু হল।

প্রায় হারু পণ্ডিতকে ধ্যানের মধ্যে এনে ফেলেছি। এল, এল—এসেই পড়েছে বলতে গেলে। টাকটা প্রায় আমার চোখের সামনে—মনে হচ্ছে যেন দাড়ির সুড়সুড়ি আমার মুখে এসে লাগছে। এক-মনে বলছি : দোহাই স্যার, স্কুল ফাইন্যাল স্যার—অঙ্কের কোশ্চেন স্যার।—আর ঠিক তক্ষুনি—

কেমন একটা বিটকেল শব্দ হল মাথার ওপর।

চমকে তাকাতে দেখি টিনের চালের গায়ে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। ঠিক যেন মোটা মোটা চশমার আড়াল থেকে হারু পণ্ডিত আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন।

আমার পালাজ্বরের পিলেটা সঙ্গে সঙ্গে তড়াং করে লাফিয়ে উঠল।

—ওকি—ওকি টেনিদা। —আমি আবার আর্তনাদ করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো যেন শূন্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—আর আমার মাথায় এসে লাগল এক রামচাঁটি। ভূত হয়ে সে চাঁটি মোলায়েম হওয়া তো দূরে থাক—আরও মোক্ষম হয়ে উঠেছে।

—বাপ্‌রে গেছি—বলে আমি এক প্রচণ্ড লাফ মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল উলটে পড়ল।

—খাইছে—খাইছে—ভূতে খাইছে রে—হাবুল কেঁদে উঠল।

—টেবিল চাপা দিয়ে আমায় মেরে ফেলে দিলে রে—টেনিদার চিৎকার শোনা গেল।

অন্ধকারে আমি দরজার দিকে ছুটে পালাতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন আমার ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ল। আমার গলা দিয়ে—'গ্যাঁ—ঘোঁক্'—বলে একটা আওয়াজ বেরুলো—আর তার পরেই—সর্ষে ফুল। ঝিঁঝির ডাক। পটলডাঙার প্যালারাম একেবারে ঠায় অজ্ঞান।

চোখ মেলে দেখি, মেঝেয় পড়ে আছি। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে, আর ক্যাবলা আমার মাথায় জল দিচ্ছে। চেয়ার টেবিলগুলো ছত্রাকার হয়ে আছে ঘরময়।

আমি বললাম, ভূ—ভূ—ভূত।

ক্যাবলা বললে, না—ভূত নয়। টেনিদা আর হাবুল তক্ষুনি পালিয়েছে বটে, কিন্তু তোকে চুপি চুপি সত্যি কথা বলি। ঘরটার পেছনেই একটা ছাগল বাঁধা আছে। দাদুর হাঁপানি রোগ আছে কিনা, ছাগলের দুধ খায়। সেই ছাগলটাই ডাকছিল।

—আর সেই জ্বলজ্বলে চোখ? সেই চাঁটি?

—হুলোর।

—হুলো কে?

—আমাদের বেড়াল। এ-ঘরে প্রায়ই ইঁদুর ধরতে আসে।

—কিন্তু হুলো কি অমন চাঁটি মারতে পারে?

—চাঁটি মারবে কেন রে বোকা? তুই চ্যাঁচালি—ভয় পেয়ে হুলোও চাল থেকে লাফ দিলে। পড়বি তো পর ছোড়দার স্যান্ড-ব্যাগের ওপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ দোল খেয়ে এসে তোর মাথায় লাগল—তুই ভাবলি হারু পণ্ডিতের গাঁট্টা। —ক্যাবলা হেসে উঠল।

—আর আমার ঘাড়ে অমন করে লাফিয়ে পড়ল কে?

—হাবলা। ভয় পেয়ে বেরুতে গিয়ে তোকে বিধ্বস্ত করে চলে গেছে। —ক্যাবলা হেসে উঠল আবার।

আমি আবার চোখ বুজলাম। ক্যাবলার কথাই হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার মন বলছে—ওই হুলো আর বালির বস্তার মধ্য দিয়ে সত্যি সত্যিই হারু পণ্ডিতের মোক্ষম চাঁটি আমার মাথায় এসে লেগেছে।

কারণ, পৃথিবীতে অমন দুর্মদ চাঁটি আর কেউ হাঁকড়াতে পারে না। আর কিছুতেই না।

বন-ভোজনের ব্যাপার

হাবুল সেন বলে যাচ্ছিল—পোলাও, ডিমের ডালনা, রুই মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা—

উস-উস শব্দে নোলার জল টানল টেনিদা : বলে যা—থামলি কেন? মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানি পোলাও, মশলদা দোসে, চাউ-চাউ, সামি কাবাব—

এবার আমাকে কিছু বলতে হয়। আমি জুড়ে দিলাম : আলু ভাজা, শুক্তো, বাটিচচ্চড়ি, কুমড়োর ছোকা—

টেনিদা আর বলতে দিলে না! গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল : থাম প্যালা, থাম বলছি। শুক্তো—বাটি-চচ্চড়ি। —দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তার চেয়ে বল না হিঞ্চে সেদ্ধ, গাঁদাল আর শিঙিমাছের ঝোল। পালা-জ্বরে ভুগিস আর বাসক-পাতার রস খাস, এর চাইতে বেশি বুদ্ধি আর কী হবে তোর! দিব্যি অ্যায়সা অ্যায়সা মোগলাই খানার কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে ধাঁ করে নিয়ে এল বাটি-চচ্চড়ি আর বিউলির ডাল! ধ্যাত্তোর!

ক্যাবলা বললে, পশ্চিমে কুঁদরুর তরকারি দিয়ে ঠেকুয়া খায়। বেশ লাগে।

—বেশ লাগে?—টেনিদা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল : কাঁচা লঙ্কা আর ছোলার ছাতু আরও ভালো লাগে না? তবে তাই খা-গে যা। তোদের মতো উল্লুকের সঙ্গে পিকনিকের আলোচনাও ঝকমারি!

হাবুল সেন বললে, আহা-হা চৈইত্যা যাইত্যাছ কেন? পোলাপানে কয়—

—পোলাপান! এই গাড়লগুলোকে জলপান করলে তবে রাগ যায়। তাও কি খাওয়া যাবে এগুলোকে? নিম-নিসিন্দের চেয়েও অখাদ্য। এই রইল তোদের পিকনিক—আমি চললাম। তোরা ছোলার ছাতু আর কাঁচা লঙ্কার পিণ্ডি গেল গে—আমি ওসবের মধ্যে নেই!

সত্যিই চলে যায় দেখছি! আর দলপতি চলে যাওয়া মানেই আমরা একেবারে অনাথ। আমি টেনিদার হাত চেপে ধরলাম : আহা, বোসো না। একটা প্ল্যান-ট্যান হোক। ঠাট্টাও বোঝ না।

টেনিদা গজগজ করতে লাগল : ঠাট্টা! কুমড়োর ছোকা আর কুঁদরুর তরকারি নিয়ে ওসব বিচ্ছিরি ঠাট্টা আমার ভালো লাগে না।

—না—না, ওসব কথার কথা।—হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বোঝাতে লাগল : মোগলাই খানা না হইলে আর পিকনিক হইল কী?

—তবে লিস্টি কর—টেনিদা নড়ে-চড়ে বসল।

প্রথমে যে লিস্টটা হল তা এইরকম :

বিরিয়ানি পোলাও

কোর্মা

কোপ্তা

কাবাব দু'-রকম

মাছের চপ—

মাঝখানে বেরসিকের মতো বাধা দিলে ক্যাবলা : তাহলে বাবুর্চি চাই, একটা চাকর, একটা মোটর লরি, দুশো টাকা—

—দ্যাখ ক্যাবলা—টেনিদা ঘুষি বাগাতে চাইল।

আমি বললাম, চটলে কী হবে? চারজনে মিলে চাঁদা উঠেছে দশ টাকা ছ-আনা।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, তাহলে একটু কম-সম করেই করা যাক। ট্যাক-খালির জমিদার সব—তোদের নিয়ে ভদ্দরলোকে পিকনিক করে!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি দিয়েছ ছ-আনা, বাকি দশ টাকা গেছে আমাদের তিনজনের পকেট থেকে। কিন্তু বললেই গাঁট্টা। আর সে গাঁট্টা ঠাট্টার জিনিস নয়—জুতসই লাগলে স্রেফ গালপাট্টা উড়ে যাবে।

রফা করতে করতে শেষ পর্যন্ত লিস্টটা যা দাঁড়াল তা এই :

খিচুড়ি (প্যালা রাজহাঁসের ডিম আনিবে বলিয়াছে)

আলু ভাজা (ক্যাবলা ভাজিবে)

পোনা মাছের কালিয়া (প্যালা রাঁধিবে)

আমের আচার (হাবুল দিদিমার ঘর হইতে হাত-সাফাই করিবে)

রসগোল্লা, লেডিকেনি (ধারে 'ম্যানেজ' করিতে হইবে)

লিস্টি শুনে আমি হাঁড়িমুখ করে বললাম, ওর সঙ্গে আর-একটা আইটেম জুড়ে দে হাবুল। টেনিদা খাবে।

—হেঁ—হেঁ—প্যালার মগজে শুধু গোবর নেই, ছটাকখানেক ঘিলুও আছে দেখছি। বলেই টেনিদা আদর করে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। 'গেছি গেছি' বলে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

আমরা পটলডাঙার ছেলে—কিছুতেই ঘাবড়াই না। চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে রোজ দু-বেলা আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় হাতি-গণ্ডার সাবাড় করে থাকি। তাই বেশ ডাঁটের মাথায় বলেছিলাম, দূর-দূর। হাঁসের ডিম খায় ভদ্দরলোক! খেতে হলে রাজহাঁসের ডিম। রীতিমতো রাজকীয় খাওয়া!

—কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে শুনি? খুব যে চালিয়াতি করছিস, তুই ডিম পাড়বি নাকি?—টেনিদা জানতে চেয়েছিল।

—আমি পাড়তে যাব কোন দুঃখে? কী দায় আমার?—আমি মুখ ব্যাজার করে বলেছিলাম : হাঁসে পাড়বে।

—তা হলে সেই হাঁসের কাছ থেকে ডিম তোকেই আনতে হবে। যদি না আনিস, তা হলে—

তা হলে কী হবে বলবার দরকার ছিল না। কিন্তু কী গেরো বলো দেখি। কাল রবিবার—ভোরের গাড়িতেই আমরা বেরুব পিকনিকে। আজকের মধ্যেই রাজহাঁসের ডিম যোগাড় করতে না পারলে তো গেছি। পাড়ায় ভন্টাদের বাড়ি রাজহাঁস আছে গোটাকয়েক। ডিম-টিমও তারা নিশ্চয় পাড়ে। আমি ভন্টাকেই পাকড়ালাম। কিন্তু কী খলিফা ছেলে ভন্টা! দু'-আনার পাঁঠার ঘুগনি আর ডজনখানেক ফুলুরি সাবড়ে তবে মুখ খুলল!

—ডিম দিতে পারি, তবে, নিজের হাতে বার করে নিতে হবে বাক্স থেকে।

—তুই দে না ভাই এনে। একটা আইসক্রিম খাওয়াব। ভন্টা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, নিজেরা পোলাও-মাংস সাঁটবেন আর আমার বেলায় আইসক্রিম! ওতে চলবে না। ইচ্ছে হয় নিজে বের করে নাও—আমি বাবা ময়লা ঘাঁটতে পারব না। কী করি, রাজি হতে হল।

ভন্টা বললে, দুপুরবেলা আসিস। বাবা মেজদা অফিসে যাওয়ার পরে। মা তখন ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। সেই সময় ডিম বের করে দেব।

গেলাম দুপুরে। উঠোনের একপাশে কাঠের বাক্স—তার ভেতরে সার-সার খুপরি। গোটা-দুই হাঁস ভেতরে বসে ডিমে তা দিচ্ছে। ভন্টা বললে, যা—নিয়ে আয়।

কিন্তু কাছে যেতেই বিতিকিচ্ছিরিভাবে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে উঠল হাঁস দুটো।

ফোঁস-ফোঁস করছে যে!

ভন্টা উৎসাহ দিলে : ডিম নিতে এসেছিস—একটু আপত্তি করবে না? তোর কোন ভয় নেই প্যালা—দে হাত ঢুকিয়ে।

হাত ঢুকিয়ে দেব? কিন্তু কী বিচ্ছিরি ময়লা!—ময়লা আর কী বদখত গন্ধ! একেবারে নাড়ি উলটে আসে। তার ওপরে যে-রকম ঠোঁট ফাঁক করে ভয় দেখাচ্ছে—

ভন্টা বললে, চিয়ার আপ প্যালা। লেগে যা!

যা থাকে কপালে বলে যেই হাত ঢুকিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে—ওরে বাপরে! খটাং করে হাঁসটা হাত কামড়ে ধরল। সে কী কামড়! হাঁই-মাই করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

—কী হয়েছে রে ভন্টা, নীচে এত গোলমাল কিসের?—ভন্টার মা'র গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আমি আর নেই। হ্যাঁচকা টানে হাঁসের ঠোঁট থেকে হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় লাগালাম। দরদর করে রক্ত পড়ছে তখন।

রাজহাঁস এমন রাজকীয় কামড় বসাতে পারে কে জানত। কিন্তু কী ফেরেব্বাজ ভন্টাটা। জেনে-শুনে ব্রাহ্মণের রক্তপাত ঘটাল। আচ্ছা—পিকনিকটা চুকে যাক—দেখে নেব তারপর। ওই পাঁঠার ঘুগনি আর ফুলুরির শোধ তুলে ছাড়ব।

কী করা যায়—গাঁটের পয়সা দিয়ে মাদ্রাজী ডিমই কিনতে হল গোটাকয়েক।

পরদিন সকালে শ্যামবাজার ইস্টিশানে পৌঁছে দেখি, টেনিদা, ক্যাবলা আর হাবুল এর মধ্যেই মার্টিনের রেলগাড়িতে চেপে বসে আছে। সঙ্গে একরাশ হাঁড়ি-কলসি, চালের পুঁটলি, তেলের ভাঁড়। গাড়িতে গিয়ে উঠতে টেনিদা হাঁক ছাড়ল : এনেছিস রাজহাঁসের ডিম ?

দুর্গা-নাম করতে করতে পুঁটলি খুলে দেখালাম।

—এর নাম রাজহাঁসের ডিম ! ইয়ার্কি পেয়েছিস ?—টেনিদা গাঁট্টা বাগাল।

আমি গাড়ির খোলা দরজার দিকে সরে গেলাম : মানে—ইয়ে, ছোট রাজহাঁস কিনা—

—ছোট রাজহাঁস ! কী পেয়েছিস আমাকে শুনি ? পাগল না পেটখারাপ ?

হাবুল সেন বললে, ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও। ডিম তো আনছে !

টেনিদা গর্জন করে বললে, ডিম এনেছে না কচু। এই তোকে বলে রাখছি প্যালা—ডিমের ডালনা থেকে তোর নাম কেটে দিলাম। এক টুকরো আলু পর্যন্ত নয়, একটু ঝোলও নয় !

মন খারাপ করে আমি বসে রইলাম। ডিমের ডালনা আমি ভীষণ ভালোবাসি, তাই থেকেই আমাকে বাদ দেওয়া ! আচ্ছা বেশ, খেয়ো তোমরা। এমন নজর দেব পেট ফুলে ঢোল হয়ে যাবে তোমাদের !

পিঁ করে বাঁশি বাজল—নড়ে উঠল মার্টিনের রেল। তারপর ধ্বস-ধ্বস ভোঁস ভোঁস করে এর রান্নাঘর, ওর ভাঁড়ার-ঘরের পাশ দিয়ে গাড়ি চলল।

টেনিদা বললে, বাগুইআটি ছাড়িয়ে আরও চারটে ইস্টিশান। তার মানে প্রায় এক ঘন্টার মামলা। লেডিকেনির হাঁড়িটা বের কর, ক্যাবলা।

ক্যাবলা বললে, এখুনি ! তাহলে পৌঁছবার আগেই সে সাফ হয়ে যাবে ?

টেনিদা বললে, সাফ হবে কেন, দুটো-একটা চেখে দেখব শুধু। আমার বাবা ট্রেনে চাপলেই খিদে পায়। এই একঘন্টা ধরে শুধু-শুধু বসে থাকতে পারব না। বের কর হাঁড়ি—চটপট—

হাঁড়ি চটপটই বেরুল—মানে, বেরুতেই হল তাকে। তারপর মার্টিনের রেলের চলার তালে তালে ঝটপট করে সাবাড় হয়ে চলল। আমি ক্যাবলা আর হাবুল সেন জুল-জুল করে শুধু তাকিয়েই রইলাম। একটা লেডিকেনি চেখে দেখতে আমরাও যে ভালোবাসি, সে-কথা আর মুখ ফুটে বলাই গেল না।

ইস্টিশান থেকে নেমে প্রায় মাইলখানেক হাঁটবার পরে ক্যাবলার মামার বাড়ি। কাঁচা রাস্তা, এঁটেল মাটি, তার ওপর কাল রাতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে আবার। আগে থেকেই রসগোল্লার হাঁড়িটা বাগিয়ে নিলে টেনিদা।

—এটা আমি নিচ্ছি। বাকি মোটঘাটগুলো তোরা নে।

—রসগোল্লা বরং আমি নিচ্ছি, তুমি চালের পোঁটলাটা নাও টেনিদা। —লেডিকেনির পরিণামটা ভেবে আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

টেনিদা চোখ পাকাল : খবরদার প্যালা, ও-সব মতলব ছেড়ে দে। টুপটাপ

করে দু'-চারটে গালে ফেলবার বুদ্ধি, তাই নয় ? হুঁ-হুঁ বাবা—চালাকি ন চলিষ্যতি !

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাঁটরি বোঁচকা কাঁধে ফেলে আমরা তিনজনেই এগোলাম।

কিন্তু তিন পাও যেতে হল না। তার আগেই ধাঁই—ধপাস্। টেনে একখানা রাম-আছাড় খেল হাবুল।

—এই খেয়েছে কচুপোড়া !—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল।

সারা গায়ে কাদা মেখে হাবুল উঠে দাঁড়াল। হাতের ডিমের পুঁটলিটা তখন কুঁকড়ে এতটুকু—হলদে রস গড়াচ্ছে তা থেকে।

ক্যাবলা বললে, ডিমের ডালনার বারোটা বেজে গেল।

তা গেল। করুণ চোখে আমরা তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। ইস—এত কষ্টের ডিম ! ওরই জন্যে রাজহাঁসের কামড় পর্যন্ত খেতে হয়েছে !

টেনিদা হুঙ্কার দিয়ে উঠল : দিলে সব পণ্ড করে ! এই ঢাকাই বাঙালটাকে সঙ্গে এনেই ভুল হয়েছে ! পিটিয়ে ঢাকাই পরোটা করলে তবে রাগ যায় !

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, হাবুল চার টাকা চাঁদা দিয়েছে—তার আগেই কী যেন একটা হয়ে গেল ! হঠাৎ মনে হল আমার পা দুটো মাটি ছেড়ে শোঁ করে শূন্যে উড়ে গেল, আর তারপরেই—

কাদা থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন আমার মাথা-মুখ বেয়ে আচারের তেল গড়াচ্ছে। ওই অবস্থাতেই চেটে দেখলাম একটুখানি। বেশ ঝাল-ঝাল টক-টক—বেড়ে আচারটা করেছিল হাবুলের দিদিমা।

ক্যাবলা আবার ঘোষণা করলে, আমের আচারের একটা বেজে গেল।

টেনিদা খেপে বললে, চুপ কর বলছি ক্যাবলা—এক চড়ে গালের বোম্বা উড়িয়ে দেব।

কিন্তু তার আগেই টেনিদার বোম্বা উড়ল—মানে স্রেফ লম্বা হল কাদায়। সাত হাত দূরে ছিটকে গেল রসগোল্লার হাঁড়ি—ধবধবে শাদা রসগোল্লাগুলো পাশের কাদাভরা খানায় গিয়ে পড়ে একেবারে নেবুর আচার।

ক্যাবলা বললে, রসগোল্লার দুটো বেজে গেল।

এবার আর টেনিদা একটা কথাও বললে না। বলবার ছিলই বা কী ! রসগোল্লার শোকে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চারজনে পথ চলতে লাগলাম আমরা। টেনিদা তবু লেডিকেনিগুলো সাবাড় করেছে, কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা কোথায় ! অমন স্পঞ্জ রসগোল্লাগুলো !

পাঁচ মিনিট পরে টেনিদাই কথা কইল।

—তবু পোনা মাছগুলো আছে—কী বলিস ! খিচুড়ির সঙ্গে মাছের কালিয়া আর আলুভাজা—নেহাত মন্দ হবে না—অ্যাঁ ?

হাবুল বললে, হ-হ, সেই ভালো। বেশি খাইলে প্যাট গরম হইব। গুরুপাক না খাওয়াই ভালো।

ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল : শেয়াল বলছিল, দ্রাক্ষাফল অতিশয় খাট্টা !—ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে ছিল, তাই দুই-একটা হিন্দী শব্দ বেরিয়ে

পড়ে মুখ দিয়ে।

টেনিদা বললে, খাট্টা! বেশি প্যাঁঠামি করবি তো চাঁট্টা বসিয়ে দেব!

ক্যাবলা ভয়ে স্পিকটি নট! আমি তখনও নাকের পাশ দিয়ে ঝাল-ঝাল টক-টক তেল চাটছি। হঠাৎ বুক-পকেটটা কেমন ভিজে-ভিজে মনে হল। হাত দিয়ে দেখি, বেশ বড়ো-সড়ো এক-টুকরো আমের আচার তার ভেতরে কায়েমি হয়ে আছে।

—জয়গুরু! এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপ করে সেটা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলাম। সত্যি—হাবুলের দিদিমা বেড়ে আচার করেছিল। আরও গোটাকয়েক যদি ঢুকত!

বাগান-বাড়িতে পৌঁছুলাম আরও পনেরো মিনিট পরে।

চারিদিকে সুপুরি আর নারকেলের বাগান—একটা পানা-ভর্তি পুকুর, মাঝখানে, একতলা বাড়িটা। কিন্তু ঘরে চাবিবন্ধ। মালীটা কোথায় কেটে পড়েছে, কে জানে।

টেনিদা বললে, কুছ্ পরোয়া নেই। চুলোয় যাক মালী। বলং বলং বাহুবলং—নিজেরা উনুন খুঁড়ব—খড়ি কুড়ব, রান্না করব—মালী ব্যাটা থাকলেই তো ভাগ দিতে হত! যা হাবুল—ইট কুড়িয়ে আন—উনুন করতে হবে। প্যালা, কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়,—ক্যাবলাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যা।

—আর তুমি?—আমি ফস্ করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

—আমি?—একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে টেনিদা হাই তুলল : আমি এগুলো সব পাহারা দিচ্ছি। সবচাইতে কঠিন কাজটাই নিলাম আমি। শেয়াল কুকুর এলে তাড়াতে হবে তো!—যা তোরা—হাতে-হাতে বাকি কাজগুলো চটপট সেরে আয়।

কঠিন কাজই বটে! ইস্কুলের পরীক্ষার গার্ডদেরও অমনি কঠিন কাজ করতে হয়। ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষতে গিয়ে যখন 'ঘোড়া-ঘোড়া ঘাস-ঘাস' নিয়ে আমাদের দম আটকাবার জো, তখন গার্ড মোহিনীবাবুকে টেবিলে পা তুলে দিয়ে 'ফোঁরর্-ফোঁ' শব্দে নাক ডাকাতে দেখেছি।

টেনিদা বললে, যা—যা সব—দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঝাঁ করে রান্নাটা করে ফ্যাল—বড্ড খিদে পেয়েছে।

তা পেয়েছে বইকি। পুরো এক হাঁড়ি লেডিকেনি এখনও গজগজ করছে পেটের ভেতর। আমাদের বরাতেই শুধু অষ্টরম্ভা। প্যাঁচার মতো মুখ করে আমরা কাঠখড়ি সব কুড়িয়ে আনলাম।

টেনিদা লিস্টি বার করে বললে, মাছের কালিয়া—প্যালা রাঁধিবে।

আমাকে দিয়েই শুরু। আমি মাথা চুলকে বললাম, খিচুড়ি-টিচুড়ি আগে হয়ে যাক—তবে তো?

—খিচুড়ি লাস্ট আইটেম—গরম গরম খেতে হবে। কালিয়া সকলের আগে। নে প্যালা—লেগে যা—

ক্যাবলার মা মাছ কেটে নুন-টুন মাখিয়ে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষা। কড়াইতে তেল চাপিয়ে আমি মাছ ঢেলে দিলাম তাতে।

আরে—এ কী কাণ্ড! মাছ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কড়াই-ভর্তি ফেনা। তারপরেই আর কথা নেই—অতগুলো মাছ তালগোল পাকিয়ে গেল একসঙ্গে। মাছের কালিয়া নয়—মাছের হালুয়া।

ক্যাবলা আদালতের পেয়াদার মতো ঘোষণা করল : মাছের কালিয়ার তিনটে বেজে গেল।

—তবে রে ইস্টুপিড—। টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : কাঁচা তেলে মাছ দিয়ে তুই কালিয়া রাঁধছিস? এবার তোর পালাজ্বরের পিলেরই একদিন কি আমারই একদিন।

এ তো মার্টিনের রেল নয়—সোজা মাঠের রাস্তা। আমার কান পাকড়াবার জন্যে টেনিদার হাতটা এগিয়ে আসবার আগেই আমি হাওয়া। একেবারে পঞ্জাব মেলের স্পিডে।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, খিচুড়ির লিস্ট থেকে প্যালার নাম কাটা গেল।

তা যাক। কপালে আজ হরি-মটর আছে সে তো গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি। গোমড়া মুখে একটা আমড়া-গাছতলায় এসে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

বসে বসে কাঠ-পিঁপড়ে দেখছি, হঠাৎ গুটি গুটি হাবুল আর ক্যাবলা এসে হাজির।

—কী রে, তোরাও?

ক্যাবলা ব্যাজার মুখে বললে, খিচুড়ি টেনিদা নিজেই রাঁধবে। আমাদের আরও খড়ি আনতে পাঠাল।

সেই মুহূর্তেই হাবুল সেনের আবিষ্কার। একেবারে কলম্বাসের আবিষ্কার যাকে বলে!

—এই প্যালা—দ্যাখছস? ওই গাছটায় কীরকম জলপাই পাকছে!

আর বলতে হল না। আমাদের তিনজনের পেটেই তখন খিদেয় ইঁদুর লাফাচ্ছে। জলপাই—জলপাই-ই সই! সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাছে উঠে পড়লাম—আহা—টক-টক—মিঠে-মিঠে জলপাই—যেন অমৃত।

হাবুলের খেয়াল হল প্রায় ঘন্টাখানেক পরে।

—এই, টেনিদার খিচুড়ি কী হইল?

ঠিক কথা—খিচুড়ি তো এতক্ষণে হয়ে যাওয়া উচিত। তড়াক করে গাছ থেকে নেমে পড়ল ওরা। হাতের কাছে পাতা-টাতা যা পেলে, তাই নিয়ে ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমিও গেলাম পেছনে পেছনে, আশায় আশায়। মুখে যাই বলুক—এক হাতা খিচুড়িও কি আমায় দেবে না? প্রাণ কি এত পাষাণ হবে টেনিদার?

কিন্তু খানিক দূর এগিয়ে আমরা তিনজনেই থমকে দাঁড়ালাম। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ!

টেনিদা সেই নারকেল গাছটায় হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর মাঝে মাঝে বলছে, দে—দে ক্যাবলা, পিঠটা আর একটু ভাল করে চুলকে দে।

পিঠ চুলকে দিচ্ছে—সন্দেহ কী। কিন্তু সে ক্যাবলা নয়—একটা গোদা বানর। আর চার-পাঁচটা গোল হয়ে বসেছে টেনিদার চারিদিকে। কয়েকটা তো মুঠো-মুঠো চাল-ডাল মুখে পুরছে, একটা আলুগুলো সাবাড় করছে আর আস্তে আস্তে টেনিদার পিঠ চুলকে দিচ্ছে। আরামে হাঁ করে ঘুমুচ্ছে টেনিদা, থেকে থেকে বলছে, দে ক্যাবলা, আর একটু ভালো করে চুলকে দে!

এবার আমরা তিনজনে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম: টেনিদা—বাঁদর—বাঁদর!

—কী। আমি বাঁদর!—বলেই টেনিদা হাঁ করে সোজা হয়ে বসল—সঙ্গে সঙ্গেই বাপ্ বাপ্ বলে চিৎকার।

—ই-ই—ক্রিচ্-ক্রিচ্! কিচ-কিচ।

চোখের পলকে বানরগুলো কাঁঠাল গাছের মাথায়। চাল-ডাল আলুর পুঁটলিও সেই সঙ্গে। আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে তরিবত করে খেতে লাগল—সেই সঙ্গে কী বিচ্ছিরি ভেংচি। ওই ভেংচি দেখেই না লঙ্কার রাক্ষসগুলো ভয় পেয়ে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল!

পুকুরের ঘাটলায় চারজনে আমরা পাশাপাশি চুপ করে বসে রইলাম। যেন শোকসভা! খানিক পরে ক্যাবলাই স্তব্ধতা ভাঙল।

—বন-ভোজনের চারটে বাজল।

—তা বাজল।—টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: কিন্তু কী করা যায় বল তো প্যালা? সেই লেডিকেনিগুলো কখন হজম হয়ে গেছে—পেট চুঁই-চুঁই করছে খিদেয়।

অগত্যা আমি বললাম, বাগানে একটা গাছে জলপাই পেকেছে, টেনিদা—

—জলপাই। ইউরেকা। বনে ফল-ভোজন—সেইটেই তো আসল বন-ভোজন! চল চল, শিগগির চল।

লাফিয়ে উঠে টেনিদা বাগানের দিকে ছুটল।

কুট্টিমামার দন্ত-কাহিনী

আমি সগর্বে ঘোষণা করলাম, জানিস, আমার ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে।

ক্যাবলা একটা গুলতি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা নেড়ী কুকুরের ল্যাজকে তাক করছিল। কুকুরটা বেশ বসে ছিল, হঠাৎ কী মনে করে ঘৌক শব্দে পিঠের একটা এঁটুলিকে কামড়ে দিলে—তারপর পাঁই-পাঁই করে ছুট লাগাল। ক্যাবলা

ব্যাজার হয়ে বললে, দ্যুৎ। কতক্ষণ ধরে টার্গেট করছি—ব্যাটা পালিয়ে গেল!—আমার দিকে ফিরে বললে, তোর ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে—এ আর বেশি কথা কী। আমার বড় কাকা, মেজ কাকা, রাঙা কাকা সবাই দাঁত বাঁধিয়েছে। আচ্ছা, কাকারা সক্কলে দাঁত বাঁধায় কেন বল তো? এর মানে কী?

হাবুল সেন বললে, হঃ। এইটা বোঝোস নাই। কাকাগো কামই হইল দাঁত খিঁচানি। অত দাঁত খিঁচালে দাঁত খারাপ হইব না তো কী?

টেনিদা বসে বসে এক মনে একটা দেশলাইয়ের কাঠি চিবুচ্ছিল। টেনিদার ওই একটা অভ্যেস—কিছুতেই মুখ বন্ধ রাখতে পারে না। একটা কিছু-না-কিছু তার চিবোনো চাই-ই চাই। রসগোল্লা, কাটলেট, ডালমুট, পকৌড়ি, কাজু বাদাম—কোনওটায় অরুচি নেই। যখন কিছু জোটে না, তখন চুয়িংগাম থেকে শুকনো কাঠি—যা পায় তাই চিবোয়। একবার ট্রেনে যেতে যেতে মনের ভুলে পাশের ভদ্রলোকের লম্বা দাড়ির ডগাটা খানিক চিবিয়ে দিয়েছিল—সে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড! ভদ্রলোক রেগে গিয়ে টেনিদাকে ছাগল-টাগল কী সব যেন বলেছিলেন।

হঠাৎ কাঠি চিবুনো বন্ধ করে টেনিদা বললে, দাঁতের কথা কী হচ্ছিল র‍্যা? কী বলছিলি দাঁত নিয়ে?

আমি বললাম, আমার ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে।

ক্যাবলা বললে, ইস—ভারি একটা খবর শোনাচ্ছেন ঢাকঢোল বাজিয়ে! আমার বড় কাকা, মেজ কাকা, ফুলু মাসি—

টেনিদা বাধা দিয়ে বললে, থাম থাম্ বেশি ফ্যাচ-ফ্যাচ করিসনি। দাঁত বাঁধানোর কী জানিস তোরা? হুঁঃ! জানে বটে আমার কুট্টিমামা গজগোবিন্দ হালদার। সায়েবরা তাকে আদর করে ডাকে মিস্টার গাঁজা-গাবিন্ডে। সে-ও দাঁত বাঁধিয়েছিল। কিন্তু সে-দাঁত এখন আর তার মুখে নেই—আছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে।

—পড়ে গেছে বুঝি?

—পড়েই গেছে বটে!—টেনিদা তার খাঁড়ার মতো নাকটাকে খাড়া করে একটা উঁচুদরের হাসি হাসল—যাকে বাংলায় বলে হাই ক্লাস। তারপর বললে, সে-দাঁত কেড়ে নিয়ে গেছে।

—দাঁত কেড়ে নিয়েছে? সে আবার কী? আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এত জিনিস থাকতে দাঁত কাড়তে যাবে কেন?

—কেন? টেনিদা আবার হাসল: দরকার থাকলেই কাড়ে। কে নিয়েছে বল দেখি?

ক্যাবলা অনেক ভেবে-চিন্তে বললে, যার দাঁত নেই।

—ইঃ, কী পণ্ডিত! টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, দিলে বলে। অত সোজা নয়, বুঝলি? আমার কুট্টিমামার দাঁত যে-সে নয়—সে এক একটা মুলোর মতো। সে-বাঘা দাঁতকে বাগানো যার-তার কাজ নয়।

—তবে বাগাইল কেডা? বাঘে? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

—এঃ, বাঘে ! বলছি দাঁড়া। ক্যাবলা, তার আগে দু আনার ডালমুট নিয়ে আয়—

হাঁড়ির মতো মুখ করে ক্যাবলা ডালমুট আনতে গেল। মানে, যেতেই হল তাকে।

আমাদের জুলজুলে চোখের সামনে একাই ডালমুটের ঠোঙা সাবাড় করে টেনিদা বললে, আমার কুট্টিমামার কথা মনে আছে তো ? সেই যে চা-বাগানে চাকরি করে আর একাই দশজনের মতো খেয়ে সাবাড় করে ? আরে, সেই লোকটা—যে ভালুকের নাক পুড়িয়ে দিয়েছিল ?

আমরা সমস্বরে বললাম, বিলক্ষণ ! 'কুট্টিমামার হাতের কাজ' কি এত সহজেই ভোলবার ?

টেনিদা বললে, সেই কুট্টিমামারই গল্প। জানিস তো—সায়েবরা ডেকে নিয়ে মামাকে চা-বাগানে চাকরি দিয়েছিল ? মামা খাসা আছে সেখানে। খায়-দায় কাঁসি বাজায়। কিন্তু বেশি সুখ কি আর কপালে সয় রে ? একদিন জুত করে একটা বন-মুরগির রোস্টে যেই কামড় বসিয়েছে—অমনি ঝন-ঝনাৎ ! কুট্টিমামার একটা দাঁত পড়ল প্লেটের ওপর খসে আর তিনটে গেল নড়ে।

হয়েছিল কী, জানিস ? শিকার করে আনা হয়েছিল তো বন-মুরগি ? মাংসের মধ্যে ছিল গোটাচারেক ছররা। বেকায়দায় কামড় পড়তেই অ্যাকসিডেন্ট, দাঁতের বারোটা বেজে গেল।

মাংস রইল মাথায়—ঝাড়া তিন ঘন্টা নাচানাচি করলে কুট্টিমামা। কখনও কেঁদে বললে, পিসিমা গো তুমি কোথায় গেলে ? কখনও ককিয়ে ককিয়ে বললে, ই-হি-হি—আমি গেলুম ! আবার কখনও দাপিয়ে দাপিয়ে বললে, ওরে বনমুরগি রে—তোর মনে এই ছিল রে ! শেষকালে তুই আমায় এমন করে পথে বসিয়ে গেলি রে।

পাকা তিন দিন কুট্টিমামা কিচ্ছুটি চিবুতে পারল না। শুধু রোজ সের-পাঁচেক করে খাঁটি দুধ আর ডজন-চারেক কমলালেবুর রস খেয়ে কোনওমতে পিত্তি রক্ষা করতে লাগল।

দাঁতের ব্যথা-ট্যাথা একটু কমলে সায়েবরা কুট্টিমামাকে বললে, তোমাকে ডেনটিস্টের ওখানে যেতে হবে।

—অ্যাঁ।

সায়েবরা বললে, দাঁত বাঁধিয়ে আসতে হবে।

ডেনটিস্টের নাম শুনেই তো কুট্টিমামার চোখ তালগাছে চড়ে গেল। কুট্টিমামার দাদু নাকি একবার দাঁত তুলতে গিয়েছিলেন। যে-ডাক্তার দাঁত তুলেছিলেন, তিনি চোখে কম দেখতেন। ডাক্তার করলেন কী—দাঁত ভেবে কুট্টিমামার দাদুর নাকে সাঁড়াশি আটকে দিয়ে সেটাকেই টানতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন : ইস—কী প্রকাণ্ড গজদন্ত আর কী ভীষণ শক্ত ! কিছুতেই নাড়াতে পারছি না !

কুট্টিমামার দাদু তো হাঁই-মাই করে বলতে লাগলেন, ওঁটা—ওঁটা আঁমার আঁক ! আঁক !—টানের চোটে নাক বেরুচ্ছিল না—'আঁক !'

ডাক্তার রেগে বললেন, আর হাঁক-ডাক করতে হবে না—খুব হয়েছে। আরও গোটাকয়েক টান-ফান দিয়ে নাকটাকে যখন কিছুতেই কায়দা করতে পারলেন না—তখন বিরক্ত হয়ে বললেন : নাঃ, হল না। এমন বিচ্ছিরি শক্ত দাঁত আমি কখনও দেখিনি ! এ-রকম দাঁত কোনও ভদ্রলোক তুলতে পারে না।

কুট্টিমামার দাদু বাড়ি ফিরে এসে বারো দিন নাকের ব্যথায় বিছানায় শুয়ে রইলেন। তেরো দিনের দিন উকিল ডাকিয়ে উইল করলেন : 'আমার পুত্র বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে-কেহ দাঁত বাঁধাইতে যাইবে, তাহাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিব।'

অবশ্যি কুট্টিমামার দাদুর সম্পত্তিতে কুট্টিমামার কোনও রাইট নেই—তবু দাদুর আদেশ তো ! কুট্টিমামা গাঁই-গুঁই করতে লাগলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে 'মাই নোজ'-টোজও বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সায়েবের গোঁ—জানিস তো ? ঝড়াং করে বলে দিলে, নো ফোক্‌লা দাঁত উইল ডু ! দাঁত বাঁধাতেই হবে।

কুট্টিমামা তো মনে মনে 'তনয়ে তারো তারিণী' বলে রামপ্রসাদী গান গাইতে গাইতে, বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে ডেনটিস্টের কাছে হাজির। ডেনটিস্ট প্রথমেই তাঁকে একটা চেয়ারে বসালে। তারপর দাঁতের ওপরে খুর্ খুর্ করে একটা ইলেকট্রিক বুরুশ বসিয়ে সেগুলোকে অর্ধেক ক্ষয় করে দিলে। একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাকি সবক'টা দাঁতকে নড়িয়ে ফেললে। শেষে বেজায় খুশি হয়ে বললে, এর দু'-পাটি দাঁতই খারাপ। সব তুলে ফেলতে হবে।

শুনেই কুট্টিমামা প্রায় অজ্ঞান। গোটা-তিনেক খাবি খেয়ে বললেন, নাকটাও ?

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন, চোপরাও !

তারপর আর কী ? একটা পেল্লায় সাঁড়াশি নিয়ে ডাক্তার কুরুৎ-কুরুৎ করে কুট্টিমামার সবক'টা দাঁত তুলে দিলে। কুট্টিমামা আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে কেঁদে ফেললেন। কিচ্ছুটি নেই মুখের ভেতর—একদম গাঁয়ের পেছল রাস্তার মতো—মাঝে মাঝে গর্ত। ওঁকে ঠিক বাড়ির বুড়ি ধাই রামধনিয়ার মত দেখাচ্ছিল।

কুট্টিমামা কেঁদে ফ্যাক ফ্যাক করে বললেন, ওগো আমার কী হল গো—

ডাক্তার আবার ধমক দিয়ে বললে, চোপরাও। সাত দিন পরে এসো—বাঁধানো দাঁত পাবে।

বাঁধানো দাঁত নিয়ে কুট্টিমামা ফিরলেন। দেখতে শুনতে দাঁতগুলো নেহাত খারাপ নয়। খাওয়াও যায় একরকম। খালি একটা অসুবিধে হত। খাওয়ার অর্ধেক জিনিস জমে থাকত দাঁতের গোড়ায়। পরে আবার সেগুলোকে জাবর কাটতে হত।

তবু ওই দাঁত নিয়েই দুঃখে সুখে কুট্টিমামার দিন কাটছিল। কিন্তু সায়েবদের কাণ্ড জানিস তো ? ওদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—কিছুতেই তিনটে দিন বসে

থাকতে পারে না। একদিন বললে, মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, আমরা বাঘ শিকার করতে যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

বাঘ-টাঘের ব্যাপার কুট্টিমামার তেমন পছন্দ হয় না। কারণ বাঘ হরিণ নয়—তাকে খাওয়া যায় না, বরং সে উলটে খেতে আসে। কুট্টিমামা খেতে ভালোবাসে, কিন্তু কুট্টিমামাকেই কেউ খেতে ভালোবাসে—এ-কথা ভাবলে তাঁর মন ব্যাজার হয়ে যায়। বাঘগুলো যেন কী! গায়ে যেমন বিটকেল গন্ধ, স্বভাব-চরিত্তিরও তেমনি যাচ্ছেতাই।

কুট্টিমামা কান চুলকে বললে, বাঘ স্যার—ভেরি ব্যাড স্যার্—আই নট লাইক স্যার—

কিন্তু সায়েবরা সে-কথা শুনলে তো। গোঁ যখন ধরেছে তখন গেলই। আর কুট্টিমামাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে গেল।

গিয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে এক ফরেস্ট বাংলোয় উঠল।

চারদিকে ধুন্ধুমার বন। দেখলেই পিত্তি ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রাত্তিরে হাতির ডাক শোনা যায়—বাঘ হুম হাম করতে থাকে। গাছের ওপর থেকে টুপ টুপ করে জোঁক পড়ে গায়ে। বানর এসে খামোকা ভেংচি কাটে। সকালে কুট্টিমামা দাড়ি কামাচ্ছিলেন।—একটা বানর এসে 'ইলিক চিলিক' এইসব বলে তাঁর বুরুশটা নিয়ে গেল! আর সে কী মশা! দিন নেই—রাত্তির নেই—সমানে কামড়াচ্ছে। কামড়ানোও যাকে বলে! দু'-তিন ঘন্টার মধ্যেই হাতে পায়ে মুখে যেন চাষ করে ফেললে।

তার মধ্যে আবার সায়েবগুলো মোটর গাড়ি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকল বাঘ মারতে।

—মিস্টার গাঁজা-গাবিন্ডে, তুমিও চলো।

কুট্টিমামা তক্ষুনি বিছানায় শুয়ে হাত পা ছুড়তে আরম্ভ করে দিলে। চোখ দুটোকে আলুর মতো বড় বড় করে, মুখে গ্যাঁজলা তুলে বলতে লাগল: বেলি পেইন স্যার—পেটে ব্যথা স্যার—অবস্থা সিরিয়াস স্যার—

দেখে সায়েবরা ঘোঁয়া-ঘোঁয়া—ঘ্যাঁয়োৎ-ঘ্যাঁয়োৎ করে বেশ খানিকটা হাসল।—ইউ গাঁজা-গাবিন্ডে, ভেরি নটি—বলে একজন কুট্টিমামার পেটে একটা চিমটি কাটলে—তারপর বন্দুক কাঁধে ফেলে শিকারে চলে গেল।

আর যেই সায়েবরা চলে যাওয়া—অমনি তড়াক করে উঠে বসলেন কুট্টিমামা। তক্ষুনি এক ডজন কলা, দুটো পাঁউরুটি আর এক শিশি পেয়ারার জেলি খেয়ে, শরীর-টরির ভালো করে ফেললেন।

বাংলোর পাশেই একটা ছোট পাহাড়ি ঝরনা। সেখানে একটা শিমুল গাছ। কুট্টিমামা একখানা পেল্লায় কালীসিঙ্গির মহাভারত নিয়ে সেখানে এসে বসলেন।

চারদিকে পাখি-টাখি ডাকছিল। পেটটা ভরা ছিল, মিঠে মিঠে হাওয়া দিচ্ছিল—কুট্টিমামা খুশি হয়ে মহাভারতের সেই জায়গাটা পড়তে আরম্ভ করলেন—যেখানে ভীম বকরাক্ষসের খাবার-দাবারগুলো সব খেয়ে নিচ্ছে।

পড়তে পড়তে ভাবের আবেগে কুট্টিমামার চোখে জল এসেছে, এমন সময় গর্র্—গর্র্—

কুট্টিমামা চোখ তুলে তাকাতেই:

কী সর্বনাশ! ঝরনার ওপারে বাঘ!

কী রূপ বাহার! দেখলেই পিলে-টিলে উলটে যায়। হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা, আগুনের ভাঁটার মতো চোখ, হলদের ওপরে কালো কালো ডোরা, অজগরের মতো বিশাল ল্যাজ। মস্ত হাঁ করে, মুলোর মতো দাঁত বের করে আবার বললে, গর্—র্—র্

একেই বলে বরাত! যে-বাঘের ভয়ে কুট্টিমামা শিকারে গেল না, সে-বাঘ নিজে থেকেই দোরগোড়ায় হাজির। আর কেউ হলে তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যেত, আর বাঘ তাকে সারিডন ট্যাবলেটের মতো টপাং করে গিলে ফেলত। কিন্তু আমারই মামা তো—ভাঙে তবু মচকায় না। তক্ষুনি মহাভারত বগলদাবা করে এক লাফে একেবারে শিমুল গাছের মগডালে।

বাঘ এসে গাছের নীচে থাবা পেতে বসল। দু'-চারবার থাবা দিয়ে গাছের গুঁড়ি আঁচড়ায়, আর ওপর দিকে তাকিয়ে ডাকে: ঘঁর্—র্ ঘুঁ—ঘুঁ। বোধহয় বলতে চায়—তুমি তো দেখছি পয়লা নম্বরের ঘুঘু!

কিন্তু বাঘটা তখনও ঘুঘুই দেখেছে—ফাঁদ দেখেনি। দেখল একটু পরেই। কিছুক্ষণ পরে বাঘটা রেগে যেই ঝাঁক করে একটা হ্যাঁক দিয়েছে—অমনি দারুণ চমকে উঠেছে কুট্টিমামা, আর বগল থেকে কালীসিঙ্গির সেই জগঝম্প মহাভারত ধপাস করে নিচে পড়েছে। আর পড়বি তো পড় সোজা বাঘের মুখে। সেই মহাভারতের ওজন কমসে কম পাক্কা বারো সের—তার ঘায়ে মানুষ খুন হয়—বাঘও তার ঘা খেয়ে উলটে পড়ে গেল। তারপর গোঁ—গোঁ—ঘেয়াং ঘেয়াং বলে বার-কয়েক ডেকেই—এক লাফে ঝরনা পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাওয়া।

কুট্টিমামা আরও আধ ঘন্টা গাছের ডালের বসে ঠক-ঠক করে কাঁপল। তারপর নীচে নেমে দেখল মহাভারত ঠিক তেমনি পড়ে আছে—তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। আর তার চারপাশে ছড়ানো আছে কেবল দাঁত—বাঘের দাঁত। একেবারে গোনা-গুনতি বত্রিশটা দাঁত—মহাভারতের ঘায়ে একটি দাঁতও আর বাঘের থাকেনি। দাঁতগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, মহাভারতকে মাথায় ঠেকিয়ে, কুট্টিমামা এক দৌড়ে বাংলোতে। তারপর সায়েবরা ফিরে আসতেই কুট্টিমামা সেগুলো তাদের দেখিয়ে বললে, টাইগার টুথ।

ব্যাপার দেখে সায়েবরা তো থ!

তাই তো—বাঘের দাঁতই বটে? পেলে কোথায়?

কুট্টিমামা ডাঁট দেখিয়ে বুক চিতিয়ে বললে, আই গো টু ঝরনা। টাইগার কাম। আই ডু বকসিং—মানে ঘুষি মারলাম। অল টুথ ব্রেক। টাইগার কাট ডাউন—মানে বাঘ কেটে পড়ল।

সায়েবরা বিশ্বাস করল কি না কে জানে, কিন্তু কুট্টিমামার ভীষণ খাতির বেড়ে

গেল। রিয়্যালি গাঁজা-গাবিণ্ডে ইজ এ হিরো! দেখতে কাকলাসের মতো হলে কী হয়—হি ইজ এ গ্রেট হিরো! সেদিন খাওয়ার টেবিলে একখানা আস্ত হরিণের ঠ্যাং মেরে দিলেন কুট্টিমামা।

পরদিন আবার সায়েবরা শিকারে যাওয়ার সময় ওকে ধরে টানাটানি: আজ তোমাকে যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে! ইউ আর এ বিগ পালোয়ান!

মহা ফ্যাসাদ! শেষকালে কুট্টিমামা অনেক করে বোঝালেন, বাঘের সঙ্গে বক্‌সিং করে ওঁর গায়ে খুব ব্যথা হয়েছে। আজকের দিনটাও থাক।

সায়েবরা শুনে ভেবেচিন্তে বললে, অল রাইট—অল রাইট।

আজকে কুট্টিমামা হুঁশিয়ার হয়ে গেছেন—বাংলোর বাইরে আর বেরুলেনই না। বাংলোর বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে আবার সেই কালীসিঙ্গির মহাভারত নিয়ে বসলেন।

—ঘেঁয়াও—ঘুঁঙ—

কুট্টিমামা আঁতকে উঠলেন। বাংলোর সামনে তারের বেড়া—তার ওপারে সেই বাঘ। কেমন যেন জোড়হাত করে বসেছে। কুট্টিমামার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বললে, ঘেঁয়াং—কুঁই।

আর হাঁ করে মুখটা দেখল।

ঠিক সেই রকম। দাঁতগুলো তোলবার পরে কুট্টিমামার মুখের যে-চেহারা হয়েছিল, অবিকল তা-ই। একেবারে পরিষ্কার—একটা দাঁত নাই! নির্ঘাত রামধনিয়ার মুখ।

বাঘটা হুবহু কান্নার সুরে বললে—ঘ্যাং—ঘ্যাং—ভ্যাঁও! ভাবটা এই, দাঁতগুলো তো সব গেল দাদা! আমার খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ। এখন কী করি?

কিন্তু তার আগেই এক লাফে কুট্টিমামা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছেন। বাঘটা আরও কিছুক্ষণ ঘ্যাং-ঘ্যাং—ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কেঁদে বনের মধ্যে চলে গেল।

পরদিন সকালে কুট্টিমামা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে, বাঁধানো দাঁতের পাটি দুটো খুলে নিয়ে, বেশ করে মাজছিলেন। দিব্যি সকালের রোদ উঠেছে—সায়েবগুলো ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুচ্ছে তখনও, আর কুট্টিমামা দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ফ্যাক-ফ্যাক গলায় গান গাইছিলেন: 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সে-ও ভালো—

সকাল বেলায় চাঁদের আলোয় গান গাইতে গাইতে কুট্টিমামার বোধহয় আর কোনও দিকে খেয়ালই ছিল না। ওদিকে সেই ফোকলা বাঘ এসে জানলার বাইরে বসে রয়েছে ঝোপের ভেতরে। কুট্টিমামার দাঁত খোলা—বুরুশ দিয়ে মাজা—সব দেখছে এক মনে। মাজা-টাজা শেষ করে যেই কুট্টিমামা দাঁত দু'পাটি মুখে পুরতে যাবেন—অমনি: ঘোঁয়াৎ ঘালুম!

অর্থাৎ তোফা—এই তো পেলুম।

জানলা দিয়ে এক ল্যাফে বাঘ ঘরের মধ্যে।

—টা-টাইগার—পর্যন্ত বলেই কুট্টিমামা ফ্ল্যাট।

বাঘ কিন্তু কিছুই করল না। টপাৎ করে কুট্টিমামার দাঁত দু'-পাটি নিজের মুখে পুরে নিল—কুট্টিমামা তখনও অজ্ঞান হননি—জ্বলজ্বল করে দেখতে লাগলেন, সেই দাঁত বাঘের মুখে বেশ ফিট করেছে। দাঁত পরে বাঘা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বাঘা হাসি হাসল, তারপর টপ্ করে টেবিল থেকে টুথ-ব্রাশ আর টুথ-পেস্টের টিউব মুখে তুলে নিয়ে জানলা গলিয়ে আবার—

কুট্টিমামার ভাষায়—একেবারে উইন্ড! মানে হাওয়া হয়ে গেল।

টেনিদা থামল। আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্বিতভাবে বললে, তাই বলছিলুম, দাঁত বাঁধানোর গল্প আমার কাছে করিসনি! হুঃ!

প্রভাতসঙ্গীত

টেনিদা অসম্ভব গম্ভীর। আমরা তিনজনও যতটা পারি গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করছি। ক্যাবলার মুখে একটা চুয়িং গাম ছিল, সেটা সে ঠেলে দিয়েছে গালের একপাশে—যেন একটা মার্বেল গালে পুরে রেখেছে এই রকম মনে হচ্ছে। পটলডাঙার মোড়ে তেলেভাজার দোকান থেকে আলুর চপ আর বেগুনী ভাজার গন্ধ আসছে, তাইতে মধ্যে-মধ্যে উদাস হয়ে যাচ্ছে হাবুল সেন। কিন্তু আজকের আবহাওয়া অত্যন্ত সিরিয়াস—তেলেভাজার এমন প্রাণকাড়া গন্ধেও টেনিদা কিছুমাত্র বিচলিত হচ্ছে না।

খানিক পরে টেনিদা বলল, 'পাড়ার লোকগুলো কী—বলদিকি?'

আমি বললুম, 'অত্যন্ত বোগাস।'

খাঁড়ার মতো নাকটাকে আরও খানিক খাড়া করে টেনিদা বললে, 'পয়সা তো অনেকেরই আছে। মোটরওলা বাবুও তো আছেন ক'জন। তবু আমাদের একসারসাইজ ক্লাবকে চাঁদা দেবে না?'

'না—দিব না।'—হাবুল সেন মাথা নেড়ে বললে, 'কয়—একসারসাইজ কইর‍্যা কী হইব? গুণ্ডা হইব কেবল!'

'হ, গুণ্ডা হইব!'—টেনিদা হাবুলকে ভেংচে বললে, 'শরীর ভালো করবার নাম হল গুণ্ডাবাজি! অথচ বিসর্জনের লরিতে যারা ভুতুড়ে নাচ নাচে, বাঁদরামো করে, তাদের চাঁদা দেবার বেলায় তো পয়সা সুড়সুড় করে বেরিয়ে আসে। প্যালার মতো রোগা টিকটিকি না হয়ে—'

বাধা দিয়ে বললুম, 'আবার আমাকে কেন?'

'ইউ শাটাপ।'—টেনিদা বাঘাটে হুংকার ছাড়ল: 'আমার কথার ভেতরে কুরুবকের মতো—খুব বিচ্ছিরি একটা বকের মতো বকবক করবি না—সে-কথা বলে দিচ্ছি তোকে। প্যালার মতো রোগা টিকটিকি না হয়ে পাড়ার ছেলেগুলো

দুটো ডাম্বেল-মুগুর ভাঁজুক, ডন দিক—এই তো আমরা চেয়েছিলুম। শরীর ভালো হবে, মনে জোর আসবে, অন্যায়ের সামনে রুখে দাঁড়াবে, বড় কাজ করতে পারবে। তার নাম গুণ্ডাবাজি। অথচ দ্যাখ—দু'-চারজন ছাড়া কেউ একটা পয়সা ঠেকাল না। আমরা নিজেরা চাঁদা-টাঁদা দিয়ে দু'-একটা ডাম্বেল-টাম্বেল কিনেছি, কিন্তু চেস্ট একসপ্যান্ডার, বারবেল—'

ক্যাবলা আবার চুয়িং গামটা চিবোতে আরম্ভ করল। ভরাট মুখে বললে, 'কেউ পাত্তাই দিচ্ছে না।'

হাবুল মাথা নাড়ল : 'দিব না। ক্লাব তুইল্যা দাও টেনিদা।'

'তুলে দেব ? কভি নেহি—' টেনিদার সারা মুখে মোগলাই পরোটার মতো একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা ফুটে বেরুল : 'চাঁদা তুলবই। ইউ প্যালা।'

আঁতকে উঠে বললুম, 'অ্যাঁ ?'

'আমাদের নিয়ে তো খুব উষ্টুম-ধুষ্টুম গপ্পো বানাতে পারিস, কাগজে ছাপাটাপাও হয়। একটা বুদ্ধি-টুদ্ধি বের করতে পারিস নে ?'

মাথা চুলকে বললুম, 'আমি—আমি—'

'হাঁ-হাঁ, তুই—তুই।'—টেনিদা কটাং করে আমার চাঁদিতে এমন গাঁট্টা মারল যে ঘিলু-টিলু সব নড়ে উঠল এক সঙ্গে। আমি কেবল বললুম, 'ক্যাঁক।'

ক্যাবলা বললে, 'ও-রকম গাঁট্টা মারলে তো বুদ্ধি বেরুবে না, বরং তালগোল পাকিয়ে যাবে সমস্ত। এখন ক্যাঁক বলছে, এর পরে ঘ্যাঁক-ঘ্যাঁক বলতে থাকবে আর ফস করে কামড়ে দেবে কাউকে।'

গাঁট্টার ব্যথা ভুলে আমি চটে গেলুম।

'ঘ্যাঁক করে কামড়াব কেন ? আমি কি কুকুর ?'

টেনিদা বললে, 'ইউ শাটাপ—অকর্মার ধাড়ি।'

হাবুল বললে, 'চুপ কইর‍্যা থাক প্যালা—আর একখান গাঁট্টা খাইলে ম্যাও-ম্যাও কইর‍্যা বিলাইয়ের মতন ডাকতে আরম্ভ করবি। অরে ছাইড়্যা দাও টেনিদা। আমার মাথায় একখান বুদ্ধি আসছে।'

টেনিদা ভীষণ উৎসাহ পেয়ে ঢাকাই ভাষা নকল করে ফেলল : 'কইয়্যা ফ্যালাও।'

হাবুল বললে, 'আমরা গানের পার্টি বাইর করুম।'

'গানের পার্টি ? মানে—সেই যে চাঁদা দাও গো পুরবাসী ? আর শালু নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াব ?'—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, 'আহা-হা, কী একখানা বুদ্ধিই বের করলেন। লোকে সেয়ানা হয়ে গেছে, ওতে আর চিঁড়ে ভেজে ? সারা দিন ঘুরে হয়তো পাওয়া যাবে বত্রিশটা নয়া পয়সা আর দু'খানা ছেঁড়া কাপড়। দুদ্দুর।'

ক্যাবলা টকাৎ করে চুয়িং গামটাকে আবার গালের একপাশে ঠেলে দিলে।

'টেনিদা—দি আইডিয়া।'

আমরা সবাই একসঙ্গে ক্যাবলার দিকে তাকালুম। আমাদের দলে সেই-ই সব

চেয়ে ছোট আর লেখাপড়ায় সবার সেরা—হায়ার সেকেন্ডারিতে ন্যাশনাল স্কলার। খবরের কাগজে কুশলকুমার মিত্রের ছবি বেরিয়েছিল স্ট্যান্ড করবার পরে, তোমরা তো সে-ছবি দেখেছ। সেই-ই ক্যাবলা।

ক্যাবলা ছোট হলেও আমাদের চার মূর্তির দলে সেই-ই সবচেয়ে জ্ঞানী, চশমা নেবার পরে তাকে আরও ভারিক্কি দেখায়। তাই ক্যাবলা কিছু বললে আমরা সবাই-ই মন দিয়ে তার কথা শুনি।

ক্যাবলা বললে, 'আমরা শেষ রাত্রে—মানে এই ভোরের আগে বেরুতে পারি সবাই।'

'শেষ রাত্তিরে !'—হাবুল হাঁ করে রইল : 'শেষ রাত্তিরে ক্যান ? চুরি করুম নাকি আমরা ?'

'চুপ কর না হাবলা—' ক্যাবলা বিরক্ত হয়ে বললে, 'আগে ফিনিশ করতে দে আমাকে। আমি দেখেছি, ভোরবেলায় ছোট-ছোট দল কীর্তন গাইতে বেরোয়। লোকে রাগ করে না, সকালবেলায় ভগবানের নাম শুনে খুশি হয়। পয়সা-টয়সাও দেয় নিশ্চয়।'

টেনিদা বললে, 'হুঁ, রাত্তিরে ঘুমিয়ে-টুমিয়ে ভোরবেলায় লোকের মন খুশিই থাকে। তারপর যেই বাজারে কুমড়ো-কাঁচকলা আর চিংড়ি মাছ কিনতে গেল, অমনি মেজাজ খারাপ। আর অফিস থেকে ফেরবার পরে তো—ইরে ব্বাস।'

আমি বললুম, 'মেজদা যেই হাসপাতাল থেকে আসে—অমনি সক্কলকে ধরে ইনজেকশন দিতে চায়।'

হাবুল বললে, 'তর মেজদা যদি পাড়ার বড় লোকগুলারে ধইর‍্যা তাগো পুটুস-পুটুস কইর‍্যা ইনজেকশন দিতে পারত—'

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : 'অর্ডার—অর্ডার, ভীষণ গোলমাল হচ্ছে। কিন্তু ক্যাবলার আইডিয়াটা আমার বেশ মনে ধরেছে—মানে যাকে বলে সাইকোলজিক্যাল। সকালে লোকের মন খুশি থাকে—ইয়ে যাকে বলে বেশ পবিত্র থাকে, তখন এক-আধটা বেশ ভক্তিভরা গান-টান শুনলে কিছু-না-কিছু দেবেই। রাইট। লেগে পড়া যাক তা হলে।'

আমি বললুম, 'কিন্তু জিমন্যাস্টিক ক্লাবের জন্যে আমরা হরিসংকীর্তন গাইব ?'

ক্যাবলা বললে, 'হরি-সংকীর্তন কেন ? তুই তো একটু-আধটু লিখতে পারিস, একটা গান লিখে ফ্যাল। ভীম, হনুমান—এইসব বীরদের নিয়ে বেশ জোরালো গান।'

'আমি—'

'হাঁ, তুই, তুই।'—টেনিদা আবার গাঁট্টা তুলল : 'মাথার ঘিলুটা আর একবার নড়িয়ে দিই, তা হলেই একেবারে আকাশবাণীর মতো গান বেরুতে থাকবে।'

আমি এক লাফে নেমে পড়লুম চাটুজ্যেদের রোয়াক থেকে।

'বেশ, লিখব গান। কিন্তু সুর দেবে কে ?'

টেনিদা বললে, 'আরে সুরের ভাবনা কী—একটা কেত্তন-ফেত্তন লাগিয়ে দিলেই

হল।'

'আর গাইব কেডা ?' হাবুলের প্রশ্ন শোনা গেল : 'আমাগো গলায় তো ভাউয়া ব্যাংয়ের মতন আওয়াজ বাইর অইব।'

'হ্যাং ইয়োর ভাউয়া ব্যাং !'—টেনিদা বললে, 'এ-সব গান আবার জানতে হয় নাকি ?' গাইলেই হল। কেবল আমাদের খাণ্ডার ক্লাবের গোলকিপার পাঁচুগোপালকে একটু যোগাড় করতে হবে, ও হারমোনিয়াম বাজাতে পারে—গাইতেও পারে—মানে আমাদের লিড করবে।'

হাবুল বললে, 'আমাগো বাড়িতে একটা কর্তাল আছে, লইয়া আসুম।'

ক্যাবলা বললে, 'আমাদের ঠাকুর দেশে গেছে, তার একটা ঢোল আছে। সেটা আনতে পারি।'

'গ্র্যান্ড !'—টেনিদা ভীষণ খুশি হল : 'ওটা আমিই বাজাব এখন। দেন এভরিথিং ইজ কমপ্লিট। শুধু গান বাকি। প্যালা—হাফ অ্যান আওয়ার টাইম। দৌড়ে চলে যা—গান লিখে নিয়ে আয়। এর মধ্যে আমরা একটু তেলেভাজা খেয়েনি।'

মাথা চুলকে আমি বললুম, 'আমিও দুটো তেলেভাজা খেয়ে গান লিখতে যাই না কেন ? মানে—দু'-একটা আলুর চপ-টপ খেলে বেশ ভাব আসত।'

'আর আলুর চপ খেয়ে কাজ নেই। যা—বাড়ি যা—কুইক। আধ ঘণ্টার মধ্যে গান লিখে না আনলে ভাব কী করে বেরোয় আমি দেখব। কুইক—কুইক—'

টেনিদা রোয়াক থেকে নেমে পড়তে যাচ্ছিল। অগত্যা আমি ছুট লাগালুম। কুইক নয়—কুইকেস্ট যাকে বলে।

জাগো রে নগরবাসী, ভজো হনুমান
করিবেন তোমাদের তিনি বলবান।
ও গো—সকালে বিকালে যেবা করে ভীমনাম
সেই হয় মহাবীর—নানা গুণধাম।
জাগো রে নগরবাসী—ডন দাও, ভাঁজো রে ডামবেল,
খাও রে পরান ভরি ছোলা-কলা-আম-জাম-বেল—
হও রে সকলে বীর, হও ভীম, হও হনুমান,
জাগিবে ভারত এতে করি অনুমান।

ক্যাবলা গান শুনে বললে, 'আবার অনুমান করতে গেলি কেন ? লেখ—জাগিবে ভারত এতে পাইবে প্রমাণ।'

টেনিদা বললে, 'রাইট। কারেকট সাজেসশন।'

হাবুল বললে, 'কিন্তু মানুষরে হনুমান হইতে কইবা ? চেইত্যা যাইব না ?'

টেনিদা বললে, 'চটবে কেন ? পশ্চিমে হনুমানজীর কত কদর। জয় হনুমান বলেই তো কুস্তি করতে নামে। হনুমান সিং—হনুমানপ্রসাদ, এ-রকম কত নাম হয় ওদের। হনুমান কি চাড্ডিখানা কথা রে। এক লাফে সাগর পেরুলেন, লঙ্কা পোড়ালেন, গন্ধমাদন টেনে আনলেন, রাবণের রথের চুড়োটা কড়মড়িয়ে চিবিয়ে দিলেন—এক দাঁতের জোরটাই ভেবে দ্যাখ একবার।'

'তবে কিনা—খাও রে পরান ভরি ছোলা-কলা-আম-জাম-বেল—' চুয়িং গাম খেতে খেতে ক্যাবলা বললে, 'এই লাইনটা ঠিক—'

আমি বললুম, 'বারে, গানে রস থাকবে না ? কলা-আম-জামে কত রস বল দিকি ? আর দুটো-চারটে ভালো জিনিস খাওয়ার আশা না থাকলে লোকে খামকা ডামবেল-বারবেল ভাঁজতেই বা যাবে কেন ? লোভও তো দেখাতে হয় একটু।'

'ইয়া !'—টেনিদা ভীষণ খুশি হল : 'এতক্ষণে প্যালার মাথা খুলেছে। এই গান গেয়েই আমরা কাল ভোররাত্তিরে পাড়ায় কীর্তন গাইতে বেরুব। ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—'

আমরা তিনজন চেঁচিয়ে উঠলুম : 'ইয়াক—ইয়াক !'

এবং পরদিন ভোরে—

শ্রদ্ধানন্দ পার্কের কাছে কাক ডাকবার আগে, ঝাড়ুদার বেরুনোর আগে প্রথম ট্রাম দেখা না দিতেই—

"জাগো রে নগরবাসী, ভজো হনুমান—"

আগে-আগে গলায় হারমোনিয়াম নিয়ে পাঁচুগোপাল। তার পেছনে ঢোল নিয়ে টেনিদা, টেনিদার পাশে কর্তাল হাতে ক্যাবলা। থার্ড লাইনে আমি আর হাবুল সেন। টেনিদা বলে দিয়েছে, তোদের দুজনের গলা একেবারে দাঁড়কাকের মতো বিচ্ছিরি, কোনও সুর নেই, তোরা থাক ব্যাক-লাইনে।

আহা—টেনিদা যেন গানের গন্ধর্ব। একদিন কী মনে করে যেন সন্ধ্যাবেলায় গড়ের মাঠে সুর ধরেছিল—'আজি দখিন দুয়ার খোলা এসো হে, এসো হে, এসো হে।' কিন্তু আসবে কে ? জন তিনেক লোক অন্ধকারে ঘাসের ওপর শুয়েছিল, দু' লাইন শুনেই তারা তড়াক তড়াক করে উঠে বসল, তারপর তৃতীয় লাইন ধরতেই দুড়দুড় করে টেনে দৌড় এসপ্ল্যানেডের দিকে—যেন ভূতে তাড়া করেছে।

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, 'তোমার গলায় তো মা সরস্বতীর রাজহাঁস ডাকে—' কিন্তু হাবুল আমায় থামিয়ে দিলে। বললে, 'চুপ মাইর‍্যা থাক। ভালোই হইল, তর আমার গাইতে হইব না। অরা তিনটায় গাঁ-গাঁ কইর‍্যা চ্যাঁচাইব, তুই আর আমি পিছন থিক্যা অ্যাঁ-অ্যাঁ করুম।'

সুতরাং রাস্তায় বেরিয়েই পাঁচুর হারমোনিয়ামের প্যাঁ-প্যাঁ আওয়াজ, টেনিদার দুমদাম ঢোল আর ক্যাবলার ঝমাঝম কর্তাল। তারপরেই বেরুল সেই বাঘা কীর্তন :

"ওগো—সকালে বিকালে যেবা করে ভীমনাম—"

পাঁচুর পিনপিনে গলা, টেনিদার গগনভেদী চিৎকার, ক্যাবলার ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ, হাবুলের সর্দি-বসা স্বর আর সেই সঙ্গে আমার কোকিল-খাওয়া রব। কোরাস তো দূরে থাক—পাঁচটা গলা পাঁচটা গোলার মতো দিগ্বিদিকে ছুটল :

"জাগো রে নগরবাসী, ডন দাও—ভাঁজো রে ডামবেল—"

ঘোঁয়াক ঘোঁয়াক করে আওয়াজ হল, দুটো কুকুর সারা রাত চেঁচিয়ে কেবল

একটু ঘুমিয়েছে—তারা বাঁইবাঁই করে ছুটল। গড়ের মাঠের লোকগুলো তো তবু এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত দৌড়েছিল, এরা ডায়মন্ড হারবারের আগে গিয়ে থামবে বলে মনে হল না।

এবং তৎক্ষণাৎ—

দড়াম করে খুলে গেল ঘোষেদের বাড়ির দরজা। বেরুলেন সেই মোটা গিন্নী—যাঁর চিৎকারে পাড়ায় কাক-চিল পড়তে পায় না।

আমাদের কোরাস থেমে গেল তাঁর একটি সিংহগর্জনে।

'কী হচ্ছে অ্যাঁ। এই লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা টেনি—কী আরম্ভ করেছিস এই মাঝরাত্তিরে ?'

অত বড় লিডার টেনিদাও পিছিয়ে গেল তিন পা!

'মানে মাসিমা—মানে ইয়ে এই—ইয়ে—একসারসাইজ ক্লাবের জন্য চাঁদা—'

'চাঁদা! অমন মড়া-পোড়ানো গান গেয়ে—পাড়াসুদ্ধ লোকের পিলে কাঁপিয়ে মাঝরাত্তিরে চাঁদা ? দূর হ এখেন থেকে ভূতের দল; নইলে পুলিশ ডাকব এক্ষুনি!'

দড়াম করে দরজা বন্ধ হল পরক্ষণেই।

কীর্তন-পার্টি শোকসভার মতো স্তব্ধ একেবারে।

হাবুল করুণ স্বরে বলল, 'হইব না টেনিদা। এই গানে কারও হৃদয় গলব না মনে হইত্যাছে।'

'হবে না মানে ?'—টেনিদা পান্তুয়ার মতো মুখ করে বললে, 'হতেই হবে। লোকের মন নরম করে তবে ছাড়ব।'

'কিন্তু ঘোষমাসিমা তো আরও শক্ত হয়ে গেলেন'—আমাকে জানাতে হল।

'উনি তো কেবল চেঁচিয়ে ঝগড়া করতে পারেন, জিমন্যাস্টিকের কী বুঝবেন। অলরাইট—নেকসট হাউস। গজকেষ্টবাবুর বাড়ি।'

আবার পদযাত্রা। আর সম্মিলিত রাগিণী :

"খাও রে পরান ভরি ছোলা-কলা-আম-জাম-বেল—
হও রে সকলে বীর, হও ভীম, হও হনুমান—"

পাঁচু, টেনিদা, ক্যাবলা তেড়ে কেবল 'হও হনুমান' পর্যন্ত গেয়েছে, আমি আর হাবলা 'আম' পর্যন্ত বলে সুর মিলিয়েছি, অমনি গজকেষ্ট হালদারের দোতলার ঝুলবারান্দা থেকে—

না, চাঁদা নয়! প্রথমে একটা ফুলের টব, তার পরেই একটা কুঁজো। মেঘনাদকে দেখা গেল না, কিন্তু টবটা আর একটু হলেই আমার মাথায় পড়ত, আর কুঁজোটা একেবারে টেনিদার মৈনাকের মতো নাকের পাশ দিয়ে ধাঁ করে বেরিয়ে গেল।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, 'টেনিদা—গাইডেড মিশাইল।'

বলতে-বলতেই আকাশ থেকে নেমে এল প্রকাণ্ড এক হুলো বেড়াল—পড়ল পাঁচুর হারমোনিয়ামের ওপর। খ্যাঁচ-ম্যাচ করে এক বিকট আওয়াজ—হারমোনিয়ামসুদ্ধু পাঁচু একেবারে চিৎ—আর ক্যাঁচ-ক্যাঁচাও বলে বেড়ালটা পাশের গলিতে উধাও।

ততক্ষণে আমরা ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছি। প্রায় হ্যারিসন রোড পর্যন্ত দৌড়ে থামতে হল আমাদের। পাঁচু কাঁদো-কাঁদো গলায় বললে, 'টেনিদা, এনাফ। এবার আমি বাড়ি যাব।'

হাবুল বললে, 'হ, নাইলে মারা পোড়বা সক্কলে। অখন কুজা ফ্যালাইছে, এইবারে সিন্দুক ফ্যালাইব। অখন বিলাই ছুইর‍্যা মারছে, এরপর ছাত থিক্যা গোরু ফ্যালাইব!'

টেনিদা বললে, 'শাট আপ—ছাতে কখনও গোরু থাকে না।'

'না থাকুক গোরু—ফিক্যা মারতে দোষ কী। আমি অখন যাই গিয়া। হিস্ট্রি পড়তে হইব।'

'এঃ—হিস্ট্রি পড়বেন!'—টেনিদা বিকট ভেংচি কাটল : 'ইদিকে তো আটটার আগে কোনওদিন ঘুম ভাঙে না। খবর্দার হাবলা—পালানো চলবে না। আর একটা চানস নেব। এত ভালো গান লিখেছে প্যালা, এত দরদ দিয়ে গাইছি আমরা—জয় হনুমান আর বীর ভীমসেন মুখ তুলে চাইবেন না ? এবং মহৎ কাজ করতে যাচ্ছি আমরা—কিছু চাঁদা জুটিয়ে দেবেন না তাঁরা ? ট্রাই—ট্রাই এগেন। মন্ত্রের সাধন কিংবা—ধর, পাঁচু—'

পাঁচুগোপাল কাঁউমাউ করতে লাগল : 'একসকিউজ মি টেনিদা। পেল্লায় হুলো বেড়াল, আর একটু হলেই নাক-ফাক আঁচড়ে নিত আমার। আমি বাড়ি যাব।'

'বাড়ি যাবেন!'—টেনিদা আবার একটা যাচ্ছেতাই ভেংচি কাটল : 'মামাবাড়ির আবদার পেয়েছিস, না ? টেক কেয়ার পেঁচো— ঠিক এক মিনিট সময় দিচ্ছি। যদি গান না ধরিস, এক থাপ্পড়ে তোর কান—'

ক্যাবলা বললে, 'কানপুরে চলে যাবে।'

আমি হাবুলের কানে-কানে বললুম, 'লোকে আমাদের এর পরে ঠেঙিয়ে মারবে, হাবলা। কী করা যায় বল তো ?'

'তুই গান লেইখ্যা ওস্তাদি করতে গেলি ক্যান ?'

'সংকীর্তন গাইবার বুদ্ধি তো তুই-ই দিয়েছিলি।'

হাবুল কী বলতে যাচ্ছিল, আবার প্যাঁ-প্যাঁ করে হারমোনিয়াম বেজে উঠল পাঁচুর। এবং :

"জাগো রে নগরবাসী—ভজো হনুমান—"

ঢোলক-করতালের আওয়াজে আবার চারদিকে ভূমিকম্প শুরু হল। আর পাঁচটি গলার স্বরে সেই অনবদ্য সংগীতচর্চা :

"করিবেন তোমাদের তিনি বলবান—"

কোনও সাড়াশব্দ নেই কোথাও। কুঁজো নয়, বেড়াল নয়, গাল নয়, কিচ্ছু নয়। সামনে কন্ট্রাকটার বিধুবাবুর নতুন তেতলা বাড়ি নিথর!

আমাদের গান চলতে লাগল :

"ওগো—সকালে বিকালে যেবা করে ভীমনাম—"

'ডামবেল' পর্যন্ত যেই এসেছে, দড়াম করে দরজা খুলে গেল আবার। গায়ে

একটা কোট চড়িয়ে, একটা সুটকেস হাতে প্রায় নাচতে-নাচতে বেরুলেন বাড়ির মালিক বিধুবাবু।

আমি আর হাবলা টেনে দৌড় লাগাবার তালে আছি, আঁক করে পাঁচুর গান থেমে গেছে, টেনিদার হাত থমকে গেছে ঢোলের ওপর। বিধুবাবু আমাদের মাথায় সুটকেস ছুঁড়ে মারবেন কিনা বোঝবার আগেই—

ভদ্রলোক টেনিদাকে এসে জাপটে ধরলেন সুটকেসসুদ্ধ। নাচতে লাগলেন তারপর।

'বাঁচালে টেনিরাম, আমায় বাঁচালে। অ্যালার্ম ঘড়িটা খারাপ হয়ে গেছে, তোমাদের ডাকাত-পড়া গান কানে না এলে ঘুম ভাঙত না ; পাঁচটা সাতের গাড়ি ধরতে পারতুম না—দেড় লাখ টাকার কন্ট্রাকটই হাতছাড়া হয়ে যেত। কী চাই তোমাদের বলো। শেষ রাতে তিনশো শেয়ালের কান্না কেন জুড়ে দিয়েছ বলো—আমি তোমাদের খুশি করে দেব।'

'শেয়ালের কান্না না স্যার—শেয়ালের কান্না না!'—বিধুবাবুর সঙ্গে নাচতে-নাচতে তালে-তালে টেনিদা বলে যেতে লাগল: 'একসারসাইজ ক্লাব—ডামবেল-বারবেল কিনব—অন্তত পঞ্চাশটা টাকা দরকার—'

বেলা ন'টা। রবিবারের ছুটির দিন। চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে আছি আমরা। পাঁচুগোপালও গেস্ট হিসেবে হাজির আছে আজকে।

মেজাজ আমাদের ভীষণ ভালো। পঞ্চাশ টাকা দিয়ে গেছেন বিধুবাবু। সামনের মাসে আরও পঞ্চাশ টাকা দেবেন কথা দিয়েছেন।

নিজের পয়সা খরচ করে টেনিদা আমাদের আইসক্রিম খাওয়াচ্ছিল। আইসক্রিম শেষ করে, কাগজের গেলাসটাকে চাটতে-চাটতে বলল, 'তবে যে বলেছিলি হনুমান আর ভীমের নামে কাজ হয় না? হুঁ হুঁ—কলিকাল হলে কী হয়, দেবতার একটা মহিমে আছে না?'

পাঁচু বললে, 'আর হুলো বেড়ালটা যদি আমার ঘাড়ে পড়ত—'

আমি বললুম, 'আর ফুলের টব যদি আমার মাথায় পড়ত—'

হাবুল বললে, 'কুঁজাখান যদি দমাস কইর‍্যা তোমার নাকে লাগত—'

টেনিদা বললে, 'হ্যাং ইয়োর হুলো বেড়াল, ফুলের টব, কুঁজো। ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—'

আমরা চেঁচিয়ে বললুম, 'ইয়াক ইয়াক।'

ভজহরি ফিল্ম কর্পোরেশন

বউবাজার দিয়ে আসতে আসতে ভীমনাগের দোকানের সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে গেল টেনিদা। আর নড়তে চায় না। আমি বললুম, রাস্তার মাঝখানে অমন করে দাঁড়ালে কেন? চলো।

—যেতে হবে? নিতান্তই যেতে হবে? —কাতর দৃষ্টিতে টেনিদা তাকাল আমার দিকে ; প্যালা, তোর প্রাণ কি পাষাণে গড়া? ওই দ্যাখ, থরে-থরে সন্দেশ সাজানো রয়েছে, থালার ওপর সোনালি রঙের রাজভোগ হাতছানি দিয়ে ডাকছে, রসের মধ্যে ডুব-সাঁতার কাটছে রসগোল্লা, পান্তো। প্যালা রে—

আমি মাথা নেড়ে বললুম, চালাকি চলবে না। আমার পকেটে তিনটে টাকা আছে, ছোটমামার জন্যে মকরধ্বজ কিনতে হবে। অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে, চলো এখন—

টেনিদা শাঁ করে জিভে খানিকটা লাল টেনে নিয়ে বললে, সত্যি বলছি, বড্ড খিদে পেয়েছে রে! আচ্ছা, দুটো টাকা আমায় ধার দে, বিকেলে না হয় ছোটমামার জন্যে মকরধ্বজ—

কিন্তু ও সব কথায় ভোলবার বান্দা প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে নয়। টেনিদাকে টাকা ধার দিলে সে-টাকাটা আদায় করতে পারে এমন খলিফা লোক দুনিয়ায় জন্মায়নি। পকেটটা শক্ত করে চেপে ধরে আমি বললুম, খাবারের দোকান চোখে পড়লেই তোমার পেট চাঁই-চাঁই করে ওঠে— ওতে আমার সিমপ্যাথি নেই। তা ছাড়া, এ-বেলা মকরধ্বজ না নিয়ে গেলে আমার ছেঁড়া কানটা সেলাই করে দেবে কে? তুমি?

রেলগাড়ির ইঞ্জিনের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেনিদা।

—ব্রাহ্মণকে সক্কালবেলা দাগা দিলি প্যালা— মরে তুই নরকে যাবি।

—যাই তো যাব। কিন্তু ছোটমামার কানমলা যে নরকের চাইতে ঢের মারাত্মক সেটা জানা আছে আমার। আর, কী আমার ব্রাহ্মণ রে! দেলখোস রেস্তোরাঁয় বসে আস্ত-আস্ত মুরগির ঠ্যাং চিবুতে তোমায় যেন দেখিনি আমি।

—উঃ! সংসারটাই মরীচিকা—ভীমনাগের দোকানের দিকে তাকিয়ে শেষবার দৃষ্টিভোজন করে নিলে টেনিদা ; নাঃ, বড়লোক না হলে আর সুখ নেই।

বিকেলে চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে সেই কথাই হচ্ছিল। ক্যাবলা গেছে কাকার সঙ্গে চিড়িয়াখানায় বেড়াতে, হাবুল সেন গেছে দাঁত তুলতে। কাজেই আছি আমরা দু'জন। মনের দুঃখে দু'ঠোঙা তেলেভাজা খেয়ে ফেলেছে টেনিদা। অবশ্য পয়সাটা আমিই দিয়েছি এবং আধখানা আলুর চপ ছাড়া আর কিছুই আমার বরাতে জোটেনি।

আমার পাঞ্জাবির আস্তিনটা টেনে নিয়ে টেনিদা মুখটা মুছে ফেলল। তারপর

বললে, বুঝলি প্যালা, বড়লোক না হলে সত্যিই আর চলছে না।

—বেশ তো হয়ে যাও-না বড়লোক— আমি উৎসাহ দিলুম।

—হয়ে যাও-না! —বড়লোক হওয়াটা একেবারে মুখের কথা কিনা! টাকা দেবে কে, শুনি? তুই দিবি?— টেনিদা ভেংচি কাটল। আমি মাথা নেড়ে জানালুম, না আমি দেব না।

—তবে?

—লটারির টিকিট কেনো। —আমি উপদেশ দিলুম।

—ধ্যাত্তোর লটারির টিকিট। কিনে-কিনে হয়রান হয়ে গেলুম, একটা ফুটো পয়সাও যদি জুটত কোনও বার। লাভের মধ্যে টিকিটের জন্যে বাজারের পয়সা চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লুম, বড়দা দুটো অ্যায়সা থাপ্পড় কষিয়ে দিলে। ওতে হবে না—বুঝলি? বিজনেস করতে হবে।

—বিজনেস!

—আলবাত বিজনেস। —টেনিদার মুখ সংকল্পে কঠোর হয়ে উঠল; ওই যে কী বলে, হিতোপদেশে লেখা আছে না, বাণিজ্যে বসতে ইয়ে— মানে লক্ষ্মী! ব্যবসা ছাড়া পথ নেই— বুঝেছিস?

—তা তো বুঝেছি। কিন্তু তাতেও তো টাকা চাই।

—এমন বিজনেস করবে যে নিজের একটা পয়সাও খরচ হবে না। সব পরস্মৈপদী— মানে পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে।

—সে আবার কী বিজনেস?—আমি বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলুম।

—হুঁ হুঁ, আন্দাজ কর দেখি? —চোখ কুঁচকে মিটিমিটি হাসতে লাগল টেনিদা; বলতে পারলি না তো? ও-সব কি তোর মতো নিরেট মগজের কাজ? এমনি একটা মাথা চাই, বুঝলি?

সগৌরবে টেনিদা নিজের ব্রহ্মতালুতে দুটো টোকা দিলে।

—কেন অযথা ছলনা করছ? বলেই ফেলো না— আমি কাতর হয়ে জানতে চাইলুম।

টেনিদা একবার চারদিকে তাকিয়ে ভালো করে দেখে নিলে, তারপর আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বললে, ফিলিম কোম্পানি!

অ্যাঁ! —আমি লাফিয়ে উঠলাম।

—গাধার মতো চ্যাঁচাসনি— টেনিদা ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠল; সব প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। তুই গল্প লিখবি— আমি ডাইরেক্ট্‌ —মানে পরিচালনা করব। দেখবি, চারিদিকে হইহই পড়ে যাবে।

—ফিলিমের কী জানো তুমি? আমি জানতে চাইলুম।

—কে-ইবা জানে? —টেনিদা তাচ্ছিল্যভরা একটা মুখ ভঙ্গি করলে; সবাই সমান— সকলের মগজেই গোবর। তিনটে মারামারি, আটটা গান আর গোটা কতক ঘরবাড়ি দেখালেই ফিলিম হয়ে যায়। টালিগঞ্জে গিয়ে আমি শুটিং দেখে এসেছি তো।

—কিন্তু তবুও—

—ধ্যাৎ, তুই একটা গাড়ল। —টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, সত্যি-সত্যিই কি আর ছবি তুলব আমরা। ও-সব ঝামেলার মধ্যে কে যাবে!

— তা হলে?

—শেয়ার বিক্রি করব। বেশ কিছু শেয়ার বিক্রি করতে পারলে— বুঝলি তো? —টেনিদা চোখ টিপল; দ্বারিক, ভীমনাগ, দেলখোস, কে. সি. দাস—

এইবার আমার নোলায় জল এসে গেল। চুক চুক করে বললুম— থাক, থাক আর বলতে হবে না।

পরদিন গোটা পাড়াটাই পোস্টারে পোস্টারে ছেয়ে গেল।

“দি ভজহরি ফিলিম কর্পোরেশন”
আসিতেছে—আসিতেছে
রোমাঞ্চকর বাণীচিত্র
“বিভীষিকা”!

পরিচালনা: ভজহরি মুখোপাধ্যায় (টেনিদা)

কাহিনী: প্যালারাম বন্দ্যোপাধ্যায়

তার নীচে ছোট ছোট হরফে লেখা:

সর্বসাধারণকে কোম্পানির শেয়ার কিনিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইতেছে। প্রতিটি শেয়ারের মূল্য মাত্র আট আনা। একত্রে তিনটি শেয়ার কিনিলে মাত্র এক টাকা।

এর পরে একটা হাত এঁকে লিখে দেওয়া হয়েছে: বিশেষ দ্রষ্টব্য— শেয়ার কিনিলে প্রত্যেককেই বইতে অভিনয়ের চান্স দেওয়া হইবে। এমন সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। মাত্র অল্প শেয়ার আছে, এখন না কিনিলে পরে পস্তাইতে হইবে। সন্ধান করুন— ১৮নং পটলডাঙা স্ট্রিট, কলিকাতা।

আর, বিজ্ঞাপনের ফল যে কত প্রত্যক্ষ হতে পারে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই হাতেনাতে তার প্রমাণ মিলে গেল। এমন প্রমাণ মিলল যে প্রাণ নিয়ে টানাটানি। অত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা আমরা আশা করিনি। টেনিদাদের এত বড় বাড়িটা একেবারে খালি, বাড়িসুদ্ধু সবাই গেছে দেওঘরে, হাওয়া বদলাতে। টেনিদার ম্যাট্রিক পরীক্ষা সামনে, তাই একা রয়ে গেছে বাড়িতে, আর আছে চাকর বিষ্টু। তাই দিব্যি আরাম করে বসে আমরা তেতলার ঘরে রেডিয়ো শুনছি আর পাঁঠার ঘুগনি খাচ্ছি। এমন সময় বিষ্টু খবর নিয়ে এল মূর্তিমান একটি ভগ্নদূতের মতো।

বিষ্টুর বাড়ি চাটগাঁয়। হাঁইমাই করে নাকি সুরে কী যে বলে ভালো বোঝা যায় না। তবু যেটুকু বোঝা গেল, শুনে আমরা আঁতকে উঠলুম। গলায় পাঁঠার ঘুগনি বেঁধে গিয়ে মস্ত একটা বিষম খেল টেনিদা।

বিষ্টু জানাল: আঁড়িত ডাঁহাইত হইড়ছে (বাড়িতে ডাকাত পড়েছে)।

বলে কী ব্যাটা! পাগল না পেট খারাপ! ম্যাড়া না মিরগেল। এই ভর দুপুর বেলায় একেবারে কলকাতার বুকের ভেতরে ডাকাত পড়বে কী রকম!

বিষ্টু বিবর্ণ মুখে জানাল : নীচে হাঁসি দেইখ্যা যান (নীচে এসে দেখে যান)। —

আমি ভেবেছিলাম খাটের তলাটা নিরাপদ কিনা, কিন্তু টেনিদা এমন এক বাঘা হাঁকার ছাড়লে যে আমার পালাজ্বরের পিলেটা দস্তুরমতো হকচকিয়ে উঠল।

—কাপুরুষ ! চলে আয় দেখি— একটা বোম্বাই ঘুষি হাঁকিয়ে ডাকাতের নাক ন্যাবড়া করে দি।— আমি নিতান্ত গোবেচারা প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে, শিংমাছের ঝোল খেয়ে প্রাণটাকে কোনওমতে ধরে রেখেছি, ওসব ডাকাত-ফাকাতের ঝামেলা আমার ভালো লাগে না। বেশ তো ছিলাম, এসব ভজঘট ব্যাপার কেন রে বাবা। আমি বলতে চেষ্টা করলুম, এই—এই মানে, আমার কেমন পেট কামড়াচ্ছে—

—পেট কামড়াচ্ছে ! টেনিদা গর্জন করে উঠল : পাঁঠার ঘুগনি সাবাড় করার সময় তো সে কথা মনে ছিল না দেখছি। চলে আয় প্যালা, নইলে তোকেই আগে—

কথাটা টেনিদা শেষ করল না, কিন্তু তার বক্তব্য বুঝতে বেশি দেরি হল না আমার। 'জয় মা দুর্গা'—কাঁপতে-কাঁপতে আমি টেনিদাকে অনুসরণ করলুম।

কিন্তু না— ডাকাত পড়েনি। পটলডাঙার মুখ থেকে কলেজ স্ট্রিটের মোড় পর্যন্ত 'কিউ।'

কে নেই সেই কিউতে ? স্কুলের ছেলে, মোড়ের বিড়িওয়ালা, পাড়ার ঠিকে ঝি, উড়ে ঠাকুর, এমন কি যমদূতের মত দেখতে এক জোড়া ভীম-দর্শন কাবুলিওয়ালা।

আমরা সামনে এসে দাঁড়াতেই গগনভেদী কোলাহল উঠল।

—আমি শেয়ার কিনব—

—এই নিন মশাই আট আনা পয়সা—

ঝি বলল, ওগো বাছারা, আমি এক ট্যাকা এনেছি। আমাদের তিনখানা শেয়ার দাও— আর একটা হিরোইনের চান্স দিয়ো—

পাশের বোর্ডিংটার উড়ে ঠাকুর বললে, আমিও আষ্টো গণ্ডা পয়সা আনুচি—

সকলের গলা ছাপিয়ে কাবুলিওয়ালা রুদ্র কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ল : এঃ বাব্বু, এক এক রূপায়া লায়া, হামকো ভি চান্স চাহিয়ে—

তারপরেই সমস্বরে চিৎকার উঠল : চান্স—চান্স ! চিৎকারের চোখে আমার মাথা ঘুরে গেল— দু'হাতে কান চেপে আমি বসে পড়লুম।

আশ্চর্য, টেনিদা দাঁড়িয়ে রইল। দাঁড়িয়ে রইল একেবারে শান্ত, স্তব্ধ বুদ্ধদেবের মতো। শুধু তাই নয়, এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত একটা দাঁতের ঝলক বয়ে গেল তার— মানে হাসল।

তারপর বললে, হবে, হবে, সকলেরই হবে,— বরাভয়ের মতো একখানা হাত সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, প্রত্যেককেই চান্স দেওয়া হবে। এখন চাঁদেরা আগে সুড়সুড় করে পয়সা বের করো দেখি। খবরদার, অচল আধুলি চালিয়ো না,— তাহলে কিন্তু—

—জয় হিন্দ—জয় হিন্দ—

ভিড়টা কেটে গেলে টেনিদা দু' হাত তুলে নাচতে শুরু করে দিলে। তারপর ধপ করে একটা চেয়ারে বসতে গিয়ে চেয়ারসুদ্ধই চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল।

আমি বললুম, আহা-হা—

কিন্তু টেনিদা উঠে পড়েছে ততক্ষণে। আমার কাঁধের ওপর এমন একটা অতিকায় থাবড়া বসিয়ে দিলে যে, আমি আর্তনাদ করে উঠলুম।

—ওরে প্যালা, আজ দুঃখের দিন নয় রে, বড় আনন্দের দিন। মার দিয়া কেল্লা ! ভীমনাগ, দ্বারিক ঘোষ, চাচার হোটেল, দেলখোস—আঃ !

যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে আমিও বললুম, আঃ।

—আয় গুনে দেখি— এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত আবার হাসির ঝলক উলসে উঠল।

রোজগার নেহাত মন্দ হয়নি। গুনে দেখি, ছাব্বিশ টাকা বারো আনা।

—বারো আনা ? —টেনিদা ভ্রূকুটি করলে, বারো আনা কী করে হয় ? আট আনা এক টাকা করে হলে— উহুঁ ! নিশ্চয় ডামাডোলের মধ্যে কোনও ব্যাটা চার গণ্ডা পয়সা ফাঁকি দিয়েছে— কী বলিস ?

আমি মাথা নেড়ে জানালুম, আমারও তাই মনে হয়।

—উঃ—দুনিয়ায় সবই জোচ্চোর। একটাও কি ভালো লোক থাকতে নেইরে ? দিলে সক্কালবেলাটায় বামুনের চার চার আনা পয়সা ঠকিয়ে। —টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : যাক, এতেও নেহাত মন্দ হবে না। দেলখোস, ভীমনাগ, দ্বারিক ঘোষ—

আমি তার সঙ্গে জুড়ে দিলুম, চাচার হোটেল, কে সি দাস—

টেনিদা বললে, ইত্যাদি— ইত্যাদি। কিন্তু শোন প্যালা, একটা কথা আগেই বলে রাখি। প্ল্যানটা আগাগোড়াই আমার। অতএব বাবা সোজা হিসেব— চৌদ্দ আনা—দু' আনা।

আমি আপত্তি করে বললুম, অ্যাঁ, তা কী করে হয় ?

টেনিদা সজোরে টেবিলে একটা কিল মেরে গর্জন করে উঠল, হুঁ, তাই হয় ! আর তা যদি না হয়, তাহলে তোকে সোজা দোতালার জানালা গলিয়ে নীচে ফেলে দেওয়া হয়, সেটাই কি তবে ভালো হয় ?

আমি কান চুলকে জানালুম, না সেটা ভালো হয় না।

—তবে চল— গোটা কয়েক মোগলাই পরোটা আর কয়েক ডিশ ফাউল কারি খেয়ে ভজহরি ফিলম কর্পোরেশনের মহরত করে আসি—

টেনিদা ঘর-ফাটানো একটা পৈশাচিক অট্টহাসি করে উঠল। হাসির শব্দে ভেতর থেকে ছুটে এল বিষ্টু। খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থেকে বললে, ছুটো বাবুর মাথা হাঁড়াপ (খারাপ) অইচে !—

কিন্তু—দিন কয়েক বেশ কেটে গেল। দ্বারিকের রাজভোগ আর চাচার কাটলেট খেয়ে শরীরটাকে দস্তুরমতো ভালো করে ফেলেছি দু'জনে। কে. সি. দাসের রসমালাই খেতে খেতে দু'জনে ভাবছি— আবার নতুন কোনও একটা প্ল্যান করা যায় কি না, এমন সময়—

দোরগোড়ায় যেন বাজ ডেকে উঠল। সেই যমদূতের মতো একজোড়া কাবুলিওয়ালা। অতিকায় জাব্বা-জোব্বা আর কালো চাপদাড়ির ভেতর দিয়ে যেন জিঘাংসা ফুটে বেরোচ্ছে।

আমরা ফিরে তাকাতেই লাঠি ঠুকল : এঃ বাব্বু— রূপেয়া কাঁহা—হামলোগ গা চাপ্প কিধর ?

—অ্যাঁঃ! —টেনিদার হাত থেকে রসমালাইটা বুক-পকেটের ভেতর পড়ে গেল : প্যালা রে, সেরেছে!

—সারবেই তো! —আমি বললুম, তবে আমার সুবিধে আছে। চৌদ্দ আনা দু' আনা। চৌদ্দ আনা ঠ্যাঙানি তোমার, মানে স্রেফ ছাতু করে দেবে। দু' আনা খেয়ে আমি বাঁচলেও বেঁচে যেতে পারি।

কাবুলিওয়ালা আবার হাঁকল :—এঃ ভজহরি বাব্বু— বাহার তো আও—

বাহার আও—মানেই নিমতলা যাও! টেনিদা এক লাফে উঠে দাঁড়াল, তারপর সোজা আমাকে বগলদাবা করে পাশের দরজা দিয়ে অন্যদিকে।

—ওগো ভালো মানুষের বাছারা, আমার ট্যাকা কই, চাপ্প কই? ঝি হাতে আঁশবটি নিয়ে দাঁড়িয়ে।

—আমারো চাপ্পো মিলিবো কি না?—উড়ে ঠাকুর ভাত রাঁধবার খুন্তিটাকে হিংস্রভাবে আন্দোলিত করল।

—জোচ্চুরি পেয়েছেন স্যার—আমরা শ্যামবাজারের ছেলে— আস্তিন গুটিয়ে একদল ছেলে তাড়া করে এল।

এক মুহূর্তে আমাদের চোখের সামনে পৃথিবীটা যেন ঘুরতে লাগল। তারপরেই —'করেঙ্গে ইয়া মারেঙ্গে!' আমাকে কাঁধে তুলে টেনিদা একটা লাফ মারল। তারপর আমার আর ভালো করে জ্ঞান রইল না। শুধু টের পেলুম, চারিদিকে একটা পৈশাচিক কোলাহল ; চোট্টা—চোট্টা—ভাগ যাতা—আর বুঝতে পারলুম— যেন পাঞ্জাব মেলে চড়ে উড়ে চলেছি।

ধপাৎ করে মাটিতে পড়তেই আমি হাঁউমাউ করে উঠলুম। চোখ মেলে তাকিয়ে দেখি, হাওড়া স্টেশন। রেলের একটা ইঞ্জিনের মতোই হাঁপাচ্ছে টেনিদা।

বললে, হুঁ হুঁ বাবা, পাঁচশো মিটার দৌড়ে চ্যাম্পিয়ন— আমাকে ধরবে ওই ব্যাটারা! যা প্যালা— পকেটে এখনও বারো টাকা চার আনা রয়েছে, ঝট করে দু'খানা দেওঘরের টিকিট কিনে আন। দিল্লি এক্সপ্রেস এখুনি ছেড়ে দেবে।

চামচিকে আর টিকিট চেকার

—বুঝলি প্যালা, চামচিকে ভীষণ ডেঞ্জারাস!...

একটা ফুটো শাল পাতায় করে পটলডাঙার টেনিদা ঘুগনি খাচ্ছিল। শালপাতার তলা দিয়ে হাতে খানিক ঘুগনির রস পড়েছিল, চট করে সেটা চেটে নিয়ে পাতাটা তালগোল পাকিয়ে ছুঁড়ে দিলে ক্যাবলার নাকের ওপর। তারপর আবার বললে, হুঁ হুঁ, ভীষণ ডেঞ্জারাস চামচিকে।

—কী কইর‍্যা বোঝলা—কও দেখি?—

বিশুদ্ধ ঢাকাই ভাষায় জানতে চাইল হাবুল সেন।

—আচ্ছা, বল চামচিকের ইংরেজি কি?

আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম।

—বল না।

শেষকালে ভেবে-চিন্তে ক্যাবলা বললে, স্মল ব্যাট। মানে ছোট বাদুড়!

—তোর মুণ্ডু।

—আমি বললাম, তবে ব্যাটলেট। তা-ও নয়? তা হলে? ব্যাটস স্যান—মানে, বাদুড়ের ছেলে? হল না? আচ্ছা, ব্রিক ব্যাট কাকে বলে?

টেনিদা বললে থাম উল্লুক! ব্রিক ব্যাট হল থান ইট। এবার তাই একটা তোর মাথায় ভাঙব।

হাবুল সেন গম্ভীর মুখে বললে, হইছে।

—কী হল?

—স্কিন মোল।

—স্কিন মোল?...টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটাকে মনুমেন্টের মতোউঁচু করে ধরল, সে আবার কী?

—স্কিন মানে হইল চাম— অর্থাৎ কিনা চামড়া। আর আমাগো দ্যাশে ছুঁচারে কয় চিকা— মোল। দুইটা মিলাইয়া স্কিন মোল।

টেনিদা খেপে গেল : দ্যাখ হাবুল, ইয়ার্কির একটা মাত্রা আছে, বুঝলি? স্কিন মোল। ইঃ—গবেষণার দৌড়টা দেখ একবার।

আমি বললাম, চামচিকের ইংরেজী কী তা নিয়ে আমাদের জ্বালাচ্ছ কেন? ডিক্সনারি দ্যাখো গে।

—ডিক্সনারিতেও নেই। —টেনিদা জয়ের হাসি হাসল।

তা হলে?

—তা হলে এইটাই প্রমাণ হল চামচিকে কী ভীষণ জিনিস! অর্থাৎ এমন ভয়ানক যে চামচিকেকে সাহেবরাও ভয় পায়। মনে কর না— যারা আফ্রিকার জঙ্গলে গিয়ে সিংহ আর গরিলা মারে, যারা যুদ্ধে গিয়ে দমাদম বোমা আর কামান

ছোড়ে, তারা সুদ্ধ চামচিকের নাম করতে ভয় পায়। আমি নিজের চোখেই সেই ভীষণ ব্যাপারটা দেখেছি।

কী ভীষণ ব্যাপার ?—গল্পের গন্ধে আমরা তিনজনে টেনিদাকে চেপে ধরলাম : বলো এক্ষুনি।

—ক্যাবলা, তাহলে চটপট যা। গলির মোড় থেকে আরও দু'আনার পাঁঠার ঘুগনি নিয়ে আয়। রসদ না হলে গল্প জমবে না।

ব্যাজার মুখে ক্যাবলা ঘুগনি আনতে গেল। দু'আনার ঘুগনি একাই সবটা চেটেপুটে খেয়ে, মানে আমাদের এক ফোঁটাও ভাগ না দিয়ে, টেনিদা শুরু করলে : তবে শোন—

সেবার পাটনায় গেছি ছোটমামার ওখানে বেড়াতে। ছোটমামা রেলে চাকরি করে— আসার সময় আমাকে বিনা টিকিটেই তুলে দিলে দিল্লি এক্সপ্রেসে। বললে, গাড়িতে চ্যাটার্জি যাচ্ছে ইনচার্জ— আমার বন্ধু। কোনও ভাবনা নেই—সেই-ই তোকে হাওড়া স্টেশনের গেট পর্যন্ত পার করে দেবে।

নিশ্চিন্ত মনে আমি একটা ফাঁকা সেকেন্ড ক্লাস কামরায় চড়ে লম্বা হয়ে পড়লাম।

শীতের রাত। তার ওপর পশ্চিমের ঠাণ্ডা— হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি ধরায়।

কিন্তু কে জানত— সেদিন হঠাৎ মাঝপথেই চ্যাটার্জির ডিউটি বদলে যাবে। আর তার জায়গায় আসবে—কী নাম ওর— মিস্টার রাইনোসেরাস।

ক্যাবলা বললে, রাইনোসেরাস মানে গণ্ডার।

—থাম, বেশি বিদ্যে ফলাসনি।...টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, যেন ডিক্সনারি একেবারে। সায়েবের বাপ-মা যদি ছেলের নাম গণ্ডার রাখে— তাতে তোর কী র‍্যা ? তোর নাম যে কিশলয় কুমার না হয়ে ক্যাবলা হয়েছে, তাতে করে কী ক্ষেতি হয়েছে শুনি ?

হাবুল সেন বললে, ছাড়ান দাও— ছাড়ান দাও। পোলাপান।

—হুঁ, পোলাপান ! আবার যদি বকবক করে তো জলপান করে ছাড়ব ! যাক— শোন। আমি তো বেশ করে গাড়ির দরজা-জানালা এঁটে শুয়ে পড়েছি। কিন্তু কিছুতেই ঘুম আসছে না। একে দু'খানা কম্বলে শীত কাটছে না, তার ওপরে আবার খাওয়াটাও হয়ে গেছে বড্ড বেশি। মামাবাড়ির কালিয়ার পাঁঠাটা যেন জ্যান্ত হয়ে উঠে গাড়ির তালে তালে পেটের ভেতর শিং দিয়ে টুঁ মারছে। লোভে পড়ে অতটা না খেয়ে ফেলেই চলত।

পেট গরম হয়ে গেলেই লোকে নানা রকম দুঃস্বপ্ন দেখে— জানিস তো ? আমিও স্বপ্ন দেখতে লাগলাম, আমার পেটের ভেতরে সেই যে বাতাপি না ইল্বল কে একটা ছিল— সেইটে পাঁঠা হয়ে ঢুকেছে। একটা রাক্ষস হিন্দি করে বলছে : এ ইল্বল্— আভি ইসকো পেট ফাটাকে নিকাল আও—

—বাপরে—বলে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম ! চোখ চেয়ে দেখি, গাড়ির ভেতরে বাতাপি বা ইল্বল কেউ নেই— শুধু ফর-ফর করে একটা চামচিকে উড়ছে।

একেবারে বোঁ করে আমার মুখের সামনে দিয়ে উড়ে চলে গেল—নাকটাই খিমচে ধরে আর কি !

এ তো আচ্ছা উৎপাত।

কোন দিক দিয়ে এল কে জানে ? চারিদিকে তো দরজা-জানালা সবই বন্ধ। তবে চামচিকের পক্ষে সবই সম্ভব। মানে অসাধ্য কিছু নেই।

একবার ভাবলাম, উঠে ওটাকে তাড়াই। কিন্তু যা শীত—কম্বল ছেড়ে নড়ে কার সাধ্যি। তা ছাড়া উঠতে গেলে পেট ফুঁড়ে শিং-টিং সুদ্ধু পাঁঠাটাই বেরিয়ে আসবে হয়তো বা। তারপর আবার যখন সাঁ করে নাকের কাছে এল, তখন বসে পড়ে আর কি। আমার খাড়া নাকটা দেখে মনুমেন্টের ডগাই ভাবল বোধ হয়।

আমি বিচ্ছিরি মুখ করে বললাম, ফর-র-ফুস। —মানে চামচিকেটিকে ভয় দেখালাম। তাইতেই আঁতকে গেল কি না কে জানে— সাঁ করে গিয়ে ঝুলে রইল একটা কোট-হ্যাঙ্গারের সঙ্গে। ঠিক মনে হল, ছোট একটা কালো পুঁটলি ঝুলছে !

ঠিক অমনি সময় ঘটাঘট শব্দে কামরার দরজা নড়ে উঠল।

এত রাত্তিরে কে আবার জ্বালাতে এল ? নিশ্চয় কোনও প্যাসেঞ্জার। প্রথমটায় ভাবলাম, পড়ে থাকি ঘাপটি মেরে। যতক্ষণ খুশি খটখটিয়ে কেটে পড়ুক লোকটা। আমি কম্বলের ভেতরে মুখ ঢোকালাম।

কিন্তু কী একটা যাচ্ছেতাই স্টেশনে যে গাড়িটা থেমেছে কে জানে ! সেই যে দাঁড়িয়ে আছে—একদম নট নড়ন-চড়ন। যেন নেমন্তন্ন খেতে বসেছে। ওদিকে দরজায় খটখটানি সমানে চলতে লাগল। ভেঙে ফেলে আর কি।

এমন বেয়াক্কেলে লোক তো কখনও দেখিনি ! ট্রেনে কি আর কামরা নেই যে এখানে এসে মাথা খুঁড়ে মরছে ! ভারি রাগ হল। দরজা না খুলেও উপায় নেই— রিজার্ভ গাড়ি তো নয় আর। খুব কড়া গলায় হিন্দীতে একটা গালাগাল দেব মনে করে উঠে পড়লাম।

ক্যাবলা হঠাৎ বাধা দিয়ে বললে, তুমি মোটেই হিন্দী জানো না টেনিদা।

—মানে ?

—তুমি যা বলো তা একেবারেই হিন্দী হয় না। আমি ছেলেবেলা থেকে পশ্চিমে ছিলাম—

—চুপ কর বলছি ক্যাবলা !—টেনিদা হুঙ্কার ছাড়ল ; ফের যদি ভুল ধরতে এসেছিস তো এক চাঁটিতে তোকে চাপাটি বানিয়ে ফেলব। আমার হিন্দী শুনে বাড়ির ঠাকুর পর্যন্ত ছাপরায় পালিয়ে গেল, তা জানিস ?

হাবুল বললে, ছাইড়্যা দাও— চ্যাংড়ার কথা কি ধরতে আছে ?

—চ্যাংড়া ! চিংড়িমাছের মতো ভেজে খেয়ে ফেলব। আমি বললাম, ওটা অখাদ্য জীব— খেলে পেট কামড়াবে, হজম করতে পারবে না। তার চেয়ে গল্পটা বলে যাও।

—হুঁ, শোন ! —টেনিদা ক্যাবলার ছ্যাবলামি দমন করে আবার বলে চলল :

উঠে দরজা খুলে যেই বলতে গেছি— এই আপ কেইসা আদমি হ্যায়— সঙ্গে

সঙ্গে গাঁক গাঁক করে আওয়াজ।

—গাঁক—গাঁক ?

—মানে সায়েব। মানে টিকিট চেকার।

—সেই রাইনোসেরাস ? বকুনি খেয়েও ক্যাবলা সামলাতে পারল না।

—আবার কে ? একদম খাঁটি সায়েব—পা থেকে মাথা ইস্তক।

সেই যে একরকম সায়েব আছে না ? গায়ের রং মোষের মতো কালো, ঘামলে গা দিয়ে কালি বেরোয়— তাদের দেখলে সায়েবের ওপরে ঘেন্না ধরে যায়— মোটেই সে-রকমটি নয়। চুনকাম করা ফর্সা রঙ— হাঁড়ির মতো মুখ, মোটা নাকের ছ্যাঁদায় বড় বড় লালচে লোম— হাসলে মুখ ভর্তি মুলো দেখা যায়, আর গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় ষাঁড় ডাকছে— একেবারে সেই জিনিসটি ! ঢুকেই চোস্ত ইংরেজীতে আমাকে বললে, এই সন্ধেবেলাতেই এমন করে ঘুমোচ্ছ কেন ? এইটেই সবচেয়ে বিচ্ছিরি হ্যাবিট।

—কী রকম চোস্ত ইংরেজী টেনিদা ? আমি জানতে চাইলাম।

—সে-সব শুনে কী করবি ?...টেনিদা উঁচু দরের হাসি হাসল ! শুনেও কিছু বুঝতে পারবি না—সায়েবের ইংরেজী কিনা ! সে যাক। সায়েবের কথা শুনে আমার তো চোখ কপালে উঠল রাত বারোটাকে বলছে সন্ধেবেলা। তা হলে ওদের রাত্তির হয় কখন ? সকালে নাকি ?

তারপরেই সায়েব বললে, তোমার টিকিট কই ?

আমার তো তৈরি জবাব ছিলই। বললাম, আমি পাটনার বাঁড়ুজ্যে মশাইয়ের ভাগনে। আমার কথা ক্রু-ইন-চার্জ চাটুজ্যেকে বলা আছে।

তাই শুনে সায়েবটা এমনি দাঁত খিঁচোল যে, মনে হল মুলোর দোকান খুলে বসেছে। নাকের লোমের ভেতরে যেন ঝড় উঠল, আর বেরিয়ে এল খানিকটা গর-গরে আওয়াজ।

যা বললে, শুনে তো আমার চোখ চড়ক গাছ।

—তোমার বাঁড়ুজ্যে মামাকে আমি থোরাই পরোয়া করি। এ-সব ডাবলুটিরা ও-রকম ঢের মামা পাতায়। তা ছাড়া চাটুজ্যের ডিউটি বদল হয়ে গেছে— আমিই এই ট্রেনের ক্রু-ইন-চার্জ। অতএব চালাকি রেখে পাটনা-টু-হাওড়া সেকেন্ড ক্লাস ফেয়ার আর বাড়তি জরিমানা বের করো।

পকেটে সব সুদ্ধ পাঁচটা টাকা আছে— সেকেন্ড ক্লাস দূরে থাক, থার্ড ক্লাসের ভাড়াও হয় না ; সর্ষের ফুল এর আগে দেখিনি— এবার দেখতে পেলাম ! আর আমার গা দিয়ে সেই শীতেও দরদর করে সর্ষের তেল পড়তে লাগল।

আমি বলতে গেলাম, দ্যাখো সায়েব—

—সায়েব সায়েব বোলো না—আমার নাম মিস্টার রাইনোসেরাস। আমার গণ্ডারের মতো গোঁ। ভাড়া যদি না দাও— হাওড়ায় নেমে তোমায় পুলিশে দেব। ততক্ষণে আমি গাড়িতে চাবি বন্ধ করে রেখে যাচ্ছি।

—কী বলব জানিস প্যালা— আমি পটলডাঙার টেনিরাম— অমন ঢের সায়েব দেখেছি। ইচ্ছে করলেই সায়েবকে ধরে চলতি গাড়ির জানলা দিয়ে ফেলে দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা বোষ্টুম— জীবহিংসা করতে নেই, তাই অনেক কষ্টে রাগটা সামলে নিলাম।

হাবুল সেন বলে বসল : জীবহিংসা কর না, তবে পাঁঠা খাও ক্যান ?

—আরে পাঁঠার কথা আলাদা। ওরা হল অবোলা জীব, বামুনের পেটে গেলে স্বর্গে যায়। পাঁঠা খাওয়া মানেই জীবে দয়া করা ! সে যাক। কিন্তু সায়েবকে নিয়ে এখন আমি করি কী ? এ তো আচ্ছা প্যাঁচ কষে বসেছে ! শেষকালে সত্যিই জেলে যেতে না হয় !

কিন্তু ভগবান ভরসা !

পকেট থেকে একটা ছোট খাতা বের করে সায়েব কী লিখতে যাচ্ছিল পেনসিল দিয়ে হঠাৎ সেই শব্দ—ফর-ফর-ফরাৎ।

চামচিকেটা আবার উড়তে শুরু করেছে। আমার মতোই তো বিনাটিকিটের যাত্রী— চেকার দেখে ভয় পেয়েছে নিশ্চয়।

আর সঙ্গে সঙ্গেই সায়েব ভয়ানক চমকে উঠল। বললে, ওটা কী পাখি ?

জবাব দিতে যাচ্ছিলাম, চামচিকে— কিন্তু তার আগেই সায়েব হাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠল। নাকের দিকে চামচিকের এত নজর কেন কে জানে— ঠিক সায়েবের নাকেই একটা ঝাপটা মেরে চলে গেল।

ওটা কী পাখি ? কী বদখত দেখতে ;— সায়েব কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। চুনকাম-করা মুখটা তার ভয়ে পানসে হয়ে গেছে।

আমি বুঝলাম এই মওকা ! বললাম, তুমি কি ও-পাখি কখনও দ্যাখোনি ?

—নো—নেভার ! আমি মাত্র ছ'মাস আগে আফ্রিকা থেকে ইণ্ডিয়ায় এসেছি। সিংহ দেখেছি— গণ্ডার দেখেছি— কিন্তু—

সায়েব শেষ করতে পারল না।

চামচিকেটা আর একবার পাক খেয়ে গেল। একটু হলেই প্রায় খিমচে ধরেছিল সায়েবের মুখ। বোধহয় ভেবেছিল, ওটা চালকুমড়ো।

সায়েব বললে, মিস্টার— ও কি কামড়ায় ?

আমি বললাম, মোক্ষম। ভীষণ বিষাক্ত ! এক কামড়েই লোক মারা যায়। এক মিনিটের মধ্যেই।

—হোয়াট ! —বলে সায়েব লাফিয়ে উঠল। তারপরে আমার কম্বল ধরে টানাটানি করতে লাগল ;

—মিস্টার—প্লিজ—ফর গডস্ সেক— আমাকে একটা কম্বল দাও।

—তারপর আমি ওর কামড়ে মারা যাই আর কি। ও সব চলবে না। —আমি শক্ত করে কম্বল চেপে রইলাম।

—অ্যাঁ ? তা হলে !— বলেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড করে বসল সায়েব। বোঁ করে একেবারে চেন ধরে ঝুলে পড়ল প্রাণপণে। তারপর জানলা খুলে দিয়ে গলা ফাটিয়ে চ্যাঁচাতে লাগল : হেলপ—হেলপ—আর খোলা জানলা পেয়েই সাহেবের

কাঁধের ওপর দিয়ে বাইরের অন্ধকারে চামচিকে ভ্যানিস।

সায়েব খানিকক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল। একটু দম নিয়ে মস্ত একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, যাক— স্যামসিকেটা বাইরে চলে গেছে। এখন আর ভয় নেই— কী বলো?

আমি বললাম, না, তা নেই। তবে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দেবার জন্য তৈরি থাকো।

সাহেবের মুখ হাঁ হয়ে গেল : কেন?

—বিনা কারণে চেন টেনেছ— গাড়ি থামল বলে। আর শোনো সায়েব— চামচিকে খুব লক্ষ্মী পাখি। কাউকে কামড়ায় না—কাউকে কিছু বলে না। তুমি রেলের কর্মচারী হয়ে চামচিকে দেখে চেন টেনেছ— এ জন্যে তোমার শুধু ফাইন নয়— চাকুরিও যেতে পারে।

ওদিকে গাড়ি আস্তে আস্তে থেমে আসছে তখন। মিস্টার রাইনোসেরাস কেমন মিটমিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে। ভয়ে এখন প্রায় মিস্টার হেয়ার—মানে খরগোশ হয়ে গেছে।

তারপরই আমার ডান হাত চেপে ধরল দু'হাতে।

—শোনো মিস্টার, আজ থেকে তুমি আমার বুজুম ফ্রেণ্ড! মানে প্রাণের বন্ধু। তোমাকে আমি ফার্স্ট ক্লাস সেলুনে নিয়ে যাচ্ছি— দেখবে তোফা ঘুম দেবে। হাওড়ায় নিয়ে গিয়ে কেলনারের ওখানে তোমাকে পেট ভরে খাইয়ে দেব। শুধু গার্ড এলে বলতে হবে, গাড়িতে একটা গুণ্ডা পিস্তল নিয়ে ঢুকেছিল, তাই আমরা চেন টেনেছি। বলো— রাজি?

রাজি না হয়ে আর কী করি! এত করে অনুরোধ করছে যখন।

বিজয়গর্বে হাসলে টেনিদা : যা ক্যাবলা— আর চার পয়সার পাঁঠার ঘুগনি নিয়ে আয়।

ব্রহ্মবিকাশের দন্তবিকাশ

হাবলু আর ক্যাবলা কলকাতায় নেই। গরমের ছুটিতে একজন গেছে বহরমপুরে পিসিমার বাড়িতে আম খেতে, আর একজন মা-বাবার সঙ্গে উধাও হয়েছে শিলঙে। এখন পটলডাঙা আলো করে আছি আমরা দুই মূর্তি—আমি আর টেনিদা। টেনিদাকেও দিন তিনেক দেখা যাচ্ছে না—কোন তালে যে ঘুরছে কে জানে।

ভাবছি বলটুদার কাছেই যাই, বেশ সময় কাটবে। বলটুদা আবার টেনিদার নাম শুনতে পারে না— বলে, টেনিদা আবার মানুষ নাকি? এক নম্বরের চালিয়াত,

কেবল উট্টুম-ধুট্টুম গল্প বানাতে পারে— আর সক্কলের সঙ্গে মারামারি করতে পারে— ছোঃ ছোঃ! আর টেনিদা বলে, বটে? ওটা একটা গোভূত। ফুটবল-মাঠে একবার পেলে এমন একখানা ল্যাং মেরে দেব না যে, একমাস চিৎপটাং হয়ে থাকবে।

বলটুদার কাছেই বেরুচ্ছি, হঠাৎ টেনিদার সঙ্গে দেখা।

'কী রে, মুখখানা যে ভারি খুশি-খুশি দেখছি— একেবারে ছানার পোলাওয়ের মতো! বলি, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?'

প্রায় বলেই ফেলেছিলুম— বলটুদার বাড়ি; কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে সামলে নিলুম। তা হলেই আর দেখতে হত না— ফটাং করে একটা রামগাঁট্টা পড়ত মাথার ওপর। বললুম, 'এই ইয়ে—মানে—একটু হাওয়া খেতে যাচ্ছিলুম।'

'দুদ্দুর—হাওয়া আবার খায় কে? হাওয়া খাওয়ার কোনও মানে হয় নাকি? হাওয়া খেয়ে পেট ভরে? চপ, কাটলেট, পুডিং—এইসব খাবি?'

শুনে, আমার রোমাঞ্চ হল।

বললুম, 'কেন খাব না আলবাত খাব। পেলেই খেতে থাকব! কে খাওয়াবে—তুমি?'

টেনিদা আমার পিঠে ধাঁই করে চড় মারল একটা।

'বদনাম দিসনি প্যালা—বলে দিচ্ছি সেকথা!'

'বদনাম মানে?'

'আমি— এই টেনিরাম শর্মা—কাউকে, কক্ষনো খাওয়াই না—নিজেই খেয়ে থাকি বরাবর। এ হচ্ছে আমার নীতি—মানে প্রিনসিপল। তোকে খাওয়াতে গিয়ে প্রিনসিপল নষ্ট করব? তুই তো দেখছি একটা নিরেট কুরুবক।'

আমার বুকভরা আশা ধুক করে নিবে গেল। শুকনো মুখে বললুম, 'তবে কে খাওয়াবে? কার গরজ পড়ছে আমাকে চপ-কাটলেট-পুডিং খাওয়াবে?'

'আছে—আছে—লোক আছে। সব খাবার সাজিয়ে বসে আছে। কেবল খেতে পারলে হয়।'

'অ—দোকানে।'—আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, 'খাওয়া-দাওয়ার কথা নিয়ে ঠাট্টা কোরো না টেনিদা, এ-সব খুব সিরিয়াস ব্যাপার। মনে ভীষণ ব্যথা লাগে।'

'তোর মগজে কিচ্ছু নেই, স্রেফ ঝিঙে-চচ্চড়িতে ভরতি। দোকান-টোকান নয়— একদম ফ্রি। তুই গেলেই টেবিল সাজিয়ে খেতে দেবে। কিন্তু খেতে পারবি না।'

শুনে কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল— 'টেবিল সাজিয়ে খেতে দেবে, অথচ খেতে পারব না? পচা-টচা বুঝি? নাকি কেষ্টনগরের মাটির তৈরি?'

'উঁহু' আসল—ওরিজিন্যাল। একদম ফ্রেশ। খেতে দেবে, অথচ খেতে পারবি না। উলটে, চোখ কপালে তুলে মরতে মরতে ফিরে আসবি।'

এ যে দেখছি রহস্যের খাসমহল তৈরি করছে। চপ-কাটলেট-পুডিং নিয়ে এ-সব ধাষ্টামো আমার ভালো লাগে না। আমি রেগে বললুম, 'সব বানিয়ে বানিয়ে

যা তা বলছ। আমি চললুম।'

'আহা-হা—চটে যাচ্ছিস কেন?'—টেনিদা বললে, 'আমি তো তোকে নেমন্তন্ন করতেই আসছিলুম। সেইসঙ্গে বলতে আসছিলুম, খেতে দেবে অথচ খেতে পারবি নে, মাঝখান থেকে প্রাণ নিয়ে টানাটানি।'

'খেতে দিয়ে বুঝি লাঠিপেটা করে?'

'দ্যুৎ। খুব মিষ্টি-মিষ্টি হেসে হাসির গল্প করে। আর সেই গল্পই মারাত্মক।'

'কিচ্ছু বুঝতে পারছি না।'

মিটমিট করে হেসে টেনিদা বললে, 'তা হলে সবটা খুলে বলি তোকে। আয়—বসা যাক একটু।'

দুজনে মিলে বসে পড়লুম চাটুজ্যেদের রোয়াকে। টেনিদা বললে, 'ব্রহ্মবিকাশবাবুকে জানিস?'

বললুম, 'না। অমন বিটকেল নামের কাউকে আমি চিনি না। চিনতে চাই না।'

'তিনিই খাওয়াতে চান।'

'খাওয়াতে চান তো খেতে দেন না কেন? তার মানে কী?'

'মানে—ওইটেই ওঁর রসিকতা।'

'অ্যা।'

'বলছি, বলছি, বেশ মন দিয়ে শুনে যা। বুঝলি, ব্রহ্মবিকাশবাবুকে আমিও চিনতুম না। একদিন শ্রদ্ধানন্দ পার্কের সামনে নিজেই যেচে আলাপ করলেন আমার সঙ্গে। বললেন, তুমিই বুঝি পটলডাঙার টেনিরাম? বেশ—বেশ। বড় আনন্দ হল। অনেক নাম শুনেছি তোমার— তোমার বন্ধু প্যালারামের লেখা দু'-একটা গল্পও পড়ে ফেলেছি। তা এসো না আজ বিকেলে অখিল মিস্তিরি লেনে আমার বাড়িতে। একসঙ্গে চা-টা খাওয়া যাবে।

'বুঝলি, সে হল গত বছর পুজোর সময়, তোরা কেউ কলকাতায় নেই তখন। থাকলে তো দলবলসুদ্ধই নিয়ে যেতুম। কিন্তু গিয়ে বুঝলুম— তোদের নিয়ে গেলে একটা কেলেঙ্কারি হয়ে যেত।

'অখিল মিস্তিরি লেনে বেশ বড় বাড়ি— পাট না ঝোলা গুড় কিসের যেন ব্যবসা করে অনেক টাকা জমিয়েছেন ব্রহ্মবিকাশবাবু। বিয়ে-থা করেননি : একা থাকেন, খুব ছিমছাম দারুণ পরিপাটি। বাড়িতে থাকবার মধ্যে একজন আধবুড়ো চাকর।

'দরজার বেল টিপতেই সে এসে খুব খাতির করে নিয়ে গেল। একেবারে ডাইনিং হলে। সে একেবারে এলাহি কাণ্ড— বুঝলি। পট ভরতি চপ-কাটলেট-সিঙাড়া, প্লেটে বোমার তালের মতো ইয়া এক পুডিং। কী সব দামী দামী কাপ-প্লেট, সে আর কী বলব তোকে। একটা চেয়ারে জাঁকিয়েই বসেছিলেন ব্রহ্মবিকাশবাবু, আমাকে দেখেই চিনিমাখা হাসি হেসে বললেন, এসো হে, তোমার জন্যেই বসে আছি।

'খাবারের আয়োজন দেখেই তো আমার এক বচ্ছরের খিদে একসঙ্গে পেয়ে গেল। বললুম, 'হেঁ-হেঁ, কী সৌভাগ্য। বলেই, প্লেটে গোটা দুই কাটলেট একসঙ্গে তুলে নিলুম।

'ব্রহ্মবিকাশ আড়চোখে একবার চেয়ে দেখলেন। তারপর মুচকি হেসে বললেন, এসো হে টেনিরাম, একটু মজা করে খাওয়া যাক। শুনেছি তুমি খুব খেতে পারো; আমিও খাইয়ে লোক। কম্পিটিশন হোক, দেখা যাক কে কত তাড়াতাড়ি খেতে পারে।

'জানিস তো, এ-রকম কম্পিটিশনে আমি সর্বদাই রেডি। নিজের খাবার চক্ষের নিমেষে ফিনিশ করে কিভাবে তোদের প্লেটগুলি টেনে নিই—সে তো হাড়ে হাড়ে টের পাস তোরা।...বললুম, হেঁ-হেঁ, সে তো খুব আনন্দের কথা। মনে-মনে ভাবলুম, দাঁড়ান মশাই, আজ ব্রহ্ম খাওয়া দেখিয়ে দেব আপনাকে।

'কিন্তু—'

টেনিদা থামল। আমি আকুল হয়ে বললুম, 'কিন্তু কী?'

'দাঁড়া না ঘোড়াড্ডিম।'—

মুখটাকে আলুভাজার মতো করে টেনিদা বললে, 'মনের দুঃখুটা একটু সামলে নিতে দে। বুঝলি, কিচ্ছু খেতে পারলুম না—একখানা মোক্ষম বিষম খাওয়া ছাড়া। আর আমি যখন কপালে চোখ তুলে ত্রিভুবন দেখছি, তখন সব খাবারগুলো ব্রহ্মবিকাশবাবু পরিপাটি করে খেয়ে ফেলেন।'

'কী রকম?'

'আরে সেইটেই তো প্যাঁচ। এক-কামড়ে যেই আধখানা কাটলেট মুখে পুরেছি, ব্রহ্মবিকাশ বললেন, ওহে টেনিরাম, একটা মজার ব্যাপার শোনো। এক ভদ্দরলোক না— পকেটে একটা মস্ত ছুঁচো নিয়ে বাসে উঠেছেন। যেউ পকেটমার সে-পকেটে হাত ঢুকিয়েছে, অমনি ছুঁচোটা ইঁ-ক্রিঁচ বলে দিয়েছে তার আঙুলে কামড়ে—

'বুঝলি, সেরেফ একটা বাজে মিথ্যে কথা। কেউ কি ছুঁচো পকেটে নিয়ে বাসে ওঠে? ছুঁচো কি মানিব্যাগ না রুমাল? কিংবা চাবির রিং? কিন্তু এমন বিটকেল ভঙ্গিতে কথাটা বললেন যে শুনে আমার বেদম হাসি পেয়ে গেল। সেই হাসির চোখে আধখানা কাটলেট গলায় গিয়ে আটকাল— দম আটকে যাই আর কি। চাকরটা বোধহয় জল হাতে রেডিই ছিল; মাথায় থাবড়ে-থাবড়ে জল দিতে যখন আমি খানিকটা সুস্থ হলুম—তখন বুঝলি, প্রায় সব ফিনিশ—কেবল আমার পাতের সেই আধখানা কাটলেট পড়ে আছে। গোটাটা উনিই তুলে মেরে দিয়েছেন।

'চুকচুক করে বললেন, আহা-হা টেনিরাম, বিষম খেয়ে কম্পিটিশনে হেরে গেলে? খাবার তো আর নেই— একটু চা খাবে নাকি?

'হুঁ—চা খেতে গিয়ে আবার একখানা বিষম খাই আর কি! আমি ঘোঁত ঘোঁত করে বেরিয়ে এলুম।'

টেনিদার কথা শুনে আমি বললুম, 'ওটা অ্যাকসিডেন্ট। হঠাৎ বিষম খেয়েই

তুমি খেতে পেলে না।'

'মোটেই না। ওই হচ্ছে ওঁর কায়দা। রাস্তায় বেরিয়ে চার-পাঁচটা ছেলের সঙ্গে দেখা। দু'জন আমাকে চেনে। একজন ওই বিশু—সুরেন্দ্রনাথ কলেজে ব্যাক খেলে। বিশু বললে, ব্যাপার কী টেনিদা? ব্রহ্মবিকাশ চোংদারের বাড়ি বুঝি খেতে গিয়েছিলে? প্রাণ নিয়ে ফিরেছ তো?

'আমি তো থ।

'তাদের কাছেই শুনলাম। এ হল ব্রহ্মবিকাশবাবুর খুব মজার খেলা। লোককে খেতে বলেন, তারা খাওয়া শুরু করলেই বিচ্ছিরি ভঙ্গিতে একটা উদ্ভট কথা বলে দেন। সে তক্ষুনি বিষম খায়: প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়ে আর সেই ফাঁকে ব্রহ্মবিকাশ সব সাফ করে দেন। এই সেই কথামালার শেয়াল আর সারসের গপ্পোর মতো—বুঝেছিস?'

আমি শুনে বললুম, 'কেউ যদি না হাসে, রামগরুড় হয়?'

'রামগরুড়কেও হাসিয়ে দেবেন: এমনি ওঁর বলার কায়দা। তুই আমি কী রে— একবার এক জাঁদরেল কাবুলিওয়ালাকে পর্যন্ত—'

'কাবুলিওয়ালা! তাকে পেলেন কোথায়?'

'কী করবেন! কেউ তো আর আসে না— সবাই চিনে ফেলেছে কিনা! শেষে রাস্তা থেকে এক কাবুলিওয়ালাকে অনেক ভুজুং ভাজুং দিয়ে ডেকে আনলেন। তারপর খেতে দিয়েই শুরু করলেন— সমঝা হ্যায় আগা সাহেব, এক আদমিকো বহুৎ লম্বে দাড়ি থা। ওহি দাড়িমে এক জিন তো ঘুস গিয়া। যব উয়ো আদমি কুচ খানেকো লিয়ে মুখে হাত লে যাতা, তব ওহি জিন সেই সব লাড্ডু-মণ্ডা ঝাঁ করে কেড়ে লেতা, আর দাড়িমে ছিপায়কে আপনি খা লেতা।—

মানে, বুঝলি না, একটা লোকের লম্বা দাড়ির ভেতরে জিন—মানে একটা দৈত্য ঢুকে গিয়েছিল। লোকটা লাড্ডু-মণ্ডা কিছু খাবার জন্যে মুখ তুললেই ঝাঁ করে কেড়ে নিয়ে দাড়িতে লুকোনো দৈত্যটা সেগুলো খেয়ে ফেলত।...যেই বলা—কাবুলিওয়ালা অ্যায়সা বিষম খেল যে তিন দিন হাসপাতালে। তারপর সেই-যে দেশে চলে গেল, আর তার পাত্তা নেই।'

আমি বললুম, 'কী ডেনজারাস!'

'শুধু ডেনজারাস? যাকে বলে পুঁদিচ্চেরি। কিন্তু এখন হয়েছে কী, আজ সকালে ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। বললেন, টেনিরাম, অনেকদিন তো তোমার সঙ্গে চা খাওয়া হয়নি, এসো না আজ বিকেলে। বেশ মজার গপ্পো-টপ্পো করা যাবে। আমি বললুম, আমার বন্ধু প্যালাকেও সঙ্গে আনব নাকি? উনি বললেন, সে তো খুব ভালো কথা— নিশ্চয় নিয়ে আসবে। —কী রে যাবি?'

আঁতকে বললুম, 'উঁহু, নেভার। আমি চপ-কাটলেট খেতে চাই, বিষম খেতে চাই না।'

খুব গম্ভীর হয়ে টেনিদা একটু ভাবল। তারপর বললে, 'লুক হিয়ার, প্যালা।'

'ইয়েস স্যার।'

'ইয়ার্কি দিসনি—ব্যাপারটা খুব পুঁদিচ্চেরি—একেবারে মেফিস্টোফিলিস যাকে বলে। আমি একটা প্ল্যান ঠাউরেছি।'

'কোনও প্ল্যানের ভেতরে আমি নেই। আমার আবার একটুতেই দারুণ হাসি পায়। মারা যাব নাকি শেষ পর্যন্ত?'

'দাঁড়া না কাঁচকলা। শোন। যেই উনি বেয়াড়া একটা হাসির গল্প আরম্ভ করবেন না—তুই কটাস করে আমাকে একটা চিমটি লাগাবি; আমিও একটা লাগিয়ে দেব তোকে। ব্যস— আর হাসাতেই পারবেন না। তারপর—ডি-লা—গ্র্যান্ডি—হুঁ, মাথায় একটা মতলব এসেছে। দিচ্ছি আজকে ব্রহ্মবিকাশ চোংদারকে ম্যানেজ করে। এখন উঠে পড়—ছ'টা বাজে, কুইক!'

'আমি যাব না।'

'তোকে যেতেই হবে। নইলে এক থাপ্পড়ে তোর কান—'

'কানপুরে পাঠিয়ে দেব!'

'ইয়া! একদম কারেক্ট! ওঠ—কুইক—কুইক—'

কী করা যায়, যেতেই হল ব্রহ্মবিকাশের বাড়িতে। টেনিদা যা বলেছিল ঠিক তাই। সেই বাড়ি, সেই আধবুড়ো চাকর, সেই ডাইনিং হল। চেয়ারে ব্রহ্মবিকাশ চোংদার। আর টেবিলে—

সে আর কী বলব। দেখলেই মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু হাসি-হাসি মুখে ব্রহ্মবিকাশ তাকিয়ে আছেন— তিনি সবাইকে খেতে ডাকবেন, অথচ কাউকে খেতে দেবেন না। এ-রকম যাচ্ছেতাই লোক যে সংসারে থাকতে পারে আমি জানতুম না।

ব্রহ্মবিকাশ মুচকে মুচকে হাসছিলেন আর রাগে আমার গা জ্বলে যাচ্ছিল। বললেন, 'তুমিই বুঝি প্যালারাম? শিঙিমাছ দিয়ে পটোলের ঝোল খেতে বুঝি খুব ভালোবাসো?'

বললুম, 'সে আগে খেতুম—ছেলেবেলায়। এখন কালিয়া-কাবাব কোর্মা খেয়ে থাকি।'

'ভালো—ভালো। আরে মানুষ তো খাওয়ার জন্যেই বেঁচে থাকে। এসো, লেগে যাও। কম্পিটিশন হোক। দেখা যাক, কে আগে খেতে পারে।'

টেনিদা আমার গা টিপল।

তারপর যা হল, সংক্ষেপে বলি।

একটা গরম-গরম ফুলকপির সিঙাড়ায় সবে কামড় বসিয়েছি, হঠাৎ ব্রহ্মবিকাশ বললেন, 'একটা কাণ্ড হয়েছে শোনো। এক লোকের খুব নাক ডাকত। তার ঘরে চোর ঢুকেছে। আর তক্ষুনি একটা গুবরে পোকা বোঁ করে উড়ে বসেছে লোকটার নাকে। তার নাক ডাকার ধাক্কায় গুবরে পোকাটা বুলেটের মতো ঠিকরে গিয়ে ঠকাস করে চোরটার কপালে—'

বলার কায়দাই এমনি যে তক্ষুনি স্রেফ আমার অপঘাত ঘটে যেত। কিন্তু সঙ্গে

সঙ্গে আমার হাঁটুতে টেনিদার এক রামচিমটি আর আমিও টেনিদার পিঠে আর এক মোক্ষম চিমটি। দুজনেই এক সঙ্গে চ্যাঁ করে উঠলুম।

ব্রহ্মবিকাশ কেমন বোকা বনে গেলেন ; তক্ষুনি থেমে গেল গল্পটা।

'অ্যাঁ— কী হল তোমাদের ?'

আমার হাঁটু জ্বালা করছিল, টেনিদারও যে খুব আরাম লাগছিল তা নয়। উচ্ছে খাওয়া-মুখে টেনিদা বললে, 'আজ্ঞে—ইয়ে—হয়েছে কী, হাসির গল্প শুনলেই আমাদের কেমন কান্না পায়।'

'কান্না পায়'।

পায় বইকি। শিব্রামের গপ্পো পড়তে গেলেই তো প্যালার দাঁত-কপাটি লাগে। আমি তো সুকুমার রায়ের পাগলা দাশু পড়ে এত কেঁদেছিলুম যে বাড়িময় জল থইথই।'

'অ্যাঁ।'

ব্রহ্মবিকাশ সামলে নিতে চেষ্টা করলেন, সেই ফাঁকে আমাদের হাত চলতে লাগল। তারপরেই 'এহে—ভারি দুঃখের কথা' বলে, ভীষণ ব্যাজার হয়ে দুটো চিংড়ির কাটলেটে টান দিলেন, টেনিদা আবার একটা তাঁর হাত থেকে প্রায় কেড়ে আনল।

ব্রহ্মবিকাশ বোধহয় আর-একটা কিছু ঠাওরাতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ টেনিদা বললে, 'ব্রহ্মবিকাশবাবু—'

প্রাণপণে কাটলেট চিবুতে-চিবুতে ব্রহ্মবিকাশ বললেন, 'অ্যাঁ ?'

'আপনি তো হাসির গপ্পো জানেন, আমি খুব ভালো ম্যাজিক জানি।'

'অ্যাঁ।'

'এই যে দুটো জলের গেলাস দেখছেন, দূর থেকে এই গেলাসের জল আমি বদলে দেব। কখনও লাল হয়ে যাবে, কখনও নীল, কখনও হলদে, কখনও বেগুনী, কখনও সবুজ। শুধু মন্তর পড়ে।'

শুনে ব্রহ্মবিকাশের চিবুনি থেমে গেল।

'অ্যাঁ। তাও কি হয় নাকি ? পি-সি সরকার হলে নাকি হে ?'

'পি-সি সরকার ! তিনি তো আমার কাছে এটা শেখবার জন্যে ঝুলোঝুলি, আমিই শেখাইনি। দেখতে চান ম্যাজিকটা ? নিন—হাত পাতুন, না—না—উলটো করে দু'হাতের পাতা মেলে দিন টেবিলের ওপর। ইয়া—কারেক্ট।'

ব্রহ্মবিকাশ কিছু না বুঝেই হাতের পাতা উবুড় করে টেবিলে মেলে দিয়েছিলেন। তিনি জানলেন না যে কী হারাইতেছেন ? এবং পত্রপাঠ টেনিদা দুটো জলভরতি গ্লাস তাঁর দু'হাতের চেটোয় বসিয়ে দিলে।

'ধরে থাকুন— ধরে থাকুন। ধৈর্য ধরে বসে থাকুন ; আস্তে আস্তে জল নীল হবে— লাল হবে—হলদে হবে—বেগুনী হবে—প্যালা, কুইক কুইক।'

আর বলবার অপেক্ষা রাখে ? আমি তখন কুইক নই—কুইকেস্ট। আর টেনিদা চালাচ্ছিল একেবারে জেট-প্লেনের স্পিডে।

ব্রহ্মবিকাশ হাহাকার করে উঠলেন।

'আরে—আরে—'

'আরে—আরে নয়, চুপ করে বসে থাকুন। এ-সব ম্যাজিকে একটু সময় লাগেই স্যার। অনেক হাসির গপ্পো শুনিয়েছেন ; আজ একটু ম্যাজিক দেখুন। হাত নাড়তে চেষ্টা করলে আপনার দামী গেলাসেরই বারোটা বাজবে, আমার কী ! হবে—হবে— নীল হবে, লাল হবে— সবুজ হবে—সব হবে। একটু ধৈর্য ধরুন ; হাসি-হাসি মুখে বসে থাকুন, ভাবতে চেষ্টা করুন হোকাস-পোকাস-গিলি-গিলি ! প্যালা—কুইক— কুইক—'

গেলাসের মায়ায় ব্রহ্মবিকাশ হাঁ করে বেকুবের মতো বসে রইলেন, চাকরটাকে ডাকবার কথা পর্যন্ত তাঁর মনে এল না। আর সেই ফাঁকে আমরা—

না—না, আমরা একেবারে ছোটলোক নই। উনি চিংড়ির যে কাটলেটটা আধখানা খেয়েছিলেন, সেটা ওঁর জন্যেই রেখে এসেছিলুম।

টিকটিকির ল্যাজ

ক্যাবলাদের বসবার ঘরে বসে রেডিয়োতে খেলার খবর শুনছিলুম আমরা। মোহনবাগানের খেলা। আমি, টেনিদা, আর ক্যাবলা খুব মন দিয়ে শুনছিলুম, আর থেকে-থেকে চিৎকার করছিলুম—গো-গো—গোল। দলের হাবুল সেন হাজির ছিল না—সে আবার ইস্টবেঙ্গলের সাপোর্টার। মোহনবাগানের খেলায় হাবলার কোনও ইন্টারেস্ট নেই।

কিন্তু চেঁচিয়েও বেশি সুবিধে হল না— শেষ পর্যন্ত একটা পয়েন্ট। আমাদের মন-মেজাজ এমনি বিচ্ছিরি হয়ে গেল যে, ক্যাবলার মা'র নিজের হাতে তৈরি গরম গরম কাটলেটগুলো পর্যন্ত খেতে ইচ্ছে করছিল না। এই ফাঁকে টেনিদা আমার প্লেট থেকে একটা কাটলেট পাচার করল— মনের দুঃখে আমি দেখেও দেখতে পেলুম না।

কিছুক্ষণ উদাস হয়ে থেকে ক্যাবলা বললে, দ্যুৎ !

আমি বললুম, হুঁ !

টেনিদা হাড়-টাড় সুদ্ধ চিবিয়ে কাটলেটগুলো শেষ করল, তারপর কিছুক্ষণ খুব ভাবুকের মতো চেয়ে রইল সামনের দেয়ালের দিকে। একটা মোটা সাইজের টিকটিকি বেশ একমনে কুপ-কুপ করে পোকা খাচ্ছিল, তাকে লক্ষ্য করতে-করতে টেনিদা বললে, ওই যে !

আমি জিজ্ঞেস করলুম, ওই যে, কী ?

—মোহনবাগান।

—মোহনবাগান মানে ?

—টিকটিকি। মানে টিকটিকির ল্যাজ।

শুনে আমি আর ক্যাবলা একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম, খবরদার টেনিদা, মোহনবাগানের অপমান কোরো না।

টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে মুখটাকে পাঁপর ভাজার মতো করে বললে, আরে খেলে যা। বললুম কী, আর কী বুঝল এ-দুটো!

—এতে বোঝবার কী আছে শুনি। তুমি মোহনবাগানকে টিকটিকির ল্যাজ বলছ—

—চুপ কর প্যালা—মিথ্যে কুরবকের মতো বকবক করিসনি। যদি বাবা কচুবনেশ্বরের কথা জানতিস তা হলে বুঝতিস—টিকটিকির রহস্য কী!

—কচুবনেশ্বর! সে আবার কী? এবার ক্যাবলার জিজ্ঞাসা।

—সে এক অত্যন্ত ঘোরালো ব্যাপার। যাকে ফরাসী ভাষায় বলে পুঁদিচ্চেরি!

—পুঁদিচ্চেরি তো পণ্ডিচেরি। সে তো একটা জায়গার নাম। —ক্যাবলা প্রতিবাদ করল।

—শট আপ! জায়গার নাম! টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, ভারি ওস্তাদ হয়ে গেছিস যে। আমি বলেছি যে, পুঁদিচ্চেরি মানে ব্যাপার অত্যন্ত সাংঘাতিক— ব্যস! এ-নিয়ে তক্কো করবি তো এক চড়ে তোর কান—

আমি বললুম—কানপুরে উড়ে যাবে।

—রাটি!—টেনিদা গম্ভীর হয়ে বললে, এবার তা হলে বাবা কচুবনেশ্বরের কথাটা বলি। ঠাকুর-দেবতার ব্যাপার, খুব ভক্তি করে শুনবি। যদি তক্কো-টক্কো করিস তা হলে...

আমরা সমস্বরে বললুম— না—না।

টেনিদা শুরু করল:

সেবার গরমের ছুটিতে সেজ পিসিমার কাছে বেড়াতে গেছি ঘুঁটেপুকুরে। খাসা জায়গা। গাছে গাছে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা—

আমি বললুম— আহা, শুনেই যে লোভ হচ্ছে। ঘুঁটেপুকুরটা কোথায় টেনিদা?

ক্যাবলা ব্যাজার হয়ে বললে— আঃ, গল্প থামিয়ে দিস নে। ঘুঁটেপুকুর কোথায় হবে আবার? নিশ্চয় গোবরডাঙার কাছাকাছি।

টেনিদা বললে—না, গোবরডাঙার কাছে নয়। রানাঘাট ইস্‌টিশন থেকে বারো মাইল দূরে। দিব্যি জায়গা রে। চারদিকে বেশ শ্যামল প্রান্তর-টান্তর—পাখির কাকলি-টাকলি কিছুরই অভাব নেই। কিন্তু তারও চাইতে বেশি আছে আম, জাম, কাঁঠাল, কলা। খেয়ে খেয়ে আমার গা থেকে এমনি আম-কাঁঠালের গন্ধ বেরুত যে, রাস্তায় আমার পেছনে-পেছনে আট-দশটা গোরু বাতাস শুঁকতে-শুঁকতে হাঁটতে থাকত। একদিন তো—কিন্তু না, গোরুর গল্প আজ আর নয়—বাবা কচুবনেশ্বরের কথাই বলি।

হয়েছে কী জানিস, আমি যাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুঁটেপুকুর ফুটবল ক্লাব তো

আমায় লুফে নিয়েছে। আমি পটলডাঙার থাণ্ডার ক্লাবের ক্যাপটেন— একটা জাঁদরেল সেন্টার ফরোয়ার্ড—সেও ওদের জানতে বাকি নেই।

দু'দিন ওদের সঙ্গে খেলেই বুঝতে পারলুম— ওদের নাম হওয়া উচিত ছিল বাতাবি নেবু স্পোর্টিং ক্লাব। মানে বাতাবি নেবু পর্যন্তই ওদের দৌড়, ফুটবলে পা ছোঁয়াতে পর্যন্ত শেখেনি। কিছুদিন তালিম-টালিম দিয়ে এক রকম দাঁড় করানো গেল। তখন ঘুঁটেপুকুরে পাঁচুগোপাল কাপের খেলা চলছিল। বললে বিশ্বাস করবিনে, আমার তালিমের চোটে ঘুঁটেপুকুর ক্লাব তিন-তিনটে গেঁয়ো টিমকে হারিয়ে দিয়ে একেবারে ফাইন্যালে পৌঁছে গেল। অবিশ্যি সব ক'টা গোল আমিই দিয়েছিলুম।

ফাইন্যালে উঠেই ল্যাঠা বাধল।

ওদিক থেকে উঠে এসেছে চিংড়িহাটা হিরোজ—মানে এ-তল্লাটে সব চেয়ে জাঁদরেল দল। তাদের খেলা আমি দেখেছি। এদের মতো আনাড়ি নয়—এক-আধটু খেলতে-খেলতে জানে। সব চেয়ে মারাত্মক ওদের গোলকিপার বিলটে ঘোষ। বল তো দূরের কথা, গোলের ভেতরে মাছি পর্যন্ত ঢুকতে গেলে কপাৎ করে লুফে নেয়। আর তেমনি তাগড়াই জোয়ান— কাছে গিয়ে চার্জ-ফার্জ করতে গেলে দাঁত-মুখ আস্ত নিয়ে ফিরতে হবে না।

স্পষ্ট বুঝতে পারলুম, ঘুঁটেপুকুরের পক্ষে পাঁচুগোপাল কাপ নিতান্তই মরীচিকা!

ঘুঁটেপুকুর ক্লাব চুলোয় যাক— সে জন্যে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি টেনি শর্মা, খাস পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবের ক্যাপ্টেন— আসল কলকাতার ছেলে, আমার নাকের সামনে দিয়ে চিংড়িহাটা ড্যাং-ড্যাং করতে-করতে কাপ নিয়ে যাবে! এ-অপমান প্রাণ থাকতে সহ্য করা যায়? তার ওপর এক মাস ধরে ঘুঁটেপুকুরের আম-কাঁঠাল এন্তার খেয়ে চলেছি—একটা কৃতজ্ঞতাও তো আছে?

কিন্তু কী করা যায়!

দুপুরবেলা বসে-বসে এই সব ভাবছি, এমন সময় শুনতে পেলুম, সেজ পিসিমা কাকে যেন বলছেন— বসে-বসে ভেবে আর কী করবে— বাবা কচুবনেশ্বরের থানে গিয়ে ধন্না দাও।

কচুবনেশ্বর! ওই বিটকেল নামটা শুনেই কান খাড়া করলুম।

সেজ পিসিমা আবার বললেন— বাবার থানে ধন্না দাও—জাগ্রত দেবতা— তোমার ছেলে নির্ঘাত পরীক্ষায় পাশ করে যাবে।

গলা বাড়িয়ে দেখলুম, পিসিমা দত্ত-গিন্নির সঙ্গে কথা কইছেন। দত্ত-গিন্নি বললেন— তা হলে তাই করব, দিদি। হতচ্ছাড়া ছেলে দু'বার পরীক্ষায় ডিগবাজি খেলে, উনি বলছেন এবারে-ও ফেল করলে লাঙলে জুড়ে চাষ করাবেন।

দত্ত-গিন্নির ছেলে চাষ করুক— আমার আপত্তি নেই, কিন্তু বাবা কচুবনেশ্বরের কথাটা কানে লেগে রইল। আর দত্ত-গিন্নি বেরিয়ে যেতে না যেতেই আমি পিসিমাকে পাকড়াও করলুম।

—বাবা কচুবনেশ্বর কে পিসিমা?

শুনেই পিসিমা কপালে হাত ঠেকোলেন। বললেন— দারুণ জাগ্রত দেবতা রে ! গাঁয়ের পুব দিকে কচুবনের মধ্যে তাঁর থান। পয়লা শ্রাবণ ওখানে মোচ্ছব হয়— কচু সেদ্ধ, কচু ঘণ্ট, কচুর ডালনা, কচুর অম্বল, আর কচুর পোলাও দিয়ে তামর ভোগ হয়।

টেনিদার গল্প শুনতে-শুনতে আমার জানতে ইচ্ছে হল, কচুপোড়াটাই বা বাদ গেল কেন। কিন্তু ঠাকুর-দেবতাদের কচুপোড়া খেতে বললে নিশ্চয় তাঁরা চটে যাবেন— তাই ব্যাপারটা চেপে গেলুম। জিজ্ঞেস করলুম, কচুর পোলাও খেতে কেমন লাগে টেনিদা !

টেনিদা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বললে— আঃ, কচু খেলে যা ! আমি কি কচুর পোলাও খেয়েছি নাকি যে বলব ! ইচ্ছে হয় পয়লা শ্রাবণ ঘুঁটেপুকুরে গিয়ে খেয়ে আসিস।

ক্যাবলা অধৈর্য হয়ে বললে, টিক-টিক করিস নে প্যালা, গল্পটা বলতে দে। তুমি থামো না টেনিদা, চালিয়ে যাও।

টেনিদা বললে, সেজ পিসিমার ভক্তি দেখে আমারও দারুণ ভক্তি হল। আর ভেবে দ্যাখ— কচু সেদ্ধ, কচু ঘণ্ট, কচুর অম্বল, কচুর কালিয়া—মানে এত কচু ম্যানেজ করা চাট্টিখানি কথা ! আমার তো কচু দেখলেই গলা কুট-কুট করে। কচু ভোগের বহর দেখে মনে হল, দেবতাটি তো তবে সামান্যি নয়।

জিজ্ঞেস করলুম— বাবা কচুবনেশ্বরের কাছে ধরনা দিয়ে ফুটবল ম্যাচ জেতা যায়, পিসিমা ?

পিসিমা বললেন— ফুটবল ম্যাচ বলছিস কী ? বাবার অসাধ্য কাজ নেই। এই তো, ও-বাড়ির মেন্টির মাথায় এমন উকুন হল যে, তিনবার ন্যাড়া করে দিয়েও উকুন যায় না। কত মারা হল, কত কবিরাজী তেল—উকুন যে-কে সেই ! শেষে মেন্টির মা কচুবনেশ্বরের থানে ধন্না দিয়ে আধ ঘণ্টা চুপ করে পড়ে থেকেছে—

ব্যস,— হাতে টুপ করে কিসের একটা শেকড় পড়ল। সেই শেকড় বেটে লাগিয়ে দিতেই একদিনে উকুন ঝাড়ে-বংশে সাফ। আর মেন্টির যা চুল গজাল—সে যদি দেখতিস ! একেবারে হাঁটু পর্যন্ত।

আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। বললুম— বাবার থান কোন্ দিকে পিসিমা ?

ওই তো সোজা পুবদিক বরাবর— একেবারে নদীর ধারেই। কচুবনের ভেতরে বাবার থান, অনেক দূর থেকেই তো দেখা যায়। তুই সেখানে ধন্না দিতে যাবি নাকি রে ? তোর আবার কী হল ?

—কিছু হয়নি— বলে সোজা পিসিমার সামনে থেকে চলে এলুম। মনে-মনে ঠিক করলুম, কাউকে জানতে দেওয়া নয়— চুপিচুপি একাই গিয়ে ঘণ্টাখানেক ধরনা দেব। একটা শেকড়-টেকড় যদি পেয়ে যাই—বেটে খেয়ে নেব, তারপর কালকের খেলায় আমাকে আর পায় কে ? ওই ডাকসাইটে বিলটে ঘোষের হাতের তলা দিয়েই তিন তিনখানা গোল ঢুকিয়ে দেব।

একটু পরেই রামায়ণ খুলে সুর করে 'সূর্পনখার নাসাচ্ছেদন' পড়তে-পড়তে পিসিমা যেই ঘুমিয়ে পড়েছে, আমি সোজা একেবারে কচুবনেশ্বরের খোঁজে বেরিয়ে পড়লুম।

বেশি হাঁটতে হল না। আমবাগানের ভেতর দিয়ে সিকি মাইলটাক যেতেই দেখি সামনে একটা মজা নদী আর তার পাশেই কচুর জঙ্গল। সে কী জঙ্গল ! দুনিয়া সুদ্ধ সব লোককে কচু ঘণ্ট খাইয়ে দেওয়া যায়— কচুপোড়া খাওয়ানোও শক্ত নয়, এমন বন সেখানে। আর তারই মাঝখানে একটা ছোট মন্দিরের মতো—বুঝলুম ওইটেই হচ্ছে বাবার থান।

বন ঠেলে তো মন্দিরে পৌঁছানো গেল। কচুর রসে গা একটু চিড়বিড় করছিল— কিন্তু ওটুকু কষ্ট না করলে কি আর কেষ্ট মেলে। গিয়ে দেখি, মন্দিরে মূর্তি-টূর্তি নেই— একটা বেদী, তার ওপর গোটা কয়েক রং-চটা নয়া পয়সা, কিছু চাল, আর একরাশ কচুর ফুল শুকিয়ে রয়েছে। সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে মন্দিরের বারান্দায় ধরনা দিলুম।

চোখ বুজে লম্বা হয়ে শুয়ে আছি। হাত দুটো মেলেই রেখেছি— কোন্ হাতে টুপ করে বাবার দান পড়বে বলা যায় না তো। পড়ে আছি তো আছিই— একরাশ মশা এসে পিন-পিন করে কামড়াচ্ছে—কানের কাছে গোটা দুই গুবরেপোকা ঘুরঘুর করছে, কচু লেগে হাত-পা কুটকুট করছে। কিন্তু মশা তাড়াচ্ছি না, গা চুলকোচ্ছি না, খালি দাঁত-মুখ সিঁটিয়ে প্রাণপণে প্রার্থনা করছি—দোহাই বাবা কচুবনেশ্বর, একটা শেকড়-টেকড় চট্‌পট ফেলে দাও— চিংড়িহাটার বিলটে ঘোষকে ঠাণ্ডা করে দিই। বেশি দেরি কোরো না বাবা—গা-হাত ভীষণ চুলকোচ্ছে, আর দারুণ মশা ! আর তা ছাড়া থেকে-থেকে বনের ভেতর কী যেন খ্যাঁক-খ্যাঁক করে ডাকছে— যদি পাগলা শেয়াল হয় তা হলে এক কামড়েই মারা যাব। দোহাই বাবা, দেরি কোরো না— যা দেবার দিয়ে দাও, কুইক—কচুবনেশ্বর।

যেই বলেছি অমনি বাঁ হাতে কী যেন টপাস করে পড়ল।

'ইউরেকা' বলে যেই লাফিয়ে উঠেছি—দেখি, শেকড়ের মতোই কী একটা পড়েছে বটে। কিন্তু এ কী ! শেকড়টা তুরুক-তুরুক করে অল্প-অল্প লাফাচ্ছে যে !

মন্ত্রপূত জ্যান্ত শেকড় নাকি ?

আর তখুনি মাথার ওপর ট্যাক-ট্যাক-টিকিস করে আওয়াজ হল। দেখি, দুটো টিকটিকি দেওয়ালের গায়ে লড়াই করছে— তাদের একটার ল্যাজ নেই। মানে, মারা-মারিতে খসে পড়েছে।

রহস্যভেদ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গেই। তা হলে আমার হাতে শেকড় পড়েনি পড়েছে টিকটিকির কাটা ল্যাজ। টিপে দেখলুম রবারের মতো— আর অল্প-অল্প নড়ছে তখনও।

দুর্বুদ্ধি হলে যা হয়—ভীষণ রাগ হয়ে গেল আমার। মনে হল, বাবা কচুবনেশ্বর আমায় ঠাট্টা করলে। এতক্ষণ গায়ের কুটকুটুনি আর মশার কামড় সহ্য করে শেষে কিনা টিকটিকির ল্যাজ। গোঁ গোঁ করে উঠে পড়লুম। তক্ষুনি আবার সেই

শিয়ালটা খ্যাঁক-খ্যাঁক করে ডেকে উঠল—মনে হল এখানে থাকাটা আর ঠিক নয়। মন্দির থেকে নেমে কচুবন ভেঙে সোজা বাড়ি চলে এলুম— আধ সের সর্ষের তেল মেখে এক ঘণ্টা পরে পায়ের জ্বলুনি খানিকটা বন্ধ হল।

টেনিদা এই পর্যন্ত বলতে আমি আর ধৈর্য রাখতে পারলুম না। ফস করে জিজ্ঞেস করলুম— সেই টিকটিকির ল্যাজটা কী হল ?

আঃ থাম না—আগে থেকে কেন বাগড়া দিচ্ছিস ? ফের যদি কথা বলবি, তা হলে দেওয়ালের ওই টিকটিকিটক পেড়ে তোর মুখে পুরে দেব— বলে টেনিদা আমার দিকে বজ্রদৃষ্টিতে তাকাল।

ক্যাবলা বললে ছেড়ে দাও ওর কথা, তুমি বলো।

—বলবার আর আছে কী —টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : ভুল যা হয়ে গেল, তার শাস্তি পেলুম পরের দিনই।

ইস্কুলের মাঠে পাঁচুগোপাল কাপের ফাইনাল ম্যাচ। ঘুঁটেপুকুর ক্লাবকে বলেছি, প্রাণ দিয়েও কাপ জিততে হবে। আর সত্যি কথা বলতে কী— বাতাবি নেবু স্পোর্টিং আজ সত্যিই ভালো খেলছে—। এমন কি আমরা হয়তো দু-একটা গোলও দিয়ে ফেলতে পারতুম— যদি ওই দুরন্ত-দুর্ধর্ষ বিলটে ঘোষটা না থাকত। আমাদের গোলকিপার প্যাঁচাও খুব ভালো খেলেছে— দু-দুবার যা সেভ করলে, দেখবার মতো।

হাফ-টাইম পর্যন্ত ড্র। কিন্তু বুঝতে পারছিলুম— ঘুঁটেপুকুরের দম ফুরিয়ে আসছে, পরের পঁচিশ মিনিট ঠেকিয়ে রাখা শক্ত হবে। হাফ-টাইম হওয়ার আগেই আমি একটা মতলব এঁটে ফেলেছিলুম। মাঠের ধারে বাদাম গাছ থেকে হাওয়ায় পাতা উড়ে উড়ে পড়ছিল, তাই দেখেই প্ল্যানটা এল। মানে, মতলবটা মন্দ নয়। কিন্তু জানিস তো— 'মরি অরি পারি যে-কৌশলে।'

হাফ-টাইম হতেই সেজ পিসিমার বাড়ির রাখাল ভেটকির কানে-কানে আমি একটা পরামর্শ দিলুম। ভেটকিটা দেখতে বোকা-সোকা হলেও বেশ কাজের ছেলে। শুনেই একগাল হেসে সে দৌড় মারল।

আবার খেলা আরম্ভ হল। হাওয়ায় বাদামের পাতা উড়ে আসছে, আমি আড়চোখে তা দেখছি আর ভাবছি ভেটকি কখন আসে। এর মধ্যে চিংড়িহাটা আমাদের দারুণ চেপে ধরেছে— জান কবুল করে বাঁচাচ্ছে প্যাঁচা ! আমিও ফাঁক পেলে ওদের গোলে হানা দিচ্ছি...কিন্তু বিলটে ঘোষটা যেন পাঁচিল হয়ে গোল আটকাচ্ছে !

আমি শুধু ভাবছি...ভেটকি গেল কোথায় ?

অনেক দূর থেকে একটা বল গড়াতে গড়াতে আমাদের গোলের দিকে চলেছিল। একটা কড়ে আঙুল আলতো করে ছুঁইয়েও তাকে ঠেকানো যায়। কিন্তু এ কী ব্যাপার ! হঠাৎ প্যাঁচা হালদার দারুণ চিৎকার ছেড়ে শূন্যে লাফিয়ে উঠল—প্রাণপণে পা চুলকোতে লাগল আর সেই ফাঁকে—

সোজা গোল !

শুধু প্যাঁচা হালদার ? ফুল-ব্যাক কুচো মিত্তির লাফাতে-লাফাতে সেই-যে বেরিয়ে গেল, আর ফিরলই না। প্যাঁচা সমানে পা চুলকোতে লাগল, আর পর-পর আরও চারটে গোল। মানে ফাঁকা মাঠেই গোল দিয়ে দিলে বলা যায় !

হয়েছিল কী জানিস ? ভেটকিকে বলেছিলুম, গাছ থেকে একটা লাল পিঁপড়ের বাসা ছিঁড়ে এনে উড়ো পাতার সঙ্গে ওদের গোলের দিকে ছেড়ে দিতে, তা হলেই বিলটে ঘোষ একেবারে ঠাণ্ডা ! ভেটকি দৌড়ে গেছে, বাসাও এনেছে— কিন্তু ওটা এমন বেল্লিক যে, হাফ-টাইমে যে সাইড-বদল হয় সে আর খেয়ালই করেনি ! একেবারে প্যাঁচা হালদারের গায়েই ছেড়ে দিয়েছে। যখন টের পেয়েছে, তখন আর—

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনিদা থামল।

—কিন্তু কচুবনেশ্বরের টিকটিকির ল্যাজ ?— আমি আবার কৌতূহল প্রকাশ করলুম।

—আরে, আসল দুঃখু তো সেইখানেই। চিংড়িহাটা যখন কাপ নিয়ে চলে গেল, তখন পরিষ্কার দেখলুম, ওদের ক্যাপ্টেন বিলটে ঘোষের কালো প্যান্টে একটা নীল তাপ্পি মারা।

—তাতে কী হল ? —ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে।

—তাইতেই সব। নইলে কি ভেটকিটা এমন ভুল করে, বিলটের বদলে প্যাঁচার গায়ে পিঁপড়ের বাসা ছেড়ে দেয় ! সবই সেই বাবা কচুবনেশ্বরের লীলা।

—কিছুই বুঝতে পারলুম না— হাঁ করে চেয়ে রইলুম টেনিদার মুখের দিকে।

আর টেনিদা খপ করে আমার মুখটা চেপে বন্ধ করে দিয়ে বললে, আরে, বাবার থান থেকে বেরিয়েই দেখি সামনের নদীর ধারে দড়ি টাঙিয়ে ধোপারা জামা-কাপড় শুকোতে দিয়েছে। হাতে টিকটিকির ল্যাজটা তখনও ছিল— কী ভেবে আমি সেটাকে একটা কালো প্যান্টের পকেটে গুঁজে দিয়েছিলুম আর সেই প্যান্টটায় নীল রঙের একটা তাপ্পি মারা ছিল।

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেনিদা। আর মাথার ওপরে টিকটিকিটা ডেকে উঠল : টিকিস-টিকিস ঠিক ঠিক !

বেয়ারিং ছাঁট

পটলডাঙার টেনিদা, আমি আর হাবুল সেন চাটুজ্যেদের রকে বসে মন দিয়ে পেয়ারা খাচ্ছি। হঠাৎ দেখি, ক্যাবলা বেশ কায়দা করে—নাকটাকে উচ্চিংড়ের মতো আকাশে তুলে সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেমন একটা আলেকজাণ্ডারের মতো ভঙ্গি— যেন দিগ্বিজয় করতে বেরিয়েছে।

টেনিদা খপ করে একটা লম্বা হাত বাড়িয়ে ক্যাবলাকে ধরে ফেলল।

—বলি, অমন তালেবরের মতো যাওয়া হচ্ছে কোথায়? নাকের ডগায় একটা চশমা চড়িয়েছিস বলে বুঝি আমাদের দেখতেই পাসনি।

ক্যাবলা বললে, দেখতে পাব না কেন? একটু কাজে যাচ্ছি—

—এই রোববার সকালে কী এমন রাজকার্যে যাচ্ছিস র‍্যা। নেমন্তন্ন খেতে নাকি? তা হলে আমরাও সঙ্গে যাই।

ক্যাবলা গম্ভীর হয়ে বললে, না—নেমন্তন্ন না। আমি চুল ছাঁটতে যাচ্ছি।

—চুল ছাঁটতে? —টেনিদা শুনে দারুণ খুশি হল: ডি-লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস! চল— আমিও যাচ্ছি।

এইবার আমার পালা। আমি চেঁচিয়ে বললুম, খবরদার ক্যাবলা, টেনিদাকে সঙ্গে নিয়েছিস কি মরেছিস! গত বছর টেনিদা আমাকে এমন একখানা 'গ্রেট-ছাঁটাই' লাগিয়েছিল যে আমার বউভাতের নেমন্তন্ন খাওয়া একদম বরবাদ।

টেনিদা চটে বললে, তুই একটা পয়লা নম্বরের পেঁয়াজ-চচ্চড়ি। বেশ ডিরেকশন দিয়ে দিয়ে চুল ছাঁটাচ্ছিলুম— চেঁচিয়ে-মেচিয়ে ভণ্ডুল করে দিলি। না রে ক্যাবলা, তোর কোনও ভয় নেই। আমি অ্যায়সা কায়দা করে তোর চুল ছাঁটিয়ে আনব যে, কী বলে— তোর মাথা দিয়ে কী বলে—একেবারে শিখা বেরুতে থাকবে।

হাবুল বললে, হ, শিখাই বাইর হইব। শিখার মানে হইল গিয়া টিকি।

আমি বললুম, তা বেশ তো— তুই টিকিই রাখ ক্যাবলা। আমরা সবাই বেশ করে টানতে পারব।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, টেক কেয়ার! টিকি নিয়ে টিকটিকির মতো টিক-টিক করবিনে— বলে দিচ্ছি? শিখা মানে বুঝি আর কিছু হয় না? তা হলে আলোর শিখা মানে কী? আলোর টিকি? আলোর কখনও টিকি হয়? কোন্ দিন বলবি, অন্ধকারের টিকি— চাঁদের টিকি—

হাবুল খুব জ্ঞানীর মতো বললে, চাঁদের টিকি ধইর‍্যা রাশিয়ানরা তো টান মারছে!

আমি বাধা দিয়ে বললুম, কক্ষনো না। চাঁদের মাথা ন্যাড়া—আমাদের পাড়ার নকুলবাবুর মতো। চাঁদের টিকি নেই।

ক্যাবলা বললে, উঃ—এরা তো মাথা ধরিয়ে দিলে দেখছি। ঘাট হয়েছে, আমি আর চুল ছাঁটতে চাই না। এই বসছি।

টেনিদা হতাশ হয়ে বলল, বসলি?

হ্যাঁ, বসলুম।

—আমাকে নিয়ে চুল ছাঁটতে যাবিনে?

—না। ক্যাবলার মুখে একটা কঠিন প্রতিজ্ঞা দেখা দিলে: তোমাকে নিয়ে তো নয়ই। প্যালার সেই গ্রেট ছাঁটাই আমি দেখেছি, ও যে গল্পটা লিখেছিল মনের দুঃখে, সেটাও পড়েছি।

টেনিদা মন খারাপ করে বললে, তোর ভালোর জন্যেই বলেছিলুম। মানে আমার ভুলোদার মতো সস্তায় কিস্তিমাত করতে গিয়ে না পস্তাস, সেইজন্যেই বলছিলুম।

আমি বললুম, ব্যাপারটা খুলে বলো তা হলে। কী হয়েছিল তোমার ভুলোদার?

—কী হয়েছিল ভুলোদার? টেনিদা টকাং করে আমার চাঁদিতে ছোট্ট একটা গাঁট্টা মারলে: ফাঁকি দিয়ে গপ্পোটা বাগাবার চেষ্টা আর সেইটে পত্রিকায় লিখে দেবার মতলব? ও-সব চালাকি চলবে না। ভুলোদার সেই প্যাথেটিক কাহিনী শুনতে হলে চার আনার তেলেভাজা আগে আনো— কুইক।

আমার পকেটে দু'আনা ছিল, আরও দু'আনা হাবুলের কাছ থেকে আমায় ধার করতে হল।

দু'খানা বেগুনি একসঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে টেনিদা বললে, আমার ভুলোদা— মানে আমাদের দূর-সম্পর্কের জ্যাঠামশাইয়ের এক ছেলে— পয়সা-কড়ির ব্যাপারে ছিল বেজায় টাইট। জ্যাঠামশাইয়ের টাকার অভাব ছিল না, ভুলোদাও কী সব ধানপাটের ব্যবসা করত— কিন্তু একটা পয়সা খরচ করতে হলে ভুলোদার চোখ কপালে উঠে যেত।

বললে বিশ্বাস করবিনে, একদিন বাজারে গিয়ে টুক করে একটা নয়া পয়সা পড়ে গেল নালার ভেতরে। বাজারের নালা— বুঝতেই পারছিস! যেমন নোংরা— তেমনি বদখত গন্ধ— তার ওপরে এক হাত পাঁক। দেখলেই নাড়ি উলটে আসে। কিন্তু ভুলোদা ছাড়বার পাত্তর নয়। এক ঘণ্টা ধরে দু'হাতে সেই নালা ঘাঁটলে। আর একটার বদলে চার-চারটে নয়া পয়সা মিলল তার ভেতর থেকে, একটা অচল সিকি পেলে দুটো মরা শিঙিমাছ আর জ্যান্ত একটা খলসে মাছও পেয়ে গেল! তিনটে নয়া পয়সা নগদ লাভ হল, সেদিন আর মাছও কিনতে হল না।

হাবুল বললে, এ রাম?—থু—থু—

টেনিদা বললে, থু-থু? জানিস, ভুলোদা এখন কত বড়লোক? বাড়িতে গামছা পরে বসে থাকে, কিন্তু ব্যাঙ্কে তার কত টাকা!

ক্যাবলা বললে, আমাদের বড়লোক হয়ে কাজ নেই, বেশ আছি। পচা ড্রেন থেকে মরা শিঙিমাছ খেতে পারব না— গামছা পরেও বসে থাকতে পারব না।

টেনিদা বললে না, না পারবি তো যা— কচুপোড়া খে গে।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, আঃ— ঝগড়া করছ কেন? গল্পটা বলতে দাও না।

টেনিদা গজগজ করতে লাগল; ইঃ— বড়লোক হবেন না! না হলি তো না হলি— অত তড়পানি কিসের জন্যে র‍্যা? মরা শিঙিমাছ খেতে না চাস, জ্যান্ত তিমি মাছ খা— গামছা পরতে না চাস আলোয়ান পরে বসে থাক। ও-সব ধ্যাষ্টামো আমার ভাল্লো লাগে না— হুঁ।

আমি বললুম, গপ্পোটা—

—গপ্পোটা! —টেনিদা মুখটাকে ডিম-ভাজার মতো করে বললে, ধ্যুৎ! খালি

কুরুবকের মতো বকবক করলে গপ্পো হয় ?

ক্যাবলা বললে, কুরুবক এক রকমের ফুল। ফুল কখনও বকবক করে না।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, শাট আপ ? আমি বলছি কুরুবক এক রকমের বক—খুব বিচ্ছিরি বক। ফের যদি আমার সঙ্গে তক্কো করবি, তা হলে আমি এক্ষুনি কাঁচি এনে তোকে একটা গ্রেট ছাঁটাই লাগিয়ে দেব।

শুনে ক্যাবলার মুখ-টুখ একবারে শুঁটকী মাছের মতো হয়ে গেল। বললে, না-না, তুমি বলে যাও। আমি আর তক্কো করব না।

—করিসনি। বেঘোরে মারা যাবি তা হলে। বলে—কুরুবক একরকমের ফুল ! তা হলে গোরুও একরকমের ফল, রসগোল্লা একরকমের পাখি, বানরগুলোও একরকমের পাকা তাল ! যা—যা—চালাকি করিসনি।

আমি বললুম, কিন্তু ভুলোদা—

—আরে গেল যা ! এটা যে ভুলোদা-ভুলোদা করে খেপে যাবে দেখছি !—টেনিদা আমার চাঁদিতে আর একটা গাঁট্টা মারলে ; শিঙিমাছ দিয়ে নিজেও পটোলের ঝোল খায় কিনা— তাই এত ফুর্তি হয়েছে। —বলে তেলেভাজার ঠোঙা থেকে শেষ আলুর চপটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, একদম সাইলেন্স ! নইলে গল্প আমি আর বলব না।

আমরা বললুম, আচ্ছা—আচ্ছা !

টেনিদা শুরু করল :

ভুলোদা পশ্চিমে কোথায় ব্যবসা করত। ওদেশে থাকবার জন্যে— আর পয়সা বাঁচাবার জন্যে তো বটেই, একেবারে পুরোপুরি দেশোয়ালি বনে গিয়েছিল। মোটা কুর্তা পরত, পায়ে দিত কাঁচা চামড়ার নাগরা— গড়গড়িয়ে দেহাতী তালুতে সব সময় খইনি ডলত। পানকে বলতো 'পানোয়া'—সাপকে বলত 'সাঁপোয়া'। আমরা কিছু জিগ্যেস করলে অন্যমনস্কভাবে জবাব দিত—'কুছ, কহলি হো ?'

কামাতে খরচ হবে বলে দাড়ি রেখেছিল। তাতে বেশ সাধু-সাধু দেখাত আর গাঁয়ের সাদাসিধে মানুষ কিছু ভক্তি-ছেদ্দাও করত। কিন্তু চুলটা মাঝে-মাঝে না কাটলে মাথা কুটকুট করে। তা ছাড়া কী বলে— রাত-দিন টাকার ধান্দায় ঘুরে ভুলোদা খুব সাফসুফ থাকতেও পারে না। জামা কাচে মাসে একবার, চান করে বছরে চারবার। তাই চুল একটু বেশি বড় হলেই উকুন এসে বাসা বাঁধে। কিন্তু চুল ছাঁটাইয়েও ভুলোদার খরচ ছিল না। বেশ একটা কায়দা করে নিয়েছিল। কী কায়দা বল দিকি ?

আমি বললুম, বোধ হয় নিজেই কাঁচি দিয়ে ছাঁটাই করত।

টেনিদা সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল'র কাকটার মতো দুলে-দুলে বললে, হয় নি—হয় নি—ফেল !

হাবুল বললে, হ, বুঝছি। নিজের মাথার চুল খামচা খামচা কইরা টাইন্যা তুলত !

—ইঃ—কী বুদ্ধি ! মগজ তো নয়—যেন নিরেট একটা খাজা কাঁঠাল বসে

আছে ! আয় ইদিক—খিমচে-খিমচে তোর খানিক চুল তুলে দি। কেমন লাগে, টের পাবি।

টেনিদা হাত বাড়াতেই হাবুল সড়াৎ করে এক লাফে রক থেকে নেমে পড়ল।

ক্যাবলা বললে, আমরা ও-সব কায়দা-ফায়দার খবর জানব কোত্থেকে। তুমিই বলো।

টেনিদা তেলেভাজার ফাঁকা ঠোঙাটা খুঁজে একটা কিসের ভাঙা টুকরো পেলে। অগত্যা সেইটেই মুখে পুরে দিয়ে বললে, কায়দাটা বেশ মজার। ভুলোদা নজর করে দেখেছিল দেহাতী নাপিতদের মধ্যে বেশ সুন্দর একটা নিয়ম আছে। চুল-দাড়ি ছাঁটতে স্বজাতির কাছ থেকে ওরা কখনও পয়সা নেয় না। গিয়ে নমস্কার করে সামনে বসলেই বুঝে নেবে— এ আমার সমাজের লোক। তখন দিব্যি একখানা ফ্রি হেয়ার কাট। আসবার সময় আর-একটা নমস্কার করে উঠে এলেই হল— একটা পয়সা খরচ নেই।

ভুলোদাও শিখে গিয়েছিল। ব্যবসার কাজে এ-গাঁয়ে ঘুরে বেড়াতে, আসতে-যেতে দুটি নমস্কার ঠুকলেই—ব্যস, কাজ হাসিল।

সেদিনও তাই করেছে। 'রাম রাম ভেইয়া' বলে তো বসে পড়েছে এক নাপিতের সামনে, চুল ছাঁটাইয়ের সঙ্গে-সঙ্গে দেহাতী ভাষায় নানান গপ্পো চলছে। চাষের অবস্থা কেমন, কোথায় 'ভাণ্টা কে ভর্তা' মানে বেগুনের ঘন্ট— দিয়ে আচ্ছা পুরী খাওয়া যায়, কোন গাছে 'তিনোয়া চুড়ৈল'— মানে তিনটে পেত্নী 'রহতী বা'। এই সব সদালাপের ভেতর দিয়ে ভুলোদার চুল কাটা তো শেষ হল।

'চলে ভেইয়া— রাম রাম—' বলে ভুলোদা পা বাড়াতে যাবে, তক্ষুনি একটা কাণ্ড হল।

সামনেই গঙ্গা। একটা খেয়া নৌকো ওপার থেকে এপারে লাগল। আর দেখা গেল, সেই নৌকো থেকে জনা পনেরো লোক এদিক পানেই আসছে। বুড়ো থেকে ছোকরা পর্যন্ত সব বয়সের লোক আছে তাদের ভেতর।

দেখেই নাপিতের চোখ কপালে উঠল। 'হায় রাম' বলে খাবি খেল একটা। ভুলোদা গুটি-গুটি চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ নাপিত খপ করে হাত চেপে ধরলে তার।

—এই, ভাগতা কেঁও ? বৈঠো !

ভুলোদা অবাক ! পয়সা চায় নাকি ? দেহাতী ভাষায় বললে, আমি পয়সা দেব কেন ? আমি তো তোমার স্বজাত।

নাপিত বললে, সে বলতে হবে না— আমি জানি। ওই যে পনেরোজন লোক আসছে, দেখছ না ? ওদের কামাতে হবে এখন। আমি একা পারব কেন ? তুমিও আমাদের স্বজাত— হাত লাগাও।

—অ্যাঁ !

নাপিত টেনে ভুলোদাকে পাশে বসিয়ে দিলে। বললে, কী করবে ভেইয়া—দেশ গাঁয়ের নিয়ম তো মানতে হয়। ওরাও আমাদের জাত-কুটুম। গাঁয়ের লোক মরছে— তাই সবাই কামাতে আসছে এপারে।

নাপিত একটা খাবি খেয়েছিল, ভুলোদা চারটে বিষম খেল।

তা-তা—ওরা এপারে কেন? ওপারে কামালেই তো পারত।

নাপিত রেগে বললে, বুদ্ধু! স্বজাত হয়েও যেন কিছু জানো না। কামাবে কে—সবারই তো অশৌচ।

ভুলোদা ততক্ষণে হাঁ করে বসে পড়েছে। মুখের ভেতর টপাং করে একটা পাকা বটের ফল পড়ল, টেরও পেলে না। ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে। আর বুঝেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার।

বুঝলি! আরও সব মজার নিয়ম রয়েছে ওদের দেশে। গাঁয়ে কেউ মরলেই সমস্ত পুরুষমানুষকে মাথা কামাতে হবে— দাড়ি চাঁছতে হবে। তাই সবসুদ্ধ এপারে এসে পৌঁছেছে।

ভুলোদা তবু একবার শেষ চেষ্টা করলে। আমার বহুৎ কাজ আছে— পেটমে দরদ হচ্ছে—

এর মধ্যে পনেরোজন লোক এসে পড়েছে। নাপিত ধমক দিয়ে বললে অভি চুপ করো— ক্ষুর লে লেও। —বলেই ভুলোদার হাতে ক্ষুর ধরিয়ে দিলে একখানা।

পনেরোজন এসে তো 'রাম রাম' বলে নমস্কার করে গোল হয়ে বসে পড়ল। ভুলোদার তখন মাথা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে— হাত-পা একেবারে হিম। ম্যালেরিয়ায় ভোগা রোগাপটকা লোক তো নয়—ইয়া ইয়া সব জোয়ান। সঙ্গে পাকা পাকা বাঁশের লাঠি। এমন করে ঘিরে বসেছে যে, পালানোর রাস্তাঘাট সব বন্ধ।

পয়সা দিয়ে দাড়ি কামাবার ভয়ে কোনওদিন ক্ষুর ধরেনি— চুলছাঁটা তো বেয়ারিং পোস্টেই চালিয়েছে এতকাল। মাথা-মুখ কামাবে কী— কিছুই জানে না। কিন্তু সে-কথা বলবারও জো নেই। এক্ষুনি দিব্যি বিনি-পয়সায় চুল কেটে নিয়েছে। যদি বলতে যায়, আমি তোমাদের সমাজের লোক নই— তা হলে কেবল নাপিতই নয়, সবসুদ্ধ ষোলোজন লোক তাকে অ্যায়সা ঠ্যাঙানি দেবে যে, ভুলোদা কেবল তক্তা নয়—একেবারে তক্তাপোশ হয়ে যাবে। চেয়ার টেবিল হয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

নাপিত ততক্ষণে একজনের মাথা জলে ভিজিয়েছে একটুখানি, তারপর ঘচাঘচ ক্ষুর চালাতে শুরু করেছে। আর একজন দিব্যি উবু হয়ে ভুলোদার দিকে মাথা বাড়িয়ে দিয়ে ঘুঘুর মতো বসে আছে।

ওদিকে ভুলোদা চোখ বুজে বলছে: হে মা কালী, এ-যাত্রা আমায় বাঁচাও। তোমায় আমি সোয়া পাঁচ আনার— না—না—বড্ড বেশি হয়ে গেল— সোয়া পাঁচ পয়সার পুজো দেব!

হাবুল চুকচুক করে বললে, ইস—ইস। আইচ্ছা ফ্যাচাঙে তো পইড়া গেছে তোমার ভুলোদা!

আমি বললুম, কিন্তু কী কিপ্‌টে দেখেছিস। তখনও পয়সার দিকে নজরটা ঠিক আছে।

টেনিদা বললে, তা আছে! ওই জন্যেই তো মা-কালী ওকে দয়া করলেন না। সাদাসিধে মানুষগুলোর হক্কের পয়সা এইভাবে ঠকানো। এখন বোঝো মজাটা।

ভুলোদা তো সমানে জপ করছে: মা—মা—সোয়া পাঁচ আনা—না—না—সোয়া পাঁচ পয়সার পুজো দেব—আর এদিকে যে-লোকটা মাথা পেতে ঠায় বসেই ছিল, তার ঘাড়ে ব্যথা হয়ে গেছে। সে রেগে ভুলোদার পেটে একটা খোঁচা দিয়ে বললে, আরে হাঁ কর্‌কে কাহে বৈঠা হায়! হাত লাগাও—

ভুলোদা দেখল, আর উপায় নেই। তক্ষুনি লোকটার মাথায় ক্ষুর বসিয়ে দে এক টান।

জল-টল কিছু দেয়নি— চুল ভেজেনি— ওভাবে ক্ষুর লাগালে কী হয়, বুঝতেই পারিস!

'আরে হাঁ—হাঁ—ক্যা করতা'—বলে লোকটা চেঁচিয়ে উঠল, আর ভুলোদা—গিঁ—গিঁ—গিঁ—বলে আওয়াজ তুলেই ঠায় অজ্ঞান।

সত্যি-সত্যিই কি অজ্ঞান। আরে, না—না! প্রাণটা তো বাঁচাতে হবে। তাই অজ্ঞান হওয়া ছাড়া ভুলোদা আর কোনও রাস্তা খুঁজে পেলে না।

তখন চারিদিকে ভারি গোলমাল শুরু হল।

—আরে, ক্যা ভৈল? ক্যা ভৈল? মর গেইল বা?— ক্ষুরের ঘায়ে যে-লোকটার চাঁদি ছুলে দিয়েছে— সে পর্যন্ত তার পেল্লায় চাঁদিটা সামলে নিলে।

—এ জী, তুমারা ক্যা ভৈল? মানে— ওহে, তোমার কী হল?

ভুলোদা বলে চলল: গিঁ—গিঁ—গিঁ—

তখন একজন বললে, ভূত পাকড়লি, কা?—মানে ভূতে ধরল।

সকলে একবাক্যে বললে, তাই হবে।

ব্যস— আর কথা নেই। ষোলোজন লোক তক্ষুনি ভুলোদাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলল, যেভাবে শুয়োর নিয়ে যায় আর কি। ভুলোদার হাত-পা যেন ছিঁড়ে যেতে লাগল—একটুখানি নধর ভুঁড়ি হয়েছিল, সেটা নাচতে লাগল ফুটবলের মতো কিন্তু ষোলোজনের কাছ থেকে বাঁচতে হলে চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। তখন গলা দিয়ে গিঁ গিঁ—নয়—সত্যিকারের গোঁ গোঁ বেরুচ্ছে।

নিয়ে ফেললে এক রোজার বাড়িতে। সবাই মিলে চেঁচিয়ে বললে, ভূত পাকড়লি!

রোজা বললে, ঠিক হ্যায়— আচ্ছাসে পাকড়ো।

অমনি সবাই মিলে ভুলোদার হাত-পা ঠেসে ধরলে। ভুলোদা তেমনি গোঁ-গোঁ করতে লাগল।

এদিকে রোজা কতকগুলো শুকনো লঙ্কার মতো কী পুড়িয়ে ভুলোদার নাকে ধোঁয়া দিতে শুরু করলে। ফ্যাঁচচো ফ্যাচচো করে হাঁচতে-হাঁচতে ভুলোদার তো নাড়ি ছিঁড়ে যাবার দাখিল।

তারপরেই রোজা করেছে কি— কোত্থেকে একটা খ্যাংড়াঝাঁটা এনে— কী-সব বিড়-বিড় করে বকতে-বকতে ভুলোদাকে ঝপাং-ঝপাং করে পিটতে আরম্ভ

করেছে।

ভুলোদার অবস্থা তখন বুঝতেই পারছিস! গলা ফাটিয়ে চেঁচাতে লাগল : বাবা-রে—মা-রে—ঠনঠনের কালী-রে— আমার দফা সারলে রে— আমি গেলুম রে!

নাপিতরা চোখ বড়-বড় করে বললে, বাংলা বোল রহা।

তখন সবাই বললে, আঁ—বাঙালী ভূত পাকড়ালি! রাম—রাম—রাম—।

রোজা মাথা নাড়লে। বললে, বাঙালীর ভূত বহুৎ জব্বর ভূত। আরও জোরে ঝাঁটা চালাতে হবে।

ঝপাং—ঝপাং—ঝপাং! তার ওপরে নাকে সেই লঙ্কাপোড়ার গন্ধ! ভুলোদা আর কিছু টের পেল না।

উঠে বসল তিনঘণ্টা পরে। একটু-একটু করে ব্যাপারটা খেয়াল হচ্ছে তখন। দেখলে, দু'শো গাঁয়ের লোক তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে। তার মাথা পরিষ্কার করে কামানো—একেবারে ন্যাড়া—মুখে একটি দাড়ির চিহ্ন নেই, এমন কি ভুরু পর্যন্ত নিটোলভাবে চাঁছা। চাঁদির ওপরে দুর্গন্ধ কী একটা প্রলেপ মাখানো—গা-ভর্তি জল আর কাদা।

হেসে রোজা বললে, হাঁ, অব ঠিক হোই। ভূত ভাগ্ গইল বা।

হাঁ— সেই থেকে ভূত সত্যিই পালিয়েছে ভুলোদার। এখন আর সস্তায় কিস্তিমাত করতে চায় না। নিয়মিত সেলুনে গিয়ে—নগদ আটগণ্ডা পয়সা খরচ করে চুল ছেঁটে আসে।

তাই বলছিলুম, ওরে ক্যাবলা—

রেগে ক্যাবলা উঠে দাঁড়াল : আমি তোমার ভুলোদার মতো বিনি পয়সায় চুল ছাঁটতে চাইছিলুম—এ কথা তোমায় কে বললে?

তারপর তেমনি কায়দা করে—নাকের ওপর চশমাটাকে আরও উঁচুতে তুলে, আলেকজাণ্ডারের ভঙ্গিতে গটমটিয়ে চলে গেল সে।

কাঁকড়াবিছে

চাটুজ্জেদের রকে আমি, টেনিদা আর হাবুল সেন বসে মোড়ের বুড়ো হিন্দুস্থানীর কাছ থেকে কিনে-আনা তিনটে ভুট্টাপোড়া খুব তরিবত করে খাচ্ছিলুম। হঠাৎ কোত্থেকে লাফাতে-লাফাতে ক্যাবলা এসে হাজির।

—ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস! মেরেছি একটাকে!

কচর-কচর করে ভুট্টার দানা চিবুতে চিবুতে টেনিদা বললে, হঠাৎ এত লম্ফঝম্ফ যে? কী মেরেছিস? মাছি, না ছারপোকা?

—একটা মস্ত কাঁকড়াবিছে। দেওয়ালের ফুটো থেকে বেরিয়ে দিব্যি ল্যাজ তুলে আমাদের ছেদিলালকে কামড়াতে যাচ্ছিল। ছেদিলাল আপন মনে গান গাইতে গাইতে গোরু দোয়াচ্ছে, কিচ্ছু টের পায়নি। আমি দেখেই একটা ইট তুলে ঝাঁ করে মেরে দিলুম—ব্যস-ঠাণ্ডা!

টেনিদা মুখটাকে কুচোচিংড়ির মত সরু আর বিচ্ছিরি করে বললে, ফুঃ!

—ফুঃ মানে?—ক্যাবলা চটে গেল; কাঁকড়াবিছের সঙ্গে চালাকি নাকি? একবার কামড়ালেই বুঝতে পারবে!

—কাঁকড়াবিছের সঙ্গে চালাকি কে করতে যাচ্ছে? কিন্তু কলকাতায় কাঁকড়াবিছে? রাম রাম! ওরা তো ডেয়ো পিঁপড়ের বড়দা ছাড়া কিছু নয়। আসল কাঁকড়াবিছের কথা জানতে চাস তো আমার পচামামার গল্প শুনতে হবে।

গল্পের আরম্ভে ক্যাবলা তড়াক করে রকে উঠে বসল।

হাবুল বললে, পচামামা? এই নামটা এইবারে য্যান নূতন শুনত্যা আছি।

—কাল শুনবি আরও, এখুনি হয়েছে কী!—ভুট্টার দানাগুলো শেষ করে টেনিদা এবার সবটা বেশ করে চেটে নিলে : আর যত শুনবি ততই চমকে যাবি!

আমি একবার মাথাটা চুলকে নিয়ে বললুম, একটা কথা জিজ্ঞেস করব টেনিদা?

ভুট্টার গোঁজটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে টেনিদা মোটা গলায় বললে, ইয়েস, পারমিশন দিচ্ছি।

—তোমার ক'টি মামা আছে সবসুদ্ধ?

টেনিদা বললে, ফাইভ ফিফটিফাইভ। মানে পাঁচশো পঞ্চান্ন জন।

আমি কাকের মতো হাঁ করে বসে রইলুম, ক্যাবলা একটা খাবি খেল, আর হাবুল সেন ডুকরে উঠল : খাইছে!

ইউ শাট আপ হাবলা, চিল্লাসনি! মামা কী রকম জানিস? ঠিক রেকারিং ডেসিমেলের মতো—মানে, শেষ নেই। মনে কর মা-র পিসতুতো ভাইয়ের বড় শালার মেজ ভায়রা—তাকে কী বলে ডাকব?

আমরা একবাক্যে বললুম, মামা।

—কিংবা মনে কর, আমার কাকিমার মাসতুতো বোনের খুড়তুতো ভাইয়ের—

ক্যাবলা বললে, থাক, আর বলতে হবে না। মানে, মামা। বিশ্বময় মামা।

—রাইট। পচামামা সেই বিশ্বময় মামার একজন।

আমি অধৈর্য হয়ে বললুম, সে তো হল। কিন্তু কাঁকড়াবিছে—

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, দাঁড়া না ঘোড়াড্ডিম! আগে সব জিনিসটা ক্লিয়ার করে নিতে হবে না? কুরুবকের মতো বেশি বকবক করবি তো তোর কানের ওপর এখুনি একটা কাঁকড়াবিছে ছেড়ে দেব।

হাবুল বললে, ছ্যাইড়া দাও—প্যালার কথা ছ্যাইড়া দাও! ওইটা একটা দুগ্ধপোইষ্য শিশু!

—কী আমার ঠাকুর্দা এলেন রে—আমি হাবুলকে ভেংচি কাটলুম।

টেনিদা আমার মাথায় টকাং করে একটা টোকা মেরে বললে, ইউ স্টপ! নাউ

নো ঝগড়া ! তাহলে দুই থাপ্পড় দিয়ে দুটোকেই তাড়িয়ে দেব এখান থেকে। এখন পচামামার গল্প শুনে যা। খবরদার, ডিসটার্ব করবিনে।

আমরা একবাক্যে বললুম, না—না।

—পচামামা, বুঝলি—একটা গলাখাঁকারি দিয়ে টেনিদা শুরু করলে : স্কুলে সাতবার ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল করেছিল। আটবারের বার টেস্টেও যখন অ্যালাও হতে পারল না, তখন দাদু—মানে পচামামার বাবা তাকে পেল্লায় একটা চড় মেরে বলল, নিকালো আমার বাড়ি থেকে হতভাগা মুখ্যু, কুপুত্তুর, বোম্বেটে, অকালকুষ্মাণ্ড কোথাকার।

একসঙ্গে চার-চারটে ওইরকম জবরদস্ত গাল, আর গালের ওপর অমনি একখানা, কী বলে—জাড্যাপহ চাঁটি—

আমি জিজ্ঞাসা করলুম : জাড্যাপহ মানে কী ?

—আমি কোত্থেকে জানব ? শুনতে বেশ জাঁদরেল লাগে, তাই বললুম।

ক্যাবলা বলতে গেল : জাড্যাপহ, অর্থাৎ কিনা, যা জড়তা অপহরণ—

—চুপ কর ক্যাবলা—টেনিদা খেঁকিয়ে উঠল : তুই আর পণ্ডিতের মতো টিকটিক করিসনি। ফের যদি বিদ্যে ফলাবি—আমি আর গল্প বলবই না। মুখে বল্টু এঁটে বসে থাকব।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, না—না, আমরা আর কথা বলব না। গল্পটাই চলুক।

টেনিদা আবার শুরু করল : সেই জাড্যাপহ চাঁটি টেয়ে পচামামার মন উদাস হল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার নিকুচি করেছে—এমন অপমান সহ্য করা যায়। পচামামা সেই রাতেই দেশান্তরী হল।

মানে বিদেশে আর যাবে কোথায়, তখনও পাকিস্তান হয়নি—সোজা দার্জিলিং মেলে উঠে পড়ল। নামল গিয়ে শিলিগুড়িতে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে পাহাড় জঙ্গল ভেঙে, বাঙলা দেশের চৌহদ্দি পেরিয়ে একেবারে চলে গেল ভুটানে।

ইচ্ছে ছিল তিব্বতে গিয়ে অতীশ-দীপঙ্কর-টর হবে, কিন্তু একে বেজায় শীত, তায় ভুটান তখন লালে লাল।

—লালে লাল ?—ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে ; ভুটানীরা খুব দোল খেলে বুঝি ?

—তোর মুণ্ডু ! লেবু—লেবু, কমলালেবু। ভুটানী কমলা বিখ্যাত, জানিস তো ? আর পাহাড় আলো করে সব বাগান, তাতে হাজারে-হাজারে ফল পেকে টুক-টুক করছে ঝরে পড়ছে গাছতলায়। যত খুশি কুড়িয়ে খাও, কেউ কিচ্ছুটি বলবে না। এমনকি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুটো-চারটে ছিঁড়ে নিতে পারো—কে আর অত লক্ষ করতে যাচ্ছে !

মোদ্দা, ওই কমলালেবুর টানেই পচামামা ভুটানে আটকে গেল। যেখানে-সেখানে পড়ে থাকে আর পেটভরতি লেবু খায়। দেখতে দেখতে পচামামার ছিবড়ে বাদুড়চোষা চেহারাই পালটে গেল একদম। দাদু কিপটে লোক, তাঁর বাড়িতে পুঁইডাঁটা চচ্চড়ি, কড়াইয়ের ডাল আর খলসে মাছের ঝাল খেয়ে

পচামামার বুদ্ধি-টুদ্ধিগুলোতে মরচে পড়ে গিয়েছিল, কিন্তু কমলালেবুর রসে হঠাৎ সেগুলো চাঙা হয়ে উঠল।

ওদিকে সবচাইতে বড়ো বাগানের মালিক হল পেম্বাদোরজী শিরিং। নামটা, কী বলে—একটু ইয়ে হলেও লোকটি বেশ ভালোমানুষ। গোলগাল চেহারা, গায়ে ওদের সেই কালো আলখাল্লা, মাথায় কাঁচাপাকা চুলের লম্বা বিনুনি। মুখ পাঁচ-সাত গাছা দাড়ি, সব সময় মিঠে-মিঠে হাসি, আর রাতদিন চমরী গাইয়ের জমাট দুধের টুকরো চুষছে। পচামামা তাকে গিয়ে মস্ত একটা সেলাম ঠুকে বললে, শিরিং সাহেব, আমি একজন বিদেশী।

শিরিং হেসে বললে, সে জানি। আজ পনেরো দিন ধরে তুমি আমার বাগানের লেবু খেয়ে আধাসাট করছ। কিন্তু আমরা অতিথিবৎসল বলে তোমায় কিছু বলিনি। ভুটিয়া হলে আমার এই কুকরি দিয়ে মুণ্ডুটি কচাৎ করে কেটে নিতুম।

শুনে পচামামার রক্ত জল হয়ে গেল। বললে, সাহেব, আমি খুব হাংগ্রি বলেই—

শিরিং চমরী গাইয়ের দুধের টুকরো মুখে পুরে বললে, ঠিক আছে, আমি কিছু মাইণ্ড করিনি। ওই তো তোমার বাঙালীর পেট, কীই বা তুমি খেতে পারো ! এখন বলো, কী চাও ?

—শিরিং সাহেব—পচামামা হাত কচলাতে কচলাতে বললে, শুধু কমলালেবু চালান দিয়ে কীই বা লাভ হয় আপনার ?

—কম কী ? লাখ খানেক।

—আজ্ঞে, এই লাখ টাকা যদি পাঁচ লাখ হয় ?

শুনে শিরিং সাহেব নড়ে বসল : তা কী করে হতে পারে ?

—আপনি অরেঞ্জ স্কোয়াশ, অর্থাৎ বোতল-ভরতি করে কমলালেবুর রস বিক্রি করুন। তাতে লাভ অনেক বেশি হবে।

শিরিং হাসল : এ আর নতুন কথা কী ? এই তো মাইল-পাঁচেক দূরে ডিক্রুজ বলে এক সায়েব একটা কারখানা করেছে। সে তো জুত করতে পারছে না। বাজারে দারুণ কম্পিটিশন—কলকাতা ও বোম্বাইতে অনেক বড় কোম্পানি, আমরা সুবিধে করতে পারব কেন ?

পচামামা আবার একটা লম্বা সেলাম ঠুকল : যদি এমন অরেঞ্জ স্কোয়াশ তৈরি করতে পারি যা স্বাদে গন্ধে, যাকে বলে অতুলনীয় ? মানে যা খেলে লোকে আর ভুলতে পারে না, একবার খেলে বারবার খেতে চায় ?

—সে জিনিস তৈরি করবে কে ? তুমি ?

—চেষ্টা করে দেখতে পারি।

—তুমি কি কেমিস্ট ?

—আমি এম. এস-সি।

পচামামা চাল মারল, বুঝতেই পারছিস। কিন্তু বিদেশ-বিভুঁয়ে এক-আধটু ও-সব করতেই হয়, নইলে কাজ চলে না। পচামামা ভাবল, হুঁ-হুঁ—বাঙালীর

ব্রেন—একটা কিছু করে ফেলবই।

শিরিং খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে কী ভাবল। তারপর বললে, বেশ, চেষ্টা করে দেখো।

—কিন্তু দিন পনেরো সময় দিতে হবে।

—পনেরো দিন কেন ?—শিরিং উৎসাহ দিয়ে বললে, এক মাস সময় দিচ্ছি। তুমি আমার আউট-হাউসে থাকো। এক্সপেরিমেন্টের জন্যে যা-যা চাও সব দেব। যদি সাক্‌সেসফুল হতে পারো, তোমাকে কারখানার চিফ কেমিস্ট করে দেব, আর মাসে দু-হাজার টাকা করে মাইনে।

পচামামা এসে শিরিং সাহেবের আউট-হাউসে উঠল। সে কী রাজকীয় আয়োজন। এমন গদি-আঁটা বিছানায় পচামামাদের কেউ সাত জন্মে শোয়নি। দু'বেলা এমন ভালো-ভালো খাবার খেতে লাগল যে তিন দিন পরে একবার করে পেটের অসুখে ভুগতে লাগল। আর সেইসঙ্গে চলল তার এক্সপেরিমেন্ট।

কখনও কমলালেবুর রসে আদা মেশাচ্ছে, কখনও মধু, কখনও চায়ের লিকার, কখনও ঝোলা গুড়, কখনও বা এক-আধ শিশি হোমিওপ্যাথিক ওষুধই ঢেলে দিচ্ছে—মানে, প্রাণে যা চায়। আর খেয়ে-খেয়ে দেখছে। কোনওদিন বা এক চামচে খেয়েই বমি করে ফেলল, কোনওদিন মুখে দিতে না দিতেই তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল, কোনওদিন নেহাত মন্দ লাগল না, আর কোনওদিন মুখ এমন টকে গেল যে, ঝাড়া আটচল্লিশ ঘন্টা কিছু আর দাঁতে কাটতে পারে না।

এদিকে এক মাস যায়-যায়। শিরিং সাহেব মাঝে মাঝে খবর নেয়, কদ্দূর হল। পচামামা বুঝতে পারল, এবারে পরস্মৈপদী রাজভোগ আর বেশিদিন চলবে না ! এক মাসের ভেতর কিছু করতে না পারলে এই খাওয়ার সুখ সুদে-আসলে আদায় করে নেবে ; পিটিয়ে তক্তা তো করে দেবেই, চাই কি কচাং করে মুণ্ডুটিও কেটে নিতে পারে।

পচামামা রাত জেগে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে, আর এক্সপেরিমেন্ট চালায়। তারপর একদিন মধু, আদা, হোমিওপ্যাথিক ওষুধ আর পিঁপড়ের ডিম মিশিয়ে যেই এক্সপেরিমেন্ট করেছে—

ওঃ, কী বলব তোদের, কী তার স্বাদ, কী সুতার ! এক-চামচে খেয়ে মনে হল যেন পোলাও, পায়েস, ছানার ডালনা, আলুকাবলি, বেলের মোরব্বা, দরবেশ, রাবড়ি—মানে যত ভালো-ভালো খাবার জিনিস রয়েছে, সব যেন কে একসঙ্গে তার মুখে পুরে দিলে। এমন অপূর্ব, এমন আশ্চর্য অরেঞ্জ স্কোয়াশ পৃথিবীতে কেউ কখনও খায়নি !

পচামামা তখনই গিয়ে শিরিং সাহেবকে সেলাম ঠুকল। বললে, আমি রেডি।

—এক্সপেরিমেন্ট সাকসেসফুল ?

শিরিং সাহেব খুশি হয়ে বললে, বেশ, তাহলে কালকে আমি ও আমার স্ত্রী, আমার ছেলে, আমার ম্যানেজার, আর আমার তিনজন বন্ধু—আমরা তোমার

অরেঞ্জ স্কোয়াশ খেয়ে দেখব। যদি ভালো লাগে, কালই কলকাতায় মেশিনের অর্ডার দেব, আর তুমি হবে আমার কারখানার চিফ কেমিস্ট, মাসে দু'-হাজার টাকা মাইনে।

কেল্লা ফতে ! পচামামা নাচতে-নাচতে চলে এল। সারা রাত ধরে স্বপ্ন দেখল, সে একটা মস্ত মোটরগাড়ি চেপে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে আর দু'ধারের লোক তাকে সেলাম ঠুকছে।

কিন্তু বরাত কি আর অত সহজেই খোলে রে ? তাহলে কি আর আজ পচামামাকে লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরে গাঁয়ে মুদিখানার দোকান করতে হয় ? না—পেঁয়াজ আর মুসুরির ডালের ওজন নিয়ে খদ্দেরের সঙ্গে ঝগড়া করতে হয় ?

যা হল, তা বলি।

পচামামা বুঝতে পেরেছিল, নিশ্চয় পিঁপড়ের ডিমের গুণেই তার তৈরি অরেঞ্জ স্কোয়াশ তখন স্বর্গের সুধা হয়ে উঠেছে। প্রাণ খুলে সে আট বোতল সুধা তৈরি করল তারপর নিশ্চিন্তে ঘুমুতে গেল। আর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কী সুখের স্বপ্ন যে দেখল সে তো আগেই বলেছি।

পরের দিন শিরিং সাহেব তো দলবল নিয়ে পচামামার এক্সপেরিমেন্ট চাখতে বসেছে। সবটা মিলে বেশ একটা চমৎকার মোচ্ছবের আবহাওয়া। মস্ত টেবিলে দামী টেবিল ক্লথ পেতে দেওয়া হয়েছে, ফুলদানিতে ফুল সাজানো হয়েছে, গ্রামোফোনে নাচের রেকর্ড বাজছে, আর সাতজনের সামনে সাতটি রুপোর গ্লাস চকচক করছে।

পচামাম আহ্লাদে-আহ্লাদে মুখ করে গেলাসে তার এক্সপেরিমেন্ট ঢেলে দিলে।

প্রথমে শিরিং সাহেব একটা চুমুক দিল, তারপরেই আর সবাই।

তোদের বলব কী—তক্ষুনি যেন বিপর্যয় ব্যাপার ঘটে গেল। প্রথমেই 'আঁক' করে শিরিং সাহেব চেয়ারসুদ্ধু উলটে পড়ে গেল, শিরিং সাহেবের গিন্নি টেবিলে বমি করে ফেলল, তাদের ছেলে 'আই' করে একটা আওয়াজ তুলে সেই-যে ঘর থেকে দৌড় লাগাল—পাক্কা তিন মাইল গিয়ে তারপরে বোধহয় সে থামল। ম্যানেজার হাত-পা ছুড়ে পাগলের মতো নাচতে লাগল—একজন অতিথি আর-একজনকে জড়িয়ে ধরে ঘরের মেঝেয় কুস্তি লড়তে লাগল, আর তিন নম্বর অতিথি হঠাৎ তেড়ে গিয়ে শিরিং সাহেবের কুকুরটার ল্যাজে ঘ্যাঁক করে কামড়ে দিলে !

পচামামা বুঝতে পারল, গতিক সুবিধের নয় ! তার সুধা যেমনই হোক—খেয়ে এদের আরাম লাগেনি। আর মনে পড়ল, শিরিং সাহেবের কুকরিটাও নেহাত চালাকি নয়। কাজেই—

'থাকিতে চরণ, মরণে কি ভয়, নিমেষে যোজন ফরসা—' পচামামা দে-দৌড় ! সারাদিন দৌড়ল, তারপর সন্ধেবেলা এক গভীর বনের ভেতর একটা ভাঙা মন্দিরে বসে হাঁপাতে লাগল। ভাবল, খুব বেঁচে গেছি এ-যাত্রা।

ওদিকে ঘন্টাতিনেক বাদে মাথা-ফাথা একটু ঠাণ্ডা হলে শিরিং সাহেব হাঁক ছাড়ল : কোথায় সেই জোচ্চোর কেমিস্ট ? বিষ খাইয়ে আমাদের মেরে ফেলবার

জোগাড় করেছিল। শিগগির তার কানে ধরে টেনে নিয়ে আয় এখানে, আমি নিজের হাতে তার মুণ্ডু কাটব !

তক্ষুনি লোক ছুটল চারদিকে !

ওদিকে পচামামা মন্দিরে বসে ভাবতে লাগল, ব্যাপারটা কী হল। সে নিজে বারবার তার আবিষ্কার চোখে দেখেছে, কী তার সোয়াদ—কী তার গন্ধ। রাতারাতি অমন করে সব বদলে গেল কী করে ?

হয়েছিল কী, জানিস ? পচামামার বাবুর্চিটা ছিল ভীষণ লোভী। সে এক ফাঁকে একটা বোতল থেকে একটু খেয়ে এমন মজে গেছে যে চুপি-চুপি আটটা বোতলই সাফ করে ফেলেছে। তারপরেই তার খেয়াল হয়েছে, সকালে তো শিরিং সাহেব তার গর্দান নেবে। তখন করেছে কী, পচামামার এক্সপেরিমেন্ট টেবিলে যা ছিল—মানে লেবুর রস, চাল-ধোয়া জল, টিংচার আইডিন, এক শিশি লাল কালি, খানিক ঝোলা গুড় আর বেশ কিছু গঁদের আঠা ঢেলে আটটি বোতল আবার তৈরি করে রেখেছে। আর তাই খেয়েই—

পচামামা আর কিছু বুঝতে পারছে না। সামনে সেই ভাঙা মন্দিরটার ভেতরে বসে মশার কামড় খাচ্ছে, ভয়ে আর শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। ভাবছে, রাত্তিরটা কোনওমতে কাটলে হয়, তারপর আবার এক দৌড়, মাইল-দশেক পেরুতে পারলেই ভুটান বর্ডার ছাড়িয়ে লঙ্কাপাড়া চা-বাগান—তখন আর তাকে কে পায় !

পচামামা যেখানে বসে আছে তার দু পাশে ভাঙা মেঝেতে বিস্তর ফুটোফাটা। সেই ফুটো দিয়ে ধীরে-ধীরে কয়েকটি প্রাণী মুখ বের করল। কালো কটকটে তাদের রঙ, লম্বা লম্বা ল্যাজের আগা বঁড়শির মতো বাঁকানো চোখে সন্ধানী দৃষ্টি। শীতের দিন, ভালো খাওয়া-দাওয়া জোটে না—পেটে বেশ খিদে ছিল তাদের। ওদিকে পচামামার কোটের পকেট থেকে কেক, ডিমভাজা—এ-সবের বেশ মনোরম গন্ধ বেরুচ্ছে। পালাবার সময় পচামামা টেবিল থেকে যা পেয়েছে দু-পকেটে বোঝাই করে নিয়েছিল—বুঝেছিল পরে এ-সব কাজে লাগবে।

সুড়সুড় করে দু-দিকের পকেটে তারা একে একে ঢুকে পড়ল। খাবারের ধ্বংসাবশেষ কিছু ছিল, তাই খেতে লাগল একমনে। পচামামা উদাস হয়ে বসে ছিল, এ-সব ব্যাপার কিছুই সে টের পেল না।

হঠাৎ তার মুখের ওপর টর্চের আলো। আর সঙ্গে সঙ্গে ভুটিয়া ভাষায় কে যেন বললে, এই যে, পাওয়া গেছে।

আর-একজন বললে, এবার কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চল। সকালে শিরিং সাহেব ওর মুণ্ডু কাটবে !

পচামামার রক্ত জল হয়ে গেল ! সামনে দৈত্যের মতো জোয়ান দুই ভুটিয়া। কোমরে চকচকে কুকরির খাপ। অন্ধকারেও পচামামা দেখল, তার মুখের ওপর টর্চ ফেলে ঝকঝকে দাঁতে হাসতে হাসতে তারা তারই দিকে এগিয়ে আসছে।

পচামামা দাঁড়িয়ে পড়ল। পালাবার পথ বন্ধ। তবু মরিয়া হয়ে ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে উঠল : সাবধান—এগিয়ো না, আমার দুই পকেটেই রিভলভার আছে !

—হাঃ—হাঃ—রিভলভার !—দুই মূর্তি ঝাঁপিয়ে পড়ল পচামামার ওপর। পচামামা কিছু বলবার আগেই দু'জনের দুটো হাত তাকে জাপটে ধরল, আর দুটো বাঁ-হাত তার দু'-পকেটে রিভলভার খুঁজতে লাগল।

আর—তক্ষুনি দুই জোয়ানের গগনভেদী আর্তনাদ ! পচামামাকে ছেড়ে দিয়ে তারা সোজা মেঝের ওপর গড়াতে লাগল : ওরে বাপরে, মেরে ফেলেছে রে—গেলুম—গেলুম—

ঠিক তখন বনের ভিতর দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের আলো পড়ল। সেই আলোয় পচামামা দেখল, দুজনের হাতেই একজোড়া করে কালো কদাকার পাহাড়ী কাঁকড়াবিছে লটকে আছে, আর, তার নিজের পকেটের ভেতর সমানে আওয়াজ উঠছে খড়র, খড়র—

—উরিঃ দাদা !

পচামামা একটানা গায়ের কোটটা ছুড়ে ফেলে দিল। তারপর ওদের পড়ে-থাকা টর্চটা কুড়িয়ে নিয়ে দৌড়—দৌড়—রাম দৌড় ! সকালের জন্যেও অপেক্ষা করতে হল না, একটা চিতাবাঘের পিঠের ওপর হাই জাম্প দিয়ে, একটা পাইথনের ল্যাজ মাড়িয়ে, ডজন পাঁচেক শেয়ালকে আঁতকে দিয়ে রাত ন'টার সময় যখন লঙ্কাপাড়া চা-বাগানে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল, তখন তার মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা উঠছে।

বুঝলি ক্যাবলা, এই হল আসল পাহাড়ি কাঁকড়াবিছের গল্প। দুটো অমন বাঘা জোয়ানকে ধাঁ করে শুইয়ে দিলে। তোর কলকাতার কাঁকড়াবিছে ওদের কিছু করতে পারত ? রামো—রামো !

টেনিদা থামল।

ক্যাবলা মাথা চুলকোতে লাগল। হাবুল বললে, একটা কথা জিগাইমু টেনিদা ?

টেনিদা হাবুলের কথা নকল করে বললে, হ, জিগাও।

—কাঁকড়াবিছায় কেক-বিস্কুট-ডিমভাজা খায় ?

—এ তো আর তোর কলকাত্তিয়া নয়, পাহাড়ি কাঁকড়াবিছে। ওদের মেজাজই আলাদা। আমার কথা বিশ্বাস না হয় পচামামাকে জিজ্ঞেস কর।

—তেনারে পামু কই ?

টেনিদা বললে, ধ্যাধ্যেড়ে কালীকেষ্টপুরে।

আমি জানতে চাইলুম : সে কোথায় ?

টেনিদা বললে, খুব সোজা রাস্তা। প্রথমে আমতা চলে যাবি। সেখান থেকে দশ মাইল দামোদরে সাঁতার কাটবি। তারপর ডাঙায় উঠে চল্লিশ মাইল পঁচাত্তর গজ সাড়ে এগারো ইঞ্চি হাঁটলেই ধ্যাধ্যেড়ে কালীকেষ্টপুরে পৌঁছে যাবি। আচ্ছা তোরা তা হলে সেখানে রওনা হয়ে যা, আমি এখন একবার পিসিমার বাড়িতে চললুম। টা টা—

বলেই হাত নেড়ে লাফিয়ে পড়ল রক থেকে, ধাঁ করে হাওয়া হয়ে গেল।

হনোলুলুর মাকুদা

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে আমি বেশ নরম গলায় গান গাইতে চেষ্টা করেছিলুম, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'—আর টেনিদা বেশ উদাস হয়ে একটার পর একটা চীনেবাদাম চিবিয়ে খাচ্ছিল। ঠিক সেই সময় পাশ থেকে কে যেন গলা খাঁকারি দিয়ে বললে, হু-হুম্।

চেয়ে দেখি লম্বা চেহারার একটি লোক, গায়ে রংচটা হলদে মতন একটা পুরনো ওভারকোট, পরনে তালিমারা ট্রাউজার আর গালভর্তি এলোপাথাড়ি দাড়ির সঙ্গে একমুখ হাসি। দাঁতগুলো আবার পানের ছোপ-ধরা—ঠিক একরাশ কুমড়োর বিচির মতো মনে হল।

লোকটা আবার বললে, আমি প্রতিবাদ করছি। এর চাইতে ভালো দেশ পৃথিবীতে অনেক আছে।

টেনিদার চীনেবাদাম চিবানো বন্ধ হয়ে গেল।

—আচ্ছা লোক তো মশাই। আপনি বাঙালী হয়ে বাংলা দেশের নিন্দে করছেন ?

—আমি বাঙালী নই। আমি ভারতবর্ষের লোকই নই।

—তবে কি বাঙাল ? না পাকিস্তানি ?

—না—আমি হনোলুলুর লোক।

—হনোলুলু ?—টেনিদার গলায় চীনেবাদাম আটকে গেল। আর আমি কাকের মতো হাঁ করে চেয়ে রইলুম লোকটার মুখের দিকে।

বার কয়েক কেশে-টেশে টেনিদা সামলে নিলে। তারপর বললে, চালিয়াতির আর জায়গা পাননি স্যার ? দিব্যি বাঙালী চেহারা আপনার—চমৎকার বাংলায় কথা বলছেন, আপনি হনোলুলুর লোক ? তা হলে আমি তো ম্যাডাগাস্কারের লোক আর এই প্যালাটা হচ্ছে আফ্রিকার গরিলা।

আমি দারুণ প্রতিবাদ করে বললুম, কক্ষনো না, আমি মোটেই আফ্রিকার গরিলা নই। বরং তোমাকে অস্ট্রেলিয়ার ক্যাঙারু বলা যেতে পারে।

গাল-ভর্তি এলোমেলো দাড়ি আর কুমড়োর বিচির মতো দাঁত নিয়ে আবার হেসে উঠল লোকটা। বললে, ছিঃ খোকারা, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করতে নেই। আমি হনোলুলুর লোক কি না জানতে চাও ? তোমরা অ্যানথ্রপোলজি পড়েছ ?

আমরা বললুম, না, পড়িনি।

—পিথেকানথ্রোপাস ইরেকটাসের কথা কিছু জানো ?

আমরা আঁতকে উঠে বললুম, না—জানি না।

—সেই জন্যেই বুঝতে পারছ না। এ-সব পড়লে-টড়লে জানতে, বাঙালী আর হনোলুলুর লোকের চেহারা একই রকম।

গোটা দু'তিন কটকটে নামের ধাক্কাতেই আমরা কাত হয়ে গিয়েছিলুম, তেমনি বোকার মতো চেয়ে রইলুম লোকটার দিকে।

লোকটা তেমনি বলে যেতে লাগল : আর বাংলা শিখলুম কী করে ? আমি হচ্ছি ওয়ার্ল্ড-ট্যুরিস্ট—অর্থাৎ ভূ-পর্যটক। আর জানোই তো, ট্যুরিস্টদের দুনিয়ার তামাম ভাষা শিখতে হয়।

—আপনি সব ভাষা জানেন ?—টেনিদা এবার নড়েচড়ে সোজা হয়ে বসল।

—আলবত।

—জাপানী বলুন তো ?

—কাই-দু চি—নাগাসাকি—হিরোহিতো-উচিমিরো-কিচিকিদা—বুঝতে পারছ ?

আমি বললুম, পরিষ্কার বুঝতে পারছি। আচ্ছা, একটু জার্মান বলুন।

—ভোলতেন্‌জেন-কুলতুরক্যাম্প-ব্লিৎক্রিগ-গট্ ইন্ হিম্মেল।

টেনিদা বললে, খুব ইন্টারেস্টিং তো ? ফরাসীও নিশ্চয় জানেন ?

লোকটা মিটমিট করে হেসে বললে, আঁফাঁ তেরিব্‌ল্—বঁজুর মঁসিয়ো—সিল্ ভু প্লে-ক্যাস্ কে সে !

টেনিদা বললে, দারুণ।

আমি চোখ কপালে তুলে বললুম, নিদারুণ।

—আর শুনতে চাও ?

—না স্যার, এতেই দম আটকে আসছে। আপনার নামটা জানতে পারি ?

—আমার নাম ম্যাকাদিনি বেনিহিতো অ্যাসপারাগাস ডি প্রোফান্ডিস !

—কী সর্বনাশ !

লোকটা তালিমারা ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরে বেশ কায়দা করে শিস দিলে একটা। বললে, আমাদের হনোলুলুর নাম একটু লম্বাই হয়। তোমাদের বাঙালী নামই বা কিসে কম ? এই তো একটু আগেই এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল—তাঁর নাম নিত্যরঞ্জন দত্ত রায়চৌধুরী।

টেনিদা মাথা চুলকে বলল, যেতে দিন স্যার, কাটাকাটি হয়ে গেল। কিন্তু অত বড় নামে তো আপনাকে ডাকা যাবে না, একটু শর্টকাট করতে পারলে—

—আচ্ছা, আচ্ছা, ম্যাকাদিনি বোলো। তোমাদের বাংলা মতে 'ম্যাকু'বাবুও বলতে পারো।

আমি বললুম, মাকু বললে হয় না ?

—তাও হয়।—লোকটা একগাল হাসল : মাকুদাই বরং বোলো আমাকে। বেশ একটা ভাই ভাই সম্পর্ক হয়ে যাবে। আর জানোই তো—এটা বিশ্বপ্রেমের যুগ।

টেনিদা বললে, নিশ্চয়। এখন চারিদিকেই তো বিশ্বপ্রেম। তা মাকুদা—আপনি কিন্তু আমাদের প্রাণে বড্ড ব্যথা দিয়েছেন।

মাকুদা বললে, দিয়েছি নাকি ? গট ইন হিম্মেল ! কখন দিলুম ?

—একটু আগেই। প্যালা গান গাইছিল, 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে

নাকো তুমি'—আপনি ফস করে বলে বসলেন যে, আপনি তার প্রতিবাদ করছেন।

মাকুদা আমাদের পাশে বসে পড়ল এতক্ষণে। তালিমারা ট্রাউজারের পকেট থেকে একটা বিড়ি বের করে সেটা ধরিয়ে নিলে। তারপর বললে, আঁফাঁ তেরিব্‌ল্‌! মানে—আমি খুব দুঃখিত। মাত্র তিন দিন আগেই আমি জাপান থেকে এসেছি কিনা। সেখানে যে আদর যত্ন পেয়েছি, তার কথা যখনই মনে পড়ছে—তখনই ভাবছি—হিরিসুমা কুচিকিদো—অর্থাৎ কিনা,—আহা সে স্বর্গ।

—তাই নাকি!

—কী আর বলব তোমাদের।—এলোমেলো দাড়িতে-ভর্তি গালটাকে ছুঁচলো করে নিয়ে মাকুদা চোঁ করে বিড়িতে একটা টান দিলে: প্রথম যেদিন জাপানে পা দিলুম—কাউকে চিনিটিনি না, সবে দু'পা পথে বেরিয়েছি, হঠাৎ দু'জন লোক আমাকে স্যালুট করে বললে, ইসিকিমা কিচিকিচি?—মানে, তুমি কি বিদেশী? আমি বললুম, উচি উচি—মানে হ্যাঁ-হ্যাঁ। লোক দুটো বললে, ওকাকুরা আসাবুরো—মানে আমাদের সঙ্গে এসো।

টেনিদা জানতে চাইল: তারপর?

—তারপর? নিয়ে গেল একটা ফার্স্ট ক্লাস হোটেলে। কত যে কী খাওয়াল সে আর কী বলব। চাউচাউ, ব্যাঙের রোস্ট—আহা, মনে পড়লে এখনও পেটের ভেতর চনচন করে ওঠে। পেট ভরে খাইয়ে-দাইয়ে হাতে দুশো ইয়েন—মানে জাপানী টাকা দিয়ে বললে, দোজিমুরা কাঁচুমাচু—অর্থাৎ কিনা, তোমায় সামান্য কিছু হাত খরচ দিলুম।

টেনিদা বললে, ইস—একবার তো জাপান যেতে হচ্ছে। ও-খাবারগুলো এখানকার চীনে হোটেলে পাওয়া যায়—ই-ই-স্‌!

—যেয়ো। শুধু জাপান? যেই ফ্রান্সে গেছি, অমনি এক ভদ্রলোক বোঁ করে তাঁর মস্ত মোটরটা আমার পাশে থামালেন। বললেন, 'মঁসিয়ো, ভেনেজাভেক মোয়া।'—মানে আমার সঙ্গে আসুন। গাড়িতে তুলে নিয়ে গেলেন তাঁর মস্ত বাড়িতে। তারপর কী যত্ন—কী খাওয়া-দাওয়া। বললেন, 'আ তু দো লাং?' মানে—ফরাসী দেশ দেখবেন? 'ক্রজ্যাত্‌ ব্র্যা মেশাঁ'—মানে আমার গাড়ি করে যত ইচ্ছে ঘুরুন।

আমি বললুম, টেনিদা, ফ্রান্সেও একবার যাওয়া দরকার।

টেনিদা বললে, হুঁ, কাল-পরশুর মধ্যেই বেরিয়ে পড়লেই হয়। সে পরে ভাবা যাবে। কিন্তু মাকুদা, বাংলা দেশে এসে—

মাকুদা শেষ টান মেরে বিড়িটা সামনের একটা ঝোপের মধ্যে ফেলে দিলে! উদাস হয়ে বললে, বাংলা দেশ হচ্ছে এক নম্বরের গেফানজেন—মানে অতিশয় বাজে জায়গা। এক কাপ চা তো দূরের কথা—কেউ একটা বিড়ি পর্যন্ত অফার করে না হে। বিদেশী টুরিস্ট—হনোলুলু থেকে আসছি—আমার দিকে একবার কেউ তাকায় না পর্যন্ত! কাল এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলুম—ট্রামটা কোন্‌ দিকে যাবে। যেই বলেছি 'স্যার'—তিনি এক লাফে সাত হাত সরে গিয়ে

বললেন, 'হবে না বাবা—মাপ করো।' কেন, আমি ভিখিরি নাকি?—মাকুদার চোখ জ্বলতে লাগল: শেম!

আমি আর টেনিদা একসঙ্গে বললুম, শেম—শেম!

মাকুদা তেমনি জ্বলন্ত চোখে বললে, আমি দেশে গিয়ে একটা ভ্রমণকাহিনী লিখব। পৃথিবীর সব ভাষায় সে-বইয়ের অনুবাদ হবে, লাখ লাখ কপি বিক্রি হবে তার। তাতে লেখা থাকবে, বাঙালী অতি নচ্ছার—মানে গেফানজেন, বাংলাদেশ অতি খারাপ—মানে 'ল্য শা বোতে'—মানে ইতিপুরো তাকাহাঁচি—মানে—

এইপর্যন্ত শুনেই আমাদের বাঙালী রক্তে আগুন ধরে গেল। দেশকে অপমান—জাতির নামে অপবাদ! টেনিদা হঠাৎ গর্জন করে বললে, থামুন দাদা, আর বলতে হবে না। বাঙালীর পরিচয় এখনও পাননি।—প্যালা!

—ইয়েস টেনিদা?

—পকেটে হাউ মাচ?

—ছটা টাকা আছে। একটা পড়ার বই কিনব ভেবেছিলুম।

—পড়া? পড়া এখন চুলোয় যাক। জাতির সম্মান বিপন্ন দেখতে পাচ্ছিস না? আমার কাছেও একটা পাঁচ টাকার নোট রয়েছে, কাকিমা তেল-সাবান কিনতে দিয়েছিল। কিন্তু ন্যাশনাল প্রেস্টিজই যদি যায়—কী হবে তেল-সাবান দিয়ে? চল—মাকুদাকে আমরা এনটারটেন করি। সমস্ত বাঙালী জাতির পক্ষ থেকেই।

বইয়ের টাকা দিয়ে মাকুদাকে এনটারটেন করা! বড়দার মুখটা মনে পড়তেই বুকের ভেতরে একবার আঁকুপাঁকু করে উঠল। কিন্তু দেশ এবং জাতির এই দারুণ দুর্দিনে 'কিসের দুঃখ, কিসের দৈন্য, কিসের লজ্জা'—মানে—'আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, মানুষ আমরা, নহি তো মেষ।'

টেনিদা বললে, চলুন মাকুদা—বাঙালীকেও একবার দেখে যান।

কুমড়োর বিচির মতো দাঁত বের করে মাকুদা বললেন, কোথায় দেখব?

—দি গ্রেট আবার-খাবো রেস্টুরেন্টে।

মাকুদা দেখলেন, ভালোই দেখলেন। চারটে কাটলেট, দু' প্লেট মাংস, এক প্লেট পোলাও, এক প্লেট পুডিং। তারপর দু' প্যাকেট ভালো সিগারেট আর তিনটাকা ট্যাক্সি খরচ আমরা ওঁর হাতে তুলে দিলুম। মানে আরও দিতুম, কিন্তু পকেট ততক্ষণে গড়ের মাঠ হয়ে গিয়েছিল।

—এইবার খুশি হয়েছেন মাকুদা?

ট্যাক্সিতে পা দিয়ে মাকুদা বললেন, বিলক্ষণ।

—বাঙালীর কথা লিখবেন তো ভালো করে? আমার আর প্যালারামের কথা?

—সব লিখব, যদি আমার বই কেউ ছাপে।—বলে মাকুদা ট্যাক্সিওয়ালাকে বললে, বাগবাজার—জলদি।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম, আপনার বই ছাপবে না মানে? আপনি একজন ওয়ার্ল্ড টুরিস্ট—

—জীবনে আমি দমদমের ওপারে যাইনি। আমার নাম বেচারাম

গড়গড়ি—বাগবাজারে থাকি। বড্ড খিদে পেয়েছিল—তাই—তা, বেড়ে খাইয়েছ ভাই, থ্যাঙ্ক ইউ, টা টা—

আমাদের নাকের ওপর একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সিটা।

হালখাতার খাওয়াদাওয়া

টেনিদা বললে, মেরে দিয়েছি কেল্লা। চল একটু মিষ্টিমুখ করে আসা যাক।

মিষ্টিমুখ করতে আপত্তি আছে—এমন অপবাদ প্যালারামের শত্রুরাও দিতে পারবে না। তবে টেনিদার সঙ্গে যেতেই আপত্তি আছে একটু। ওর মিষ্টিমুখ মানেই আমার পকেট ফাঁক। টেনিদা যখনই বলেছে, চল প্যালা—বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডার থেকে তোকে জলযোগ করিয়ে আনি—তখনই আমার কমসে-কম পাঁচটি করে টাকা স্রেফ বরবাদ। মানে রাজভোগগুলো ও-ই খেয়েছে—আর আমি বসে বসে দু'একটা যা খেতে চেষ্টা করেছি, থাবা দিয়ে সেগুলো কেড়ে নিয়ে বলেছে, এ-সব ছেলেপুলের খেতে নেই—পেট খারাপ করে।

অতএব গেলাস দুই জল খেয়েই আমায় উঠে আসতে হয়েছে। একেবারে খাঁটি জলযোগ যাকে বলে। তাই টেনিদার প্রস্তাব কানে যেতেই আমি তিন পা পেছিয়ে গেলাম।

বললাম, আমার শরীর ভালো নেই—আমি এখন মামাবাড়ি যাচ্ছি।

টেনিদা খাঁড়ার মতো নাকটাকে খাড়া করে বললে, শরীর ভালো নেই তো মামাবাড়ি যাচ্ছিস কেন? তোর মামা কি ভেটিরিনারি সার্জন যে তোর মতো ছাগলকে পটাৎ পটাৎ করে ইনজেকসন দেবে? বেশি পাকামি করিসনি প্যালা—চল আমার সঙ্গে।

—সত্যি বলছি টেনিদা—

কিন্তু সত্যি-মিথ্যে কিছুই টেনিদা আমায় বলতে দিলে না। আমার পিঠে পনেরো সের ওজনের একটা চাঁটি বসিয়ে বললে, কেন বচ্ছরকার প্রথম দিনটাতে একরাশ মিথ্যে বলছিস প্যালা? কোনও ভাবনা নেই—বুঝলি? তোর এক পয়সাও খরচ নেই—সব পরস্মৈপদী।

—পরস্মৈপদী? কে খাওয়াবে? আমাদের মতো অপোগণ্ডকে খাওয়াবার জন্য কার মাথা ব্যথা পড়েছে?

টেনিদা বললে, তোর মগজে আগে গোবর ছিল, এখন একেবারে নিটোল ঘুঁটে। ওরে গর্দভ, আজ যে হালখাতা। দোকানে গেলেই খাওয়াবে।

—কিন্তু আমাদের খাওয়াবে কেন? নেমন্তন্ন করেনি তো?

—সেই ব্যবস্থাই তো করেছি। টেনিদা হেঁ-হেঁ করে হেসে বললে, এই দ্যাখ—বলেই পকেট থেকে বের করলে একগাদা লাল-নীল হালখাতার চিঠি।

—এ-সব তুমি পেলে কোথায়?

—আরে আমার চিঠি নাকি? সব কুট্টিমামার।

—কুট্টিমামা!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—সেই-যে গজগোবিন্দ হালদার? তোকে বলিনি? সেই-যে ভালুকের নাকে টিকের আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিল। সেই কুট্টিমামার অনেক এসেছে। তাই থেকেই কয়েকটা হাতসাফাই করেছি আমি। বিশেষ করে এইটে—

বলে একটা লাল রঙের চিঠি এগিয়ে দিলে। তাতে 'নতুন খাতা মহরত-টহরত' এইসব বাঁধা গতের তলায় কালি দিয়ে লেখা আছে: প্রিয় গজগোবিন্দবাবু, অবশ্য আসিবেন। মাংস, পোলাও, দই, রসগোল্লার বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। ইতি আপনাদের চন্দ্রকান্ত চাকলাদর—প্রোপাইটার, নাসিকামোহন নস্য কোম্পানি।

টেনিদার চোখ চকচক করে উঠল: দেখছিস তো খ্যাঁটের ব্যবস্থাখানা? এমন সুযোগ ছাড়তে নেই। তবে একা খেয়ে সুবিধে হবে না, তাই তোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইছি।

—কিন্তু টেনিদা—

টেনিদা মুখটাকে গণ্ডারের মতো করে বললে, আবার কিন্তু কী রে? পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেয়ে খেয়ে তুই দেখছি একটা পটোলের দোলমা হয়ে গেছিস। মাংস-পোলাও খেতে পাবি তাতে অত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন?

—আমি বলছিলাম হালখাতায় গেলে নাকি টাকা-ফাকা দিতে হয়—

—না দিলেই হল! দোকানদারেরা এ-সময় ভারি জব্দ থাকে—জানিস তো? যত টাকাই পাওনা থাক না কেন—মুখ ফুটে চাইতে পারে না। যত খুশি খেয়ে আয়, হাসিমুখে বলবে, আর দুটো মিহিদানা দেব স্যার? চল প্যালা—এমন মওকা ছাড়তে নেই!

ভেবে দেখলাম, ছাড়া উচিতও নয়। আমি টেনিদার সঙ্গই নিলাম।

প্রথম দু'-একটা জায়গায় খুচরো খাওয়া-দাওয়া হল।

এক গ্লাস ঘোলের শরবত—দুটো-একটা মিষ্টি—এই সব। দোকানদারেরা অবশ্য আড় চোখে টাকার থালার দিকে তাকিয়ে দেখছিল আমরা কী দিই। আমরা ও-সবে ভ্রূক্ষেপ না করে নিজেদের কাজ ম্যানেজ করে গেলাম, অর্থাৎ যতটা পারা যায় রসগোল্লা, ঘোলের শরবত, ডাবের জল এ-সব সেঁটে নিলাম। এক-আধজন বেশ ব্যাজার হল, একজনের গলা তো স্পষ্টই শোনা গেল: দু'শো সাতাশ টাকা বাকি—গজগোবিন্দবাবু একটা পয়সা ছোঁয়ালেন না—আবার দুটো ছোকরা এসে তিন টাকার খাবার সাবড়ে গেল!—ও-সব তুচ্ছ কথায় আমরা কান দিলাম না—দেওয়ার দরকারই বোধ হল না। উপরন্তু দু'জনে চারটে করে পান নিয়ে নেমে এলাম রাস্তায়।

আমি টেনিদাকে বললাম, এ-সব ঘোল-ফোল খেয়ে পেট ভরিয়ে লাভ কী?

তোমার সেই নাসিকামোহন নস্য কোম্পানিতেই চলো না।—বলতে-বলতে আমার নোলায় প্রায় আধ সের জল এসে গেল : পোলাওটা যদি ঠাণ্ডা হয়ে যায়, তাহলে খেতে জুত লাগবে না। তা ছাড়া বেশি দেরি হলে মাংসও আর থাকবে না—কেবল খানকয়েক পাঁঠার হাড় পড়ে থাকবে।

টেনিদা বললে, আঃ—এই পেটুকটা দেখছি জ্বালিয়ে খেল! এইসব টুকটাক খেয়ে খিদেটা একটু জমিয়ে নিচ্ছি, তা এটার কিছুতেই আর তর সইছে না।

—মানে আমি বলছিলাম, যদি ফুরিয়ে-টুরিয়ে যায়—

—হুঁ, সেও একটা কথা বটে।—টেনিদা নাক চুলকে বললে, আচ্ছা চল—যাওয়া যাক—

ঠিকানা বাগবাজারের। তাও কি এক গলির মধ্যে। অনেক খুঁজে খুঁজে বের করতে হল।

এই নাকি নাসিকামোহন নস্য কোম্পানি! দেখে কেমন যেন খটকা লেগে গেল। একটু পুরনো একতলা ঘর। ভেতরে মিটমিট করে আলো জ্বলছে। বাইরে একটা সাইনবোর্ড—তাতে প্রকাণ্ড নাকওলা লোক এক জালা নস্যি টানছে এমনি একটা ছবি। সাইনবোর্ডটা কেমন কাত হয়ে ঝুলছে। এরাই খাওয়াবে মাংসপোলাও!

বললাম, টেনিদা—পোলাও-টোলাওয়ের গন্ধ তো পাচ্ছি না!

টেনিদা বললে, আছে—সব আছে। চল—ভেতরে যাই।

ঘুরে ঢুকে দেখি একটা ময়লা চাদর পাতা তক্তপোশে দুটো ষণ্ডামতন লোক কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে আছে। পাশে একটা কাচ ভাঙা আলমারি—তাতে গোটা কয়েক শিশি-বোতল। আর কিচ্ছু নেই।

আমরা কী রকম ঘাবড়ে গেলাম। জায়গা ভুল করিনি তো। কিন্তু তাই বা কী করে। বাইরে স্পষ্টই সাইনবোর্ড ঝুলছে। ওই তো আলমারির গায়ে সাঁটা এক টুকরো কাগজে লেখা রয়েছে : নাসিকামোহন নস্য কোম্পানি—প্রোঃ চন্দ্রকান্ত চাকলাদার।

আমাদের দেখেই একটা লোক বাঘাটে গলায় বললে, কী চাই?

সঙ্গে-সঙ্গে আমি প্রায় দরজার বাইরে। টেনিদা ঢোক গিলে বললে, আমরা হালখাতার নেমন্তন্ন পেয়ে আসছি।

—হালখাতার নেমন্তন্ন!—লোকটা তেমনি বাঘা গলায় কী বলতে যাচ্ছিল, দু-নম্বর তাকে থামিয়ে দিলে।

বললে, কে পাঠিয়েছে তোমাদের?

ব্যাপারটা কী রকম গোলমেলে মনে হল। আমি ভাবছিলাম কেটে পড়া উচিত, কিন্তু টেনিদা হাল ছাড়ল না। পকেট থেকে সেই চিঠিটা বের করে বলল, এই তো—মামা আমাদের পাঠিয়েছেন। মামা—মানে গজগোবিন্দ হালদার—

—গজগোবিন্দ হালদার?—প্রথম লোকটা এবারে ঝাঁটা গোঁফের পাশ দিয়ে মিটিমিটি হাসল : ওহো—তাই বলো। আগে বললেই বুঝতে পারতাম। আমাদের

এখানে আজ স্পেশ্যাল ব্যবস্থা কিনা—তাই বেছে বেছে মাত্র জন জনকয়েককে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। তা গজগোবিন্দবাবু কোথায়? তিনি যে বড় এলেন না?

—তিনি একটু জরুরি কাজে আসানসোলে গেছেন—টেনিদা পটাং করে মিথ্যে কথা বলে দিলে : তাই আমাদের এখানে আসতে বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

শুনে প্রথম লোকটা দ্বিতীয় লোকটার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। তারপরে তেমনি হাসি-হাসি মুখে বললে, তা তোমরা এসেছ—তাতেও হবে। এসো—এসো—

লোকটা উঠে দাঁড়াল।

—ভেতরের ঘরে। সেখানেই বিরিয়ানি পোলাও আর মোগলাই কালিয়ার ব্যবস্থা হয়েছে কিনা। এসো—চলে এসো—নইলে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

টেনিদা বললে, আয় প্যালা—

আসতে বলার দরকার ছিল না। তার অনেক আগেই এসে পড়েছি আমি। জিবের ডগাটা সুড়সুড় করে উঠছে! শরবত-টরবতগুলো এতক্ষণ পেটের মধ্যেই ছিল—হঠাৎ সেগুলো হজম হয়ে গিয়ে খিদেয় নাড়ি-ভুঁড়ি চুঁই চুঁই করতে লাগল।

সেই লোকটার পেছনে পেছনে আমরা এগিয়ে চললাম। একটা অন্ধকার বারান্দা—তারপরে আর-একটা ঘর। তার মধ্যেও আলো নেই। লোকটা বললে, ঢুকে পড়ো এখানে।

—অন্ধকার যে!—টেনিদার গলায় সন্দেহের সুর। আমারও কী রকম যেন বেয়াড়া লাগল। যে-ঘরে পোলাও কালিয়া থাকে সে-ঘর অন্ধকার থাকবে কেন? পোলাওয়ের জলুসেই আলো হয়ে থাকবার কথা।

লোকটা বললে, ঢোকো না—আলো জ্বেলে দিচ্ছি। টেনিদা ঢুকল, পেছন পেছন আমিও। আর যেই ঢুকেছি—অমনি পটাং করে লোকটা দরজা বন্ধ করে দিলে!

—একী —একী—দোর বন্ধ করছেন কেন? দরজার ওপাশ থেকে সেই লোকটার পৈশাচিক অট্টহাসি শোনা গেল : পোলাও-কালিয়া খাওয়াব বলে।

শেকল আটকে দিলেন কেন?—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : ঘরে তো পোলাও-কালিয়া কিছু নেই। এ যে কয়লার ঘর মনে হচ্ছে! ঘুঁটের গন্ধ আসছে—

লোকটা আবার বাজখাঁই গলায় বললে, ঘুঁটের গন্ধ! শুধু ঘুঁটের গন্ধেই পার পেয়ে যাবে ভেবেছ? এর পরে তিনটি বাছা-বাছা গুণ্ডা আসবে—দেবে রাম ঠ্যাঙানি—যাকে বলে আড়ং-ধোলাই! প্রাণ খুলে পোলাও-কালিয়া খাবে!

শুনে আমার হাত-পা সোজা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল! আমি ধপাস করে সেই অন্ধকার কয়লার ঘরের মেজেতেই বসে পড়লাম। নাকমুখের ওপর দিয়ে ফুড়ুক-ফুড়ুক করে গোটাচারেক আরশোলা উড়ে গেল!

টেনিদা কাঁপতে-কাঁপতে বললে, আমাদের সঙ্গে এ-রসিকতা কেন স্যার? আমরা কী করেছি?

—কী করেছ?—লোকটা সিংহনাদ ছাড়ল : তোমরা—মানে, তোমার মামা

গজগোবিন্দ আমাদের কোম্পানি থেকে তিনশো তিপান্ন টাকার নস্যি কিনেছ তিন বছর ধরে—সব বাকিতে। একটা পয়সা ছোঁয়ায়নি। তারপর আর এ-পাড়া সে মাড়ায়নি।

—আর আমাদের কোম্পানি তারই জন্যে লাল বাতি জ্বেলেছে। আজ তাকে ঠ্যাঙাবার জন্যেই পোলাও-মাংসের টোপ ফেলেছিলাম। সে আসেনি—তোমরা এসেছ। টাকা তো পাবই না—কিন্তু তোমাদের রাম ঠ্যাঙানি দিয়ে যতটা পারি—সুখ করে নেব। একটু দাঁড়াও—গুণ্ডারা এল বলে—

টেনিদা হাঁউমাউ করে উঠল : দোহাই স্যার—আমাদের ছেড়ে দিন স্যার! আমরা নেহাত নাবালক, নস্যি-টস্যির ধার ধারিনে—আমাদের ছেড়ে দিন—

কিন্তু লোকটার আর সাড়া পাওয়া গেল না। দরজায় শেকল দিয়ে বেমালুম সরে পড়েছে। গুণ্ডা ডাকতেই গেছে খুব সম্ভব।

আমার [illegible] জাবের পিলেতে গুর গুরু করে শব্দ হচ্ছে। বুকের ভেতর ঠাণ্ডা হিম। চোখের সামনে [illegible] পটোল-ধুঁদুল-কাঁচকলা এই সব দেখতে পাচ্ছি! হালখাতার পোলাও খেতে গিয়ে পটলডাঙার প্যালারামের এবার পটল তোলবার জো!

টেনিদা বললে, প্যালা রে—মেরে ফেলবে যে! গলা দিয়ে কেবল কুঁই-কুঁই করে খানিকটা আওয়াজ বেরুল!

—ওরে বাবা—পায়ের ওপর দিয়ে ছুঁচো দৌড়চ্ছে!

—এর পরে লাঠি দৌড়বে—অনেক কষ্টে আমি বলতে পারলাম।

টেনিদা দরজাটার ওপর দুম দুম করে লাথি ছুড়তে লাগল : দোহাই স্যার—ছেড়ে দিন স্যার—আমরা কিছু জানিনে স্যার—আমরা নেহাত নাবালক স্যার—

কটাং। আমার কপালে কিসে ঠোকর মারল। তারপরেই কী একটা প্রাণী নাকের ওপর একটা নোংরা পাখার ঘা দিয়ে উড়ে গেল! নির্ঘাত চামচিকে!

—বাপরে—বলে আমি লাফ মারলাম। এক লাফে একটা জানালার কাছে! আর সঙ্গে সঙ্গেই আবিষ্কার করলাম, জানালার দুটো গরাদ ভাঙা! অর্থাৎ গেলে বেরিয়ে যাওয়া যায়।

টেনিদা তখনও প্রাণপণে ধাক্কাচ্ছে! বললাম, টেনিদা, এখানে একটা ভাঙা জানালা।

—কই কোথায়?

—এই তো—বলেই আমি জানালা দিয়ে দু'নম্বর লাফ! আর সঙ্গে সঙ্গে—একেবারে ডাস্টবিনে রাজ্যের দুর্গন্ধ আবর্জনার ভেতর।

টেনিদাও আমার ঘাড়ের ওপরে এসে পড়ল পর মুহূর্তেই! আর তক্ষুনি উলটে গেল ডাস্টবিন! আমাদের গায়ে মাথায় পৃথিবীর সব রকম পচা আর নোংরা জিনিস একেবারে মাখামাখি! হালখাতার খাওয়া-দাওয়াই বটে! অন্নপ্রাশন থেকে শুরু করে যা কিছু খেয়েছিলাম—সব ঠেলে বেরিয়ে আসছে গলা দিয়ে!

কিন্তু বমি করারও সময় নেই আর। পেছনে একটা কুকুর তাড়া করেছে—কা'রা যেন বললে, চোর—চোর। সর্বাঙ্গে সেই পচা আবর্জনা মেখে প্রাণপণে ছুটতে আরম্ভ করেছি আমরা। সোজা বড় রাস্তার দিকে। সেখান থেকে একেবারে গিয়ে গঙ্গায় নামতে হবে—পুরো দু'ঘণ্টা চান না করলে গায়ের গন্ধ যাওয়ার সম্ভাবনা নেই!

ঘুঁটেপাড়ার সেই ম্যাচ

চোরবাগান টাইগার ক্লাবের সঙ্গে পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাবের ফুটবল ম্যাচ হয়ে গেল। প্রথমে টাইগার ক্লাব ঝাঁ-ঝাঁ করে আমাদের ছ'টা গোল ঢুকিয়ে দিলে, ওদের সেই ট্যারা ন্যাড়া মিত্তির একাই দিলে পাঁচখানা। আর বাকিটা দিলে আমাদের ব্যাক বলটুদা—সেমসাইডে।

তারপরেই পটলডাঙা থাণ্ডার ক্লাব পর পর ছ'টা গোল দিয়ে দিলে। টেনিদা দুটো, ক্যাবলা তিনটে, দলের সবচেয়ে ছোট্ট আর বিচ্ছু ছেলে কম্বল দিলে একটা। তখন ভারি একটা গোলমাল বেধে গেল, আর খেলাই হল না— রেফারি ফুর্‌র্‌ করে হুইসিল বাজিয়েখেলা শেষ করে দিলেন।

ব্যাপারটা এই :

আমাদের গোলকিপার পাঁচুগোপাল চশমা পরে। সেদিন ভুল করে ওর পিসিমার চশমা চোটে দিয়ে মাঠে নেমে পড়েছে। তারপরে আর কী— একসঙ্গে তিনদিকে তিনটে বল দেখতে পায়, ডাইনের বলটা ঠেকাতে যায় তো বাঁয়েরটা গোল হয়ে যায়। বলটুদা আবার বুদ্ধি করে একটা ব্যাক পাস করেছিল, তাতে করে একটা সেমসাইড!

এখন হল কী, ছ'টা গোল দিয়ে টাইগার ক্লাব কী রকম নার্ভাস হয়ে গেল আনন্দের চোটে ওদের তিনজন খেলোয়াড় অজ্ঞান হয়ে পড়ল, বাকিরা কেবল লাফাতে লাগল, সেই ফাঁকে ছ'টা বল ফেরত গেল ওদের গোলে। তখন সেই ফুর্তির চোট লাগল থাণ্ডার ক্লাবে—আর কে যে কোন্ দলে খেলছে খেয়ালই রইল না। টেনিদা বেমক্কা হাবুল সেনকেই ফাউল করে দিলে, আর ন্যাড়া মিত্তির তখন নিজেদের গোলে বল ঢোকাবার জন্যে মরিয়া—থাণ্ডার ক্লাবের দু'জন তাকে জাপটে ধরে মাঠময় গড়াগড়ি খেতে লাগল। ব্যাপার দেখে রেফারি খেলা বন্ধ করে দিলেন, আর কোত্থেকে একটা চোঙা এনে সমানে ভাঙা গলায় চ্যাঁচাতে লাগলেন ; 'ড্র—ড্র—ড্রন গেম— এক্ষুনি সব মাঠ থেকে কেটে পড়ো, নইলে পুলিশ ডাকব—হুঁ!'

সেদিন সন্ধের পর এই নিয়ে দারুণ আলোচনা চলছিল আমাদের ভেতরে।

হঠাৎ টেনিদা বললে, ছোঃ, বারোটা গোল আবার গোল নাকি ? একবার একাই আমি বত্রিশটা গোল দিয়েছিলুম একটা ম্যাচে।

অ্যাঁ !—চুয়িং গাম চিবুতে চিবুতে ক্যাবলা একটা বিষম খেল।

হাবুল বললে, হ, ফাঁকা গোলপোস্ট পাইলে আমিও বায়ান্নখান গোল দিতে পারি।

—নো স্যার, নো ফাঁকা গোল বিজনেস ! দু'দলে এ ডিভিসন বি ডিভিসনের কমসে কম বারোজন প্লেয়ার ছিল। যা-তা খেলা তো নয়— ঘুঁটেপাড়া ভার্সাস বিচালিগাম।

—খেলাটি কোথায় হয়েছিল ?

—ঘুঁটেপাড়ায়। কী পেলে, ইউসেবিয়ো, মুলার নিয়ে লাফালাফি করিস। জীবনে একটা ম্যাচে কখনও বত্রিশটা গোল দিয়েছে তোদের রিভেরা, জেয়ার জিন্‌হো ? ববি চার্লটন তো আমার কাছে বেবি রে !

—একটা মোক্ষম চাল মারতাছে— বিড়বিড় করে আওড়াল হাবুল সেন।

হাবুলার কপাল ভালো যে টেনিদা সেটা ভালো করে শুনতে পেল না। বললে, কী বললি, মোক্ষদা মাসি ? কী করে জানলি রে ? ওই মোক্ষদা মাসির বাড়িতেই তো আমি গিয়েছিলুম ঘুঁটেপাড়ায়। সেইখানেই তো সেই দারুণ ম্যাচ। কিন্তু মোক্ষদা মাসির খবর তোকে বললে কে ?

আমি জানি— হাবুল পণ্ডিতের মতো হাসল।

ওর ওস্তাদি দেখে আমার রাগ হয়ে গেল। বললুম, বল দেখি ঘুঁটেপাড়া কোথায় ?

—ঘুইট্যাপাড়া আর কোথায় হইব ? গোবরডাঙার কাছেই। গোবর দিয়াই তো ঘুইট্যা হয়।

ইয়াহ ! টেনিদা এত জোরে হাবুলের পিঠ চাপড়ে দিলে যে হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। নাকটাকে জিভেগজার মতো উঁচু করে টেনিদা বললে, প্রায় ধরেছিস। তবে ঠিক গোবরডাঙার কাছে নয়, ওখান থেকে দশ মাইল হেঁটে, দুই মাইল দৌড়ে—

দৌড়তে হয় কেন ?—ক্যাবলা জানতে চাইল।

—হয়, তাই নিয়ম। অত কৈফিয়ত চাসনি বলে দিচ্ছি। ওখানে সবাই দৌড়য়। হল ?

ক্যাবলা বললে, হল। আর পথের বিবরণ দরকার নেই, গল্পটা বলো।

গল্প !—টেনিদা মুখটাকে গাজরের হালুয়ার মতো করে বললে, এমন একটা জলজ্যান্ত সত্যি ঘটনা, আর তুই বলছিস গল্প। শিগগির উইথড্র কর— নইলে এক চড়ে তোর নাক—

আমি বললুম, নাগপুরে উড়ে যাবে।

ক্যাবলা বললে, বুঝেছি। আচ্ছা আমি উইথড্র করলুম। কিন্তু টেনিদা— ইংরেজীতে উচ্চারণ উইথড্র নয়।

আবার পণ্ডিতী ! —টেনিদা গর্জন করল : টেক কেয়ার ক্যাবলা, ফের যদি বিচ্ছিরি একটা কুরুবকের মতো বকবক করবি তো এক্ষুনি একটা পুঁদিচ্চেরি হয়ে যাবে— বলে দিচ্ছি তোকে। যা— শিগগির আট আনার ঝাল-মুড়ি কিনে আন— তোর ফাইন !

আলুভাজা-আলুভাজা মুখ করে ক্যাবলা ফাইন আনতে গেল। ওর দুর্গতিতে আমরা কেউ দুঃখিত হলুম না— বলাই বাহুল্য। সব কথাতেই ক্যাবলা ও-রকম টিকটিকির মতো টিকটিক করে।

বুঝলি— ঝালমুড়ি চিবুতে চিবুতে টেনিদা বলতে লাগল : ছ' দিনের জন্যে তো বেড়াতে গেছি মোক্ষদা মাসির বাড়িতে। মেসোমশাই ব্যবসা করেন আর মাসিমা যা রাঁধেন না, খেলে অজ্ঞান হয়ে যাবি। মাসির রান্না বাটি-চচ্চড়ি একবার খেয়েছিস তো ওখান থেকে নড়তেই চাইবি না—ঘুঁটেপাড়াতেই ঘুঁটের মতো লেপটে থাকবি।

আমার খুব মনের জোর, তাই বাটি-চচ্চড়ি আর ক্ষীরপুলির লোভ কাটিয়েও কলকাতায় ফিরে আসি। সেবারেও গেছি— দুটো দিন একটু ভালোমন্দ খেয়ে আসতে। ভরা শ্রাবণ, থেকে থেকেই ঝুপঝাপ বৃষ্টি। সেদিন সকালে মাসিমা তালের বড়া ভেজে ভেজে তুলছেন আর আমি একটার-পর-একটা খেয়ে যাচ্ছি, এমন সময় ক'টা ছেলে এসে হাজির।

অনেকবার তো ঘুঁটেপাড়ায় যাচ্ছি, ওরা সবাই আমায় চেনে। বললে, 'টেনিবাবু, বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে ছুটে এলুম। আজ বিকেলে শিবতলার মাঠে বিচালিগ্রমের সঙ্গে আমাদের ফুটবল ম্যাচ। ওরা ছ'জন প্লেয়ার কলকাতা থেকে হায়ার করেছে, আমরাও ছ'জন এনেছি। কিন্তু মুশকিল হল, আমাদের এখানকার একজন জাঁদরেল খেলোয়াড় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনাকেই আমাদের উদ্ধার করতে হচ্ছে দাদা।'

জানিস তো, লোকের বিপদে আমার হৃদয় কেমন গলে যায়। তবু একটু কায়দা করে বললুম, 'সব হায়ার-করা ভালো-ভালো প্লেয়ার, ওদের সঙ্গে কি আর আমি খেলতে পারব ? তা ছাড়া এ-বছরে তেমন ফর্ম নেই আমার।' ওরা তো শুনে হেসেই অস্থির।

'কী যে বলেন স্যার, আপনি পটলডাঙার টেনিরাম শর্মা— আপনার ফর্ম তো সব কাজে সব সময়েই থাকে। প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা, হেমেন্দ্রকুমারের জয়ন্ত, শিব্রামের হর্ষবর্ধন—এদের ফর্ম কখনও পড়তে দেখেছেন ?'

আমি হাতজোড় করে প্রণাম করে বললুম, 'ঘনাদা, জয়ন্ত, হর্ষবর্ধনের কথা বললেন না—ওঁরা দেবতা— আমি তো স্রেফ নস্যি। ওঁরা যদি গরুড় পাখি হন, আমি স্রেফ চড়ুই।'

ওরা বললে, 'অত বুঝিনে দাদা, আপনাকে ছাড়ছিনে। আমাদের ধারণা, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল তো তুচ্ছ— আপনি ইচ্ছা করলে বিশ্ব একাদশে খেলতে পারেন। আর আপনি যদি চড়ুই পাখি হন, আমরা তো তা হলে— কী বলে,

মশা।'

আমি বললুম, 'ঘুঁটেপাড়ার মশাকে তুচ্ছ করবেন না মশাই, এক-একটা প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা।'

ওরা হেঁ-হেঁ করে চলে গেল, কিন্তু আমাকে রাজি করিয়েও গেল। আমার ভীষণ ভাবনা হল রে। থাণ্ডার ক্লাবে যা খেলি— তা খেলি, কিন্তু অতগুলো এ-ডিভিসন বি-ডিভিসন খেলোয়াড়ের সামনে। ওরা না হয় আপ করে গেল, কিন্তু আমি দাঁড়াব কী করে?

কিন্তু ফিরিয়েও তো দেওয়া যায় না। আমার নিজের প্রেস্টিজ—পটলডাঙার প্রেস্টিজ সব বিপন্ন! কোন্ দেবতাকে ডাকি ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ মা নেংটীশ্বরীকে মনে পড়ে গেল। আরে সেই নেংটীশ্বরী— আরে সেই যে রে—"কম্বল নিরুদ্দেশ"-এর ব্যাপারে যে-দেবতাটির সঙ্গে আমাদের দেখা হয়ে গিয়েছিল। মনে-মনে বলতে লাগলুম, এ-বিপদে তুমিই দয়া করো মা—গোটা কয়েক নেংটি ইঁদুর পাঠিয়ে দাও তোমার—খেলার সময় ওদের পায়ে কুটুরকুটুর করে কামড়ে দিক। নিদেনপক্ষে পাঠাও সেই "অবকাশরঞ্জিনী" বাদুড়কে— সে ওদের সকলের চাঁদি ঠুকরে বেড়াক।

এ-সব প্রার্থনা-ট্রার্থনা করে— শ-দেড়েক তালের বড়া খেয়ে আবার বেশ একটা তেজ এসে গেল। কেবল মনে হতে লাগল, আজ একটা এসপার-ওসপার হয়ে যাবে। তখন কি জানি, শুনে-শুনে বত্রিশটা গোল দিতে পারব, আমি একাই?

বিকেলে আকাশ জুড়ে কালো-কালো হাতির পালের মতো মেঘ। মনে হল, দুর্দান্ত বৃষ্টি নামবে। তবু মাঠে গিয়ে দেখি বিস্তর লোক জড়ো হয়ে গেছে। এক দল হাঁকছে: 'বিচালিগ্রাম—হিপ হিপ হুররে— আর এক দল সমানে উত্তর চড়াচ্ছে: 'ঘুঁটেপাড়া— হ্যাপ-হ্যাপ-হ্যাররে।'

ক্যাবলা হঠাৎ আঁতকে উঠল— হ্যাপ-হ্যাপ্-হ্যাররে মানে কী? কখনও তো শুনিনি।

—ওটা ঘুঁটেপাড়ার নিজস্ব স্লোগান। ওরা হিপ-হিপ বলছে কিনা, তাই পালটা জবাব। ওরাও যদি হিপ-হিপ করে, তা হলে এরা বলবে না, এদের নকল করছে? ওরা যদি বলত বিচালিগ্রাম জিন্দাবাদ—এরা সঙ্গে সঙ্গে বলত ঘুঁটেপাড়া মুর্দাবাদ।

—অ্যাঁ, মুর্দাবাদ! নিজেদেরই?

—হ্যাঁ, নিজেদেরই। পরের নকল করে অপমান হওয়ার চাইতে মরে যাওয়া ভালো— বুঝলি না?

—বিলক্ষণ! আচ্ছা—বলে যাও।

—এতেই বুঝতে পারছিস, দুটো গ্রামে রেষারেষি কী রকম। দারুণ চিৎকারের মধ্যে তো খেলা শুরু হল। দু'-মিনিটের মধ্যেই বুঝতে পারলুম, বিচালিগ্রামকে এঁটে ওঠা অসম্ভব। এরা ছ'জনেই এ-ডিভিশনের প্লেয়ার এনেছে—খেলায় তাদের আগুন ছোটে। আর ওদের গোলকিপার! সে একবারে ছ'হাত লাফিয়ে ওঠে, তার লম্বা লম্বা হাত বাড়িয়ে বল তো বল, বন্দুকের গুলি অব্দি পাকড়ে নিতে পারে।

ঘুঁটেপাড়ায় মাত্র দু'জন এ-ডিভিটিনের, বাকি চারজনই বি-ডিভিশনের। এ-মার্কা দু'জনও ওদের তুলনায় নিরেস। খেলা শুরু হতে-না-হতেই বল এসে একেবারে ঘুঁটেপাড়ার ব্যাক লাইনে চেপে পড়ল, মাঝ-মাঠও আর পেরোয় না। আর ওদের গোলকিপার শুনিয়ে-শুনিয়ে বলতে লাগল: 'একটা বালিশ আর শতরঞ্চি দাও হে— একটু ঘুমিয়ে নেব।'

আমি আর কী করব— মিড-ফিল্ডে দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়েই আছি। নিতান্তই ঘুঁটেপাড়ার বাকি দশজনই ডিফেন্স লাইনে দাঁড়িয়ে আছে তাই গোল হচ্ছে না— কিন্তু দেখতে-দেখতে ওরা গোটা পাঁচেক কর্নার কিক পেয়ে গেল। আর কতক্ষণ ঠেকাবে!

আমি তখনও মা নেংটিশ্বরীকে ডাকছি তো ডাকছিই। এমন সময় আকাশ ভেঙে ঝমঝম বৃষ্টি। এমন বৃষ্টি যে চারদিক অন্ধকার। কিন্তু পাড়াগেঁয়ে লোক, আর কলকাত্তাই খেলোয়াড়ের গোঁ—খেলা দাপটে চলতে লাগল। বল জলে ভাসছে— ধপাধপ আছাড়—এই ফাঁকেও পর-পর দু'খানা গোল খেয়ে গেল ঘুঁটেপাড়া।— ভাবলুম—যাঃ, হয়ে গেল!'

বিচালিগ্রাম তারস্বরে চিৎকার করছে, হঠাৎ এদিকের লাইন্সম্যান ফ্ল্যাগ ফেলে মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বললে, শিবতলার পুকুরে ভেসেছে রে— মাঠ ভর্তি মাছ।

অ্যাঁ—মাছ!

দেখতে দেখতে যেন ম্যাজিক। গাঁয়ের লোকে বর্ষায় পুকুর-ভাসা মাছ তো ধরেই, কলকাতার ছেলেগুলোও আনন্দে ফেঁপে গেল। রইল খেলা, রইল বিচালিগ্রাম আর ঘুঁটেপাড়ার কম্পিটিশন— তিনশো লোক আর একুশজন খেলোয়াড়, দু'জন লাইন্সম্যান— সবাই কপাকপ মাছ ধরতে লেগে গেল। প্লেয়াররা জার্সি খুলে ফেলে তাতেই টকাটক মাছ তুলতে লাগল। খেলতে আর বয়ে গেছে তাদের।

'এই রে, মস্ত একটা শোলমাছ পাকড়েছি।'

'আরে—একটা বাটামাছের ঝাঁক যাচ্ছে রে।'

'ইস—কী বড়-বড় কই মাইরি! ধর—ধর—'

সে যে একখানা কী কাণ্ড, তোদের আর কী বলব! খেলার মাঠ ছেড়ে ক্রমেই দূরে-দূরে ছড়িয়ে পড়তে লাগল সবাই। শেষে দেখি, মাঠে আমরা দু'জন। আমি আর রেফারি।

রেফারি ওখানকার স্কুলের ড্রিল-মাস্টার। বেজায় মারকুটে, ভীষণ রাগী। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, 'হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছো কী? ইয়ু গো অন প্লেয়িং!'

ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, 'আমি একাই খেলব?'

'ইয়েস— একাই খেলবে। আমি তো খেলা বন্ধ করিনি।'—ধমক দিয়ে রেফারি বললেন, 'খেলো। প্লেয়াররা মাঠ ছেড়ে মাছ ধরতে দৌড়লে খেলা বন্ধ করে দিতে হবে, রেফারিগিরির বইতে এমন কোনও আইন নেই।'

তখন শুরু হল আমার গোল দেবার পালা। একবার করে বল নিয়ে গিয়ে গোল

দিয়ে আসি, আর রেফারি ফুর্র্ করে বাঁশি বাজিয়ে আবার সেন্টারে নিয়ে আসে। এই-ই চলতে লাগল।

ওদের দু'-একজন বোধহয় টের পেয়ে ফেরবার কথা ভাবছিল, এমন সময় মা নেংটীশ্বরীর আর-এক দয়া। মাঠের কাছেই ছিল সারে-সারে তালগাছ। হঠাৎ হু-হু করে ঝোড়ো হাওয়া, আর ঝপাস-ঝপাস্ করে পাকা তাল পড়তে লাগল।

'তাল পড়ছে— তাল পড়ছে—'

যারা ফিরতে যাচ্ছিল, তারা প্রাণপণে ছুটল তাল কুড়োতে।

এর মধ্যে আমি যা গোল দেবার দিয়েছি— মানে গুনে-গুনে বত্রিশটি। আমি গুনছি না, গোল দিতে দিতে আমার মাথা বোঁ-বোঁ করছে, আর ওই ভারি ভেজা বল বারবার সেন্টার থেকে জলের ওপর দিয়ে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছি—চাড্ডিখানা কথা নাকি! একবার বলেছিলুম, 'অনেক তো গোল দিয়েছি স্যার, আর পারছি না—পা ব্যথা করছে।' রেফারি আমায় তেড়ে মারতে এলেন, বিকট মুখ ভেংচে বললেন, 'ইয়ু গো অন গোলিং—আই সে!'

গোলিং আবার ইংরেজী হয় নাকি— ক্যাবলা বলতে যাচ্ছিল, টেনিদা একটা বাঘা ধমক দিয়ে বললে, ইয়ু শাট্ আপ! যে মারকুটে মাস্টার, তার ইংরেজীর ভুল ধরবে কে? আমি গোল দিচ্ছি আর উনি গুনেই যাচ্ছেন, 'থার্টি—থার্টিওয়ান—থার্টিটু—'

'ওরে গোল দিচ্ছে বুঝি—' বলে ওদের সেই গোলকিপারটা দৌড়ে এল। সে যে রকম জাঁদরেল, হয়তো একাই বত্রিশটা গোল ফেরত দিত, আমি আটকাতে পারতুম না— বেদম হয়ে গেছি তখন। কিন্তু রেফারি তক্ষুনি ফাইন্যাল হুইসেল বাজিয়ে দিলেন। দিয়ে বললেন, 'খেলা ফিনিশ।' তারপর আমাকে বললেন, 'এখন যাও— কই মাছ ধরো গে, তাল কুড়োও গে।'

কিন্তু তখন কি আর মাছ, তাল কিছু আছে? খেলা ফিনিশের সঙ্গে তাও ফিনিশ। অতগুলো লোক!

টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল: তখন প্রাণের আনন্দে মাছ ধরে আর তাল কুড়িয়ে বিচালিগ্রাম চিল্লোতে লাগল: থ্রি চিয়ার্স ফর বিচালিগ্রাম, আর ঘুঁটেপাড়া চ্যাঁচাতে লাগল: থ্রি টিয়ার্স ফর ঘুঁটেপাড়া!

টিয়ার্স? মানে চোখের জল?—ক্যাবলা আবার বিস্মিত হল।

হ্যাঁ—টিয়ার্স। পালটা জবাব দিতে হবে না? সে যাক। কিন্তু একটা ম্যাচে একাই বত্রিশটা গোল দিলুম, পেলে-ইউসেবিয়ো-রিভেরা-চার্লটন সব কাত করে দিলুম, কিন্তু একটা কই মাছ, একটা তালও পেলুম না—এ-দুঃখ মরলেও আমার যাবে না রে।—আবার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলল টেনিদা।

টেনিদা আর ইয়েতি

ক্যাবলা বলে, 'ইয়েতি—ইয়েতি। সব বোগাস।'

চ্যাঁ চ্যাঁ করে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল সেন।

'হ, তুই কইলেই বোগাস হইব! হিমালয়ের একটা মঠে ইয়েতির চামড়া রাইখ্যা দিছে জানস তুই?'

'ওটা কোনও বড় বানরের চামড়াও হতে পারে।'—চশমাসুদ্ধ নাকটাকে আরও ওপরে তুলে ক্যাবলা গম্ভীর গলায় জবাব দিলে।

হাবুল বললে, 'অনেক সায়েব তো ইয়েতির কথা লেখছে।'

'কিন্তু কেউই চোখে দেখেনি। যেমন সবাই ভূতের গল্প বলে—অথচ নিজের চোখে ভূত দেখেছে—এমন একটা লোক খুঁজে বের কর দিকি?'

এইবারে আমি কিছু বলতে যাচ্ছিলুম, এমন সময় টেনিদা এসে চাটুজ্যেদের রোয়াকে পৌঁছে গেল। একবার কটমট করে আমাদের তিনজনের দিকে তাকিয়ে মোটা গলায় বললে, 'কী নিয়ে তোরা তক্কো করছিলি র‍্যা?'

আমি বললুম, 'ইয়েতি।'

'অ—ইয়েতি।'—টেনিদা জাঁকিয়ে বসে পড়ল: 'তা তোরা ছেলেমানুষ—ও-সব তোরা কী জানিস? আমাকে জিজ্ঞেস কর।'

হাবুল বললে, 'ইস—কী আমার একখানা ঠাকুর্দা আসছেন রে।'

টেনিদা বললে, 'চোপরাও। গুরুজনকে অচ্ছেদ্দা করবি তো এক চড়ে তোর কান আমি—'

আমি 'ফিল আপ দি গ্যাপ' করে দিলুম: 'কানপুরে পৌঁছে দেব।'

'ইয়া—ইয়া—কারেক্ট।'—বলে টেনিদা এমন জোরে আমার পিঠে থাবড়ে দিলে যে হাড়-পাঁজরাগুলো পর্যন্ত ঝনঝন করে উঠল। তারপর বললে, 'ইয়েতি? সেই যে কী বলে—অ্যাব—অ্যাব—অ্যাবো—'

ক্যাবলা বললে, 'অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান।'

'মরুক গে—ইংরিজীটা বড্ড বাজে—ইয়েতিই ভাল। তোরা বলছিস নেই? আমি নিজের চক্ষে ইয়েতি দেখেছি।'

'তুমি!'—আমি আঁতকে উঠলুম।

'অমন করে চমকালি কেন, শুনি?'—চোখ পাকিয়ে টেনিদা বললে, 'আমি ইয়েতি দেখব না তো তুই দেখবি? সেদিনও পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেতিস, তোর আস্পর্ধা তো কম নয়!'

হাবুল বললে, 'না—না, প্যালা দেখব ক্যান? আমরা ভাবতা ছিলাম—ইয়েতি তো দেখব প্রেমেন মিত্তিরের ঘনাদা—তুমি ওই সব ভ্যাজালে আবার গেলা কবে?'

ঘনাদার নাম শুনে টেনিদা কপালে হাত ঠেকাল: 'ঘনাদা! তিনি তো মহাপুরুষ। ইয়েতি কেন—তার দাদামশাইয়ের সঙ্গেও তিনি চা-বিস্কুট খেতে

পারেন। তাই বলে আমি একটা ইয়েতি দেখতে পাব না, এ-কথার মানে কী ?'

ক্যাবলা বললে, 'তুমিও নিশ্চয় দেখতে পারো—তোমারও অসাধ্য কাজ নেই ! কিন্তু কবে দেখলে, কোথায় দেখলে—'

'শুনতে চাস ?'—কথা কেড়ে নিয়ে টেনিদা বললে, 'তা হলে সামনের ভুজাওলার দোকান থেকে ছ' আনার ঝালমুড়ি নিয়ে আয়—কুইক।'—আর তৎক্ষণাৎ আমার পিঠে একটা বাঘাটে রদ্দা কষিয়ে বললে, 'নিয়ায় না—কুইক !'

রদ্দা খেয়ে আমার পিত্তি চটে গেল। বললুম, 'আমার কাছে পয়সা নেই।'

'তা হলে ক্যাবলাই দে। কুইক।'

রদ্দার ভয়ে ক্যাবলাই পয়সা বের করল। শুধু কুইক নয়, ভেরি কুইক।

ঝালমুড়ি চিবুতে চিবুতে টেনিদা বললে, 'এই গরমের ছুটিতে এক মাস আমি কোথায় ছিলুম বল দিকি ?'

আমি বললুম, 'গোবরডাঙায়। সেখানে পিসিমার বাড়িতে তুমি আম খেতে গিয়েছিলে।'

'ওটা তো তোদের ফাঁকি দেবার জন্যে বলেছি। আমি গিয়েছিলুম হিমালয়ান এক্সপিডিশনে।'

'অ্যাঁ—সৈত্য কইতাছ ?'—হাবুল হাঁ করল।

'আমি কখনও মিথ্যে কথা বলি ?'—টেনিদা গর্জন করল।

'বালাই ষাট—তুমি মিথ্যে বলবে কেন ?'—ক্যাবলা ভালোমানুষের মতো বললে, 'কোথায় গিয়েছিলে ? এভারেস্টে উঠতে ?'

'ছো—ছো—ও তো সবাই উঠছে, ডাল-ভাত হয়ে গেছে ! আর ক'দিন পরে তো স্কুলের ছেলেমেয়েরা এভারেস্টের চুড়োয় বসে পিকনিক করবে। আমি গিয়েছিলুম—আরও উঁচু চুড়োর খোঁজে।'

'আছে নাকি ?'—আমরা তিনজনেই চমকালুম।

'কিছুই বলা যায় না—হিমালয়ের কয়েকটা সাইড তো মেঘে-কুয়াশায় চিরকালের মতো অন্ধকার—এখনও সে-সব জায়গার রহস্যই ভেদ হয়নি। লাস্ট ওয়ারের সময় দু'জন আমেরিকান পাইলট বলেছিল না ? পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরেও তারা পাহাড়ের চুড়ো দেখেছিল একটা—তারপর সে যে কোথায় হারিয়ে গেল—'

'তুমি সেই চুড়ো খুঁজে পেয়েছ টেনিদা ?'—আমি জানতে চাইলুম।

'থাম ইডিয়ট। তা হলে তো কাগজে-কাগজে আমার ছবিই দেখতে পেতিস। আমি কি আর তবে তোদের ওই সিটি কলেজের ক্লাসে বসে থাকতুম, আর প্রক্সি দিতুম ? কবে আমাকে মাথায় তুলে সবাই দিল্লি-টিল্লি নিয়ে যেত—আমি, কী, বলে,—একটা পদ্ম-বিভীষণ হয়ে যেতুম।'

ক্যাবলা বললে, 'উহু, পদ্মবিভূষণ।'

'একই কথা।'—ঝালমুড়ির ঠোঙা শেষ করে টেনিদা বললে, 'চুপ কর—এখন ডিসটার্ব করিসনি। না—নতুন চুড়ো খুঁজে পেলুম না। সেই-যে, কী বলে—পাহাড়ের কী তুষারঝড়—'

ক্যাবলা বললে, 'ব্লিজার্ড।'

'হ্যাঁ, এমন ব্লিজার্ড শুরু হল যে শেরপা-টেরপা সব গেল পালিয়ে। আমি আর কী করি, খুব মন খারাপ করে চলে এলুম কালিম্পঙে। সেখানে কুট্টিমামার ভায়রাভাই হরেকেষ্টবাবু ডাক্তারি করেন, উঠলুম তাঁর ওখানে।'

'তা হলে ইয়েতি দেখলে কোথায় ?'—আমি জানতে চাইলুম : 'সেই ব্লিজার্ডের ভেতর ?'

'উঁহু, কালিম্পঙে।'

'কালিম্পঙে ইয়েতি।'—হাবুল চেঁচিয়ে উঠল : 'চাল মারনের জায়গা পাও নাই ? আমি যাই নাই কালিম্পঙে ? সেইখানে ইয়েতি ? তাইলে তো আমাগো পটলডাঙায়ও ইয়েতি লাইমা আসতে পারে।'

টেনিদা ভীষণ গম্ভীর হয়ে বললে, 'পারে—অসম্ভব নয়।'

'অ্যাঁ।'—আমরা তিনজনে একসঙ্গে খাবি খেলুম।

টেনিদা বলল, 'হাঁ, পারে। ওরা ইনভিজিবল—মানে প্রায়ই অদৃশ্য হয়ে থাকে। তাই লোকে ওদের পায়ের দাগ দেখে, কিন্তু ওদের দেখতে পায় না। যেখানে খুশি ওরা যেতে পারে, যখন খুশি যেতে পারে। আবার ইচ্ছে করলেই রূপ ধরতে পারে—কিন্তু সে-রূপ না দেখলেই ভালো। আমি কালিম্পঙে দেখেছিলুম—আর দেখতে চাই না।'

আমি বললুম, 'কিন্তু ওখানে ইয়েতি এল কী করে ?'

'ইয়েতি কোথায় নেই—কে জানে। হয়তো—এই যে আমরা কথা কইছি—ঠিক এখুনি আমাদের পিছনে একটা অদৃশ্য ইয়েতি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছে।'

আমরা ভীষণ চমকে তিনজনে পিছন ফিরে তাকালুম।

টেনিদা বললে, 'উঁহু, ইচ্ছে করে দেখা না দিলে কিছুতেই দেখতে পাবি না। ও কি এত সহজেই হয় রে বোকার দল ? ওর জন্যে আলাদা কপাল থাকা চাই।'

ক্যাবলা বললে, 'তোমার সেই কপাল আছে বুঝি ?'

হাঁটু থাবড়ে টেনিদা বললে, 'আলবাত।'

হাবুল বললে, 'কালিম্পঙে ইয়েতি দ্যাখলা তুমি ?'

'দেখলুম বইকি।'

ক্যাবলা বললে, 'রেস্তোরাঁয় বসে ইয়েতিটা বুঝি চা খাচ্ছিল ? না কি বেড়াতে গিয়েছিল চিত্রভানুর ওদিকটায় ?'

'ইয়ারকি দিচ্ছিস ?'—বাঘা গলায় টেনিদা বললে, 'ইয়েতি তোর ইয়ারকির পাত্তর ?'

হাবুল বললে, 'ছাড়ান দাও—পোলাপান।'

'পোলাপান ? ওটাকে জলপান করে ফেলা উচিত। ফের যদি কুরুবকের মতো বকবক করবি ক্যাবলা, তা হলে এক ঘুষিতে তোর চশমাসুদ্ধু নাক আমি—'

আমি বললুম, 'নাসিকে উড়িয়ে দেব।'

'ইয়া—একদম কারেক্ট?'—বলে আমার পিঠ চাপড়াতে গিয়ে টেনিদার হাত হাওয়ায় ঘুরে এল—আগেই চট করে সরে গিয়েছিলুম আমি।

ব্যাজার মুখে টেনিদা বললে, 'দুৎ—দরকারের সময় একটা পিঠ পর্যন্ত হাতের কাছে পাওয়া যায় না। রাবিশ।'

হাবুল বললে, 'কিন্তু ইয়েতি।'

'দাঁড়া না ঘোড়াড্ডিম—একটু মুড আনতে দে।'—টেনিদা মুখটাকে ঠিক গাজরের হালুয়ার মতো করে, নাকের ডগাটা খানিক খুচখুচ করে চুলকে নিলে। তারপর বললে, 'হুঁ—ইয়েতির সঙ্গে ইয়ার্কিই বটে। আমিও ইয়েতি নিয়ে একটু ইয়ার্কিই করতে গিয়েছিলুম। তারপরেই বুঝতে পারলুম—আর যেখানে ইচ্ছে চালিয়াতি করো—ওঁর সঙ্গে ফাজলেমি চলে না।'

আমি বললুম, 'চলল না ফাজলেমি?'

'না।'—খুব ভাবুকের মতো একটু চুপ করে থেকে টেনিদা বললে, 'হল কী জানিস, এক্সপিডিশন থেকে ফিরে কালিম্পঙে এসে বেশ রেস্ট নিচ্ছিলুম। আর ডাক্তার হরেকেষ্টবাবুর বাড়িতেও অনেক মুরগি—রোজ সকালে 'কঁকর-কঁকর' করে তারা ঘুম ভাঙাত, আর দুপুরে, রাত্তিরে—কখনও কারি, কখনও কাটলেট, কখনও রোস্ট হয়ে খাবার টেবিলে হাজির হত। বেশ ছিলুম রে—তা ওখানে একদিন এক ফরাসী টুরিস্টের সঙ্গে আলাপ হল। জানিস তো আমি খুব ভালো ফরাসী বলতে পারি—'

ক্যাবলা বললে, 'পারো বুঝি?'

'পারি না? ডি-লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস—ইয়াক ইয়াক—তা হলে কোন ভাষা?'

হাবুল বললে, 'যথার্থ। তুমি কইয়া যাও।'

'লোকটার সঙ্গে তো খুব খাতির হল। এ-সব টুরিস্টদের ব্যাপার কী জানিস তো? সব কিছু সম্পর্কেই ওদের ভীষণ কৌতূহল। ইন্ডিয়ানদের টিকি থাকে কেন—তোমাদের কাকেদের রং এত কালো কেন, তোমাদের দেবতা কি খুব ভয়ানক যে তোমরা 'হরিবল-হরিবল' (মানে হরিবোল আর কি!) চ্যাঁচাও—ইন্ডিয়ান গুবরে পোকা কি পাখিদের মতো গান গাইতে পারে, এ দেশের ছুঁচোরা কি শুয়োরের বংশধর? এই সব নানা কথা জিজ্ঞেস করতে-করতে সে বললে—আচ্ছা মসিয়োঁ, তুমি তো হিমালয়াজে গিয়েছিলে, সেখানে ইয়েতি দেখেছ?

'আমার হঠাৎ লোকটাকে নিয়ে মজা করতে ইচ্ছে হল। তার নাম ছিল লেলেফাঁ। আমি বেশ কায়দা করে তাকে বললুম, তুমি আছ কোথায় হে মসিয়োঁ লেলেফাঁ? ইয়েতি দেখেছি মানে? আমি তো ধরেই এনেছি একটা।'

—'অ্যাঁ, ধরে এনেছ!'—লোকটা তিনবার খাবি খেল: 'কই, আজ পর্যন্ত কেউ তো ধরতে পারেনি!'

আমি লেলেফাঁর বুকে দুটো টোকা দিয়ে বললুম, 'আমি পটলডাঙার টেনি শর্মা—সবাই যা পারে না, আমি তা পারি। আমার বাড়িতেই আছে ইয়েতি।'

—অ্যাঁ!

—হ্যাঁ!

মসিয়োঁ লেলেফাঁ খানিকটা হাঁ করে রইল, তারপর ভেউভেউ করে কাঁদার মতো মুখ করলে, আবার কপ-কপ করে তিনটে খাবি খেল—যেন মশা গিলছে। শেষে একটু সামলে নিলে চোটটা।

—আমায় দেখাবে ইয়েতি?

—কেন দেখাব না?

শুনে এমন লাফাতে লাগল লেলেফাঁ যে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে চিতপাত হয়ে পড়ে গেল। আর একটু হলেই গড়িয়ে হাত তিরিশেক নীচে একটা গর্তে পড়ে যেত, আমি ওর ঠ্যাং ধরে টেনে তুললুম। উঠেই আমাকে দু'হাতে জাপটে ধরল সে আর পাক্কা তিন মিনিট ট্যাঙো ট্যাঙো বলে নাচতে লাগল।

—চলো, এক্ষুনি দেখাবে।

আমি বললুম, 'সে হয় না মসিয়োঁ, যখন তখন তাকে দেখানো যায় না। সে উইকে সাড়ে তিন দিন ঘুমোয়, সাড়ে তিন দিন জেগে থাকে। ঘুমের সময় তাকে ডিস্টার্ব করলে সে এক চড়ে তোমার মুণ্ডু—'

আমি জুড়ে দিলুম, 'কাঠমুণ্ডুতে উড়িয়ে দেবে।'

টেনিদা বললে, 'রাইট। লেলেফাঁকে বললুম—কাল থেকে ইয়েতি ঘুমুচ্ছে। জাগবে, পরশু বারোটার পর। তারপর খেয়েদেয়ে যখন চাঙ্গা হবে—মানে তার মেজাজ বেশ খুশি থাকবে, তখন—মানে পরশু সন্ধের পর তোমাকে ইয়েতি দেখাব।'

লেলেফাঁ বললে, 'আমার ক্যামেরা দিয়ে তার ছবি তুলতে পারব তো?'

—খবরদার, ও কাজটিও কোরো না। ইয়েতিরা ক্যামেরা একদম পছন্দ করে না— চাই কি খ্যাঁচ করে তোমায় কামড়েই দেবে হয়তো। তখন হাইড্রোফোবিয়া হয়ে মারা পড়বে।

—ইয়েতি কামড়ালে হাইড্রোফোবিয়া হয়?

'হাইড্রোফোবিয়া তো ছেলেমানুষ। কালাজ্বর হতে পারে, পালাজ্বর হতে পারে, কলেরা হতে পারে, চাই কি ইন্দ্রলুপ্ত—এমন কি সনন্ত ষণ্ডন্ত প্রত্যয় পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে।'

ক্যাবলা প্রতিবাদ করল: 'সনন্ত ষণ্ডন্ত প্রত্যয় কী করে—'

'ইয়ু শাটাপ ক্যাবলা—সব সময় টিকটিকির মতো টিকিস-টিকিস করবিনি বলে দিচ্ছি। শুনে লেলেফাঁ ফরাসীতে বললে, মি ঘৎ। মানে—হে ঈশ্বর।'

ক্যাবলা বললে, 'ফরাসীরা কি মি ঘৎ বলে নাকি?'

'শাটাপ আই সে!'—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: 'ফের যদি তক্কো করবি, তা হলে এখুনি এক টাকার আলুর চপ আনতে হবে তোকে। যাকে বলে ফাইন।'

ক্যাবলা কুঁকড়ে গেল, বললে, 'মী ঘৎ ! থাক, আর তর্ক করব না, তুমি বলে যাও।'

'তবু তোকে আট আনার আলুর চপ আনতেই হবে। তোর ফাইন। যা—কুইক।'

আমি বললুম, 'হুঁ, ভেরি কুইক।'

বেগুনভাজার চাইতেও বিচ্ছিরি মুখ করে ক্যাবলা চপ নিয়ে এল।

'বেড়ে ভাজে লোকটা'—চপে কামড় দিয়ে টেনিদা বললে, 'যাকে বলে মেফিস্টোফিলিস।'

আমি আকুল হয়ে বললুম, 'কিন্তু ইয়েতি ?'

'ইয়েস—ই য়ে স, ই য়ে তি। বুঝলি, আমার মাথায় তখন একটা প্ল্যান এসে গেছে। বাড়ি গিয়ে হরেকেষ্টবাবুকে বললুম সেটা। কুট্টিমামার ভায়রাভাই তো, খুব রসিক লোক, রাজি হয়ে গেলেন। তারপর ম্যানেজ করলুম কাইলাকে।'

হাবুল বললে, 'কাইলা কেডা ?'

'ও একজন নেপালী ছেলে—আমাদের বয়েসীই হবে। হরেকেষ্টবাবুর ডাক্তারখানায় চাকরি করে। খুব ফুর্তিবাজ সে। বললে, দাজু, রামরো—রামরো। মানে—দাদা, ভালো, খুব ভালো।'

ওদিকে সায়েবের আর সময় কাটে না।

—তোমার ইয়েতি কি এখনও ঘুমুচ্ছে ?

—নাক ডাকাচ্ছে।

—সময়মতো জাগবে তো ?

—সময়মতো মানে ? ঠিক বারোটায় উঠে বসবে। এক সেকেন্ডও লেট হবে না।

যা হোক—দিন তো এল। হরেকেষ্টবাবুর দোতলার হলঘরে আমি একটা কালো পর্দা টাঙালুম। প্ল্যান হল, খুব একটা ডিম লাইট থাকবে—আমি ধীরে ধীরে পর্দা সরিয়ে দেব। ইয়েতিকে দেখা যাবে। মাত্র দু মিনিট কি আড়াই মিনিট। তারপরেই আবার পর্দা ফেলে দেব।

আমি বললুম, 'কিন্তু ইয়েতি—'

'ইয়ু শাটাপ—পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল। আরে, কিসের ইয়েতি ? হরেকেষ্টবাবুর বাড়িতে মস্ত একটা ভালুকের চামড়া ছিল, প্ল্যান করেছিলুম কাইলা সেটা গায়ে পড়বে, আর একটা বিচ্ছিরি নেপালী মুখোশ এঁটে গোটা কয়েক লাফ দেবে—চেঁচিয়ে বলবে—দ্রাম-দ্রুম—ইয়াহু-মিয়াহু। ব্যস—আর দেখতে হবে না, ওতেই মসিয়োঁ লেলেফাঁর দাঁতকপাটি লেগে যাবে।

'সব সেইভাবে ঠিক করা রইল। সায়েব যখন এল, তখন ঘরে একটা মিটমিটে আলো—সামনে একটা কালো পর্দা, তার ওপর আমি কাল থেকে সায়েবকে ইয়েতি সম্পর্কে অনেক ভীষণ ভীষণ গল্প বলছিলুম। বুঝতে পারলুম, ঘরে ঢুকেই তার বুক কাঁপছে।

'মজা দেখবার জন্যে হরেকেষ্ট ছিলেন, তাঁর কম্পাউন্ডার গোলোকবাবুও বসে ছিলেন। বেশ অ্যাটমসফিয়ার তৈরি হয়ে গেলে—ওয়ান-টু-থ্রি বলে আমি পর্দাটা সরিয়ে দিলুম। আর—'

আমরা একসঙ্গে বললুম, 'আর ?'

'এ কী ! এ তো কাইলা নয়। তার ভালুকের চামড়া পড়ে গেছে, মুখোশ ছিটকে গেছে—চিৎপাত অবস্থায় ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে সে ঠায় অজ্ঞান। আর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ছাদ-পর্যন্ত-ছোঁওয়া এক মূর্তি। সে যে কী রকম দেখতে আমি বোঝাতে পারব না। মানুষ নয়, গরিলা নয়—অথচ গায়ে তার কাঁটা-কাঁটা বাদামী রোঁয়া—চোখ দুটো জ্বলছে যেন আগুনের ভাঁটা। তিনটে সিংহের মতো গর্জন করে সে পরিষ্কার বাংলায় বললে, ইয়েতি দেখতে চাও—না ? তবে নকল ইয়েতি দেখবে কেন—আসলকেই দেখো। বলে হাঃ-হাঃ করে ঘর-ফাটানো হাসি হাসল—তিরিশখানা ছোরার মতো ধারালো দাঁত তার ঝলকে উঠল, তারপর চোখের সামনে তার শরীরটা যেন গলে গেল, তৈরি হল একরাশ বাদামী ধোঁয়া—সেটা আবার মিলিয়ে গেল দেখতে-দেখতে। আর আমাদের গায়ের ওপর দিয়ে বয়ে গেল যেন হিমালয়ের সেই ব্লিজার্ডের মতো একটা ঝড়ো হাওয়া, রক্ত জমে গেল আমাদের—বন্ধ দরজার পাল্লা দুটো তার ধাক্কায় ভেঙে দশ হাত দূরে ছিটকে পড়ল। তারপর সেই হাওয়াটা হা-হা করতে করতে শাল আর পাইন বনে ঝাপটা মেরে একেবারে নাথুলার দিকে ছুটে গেল।

'আমি তো পাথর। সায়েব মেঝেতে পড়ে কেবল গিঁ গিঁ করছে। কম্পাউন্ডার অজ্ঞান। হরেকেষ্টবাবু চেয়ারে চোখ উল্টে আছেন, আর বিড়বিড় করে বলছেন—কোরামিন—কোরামিন। সায়েবকে নয়—আমাকে দাও—এখুনি হার্ট ফেল করবে আমার।'

টেনিদা থামল। বললে, 'বুঝলি, এই হচ্ছে আসল ইয়েতি। তাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করতে যাসনি—মারা পড়ে যাবি। আর তাকে কখনও দেখতেও চাসনি—না দেখলেই বরং ভালো থাকবি।'

আমরা থ হয়ে বসে রইলুম খানিকক্ষণ। তারপর ক্যাবলা বললে, 'স্রেফ গুলপট্টি।'

'গুলপট্টি ?'—টেনিদা কটকট করে তাকাল ক্যাবলার দিকে ; 'ওরা অন্তর্যামী। বেশি যে বকবক করছিস, হয়তো এখুনি একটা অদৃশ্য ইয়েতি তার সিংহের মতো থাবা তোর কাঁধের ওপর বাড়িয়ে দিয়ে—'

'ওরে বাবা রে !' এক লাফে রোয়াক থেকে নেমে পড়ে বাড়ির দিকে টেনে দৌড় লাগাল ক্যাবলা।

একাদশীর রাঁচি যাত্রা

টেনিদা বললে, আমার একাদশী পিসেমশাই—

আমি বললুম, একাদশী পিসে ! সে আবার কী রকম ?

—কী রকম আর ? হাড়-কঞ্জুস। খাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে বলে লোকে নাম করে না—একাদশী বলে। কালকে সন্ধেবেলায় তিনি রাঁচি গেলেন।

বললুম, ভালোই করলেন। রাঁচি বেশ জায়গা। হুডরু আছে, জোনা ফলস আছে। আমরা একবার ওখান থেকে নেতার হাট—

বাধা দিয়ে টেনিদা বললে, তুই থাম না—কুরুবক কোথাকার। একটা কথা বলতে গেলেই বকবকানি শুরু করে দিবি। একাদশী পিসে ও-সব হুডরু-জোনা-নেতার হাট কিচ্ছু দেখতে যাননি। তিনি গেছেন কাঁকেতে।

—কাঁকে ?—আমি চমকে বললুম, সেখানে তো—

আমার পিঠে প্রকাণ্ড একটা থাবড়া বসিয়ে টেনিদা বললে, ইয়াহ্‌—এতক্ষণে বুঝেছিস। সেখানে পাগলা-গারদ। তোর নিজের জায়গা কিনা, তাই কাঁকে বলবার সঙ্গে-সঙ্গেই খুশি হয়ে উঠলি !

আমি ব্যাজার মুখে বললুম, মোটেই না, কাঁকে কক্ষনো আমার নিজের জায়গা নয়। বরং বলটুদা বলছিল, তুমি নাকি চিড়িয়াখানার গাবে হাউসে দিন কয়েক থাকার কথা ভাবছ।

—গাবে হাউস ?—খাঁড়ার মতো নাকটাকে আকাশে তুলে টেনিদা বললে, কে বলেছে ? বলটু ? ওই নাট-বলটুটা ?

—হুঁ। সে কাল আমায় আরও জিজ্ঞেস করছিল, কী রে প্যালা তোদের টেনিদার ল্যাজটা ক'ইঞ্চি গজাল ?

টেনিদা খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল। তারপর বললে, অলরাইট। ফুটবলের মাঠে একবার বলটেকে পেলে আমি দেখিয়ে দেব।

আমি ভালোমানুষের মতো বললুম, সে তোমাদের ব্যাপার—তোমরা বুঝবে। কিন্তু একাদশী পিসের কথা কী বলছিলে ?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, থাম—ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিসনি। দিলে মেজাজ চটিয়ে—এখন বলছে একাদশী পিসের কথা বলো। বলব না—ভাগ !

কিন্তু টেনিদার মেজাজ কী করে ঠাণ্ডা করতে হয় সে তো জানি। তক্ষুনি মোড় থেকে এক ঠোঙা তেলেভাজা কিনে আনলুম। আর গরম গরম আলুর চপে কামড় দিয়েই টেনিদা একেবারে জল হয়ে গেল।

—প্যালা, ইউ আর এ গুড বয়।

আমি বললুম, হুঁ।

—এই জন্যেই আমি তোকে এত ভালবাসি।

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

—হাবুল সেন আর ক্যাবলাটার কিচ্ছু হবে না।

আমি বললুম, হবেই না তো। এই গরমের ছুটিতে—আমাদের ফেলে—একটা গেল মামাবাড়িতে আম খেতে, আর একটা মা-বাবার সঙ্গে বেড়াতে গেল শিলঙে। বিশ্বাসঘাতক।

টেনিদা বেগুনি চিবুতে-চিবুতে বললে, বল—ট্রেটর। ওতে জোর বেশি হয়।

বললুম, মরুক গে, ওদের কথা ছাড়ো। কিন্তু তোমার সেই একাদশী পিসে—

—ইয়েস—একাদশী পিসে। টেনিদা বললে, তাঁর কথাই বলতে যাচ্ছিলুম তোকে। আমার ঠিক রিয়েল পিসে নন—মা-র যেন কী রকম খুড়তুতো দাদামশাইয়ের মাসতুতো ভাইয়ের মামাতো শ্বশুরের—

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, থাক, এতেই হবে। মানে তিনি তোমার পিসেমশাই—এই তো ?

—হাঁ, পিসেমশাই। বাঁকুড়ায় উকিল। খুব পশার—বুঝলি ? বাড়ি—গাড়ি, বিস্তর টাকা। এক ছেলে পঞ্জাবে ইঞ্জিনিয়ার, আর এক ছেলে যেন কোথায় প্রফেসারি করে। মানে এত পয়সাকড়ি যে এখন পিসে ইচ্ছা করলে সব ছেড়ে বসে বসে গড়গড়া টানতে পারেন। কিন্তু ওসবে একাদশী পিসের সুখ নেই। খালি টাকা টাকা—টাকা। কিন্তু তার একটা পয়সা খরচ করতে হলে তাঁর পাঁজরা ভেঙে যায়।

—কী করেন তা হলে টাকা দিয়ে ?

—কেন, ব্যাঙ্কে জমান। একটা কানাকড়িও তোলেন না তা থেকে। বলেন—গুরুর আদেশ। গুরু নাকি বলে দিয়েছেন ব্যাঙ্কের জমানো টাকা কখনও তুলতে নেই, তাতে পাপ হয়।

—সত্যিই ওঁর গুরু আছে নাকি ?

—ঘোড়ার ডিম, সব বানানো। ওঁদের কে এক কুলগুরু নাকি একবার কিছু প্রণামীর আশায় ওঁর বাড়িতে এসেছিলেন—একাদশী পিসে মোটা একখানা আইনের বই নিয়ে তাঁকে এমন তাড়া লাগালেন যে গুরুদেব এক ছুটে বাঁকুড়ার বর্ডার পেরিয়ে একেবারে মানভূম—মানে পুরুলিয়া ডিসট্রিক্টে চলে গেলেন।

—ডেনজারাস !

—ডেনজারাস বলে ডেনজারাস। বাড়িতে লোকজন টেকে না—ঝি-চাকর আসে, কিন্তু মোটা মোটা চালের আধপেটা ভাত, আধপোড়া দু-একখানা রুটি, খোসাসুদ্ধু কড়াইয়ের দাল আর ডাঁটার চচ্চড়ি দিন তিনেক খেয়েই তারা বাপ-রে—মা-রে বলে ছুটে পালায়। যাওয়ার আগে যদি মাইনে চায়, একাদশী পিসে বলেন, 'মাইনে। চুক্তি ভঙ্গের দায়ে এক্ষুনি তোদের নামে এক নম্বর ঠুকে দেব।'

পিসেমশাইয়ের বাড়িতে গোরু আছে, দুধও হয়—কিন্তু দুধ পিসেমশাই কাউকে খেতে দেন না—বলেন, 'ও তো শিশুর খাদ্য।' দুধ তিনি বিক্রি করেন। ঘি ? আরে রামো—কোন ভদ্রলোকে ঘি খায় ? এক সের তেলে তাঁর বাড়িতে ছ'মাস

রান্না হয়। মাংস ? পিসে বলেন, 'ছিঃ জীবহিংসা করতে নেই।'

আমি জিজ্ঞেস করলুম, পরের বাড়িতে গিয়ে তিনি মাংস খান না ?

—খাবেন না কেন ? পেলেই খান। কিন্তু জীব-হিংসের পাপ তো অন্যের। পিসের কী দোষ ?

—আর মাছ ?

—হুঁ, মাছ একটু অবিশ্যি না হলে তাঁর খাওয়া হয় না। দুটো ছোট-ছোট শিঙিমাছ আনলে তাঁর মাসখানেক চলে যায়।

—সে কী !

টেনিদা মিটমিট করে হাসল : বুঝতে পারছিস না ? মাছ দুটোকে হাঁড়িতে জীইয়ে রাখা হয়। আর রোজ সকালে পিসেমশাই একখানা দাড়ি কামানোর ব্লেড দিয়ে সেই মাছদের ল্যাজ থেকে—এই মনে কর—আধ ইঞ্চির কুড়ি ভাগের এক ভাগ কেটে নেন।

আমি একটা বিষম খেলুম : কত বললে ?

—আধ ইঞ্চির কুড়ি ভাগের এক ভাগ।

—কাটতে পারে কেউ ? ইমপসিবল !

—তুই ইমপসিবল বললেই হবে ? যে-লোক ও-ভাবে পয়সা জমাতে পারে সে সব পারে। এমন ভাবে কাটেন যে মাছ দুটো টেরও পায় না—পরদিন সে ল্যাজ আবার গজিয়ে যায়। আর সেই ল্যাজের কাটা টুকরোটা দিয়ে এক বাটি ঝোল রান্না করে খান একাদশী পিসে—বলেন, 'শিঙিমাছের ঝোল খুব বলকারক।'

আমি বললুম, তাতে আর সন্দেহ কী ! কিন্তু মাছ দু'টো মরে গেলে ?

—বাড়িতে বিরাট ভোজ। সবাই সেদিন ঝোলে আঁশটে গন্ধ পায়। তারপর সাত দিন আর মাছ আসে না। পিসে বলেন—এত মাছ খাওয়া হয়েছে, এগুলো আগে হজম হোক।

—তা এখন পিসে হঠাৎ কাঁকে গেলেন কেন ?

—আরে যেতে কি আর চেয়েছিলেন ? তাঁকে যেতে হল। সেই কথাই বলি।...

এখন হয়েছে কী জানিস ? সারা জীবন ওই কড়াইয়ের দাল আর ডাঁটা চচ্চড়ি খেতে-খেতে শেষকালে পিসিমা গেলেন দারুণ চটে। —ওদিকে টাকায় শেওলা জমে গেল, এদিকে আমরা না খেয়ে মরি ! বিদ্রোহ করলেন পিসিমা।

—বিদ্রোহ !

—তা ছাড়া আর কী। সামনা-সামনি কিচ্ছু বললেন না, কিন্তু চমৎকার প্ল্যান আঁটিলেন একটা। পিসে তো কড়াইয়ের দাল, চচ্চড়ি আর তাঁর সেই 'মাছ' খেয়ে নিয়মিত কোর্টে চলে যান। আর পিসিমা কী করেন ? তক্ষুনি চাকরকে বাজারে পাঠান—গলদা চিংড়ি, ইলিশ, মাছ, পাকা পোনা, ভাল মাংস, ডিম এইসব আনান। সেগুলো তখন রান্না হয়, পিসিমা খান, ঝি-চাকর খায়—বাড়িতে যে-দুটো মড়াখেকো বেড়াল ছিল তারা দেখতে-দেখতে তেল-তাগড়া হয়ে যায়।

আমি বললুম, এ কিন্তু পিসিমার অন্যায় ! পিসেকে ফাঁকি দিয়ে—

টেনিদা রেগে বললে, কিসের অন্যায় ? পিসে যদি কাঁড়ি-কাঁড়ি টাকা রোজগার করেও না খেয়ে শিঁটকে হয়ে থাকেন—সে তাঁর খুশি। তাই বলে পিসিমা কষ্ট পেতে যাবেন কেন ? আর অনেক দিনই ডাঁটা-চচ্চড়ি চিবিয়েছেন, চিবুতে-চিবুতে দাঁতই পড়ে গেছে গোটাকয়েক, শেষ বয়সে ইচ্ছে হবে না একটু ভালোমন্দ খাবার ?

—তা বটে।

—এইভাবেই বেশ চলে যাচ্ছিল। পিসেমশাই কিছুই টের পেতেন না। কেবল মধ্যে-মধ্যে বেড়াল দুটোর দিকে তাকিয়ে তাঁর মনে একটা কুটিল সন্দেহ দেখা দিত। পিসিমাকে জিজ্ঞেস করতেন, 'বেড়াল দুটো কী খাচ্ছে-টাচ্ছে বলো তো ? এত মোটা হচ্ছে কেন ?' পিসিমা ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলতেন, 'ওরা আজকাল খুব ইঁদুর মারছে—তাই।' 'ওঃ—ইঁদুর মারছে।' শুনে পিসেমশাই খুব খুশি হতেন, বলতেন, 'ইঁদুর মারা খুব ভালো, ও ব্যাটারা ধান-চাল, কলাই-টলাই খেয়ে ভারি লোকসান করে।'

সবই তো ভালো চলছিল, কিন্তু সেদিন হঠাৎ—

আমি জিজ্ঞেস করলুম, হঠাৎ ?

—পিসেমশাই কোর্টে গিয়ে দেখলেন—কে মারা গেছেন, কোর্ট বন্ধ। একটু গল্প-গুজব করে, পরের পয়সায় দু'-একটা পান-টান খেয়ে বেলা বারোটা নাগাদ হঠাৎ বাড়ি ফিরলেন তিনি। ফিরেই তিনি স্তম্ভিত। এ কী ! সারা বাড়ি যে মাছের কালিয়ার গন্ধে ম-ম করছে। মাছের মুড়ো দিয়ে সোনামুগের ডালের সুবাসে বাতাস ভরে গেছে যে ! এ তিনি কোথায় এলেন—কার বাড়িতে এলেন ! জেগে আছেন, না স্বপ্ন দেখছেন।

দরজায় গাড়ি থামার শব্দে ওদিকে তো পিসিমার হাত-পা পেটের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল। কিন্তু পিসিমা দারুণ চালাক আর মাথাও খুব ঠাণ্ডা। তিনি এক গাল হেসে বললেন, 'এসো। এসো। তুমি যাওয়ার পরেই তোমার এক মক্কেল—কী নাম ভুলে গেছি—প্রকাণ্ড একটা রুইমাছ, ভালো সোনামুগের ডাল আর ফুলকপি পাঠিয়ে দিয়েছে। তাই রান্না করছিলুম।'

'অ—মক্কেল।'—পিসেমশাই একটু আশ্বস্ত হলেন কিন্তু তারপরেই আঁতকে উঠে বললেন, 'কিন্তু তেল, ঘি ? মশলা-পাতি ?'

'সব সে পাঠিয়ে দিয়েছিল।'

'তাই নাকি ? তাই নাকি ? তা হলে খুব ভালো'—পিসেমশাইয়ের বোঁচা গোঁফের ফাঁকে একটু হাসি দেখা দিল : 'আমি ভাবতুম, মক্কেলগুলো সব বে-আক্কেলে—এর দেখছি একটু বুদ্ধি-বিবেচনা আছে। তা কোথাকার মক্কেল বললে ? কী নাম ?'

'নাম তো ভুলে গেছি।'—পিসিমা বুদ্ধি খাটিয়ে বললেন, 'বোধহয় সোনামুখীর কোনও লোক।' তিনি জানতেন সোনামুখীতে পিসের কিছু মক্কেল আছে।

'সোনামুখী ?'—ভুরু কুঁচকে ভাবতে লাগলেন পিসে।

পিসি বললেন, 'হয়েছে—হয়েছে, এখন তোমায় আর অত আকাশ-পাতাল ভাবতে হবে না। কত লোকের মামলা জিতিয়ে দিয়েছ, কে খুশি হয়ে দিয়ে গেছে, ও নিয়ে মাথা ঘামালে চলে ? এখন এসো—মুড়িঘণ্টের ডাল আর মাছের কালিয়া দিয়ে দুটো ভাত খাও।'

বাড়ি গন্ধে ভরাট—তাতে মাথা খারাপ হয়ে যায়—পিসেমশাইয়ের পেটও চুঁই চুঁই করছিল। তবু একটু মাথাটা চুলকে বললেন, 'বামুনের ছেলে, এক সূর্যিতে দু'বার ভাত খাব ?'

'ভাত না খেলে। মাছই খাও একটু।'

'তা হলে ভাতও দাও দুটো। শুধু মাছে কি আর—' পিসে ভেবে-টেবে বললেন, 'আর মক্কেলই তো খাওয়াচ্ছে—ওতে দোষ হবে না বোধহয়।'

পিসিমা বললেন, 'না—কোনও দোষ হবে না।'

অগত্যা পিসে বসে গেলেন। কিন্তু ডাল থেকে মুড়ো তুলে মুখে দিয়েই—হঠাৎ একটা আর্তনাদ করলেন তিনি।

'এ যে যজ্ঞির রান্না।'

পিসিমা বললেন, 'পরের পয়সায় তো।'

'কিন্তু কয়লা পুড়ল যে !'

পিসিমা বললেন, 'কয়লা তো পোড়াইনি। চাকর দিয়ে শুকনো ডাল-পালা কুড়িয়ে আনিয়েছি।'

'কিন্তু—কিন্তু—হাঁড়ি-ডেকচিগুলো ?'—বুকফাটা চিৎকার করলেন পিসেমশাই।

'সেগুলো আগুনে পুড়ল না এতক্ষণ ? ক্ষতি হল না তাতে ? তারপর মাজতে হবে না ? আরও ক্ষয়ে যাবে না সে-জন্যে ?'—বলতে বলতে পিসেমশাই ডুকরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন : 'গেল—আমার এত টাকার হাঁড়ি-ডেকচি ক্ষয়ে গেল—' আর কাঁদতে-কাঁদতে ঠাস করে পড়ে গেলেন। পড়েই অজ্ঞান।

জ্ঞান হল বারো ঘণ্টা পরে। চোখ লাল—খালি ভুল বকছেন। থেকে-থেকে কঁকিয়ে কেঁদে উঠছেন : 'গেল—গেল—আমার হাঁড়ি-ডেকচি গেল !'

ডাক্তার এসে বললেন, 'দারুণ শক পেয়ে পাগল হয়ে গেছে। রাঁচি পাঠিয়ে দেখুন—ওরা যদি কিছু করতে পারে।

তাই একাদশী পিসে কাঁকে চলে গেলেন। হয়তো ছ'মাস পরে ফিরবেন। এক বছর পরেও ফিরতে পারেন। আর নইলে পাকাপাকিভাবে থেকেও যেতে পারেন ওখানে। রাঁচির জল হাওয়ায় ভালোই থাকবেন আর মধ্যে মধ্যে হাঁড়ি-ডেকচির জন্যে কান্নাকাটি করবেন।

আমি বললুম, আচ্ছা টেনিদা, এখন একাদশী পিসি কী করবেন ? বেশ নিশ্চিন্তে রোজ রোজ মাছ-মাংস-পোলাও-পায়েস খাবেন তো ?

টেনিদা বললে, ছি প্যালা—তুই ভীষণ হার্টলেস।

আমি চুপ করে রইলুম। তেলে-ভাজার ঠোঙা শেষ হয়ে গিয়েছিল, একটা ল্যাজ-ন্যাড়া নেড়ী কুত্তার গায়ে সেটা ছুঁড়ে দিয়ে টেনিদা আমার কানে-কানে বললে, এখন মানে যদ্দিন পিসে কাঁকেতে থাকে—এই সময় বাঁকুড়ায় বেড়াতে যাওয়া যায়, না রে ? যাবি তুই আমার সঙ্গে ?

পরমানন্দে মাথা নেড়ে আমি বললুম, নিশ্চয়—নিশ্চয়।

ন্যাংচাদার 'হাহাকার'

ক্যাবলা বললে—বড়দার বন্ধু গোবরবাবু ফিলিমে একটা পার্ট পেয়েছে। টেনিদা চার পয়সার চীনেবাদাম শেষ করে এখন তার খোলাগুলোর ভেতর খোঁজাখুঁজি করছিল। আশা ছিল, দু'-একটা শাঁস এখনও লুকিয়ে থাকতে পারে। যখন কিচ্ছু পেলে না, তখন খুব বিরক্ত হয়ে একটা খোলাই তুলে নিলে, কড়মড় করে চিবুতে-চিবুতে বললে, বারণ কর ক্যাবলা—এক্ষুনি বারণ করে দে।

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, কাকে বারণ করব ? গোবরবাবুকে ?

—আলবাত। নইলে তোর গোবরবাবু স্রেফ ঘুঁটে হয়ে যাবে !

—ঘুঁটে হবে কেন ? সেই যে কী বলে—মানে স্টার হবে। ...আমি বলতে চেষ্টা করলুম।

—স্টার হবে ? আমার ন্যাংচাদাও স্টার হতে গিয়েছিল, বুঝলি ? এখন নেংচে-নেংচে হাঁটে আর সিনেমা হাউসের পাশ দিয়ে যাবার সময় কানে আঙুল দিয়ে, চোখ বুজে খুব মিহি সুরে 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু কৃপাবিন্দু বিতরো'—এই গানটা গাইতে-গাইতে পেরিয়ে যায়।

—বুঝতে পারছি।...হাবুল সেন মাথা নাড়ল : তোমার ন্যাংচাদা-রে ফিলিমের লোকেরা মাইরা ল্যাংড়া কইরা দিছে।

—হুঃ, মাইর‍্যা ল্যাংড়া করছে !—টেনিদা ভেংচে বললে, খামকা বকবক করিসনি, হাবুল ! যেন এক নম্বরের কুরুবক !

ক্যাবলা বললে—কুরুবক তো ভালোই। এক রকমের ফুল।

—থাম, তুই আর সবজান্তাগিরি করিসনি। কুরুবক যদি ফুল হয়, তা হলে কানিবকও একরকমের গোলাপফুল ! তা হলে পাতিহাঁসও এক রকমের ফজলি আম ! তা হলে কাকগুলোও এক রকমের বনলতা হতে পারে !

ক্যাবলা বললে—বা-রে, তুমি ডিকশনারি খুলে দ্যাখো না !

—শাট আপ ! ডিকশনারি। আমিই আমার ডিকশনারি। আমি বলছি কুরুবক এক ধরনের বক—খুব খারাপ, খুব বিচ্ছিরি বক। যদি চালিয়াতি করবি তো এক চাঁটিতে তোর দাঁত—

—দাঁতনে পাঠিয়ে দেব।—আমি জুড়ে দিলুম : কিন্তু বকের বকবকানি এখন

বন্ধ করো না বাপু। কী ন্যাংচাদার গল্প যেন বলছিলে ?

—অঃ, ফাঁকি দিয়ে গপ্প শোনার ফন্দি ? টেনি শর্মাকে অমন 'আনরাইপ চাইল্ড' মানে কাঁচা ছেলে পাওনি—বুঝেছ, প্যালারাম চন্দর ? ন্যাংচাদার রোমহর্ষক কাহিনী যদি শুনতে চাও তা হলে এক্ষুনি পকেট থেকে ঝাল-নুনের শিশিটা বের করো। একটু আগেই লুকিয়ে-লুকিয়ে চাটা হচ্ছিল, আমি বুঝি দেখতে পাইনি ?

কী ডেঞ্জারাস চোখ—দেখেছ ? কত হুঁশিয়ার হয়ে খাচ্ছি—ঠিক দেখে ফেলেছ ! সাধে কি ইস্কুলের পণ্ডিতমশাই টেনিদাকে বলতেন, বাবা ভজহরি—তুমি হচ্ছ পয়লা নম্বরের 'শিরিগাল'...মানে ফকস।

দেখেছে যখন, কেড়েই নেবে। কী আর করি—মানে-মানে দিতেই হল শিশিটা।

প্রায় অর্ধেকটা ঝাল-নুন একেবারে চেটে নিয়ে টেনিদা বললে—ন্যাংচাদা—মানে আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই—

হাবুল বললে—চোরে-চোরে।

—অ্যাঁ ! কী বললি ?

—না-না, আমি কিছু কই নাই। কইতাছিলাম, একটু জোরে-জোরে কও।

—জোরে ?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে নাকটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে, আমাকে কি অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো পেলি যে, খামকা হাউমাউ করে চ্যাঁচাব ? মিথ্যে বাধা দিবি তো এক গাঁট্টায় চাঁদি—

আমি বললুম—চাঁদপুরে পাঠিয়ে দেব !

—যা বলেছিস !—বলেই টেনিদা আমার মাথায় টকাস করে গাঁট্টা মারতে যাচ্ছিল, আমি চট করে সরে গিয়ে মাথা বাঁচালুম।

আমাকে গাঁট্টা মারতে না পেরে ব্যাজার হয়ে টেনিদা বললে—দরকারের সময় হাতের কাছে কিচ্ছু পাওয়া যায় না—বোগাস ! মরুক গে—ন্যাংচাদার কথাই বলি। খবরদার কথার মাঝখানে ডিসটার্ব করবি না কেউ।

হ্যাঁ, যা বলছি। আমার বাগবাজারের মাসতুতো ভাই ন্যাংচাদার ছিল ভীষণ ফিলিমে নামবার শখ। বায়োস্কোপ দেখে-দেখে রাতদিন ওর ভাব লেগেই থাকত। বললে বিশ্বাস করবিনে, বাজারে কাঁচকলা কিনতে গেছে—হঠাৎ ওর ভাব এসে গেল। বললে, ওগো তরুণ কদলী ! এই নিষ্ঠুর সংসার তোমাকে ঝোলের মধ্যে রান্না করে করে খায়—তোমার অরুণ হিয়ার করুণ ব্যথা কে বুঝবে ! এই বলে, খুব কায়দা করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে 'ওফ' বলতে যাচ্ছে, এমন সময় কাঁচকলাওয়ালা বললে, কোথাকার এঁচোড়ে পাকা ছেলে রে। দিতে হয় কান ধরে এক থাপ্পড়। ন্যাংচাদা আমার কানে-কানে বললে—অহো—কী নৃশংস মনুষ্য—দেখেছিস ?

এমন ভাবের মাথায় কেউ কি আই-এ পাশ করতে পারে ? ন্যাংচাদা সব সাবজেক্টে ফেল করে গেল। আর মেসোমশাই অফিস থেকে ফিরে এসে যা-যা বললেন, সে আর তোদের শুনে কাজ নেই। মোদ্দা, অপমানে ন্যাংচাদার সারারাত

কান কটকট করতে লাগল। প্রতিজ্ঞা করল, হয় ফিলিমে নেমে প্রতিভায় চারিদিক অন্ধকার করে দেবে—নইলে এ-পোড়া কান আর রাখবে না।

—খুব ইচ্ছেশক্তি থাকলে, মানে—মনে খুব তেজ এসে গেলে—বুঝলি, অঘটন একটা ঘটেই যায়। ন্যাংচাদা তো মনের দুঃখে সকালবেলা 'দি গ্র্যান্ড আবার খাবো রেস্তোরাঁ'য় ঢুকে এক পেয়ালা চা আর ডবল ডিমের মামলেট নিয়ে বসেছে। এমন সময় খুব সুট-টাই হাঁকড়ে এক ছোকরা এসে বসলো ন্যাংচাদার টেবিলে। ন্যাংচাদা দেখলে, তার কাছে একটা নীল রঙের ফাইল...আর তার ওপরে খুব বড়-বড় করে লেখা 'ইউরেকা ফিলিম কোং'। নবতম অবদান—'হাহাকার'।

ন্যাংচাদার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস। উত্তেজনায় তার কানের ভেতর যেন তিনটে করে উচ্চিংড়ে লাফাতে লাগল, নাকের মধ্যে যেন আরশোলারা সুড়সুড়ি দিতে লাগল। তার সামনেই জলজ্যান্ত ফিলিমের লোক বসে—তাতে আবার নবতম অবদান। একেই বলে মেঘ না চাইতে জল। কে বলে, কলিযুগে ভগবান নেই !

ন্যাংচাদা বাগবাজারের ছেলে—তুখোড় চিজ। তিন মিনিটে আলাপ জমিয়ে নিলে। লোকটার নাম চন্দ্রবদন চম্পটী—সে হল 'হাহাকার' ফিলিমের একজন অ্যাসিসট্যান্ট। মানে, ছবির ডিরেক্টারকে সাহায্য করে আর কি।

হাবুল বললে—সহকারী পরিচালক।

—চোপরাও !—টেনিদা হাবুলকে এক বাঘা ধমক লাগিয়ে বলে চলল, চন্দ্রবদনকে ন্যাংচাদা ভজিয়ে ফেললে। তার বদনে দুটো ডবল ডিমের মামলেট, চারটে টোস্ট আর তিন কাপ চা ঘুষ দিয়ে—শেষে হাতে চাঁদ পেয়ে গেল ন্যাংচাদা। ওঠবার সময় চন্দ্রবদন বললে—এত করে বলছেন যখন—বেশ, আপনাকে আমি ফিলিমে চান্স দেব। কাল বেলা দশটার সময় যাবেন বরানগরের ইউরেকা ফিলিমে—নামিয়ে দেব জনতার দৃশ্যে।

হাত কচলাতে কচলাতে ন্যাংচাদা বললে, স্টুডিয়োটা কোথায়, স্যর ?

চন্দ্রবদন জায়গাটা বাতলে দিলে। বললে—দেখলেই চিনতে পারবেন। উঁচু পাঁচিল—বাইরে লেখা রয়েছে ইউরেকা ফিলিম কোং। আচ্ছা আসি এখন, ভেরি বিজি, টা—টা—

হাত নেড়ে চন্দ্রবদন তড়াক করে একটা চলতি বাসে উঠল।

সেদিন রাত্তিরে তো ন্যাংচাদার আর ঘুম হয় না। বার বার বিছানা থেকে উঠে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জনতার দৃশ্যে পার্ট করছে। মানে, কখনও স্তম্ভিত হয়ে যাচ্ছে—কখনও জয়ধ্বনি করছে, কখনও অট্টহাসি হাসছে। অবিশ্যি হাসি আর জয়ধ্বনিটা নিঃশব্দেই হচ্ছে—পাশের ঘরেই আবার মেসোমশাই ঘুমোন কিনা !

সারা রাত ধরে জনতার দৃশ্য সড়গড় করে নিয়ে ন্যাংচাদা সকাল ন'টার আগেই সোজা ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের বাসে চেপে বসল। তারপর জায়গাটা আঁচ করে নেমে পড়ল বাস থেকে।

খানিকটা হাঁটতেই—আরে, ওই তো উঁচু পাঁচিল। ওইটেই নিশ্চয় ইউরেকা

ফিলিম।

গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে গেল ন্যাংচাদা। বাইরে একটা মস্ত লোহার গেট—ভেতর থেকে বন্ধ। তার ওপরে বোর্ডে কী একটা নাম লেখা আছে—কিন্তু লতার ঝাড়ে নামটা পড়া যাচ্ছে না—দেখা যাচ্ছে কেবল তিনটে হরফ—এল, ইউ, এম।

এল-ইউ-এম। লাম! মানে ফিলাম। তার মানেই ফিলিম।

ক্যাবলা আপত্তি করলে, লাম! লাম কেন হবে? এফ-আই-এল-এম—ফিলম!

টেনিদা রেগেমেগে চিৎকার করে উঠল: সায়লেন্স। আবার কুরুবকের মতো বকবক করছিস? এই রইল গল্প—আমি চললুম।

প্রায় চলেই যাচ্ছিল, আমরা টেনেটুনে টেনিদাকে বসালুম। হাবুল বললে, ছাইড়্যা দ্যাও ক্যাবলার কথা—চ্যাংড়া!

—চ্যাংড়া! ফের ডিসটার্ব করলে ট্যাংড়া মাছ বানিয়ে দেব বলে রাখছি। হুঁঃ। লোহার গেট বন্ধ দেখে ন্যাংচাদা গোড়াতে তো খুব ঘাবড়ে গেল। ভাবলে, চন্দ্রবদন নির্ঘাত গুলপট্টি দিয়ে দিব্যি পরস্মৈপদী খেয়েদেয়ে সটকান দিয়েছে। তারপর ভাবলে, অন্যদিকেও তো দরজা থাকতে পারে। দেখা যাক।

পাঁচিলের পাশ দিয়ে ঘুরঘুর করছে—গেট-ফেট তো দেখা যাচ্ছে না। খুব দমে গেছে, এমন সময় হঠাৎ ভীষণ মোটা গলায় কে বললে, হু আর ইউ?

ন্যাংচাদা তাকিয়ে দেখল, পাঁচিলের ভেতর একটা ছোট ফুটো। তার মধ্যে কার দুটো জ্বলজ্বলে চোখ আর একজোড়া ধুমসো গোঁফ দেখা যাচ্ছে। সেই গোঁফের তলা থেকে আবার আওয়াজ এল: হু আর ইউ?

ন্যাংচাদা বললে, আমি—মানে আমাকে চন্দ্রবদনবাবু ফিলিমে পার্ট করতে ডেকেছিলেন। এটাতে তো ইউরেকা ফিলিম?

—ইউরেকা ফিলিম?—গোঁফের তলা থেকে বিচ্ছিরি দাঁত বের করে কেমন খ্যাঁক-খেঁকিয়ে হাসল লোকটা। তারপর বললে, আলবাত ইউরেকা ফিলিম। পার্ট করবে? ভেতরে চলে এসো।

—গেট যে বন্ধ। ঢুকব কী করে?

—পাঁচিল টপকে এসো। ফিলিমে নামবে আর পাঁচিল টপকাতে পারবে না, কী বলো?

ন্যাংচাদা ভেবে দেখলে, কথাটা ঠিক। ফিলিমের কারবারই আলাদা। দ্যাখ না—বোঁ করে লোকে নল বেয়ে চারতলায় উঠে পড়ছে, ঝপাং করে পাঁচতলার থেকে নিচে লাফিয়ে পড়ছে—একটা চলতি ট্রেন থেকে লাফিয়ে আর একটা ট্রেনে চলে যাচ্ছে। এ-সব না করতে পারলে ফিলিমে নামাবেই বা কেন? ন্যাংচাদা বুঝতে পারলে, এখানে পাঁচিল টপকে ভেতরে যাওয়াই নিয়ম, ওইটেই প্রথম পরীক্ষা।

ন্যাংচাদা কী আর করে? দেওয়ালের খাঁজে-খাঁজে পা দিয়ে উঠতে চেষ্টা করতে লাগল। দু'পা ওঠে—আর সড়াৎ করে পিছলে পড়ে যায়। শখের সিলকের

পাঞ্জাবি ছিঁড়ল, গায়ের নুনছাল উঠে গেল, ঠিক নাকের ডগায় আবার কুটুস করে একটা কাঠপিঁপড়ে কামড়ে দিলে। ভেতরে বোধহয় আরও কিছু লোক জড়ো হয়েছে—তারা সমানে বলছে—হেঁইয়ো জোয়ান—আর একটু—আর একটু—

প্রাণ যায় যায়—কিন্তু ন্যাংচাদা হার মানবার পাত্তর নয়। একে বাগবাজারের ছেলে, তায় জনতার দৃশ্যে পার্ট করতে এসেছে। আধঘণ্টা ধ্বস্তাধবস্তি করে ঠিক উঠে গেল পাঁচিলের ওপর। বসে একটু দম নিতে যাচ্ছে, অমনি তলা থেকে কারা বললে, আয় রে আয়—চলে আয় দাদা—আয় রে, আমার কুমড়োপটাশ—

আর বলেই ন্যাংচাদার পা ধরে হ্যাঁচকা টান। ন্যাংচাদা একেবারে ধপাস করে নীচে পড়ল। কুমড়োপটাশের মতোই।

কোমরে বেজায় চোট লেগেছিল, বাপ-রে মা-রে বলতে বলতে ন্যাংচাদা উঠে দাঁড়াল। দেখলে পাঁচিলে-ঘেরা মস্ত জায়গাটা—সামনে খানিক মাঠের মতো—একটু দূরে একটা বড় বাড়ি, পাশেই একটা ছোট ডোবা—তাতে জল নেই, খানিক কাদা। আর তার সামনে পাঁচ-সাতজন লোক দাঁড়িয়ে নানারকম মুখভঙ্গি করছে।

একজন একটা হুঁকো টানছে—তাতে কলকে-টলকে কিচ্ছুটি নেই। আর একজনের ছেঁড়া সাহেবি পোশাক—কিন্তু টুপির বদলে মাথায় একটা ভাঙা বালতি বসানো। একজনের গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা। আর একজন—মুখে লম্বা-লম্বা গোঁফ-দাড়ি—সমানে চেঁচিয়ে বলছে: 'কুকুর আসিয়া এমন কামড় দিল পথিকের পায়।' বলেই সে এমন ভাবে ঘ্যাঁক করে দৌড়ে এল যে, ন্যাংচাদাকে কামড়ে দেয় আর কি!

সেই সাহেবি পোশাক পরা লোকটা ধাঁ করে রদ্দা মেরে 'কুকুর আসিয়া এমন কামড়'কে দূরে সরিয়ে দিলে। তারপর বললে—বন্ধুগণ, আমাদের নতুন অভিনেতা এসে গেছেন। বেশ চেহারাটি।

সকলে চেঁচিয়ে বললে, হিরো—আলবাত হিরো।

ন্যাংচাদা প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিরো শুনেই চাঙ্গা হয়ে উঠল। বুঝল, সিনেমায় তো নানারকম পার্ট করতে হয়—তাই ওরা সব ওইরকম সেজেছে, যাকে বলে 'মেক আপ'। তারপর তাকেই হিরো করতে চায়! ন্যাংচাদা নাক আর কোমরের ব্যথা ভুলে একেবারে আকর্ণবিস্তৃত হাসি হাসল। বললে, তা আজ্ঞে, হিরোর পার্টও আমি করতে পারব—পাড়ার থিয়েটারে দু'বার আমি হনুমান সেজেছিলুম। কিন্তু চন্দ্রবদনবাবু কোথায়?

সেই জুতোর মালা-পরা লোকটা বললে, চন্দ্রবদন শ্বশুরবাড়ি গেছে—জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে। আমি হচ্ছি সূর্যবদন—ডিরেকটার!

বালতি মাথায় লোকটা তাকে ধাঁই করে এক চাঁটি দিলে: ইউ ব্লাডি নিগার! তুই ডিরেকটার কীরে? তুই তো একটা হুঁকোবরদার। আমি হচ্ছি ডিরেকটার—আমার নাম হচ্ছে তারাবদন।

সূর্যবদন চাঁটি খেয়ে বিড়বিড় করতে লাগল। আর যে-লোকটা কামড়াতে

এসেছিল, সে সমানে বলতে লাগল :

"সকালে উঠিয়া আমি মনে-মনে বলি
আজি কি সুন্দর নিশি পূর্ণিমা উদয়
একা ননী পাড়ে ছানা আমগাছে চড়ে
মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার—"

তারাবদন ধমকে দিয়ে বললে, চুপ! এখন রিহার্সেল হবে। তারপর হিরোবাবু—তোমার নাম কী ?

ন্যাংচাদা বললে, আমার ভালো নাম বিষ্ণুচরণ—ডাকনাম ন্যাংচা।

—ন্যাংচা! আহা—খাসা নাম! শুনলেই খিদে পায়।—তারপর ফিসফিসিয়ে বললে, জানো—আমার ডাক নাম চমচম!.

ন্যাংচাদা বলতে যাচ্ছে, তাই নাকি—হঠাৎ চমচম চেঁচিয়ে উঠল : কোয়ায়েট! সব চুপ। রিহার্সেল হবে। মিস্টার ন্যাংচা—

ন্যাংচাদা বললে, আজ্ঞে ?

—এক পা তুলে দাঁড়াও।

ন্যাংচাদা তাই করলে।

—এবার দু'পা তুলে দাঁড়াও।

ন্যাংচাদা ঘাবড়ে গিয়ে বললে, আজ্ঞে, দু'পা তুলে কি—

বলতেই তারাবদন চটাস করে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলে ন্যাংচাদার গালে। বললে, রে বর্বর, স্তব্ধ করো মুখর ভাষণ! যা বলছি, তাই করো। ফিলিমে পার্ট করতে এসেছ—দু'পা তুলে দাঁড়াতে পারবে না! এয়ার্কি নাকি ?

চাঁটি খেয়ে ন্যাংচাদার তো মাথা ঘুরে গেছে। কাঁউমাউ করে দু'পা তুলে দাঁড়াতে গেল। আর যেই দু'পা তুলতে গেছে, ধপাস করে পড়ে গেল মাটিতে।

সবাই চেঁচিয়ে উঠল : শেম—শেম, পড়ে গেলি। ফাই—ফাই!

ন্যাংচাদা ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে গেল। ফিলিমে নামতে গেলে নিশ্চয় দু'পা তুলে দাঁড়াতে হয়—কিন্তু কী করে যে সেটা পারা যায় কিছুতেই ভেবে পেল না।

তারাবদন ন্যাংচাদার জুলপি ধরে এমন হ্যাঁচকা মারল যে, তড়বড়িয়ে লাফিয়ে উঠতে হল বেচারিকে। তারপর তারাবদন বললে, এবার গান করো।

—কী গান গাইব ?

—যে গান খুশি। বেশ উপদেশপূর্ণ গান।

ন্যাংচাদা একেবারে গাইতে পারে না...বুঝলি ? মানে আমাদের প্যালার চাইতেও যাচ্ছেতাই গান গায়—একবার রাস্তায় যেতে-যেতে এমন তান ছেড়েছিল যে, শুনে একটা কাবলিওলা আচমকা আঁতকে উঠে ড্রেনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু হিরো হওয়ার আনন্দে সেই ন্যাংচাদাই ভীমসেনী গলায় গান ধরল :

'ভুবন নামেতে ব্যাদড়া বালক
তার ছিল এক মাসি—
ভুবনের দোষ দেখে দেখিত না
সে মাসি সর্বনাশী—'

এইটুকু কেবল গেয়েছে...হঠাৎ সবাই চেঁচিয়ে উঠল : স্টপ—

তারাবদন বললে, না...আর গান না। এবার নাচো—

—নাচব ?

—নিশ্চয় নাচবে।

—আমি তো নাচতে জানিনে।

—নাচতে জানো না...হিরো হতে এসেছ ? মামাবাড়ির আবদার পেয়েছো...না ? বলেই কড়াৎ করে ন্যাংচাদার জুলপিতে আর-এক টান।

গেলুম গেলুম...বলে ন্যাংচাদা নাচতে লাগল। মানে ঠিক নাচ নয়...লাফাতে লাগল ব্যথার চোটে।

সকলে বললে, এনকোর...এনকোর!

যেই এনকোর বলা...অমনি তারাবদন আর-একটা পেল্লায় টান দিয়েছে ন্যাংচাদার জুলপিতে! 'পিসিমা গো গেছি'...বলে ন্যাংচাদা এবার এমন নাচতে লাগল যে, তার কাছে কোথায় লাগে তোদের উদয়শংকর!

তারাবদন বললে, রাইট। ও-কে! কাট!

কাট! কাকে কাটবে ? ন্যাংচাদা ভয় পেয়ে থমকে গেছে। তারাবদন বললে, এবার তা হলে সন্তরণের দৃশ্য। কী বলো বন্ধুগণ ?

সঙ্গে-সঙ্গে সকলে চেঁচিয়ে বললে, ঠিক...এবারে সন্তরণের দৃশ্য।

ন্যাংচাদা 'আরে আরে...করছ কী...' বলতে-বলতে সবাই ওকে চ্যাংদোলা করে তুলে ফেলল। তারপর চক্ষের পলকে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললে সেই ডোবাটার ভেতরে।

কাদা মেখে ভূত হয়ে উঠতে যাচ্ছে...সবাই আবার ঠেলে ডোবার মধ্যে ফেলে দিলে। বলতে লাগল : সন্তরণ...সন্তরণ।

আর সন্তরণ। ন্যাংচাদার তখন প্রাণ যাওয়ার জো। সারা গা...জামাকাপড় কাদায় একাকার...নাকে-মুখে দুর্গন্ধ—পচা পাঁক ঢুকে গেছে, আর বিছুটির মতো সে কী জ্বলুনি। ন্যাংচাদা যেমনি উঠতে চায় অমনি সবাই তক্ষুনি তাকে ডোবায় ফেলে দেয়। আর চ্যাঁচাতে থাকে : সন্তরণ...সন্তরণ—

শেষে ন্যাংচাদা আকাশ ফাটিয়ে হাহাকার করতে লাগল...মানে 'হাহাকার' ফিলিমে পার্ট করতে এসেছিল কিনা : বাঁচাও...বাঁচাও...আমাকে মেরে ফেললে...আমি আর ফিলিমে পার্ট করব না...

প্রাণ যখন যাবার দাখিল তখন কোত্থেকে তিন-চারজন খাকী শার্ট-প্যান্ট পরা লোক লাঠি হাতে দৌড়ে এল সেদিকে। আর তক্ষুনি তারাবদনের দল একেবারে হাওয়া।

ন্যাংচাদার তখন প্রায় নাভিশ্বাস। খাকীপরা লোকগুলো তাকে পাঁক থেকে টেনে তুলে কিছুক্ষণ হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে রইল। শেষে বললে, ক্যা তাজ্জব। ই নৌতুন পাগলা ফির কাঁহাসে আসলো ?

ব্যাপার বুঝলি ? আরে...ওটা মোটেই ফিলিম স্টুডিয়ো নয়...লাম...মানে লুনাটিক অ্যাসাইলাম...অর্থাৎ কিনা পাগলা গারদ। উঁচু পাঁচিল আর 'লাম' দেখেই ন্যাংচাদা ঘাবড়ে গিয়েছিল।

সেই থেকে ন্যাংচাদা নেংচে-নেংচে হাঁটে...আর সিনেমা হল দেখলেই চোখ বুজে করুণ গলায় গাইতে থাকে : 'দীনবন্ধু, কৃপাসিন্ধু...'

টেনিদা থামল। আমার ঝালনুনের শিশি ততক্ষণে সাফ।

হাত চাটতে-চাটতে বললে, তাই বলছিলুম, তোর গোবরবাবুকে বারণ করে দে। আরে—আসলে ফিলিম স্টুডিয়োগুলোও এমনি পাগলা গারদ...গোবরবাবুকে স্রেফ ঘুঁটেচন্দর বানিয়ে ছেড়ে দেবে !

ভজগৌরাঙ্গ কথা

হাবুল সেন বর্ধমানে মামার বাড়ি বেড়াতে গেছে। ক্যাবলা গেছে বাবা-মার সঙ্গে নাইনিতালে। তাই পুজোর ছুটিতে পটলডাঙা আলো করে আছি চার মূর্তির দুজন—আমি আর টেনিদা।

বিকেলবেলা ভাবছি, ধাঁ করে লিলুয়ায় ছোট পিসিমার বাড়ি থেকে একটু বেড়িয়ে আসি—হঠাৎ বাইরে থেকে টেনিদার গাঁকগাঁক করে চিৎকার !

—প্যালা, কাম—কুইক্ !

নতুন ডাক্তার মেজদা হসপিটালে গোটাকতক রুগী-টুগী মেরে ফিরে আসছিল। নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দাঁত খিঁচিয়ে আমায় বলে গেল : যাও জাম্বুবান—তোমার দাদা হনুমান তোমায় ডাকছে। দুজনে মিলে এখন লঙ্কা পোড়াওগে।

জাম্বুবান কখনও লঙ্কা পোড়ায়নি—মেজদাকে এই কথাটা বলতে গিয়েও আমি বললুম না। ওকে চটিয়ে দিলে মুশকিল। একটু পেটের গণ্ডগোল হয়েছে কি, সঙ্গে-সঙ্গে সাতদিন হয়তো সাগু-বার্লি কিংবা স্রেফ কাঁচকলার ঝোল খাইয়ে রাখবে, নইলে পটাং করে পেটেই একটা ইনজেকশান দিয়ে দেবে। তাই মিথ্যে অপবাদটা হজম করে যেতে হল।

আবার টেনিদার সেই পাড়া-কাঁপানো বাজখাঁই হাঁক : প্যালা, আর ইউ ডেড ?

টেনিদার চিৎকার শুনলে মড়া অবধি লাফিয়ে ওঠে, আর আমি তো এখনও মারাই যাইনি। হুড়মুড় করে দোতলা থেকে নেমে এসে বললুম : কী হয়েছে, চ্যাঁচাচ্ছ কেন অত ?

টেনিদা আমার চাঁদির ওপর কড়াং করে একটা গাঁট্টা মারল। বললে : তুই একটা নিরেট ভেটকি মাছ। আমি তো শুধু চ্যাঁচাচ্ছি—ব্যাপারটা শুনলে তুই

একেবারে 'ভজ গৌরাঙ্গ ভজ গৌরাঙ্গ' বলে দু-হাত তুলে নাচতে থাকবি। যাকে বলে, নরীনৃত্যাতি।

কাণ্ডটা দ্যাখো একবার—টেনিদা সংস্কৃত আওড়াচ্ছে ! পণ্ডিতমশাই একবার ওকে 'গো' শব্দরূপ জিজ্ঞেস করায় বলেছিল, গৌ—গৌবৌ—গৌবরঃ। শুনে পণ্ডিতমশাই চেয়ার থেকে উলটে পড়ে যেতে যেতে সামলে গিয়েছিলেন। আর ওকে বলেছিলেন—কী বলেছিলেন, সেটা নাই-বা শুনলে !

কিন্তু সংস্কৃত যখন বলছে, তখন ব্যাপারটা নিশ্চয় সাংঘাতিক। বললুম : খামকা আমি নাচব কেন ? আর যদিই বা নাচি, ভজ গৌরাঙ্গ বলব কেন ? তোমার নাম ধরে ভজহরি ভজহরি বলেও তো নাচতে পারি ! (তোমরা তো জানোই, টেনিদার পোশাকি নাম ভজহরি মুখুজ্যে।)

টেনিদা আমার নাকের সামনে বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বললে : ভজহরি বলে নাচলে কচুপোড়া পাবি। আরে, আজ সন্ধের পর ভজগৌরাঙ্গবাবু যে পোলাও-মাংস খাওয়াচ্ছেন ! তোকে আর আমাকে !

শুনে খানিকক্ষণ আমি হাঁ করে থাকলুম।

—কে খাওয়াচ্ছে বললে ?

—ভজগৌরাঙ্গবাবু।

আমার হাঁ-টা আরও বড় হল : ভালো করে বলো, বুঝতে পারছি না।

বলেই বুঝতে পারলুম, কী ভুলটাই করেছি। টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে আমার কানের কাছে মুখ এনে 'ভজগৌরাঙ্গ' বলে এমন একখানা হাঁক ছাড়ল যে আমি আঁতকে তিন হাত লাফিয়ে উঠলুম। কান কনকন করতে লাগল, মাথা বনবন করে উঠল !

টেনিদা হিড়হিড় করে টানতে টানতে আমাকে চাটুজ্যেদের রোয়াকে নিয়ে এল। বললে : শুনে যে তোর 'মুচ্ছো' যাওয়ার জো হল দেখছি। বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি ?

বাঁ-দিকের কানটা চেপে ধরে আমি বললুম : ভজগৌরাঙ্গ আমাদের মাংসপোলাও খাওয়াবে ?

—আলবত। তোকে আর আমাকে।

—ভজগৌরাঙ্গ সমাদ্দার ?

—নির্ঘাত !

বলে কী টেনিদা ? পাগল হয়ে গেছে না পেট খারাপ হয়েছে ? ভজগৌরাঙ্গবাবুর মতো কৃপণ সারা কলকাতায় আর দুজন নেই। একাই থাকেন। ওঁর ছেলে রামগোবিন্দ চাকরি পেয়েই নিজের মাকে নিয়ে কেষ্টনগরে চলে গেছে—মানে পালিয়ে বেঁচেছে। ভজগৌরাঙ্গ পাটের দালালি করছেন, আর টাকা জমাচ্ছেন। বাড়ির সামনে ভিক্ষুক এলে লাঠি নিয়ে তাড়া করেন। একবার গোটাকয়েক ডেঁয়ো পিঁপড়ে ওঁর একটুখানি চিনি খেয়ে ফেলেছিল, ভদ্রলোক পিঁপড়েগুলোকে ধরে একটা শিশিতে পুরে রাখলেন আর পর পর তিনদিন সেই পিঁপড়ে দিয়ে চা করে, খেলেন। সেই ভজগৌরাঙ্গ পোলাও-মাংস খাওয়াবেন

আমাকে আর টেনিদাকে ? উঁহু, মাথা খারাপ হলেও এ-কথা লোকে ভাবতে পারে না। টেনিদারই পেট খারাপ হয়েছে!

টেনিদা বললে : অমন শিঙাড়ার মতো মুখ করে, ছাগলের মতো তাকিয়ে আছিস যে ? তা হলে সব খুলে বলি, শোন!

কাল শেষরাত্তিরে ছোট কাকা সরকারি কাজে এরোপ্লেনে চেপে সিঙ্গাপুরে গেছে। আমি দমদমে ছোট কাকাকে তুলে দিয়ে যখন ট্যাক্সি করে বাড়ি ফিরেছি, তখন রাত চারটে। গলির মধ্যে ঢুকেই দেখি যে এক যাচ্ছেতাই ব্যাপার! একটা লোক ল্যাম্পপোস্টের ওপর ঝুলছে; আর নীচ থেকে একজন পাহারাওলা 'উতারো-উতারো' বলে তার ঠ্যাং ধরে টানছে।

এগিয়ে এসে দেখি ল্যাম্পপোস্ট ধরে যে-লোকটা ঝুলছে, সে আর কেউ নয়—ভজগৌরাঙ্গবাবু!

—বলো কী—ভজগৌরাঙ্গবাবু ? তা শেষরাত্তিরে ল্যাম্পপোস্ট ধরে ঝুলতে গেল কেন ?

—আরে, সেইটেই তো গণ্ডগোল! পাহারাওলা তো এক হ্যাঁচকা টানে ভজগৌরাঙ্গকে চালকুমড়োর মতো ধপাত করে নামিয়ে নিলে। তারপর বলে, 'তোম্ ইলেকট্রিকের তার চুরি করতা হ্যায়—চলো থানামে!' আর ভজগৌরাঙ্গ হাঁউমাউ করতে থাকে, 'আমি শেষ রাত্রে বৈঠ্‌কে বৈঠ্‌কে হিসাব লিখ্‌তা থা, একঠো কাগজ উড়্‌কে ল্যাম্পপোস্টকে উপরে গিয়ে লটকে গিয়া, সেইঠো পাড়তে গিয়া!' পাহারাওলা তা বিশ্বেস করবে কেন ? খালি বলে, 'তোম চোর হ্যায়—চলো থানামে।'

আমাকে দেখেই ভজগৌরাঙ্গবাবুর সে কী কান্না! বলে, 'বাবা টেনি, আমায় বাঁচাও। এই বুড়ো বয়েসে চোর বলে ধরে নিয়ে গেলে আমি আর বাঁচব না।'

যাই হোক, আমি পাহারাওলাকে অনেক বোঝালুম। বললুম, 'এ দারোগা সাব্—এ লোক আচ্ছা আদ্‌মি, চুরি নেহি করতা। ছোড় দিজিয়ে দারোগা সাহেব!'—দারোগা সাহেব বলাতে লোকটা একটু ভিজল। খানিকটা খইনিটইনি খেয়ে, ভজগৌরাঙ্গবাবুর টিকিতে একটা টান দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আজ ছোড় দেতা। ফের যদি তুম্ ল্যাম্পপোস্টে উঠে গা, তো তুম্‌কো ফাঁসি দে দেগা।'—বলে চলে গেল।

তখন ভজগৌরাঙ্গ আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন। বললে, 'বাবা টেনি, তুমি আমায় ধনে-প্রাণে বাঁচিয়েছ। এ-কথা কাউকে বোলো না—তা হলে পাড়ায় মুখ দেখাতে পারব না। তোমাকে আমি চারটে পয়সা দিচ্ছি, ডালমুট খেয়ো।' আমি বললুম, 'অত সস্তায় হবে না স্যার! যদি আমাকে আর প্যালাকে কাল সন্ধেয় পোলাও-মাংস খাওয়াতে পারেন, তবেই ব্যাপারটা চেপে যাব।'

শুনে বুড়োর চোখ কপালে চড়ে গেল। বলে, 'এই গরমে পোলাও-মাংস খেতে নেই বাবা—শেষে অসুখ করে পড়বে। তার চে' বরং দুই আনা পয়সা দিচ্ছি—তুমি আর প্যালারাম বোঁদে কিংবা গুজিয়া কিনে খেয়ো। পাকৌড়িও খেতে পারো।'

আমি বললুম, 'এই আশ্বিন মাসে মোটেই গরম নেই—ওসব বাজে কথা চলবে না। জেলের হাত থেকে বাঁচালুম, একশো-দুশো টাকা ফাইনও হতে পারত, তার বদলে কিনা বোঁদে আর পাকৌড়ি। বেশ, কিছু খাওয়াতে হবে না আপনাকে। সকাল হলেই আমি আর প্যালা দুটো চোঙা মুখে নিয়ে রাস্তায় বেরুব। আমি বলব—'পটলডাঙার ভজগৌরাঙ্গ', প্যালা বলবে—'তার-চোর।' আমি বলব—'পুলিশ ধরে কাকে ?' প্যালা বলবে—'ভজগৌরাঙ্গকে।' ব্যাস—বুড়ো একদম ঠাণ্ডা! সুড়সুড় করে রাজি হয়ে গেল! বুঝলি প্যালা—একেই বলে পলিটিক্‌স্!

—তা হলে আজ সন্ধেয় আমরা পোলাও-কালিয়া খাচ্ছি ? ভজগৌরাঙ্গের বাড়িতে ?

—নিশ্চয়! ঠেকাচ্ছে কে ?

এবারে সত্যি সত্যিই আমি নেচে উঠলুম! চেঁচিয়ে বললুম : ডি-লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস্—

টেনিদা বলল : ইয়াক্—ইয়াক্।

সন্ধের পরে ভজগৌরাঙ্গের বাড়ি গিয়ে তো সমানে কড়া নাড়ছি দুজনে। পুরো পনেরো মিনিট কড়া নাড়বার পরেও কোনও সাড়াশব্দ নেই। বুড়ো চুপ করে ঘাপটি মেরে বসে আছে ভেতরে। সারা রাত কড়া নাড়লেও দরজা খুলবে বলে মনে হল না।

আমি বললুম : হল তো ? খাও এখন পোলাও-কালিয়া। পিঁপড়ে দিয়ে ও চা খায়—ওর কথায় তুমি বিশ্বাস করলে ?

টেনিদা খেপে গেল। খাড়া নাকটাকে গণ্ডারের মতো উঁচু করে বললে : দরজা খুলবে না। দাঁড়া—খোলাচ্ছি। আমি বলছি—'ভজগৌরাঙ্গ'—তুই সঙ্গে সঙ্গে বলবি—

—মনে আছে। হাঁক পাড়ো—

টেনিদা যেই আকাশফাটা চিৎকার তুলেছে—'ভজগৌরাঙ্গ', আর আমি কাঁসরের মতো ক্যানকেনে গলায় জবাব দিয়েছি—'তার-চোর',—অমনি চিচিং ফাঁক। ক্যাঁচ দরজা খুলে গেল। একমুখ কাঁচা-পাকা দাড়ি নিয়ে ভজগৌরাঙ্গ বেরিয়ে এলেন সুট করে।

—আহা-হা, করছ কী! চুপ—চুপ!

—চুপ—চুপ মানে ? আধ ঘণ্টা ধরে কড়া নাড়ছি—কোনও সাড়াই নেই ? ভেবেছেন কী আপনি ? প্যালা—এগেইন!—

ভজগৌরাঙ্গ তাড়াতাড়ি বললেন : না—না—এগেইন নয়। আহা-হা, বড় কষ্ট হয়েছে তো তোমাদের। আমি কড়ার আওয়াজ শুনতেই পাইনি। মানে—এই—পেট ব্যথা করছিল কিনা, তাই একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

এসো—এসো—ভেতরে এসো—

বারান্দায় একটা ছেঁড়া মাদুর পাতা, তার একপাশে কতকগুলো হিসেবের কাগজপত্র। একটা লণ্ঠন মিটমিট করে জ্বলছে। বাড়িতে ইলেকট্রিকের লাইন নিয়ে পয়সা খরচ করবেন, এমন পাত্রই নন ভজগৌরাঙ্গ। কাগজপত্রগুলো সরিয়ে দিয়ে বললেন : বোসো বাবা বোসো, একটু জিরোও আগে।

টেনিদা বলল : জিরোবার দরকার নেই, দোরগোড়ায় আধ ঘণ্টা জিরিয়েছি আমরা। পোলাও-কালিয়া কোথায় তাই বলুন!

—পোলাও-কালিয়া?—ভজগৌরাঙ্গ খাবি খেলেন।

—হুঁ, পোলাও-কালিয়া!—টেনিদা বাঘাটে গলায় বললে : সেই রকমই কথা ছিল। কোথায় সে?

ভজগৌরাঙ্গ বললেন : এঃ, তাই তো—একেবারে মনেই ছিল না! মানে সারা দিন খুব পেটের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলুম কিনা, সেইজন্যেই—তা ইয়ে, তোমাদের বরং চার আনা পয়সা দিচ্ছি, শেয়ালদায় পাঞ্জাবিদের দোকানে গিয়ে দু'আনার মাংস আর দু'আনার পুরি—

আমি বললুম : দু' আনায় মাংস দেয় না, চিবুনো-হাড় দিতে পারে একটুকরো।

টেনিদা গর্জন করে বললে : চালাকি? ফাঁকি দেবার মতলব করেছেন? জেল থেকে বাঁচিয়ে দিলুম—তার এই প্রতিদান? যাক্, আমরা কিছু খেতে চাই না। চল্ প্যালা—এখুনি বেরিয়ে পড়ি চোঙা নিয়ে!

—আহা-হা, চোঙা আবার কেন?—ভজগৌরাঙ্গ ব্যস্ত হয়ে উঠলেন : চোঙা-টোঙা খুব খারাপ জিনিস। ছিঃ বাবা টেনি, চোঙা নিয়ে চেঁচাতে নেই—ওতে লোকের শান্তি ভঙ্গ হয়।

—সে আমরা বুঝব। আমরা চোঙা ফুঁকে আপনাকে শিঙে ফুঁকিয়ে ছাড়ব। প্যালা—চলে আয়—

—আহা, থামো—থামো!—ভজগৌরাঙ্গ টেনিদার হাত চেপে ধরলেন। তারপর ডিম ভাজার মতো করুণ মুখ করে মিহিদানার মতো মিহি গলায় বললেন : নিতান্তই যদি খাবে, তা হলে আমার খাবারটাই খেয়ে যাও। আমি নয় আজ রাতে এক গ্লাস জল খেয়েই শুয়ে থাকব।—বলেই ভজগৌরাঙ্গের দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

—আপনার খাবারটা কী?—আমার সন্দেহ হল।

—ভালো মাছ আছে আজকে—পুঁটি মাছ ভাজা। সেই সঙ্গে পান্তা ভাত। দশ দিন পরে দু'গণ্ডা পয়সা দিয়ে একটুখানি মাছ এনেছিলুম আশা করে, কিন্তু কপালে না থাকলে—। আবার বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ভজগৌরাঙ্গের।

—বটে, পুঁটি মাছ ভাজা আর পান্তো ভাত! ও রাজভোগ আপনিই খান মশাই। প্যালা, চোঙা দুটো রেডি আছে তো? চল—বেরিয়ে পড়ি—

ভজগৌরাঙ্গ কাঁউকাঁউ করে কী বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ খটখট করে বাজের মতো বেজে উঠল দরজার কড়া। সঙ্গে সঙ্গে বিদঘুটে মোটা গলায় কে বললে : ভাজগুড়ুং বাবু হ্যায়—ভাজগুড়ুং বাবু?

ভজগৌরাঙ্গ থমকে থেমে গেলেন। টেনিদা জিজ্ঞেস করলে : কোন্ হ্যায়?

আবার সেই মোটা গলা শোনা গেল : হামি লালবাজার থানা থেকে আসছে!

ভজগৌরাঙ্গ ঠকঠক করে কেঁপে উঠলেন।

—এই সেরেছে! টিকিটা টেনে দিয়েও পাহারাওয়ালার রাগ যায়নি—নির্ঘাত লালবাজারের গিয়ে নালিশ করেছে—আর পুলিশে আমায় ধরতে এসেছে। বাবা টেনি, কাল মাংস পোলাও-চপ-কাটলেট সব খাওয়াব, আমাকে আজ যেমন করে হোক বাঁচাও।

বাইরে থেকে আবার আওয়াজ এল : জলদি দরজা খুলিয়ে দেন—হামি লালবাজারসে আসছে!

—ওকে বলো—ইয়ে, তোমরা আমার ভাইপো, আর আমি তিন মাসের জন্যে দিল্লি গেছি—বলেই ভজগৌরাঙ্গ চট্ করে অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়লেন, তারপরই একেবারে তক্তপোশের তলায়। সেখান থেকে কুকুরের বাচ্চার ডাকের মতো কুঁকুঁ করে আওয়াজ উঠতে লাগল। বোঝা গেল, ভজগৌরাঙ্গ প্রাণপণে কান্না চাপবার চেষ্টা করছেন।

—এ ভাজগুড়ুং বাবু—দরজা খোলিয়ে—

টেনিদা ফিসফিস করে বললে : ব্যাপার সুবিধে নয় রে প্যালা, লালবাজারের পুলিশ কেন আবার? বুড়োর জন্যে আমরাও ফেঁসে যাব নাকি?

আমি বললুম : আমরা তো কখনও ল্যাম্পপোস্টে উঠিনি, আমাদের ভয় কিসের? দরজা খুলে দেখাই যাক।

তক্তপোশের তলায় আবার কুঁকু করে আওয়াজ উঠতে লাগল।

টেনিদা দরজা খুলল ভয়ে ভয়ে। বাইরে খাকী জামাপরা এক পুলিশের লোক দাঁড়িয়ে—তার হাতে একটা মস্ত বড় হাঁড়ি। আমাদের দেখেই এক প্রকাণ্ড স্যালুট ঠুকল। তারপর একটা চিঠি দিয়ে বললে : চটার্জি সাহেব দিয়া। হামি সাহাবকো আরদালী আছে।

রাস্তার আলোয় চিঠিটা পড়ে দেখলুম আমরা। কেষ্টনগর থেকে লিখেছে রামগোবিন্দ :

> "বাবা, পুলিশ অফিসার মিস্টার চাটার্জি আমার বন্ধু। কেষ্টনগরে বেড়াতে এসেছিলেন। ওঁর সঙ্গে তোমার জন্যে এক হাঁড়ি ভালো সরপুরিয়া আর সরভাজা পাঠালুম। ঘরে রেখে পচিয়ো না—খেয়ো। আমি আর মা ভালো আছি। প্রণাম নিয়ো।
>
> —রামগোবিন্দ।"

টেনিদা একবার আমার দিকে তাকাল, আমি তাকালুম টেনিদার দিকে। আমি বললুম : আচ্ছা আরদালী সাহেব, সব ঠিক হ্যায়।

'আরদালী সাহেব' আবার স্যালুট করে, জুতো মচমচিয়ে চলে গেল।

আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, টেনিদা ঝট করে আমাকে দরজার বাইরে টেনে নিয়ে এল।

—চুপ, স্পিক্‌টি নট্‌! এক হাঁড়ি সরভাজা আর সরপুরিয়া—খাঁটি কেষ্টনগরের জিনিস! পোলাও-কালিয়া কোথায় লাগে এর কাছে!

দরজাটা টেনে দিতে দিতে টেনিদা হাঁক পাড়ল: ভজগৌরাঙ্গবাবু, লাইন ক্লিয়ার! পুলিশ তাড়িয়েছে। কাল আর ঘর থেকে বেরুবেন না। পরশু সন্ধ্যায় আমরা পোলাও-কালিয়া খেতে আবার আসব। এখন দরজাটা বন্ধ করে দিন।

তারপর?

তারপর সেই সরভাজা আর সরপুরিয়ার হাঁড়ি নিয়ে আমরা দু'জন সোজা টেনিদাদের তে-তলার ছাদে। টেনিদা একখানা গোটা সরভাজা মুখে দিয়ে বললে: ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস্‌—

আমি সরপুরিয়ার কামড় দিয়ে বললুম: ইয়াক্‌—ইয়াক্‌!

না টি কা

পরের উপকার করিও না

প্রথম দৃশ্য

(চাটুজ্যেদের রোয়াক)

ভজহরি : *(বাজখাঁই গলায়)* আমার দলবল সব হাজির ? প্যালারাম ?

প্যালা : আছি ভজাদা।

ভজ : হাবুল সেন ?

হাবুল : *ঢাকাই ভাষায়)* এই তো তোমার সামনেই খাড়াইয়া রইছি। দ্যাখতে পাও না ?

ভজ : ক্যাবলা ?

ক্যাবলা : প্রেজেন্ট স্যার!

ভজ : *(চটে)* আবার ইংরেজী কেন গোমুখ্যু! ইংরেজ চলে গেছে, খাঁটি বাংলা বলবি এখন! বল—হাজির আছি ভজাদা!

ক্যাবলা : আচ্ছা, তাই হবে হাজিরই রইলাম না হয়।

ভজ : নে, চল এবার। বেরিয়ে পড় চটপট।

হাবুল : যাবা কই ? সিনেমায় নাকি ?

ভজ : হুঁ—সিনেমায়। পয়সা দেবে কে চাঁদ, শুনি ? সব তো ট্যাঁকখালির জমিদার। চল—কালীঘাটে বেড়িয়ে আসি।

প্যালা : আবার কালীঘাট কেন ? তোমার ধর্মে-কর্মে মতি হল নাকি ভজাদা ? ও-সব বালাই তো কোনও দিন ছিল না।

ভজ : বেশি বকাসনি প্যালা—রদ্দা খাবি। ধর্ম-কর্ম আবার কী ? কালীঘাটে দিব্যি প্যাঁড়া পাওয়া যায়—চল তাই খেয়ে আসি।

ক্যাবলা : এটা ভালো প্রস্তাব। চল, যাওয়া যাক।

দ্বিতীয় দৃশ্য

কালীঘাট : চারিদিকে গোলমাল। 'পাণ্ডা লাগবে নাকি বাবু ? এই-যে আসুন-আসুন—মাকে দর্শন করুন।' 'একটা পয়সা দাও বাবা, মা কালী মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন!'

ভজা : ধ্যাত্তোর। কালীঘাটে ভদ্দরলোক আসে। খালি পাণ্ডা আর ভিখিরি, ভিখিরি আর পাণ্ডা।
হাবুল : যা কইছ ভজাদা! য্যান গোয়ালন্দের স্টিমার-ঘাট!
প্যালা : চলো ভজাদা, পালাই। এর পরে জামা-কাপড় কেড়ে নেবে মনে হচ্ছে।
ক্যাবলা : ওরেঃ-বাপরে! আবার কে আসছে। একটা বিরাট সাধু দেখছি। পেল্লায় চেহারা—টকটকে লাল চোখ—হাতে চিমটে—মাথায় জটা—যেন ঘটোৎকচ।
সাধু : *(ভীমসেনী গলায়)* হর হর বম বম।
ভজা : উঃ—কী চাঁচাছোলা গলা! যেন ষাঁড় ডাকছে।
সাধু : এই, তোমার নাম কেয়া হ্যায়?
ভজা : *(ঘাবড়ে)* আমার নাম? আমার নাম বাবা ভজহরি মুখুজ্যে।
সাধু : ভজহরি? ঠিক আছে। দে পাঁচসিকে পয়সা।
ভজা : পাঁচসিকে কোথায় পাব বাবা?
ক্যাবলা : আমাদের ট্যাঁক তো দাদা গড়ের মাঠ!
সাধু : *(ধমকে)* চুপ রহো।
প্যালা : ওরে বাবা।
হাবুল : চুপ কইর‍্যা থাক ক্যাবলা। দ্যাখস না চেহারাখান? চিমটা দিয়া অখনি রামপিঠান লাগাইব।
সাধু : এই ভজহরি। কত আছে তোর কাছে?
ভজা : আনা সাতেক হবে বাবা।
সাধু : আনা সাতেক? আচ্ছা, তাই দে। আর একটা বিড়ি।
ভজা : বিড়ি-সিগ্রেট তো আমরা খাইনে বাবাঠাকুর।
সাধু : হুঁ! গুড বয় দেখছি। তা বেশ। বিড়ি-ফিড়ি কখনও খাসনি, ওতে যক্ষ্মা হয়। দে—পয়সাই দে! হাঁ করে আছিস কী? দে। শিগগির—
ভজা : *(ভয় পেয়ে) হ্যাঁ—অ্যাঁ—বাবা—দিচ্ছি—*

(পয়সা দেওয়ার আওয়াজ)

সাধু : বহুত আচ্ছা। ভারি খুশি হলাম। এই নে, আশীর্বাদী জবাফুল দে মাথায়। হ্যাঁ রে ভজহরি, তুই এখানে কেন র‍্যা?
ভজা : আজ্ঞে বাবা, প্যাঁড়া খেতে এসেছিলাম।
সাধু : তা বলছি না। তুই যে মহাপুরুষ রে। তোকে দেখে মনে হচ্ছে পরোপকার করে তুই দেশজোড়া নাম করবি!
ভজা : *(ঢোক গিলে)* দুনিয়ায় অনেক সৎকাজ করেছি বাবা। মারামারি, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়া, ইস্কুলের সেকেন্ড পণ্ডিতের টিকি কেটে নেওয়া —এ সব ভালো ভালো কাজ অনেক করেছি। কিন্তু পরোপকার তো কখনও করিনি।
সাধু : *(চটে)* করিসনি মানে? তুই তো ছোঁড়া বড্ড এঁড়েতক্কো করিস! এই তো আমায় সাত আনা পয়সা দিলি—খেয়াল নেই বুঝি? আমার কথা শোন। সংসার-টংসার ছেড়ে স্রেফ হাওয়া হয়ে যা। দুনিয়ায় মানুষের অশেষ দুঃখ—বুঝলি? সেই দুঃখ দূর করতে আদা-নুন খেয়ে লেগে পড়। আর্তের সেবা কর—দেখবি তিন দিনেই তোর নামে টি-টি পড়ে যাবে। দে দে—একটা বিড়ি দে—
ভজা : বললাম যে বাবাঠাকুর, আমরা বিড়ি-টিড়ি খাই না।
সাধু : ওহো, তাও তো বটে! বেশ বেশ, বিড়ি কখনও খাসনি। আরও শোন—পরের উপকারে নশ্বর জীবন বিলিয়ে দে। আজ থেকেই লেগে যা—

(সাধুর প্রস্থান)

প্যালা : চলে গেল! স্রেফ ভোগা দিয়ে সাত আনা পয়সা মেরে দিলে!
ভজা : চুপ কর প্যালা! বাজে বকলে গাঁট্টা লাগাব! লোকটা নির্ঘাত মহাপুরুষ!
ক্যাবলা : কী সর্বনাশ!
ভজা : ঠিক বলেছে—পরের উপকারই আমি করব। কালই চলে যাব দেশের বাড়িতে—ধোপাখোলায়। দারুণ ম্যালেরিয়া সেখানে। কলকাতা থেকে বোতল ভরে জ্বরারি পাঁচন নিয়ে সবাইকে খাওয়াব। রোগ-বালাই দূর করে দেবে।
হাবুল : কম্ম তো সারছে। আমাগো লিডার ভজাদা শ্যাষে সন্ন্যাসী হইল। হায়—হায়!
ভজা : চুপ কর, আমার মন উদাস হয়ে গেছে। তোদের সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়ে জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করব না। আজই চললাম ধোপাখোলায় (নাটকীয় ভাবে) বিদায়—বিদায়—

তৃতীয় দৃশ্য

(ধোপাখোলার বাড়ি)

ভজা : গ্রামে তো এসেছি! যা ভেবেছি ঠিক তাই। চারদিকেই ম্যালেরিয়া। যেখানে যাই সেখানেই দেখি লোকে জ্বরে কোঁ-কোঁ করছে। দশ বোতল জ্বরারি পাঁচন এনেছি—গ্রামের রোগ তাড়িয়ে তবে আমি নড়ব। হুঁ—হুঁ—ওই রে, পিসিমা আসছে! ভারি মুশকিল, কানে কম শোনে—কথা বলাই শক্ত!

(পিসিমার প্রবেশ)

পিসিমা : হ্যাঁরে, এখন যে বড় দেশে এলি?
ভজা : এমনি এলাম।
পিসিমা : আম নিয়ে এলি। কী আম পেলি এখন অসময়ে? ল্যাংড়া না বোম্বাই?
ভজা : আম নয়। পরোপকার করতে এসেছি পিসিমা।
পিসিমা : পুরি খেতে এসেছিস? পুরি এখানে কোথায় বাবা? পোড়া দেশে কি আর ময়দা-ফয়দা কিছু আছে? ইংরেজ রাজত্বে আর বেঁচে সুখ নেই।

ভজ : ইংরেজ কোথায় পিসিমা ? এখন তো আমরা স্বাধীন। মানে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট !

পিসিমা : কোট-প্যান্ট ? ছিঃ বাবা ! আমি বিধবা মানুষ, কোট-প্যান্ট পরব কেন ? থান পরি।

ভজ : দুত্তোর ! এ তো মহা জ্বালা হল ! ইচ্ছে করছে, পিসিমার কানে খানিক পাঁচন ঢেলে দিই ! *(গলা চড়িয়ে)* বলছিলাম, দেশের রোগ-বলাই তাড়াতে এসেছি।

পিসিমা : কী বললি, মালাই ? মালাই কোথায় পাবি বাবা ? দুধ কই ? গো-মড়কে সব গোরু উচ্ছন্নে গেছে।

ভজ : উঃ—কী জ্বালা। যাই পাঁচনের বোতল বগলে নিয়ে বেরিয়ে পড়ি !

চতুর্থ দৃশ্য

(গ্রামের পথ)

ভজ : গাঁয়ের লোকে তো আচ্ছা খলিফা ! ওষুধ খেতে চায় না ! বলে, ভগবানের দেওয়া রোগ—তাড়ালে পাপ হয়। কী আকাট মুখ্যু সব ! কিন্তু এখন আমি কী করি ? পরের উপকার আমায় যে করতেই হবে ! এ তো মহা মুশকিল হল ! আরে—আরে—ওই তো ! একটা জামগাছতলায় বসে গজানন সাঁতরা ঝিমুচ্ছে দেখছি। নির্ঘাত ম্যালেরিয়া। ওর রোগই আগে সারাই। বেশ হাঁ করে আছে, দিই ওর মুখে খানিক পাঁচন ঢেলে—

গজানন : *(চিৎকার করে)* কে রে বেল্লিক ! উজবুক ! ওয়াক থুঃ-থুঃ—! আমার এমন তাড়ির নেশাটা বেমালুম চটিয়ে দিলে ! মেরেই খুন করে ফেলত তোকে। ওয়াক থুঃ-থুঃ—

ভজ : ইঃ—বড্ড ভুল হয়ে গেছে। ব্যাটা তাড়ি খেয়েছিল। ওরে বাপ রে, তেড়ে আসছে যে। পালাই—

গজ : ওয়াক থুঃ। তোর মুণ্ডু ভেঙে দেব। ওয়াক—

পঞ্চম দৃশ্য

(গ্রামের পথ)

ভজ : নাঃ,হাল ছাড়ছি না। পরের উপকার করে—মানে গাঁ-সুদ্ধ লোককে পাঁচন গিলিয়ে তবে কলকাতায় ফিরব। এই যে সামনেই পাঁচুমামার বাড়ি ; ঢুকে পড়ি !

(একটু পরে)

পাঁচু : উঃ। আঃ। ই-হি-হি-হি।

ভজ : কী হল পাঁচুমামা ? ইজিচেয়ারে শুয়ে আঃ ইঃ করছ কেন ?

পাঁচু : এই গেঁটে বাত বাবা ! গাঁটে গাঁটে ব্যথা। ওফ্।

ভজ : বাত ! *(দেখে নিয়ে)* তাই তো, বাত। *(উৎসাহভরে)* জ্বর হয়নি কখনও মামা ? মানে, ম্যালেরিয়া ?

পাঁচু : ম্যালেরিয়া হয়েছিল বই কি। গত বছর। —উঃ ! আঃ। ইঃ।

ভজ : ওতেই হবে, বুঝলে মামা, ও-ই হল রোগের লক্ষণ। ওই ম্যালেরিয়া থেকেই সব। কিছু ভেবো না, এখুনি তোমার বাত-ফাত একেবারে কাত করে দিচ্ছি।

পাঁচু : বলিস কী রে। তুই তাহলে ডাক্তার হয়ে এসেছিস ? কই শুনিনি তো !

ভজ : ডাক্তার কী বলছ মামা, তার চেয়ে ঢের বড়। একেবারে মহাপুরুষ !

পাঁচু : মহাপুরুষ !

ভজ : তবে আর বলছি কী ? হাতে এই যে বোতল দেখছ—ও ধন্বন্তরি। নাও হাঁ কর।

(কয়েক সেকেন্ড পরে)

পাঁচু : *(চিৎকার করে)* ওয়াক, ওয়াক ! ওরে বাপ রে—গেছি রে—ডাকাত রে—মেরে ফেললে রে ! ওরে, কে কোথায় আছিস রে, ওকে দু-ঘা-বসিয়ে দে রে ! ওয়াক ওয়াক...

ভজ : আর নয়, এবার কেটে পড়ি।

পাঁচু : *(দূর থেকে চিৎকার)* পাজি, ছুঁচো, নচ্ছার, রাস্কেল, খুনে, গুণ্ডা...

ভজ : তা গালই দাও আর যাই করো—পরের উপকার তো হয়েছে। এবার দেখি, আর কাউকে পাই কি না।

ষষ্ঠ দৃশ্য

(গ্রামের পথ। দূর থেকে কান্না : ভ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ)

ভজ : ওই যে আমগাছতলায় দাঁড়িয়ে বছর দশেকের ছোকরা চ্যাঁচাচ্ছে। ম্যালেরিয়াই নিশ্চয়। যাই দেখি ওর কাছে।

(একটু পরে)

এই কী নাম তোর ?

ছেলেটা : *(ফোঁপাতে ফোঁপাতে)* লাড্ডু।

ভজ : লাড্ডু। তা, অমন করে কাঁদছিস ? চোখের জলে যে হালুয়া হয়ে যাবি, আর লাড্ডু থাকবি নে ! কী হয়েছে তোর ?

লাড্ডু : বড়দা চাঁটি মেরেছে।

ভজ : কেন ? তোকে তবলা ভেবেছিল বুঝি ?

লাড্ডু : না। আমি কাঁচা আম খেতে চেয়েছিলাম।

ভজ : এই কার্তিক মাসে, কাঁচা আম খেতে চেয়েছিলি ? শুধু চাঁটি নয় গাঁট্টা খাওয়ার মতো শখ ! ভালো কথা, তুই বুঝি টক খেতে ভালবাসিস ?

লাড্ডু : হুঁ, খুব।

ভজ : নির্ঘাত ম্যালেরিয়ার লক্ষণ। এই লাড্ডু, তোর জ্বর হয় ?
লাড্ডু : হয় বই কি।
ভজ : তবে আর কথা নেই। হাঁ কর।
লাড্ডু : কী আছে বোতলে ? আচার বুঝি ?
ভজ : আচার বলে আচার ! দুরাচার, সদাচার, কদাচার—সকলের সেরা এই আচার। হাঁ কর। হাঁ কর। চটপট !

(কয়েক সেকেন্ড পরে)

লাড্ডু : ওয়াক, থু থু ! বাবা রে, মা রে, বড়দা রে। ওয়াক। ওয়াক ! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা—
ভজ : ইস। ঢিল চালাচ্ছে যে। ওরে ব্বাস। একটা আবার পিঠে এসে পড়ল। উঃ—উঃ, ছেলেটার দেখছি তাক ফস্কায় না, ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে হল।

সপ্তম দৃশ্য

(ধোপাখোলার বাড়ি : ভজহরি ও পিসিমা)

পিসিমা : তুই গ্রামে এ কী উৎপাত শুরু করেছিস বাবা ভজহরি ? তোকে দেখলে সবাই বাড়ির দরজা বন্ধ করে দেয়, ছেলেপুলে দৌড়ে পালিয়ে যায়। লোকে যে তোকে ঠ্যাঙাবার ফন্দি আঁটছে।
ভজ : *(গম্ভীর গলায়)* পরের জন্যে আমি প্রাণ দেব পিসিমা।
পিসিমা : কী বললি ? ঘরের লোকের কান কেটে নিবি ? *(মড়াকান্না জুড়ল)* কী সর্বনাশ। ওগো, আমার কী হল গো ! আমাদের ভজহরি যে পাগল হয়ে গেল গো।
ভজ : দুত্তোর, কথা কওয়াই ঝকমারি ! বেরিয়ে পড়ি বাড়ি থেকে—

অষ্টম দৃশ্য

(পথ)

ভজ : কী অকৃতজ্ঞ নরাধম দেশ। এই দেশের উপকারের জন্যে মরিয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অথচ কেউ আমার কদর বুঝবে না ? ছিঃ ছিঃ। এইজন্যেই দেশ আজ পরাধীন—থুড়ি, স্বাধীন ! কিন্তু কী করা যায় ? কী ভাবে উপকার করি ? গাঁয়ে তো যাওয়া যাচ্ছে না, লোকে পিটিয়ে চ্যাপটা করে দেবে। কার উপকার করি এখন ?

(একটু পরে)

আরে, নিমগাছতলায় ওই তো তিনটে ছাগল ঝিমুচ্ছে ! ভারি খারাপ লক্ষণ ! এখানেকার জলে হাওয়ায় ম্যালেরিয়া ! ছাগলকেও ধরেছে। ধরাই স্বাভাবিক ! আহা অবোলা জীব ! কেউ ওদের দুঃখ বোঝে না ! আহা—চুক চুক ! ছাগলকেই তবে পাঁচন খাওয়াই। মানুষের মতো ওরা অকৃতজ্ঞ নয়। তেড়ে মারতে আসবে না। আজ থেকে এই অবোলা জীবের উপকার করাই আমার ব্রত। যাই ছাগল দিয়েই তবে শুরু করি—

(একটু পরে ছাগলের ডাক—ব্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—)

আঃ, ছটফট করছিস কেন ? তোর ভালোর জন্যেই তো ! *(ছাগলের ডাক—ভ্যা—আ্যা—অ্যা—)* এবার দু' নম্বর। আঃ, ব্যাটা তো ভারি নচ্ছার ! নে খা না ! *(ছাগলের ডাক)* চলে আয় তিন নম্বর। খেয়ে নে ধন্বন্তরী পাঁচন—

(তিনটে ছাগলের সমস্বরে ডাক—ব্যা-অ্যা-অ্যা—ভ্যা অ্যা-অ্যা)

লোক : *(দূর থেকে চিৎকার করে)* ওগো, সেই খুনে ডাকাতটা গো ! আমার তিনটে ছাগলকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেললে রে—
ভজ : সর্বনাশ ! ছাগলের মালিক দেখছি ! নাঃ, সটকাতে হল।
লোকটা : *(চেঁচিয়ে)* আমিও হলধর সাঁপুই ! সহজে ছাড়ব না। মামলা করব, জেল খাটাব ! *(ছাগলের ডাক)* হায় হায়, আমার ছাগল বুঝি গেল !

নবম দৃশ্য

(আদালত)

পেয়াদা : ফরিয়াদি হলধর সাঁপুই হা—জির—
হলধর : এই যে হুজুর, হাজির !
উকিল : ধর্মাবতার। হুজুর মাননীয় জজ বাহাদুর !
জজ : অমন করে চেঁচাবেন না মশাই, পিলে চমকে যায় ! আপনার মক্কেলের নালিশ বলুন।
উকিল : ধর্মাবতার, এই যে কাঠগড়ায় আসামী ভজহরি মুখুজ্যে দাঁড়িয়ে আছে, ও একটা মহা পাষণ্ড। ও যে অন্যায় করেছে তা আমাদের দরখাস্তে বিশদভাবেই লেখা আছে। অবোলা জীবের ওপর ভজহরি যে ভীষণ অত্যাচার করেছে, তার নিন্দের ভাষা নেই। একটা ছাগল পরশু থেকে কাঁচা ঘাস পর্যন্ত হজম করতে পারছে না ! আর একটা সমানে বমি করছে আর একটা তিন দিন ধরে সামনে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে—ফরিয়াদির একটা ট্যাঁকঘড়ি সুদ্ধ চিবিয়ে ফেলেছে।—কী হে হলধর—তাই নয় ?
হলধর : *(ফোঁস-ফোঁস করে)* আজ্ঞে ধর্মাবতার, জজসাহেব, উকিলবাবু যা বলেছেন সবই সত্যি। আমার ট্যাঁকঘড়িটা খুব ভালো ছিল স্যার। কী শক্ত ! আমার ছেলে সেইটে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে আম পাড়ত। চলত না বটে, তবু ঘড়ির মতো ঘড়ি ছিল একটা। *(ভেউ ভেউ, হলধরের কান্না : একটু পরে)* ঘড়ি নয় যাক হুজুর, কিন্তু আমার

অমন তিন-তিনটে ছাগল ! বুঝি পাগল হয়ে গেল হুজুর, একেবারে উদ্দাম পাগল !

জজ : আরে জ্বালাতন ! আরে বাপু, তুমিও তো দেখছি একটা পাগল। ছাগল কখনও পাগল হয়। সে যাক। অপরাধের গুরুত্ব চিন্তা করে আমি আসামী ভজহরি মুখুজ্যেকে তিনটাকা জরিমানা করলাম—এই টাকায় হলধরের ছাগলেরা রসগোল্লা খাবে।

দশম দৃশ্য

(চাটুজ্যেদের রোয়াক)

ভজ : প্যালা।

প্যালা : হাজির।

ভজ : হাবুল।

হাবুল : সামনে খাড়াইয়া রইছি।

ভজ : ক্যাবলা !

ক্যাবলা : প্রেজেন্ট স্যর—থুড়ি এই যে মহাশয়।

ভজ : শোন, মনটা বেজায় খিঁচড়ে গেছে। বুঝলি, সংসারে কারও উপকার করতে নেই।

প্যালা : নিশ্চয়ই না।

ক্যাবলা : উপকারীকে বাঘে খায়।

হাবুল : বিনা উপকারেই যখন পৃথিবী চলতে আছে, তখন উপকার করতে গিয়া খামকা ঝামেলা বাড়াইয়া হইব কী !

ভজ : যা কইছস। *(হেঁড়ে গলায়) বুঝলি, আমি আর-একখানা নতুন বর্ণপরিচয় লিখব। তার প্রথম পাঠ থাকবে : কখনও পরের উপকার করিও না।*

ক্যাবলা : সাধু। সাধু।

ভজ : *(গর্জন করে)* খবরদার, সাধু-ফাদুর নাম আমার কাছে করবি নে। ওই সাধুর জন্যেই তো এত কেলেঙ্কারি। একবার সাধুকে যদি হাতের কাছে পাই, তা হলে ওরই একদিন কি আমারই একদিন।

সং যো জ ন

কিছু কথা : বই নিয়ে, টেনিদাকে নিয়ে

টেনিদাকে নিয়ে লেখা যে সমূহ গল্প-উপন্যাস-নাটক এই সংগ্রহে অন্তর্ভুক্ত হল, পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে রচনাকাল-অনুসারে সেগুলিকে সাজানো গেল না। তার বদলে, পাঠকের দৃষ্টিকোণ থেকে টেনিদার কীর্তিকাহিনীগুলি নানাভাবে খতিয়ে দেখে ধারাবাহিকতার একটি নতুন চেহারা এ-গ্রন্থে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এই প্রয়াস কতটা সার্থক হয়ে উঠতে পেরেছে, জানি না। বিশেষত, গল্পের ক্ষেত্রে। প্রথম কোন্‌টি, তা চিহ্নিত করা প্রায় দুঃসাধ্য। অনুরোধ রইল—এ-বিষয়ে উপযুক্ত তথ্য যদি কারও জানা থাকে, প্রকাশকের ঠিকানায় তিনি যেন অনুগ্রহ করে তা জানিয়ে দেন। এ-বইয়ের ভবিষ্যৎ-সংস্করণে সেই অনুযায়ী পরিবর্তন ঘটানো হবে।

উপন্যাস হিসেবে, 'চার মূর্তি'ই টেনিদা-সিরিজের প্রথম উপন্যাস। ১৯৫৭ সালে অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে 'চার মূর্তি' যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, ভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "ছোটদের একটুখানি খুশি করবার আশা নিয়ে 'চার মূর্তি' ধারাবাহিকভাবে 'শিশুসাথী'তে লিখেছিলাম। ছোটরা আশাতীতভাবে সাড়া দিয়েছে। সেই ভরসাতেই বইয়ের আকারে প্রকাশ করা গেল।"

'চার মূর্তির অভিযান' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালের জুলাই মাসে। এটিও অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে প্রকাশিত। এ-বইয়ের ভূমিকায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের নাম ব্যবহার করেননি, টেনিদা-কাহিনীর কথক প্যালারামের জবানিতেই দারুণ মজাদার একটি ভূমিকা লিখেছেন :

> ছোট ছোট বন্ধুরা,
>
> পটলডাঙার 'চার মূর্তি' এখন বড় হয়েছে, তারা কলেজে পড়ছে। তাই সেদিন টেনিদা এসে শাসিয়ে বললে, 'দ্যাখ্ প্যালা, আমাদের কীর্তি-কাহিনী নিয়েই যে সব উপন্যাস লিখছিস, তাতে লোকের কাছে আর মান থাকবে না। ফের যদি তুই আমাদের নিয়ে উপন্যাস লিখবি তাহলে এক চড়ে তোর নাক নাসিকে পাঠিয়ে দেব।' হাবুল সেন সঙ্গে-সঙ্গে বললে, 'হ, সত্য কইছ।' আর ক্যাবলা দয়া করে বললে, 'মধ্যে মধ্যে দু-একটা গল্প লিখতে পারিস—নইলে অভ্যুদয়ের অমিয় চক্রবর্তী আবার রাগ করবে।' মাথা চুলকে বললুম, 'তথাস্তু।'
>
> তোমরা তো টেনিদাকে জানোই। আমি রোগা-পটকা প্যালারাম—তাকে

চটাতে পারি ? তাই 'চার মূর্তি'কে নিয়ে আর উপন্যাস নয়, কখনো কখনো গল্প তোমাদের নিশ্চয় শোনাবো। কী করি বলো ? প্রাণের মায়া আছে তো একটা !

—তোমাদের
প্যালারাম

আমাদের সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, টেনিদার এই শাসানি শেষ পর্যন্ত ভুলতে হয়েছে প্যালারামকে। নইলে কি আর 'ঝাউবাংলোর রহস্য' লিখে 'সন্দেশ' পত্রিকায় ছেপে দেয় সে ?

হ্যাঁ, প্যালারামের সেই জবানি 'ঝাউবাংলোর রহস্য' উপন্যাসের শেষেই রয়েছে। নবপর্যায় 'সন্দেশ' পত্রিকাতে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল 'ঝাউবাংলোর রহস্য' (সমগ্র কিশোরসাহিত্যে অবশ্য এ-লেখা অন্তর্ভুক্ত 'ঝাউরহস্য' নামে)। সে-উপন্যাসে প্যালারাম জানাচ্ছে : "আমাদের বোকা বানিয়ে পুণ্ডরীক কুণ্ডু গোয়েন্দা গল্প লিখবেন, তা-ও কি হতে পারে ? তাই তিনি তাঁর উপন্যাস ছাপাবার আগেই সব ব্যাপারটা আমি 'সন্দেশে' ছেপে দিলুম।" মূলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে 'ঝাউরহস্য' নামে নয়, 'ঝাউবাংলোর রহস্য' নামেই এ-উপন্যাসটি এই সংগ্রহে গৃহীত হল।

এই সংকলনে টেনিদাকে নিয়ে লেখা একটিমাত্র নাটিকাই স্থান পেয়েছে। কৌতুকনাটিকা কম লেখেননি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তার অনেকগুলিই অতি সুখ্যাত এবং বহু-অভিনীত। কিন্তু টেনিদাকে নিয়ে কি কোনও মৌলিক নাটক লেখেননি ? তার খোঁজ অন্তত পাওয়া যায়নি। এখানে যে-নাটিকাটি ছাপা হল, তা আসলে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ওই নামেরই একটি গল্পের নাট্যরূপ। লক্ষণীয় যে, গল্পে থাকলেও টেনিদা এই নাটিকাটিতে টেনিদা নামে নেই। টেনিদার ভালো নাম ভজহরি মুখোপাধ্যায়। সেই নামই এ-নাটিকায় ব্যবহৃত। আরও বড় কথা, পটলডাঙার তিন মূর্তি টেনিদা নামে নয়, ভজাদা নামে সম্বোধন করছে টেনিদাকে। এ-থেকে অনুমান করতে ইচ্ছে হয়, নাটিকাটিই আগে লেখা হয়েছে। গল্পটি পরবর্তীকালে, টেনিদা যখন ডাকনামেই স্বনামধন্য।

এই সূত্রেই মনে পড়ল, পটলডাঙার 'চার মূর্তি'র যে একটা করে ভালো নাম রয়েছে, 'চার মূর্তি' উপন্যাসের কোথাও কিন্তু তা বলা নেই। 'চার মূর্তির অভিযান'-এ পৌঁছে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শুরুতেই ভালো নামের এক হঠাৎ চমক। এবং হঠাৎ মজা। প্যালারামের জবানিতেই সে-জায়গাটা একবার নতুন করে শোনা যাক—

"ভজহরি মুখার্জি—স্বর্ণেন্দু সেন—কুশল মিত্র—কমলেশ ব্যানার্জি—

নামগুলো শুনে চমকে চমকে উঠছ তো ? ভাবছ—এ আবার কারা ? হুঁ, হুঁ—ভাববার কথাই বটে। এ হল আমাদের চার মূর্তির ভাল নাম—আগে স্কুলের খাতায় ছিল। এখন কলেজের খাতায়। ভজহরি হচ্ছে আমাদের দুর্দান্ত টেনিদা, স্বর্ণেন্দু হল ঢাকাই হাবুল, কুশল হচ্ছে হতচ্ছাড়া ক্যাবলা, আর কমলেশ ? আন্দাজ করে নাও।" কমলেশ যে প্যালারাম, আন্দাজ করতে-না-করতেই অপ্রত্যাশিত মজা :

"এ-সব নাম কি ছাই আমাদের মনে থাকে ? প্লেনে উঠতে যেতেই একটা লোক কাগজ নিয়ে এইসব নাম ডাকতে লাগল। আমরাও—এই যে—এই যে বলে টকাটক উঠে পড়লুম। হাবলা তো অভ্যাসে বলেই ফেলল, প্রেজেন্ট স্যার।"

শুধু এঁদের ভালো নামই যে 'চার মূর্তির অভিযান'-এ শোনালেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তা নয়, 'চার মূর্তি'তে ছিল না, অথচ অভিযান-কাহিনীর শুরুতেই পাওয়া যাচ্ছে টেনিদার সেই অবিস্মরণীয় সোল্লাস চিৎকার—ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস, আর সেইসঙ্গে পটলডাঙার তিন মূর্তির ততোধিক উচ্চগ্রামে সমস্বর সংযোজন, ইয়াক্ ইয়াক্।

আসলে, টেনিদার কাহিনী যত এগিয়েছে, ততই এতে যুক্ত হয়েছে কৌতুকের নতুন-নতুন মাত্রা। প্রথম দিকে টেনিদা শুধু 'মেলা বকিসনি' বলেই থেমে গেছে, ক্রমশ টেনিদার মুখে বসেছে নিত্যনতুন প্রবচন : কুরুবকের মতো বকবক করা, কান ছিঁড়ে কানপুরে পাঠানো, দাঁত পাঠানো দাঁতনে, নাক পাঠানো নাসিকে, পুঁদিচ্চেরি মানে ব্যাপারটা খুব ঘোরালো—এই রকম বহু চিরকালীন কৌতুকময় সংলাপ। শুধু কি কথাবার্তার ধরনই বদলেছে ? বদলেছে টেনিদার চালচলন, চরিত্র-চেহারা, এমন-কি আত্মীয়স্বজনের নাম পর্যন্ত। দু'-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। টেনিদার উচ্চতা প্রথম দিকে ছিল হাতের হিসেবে। ছ' হাত, এমন-কি কোনও গল্পে পাঁচ হাতও। (দ্রষ্টব্য : এ-সংগ্রহের গোড়ার কয়েকটি গল্প)। পরে টেনিদার উচ্চতা—যেমন, 'পরের উপকার করিও না' গল্পে—ছ' ফিট। 'একটি ফুটবল ম্যাচ'-এ কুট্টিমামার পরিচয়—পটলডাঙার থাণ্ডার ফুটবল ক্লাবের দুই খেলোয়াড়ের কাশীনিবাসী মামা হিসেবে। পরবর্তীকালে সেই কুট্টিমামাই দিব্য হয়ে উঠেছেন টেনিদার মামা। কি গল্পে, কি উপন্যাসে। জানি না, স্বনামধন্য ভাগ্নের মামা হওয়াকেই বেশি গৌরবজনক বলে মনে করেছেন কি না কুট্টিমামা। 'কাক-কাহিনী'তে মোক্ষদামাসীকে দেখছি তেলিনীপাড়ায় থাকেন, তিনিই কখন যেন ঘুঁটেপাড়াবাসিনী হয়ে উঠেছেন টেনিদার গল্পের তোড়ে। তবে টেনিদার বানানো গল্প তো, এ-সমস্ত কিছুই তাই শেষ পর্যন্ত মানিয়ে যায়।

টেনিদা তো গল্প বানান, কিন্তু টেনিদাকে কীভাবে বানালেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ? সত্যি কি পটলডাঙায় এই নামের কোনও বাস্তব চরিত্রকে কাছ থেকে দেখেছিলেন তিনি ? আর সেই বাস্তবের সঙ্গে নিজের ছেলেবেলার যাবতীয় অভিজ্ঞতা আর কল্পনা মিশিয়ে অদ্বিতীয় টেনিদার গল্প লিখতে শুরু করেছিলেন ? এ-প্রশ্নের উত্তর খুঁজুন গবেষকরা। তবে পটলডাঙায় সত্যিই থাকেন এক টেনিদা। আর সম্প্রতি পটলডাঙায় গিয়ে টেনিদাভক্ত এক সাংবাদিক, শ্রীদীপংকর চক্রবর্তী, সেই সত্যি টেনিদার সঙ্গে দেখা করে এসেছেন। তাঁর সেই সাক্ষাৎকারটি টেনিদা সম্পর্কে এমনই নানান সরস তথ্যে সমৃদ্ধ আর সব-মিলিয়ে এতই সুন্দর যে সেটিকেও এই বইতে ছেপে দেবার লোভ সামলানো গেল না। সেইসঙ্গে ছাপা হল বাস্তবের এই টেনিদার দু' বয়সের দুটি আলোকচিত্র।

[illegible]

টেনিদা এখন

পটলডাঙার সেই টেনিদার বয়স এখন ৭৫

দীপঙ্কর চক্রবর্তী

'চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে টেনিদা বললেন, ডি-লা-গ্রান্ডি মেফিস্টোফিলিস ইয়াক ইয়াক।' এই অদ্বিতীয় টেনিদা কি শুধুই নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সৃষ্টি? আর সেই চাটুজ্জেদের রোয়াক কি সত্যি কোথাও ছিল? তাঁর জনপ্রিয় উপন্যাস 'চারমূর্তি'র কোনও বাস্তব প্রেরণা আদৌ ছিল কি? এতদিন যাঁরা এই প্রশ্নগুলি [illegible] পাড়ে, তাঁদের [illegible] টেনিদা আর লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় একই বাড়িতে থাকতেন, টেনিদা বাড়িওয়ালা, লেখক ভাড়াটে।

মধ্য কলকাতার গলির গলি, তস্য গলির ভিতর দিয়ে ঢুকতে হয় সেই বাড়িতে। গলির মুখেই বিখ্যাত সেই রোয়াক। ২০ নম্বর পটলডাঙা স্ট্রিটের বাসিন্দা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ওরফে আসল টেনিদা বললেন, "ওটা আসলে মুখুজ্জেদের রোয়াক। নামটা একটু পালটে দিয়েছিলেন নারায়ণদা। আর 'ডি-লা গ্রান্ডি'ও আসলে ওঁরই মুখের কথা, গল্পের খাতিরে আমার মুখে বসিয়ে দিয়েছিলেন।"

'টেনিদাকে তোমরা চেনো না। পৃথিবীর প্রাচীনতম কীর্তি[illegible]—পটলডাঙার টেনিদা। পুরো ছ' ফুট লম্বা, [illegible] খাঁড়ার মতো খাড়া নাক, খটখটে [illegible]। গড়ের মাঠে গোরা ঠেঙিয়ে [illegible]। হাত তুললেই মনে হবে বক্সার, [illegible] গান করলেই বোধ হবে [illegible]।' এভাবেই [illegible] নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় টেনিদার সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছেন। গল্পের টেনিদার বয়স তখন ছিল ২০/২৫, এখন কলকাতার টেনিদার বয়স ৭২।

যৌবনের ব্যায়াম-করা শরীরটার উপর বয়সের ছাপ অবশ্য তেমন পড়তে পারেনি। একটা চোখেই না একটু কম দেখেন। এটুকু বাদ দিলে [illegible] এখনও টানটান। তবে অত্যন্ত মৃদুভাষী, আপাদমস্তক ভদ্রলোকটির সঙ্গে কথা বলার পরই টের পাওয়া যায় যে, টেনিদার '[illegible]' চরিত্র গড়তে লেখককে যথেষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল। 'তাও তো ওঁর চরিত্রে কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের মিশেল আছে। চেহারা আর ডাকনামটা অবিকল এক রেখেছেন। [illegible] আর [illegible] মূর্তিকে নারায়ণদা যে কতজনের কত কিছু

মিলিয়ে-মিশিয়ে তৈরি করেছেন, তা উনি নিজেই মনে করে উঠতে পারতেন না," বললেন টেনিদার পঞ্চাশ বছরের জীবনসঙ্গিনী বাসন্তীবৌদি। বাড়িউলি হওয়ার সুবাদে যিনি সপরিবার নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে বিলক্ষণ চিনতেন।

"আমাদের তো ভাড়াটে-বাড়িওয়ালা সম্পর্ক ছিল না, উনি আর আশাবৌদি (আশা দেবী) ছিলেন আমাদের পারিবারিক বন্ধু। ১৯৪৬ সালের মার্চ মাসে আমার শ্বশুরমশাই এই পুরনো বাড়িটা কিনলেন, পরের মাসেই ওঁরা দোতলায় ঘর ভাড়া নিয়ে এলেন। একতলাটা তখনও সারাই চলছে। আমাদের নতুন সংসারও দোতলায়। খুব তাড়াতাড়ি বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমার স্বামীর চেয়ে বছর তিনেকের বড় ছিলেন উনি। তা, আমরা ওঁদের দাদা-বৌদি ডাকতাম, ওঁরাও আমাদের ডাকতেন দাদা-বৌদি বলে। আড্ডা মারতে তো যেমন আমার কর্তা, তেমন নারায়ণদা—দুজনেই ওস্তাদ। পাড়ার অন্যরাও প্রায়ই জুটে যেত! দিন নেই, রাত নেই, কখনও সামনের ১৮ নম্বর বাড়ির রোয়াকে, কখনও এ বাড়ির ছাদে বসে ওঁদের ঘন্টার পর ঘণ্টা আড্ডা চলত। সেই সঙ্গে রাশি রাশি চপ-কাটলেট, কুলপি বরফ, ঘুগনি, চানাচুর। এদিকে কাপের পর কাপ চা জুগিয়ে যেতাম আমি আর আশাবৌদি, পালা করে।"

আড্ডা মারতে-মারতেই নানা টুকরো কথা, মজার নানা ঘটনার বিবরণ মনের ঝুলিতে জমা করে নিতেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। তার সঙ্গে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে তৈরি হত গল্প। "যেমন একদিন আড্ডায় আমরা ছেলেবেলার ঘুড়ি ওড়ানোর কথা বলছিলাম। তখন আমি বৈঠকখানায় থাকি, রোগা-পটকা চেহারা। তাও ইয়াব্বড় একটা চ্যাং ঘুড়ি উড়িয়েছিলাম একবার বিশ্বকর্মা পুজোয়। যেই না সেকথা বলা, অমনি নারায়ণদা বললেন, 'অ্যাঁ, ঘুড়ির সঙ্গে সঙ্গে আপনিও আকাশে উড়ে গেলেন তো।' এই নিয়ে হাসি-ঠাট্টা। ওমা, সেই গল্পই ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে লিখে ফেললেন 'ঢাউস'। তা হলেই বুঝুন, সাহিত্যিকরা কেমন তিলকে তাল করেন।" হাসতে হাসতে বললেন টেনিদা।

তবে যে টেনিদার পরিচয় দিতে গিয়ে লেখক বলেছেন, 'জাঁদরেল খেলোয়াড়—গড়ের মাঠে তিন তিনটে গোরার হাঁটু ভেঙে দিয়ে রেকর্ড করেছেন।' এও মিথ্যা? প্রশ্ন শুনে টেনিদা আবার একটু হেসে নিলেন। তারপর বললেন—"না, একটু সত্যি আছে। আমি তখন মিলিটারি অ্যাকাউন্টস-এ কাজ করি। অফিস-ক্লাব গোলকিপার কাউকে না পেয়ে ধরে-বেঁধে আমাকেই মাঠে নামিয়ে দিল। আমি সাক্ষীগোপালের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে। ওদিকে অন্য দলের খেলোয়াড় গোল করতে ছুটে আসছে। আমাকে বন্ধুরা যত বলে—'ডাইভ দে, ডাইভ দে', আমি নড়ি না। ডাইভ দেব কেমন করে, ওখানে কাদা ছিল যে। পর পর দুটো গোল খেয়েই চোঁ চাঁ দৌড় মেরে ট্রামে উঠে সোজা বাড়ি। পরদিন অফিসে যেতেই চেঁচামেচি, গালাগাল। আমি বললাম, তোমরা দশজন মিলে যাকে আটকাতে পারলে না, তাকে আমি একা আটকাব, আশা কর কী করে? তো, এই হল আমার ফুটবল খেলা। বাকিটা বুঝে নিন।"

এ-পর্যন্ত বাসন্তীবৌদি কোনও আপত্তি করেননি। এবারে তিনি বললেন, "ওঁর স্বভাবের সঙ্গে গল্পের টেনিদার কিন্তু অনেক মিলও ছিল। হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা বলে উনি খুব লাফাতেন, কিন্তু আসলে তো ভিতু, তাই যেই বলা হত, যাও না, কর না, কী করবে। অমনি উনি কোনও একটা ছুতোয় ছাদে উঠে বসে থাকতেন। নারায়ণদা সবই লক্ষ করতেন। চারমূর্তি উপন্যাসে তাই দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু ঘচাং ফুঃ চিঠি দিয়েছে জেনেই টেনিদা টেবিলের তলায় ঢুকে পড়েছিল।" (লজ্জা ঢাকতে টেনিদাকে একটু বেশিক্ষণ হাসতে হল)।

পটলডাঙার গ্রেট টেনিদার ব্যাপার তো বোঝা গেল। তাঁর তিন সাকরেদের ভূমিকায় কারা ছিলেন? তাঁরাও কি টেনিদার মতোই বাস্তব চরিত্র? "না।" বাসন্তীবৌদি জানালেন, 'আমার এক দেওরের নাম হাবু, তার সঙ্গে একটা 'ল' যোগ করে উনি হাবুলকে তৈরি করেছেন। ক্যাবলা আমার আর-এক দেওরের নাম। তবে, ওই দুজনের আসল চরিত্রের সঙ্গে গল্পের কোনও মিলই নেই, মিল শুধু নামে।" নিজের পিতৃদত্ত নাম তারকনাথ বদলে যিনি নারায়ণ করেছিলেন, তিনি যে তাঁর গল্পের চরিত্রগুলোর নাম বদলাবেন, তাতে আর আশ্চর্য কী?

মনে হয়, বরিশালের বাঙাল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় খাঁটি কলকাত্তাইয়া পরিবেশে এক কাঠবাঙালকে এনেছেন, ভাষায় একটু বৈচিত্র্য আনতে। যার নাম ক্যাবলা দিয়েছেন, তাকে তিনি করেছেন বুদ্ধিমান ও সাহসী। আর প্যালারাম তো বলাই বাহুল্য লেখক নিজে। তাই তার কথা তিনি লিখেছেন উত্তমপুরুষে। নিজেকে নিয়ে মজা। পেটরোগা প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে নিত্যি পালাজ্বরে ভোগে, পটলডাঙায় থাকে, পটল দিয়ে সিঙ্গি মাছের ঝোল খায়। দু'পা হাঁটতে গেলেই তার পেটের পিলে খটখট করে জানান দেয়। টেনিদা তাকে প্রায় হুমকি দেন—'এক চড়ে তোর নাক নাসিকে, আর কান কানপুরে পাঠিয়ে দেব।' ভয়ে প্যালার পিলে চমকে যায়।

আপনাকে এমন হাস্যকর একটা চরিত্র হিসাবে সৃষ্টি করেছিলেন লেখক, তার জন্য বাস্তবে কখনও মুশকিলে পড়তে হয়নি? প্রশ্ন করতেই টেনিদা বললেন—"হয়নি আবার! খুব হয়েছে। শ্বশুরবাড়ি যাওয়া একটা সময় বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শালা-শালিরা হাসির খোরাক পেত আমার মধ্যে। ঠাট্টার চোটে অস্থির হয়ে যেতাম। পরে অবশ্য সয়ে গিয়েছিল। খ্যাতির বিড়ম্বনা তখন উপভোগও করেছি। কয়েক বছর আগে আমাকে আর 'চারমূর্তি' সিনেমায় যে টেনিদা সেজেছিল, সেই চিন্ময় রায়কে নিয়ে একটা আড্ডার আয়োজন হয়েছিল। তবে সিনেমার টেনিদাকে ঠিক পছন্দ হয়নি আমার।"

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর সব গল্পে চারমূর্তিকে ডাকনামেই বিখ্যাত করে দিয়ে গেলেও তাদের একটা করে ভাল নামও কিন্তু দিয়েছিলেন। টেনিদার ভাল নাম ভজহরি মুখোপাধ্যায়, হাবুল হল স্বর্ণেন্দু সেন, ক্যাবলা কুশলকুমার মিত্র, আর প্যালা কমলেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। পাঠকরা ওই সব তোলা নাম ভুলে গিয়েছেন, মনে রেখেছেন শুধু চরিত্রগুলোকে।

বইয়ের পাতার বাইরে নিজস্ব জীবন যাপন করছেন কেবল টেনিদাই। তাঁর একমাত্র ছেলে চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায় কল্যাণীতে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার। একমাত্র মেয়ে ইলা চক্রবর্তী সিমলা স্ট্রিটে ঘরকন্না করছেন। আর স্ত্রী বাসন্তীবৌদির কথা তো আগেই বলেছি। এঁদের সবাইকে, আর নাতি-নাতনিদের নিয়ে টেনিদার সুখের সংসার। নিজের একটা ছাপাখানাও আছে তাঁর। সব মিলিয়ে দিব্যি আছেন তিনি। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর মুখে শোনা যেত এ-যুগের স্লোগান—'টেনিদা, যুগ যুগ জিও।' তিনি নেই, আমরা তাই তাঁরই কথার প্রতিধ্বনি তুলে বলি, 'ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস, ইয়াক্ ইয়াক্।'

২৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ তারিখের দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।